বঙ্গভাষার লেখক

প্রথম ভাগ

বঙ্গবাসী-স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের উদ্যোগে ও ব্যয়ে

বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

[illegible] ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো-মেসিন্ যন্ত্রে,—

শ্রীযুক্ত নুটবিহারী রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভূমিকা।

গ্রন্থের ইহা প্রথম ভাগ মাত্র। সুতরাং এ গ্রন্থের অভিধেয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবৃতি শেষভাগে করিবার ইচ্ছা রহিল। তবে প্রথমেই বলিয়া রাখি, ইহা গ্রন্থাবলীর সমালোচনা পুস্তক নহে,—গ্রন্থকার সমূহের জীবনী সংগ্রহ। আটবৎসর যাবৎ "বঙ্গবাসী" আফিস হইতে এ চেষ্টা হইতেছে। ইহাই সে চেষ্টার প্রথম ফল।

গ্রন্থ-সঙ্কলনে বিস্তর বন্ধুবান্ধব এবং সাহিত্য-সেবীর সাহায্য পাইয়াছি। হুগলী-ভাঙ্গামোড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্ত এবং বর্দ্ধমান-দেনুড়ের শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ ব্রহ্মচারী ভট্টাচার্য্য মহাশয় এপক্ষে আমাকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছেন; ইহাঁরা বহু প্রথিতনামা গ্রন্থকারের জীবনী সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা ১৭নং শিকদার বাগান ষ্ট্রীটস্থ শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী এবং কলিকাতা সাহিত্য পরিষদের শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের আনুকূল্যে প্রয়োজন মত বহু প্রাচীন গ্রন্থ পড়িতে পাইয়াছি। কলিকাতা হিন্দুকলেজের অন্যতম সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, বঙ্গবাসীর অন্যতম সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দোপাধ্যায় বিএ, বঙ্গবাসী আফিসের বহুজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকান্ত কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য, বঙ্গবাসী-দৈনিকের প্রধান লেখক শ্রীযুক্ত ভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সাবিত্রী ও "বালিকার পদ্য শিক্ষা" গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত প্রভৃতি অনেকেই আমাকে এ কার্য্যে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন।

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এবং বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী-প্রবন্ধ বঙ্গবাসীর সর্ব্বপ্রধান সহকারী সম্পাদক,—আমার সাহিত্য-গুরু,—সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সরকার মহাশয়ের লিখিত,—বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। বঙ্গবাসী হইতেই এই কয়েকটী প্রবন্ধ আমি "বঙ্গভাষার লেখক" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

এরূপ গ্রন্থে বিস্তর ভ্রম-প্রমাদ থাকিবার সম্ভাবনা—আছেও। গ্রন্থের এক স্থানে 'হরপ্রসাদ কর' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে, পুরুষপরীক্ষা হরপ্রসাদ করের লিখিত; কিন্তু বাস্তুতঃ তাহা নহে; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, পুরুষ-

পরীক্ষা গ্রন্থের গ্রন্থকার ।গ্রন্থের অন্যত্র এ কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের জীবনী-বিবরণ সংগ্রহে বা সময়-নির্ণয়েও এ গ্রন্থে ক্রটী থাকিতে পারে। আমার বিনীত নিবেদন,—এ গ্রন্থে যিনি যাহা ভ্রম বলিয়া মনে করিবেন, তিনি যেন তাহা বঙ্গবাসী আফিসে গ্রন্থ-সম্পাদকের নিকট কৃপা করিয়া লিখিয়া পাঠান। তাহা হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে এ গ্রন্থের বিশুদ্ধি-সাধনে সবিশেষ সাহায্য পাইব।

বর্ণাশুদ্ধি এবং ছাড়ও এবার স্থানে স্থানে হইয়াছে। পণ্ডিত-প্রবর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের জীবনী-প্রবন্ধের কতিপয় স্থানের একটী শুদ্ধিপত্র এই স্থানেই সন্নিবিষ্ট করিলাম।

"৯০১ পৃঃ ২য় পংক্তিতে 'কেন যে ঘটে নাই তাহা পরে বলিব' না হইয়া "কেন যে ঘটে নাই তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি" হইবে। ৯০১ পৃঃ ৯ পংক্তির পর নিম্নলিখিত অংশ বসিবে ;—

"১২৮৪ সালে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয়ের নিকট আমি ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করি। আমার সৌভাগ্যগুণে আমি অধ্যাপক মহাশয়ের কৃপা ও প্রীতির পাত্র হইয়াছিলাম। ১২৯৩ সাল পর্য্যন্ত আমি তাঁহারই নিকটে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করি। এই সময়েরই মধ্যে সুযোগ মত আমার বেদান্তের কতিপয় গ্রন্থ, সাংখ্য গ্রন্থাবলী, পাতঞ্জল দর্শন, এবং নব্যস্মৃতি অধ্যয়ন করা ঘটে। ১২৮৮ সালে ছয় মাস যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনীয় শাখা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমার অধ্যয়ন স্থান ভট্টপল্লী এবং ৺কাশীধাম।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পং
পুরুষ	পূর্ব্বপুরুষগণ	৮৯৭	১৩
সভার কোলে	সভার মধ্যে কোলে	৮৯৮	৪
থাকিয়া	থাকিলে	৮৯৯	১৮
মাত্র	।০ মাত্র	৯০০	১৩
গুপ্ত বন্ধু	প্রভু, বন্ধু	ঐ	১৬
শিষ্টের	শিষ্যের	ঐ	১৮
শিষ্ট	শিষ্য	ঐ	ঐ
রণস্মরণ	অসাধারণ স্মরণ	৯০১	২১

অসাধাকার্য্য	কার্য্যে	ঐ	২২
বঙ্গবাসীতর	বঙ্গবাসীতহবিলের	১০৪	৮
প্রধানখ্যাত,	প্রধান স্মার্ত্ত	১০৫	১৬
স্তনন্ধর	স্তনন্ধয়	১০৭	২১
আমার	আমায়	১০৭	২৪
কারী	করিয়া	,,	,,

দ্বিতীয় সংস্করণে এই সকল অশুদ্ধির সংশোধন করিয়া দিব।

কোন কোন গ্রন্থকারের জীবনী যতটা বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল, এবার তাহা পারি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে বিস্তৃত ভাবে তাহা প্রকাশ করিবার বাসনা হিল। কোন কোন গ্রন্থকারের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলীর পরিচয়ও এবার দিতে পারি নাই। দৃষ্টান্ত,—পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ মহাশয়ের প্রণীত একখানি গ্রন্থের মাত্র নামোল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইনি নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন,—বাঙ্গালা।—আত্মতত্ত্ব প্রকাশ, ভবভূতি, বুদ্ধদেব। সংস্কৃত।—রত্নাবলী টীকা, লঙ্কাবতার সূত্র, অভিজ্ঞান শাকুন্তল টীকা। পালি।—কাত্যায়ন প্রণীত পালিব্যাকরণের টীকা ও ইংরেজী অনুবাদ, রতন সুত্ত। তিব্বতীয়।—টিবেটান্ প্রাইমার ১ম ও ২য় ভাগ ব্য—ছোই (বিহঙ্গ সমিতি)। ইংরেজী।—মাধ্যমিক সূত্রের ইংরেজী অনুবাদ, গ্রিম্‌স্‌ল প্রভৃতি। ইহাঁর সকল গ্রন্থেই গবেষণার যথেষ্ট পরিচয়; প্রসিদ্ধিও যথেষ্ট। নানা রূপ প্রতিবন্ধকতায় প্রবন্ধসমূহের শ্রেণী-সন্নিবেশও এবার সম্ভবপর হয় নাই। অকারাদি বর্ণমালাক্রমে জীবনী প্রবন্ধ সমূহ সাজাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এবার তাহা পারি নাই। যাঁহার প্রবন্ধ যেমন পাইয়াছি, তেমনি ছাপিতে দিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণে বর্ণমালা ক্রমে সাজাইয়া দিব।

যাঁহাদের জীবনী প্রথম ভাগে প্রকাশিত হইল না, তাঁহারা বুঝিবেন, দ্বিতীয় ভাগে তাহা প্রকাশিত হইবে। কেবল মাত্র গ্রন্থকারের জীবনী নহে, দ্বিতীয় ভাগে প্রাচীন এবং অধুনাতন সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং তত্তৎ সম্পাদকের জীবনীও প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। বাঙ্গলা সাহিত্য সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক কথা দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশ করিবার প্রয়াস হইতেছে। যাঁহারা এখনও স্ব স্ব জীবনী পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ

পূর্ব্বক অবিলম্বে তাহা বঙ্গবাসী আফিসে পাঠাইয়া দিবেন। কেননা, দ্বিতীয় ভাগও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা।

বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ব্যয়ে, বঙ্গবাসী স্বত্বাধিকারীর জন্যই এই গ্রন্থ আমি সঙ্কলন ও সম্পাদন করিলাম। ইতি ১৩১১ সাল, ২৯ শে ভাদ্র।

৩৮।২ নং ভবানী চরণ দত্তের ষ্ট্রীট,
বঙ্গবাসী আফিস, কলিকাতা।



শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়
বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক।

বঙ্গভাষার লেখক গ্রন্থের প্রথম ভাগের

সূচীপত্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।

বঙ্গ-ভাষার লেখক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চণ্ডিদাস

প্রেম-আলেখ্যের সুনিপুণ শিল্পী,—প্রেম-অঙ্গের বিচক্ষণ ব্যবচ্ছেদক,—মহাকবি চণ্ডিদাস,—বঙ্গ-সাহিত্যে বস্তুতই চিরকীর্ত্তিমান্। প্রেম-বিরহের পরতে পরতে,—ভাব-অভাবের স্ফুরণে-কুঞ্চনে-প্রেমিক-প্রেমিকার আঁখিতে আঁখিতে—শিরায় শিরায়,—শ্বাসে-প্রশ্বাসে পলকে পলকে যে চিত্র ফুটিয়া উঠে, চণ্ডিদাস স্বকীয় বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ী তুলিকায় তাহা কি সুন্দর আঁকিয়াছেন! মধুর মদিরা-রসে ভিজাইয়া, সুচিক্কণ ভাব-সাজে সাজাইয়া, তিনি যে অতি মধুর পদাবলী গাঁথিয়া রাখিয়াছেন, তাহা ভক্তের নির্ম্মাল্য,—যোগীর জপমন্ত্র,—সংযোগীর মন্দার-মালা,—বিয়োগীর চন্দন-লেপ! চণ্ডিদাসের পদামৃত আকণ্ঠ প্রাণ ভরিয়া পান কর, তবু পিপাসা মিটিবে না, ব্যাকুলতা বাড়িবে;—তাঁহার সঙ্গীতের এমনই সম্মোহনী শক্তি!

সহজ সরল ভাষায়—ভাবের খেলা খেলাইতে—চণ্ডিদাস সিদ্ধহস্ত। তাই যিনিই তাঁহার যে কোন একটী সঙ্গীত মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তিনিই মুগ্ধ হইবেন;—যিনিই পাঠ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, "Literature

of Bengal" নামক গ্রন্থে মুক্তপ্রাণে চণ্ডিদাসের সঙ্গীত-সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। চণ্ডিদাস সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

"He feels deeply and sings feelingly."

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

"Sweet Bidyapati! Sweet Chandidass! The earliest stars in the firmament of Bengali literature. Long, long will your strains be remembered and sung in Bengal."

বঙ্গীয় সাহিত্য-গগনে চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতি দীপ্তিশালী অবিনশ্বর জ্যোতিষ্কই বটে!

বীরভুম জেলায় সাঁকুলিপুর থানার অধীন নান্নুর গ্রামে চণ্ডিদাস জন্মগ্রহণ করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে—আহাম্মদপুর ষ্টেশন হইতে নান্নুরগ্রাম পূর্ব্বদিকে প্রায় দশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। নান্নুর প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম। ১২৮০ সালের ১০ই পৌষ তারিখের সোমপ্রকাশে একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন,—"চণ্ডিদাসের ১৩৩৯ শকে জন্ম ও ১৩৯৯ শকে মৃত্যু হয়।" পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলেন,—"চণ্ডিদাসের জন্ম ১৩৪০ শকেই স্থির করিয়া লইতে হইবে।" ১৩০১ সালের আশ্বিনের নব্য-ভারতে পরলোকগত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি লিখিয়াছেন,—"কলিযুগপাবনাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের ত্র্যধিকাশীতি বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা চণ্ডিদাস * * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

সোমপ্রকাশের পত্রলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন,—"চণ্ডিদাসের পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি; ইহাঁরা বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।"

শিশুকালেই চণ্ডিদাস মাতাপিতৃহীন হন। গ্রামের লোকে কৃপা করিয়া তাঁহার উপনয়ন দেন এবং পরে তাঁহাকে বাশুলী বা বিশালাক্ষী দেবীর সেবায় নিয়োজিত করেন। চণ্ডিদাসের পিতাও বাশুলীর পূজা করিতেন। বাশুলী শিবোপরি বিরাজিতা পাষাণময়ী চতুর্ভুজা চণ্ডীমূর্ত্তি। চণ্ডিদাস বাশুলীর পূজা করিতেন,—ভোগ রাঁধিতেন—এবং সাধু অতিথিকে ভোজন করাইয়া, নিজে নিরামিষ প্রসাদ পাইতেন।

চণ্ডিদাস দেবী-মঠের অদূরে পত্র-কুটিরে অবস্থিতি করিতেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মন ইষ্ট-চিন্তায় বিভোর হইয়া উঠে। যথা,—

"নান্নুরের মঠে, পত্রের কুটীর, নিরঞ্জন স্থান অতি।
বাশুলী আদেশে, চণ্ডিদাস তথা, ভজন করয়ে নিতি।

এই সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। রামমণি নামী একটী অসহায়া রজকী নান্নুর গ্রামে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইত। গ্রামের লোকে তাহাকে বাশুলীদেবীর শ্রীমন্দির-মার্জ্জনে নিযুক্ত করিয়া দিল। রামমণি প্রত্যহ দেবী-মন্দির মার্জ্জনা করিত,—আর পানড়া বা দেবীর প্রসাদ পাইত। ক্রমে তাহার দেহের লাবণ্য যেমন বাড়িতে লাগিল, ধর্ম্ম-বুদ্ধিও সেইরূপ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিল।

"অল্প বয়সে, দুঃখিনী রামিণী, সেবাতে নিযুক্ত হ'ল।
চণ্ডিদাস কহে, শশিকলার ন্যায়,ক্রমে বাড়িতে লাগিল।"

উভয়ে কাম-গন্ধবিহীন অলৌকিক প্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

বাকুঁড়া জেলার গঙ্গাজলঘাটি থানায় শালতোড়া গ্রাম। এই গ্রামে নিত্যা দেবী বিরাজিতা। নিত্যা,—মনসা দেবী। প্রতি বৎসর দশহরার দিন মহোৎসবে ইহাঁর ঝাঁপান হইত। ইহাঁর অনেকগুলি ডাকিনী বা সহচরী ছিল। ব্রাহ্মণী বাশুলী তাঁহার অন্যতম ডাকিনী বা সহচরী। নিত্যা দেবী ঝুমুর শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। একদিন ঝুমুর শুনিয়া তিনি বড়ই প্রীত হইলেন; বাশুলীকে বলিলেন,—'শ্রীবৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা যদি এমনই ভাবে সঙ্গীত হয়, তাহা হইলে, সংসার-সরোবরে কেমন মনোহর সুখ-শতদল ফুটিয়া উঠে! সহচরী,—দেবীর অভিপ্রায় বুঝিলেন,—ভাবিতে লাগিলেন,—সংসারে এরূপ সঙ্গীত-রচনার অধিকারী কে?—পরিশেষে স্থির হইল, চণ্ডিদাসই উপযুক্ত পাত্র।

একদিন রাত্রে নান্নুরের মাঠে,—দেবী বাশুলীর মঠে চণ্ডিদাস ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। এমন সময়ে বাশুলী আসিয়া, তাঁহার পৃষ্ঠদেশে চপেটাঘাত করিলেন। চণ্ডিদাসের নিদ্রাভঙ্গ হইল,—তিনি নিদ্রাভঙ্গে দেখিলেন,—সম্মুখে নিত্যা দেবীর সহচরী বাশুলী সমুপস্থিত। বাশুলী

তাঁহাকে বলিলেন,—"চণ্ডিদাস! তুমি উপযুক্ত গুরুস্থানে দীক্ষিত হও; তাহার পর, রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-পদ গ্রন্থন কর; আর রজকী রামীর সহিত প্রবৃত্ত হইয়া, ত্বরায় শ্রীবৃন্দাবন যাত্রায় উদ্যোগী হও।"

যথা,—

নিত্যার আদেশে, বাশুলী চলিলা, সহজ জানাবার তরে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে, নান্নুর গ্রামেতে, প্রবেশ যাইয়া করে॥
বাশুলী হাসিয়া, চাপড় মারিয়া, চণ্ডিদাসে কিছু কয়।
সহজ ভজন, করহ যাজন, ইহা ছাড়া কিছু নয়॥
ছাড়ি জপতপ, করহ আরোপ, একতা করিয়া মনে।
যাহা কহি আমি, তাহা কর তুমি, ভজহ চৌষট্টি সনে॥
রতি পরকীয়া, যাহারে কহিয়া, সেই সে আরোপ সার।
ভজন তোমারি, রজক-ঝিয়ারি, রামিণী নাম যাহার॥

'সহজ ভজন?'—'রজকীয়ার সহিত ভজন?'—চণ্ডিদাস বিস্মিত হইলেন,—কহিলেন,—

প্রবর্ত্ত দেহের, সাধন করিলে, কোন্ বরণ হব!
কোন্ কর্ম্ম, যাজন করিলে, কোন্ বৃন্দাবনে যাব॥
নব-বৃন্দাবনে, নব নাম হয়, সকল আনন্দময়।
কোন বৃন্দাবনে, ঈশ্বর মানুষে, মিলিত হইয়া রয়॥
কোন্ বৃন্দাবনে, বিরজা বিলাসে, তরুলতা চারি পাশে।
কোন্ বৃন্দাবনে, কিশোর কিশোরী, শ্রীরূপমঞ্জরী সাথে॥
কোন্ বৃন্দাবনে, রস উপজয়ে, সুধার জনম তায়।
কোন্ বৃন্দাবনে, বিকশিত পদ্ম, ভ্রমরা পশিছে তায়॥
গোপনের পথ, না হয় বেকত, রসিক জনার সনে।
উপাসনা ভেদ, যাহার হয়েছে, সেই সে মরম জানে॥
দ্বিজ চণ্ডিদাস, না জানিয়ে তাতে, কেমনে হইবে পার।
উত্তম কুলেতে, লভিয়া জনম, ছি!—নীচ সহ ব্যবহার॥"

তখন,—

"বাশুলী কহিছে শুন হে দ্বিজ। কহিব তোমায় সাধনা-বীজ॥
প্রথম দুয়ারে মদের গতি। দ্বিতীয় দুয়ারে আসক স্থিতি॥
তৃতীয় দুয়ারে কন্দর্প রয়। কন্দর্প-রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কয়॥
আসক রূপেতে শ্রীকৃষ্ণ কই। মদরূপ ধরি আশ্রিত হই॥

সাতাইশ আঁখরে সাধিতে তিনে। একত্র করিয়া আপন মনে॥
রতির আকৃতি অনেকে কয়। রসের আকৃতি কন্দর্প হয়॥
তিনটী আঁখরে রতিকে যজি। পঞ্চম আঁখরে বালকে ভজি॥
দ্বিতীয় আসকে সামান্য রতি। তবে সে পাইবে বিশেষ স্থিতি॥
চতুর্থ আঁখরে সামান্য রস। তাহাতে কিশোর কিশোরী বশ॥
বাশুলী কহয়ে এই সে সার। নিত্য বৃন্দাবন বেদান্ত পার॥

বাসুলীর আদেশে চণ্ডিদাস সহজ ভজনে সম্মত হইলেন; প্রবাদ—স্বয়ং বাশুলী দেবীই,—চণ্ডিদাস এবং রামমণিকে চতুরক্ষর রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। দীক্ষার পরই চণ্ডিদাস পদ-রচনায় প্রবৃত্ত হন। কি ইষ্ট-ভজনে,—কি দেবী-অর্চ্চনে,—রামমণি,—চণ্ডিদাসের নিত্যা সহচরী হইলেন।

নান্নুর গ্রামের সকলেই শক্তি-সেবক; কেবল চণ্ডিদাস ও রামমণিই শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিরত হইলেন। ইহাতে সকলেরই ক্রোধ হইল। অতঃপর গ্রামে রটিল, চণ্ডিদাস,—রজকীসংস্পর্শে জাতি হারাইয়াছেন। ঢক্কা-নিনাদে গ্রামে এই কুসংবাদ প্রচারিত হইল। ফলে, চণ্ডিদাস বাশুলীর পূজা-কার্য্যে নিষিদ্ধ হইলেন। রামমণিরও প্রসাদান্ন স্থগিত হইল।

এই সময়ে চণ্ডিদাস একদিন পীড়ার ভাণ করিয়া, পত্র-কুটীরে শুইয়া রহিলেন। গ্রামের কেহই তাঁহাকে ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না,—একবিন্দু জল দিয়াও কেহ সাহায্য করিল না। তৃতীয় দিনে গ্রামে গুজব উঠিল,—চণ্ডিদাসের মৃত্যু হইয়াছে। গ্রামের লোকে চণ্ডিদাসের শব শ্মশানে লইয়া গেল। চিতা সজ্জিত হইল। চিতায় চণ্ডিদাসের দেহ স্থাপিত হইল; চিতায় অগ্নি-সংযোগ হইবে,—এমন সময় রামমণি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—বিরহোন্মাদিনী শ্রীরাধিকার ন্যায় রামমণি উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—

"কোথাও যাও ওহে, প্রাণবঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি॥"

ইত্যাদি গান শুনিয়া, চণ্ডিদাস যেন নিদ্রা-ভঙ্গে জাগিয়া উঠিলেন,—এবং রামমণিকে পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন,—

রামমণিও তাঁহার সহিত আনন্দ-নৃত্যে যোগ দিলেন। চণ্ডিদাস,—রামমণিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

"এদেশে না রব সই! দূরদেশে যাব।"

চণ্ডিদাস শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রা করিলেন; রামমণিও তাঁহার সঙ্গিনী হইলেন। বৃন্দাবনেই তাঁহাদের সমাধি হইল।

চণ্ডিদাস ও রামমণির 'মধুর মিলন' সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একটী এইরূপ;—"একবার চণ্ডিদাসের পরমাত্মীয়গণ,—তাঁহাকে রজকীর বাটী হইতে বলপূর্ব্বক গৃহে আনে। তখন চণ্ডিদাস দিনরাত্রি রামমণির বাড়ীতেই থাকিতেন। বাড়ীতে আনিয়া চণ্ডিদাসের আত্মীয়গণ,—তাঁহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিলেন। ব্রাহ্মণভোজনের আয়োজন হইল। চণ্ডিদাস এদিকে অন্নের থালা হাতে লইয়া, ব্রাহ্মণগণকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন, ওদিকে রামমণি শুনিলেন,—চণ্ডিদাস জাতে উঠিতেছেন। অমনি তিনি কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া,—কাপড়ের মোট হাতে লইয়া,—চণ্ডিদাসের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চণ্ডিদাসের হাতে অন্নের থালা; সহসা সম্মুখে ব্রাহ্মণভোজন-স্থানে অভিমানিনী রামমণি;—রামমণি,—চণ্ডিদাসকে দেখিয়াই বলিলেন,—"কিরে চণ্ডী! তুই নাকি জাতে উঠ্‌ছিস্! বটে!" তখন যেন রামমণির আরও দুইটী বাহু পরিদৃষ্ট হইল; তিনি যেন সেই নবীন বাহু দুইটী দিয়া, চণ্ডিদাসের ভাতের থালা ধরিলেন;—চণ্ডিদাসও থালা ফেলিয়া, রামমণিকে আলিঙ্গন করিলেন; অনন্তর উভয়েই ত্রস্তপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন। ইহার পর, চণ্ডিদাসের কোন আত্মীয়ই চণ্ডিদাসকে আর গৃহে আনিবার চেষ্টা করেন নাই।

চণ্ডীদাস,—বিদ্যাপতির সমসাময়িক। বিদ্যাপতি একবার চণ্ডিদাসকে নান্নুরে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চণ্ডিদাসের সহিত,—বিদ্যাপতির সৌহার্দ্দ খুবই হইয়াছিল। চণ্ডিদাস,—পূর্ব্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, খণ্ডিতা এবং ভাব-সম্মিলন বর্ণনে অসামান্য কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

পূর্ব্বরাগের এ কি অনুপম বর্ণনা,—

ঘরের বাহিরে, দণ্ডে শতবার, তিলে তিলে আসে যায়।
মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়॥
রাই,—এমন কেনে বা হলো।
গুরু দুরুজন, ভয় নাহি মন, কোথা বা কি দেব পাইল॥
সদাই চঞ্চল, বসন-অঞ্চল, সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি, ভূষণ খসিয়া পড়ে॥
বয়সে কিশোরী, রাজার কুমারী, তাহে কুলবধূ বালা।
কিবা অভিলাষে, বাড়ায় লালসে, না বুঝি তাহার ছলা॥
তাহার চরিতে, হেন বুঝি চিতে, হাত বাড়াইল চাঁদে।
চণ্ডিদাস ভণে, করি অনুমানে, ঠেকেছে কালিয়া-ফাঁদে॥

নায়কের পূর্ব্বরাগ,—

'সজনি ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা গোরী, নবীনা কিশোরী, নাহিতে দেখিনু ঘাটে॥
শুনহে পরাণ,————সুবল সাঙ্গাতি, কো ধনী মাজিছে গা।
যমুনার তীরে, বসি তার নীরে, পায়ের উপরে পা॥
অঙ্গের বসন, কৈরাছে আসন, আলাঞা দিয়াছে বেণী।
উচ কুচমূলে, হেম-হার দোলে, সুমেরু শিখর জানি॥
সিনিয়া উঠিতে, নিতম্ব-কটিতে, পড়েছে চিকুর-রাশি।
কাঁদিয়ে আঁধার—কলঙ্ক চাঁদার—শরণ লইল আসি॥
কিবা সে দুস্তুলি, শঙ্খ ঝলমলি, সরু সরু শশিকলা।
সাঁজেতে উদয়, সুধু সুধাময়, দেখিয়ে হইনু ভোলা॥
চলে নীলশাড়ী, নিঙ্গাড়ি নিঙ্গাড়ি, পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর, হিয়া নহে থির, মনমথ-জ্বরে ভোর॥
কহে চণ্ডিদাসে, বাশুলি আদেশে, শুনহে নাগর চাঁদা।
সে যে বৃকভানু,—রাজার নন্দিনী, নাম বিনোদিনী রাধা॥

চণ্ডিদাসের প্রেম-বৈচিত্র্য শুনুন,—

"পিরিতি সুখের, সায়র দেখিয়া, নাহিতে নামিনু তায়।
নাহিয়া উঠিয়া, ফিরিয়া চাহিতে, লাগিল দুখের বায়॥
কেবা নিরমিল, প্রেম-সরোবর, নিরমল তার জল।
দুখের মকর, ফিরে নিরন্তর, প্রাণ করে টলমল॥
গুরুজন-জ্বালা, জলের শিহালা, পড়শী জীয়ল মাছে।
কুল-পানীফল, কাঁটা যে সকল, সলিল বেড়িয়া আছে।

কলঙ্ক-পানায়, সদা লাগে গায়, ছাঁকিয়া লইল যদি।
অন্তর বাহিরে, কুটুকুটু করে, সুখে দুখ দিল বিধি॥
কহে চণ্ডিদাস, শুন বিনোদিনী, সুখ দুখ দুটী ভাই।
সুখের লাগিয়া, যে করে পিরীত, দুখ যায় তার ঠাঁই।

"পিরীতি বলিয়া, একটী কমল, রসের সায়র মাঝে।
প্রেম-পরিমল- লুবধ ভ্রমর, ধায়ল আপন কাজে॥
ভ্রমরা জানয়ে, কমল-মাধুরী, তেঁই সে তাহার বশ।
রসিক জানয়ে, রসের চাতুরী, আনে কহে অপযশ॥
সই! এ কথা বুঝিবে কে!
যে জন জানয়ে, সে যদি না কহে, কেমনে ধরিবে সে॥
ধরম করম, লোক-চরচাতে, এ কথা বুঝিতে নারে।
এ তিন আখর, যাহার মরমে, সেই সে বলিতে প্যারে।
চণ্ডিদাসে কহে, শুনলো সুন্দরী, পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের, রসিক নহিলে, কি ছার পরাণ তার।

ভাব-সম্মিলন,—

অনেক সাধের, পরাণ-বঁধুয়া, নয়ানে লুকায়ে থোব।
প্রেম-চিন্তামণির, শোভা গাঁথিয়া, হিয়ার মাঝারে লব।
তুমি হেন ধন, দিয়াছি যৌবন, কিনেছি বিশাখা জানে।
কিনা ধনে আর, অধিকার কার, এ বড় গৌরব মনে॥
বাড়িতে বাড়িতে, ফল না বাড়িতে, গগনে চড়ালে মোরে।
গগন হইতে, ভূমে না ফেলাও, এই নিবেদন তোরে॥
এই নিবেদন, গলায় বসন, দিয়া কহি শ্যাম-পায়।
চণ্ডিদাস কয়, জীবনে মরণে, না ঠেলিবে রাঙ্গা পায়॥

শ্যাম সুন্দর, স্মরণ আমার, শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণধন, শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেসর, শ্যাম বেশ মোর, শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন, ভজন পূজন, শ্যাম-দাসী হলো রাধা॥
শ্যাম ধন-বল, শ্যাম জাতি-কুল, শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন, অমূল্য রতন, ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর, করে পঞ্চ স্বর, বঁধুরে পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে, রাখিহ শ্যামেরে, দ্বিজ চণ্ডিদাস বলে॥

চণ্ডীদাসের একটী রাগাত্মিক পদ এইরূপ,—

রসিক রসিক, সবাই কহয়ে, কেহ ত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া, বুঝিয়া, দেখিলে, কোটিতে গোটীক হয়॥
সখি হে! রসিক বলিব কারে।
বিবিধ মসলা, রসেতে মিশায়, রসিক বলি যে তারে।
রস পরিপাটি, সুবর্ণের ঘটি, সম্মুখে পুরিয়া রাখে।
খাইতে খাইতে, পেট না ভরিবে, তাহাতে ডুবিয়া থাকে॥
সেই রস পান, রজনী দিবসে, অঞ্জলি পুরিয়া খায়।
খরচ করিলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে, উছলিয়া বহি যায়॥
চণ্ডিদাসে কহে, শুন রসমতি, তুমি সে রসের কূপ।
রসিক জনা, রসিক না পাইলে, দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥"

১২৯৬ সালের শ্রাবণের ভারতীতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কবিতায় সর্ব্বত্রই প্রেমের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে।" তুলনায় তারতম্য কিরূপ, রসিক ভক্তই তাহা ভাল বুঝিবেন।

রামমণি।



চণ্ডিদাসের আরাধ্যা প্রেমিকা রামমণিও কয়েকটী পদ রচনা করিয়াছিলেন। পদ-সমুদ্র গ্রন্থে তাঁহার পদাবলীর পরিচয় আছে।

চণ্ডিদাস রজকী-সঙ্গ করিয়াছেন,—এই অখ্যাতির আরোপ করিয়া নান্নরের লোকে যখন তাঁহার বাশুলী-পূজার কার্য্য বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন রামমণি চণ্ডিদাসকে বলিতেছেন,—

"কি কহিব বঁধু হে বলিতে না জুয়ায়॥ কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায়॥
অনামুখ মিন্সেগুলার কিবা বুকের পাটা। দেবীপূজা বন্ধ করে কুলে দেয় পাটা॥
দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে। মুখ ফুটে না বলতে পারি, মরি বুক ফেটে॥

ঢাক পিটিয়ে সহজ বাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে। চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে॥
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে। ঝঞ্ঝনা পড়ুক তার মস্তক-উপরে॥
অবিচার পুরী দেশে আর না রহিব। যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব॥
বাশুলী দেবীর যদি কৃপা-দৃষ্টি হয়। মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটি পরে বলে বোঁচা। সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা॥

চণ্ডিদাস যখন চিতা-সজ্জায় শায়িত,—তখন রামমণি পাগলিনীর ন্যায় গাহিতেছেন,—

কোথা যাও ওহে, প্রাণবঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক, ধৈরজ ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি মানি॥
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথী, ক্রূর অতিশয়, বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকিলে, দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, অবলা ভাসাতে নাই॥
পিরীতি জ্বালিয়া, যদি বা যাইবা, কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ পালন, দাসীরে করহ সাথ॥
"তুমি দিবা ভাগে, লীলা-অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ক্রুটীসম কাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটীল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ-মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিমেষ দিয়েছে কেবা।
যাহে সর্ব্বক্ষণ, তব দরশন, নিবারণ সেই করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডিদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার॥

বিদ্যাপতি।

বিদ্যাপতির পদও প্রসিদ্ধ পদ। তাঁহার পদও মাধুর্য্যে মনোহর। কিন্তু সে মাধুর্য্য—গাম্ভীর্য্যে বিমিশ্রিত। চণ্ডিদাসের পদ ভাষায় সরল, ভাবে গভীর; বিদ্যাপতির পদ কোন কোন স্থানে ভাষায় কিঞ্চিৎ কঠিন।—চণ্ডিদাসের কোন কোন পদের একটী ছত্রেই যেন ভাব-সাগরের যাবতীয় রত্ন নিহিত,—বিদ্যাপতির পদেও তেমন ভাব-সৌন্দর্য্যের অভাব নাই; তবে সে ভাব চাখিয়া চাখিয়া উপভোগ করিতে হয়।

বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী। কিন্তু মিথিলাবাসী হইলেও, তাঁহাকে আমরা বাঙ্গালী কবি বলিয়া—আমাদেরই আপনার করিয়া লইতে পারি, এ অধিকার আমাদের আছে। বঙ্গদর্শনের চতুর্থ ভাগের ৯১ পৃষ্ঠায় পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন;—

"বিদ্যাপতি মৈথিলি কবি হইলেও, তাঁহাকে বাঙ্গালী বলা অন্যায় নহে; বল্লাল সেন বাঙ্গলা দেশকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন; তন্মধ্যে মিথিলা এক ভাগ। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেনের অব্দ বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলায় প্রচলিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। লক্ষ্মণ সেন বিজয়ী বাঙ্গালী রাজা হইলেও বাঙ্গালীরা লক্ষ্মণ সংবৎ ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু মৈথিলি পণ্ডিতেরা তাহা ভুলেন নাই। বাঙ্গালীর স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্মারক লক্ষ্মণ সংবৎ বল্লালের যে বিভাগে অদ্যাপি প্রচলিত আছে, সে বিভাগকে বাঙ্গলার অংশ ও তন্নিবাসীদিগকে বাঙ্গালী বলিতে কেন সঙ্কুচিত হইব? এতদ্ব্যতিরিক্ত, বিদ্যাপতির হৃদয় বাঙ্গালি-হৃদয়। তিনি যে রসের রসিক, সে রস তিনি বাঙ্গালী জয়দেবের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন এবং সে রস চৈতন্যদেব ও তদ্ভক্তদিগের সময়ে মূর্ত্তিমান হইয়া, বাঙ্গালা প্লাবিত করিয়াছিল। সুতরাং বিদ্যাপতির কবিতা-কুসুম সাদরে বঙ্গ-কাব্যোদ্যানে গৃহীত হইয়াছে, ইহা অস্বাভাবিক নহে!"

এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"বঙ্গদেশের বহুদিনের অশ্রু, সুখ ও প্রেমের কথার সঙ্গে তাঁহার (বিদ্যাপতির) পদাবলী জড়িত হইয়া পড়িয়াছে; ধীরে ধীরে আমরা বাঙ্গালীর ধুতি চাদর পরাইয়া, মিথিলার বড় পাগড়ি খুলিয়া ফেলিয়া, তাঁহাকে আমাদের করিয়া দেখিয়াছি; সেইরূপে তিনি আমাদেরই থাকিবেন।" বঙ্গভাষাও সাহিত্য,—২য় সংস্করণ, ২০২—৩ পৃষ্ঠা।

পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন,—

"যে কবি বঙ্গদেশের কবি জয়-দেবের প্রণীত গীত-গোবিন্দের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত, এই বোধেই পরমভক্তি-সহকারে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে সকল সঙ্গীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় শত শত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না। ফল কথা, যিনি যাহা বলুন, আমরা বিদ্যাপতিকে বঙ্গদেশেরই প্রাচীন কবি মনে করিব।"

বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব,—২২-২৩

পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"পূর্ব্বে মিথিলা প্রদেশের লোকেরা ও বঙ্গদেশের লোকেরা আপনাদিগকে প্রায় এক দেশের লোক বলিয়া মনে করিত। মিথিলা পঞ্চ-গৌড়ের মধ্যে পরিগণিত ও অনেক দিন অবধি সেখবংশীয় রাজাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। তথায় বঙ্গরাজ লক্ষ্মণসেনের অব্দ এখনও প্রচলিত আছে। এই সকল কারণবশতঃ মিথিলাপ্রদেশের লোকদিগের সহিত বঙ্গদেশের লোকদিগের বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। * * * মিথিলার সঙ্গে যখন বঙ্গদেশের এতদ্রূপ নিকট সম্বন্ধ ছিল, তখন ইহা অসম্ভব নহে যে,

বিদ্যাপতি তাঁহার কতকগুলি কবিতা মৈথিলি হিন্দীতে এবং কতকগুলি কবিতা বাঙ্গালাতে রচনা করিয়াছিলেন।"

বস্তুতই বিদ্যাপতির কোন কোন পদ যেন খাটী বাঙ্গালী কবির,—বাঙ্গালা ভাষায় রচিত। পরিচয় লউন,—

"শুনলো রাজার ঝি! তোরে কহিতে আসিয়াছি।
কানু হেন ধন, পরাণে বধিলি, একাজ করিলি কি॥
বেলি-অবসান কালে, গিয়াছিলি নাকি জলে।
তাহারে দেখিয়া, মুচকি হাসিয়া ধরিলি সখীর গলে॥"

আবার শুনুন,—

"একদিন হেরি হেরি হাসি হাসি যায়।
আর দিন নাম ধরি মুরলী বাজায়॥
আজু অতি নিয়ড়ে করল পরিহাস। না জানিয়ে গোকুলে কাহার বিলাস
শুন সজনি ও নাগর শ্যাম-রাজ। মূল বিনু পরধনে মাগয়ে বেয়াজ॥
অতি পরিচয় নাহি দেখি আন কাজ। না করয়ে সম্ভ্রম না করয়ে লাজ॥"

বিদ্যাপতির একটী পদের আরম্ভ এইরূপ;—

"নব বৃন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল॥"

তাঁহার পদাবলীতে এমন দৃষ্টান্ত প্রচুর। সুতরাং তাঁহাকে আমাদের করিয়া লইতে,—বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠ স্থান নির্দ্দেশ করিতে,—যুক্তিসঙ্গত কোন আপত্তিই হইতে পারে না।

বিদ্যাপতি ১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম গণপতি;—পিতামহের নাম জয় দত্ত। বিদ্যাপতি সম্ভ্রান্ত—বিদ্বান বংশসম্ভূত। মিথিলার রাজা তখন শিব সিংহ; বিদ্যাপতি,—শিব সিংহের সভাসদ্ নিযুক্ত হন। রাজা শিবসিংহের আদেশে বিদ্যাপতি কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থগুলির নাম,—পুরুষপরীক্ষা, শৈব-সর্ব্বস্ব-হার, গঙ্গাবাক্যাবলী, কীর্ত্তিলতা, দান-বাক্যাবলী, গয়া-পত্তন, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী, বিভাগসার এবং দুর্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী। ভাষা গ্রন্থ,—রাধাকৃষ্ণপদাবলী ও শৈবপদাবলী। রাজা,—বিদ্যাপতির

কবিত্ব-গুণে অতিমাত্র পরিতুষ্ট হইয়া, ২৯৩ লক্ষণাব্দে তাঁহাকে মহাপণ্ডিত উপাধি এবং বিস্‌পী নামক একখানি গ্রাম প্রদান করেন। এই গ্রাম,—ত্রিতপ্র দেশে সীতামারী মহকুমার অধীন ;—কমলা নাম্নী নদী-তটে অবস্থিত।

রাজার সনন্দের এক'ংশ এইরূপ ;—

"অব্দে লক্ষণসেনভূপতিমিতে বহ্নিগ্রহদ্ব্যঙ্কিতে।
মাসি শ্রাবণসংজ্ঞকে মুনিতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ।
বাগ্বত্যাঃ সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে।
দিৎসোৎসাহ বিবৃদ্ধ বাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যে সভম॥
প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরা ভোগংনদীমাতৃকং
শরণ্যং সসরোবরঞ্চ বিসপী নামানমাসীমতঃ।
শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণে সুকবয়ে পূণ্যাদি ভিভু´ঞ্জতাং
বীরঃ শ্রীশিব সিংহ দেবনৃপতিগ্র´মিং দদে শাসনং।"

এই গ্রাম—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথে বাঢ় নামক ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। বিদ্যাপতির বংশধরগণ অদ্যাপি এই গ্রাম উপভোগ করিতেছেন। ৯৮ বৎসর বয়সে,—১৪৮১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাপতির তিরোধান হইয়াছে।

বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বিদাপতি" গ্রন্থে,—বিদ্যাপতি-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

১। বিদ্যাপতি ঠাকুর, প্রাতঃকালে ও অন্যান্য সময়ে অবসর-মতে স্বরচিত শিবগীত, ভাবে বিভোর হইয়া, গান করিতেন। তাঁহার এক বিদেশীয় ভৃত্য সেই গান শুনিতে বড়ই ভালবাসিত, গান শুনিবার জন্যই যেন সে দাসত্ব করিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর যখনই গান করিতেন, সে তখনই সেইখানে উপস্থিত হইয়া অধিকতর ভাবে মাথা নাড়িত আর অশ্রুবর্ষণ করিত। একদা বিদ্যাপতি ঠাকুর তাহা দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন ;—নিরক্ষর সামান্য ভৃত্যের এত প্রেম! তখন তাহার প্রতি বিদ্যাপতির বিশেষ দৃষ্টি পড়িল। এক দিন তাঁহার মনে হইল, এ ব্যক্তি সামান্য মানব নহে, প্রকৃত-পক্ষে ইহার তদন্ত লইতে হইবে। যেদিন এইরূপ প্রবৃত্তি মনে মনে

হইল, তৎপরদিন হইতেই সেই ভৃত্যকে আর দেখা গেল না। বিদ্যাপতি ঠাকুর অনেক অন্বেষণ করিলেন, ভৃত্যের পূর্ব্বকথানুযায়ী গ্রামেও সন্ধান করিলেন, কিন্তু 'কঃ কেন সঙ্গচ্ছতে?'—সে গ্রামে সেই ভৃত্যের নামও কেহ জানে না। বিদ্যাপতি তখন সেই ভৃত্যকে স্বয়মাগত সাক্ষাৎ মহেশ্বর মনে করিয়া বিলাপপূর্ণ ও অনুতাপসূচক অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করেন। এই ভৃত্যের নাম ছিল—উদনা।

২। দিল্লীশ্বর কি অপরাধে রাজা শিবসিংহকে একবার ধরিয়া লইয়া গিয়া কারারুদ্ধ করেন। রাজার নিতান্ত অনুগত বিদ্যাপতিও রাজাকে কারামুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়া দিল্লীশ্বরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হন। তার পর, তিনি আপনার অসাধারণ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়া এবং অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের প্রত্যক্ষবৎ বর্ণনা করিয়া দিল্লীশ্বরের প্রসাদভাজন হন; তখন বিদ্যাপতির অনুরোধে দিল্লীশ্বর শিব সিংহকে কারামুক্ত করিয়া দেন।

৩। মুমূর্ষু বিদ্যাপতি গঙ্গাযাত্রী হইয়া স্বগ্রাম হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ পথ অতিবাহিত করেন, তার পর গঙ্গা যে স্থান হইতে পাঁচ ক্রোশ ব্যবহিত, সেই বাজিতপুর গ্রামে থাকিয়া, তিনি বলেন, "আমি এতদূর আসিলাম, আর মা গঙ্গা কি এতটুকু পথও আসিবেন না? আমি এই গ্রামেই থাকিলাম, দেখি, অধম সন্তনের প্রতি জননীর দয়া কিরূপ?" বিদ্যাপতি সেই গ্রামে থাকিলেন, রাত্রির মধ্যে ভক্তবৎসলা ভগবতী ভাগীরথী, স্রোতোধারাপথে সেই গ্রামে আসিলেন; বিদ্যাপতি পরমানন্দে সেই স্রোতোধারারূপিণী ভাগীরথীর তীরে দেহ ত্যাগ করিলেন। পরে বিদ্যাপতির চিতা যেখানে ছিল,—সেইখানে এক শিবলিঙ্গ উদ্ভূত হইলেন। এই শিব, বিদ্যাপতীশ্বর নামে প্রসিদ্ধ।

শিবসিংহ ভূপতির মহিষী লছিমা-দেবীকে বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধা জ্ঞান করিতেন, লছিমা-দেবীও তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান করিতেন। পরস্পরের প্রণয়ও তদনুরূপ ছিল; কিন্তু এ প্রণয়ে দোষের গন্ধও ছিল না। এ প্রণয় সপ্তস্বর্গ হইতেও মহনীয়—শ্রীধাম গোলোকধামের সার সামগ্রী। এ প্রণয়ের মর্ম্ম সাধারণে কি বুঝিবে? মিথিলার

বহুতর লোকেই স্ব স্ব পরিচিত অনুসারে তাঁহাদিগের হৃদয়ের পাপ-কলঙ্ক—কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। ক্রমে মহারাজ শিবসিংহ কর্ণ-পরম্পরায় এই কথা এবং—'লছিমাদেবীর রূপ দর্শন না করিলে বিদ্যাপতি ঠাকুর কবিতা-রচনাই করিতে পারেন না' এই কথা শুনিয়া, জনশ্রুতি সত্য কি মিথ্যা, পরীক্ষা করিবার জন্য এই কৌশল উদ্ভাবন করিলেন;—"রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতি-ঠাকুরকে কাষ্ঠ-পেটকে আবদ্ধ রাখিয়া রাধা-কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক কবিতা রচনা করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু মহাকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর সমস্ত দিনের মধ্যে একটী কবিতা বা কবিতাংশও রচনা করিতে পারিলেন না। রাজা বিরক্ত হইয়া সায়ংকালে বিদ্যাপতি ঠাকুরকে যেমন মুক্ত করিলেন, অমনি পতি অন্তঃপুর-প্রাসাদোপরি লছিমা দেবীকে ঈষন্মাত্র দেখিলেন। আর যায় কোথা!—চন্দ্রকান্তমণিতে চন্দ্রকিরণ স্পর্শ হইল,—কমলকোরকে দিবাকরের করস্পর্শ হইল,—ঠাকুর বিদ্যাপতির কবিতারত্ন-ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইল! বিদ্যাপতির কবিতোৎস মহাবেগে ছুটিতে লাগিল—

এই সময়ের প্রথম কবিতা—

"যব্ গোধূলি সময় বেলি ধনি মন্দির বাহির ভেলি।
নব জলধর বিজুরি-রেহা দ্বন্দ্ব পসারিয়া গেলি॥"

কেহ কেহ বলেন,—

"গেলি কামিনী, গজবর গামিনী, বিহসি পালটী নেহারি।"

এই ব্যাপার দর্শনে রাজা জনশ্রুতি আংশিক সত্য মনে করিলেন; এবং অন্যাংশের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য দ্বিতীয় পরীক্ষা কল্পনা করিলেন। ঈর্ষাপরায়ণ সমাগত সভ্যমণ্ডলী তাহাতে বাধা দিয়া বলিল,—"আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে! জনশ্রুতি যে সত্য, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" রাজা, প্রজা-রঞ্জনের অনুরোধে দ্বিতীয় পরীক্ষার কল্পনা ত্যাগ করিয়া, পরদিন বিদ্যাপতিকে শূলে দিতে আদেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে বিদ্যাপতি শূলে আরোপিত হইলেন। লছিমা-দেবী এই সংবাদ শ্রবণে, অকারণ ব্রহ্মহত্যাভয়ে নিতান্ত ভীতা হইয়া, উন্ম-

ত্তার ন্যায়, বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন্ন মৃত্যু বিদ্যাপতি বলিতে লাগিলেন,—

প্রেমক অঙ্কুর, আঁত জাত ভেল, না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ, উদয়ে যৈছে যামিনী, সুখ নয় ভৈ গেল নৈরাশা।
সখি হে অব মুঝে নিঠুর মাধাই! অবধি রহল বিছুরাই॥
কাজানে চাঁদ, চকোরিণী বঞ্চব, মাধব মধুপ সুজান।
অনুখন কানু, পীরিতি অনুমানিয়ে, বিঘটিত বিহি পরমাণ॥
পাপ পরাণ আন নাহি জানত কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহে নিকরুণ মাধব—

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্রেই তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইল। রাণী লঁছিমাও অকারণ ব্রহ্মহত্যায় ও বিদ্যাপতির শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া, সেই শূলেই প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন রাজা শিবসিংহও নানাপ্রকারে নিজের অবিমৃষ্যকারিতা এবং বিদ্যাপতি ও মহিষীকে প্রকৃত পক্ষে নির্দ্দোষ বুঝিয়া, শোকে সেই শূলেই আত্মসমর্পণ করিলেন। কেহ কেহ বলেন, বিদ্যাপতির স্বেচ্ছাতেই তাঁহার শূল-দণ্ড হইয়াছিল। যাহা হউক, নারায়ণের কৃপায় পরিশেষে সকলেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন।

৫। দ্বিতীয় (২) সংখ্যায় যে প্রবাদটী লিখিত হইয়াছে, মিথিলাতেই তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে;—এক মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি; অন্য মত এই;—

"রাজা শিবসিংহ একটী দীর্ঘিকা খনন করাইতে বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া ফেলেন, তাহাতে দিল্লীর রাজকোষে কিছুকাল রাজস্ব দিতে পারেন নাই। এই অপরাধে রাজা শিবসিংহ দিল্লীশ্বরের অনুমতিক্রমে বন্দী অবস্থায় দিল্লীনগরে নীত হইলে, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তুমি রাজস্ব দেও নাই কেন?' শিবসিংহ বলিলেন,— "একটী দীর্ঘিকা খননে অধিকতর ব্যয় হওয়াতেই এই অপরাধ ঘটিয়াছে।"

দিল্লীশ্বর। কত ব্যয় হইয়াছে?

শিবসিংহ, বিদ্যাপতি ঠাকুর প্রভৃতি তিন জনের নাম উল্লেখ করিয়া

বলিলেন, 'ইহাঁরাই বলিতে পারেন, ঠিক কত ব্যয় হইয়াছে; আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার ভাণ্ডার শূন্য হইয়াছে।'

তখন দিল্লীশ্বরের আদেশে রাজা শিবসিংহ, তিন ব্যক্তিকেই দিল্লী আসিতে অনুমতি পাঠাইলেন। দুই জন আসিলেন না, বিদ্যাপতি ঠাকুর যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদ্যাপতি দীর্ঘিকা-খননের ব্যয়-তালিকা দিল্লীশ্বরকে প্রদান করিলেন. তাহাতেও কিন্তু রাজা শিবসিংহের মুক্তি হইল না। কিয়দ্দিন পরে, বিদ্যাপতি প্রসিদ্ধ গায়ক-গুরু তানসেনকে স্বীয় সঙ্গীত-প্রভাবে বিমুগ্ধ করিলেন। তানসেনের বিমুগ্ধতায় দিল্লীশ্বর চমৎকৃত হইয়া, বিদ্যাপতিকে পুরস্কার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, বিদ্যাপতি, রাজা শিবসিংহের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা পূর্ণ হইল।

ফলে কিন্তু তানসেন ও বিদ্যাপতি সমকালের লোক নহেন। তানসেন, বিদ্যাপতি ঠাকুরের বহুপরবর্ত্তী; তবে প্রবাদের তানসেন আর কোন গায়ক হইতে পারেন।'

সৌন্দর্য্যের পরিস্ফুট-চিত্রাঙ্কণে,—অপিচ, স্বভাব-সঙ্গত উপমা-বর্ণনে বিদ্যাপতি নিরতিশয় শক্তিশালী ছিলেন। তাঁহার বর্ণিত বয়ঃসন্ধি, রসোদ্গার, প্রবাস ও মান,—কবিত্ব-রসে ঢল-ঢল।

বিদ্যাপতির বর্ণিত পূর্ব্বরাগ,—

বাল-ধানশী।

এ সখি কি পেখলুঁ এক অপরূপ। শুনইতে মানবি স্বপন স্বরূপ॥
কমল যুগল পর চান্দকি মাল। তাপর উপজল তরুণ তমাল॥
তাপর বেড়ল বিজুরী-লতা। কালিন্দী-তীর ধীর চলি যাতা॥
শাখাশিখর সুধাকর পাঁতি। তাহে নব পল্লব অরুণক ভাতি॥
বিমল বিম্বফল-যুগল বিকাশ। তাপর কীর থির করু বাস॥
তাপর চঞ্চল খঞ্জন যোড়। তাপর সাপিনী বেড়ল মোড়॥
এ সখি রঙ্গিণী কহ নিদান। পুন হেরইতে কাহে হয়ল গেয়ান॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস ভাণ। সুপুরুখ মরম তুহু ভাল জান॥

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত। ধাওল অলিকুল মাধবী-পন্থ॥
দিনকর-কিরণ ভেল পৌগণ্ড; কেশরকুসুম ধয়ল হেমদণ্ড

নৃপ আসন নব পীঠলপাত। কাঞ্চন কুসুম ছত্র ধরু মাথ॥
মৌলি রসাল-মুকুল ভেল তায়। সমুখহি কোকিল পঞ্চম গায়॥
শিখিকুল নাচত অলিকুল যন্ত্র। আন দ্বিজকুল পড়ু আশীষমন্ত্র॥
চন্দ্রাতপ উড়ে কুসুম-পরাগ; মলয়-পবন সহ ভেল অনুরাগ॥
কুন্দ বিল্লি তরু ধরল নিশান। পাটল তূণ অশোক দল বাণ॥
কিংশুক লবঙ্গ-লতা এক সঙ্গ। হেরি শিশির-ঋতু আগে দিল ভঙ্গ॥
সৈন্য সাজল মধুমক্ষিকাকুল। শিশিরক সবহু করল নিরমূল॥
উধারল সরসিজ পাওল প্রাণ। নিজ নব দলে করু আসন দান॥
নবরন্দাবন-রাজ্যে বিহার। বিদ্যাপতি কহ সময়ক সার॥

মায়ুর।

নবরন্দাবন, নবীন তরুগণ, নব নব বিকসিত ফুল।
নবীন বসন্ত, নবীন মলয়ানিল, মাতল নব অলিকুল॥
বিহরই নওল কিশোর।
কালিন্দীপুলিন, কুঞ্জ নব শোভন, নবনব-প্রেম-বিভোর॥
নবীন রসাল-মুকুল-মধুমাতিয়া নব কোকিলকুল গায়।
নব-যুবতীগণ চিত উনমতই নবরসে কাননে ধায়॥
নব-যুবরাজ, নবীন নব নাগরী, মিলয়ে নব নব ভাতি।
নিতি নিতি ঐছন, নব নব খেলন, বিদ্যাপতি মতি মাতি॥

শঙ্করাভরণ।

এ ধনি কমলিনী শুন হিতবাণী। প্রেম করবি অব সুপুরুখ জানি॥
সুজনক প্রেম হেম সমতুল। দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয়ে মূল॥
টুটইতে নাহি টুটে প্রেম অদ্ভুত। যৈছনে বাঢ়ত মৃণালক সূত॥
সবহু মতঙ্গজে মোতি নাহি মানি। সকল কণ্ঠে নাহি কোকিল-বাণী॥
সকল সময় নহে ঋতু বসন্ত। সকল পুরুখ নারী নহে গুণবন্ত॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর-নারী। প্রেমক রীত অব বুঝহ বিচারি॥

বিদ্যাপতির আত্ম-নিবেদন ;—

ধানশী।

ভনে যতেক ধন, পাপে বাঁটায়লু মেলি পরিজনে খায়।
মরণক বেরি হেরি, কোই না পুছই করম সঙ্গে চলি যায়॥
এ হরি বন্দো তুয়া পদ নায়।
তুয়া পদ পরিহরি, পাপ-পয়োনিধি, পার হবো কোন্ উপায়।
যাবত জনম হাম, তুয়া পদ না সেবিনু, যুবতী মতিময় মেলি।

অমৃত তেজি কিয়ে, হলাহল পীয়নু, সম্পদে বিপদহি ভেলি।
ভণহু বিদ্যাপতি, সেহ মনে গুণি, কহিলে কি বাঢ়ব কাজে।
সাঁঝক বেরি সেব কোই মাগই, হেরইতে তুয়া পদ লাজে॥

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম, সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু, অব মঝু হব কোন্ কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহু জগতারণ, দীন-দয়াময়, অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
আধ জনম হাম, নিন্দে গোঙায়নু, জরা শিশু কত দিন গেলা।
নিধুবনে রমণী-রস-রঙ্গে মাতনু, তোহে ভজব কোন বেলা॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত, সাগর-লহরী সমানা॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে, তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কহায়সি, অবতারণ ভার তোহারা॥

বরাড়ী।

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পিনু, দয়া জানি ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ লেশ না পাওবি, যব তুহু করবি বিচার।
তুহু জগন্নাথ জগতে কহায়লি, জগ বাহির নহি মুঞি ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী যে জনমিলে, অথবা কীট-পতঙ্গে।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ, মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর, তরইতে ইহ ভবসিন্ধু।
তুয়া পদ-পল্লব, করি অবলম্বন, তিল এক দেহ দীন-বন্ধু॥

মহাপ্রভু চৈতন্যদেব,—চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদমাধুর্য্যে মোহিত হইতেন। ইহাঁদের পদাবলী তিনি রাত্রিদিনই শুনিতে ভালবাসিতেন। যথা,—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে,—

"চণ্ডিদাস-বিদ্যাপতি, রায়ের নাটকগীতি, কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি-দিনে, গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

জ্ঞানদাস।

জ্ঞানদাসের রচিত "মাথুর" এবং "মুরলীশিক্ষা" মাধুর্য্যের ফুল্ল শতদল। তাঁহার ষোড়শ-গোপাল-রূপবর্ণনার তুলনা নাই। জ্ঞানদাস সকল ভাবেরই পদ রচনা করিয়াছেন ;—তিনি বৈষ্ণবসমাজে সুরসিক পদকর্ত্তা বলিয়া অভিহিত।

বীরভূম জেলায় একচক্রা গ্রাম। এই গ্রাম ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথে লুপলাইনের মল্লারপুর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। এই একচক্রা গ্রামেই নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। একচক্রার দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রাম। কাঁদড়া গ্রামের মঙ্গল ব্রাহ্মণবংশ বিখ্যাত। জ্ঞানদাস মঙ্গলবংশেই জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য কেহ তাঁহাকে মঙ্গলঠাকুর, কেহ তাঁহাকে শ্রীমঙ্গল, কেহ বা তাঁহাকে মদনমঙ্গল বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ভক্তিরত্নাকর নামক গ্রন্থে জ্ঞানদাসের পরিচয় এইরূপ লিখিত আছে ;—

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥"

জ্ঞানদাস ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নিত্যানন্দ-পত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট ইঁহার দীক্ষা হয়। কাঁদড়াগ্রামে অদ্যাপি জ্ঞানদাসের মঠ বিরাজিত। প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় তথায় মহোৎসবে মেলা হইয়া থাকে।

জ্ঞানদাসের পদাবলীর কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন ;

নায়কের পূর্ব্বরাগ,—

ধানশী।

হাসি বদনে আধ অঞ্চল দেল। অঙ্গ মোড়ি পদ দুই তিন গেল॥
পাশ উদাসল পালটি নেহারি। তাহি চঞ্চল মন বাহু পসারি॥
আজু পেখনু মুই বিদগধ নারী। মদন-বাণ কত গেলি উভারি॥
কেশ বিথারল পিঠহি লোল। মাথ আধপর রহল নিচোল।
পহিরণ পুনহি ঝাড়ি নীবিবন্ধ। তব ধরি নয়ানে রহল কিয়ে ধন্দ॥

চাতুরী কতএ কয়ল মঝ আগে। জীউ রহল আজ বড় পুণভাগে॥
কহইতে কি কহব কহয়ে না পারি। জ্ঞান কহই এ বড়ি বিদগধ নারী॥

নায়িকার অনুরাগ,—

"কানু সে জীবন, জাতি প্রাণ ধন, ও দুটী নয়ন তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতলী, নিমিখে নিমিখ-হারা॥
তোরা কুলবতী, ভজ নিজ-পতি, যার যেবা মনে লয়।
ভাবিয়া দেখিনু, শ্যাম বঁধু বিনু, আর কেহ মোর নয়॥
কি আর বুঝাও, কুলের ধরম, মন স্বতন্তর নয়।
কুলবতী হইয়া, রসের পরাণ, আর কার জানি হয়॥
যে মোর করমে, লিখন আছিল, বিধি ঘটাওল মোরে।
তোরা কুলবতী, দেখিনু যুকতি, কুল লৈয়া থাক ঘরে॥
গুরু দুরজন, বলে কুবচন, না যাব সে লোক পাড়া।
জ্ঞানদাস কয়, কানুর পিরীতি, জাতি কুল শীল ছাড়া॥"

প্রেম-বৈচিত্র্য,—

"হাসিয়া হাসিয়া, মুখ নিরখিয়া, মধুর কথাটি কয়।
ছায়ার সহিতে, ছায়া মিশাইতে, পথের নিকটে রয়॥
আলো সই, সে জন মানুষ নয়।
তাহার সঙ্গেতে পিরীত করয়ে, কি জানি কি তার হয়॥
সহজ রসের, আকার সে যে, ভাবের অঙ্কুর তায়।
বাতাসে বসন উড়িতে আপন, অঙ্গেতে ঠেকায়ে যায়॥
চমক চলনি, ওগিম দোলনী, রমণী-মানস-চোর।
জ্ঞানদাস কহে, সো পিয়া পিরীতি, মরমে পশিল তোর॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপ,—

"তরু অবলম্বন কে।
হৃদয়-নিহিত, মণি-মাল বিরাজিত, সুন্দর শ্যামর দে॥
নব কুবলয় দল, কিয়ে অতসি ফুল, নীল মুকুর মণি আভা।
কিয়ে দলিতাঞ্জন, কিয়ে নব ঘন, বরণে না পায়হ শোভা॥
কুসুমিত চিকুর, বলিত বর বরিহা, চাঁদ বিরাজিত ভালে।
আর এক অপরূপ, মলয়জ তিলক, চাঁদ উয়ল ঘন-মালে॥
কোটি ইন্দু জিনি, বয়ন মনোহর, অধরে মুরলী রসাল।
জ্ঞানদাস চিত, ওরূপ অবিরত, ভাবিতে যাউ মোর কাল॥

তুড়ি।

কেনে গেলাম জল ভরিবারে।

যাইতে যমুনায় তটে, সেখানে ভুলিনু বাটে, তিমিরে গরাসিল মোরে॥
রসে তনু ঢর ঢর, তাহে নব কৈশোর, আর তাহে নটবর বেশ।
চূড়ায় টালনী বামে, ময়ুর-চন্দ্রিকা ঠামে, ললিত লাবণ্য রূপ শেষ॥
ললাটে চন্দন পাঁতি, নব গোরোচনা ভাতি, তার মাঝে পূর্ণমিক চান্দ।
অলকা বলিত মুখ, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ, কামিনী জনের মন ফাঁদ॥
লোকে তারে কাল কয়, সহজে সে কাল নয়, নীলমণি মুকুতার পাঁতি।
চাহনি চঞ্চল বাঁকা, কদম্ব গাছেতে ঠেকা, ভুবন-মোহন রূপ ভাতি॥
সঙ্গে ননদিনী ছিল, সকল দেখিয়া গেল, অঙ্গ কাঁপে থরহরি ডরে।
শ্রীজ্ঞানদাসেতে কয়, তারে তোমার কিবা ভয়, সে কি সতি বোলইতে পারে॥

শ্রীরাধিকার অভিসার,—

"শ্যাম-অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা। নীল বসনে মুখ ঝাঁপিয়াছে আধা॥
সুকুঞ্চিত কেশে রাই বান্ধিয়া কবরী। কুন্তলে বকুল-মালা গুঞ্জরে ভ্রমরী॥
নাসায় বেসর দোলে মারুত হিল্লোল। নবীন কোকিলা জিনি আধ আধ বোল॥
কত কোটি চাঁদ জিনি বদনের শোভা। প্রেম-বিলাসিনী রাই কানু মন-লোভা॥
ভালে সে সিন্দুর বিন্দু চন্দনের রেখা। জলদে ঝাঁপল চাঁদ আধ দিছে দেখা॥
আবেশে সখীর অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া। পদ আধ চলে আর পড়ে মুরছিয়া॥
রবাব খমক বীণা সুমিল করিয়া। প্রবেশিল বৃন্দাবনে জয় জয় দিয়া॥
নূপুরের রুনু ঝুনু পড়ে গেল সাড়া। নাগর উঠিয়া বলে আইল রাই পাড়া॥
বৃন্দাবনে যাইয়া রাই চারিদিগে চায়। মাধবী লতার কোলে দেখে শ্যাম রায়॥
শ্যাম-কোরে মিলন রসের মঞ্জরী। জ্ঞানদাস মাগে রাঙ্গা-চরণ মাধুরী।

মুরলীশিক্ষা,—

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম?
কোন্ রন্ধ্রে রাধা বলে ডাকে আমার নাম?
কোন্ রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি?
কোন্ রন্ধ্রে কেকা রবে নাচে ময়ুরিণী?
কোন্ রন্ধ্রে রসালে ফুটয়ে পারিজাত?
কোন্ রন্ধ্রে কদম্ব ফুটে হে প্রাণনাথ?
কোন্ রন্ধ্রে ষড়ঋতু হয় একবালে?

কোন্ রন্ধে নিধুবন হয় ফুল ফলে ?
কোন্ রন্ধে কোকিল পঞ্চম স্বরে গায় ?
একে একে শিখাইয়া দেহ শ্যাম রায়।
জ্ঞানদাস শুনি কহে হাসি হাসি।
রাধে রাধে মোর বোল বাজিবেক বাঁশী॥

দানলীলা,—

এত ছান্দে কে না বান্ধে চুল। তোমার চূড়ায় মজাইলে জাতি-কুল॥
এই ত চন্দনের ফোঁটা কেবা নাহি পরে। তোমার কপাল-গুণে ঝলমল করে
কেবা নাহি পরে বনমালা। তোমার মালায় সে এতেক কেন জ্বালা॥
কে না থাকে ত্রিভঙ্গ হইয়া। প্রাণ কান্দে এরূপ দেখিয়া॥
কেবা না এতেক জানে কলা। যাহা দেখি ভুলয়ে অবলা॥
কেবা নাহি ধরে রূপ কালা। তোমার রূপে সে ভুবন করে আলা॥
তোমা বিনে মনে নাহি লয়। জ্ঞানদাস কহে ভাল হয়।

বসন্তলীলা,—

মধুবনে মাধব দোলত রঙ্গে। ব্রজ-বনিতা ফাগু দেই শ্যাম-অঙ্গে॥
কানু ফাগু দেয়ল সুন্দরী-অঙ্গে। মুখ মোড়ল ধনী করি কত ভঙ্গে॥
ফাগু রঙ্গে গোপী সব চৌ-দিগে বেঢ়িয়া। শ্যাম-অঙ্গে ফাগু দেই অঞ্জলি
ফাগু খেলাইতে ফাগু উঠিল গগনে বৃন্দাবন তরু লতা রাতুল চরণে॥
রাঙ্গা ময়ুর নাচে, কাছে রাঙ্গা কোকিল গায়। রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়।
রাঙ্গা বায় রাঙ্গা হৈল কালিন্দীর পানি। গগন ভুবন দিগ-বিদিগ না জানি॥
রতি জয় জয় দ্বিজ কুলে গাব। জ্ঞানদাস-চিত-নয়ন জুড়ায়॥

ধানশী।

সময় জানিয়া ভানুর বালা। নিকসে যেমন চাঁদের মালা॥
পরিধান নীল পট্ট সাড়ী। অঞ্চলে বাঁধয়ে নবকস্তুরি॥
চাঁচর চিকুরে বাঁধে কবরী। শশী করে আলা চৌদিকে বেরি॥
সীঁথাতে শোভিত সোনার সীঁথি। তাহাতে দুলিছে কনকমোতি॥
কপালে সিন্দুর চন্দন বিন্দু। উদয় হইল অরুণ ইন্দু॥
নাসায় শোভিত সুন্দর বেশর। মৃগমদ-বিন্দু চিবুক উপর॥
কর্ণে শোভিত সোনার ফুলে। মুখে মৃদু হাসি আধ যে বলে॥
কণ্ঠমালা কণ্ঠেতে বেরি। নীলমণি হার কাঁচলী পরি॥
বাহু বন্ধ তাহে সোনার ঝাপা। কি শোভা হয়েছে দেখ বিশাখা॥

নীলমণি চুড়ী ভূজের আগে। রতন কাঞ্চন তাহার যুগে।
রতন পহুঁচে তাহার পরে। মাণিক অঙ্গুরি অঙ্গুলি পরে॥
ক্ষীণ কটী মাঝে রতন কিঙ্কিণী। রাম-রম্ভা যিনি উরুর বলনি॥
পদতলে কত চাঁদের ধটি। তাহার উপরে সোণার পাটি॥
সোণার শিকলি তাহার পরে। মরাল নূপুর বাজিছে জোরে॥
তাহার উপরে ঘুমুর ঘন। রতন চুটকি হইলা জ্ঞান॥

কেদার।

বৃষভানু-নন্দিনী, রমণীর শিরোমণি, নব নব রঙ্গিণী সঙ্গ।
চলিল শ্রীবৃন্দাবনে, প্রাণনাথের দরশনে, রসভরে ডগমগ অঙ্গ॥
রাই রূপ লাবণ্যের সীমা!
না জানি কতেক নিধি, গড়িল কেমন বিধি, ত্রিভুবনে নাহিক উপমা॥
নীলমণি চুড়ী হাতে, কনয়া কঙ্কণ তাতে, নীল বসন শোভে গায়।
নব যৌবন ভরে, গতি অতি মন্থরে, হংসগমনে চলি যায়॥
জিনি প্রভা কেটি শশী, মুখে মন্দ মৃদু হাসি, পিঠে দোলে চাচর কেশের বেণী।
বেণী আগে সোণার ঝাঁপা, তার মাঝে কনক চাঁপা, গোবিন্দের হৃদয়-মোহিনী॥
ললিতা দক্ষিণ হাতে, বাম ভুজ দিয়া তাতে, বৃন্দাবন ভূমি প্রবেশিলা।
রাই অঙ্গ কান্তি মালা, দশদিক কৈল আলা, জ্ঞানদাস তাহাতে ভুলিল॥

গোবিন্দদাস।



প্রধানতঃ ইনি গোবিন্দ কবিরাজ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাঁর পিতার নাম,—চিরঞ্জীব সেন। মাতার নাম,—সুনন্দা। ইহাঁদের আদিবাস কুমারনগর। চিরঞ্জীব,—বিবাহসূত্রে বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইনি দামোদর সেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। পুত্র গোবিন্দ কিন্তু পদ্মাতীরে তেলিয়াবুধরি গ্রামে আপন বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১৪৫৯ শকে গোবিন্দদাস ভূমিষ্ঠ হন। বৈষ্ণবদিগ্‌দর্শিনী নামক গ্রন্থে ইহাই উল্লিখিত। চিরঞ্জীবের দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র; কনিষ্ঠ গোবিন্দ। উভয়েই কবিরাজ। যথা ভক্তিরত্নাকরে,—

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়। সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা করি সবে প্রশংসয়।

রামচন্দ্র প্রেমবিলাস গ্রন্থে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"রামচন্দ্র নাম মোর অম্বষ্ঠ কুলে জন্ম। কেবল লালসা প্রভুর চরণ-দর্শন॥
তিলিয়া বুধরী গ্রামে জন্ম মোর হয়। পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন মহাশয়॥
কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম হয় শ্রীগোবিন্দ। একোদরে দুই ভাই পরম স্বচ্ছন্দ॥"

রামচন্দ্র বিখ্যাত কবি এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

প্রবাদ,—গোবিন্দদাস চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত শাক্ত ছিলেন; ই পরে তিনি বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাবিব পদাবলী ব্যতীত ইনি সংস্কৃতভাষায় সঙ্গীতমাধব পদাবলী (কর্ণামৃত নামক দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ভক্তিরত্নাক সঙ্গীতমাধবের অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। নিত্যানন্দপ জাহ্নবা দেবীর সহিত গোবিন্দদাস বৃন্দাবনযাত্রা করেন। তথ শ্রীজীব গোস্বামী ইহাঁর প্রণীত গীতামৃত দেখিয়া আনন্দিত হ গোবিন্দদাসের প্রতি আদেশ থাকে,—দেশে আসিয়া নূতন প রচনা করিলেই, তিনি তাহা বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট পাঠাই দিবেন। গীতামৃত পাঠাইতে গোবিন্দদাসের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়। শ্রীজী গোস্বামী তাঁহাকে পত্র লেখেন,—

"বৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাভাগবতেষু। জীব কৃষ্ণস্মরণং শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেনাত্রত্যকুশলং তত্রত্যং তদীয়ে মম। তত্র ভবন্ত এবাস্মাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে তস্মাদ্ভবদীয়ং কুশ শ্রোতুং সদাবাঞ্ছামস্তত্রাবধানং কর্ত্তব্যম্। সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়া স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বংসকালিতানি চযানি তৈরস্মর্তৈ তৃপ্ত বর্ত্তামহে। পুনরপি নূতনংতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিক লভামহে তদ্ভবদ্ভিরত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যম্। পরন্তু পূর্ব্বং শ্যামদাসমার্দ্দঙ্গিক হস্তে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য গোস্বামিকৃতং বৃহৎ ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসী তৎতত্র প্রবিষ্টং নবা ইতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহান্নিবর্ত্তনীয়াঃ। কিং বহু স্বতএব দয়ালুষু শ্রীমৎসু। লিখিতমিদং চৈত্রস্য শুক্লতৃতীয়ায়াং

১৫৩৪ শকের চান্দ্রাশ্বিন শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে ৭৫ বৎ বয়সে ইনি অন্তর্ধান করেন।

এইরূপ কথিত আছে, গোবিন্দদাস একবার কঠিন গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। "রাধাকৃষ্ণ" এই চতুরক্ষর মন্ত্র গ্রহণেই তিনি সে রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই সময় তিনি এই পদটী রচনা করেন,—

"ভজ হুয়ে মন, নন্দ-নন্দন, অভয়-চরণারবিন্দ রে।
শীত আতপ, বাত বরিখত, এ দিন-যামিনী যাগিরে॥
বৃথায় সেবিনু, স্বজন পরিজন, কেবল চপল সুখ লাগি রে।
আপকি দোষে, কতহু ভোগিনু, গোবিন্দ করম অভাগী রে॥"

অনুপ্রাস ছন্দে ইনি এই পদটী রচনা করেন,—

"মুদিত মরকত, মধুর মূরতি, মুগধ মোহন ছাদ।
মল্লিকা-মালতী, মাগে মধুব্রত, মধুপ মনমথ ফাঁদ॥
শ্যামসুন্দর, সুঘড় শেখর, শরদ শশধর হাস।
সঙ্গে সখাচয়, সুবেশ সমারস, সদত সুখময় ভাষ॥
চিকণ চিকুর, চিকুরে চুম্বিত, চারু চন্দ্রক পাঁতি।
চপলা চমকিত, চকিত চাহনি, চিত চৌরক ভাতি॥
গিরিক গৈরিক, গোরজ গোরচনা, গন্ধ পরভিত ভাষ।
গোপ গোপী, গুণাগুণ গায়ত, কহত হি গোবিন্দদাস।

ভক্তি-রত্নাকরে গোবিন্দদাসের বিবরণ এইরূপ,—

শক্তি-উপাসক মাতামহ দামোদর। ভগবতী যাঁর বশীভূত নিরন্তর॥
দামোদর কবিরাজ সর্ব্বত্র প্রচার। তাঁর কন্যা সুনন্দা গোবিন্দ পুত্র যার॥
মাতৃগর্ভে গোবিন্দ ভূমিষ্ঠ নাহি হয়। তাহাতে মাতার কষ্ট হৈল অতিশয়॥
দাসী শীঘ্র কহিলেন কবিরাজ প্রতি। সে সময়ে কবিরাজ পূজে ভগবতী॥
কথা না কহিয়া নেত্র হস্ত ভঙ্গী দ্বারে। শ্রীদুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখায় দাসীরে॥
লৈয়া যাহ ইহা শীঘ্র করাহ দর্শন। হইব প্রসব দুঃখ হবে নিবারণ॥
কহিল ভঙ্গীতে যাহা তাহা না বুঝিল। শীঘ্র যন্ত্র ধৌত করি জল পিয়াইল॥
হইল প্রসব পুত্র পরম সুন্দর। দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈলা যৈছে শশধর॥
জন্ম হইল ভগবতী-যন্ত্রোদক পানে। এই এক হেতু ইহা জানে সর্ব্বজনে॥
আক্ষকালে পিতা সঙ্গোপন সঙ্গহীন। না বুঝিয়া কুল কর্ম্ম-কহয়ে প্রাচীন॥
আজন্ম রহিলা মাতামহের আলয়। তাঁর সঙ্গাধীন আর এই এক হয়॥
উত্তম মধ্যমাধম সঙ্গ শাস্ত্রে কয়। যে যৈছে করয়ে সঙ্গ সেহো তৈছে হয়॥
ভগবতী প্রতি আর্ত্তি এ দুই প্রকারে। সবে উপদেশে ভগবতী পূজিবারে॥
ভগবতী বিনা কুল কার্য্যসিদ্ধি নয়। এই মত উপদেশ গোবিন্দ করয়॥

রামচন্দ্র শ্রীআচার্য্য স্থানে শিষ্য হৈতে। গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয় চিতে
ভগবতী-পাদপদ্ম কৈলে আরাধন। নহিবে কি এ ভববন্ধাদি বিমোচন॥
হেনকালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী। কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি।
শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল। ভজিব শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্ম দঢ়াইল॥
আচার্য্য প্রভুর শিষ্য হইব সর্ব্বথা। তবে সে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা॥
ঐছে বিচারিয়া চলিতেই যাজিগ্রামে। শুনিলেন শ্রীআচার্য্য গেলা বৃন্দাবনে॥
গোবিন্দের চিত্তে খেদ হৈল অতিশয়। হইয়া ব্যাকুল মনে মনে বিচারয়॥
বৈষ্ণবগণেও মোর হিত চিন্তা কৈল। কহিল পিতার বার্ত্তা তাহা না শুনিল
মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্যাবান্। চৈতন্য চন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান॥
এ হেন সন্তান হৈয়া গেনু ছারেখারে। এ কেবল কর্ম্মদোষ কি বলিব কারে
মোর সম জগতে অধম নাহি আর। মনে যে করিনু তাহা নহিল আমার
যদি আচার্য্যের কভু করিতু দর্শন। তবে কিনা ফিরিত আমার দুষ্ট মন।
মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য্য প্রভুর দরশনে। ফিরিল সে মন নিষ্ঠা হৈল সে চরণে
তাঁরে শ্রীআচার্য্য প্রভু অনুগ্রহ কৈল। মোর কর্ম্মদোষে তাঁর দর্শন না হৈল
কি করিব কোথা যাব কি হবে আমার। এত কহি কান্দে নেত্রে বহে অশ্রুধার
হেনকালে দৈববাণী হইল আকাশে। অভিলাষ পূর্ণ হবে অল্প দিবসে।
সেই দিন হৈতে কৃষ্ণে হৈল রতিমতি। দেখি ঐছে চেষ্টা রামচন্দ্র হৃষ্ট মতি
এই ত হইল গোবিন্দের পূর্ব্ব রীত। এ সব শ্রবণে কৃষ্ণচন্দ্রে হয় প্রীত।
তেলিয়া বুধরি গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি। তেলিয়ার নির্জ্জন স্থানেতে প্রীত অতি
বুধরি পশ্চিমে শ্রীপশ্চিম পাড়া নাম। তথা সর্ব্বারম্ভে বাস সেই রম্যস্থান

গোবিন্দদাসের কয়েকটী পদ-পরিচয়,—

ভাটিয়ারি।

গৌরাঙ্গ পতিত পাবন অবতারি।
কলি-ভুজঙ্গম দেখি, হরি নামে জীব রাখি, আপনি হইলা ধন্বন্তরি॥
কলি-যুগে শ্রীচৈতন্য, অবনী করিলা ধন্য, পতিত-পাবন যার বানা॥
পুরবে রাধার ভাবে, গৌরাঙ্গ হইলা এবে, নিজ রূপ ধরি কাঁচা সোণা।
গদাধর আদি যত, মহামায় ভাগবত, তারা সব গোরা গুণ গায়।
অখিল ভুবনপতি, গোলোকে যাঁহার স্থিতি, হরি বলি অবনী লোটায়॥
সোঙরি পুরব গুণ, মুরছয়ে পুনঃ পুনঃ পরশে ধরণী উলসিত।
চরণ কমল কিবা নখর উজর শোভা, গোবিন্দদাস বঞ্চিত?

সুহই।

কুন্দন কনয়া কলেবর কাঁতি। প্রতি অঙ্গে অবিরল পুলক পাঁতি॥
প্রেমভরে ঝর ঝর লোচনে চায়। কতহুঁ মন্দাকিনী তঁহি বহি যায়॥

দেখ দেখ গোরা গুণমণি। করুণাময় কো বিহি মিলায়ল আনি॥
জপি জপায় মধুর নিজ নাম। গাইয়া গাওয়ায় আপন গুণগান॥
নাচিয়া নাচাওয়ে বধির জড় অন্ধ। কতিহুঁ না পেখলুঁ ঐছন পরবন্ধ॥
আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর। নিজ পর নাহি, সবারে দেই কোর॥
ভাসল প্রেমে অখিল নর নারী। গোবিন্দদাস কহে যাও বলিহারি।

সারঙ্গ।

কাঞ্চন কমল, কান্তি কলেবর, বিহরই সুরধুনী-তীর।
তরুণ তরুণ তরু, তরু হেরি তোড়ই, কুন্দ কুসুম করবীর॥
সমবয়ো সকল, সখাগণ সঙ্গহি, সরস রভস রসে ভোর।
গজবর গমন, গঞ্জি গতি মন্থর, গোপতে গদাধর কোর॥
অপরূপ গৌরাঙ্গ রঙ্গ।
পুরব-প্রেম,-পরমানন্দে পূরিত, পুলক পটল ময় অঙ্গ।
নিরুপম নদীয়া-নগর, পুব নিতি নিতি, নব নব করত বিলাস।
দীনে দয়া কুরু, দুরিত দুঃখ হরু, কহতহি গোবিন্দদাস॥

ধানশী।

গৌর রূপ সদাই পড়িছে মোর মনে।
নিরবধি থুঞা বুকে, সে রস মানস সুখে, অনিমিখে দেখহ নয়ানে।
পরিয়া পাটের যোড়, বাঁধিয়া চিকুর ওর, তাহে নানা ফুলের সাজনি।
পরিসর হিয়া ঘন,লেপিয়াছে চন্দন, দেখি জীউ করিনু নিছনী।
মৃগমদ চন্দন, কুঙ্কুম চতুঃসম, সাজিয়া কি দিল ভালে কোঁটা
আছুক আনের কাজ, মদন মুগধ, রহল যুবতীকুলের খোঁটা॥
প্রাণ সরবস দেহ, অবশ সকল ভেল, মোর আঁখি পাপ।
হিয়ায় গৌরাঙ্গ রূপ, কেশর লেপিয়া গো, ঘুচাইব যত মনের তাপ॥
কামিনী হইয়া, কামনা করিয়া, কাম-সায়রে মরি।
গোবিন্দদাসে, কহয়ে তবে, সে দুখের সাগরে তরি॥

বেলোয়ার।

অরুণিত চরণে, রণিত মণি মঞ্জির, আধপদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন, বসন মনোরঞ্জন, কলিত বলিত বনমাল॥
ধনি ধনি মদন মোহনিয়া।
অঙ্গহি অঙ্গ, অনঙ্গ তরঙ্গিম, রঙ্গিম ভঙ্গিম, নয়ন চাচনিয়া॥
মাঝহি ক্ষীণ, পীনউর অম্বর, প্রান্তর অরুণকিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জর করভ, করহি কর বন্ধন, মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥

অধর সুরঙ্গিনী, মুরলী তরঙ্গিণী, বিগলিত রঙ্গিনী হৃদয় দুকুল।
মাতল নয়ন, ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি, উড়ি পড়ত শ্রুতি উতপল মূল।
গোরোচন তিলক চূড়ে, বালচন্দ্র বেলে, রমণী মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাসের চিতে, নিতি বিহরত, নাগরবর তরুণ তমাল।

বেলোয়ার।

অঞ্জন গঞ্জন, জগজন রঞ্জন, জলদপুঞ্জ জিনি বরণ।
তরুণারুণ, থল কমল দলারুণ, মঞ্জির রঞ্জিত চরণ॥
দেখি সখি নাগররাজ বিরাজে।
সুধই সুধারস, হাস বিকসিত, হেরি হেরি চাঁদ মলিন ভেল লাজে।
ইন্দীবরক গরববিমোচন, লোচন মনমথ ফাঁদে।
ভাঙ ভুজগ পাশে, বাঁধল কুলবতী, কুলদেবতা মন কাঁদে॥
ভ্রমর করম্বিত, আজানুলম্বিত, কেলি কদম্বক মাল।
গোবিন্দদাসচিতে, নিতি নিতি বিহরত, ঐছন মুরতি রসাল।

সারঙ্গ।

মরকত মঞ্জু মুকুর, মুখমণ্ডল, মুখরিত মুরলী সুতান।
শুনি পশু পাখী, শাখিকুল পুলকিত, কালিন্দী বহয়ে উজান।
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর চন্দ।
কামিনী মনহি, মুরতিময় মনসিজ, জগজন নয়ন আনন্দ॥
তনু অনুলেপন, ঘন সার চন্দন, মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল-চুম্বিত, অবনী-বিলম্বিত, বনিবনমাল বিটঙ্ক॥
অতি কোমল, চরণতল শীতল, জীতল শরদরবিন্দ।
কত কত ভকত, মধুপ আনন্দিত, বঞ্চিত দাসগোবিন্দ॥

মায়ুর।

কুবলয় কন্দর, কুসুম কলেবর, কালিম কান্তি কলোল।
কোমল কেলি, কদম্ব করম্বিত, কুণ্ডল কান্তি কপোল॥
জয় জয় কৃষ্ণ কমলেশ।
কালিয় কেশী, কংস-করি-কর্ষণ, কেশব কুঞ্চিত কেশ॥
কুলবনিতাকুচ কুঙ্কুমাঞ্চিত, কুসুমিত কুন্তল বন্ধ।
কালিন্দী কমল, কলিত কর কিশলয়, কৌতুক কন্দন কন্দ॥
কমলা কেলি, কলপতরু কামদ, কমনীয় কটী করীন্দ্র।
কৃপণ কৃপাকর, কলিকলুষাঙ্কুশ, কহ কবি দাস গোবিন্দ॥

মল্লার।

কুটিল কুন্তল, কুসুম কাছনি, কান্তি কুবলয় ভাস রে।
কুঞ্চিতাধর, কুমুদ কৌমুদী, কুন্দ কোরক হাস রে॥
কালিন্দী কুল, কদম্ব কাননে, কুঞ্জে কুঞ্জরাজ রে।
কামিনী কুচ, কুঙ্কুমাঙ্কিত, কাম কোটি বিরাজ রে॥
কনক কিঙ্কিণী, কঙ্কণাঙ্গদ, কুণ্ডলাকৃতি অংস রে।
কেকী কোকিল, কণ্ঠ কণ্ঠক, কাকলী কৃত বংশ রে॥
কেশরী কটি, কম্বু কণ্ঠক কুন্দ কেশর দান রে।
কলিকাল কালিম, কবল কম্পিত, দাস গোবিন্দ নাম রে॥

মায়ুর।

কুন্দন কুসুম সুকোমল কাঁতি। মাথে ময়ূর শিখণ্ডক পাঁতি॥
আকুল অলিকুল বকুল কি মাল। চন্দন চাঁদ বিরাজিত ভাল॥
মদনমোহন মুরতি কাণ। হেরি উনমতি যুবতী পরাণ॥
ভাঙ বিভঙ্গিম লোচনলোর। নাসা উন্নত মোহিত জোড়॥
বঙ্কিম গীম অমিয় মিঠ বোল। কাঞ্চন কুণ্ডল গণ্ড হিলোল॥
মণিময় আভরণ অঙ্গে বিরাজ। পীত নিচোল তাহি পর সাজ যাওয়ে।
অরুণ চরণে মণি মঞ্জির ধাওয়ে। গোবিন্দদাস চিতে আন নাহি ভাওয়ে॥

মায়ুর।

মুখরিত মুরলী, মিলিত মুখ মোদনে, মরকত মুকুর মৈলান।
মানিনী মান, মগন মুচুকায়লি, মুনিমানস মুরছান॥
মদন মোহন মুরতি মুরারি।
মনইতে মরমে মনোরথ মাধুরী, মনমথ মনমথ নারি॥
মুকুলিত মল্লী মধুর মধু মাধুরী মালতী মঞ্জুর মাল।
মন্দ মকরন্দে, মুদিত মত্ত মধুকর, মণ্ডিত মৌকলি মন্দার॥
মাথহি মৌড়, মুকুট মদ মন্থর, মণিমণ্ডল মন মান।
মঞ্জু মঞ্জীর, মহিমা মহিমাময়, দাস গোবিন্দ গুণ গান॥

সারঙ্গ।

কুন্দন কনক কলিত কর কঙ্কণ, কালিন্দীকুল বিহারী।
কুঞ্চিত কেশ, কবচ কুসুমাকুল, কুলকামিনী করধারী।
জয় জয় জগজীবন যদুবীর।
জলধর জ্যোতিঃ জিতি যছু যৌবন যুবতীযুথ অথির॥

পদ্মিনী পাণি, পরশে পুলকায়িত, পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত, পতনি পতিতাকুল, পদপঙ্কজ পরচারি॥
রমণীরমণ, রতন রুচিরানন, রতি রঞ্জিত রস বাস।
রসনা রোচন, রসিক রসায়ন, রচয়তি গোবিন্দদাস॥

তুড়ী।

রাধারমণ, রমণীমোহন, বৃন্দাবন-বনদেব।
অভিনব রাস, রসিক বর নাগর, নাগরীগণ সেব॥
ব্রজপতি-দম্পতী, হৃদয় আনন্দন, নন্দন নব ঘন শ্যাম।
নন্দীশ্বর-পুর, পুরট পটাম্বর, রামানুজ গুণধাম॥
গোবর্দ্ধন-ধর, ধরণী-সুধাকর মুখরিত মোহন বংশ।
দাম সুদাম, সুবল সখা সুন্দর, চন্দন চারু অবতংস॥
কালিয়দমন, গমন জিতি কুঞ্জর, কুঞ্জর জিতি রতি রঙ্গ।
গোবিন্দদাসের, হৃদয় মণিমন্দির, অবিচল মুরতি ত্রিভঙ্গ॥

কামোদ।

মুখমণ্ডল জিতি, শরদ সুধাকর, তনু রুচি তরুণ তমাল।
চূড়া চারু, শিখণ্ডক মণ্ডিত, মালতী মধুকর-মাল॥
ধনি ধনি বনি নব নগর কান।
রহই ত্রিভঙ্গ ভুবনমনোমোহন, মধুর মুরলী করু গান।
টল মল অলক, তিলক ঝল ঝলকৈ, ভাঙ কি ধনুয়া ধুনান।
কুলবতী বরত, বিমোচন লোচন, বিষম কুসুম-শর বাণ॥
বান্ধুলি বন্ধু অধরে মধু মাখল, মধুর মধুর মৃদুহাস।
যছু আমোদ মদন মদ মন্থর, ভণতহি গোবিন্দদাস॥

কামোদ।

ইন্দু অমিঞা বয়ান অগোরল, ভাঙ তিমির ঘন ঘোর।
কিরণ বিকাশিত, শ্রুতি কুবলয় পর, ধাবত নয়ান চকোর।
নাসা শিখর, উপরে পুন উদিত, সিন্দুর ভাও উজোর॥
অহর্নিশ বদনকমল, তেঞি বিকশিত, শ্যাম ভ্রমর নাহি ছোড়॥
অরুণ কিরণ পুনঃ অধর হেরি হেরি, হারত রঙ্গিণীকুলে।
কুচ-যুগ কোক, শোক নাহি জানত, গোবিন্দদাস কহ ফুরে॥

শ্রীরাগ।

মুরারি শিঙ্গারিণী, রাসবিহারিণী, মণিময় ভূষিতা অঙ্গী।
মধুরিম হাসনি, রসময় ভাষণী, দশন কিরণমণি মোতিম রঙ্গী।

জয় জয় জয় বৃষভানু কিশোরী। গোরোচন রুচি চোরণ গোরী ॥
চকিত খঞ্জন, গতি জিনি লোচন, মনমথ মনোমত ভাতি।
নাচত রঙ্গিণী, ভাঙ ভুজঙ্গিনী, কলির দমন মদন মদে মাতি ॥
শ্যাম মনোহর, মনমথ কুঞ্জর, কুচ কনকাচল বিহরত দেখি।
নীল নিচোল, ঝাঁপি তাহা বাঁধল, গোবিন্দদাস যুগতি না উপেখি ॥

শ্রীরাগ।

নিরুপম কাঞ্চন, রুচির কলেবর, লাবণী অবনী ধরণী না হোই।
নিরমল বদন, হাস রস পরিমল, মলিন সুধাকর অম্বরে রোই ॥
আজু বনি নব নব রঙ্গিণী রাই। সঙ্গিনী সকল শিঙ্গারিণী সাই ॥
লোল অলকা তিলকাবলী রঞ্জিত, সীঁথ কাঞ্চন কমল উজোর।
লোচন মধুকরী চল তঁহি ফিরি ফিরি, শ্রু তকুবলয় পরিমলে কিয়ে ভোর ॥
শ্যামর চিত-চোর কুচ কোরক, নীল নিচোল কোরে করু বাস।
যাবক রঞ্জিত, অরুণ চরণতলে, জিউ নিণমঞ্জুল গোবিন্দদাস ॥

তুড়ী।

ধনী কানড়া ছাঁদে বাঁধে কবরী। মন মালতী মাল-তাহি উপরি ॥
দলিতাঞ্জন গঞ্জ কলা কবরী। ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী ॥
ধনী সিন্দুর-বিন্দু ললাট বনি। অলকা ঝলকো তঁহি নীলমণি ॥
তাহে শ্রীখণ্ড কুণ্ডল ভাঙ পাতা। ভ্রূভঙ্গিম চাপ ভুজঙ্গলতা ॥
নয়নাঞ্চল চঞ্চল খঞ্জরীটা। তাহে কাজর শোভিত নীল ছটা ॥
তিল পুষ্প সম নাসা ললিতা। কনকাঁতি ভাতি ঝলকে মুকুতা ॥
ধনী সুন্দর শারদ ইন্দুমুখী। মধুরাধর পল্লব বিম্ব নখী ॥
গলে মতিমহার সুরঙ্গ মালা। কুচ কাঞ্চন শ্রীফল তাহে খেলা ॥
নব যৌবন ভার ভরে গুরুয়া। তঁহি অঙ্গে সুলেপন গন্ধ চুয়া ॥
ক্ষীণ উপর পাশে শোভে ত্রিবলী। কটি কিঙ্কিণী, জানু হেম কদলী ॥
পদপঙ্কজ পাশে শোভে আলতা। মণি মঞ্জীর তোড়ল মল্ল পাতা ॥
নখচন্দ্রচ্ছটা ঝলকে অনুপম। হেরি গোবিন্দদাস তঁহি পরণাম ॥

শ্রীরাগ।

ঢল ঢল কাঁচা, অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির, তরঙ্গহিল্লোলে মদন মুরছা পায় ॥
কিবা সে নাগর, কি খণে দেখিনু, ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর, চিত বেয়াকুল, কেনই বা সদাই ঝুরে ॥

হাসিয়া হাসিয়া, অঙ্গ দোলাইয়া, নাচিয়া নাচিয়া যায়।
নয়ানকটাক্ষে, বিষম বিশিখে, পরাণ বাঁধিতে ধায়॥
মালতী ফুলের, মালাটী গলে, হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া, মাতল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥
কপালে চন্দন, কোঁটার ছটা, লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি, মরমে বাঁধল, না কহি লোকের লাজে॥
এমন কঠিন, নারীর পরাণ, বাহির নাহিক হয়।
না জানি কি জানি, হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ কয়॥

কামোদা।

কাঞ্চন কমল, পবনে উলটায়ল, ঐছন বদন সঞ্চারি।
সমবম লেই, পালটি পুন বিজ্কলি, রঙ্গিণী বঙ্ক নেহারি॥
হরি হরি কো দেই দারুণ বাধা।
নয়নক সাধ, আধ না পূরিল, পালটী না হেরিনু রাধা।
ঘন ঘন আঁচর, কুচ কনকাচল, ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মন হরি, কনয়া কুম্ভ ভরি, মহরি রাখত কত বেরি।
যব মন বাঁধল, ইন্দ্রিয় কাপর, তঁহি মিলল আন আন।
কাঠক মুরতি, ঐছে মুরছায়ত, গোবিন্দদাস পরমাণ।

বিহাগড়া।

এধনি আঁচরে বদন ঝাঁপাও।
লুবধল মধুপ, বিধুন্তুদ অদত অনত চলি যাও॥
মুখমণ্ডল কিয়ে, শরদ সরোরুহ, ভালহি অটমিক চন্দ।
মধুরিপু মরম ভরম গাহা ঐছন, তাহে কি গণিয়ে মতি মন্দ॥
জনি কহ গরবে, পাণিতলে বারব, ও থল কমল উজোর।
তঁহি নখচাঁদ, ভরম ভরে ঐছন, ততহি পড়ত জানি ভোর॥
ভাঙ ধনুয়া কিয়ে, সুতনু ধুনায়সি, যছু শরে গিরিধর কাঁপ।
সো কিয়ে অতনু পতগ শিবে ডারসি গোবিন্দদাস হিয়ে তাপ॥

সুহই।

চম্পক দাম হেরি, চিত অতি কম্পিত, লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়া রূপ অন্তর, জাগয়ে নিরন্তর, ধনি ধনি তেহারি সোহাগ॥
বৃষভানু-নন্দিনী, জপয়ে রাতি দিনি, ভরমে না বোলায় আন।
লাখ লাখ ধনী, বোলয়ে মধুরবাণী, স্বপনে না পাতয়ে কাণ॥

যা কহি ধা পহুঁ কহই না পারিয়ে, ধারা ধরি বহে লোর।
সেই পুরুখ-মণি, লোটায় ধরণী, পুনি কোহে আরতি ওর॥
গোবিন্দদাস তুয়া, চরণে নিবেদল, কানুক ঐছে সম্বাদ।
নিচয়ে জানহ, তছু দুখ খণ্ডয়ে, কেবল তুয়া পরসাদ॥

শ্রীরাগ।

কনক লতা কিয়ে, কিশলয় পদুমিনী কিয়ে, মহী বিজুরী উজোর।
কুঞ্জ কুটীরে কিয়ে, উয়ল হিমকর, হেরইতে ভৈগেনু ভোর॥
সুন্দরি তোহারি চরিত বিপরীতে।
কাজর গরলহি, ভরল নয়ন শর, হানলি অন্তর চিতে॥
তব অগেয়ান, কয়লি তুহু ঐছন, অব সুপুরুখ বধ জান।
উচ কুচ পাথর, সরস পরশ দেই, উদঘাটই দিঠি বাণ॥
আশা পাশ হাস দরশায়লি, অতিক্ষণে ধরবি পরাণ।
বিঘটন সময়, পালটি নাহি আয়ত, গোবিন্দদাস পরমাণ॥

কানড়া।

শরত চন্দ, পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ,
ফুল্ল মল্লি মালতি যুথি, মত্ত মধুকর ভোরণি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যামমোহন শোহন কাঁতি,
মুরলী তান পঞ্চম গান, কুলবতী চিত চোরণি॥
শুনত গোপী, প্রেম রোপি, মনহি মনহি আপা সোপি,
তাঁহি চলত, যাঁহি বোলত, কম কনক লোলনি।
বিস্মরি গেহ, নিজহু দেহ, একু নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত মঞ্জীর একু, একু কুণ্ডল দোলনি॥
পবনে শিথিল সীঁথির বন্ধ বেগে ধায়ত যুবতীবৃন্দ,
গ্রহত খসত বসন চোরি, বিগলিত বেণী দোলনি।
ততনি বেলি, সখিনী মেলি, কেহ কাহুক পথে না হেরি,
ঐছে মিলল গোকুল-চন্দে, গোবিন্দদাসক গায়নি॥

সুহই।

মাধব মাধব স্মরি নিচয়ে মরিব। পিয়ার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব।
জনমে জনমে হউ সে পিয়া আমার। বিধি পায়ে মাঙ্গ মুঞি এই বর সার॥
হিয়ার মাঝারে মোর রহি গেল দুখ। মরণ সময়ে পিয়ার না দেখিনু মুখ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কয় চরণেতে ধরি। এখনি আনিয়া দিব তোমার প্রাণহরি॥

বলরাম দাস।

বলরাম দাস,—বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডের বৈদ্য বংশীয়। পদ কল্পতরু গ্রন্থে ইনি "কবি নৃপবংশজ" বলিয়া অভিহিত। ইহাঁর পিতার নাম আত্মা-রাম দাস; মাতার নাম সৌদামিনী। অনেকের মতে প্রেম-বিলাস ইহাঁরই প্রণীত গ্রন্থ। ইহাঁর গুরুদত্ত নাম,—নিত্যানন্দ দাস। প্রেম বিলাস গ্রন্থে ইহাঁর আত্মপরিচয় এইরূপ,—

মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস। অম্বষ্ঠ কুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস।
আমি এক পুত্র মোরে রাখিয়া বালক। পিতা মাতা দোঁহে বলি গেলা পরলোক॥
অনাথ হইয়া আমি ভাবি অনিবার। রাত্রিতে স্বপন এক দেখিল চমৎকার।
জাহ্নবা ঈশ্বরী কহি কোন চিন্তা নাই। খড়দহ গিয়া মন্ত্র লহ মোর ঠাঁই॥
স্বপন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন। ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপার ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা। এবে নিত্যানন্দ দাস শ্রীমুখে রাখিলা।
নিজ পরিচয় আমি করিনু প্রচার। গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব পদে করি নমস্কার॥

বলরামের বৃদ্ধাকালের রচিত একটী পদ শুনুন,—

"বুঢা!—কি আর গরব ধর।
এ ভব সংসার, সাগর তরিতে, হরিনাম সার কর।
পাকিল কুন্তল, গায়ে নাহি বল, কাঁকালি হয়েছে বাঁধা॥
হাতে নড়ি করি, যাও গুড়ি গুড়ি, হুড়ি পড়িবারে শঙ্কা॥
সন্ধ্যায় শয়ন, কাশ ঘনে ঘন, সঘনে ডাকিছে গলা।
মুদিত নয়ান, ঘুচাইয়া দেখ, উদিত হয়েছে বেলা॥
খাস যে রোদন, লজ্জি ঘনে ঘন, সকলে পিবহ পাণী।
অওয়ে বদন, ভরি বল হরি, দাস বলরাম বাণী॥"

বলরাম দাস,—ইষ্টদেবের গুণ বর্ণনা করিতেছেন,—

"অনুক্ষণ অরুণ, নয়ান ঘন ঘূরত, ঢরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন অরুণ, বরুণালয়ে সকরু, অমিয়া বরিখে অনিবার॥
নাচত রে নিতাইবর চাঁদ।
সিঞ্চই প্রেম সুধারস জগজনে, অদ্ভুত নটন সুছাঁদ॥
পদতল ভাল খলিত মণি মঞ্জীর, চলত হি টলমল গঙ্গ।
মেরু-শিখরে কিয়ে, তনুঅনুপাম রে, ঝলমল ভাব তরঙ্গ॥

সতত রোয়তই, গতি অতি মন্থর, হরি বলি মুরছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর, গৌর বলি ধাবই, আনন্দ গরজত দোর॥
পামর পঙ্গু, অধম জড় আতুর, দীন অবধি নাহি নাম।
অবিরত দুর্লভ, প্রেম রতন ধন, যদি জগতে কর দান॥
অতি চলন্মোগ্র, প্রেমধন বিতরণে, নিখিল তাপ দূরে গেল।
দীনহীন সবহু, মনমথ পূরণ, অবলা উনমত ভেল॥
ঐছন করুণ, নয়ান অবলোকনে, কাহু ন রহু দুরদ্দিন।
বলরাম দাস, কাহে ভেল বঞ্চিত, দারুণ হৃদয় কঠিন॥"

অন্য কয়েকটী পদ,—

কামোদা।

ভালে সে চন্দন চান্দ, নাগরী মোহন ফান্দ, আধ টানিয়া চুড়া বান্ধে।
বিনোদ ময়ুরের পাখে, জাতি কুল নাহি রাখে, মো পুন ঠেকিনু ও না ফান্দে॥
সই কি আর কি আর বোল মোরে।
জাতি কুল শীল দিয়া, ও রূপ নিছনি লিয়া, পরাণে বান্ধিয়া থোব তারে॥
দেখিয়া ও মুখ চান্দ, কান্দে পুণমিক চাঁদ, লাজ ঘরে ভেজাঞা আগুনি।
নয়ান কোণের বাণে, হিয়ার মাঝারে হানে, কিবা দুটী ভুরুর নাচনি॥
আই আই মনু মনু, কি রূপ দেখিয়া আইনু, কলা অঙ্গে পরিছে বিজলি।
স্বরূপে দড়ানু মনে, এ রূপ যৌবন সনে, আপনা সাজাঞা দিব ডালি॥
কি খেনে দেখিনু তারে, না জানি কি হৈল মোরে, আট প্রহর প্রাণ ঝুরে।
বলরামদাস কহে, ওরূপ দেখিয়া গো, কোন পামরী রবে ঘরে॥

সুহই।

নব অনুরাগে ঘরে রহই না পারি। গুরুজন-পথ ধনী করত নেহারি॥
গুরুজন পরিজন সবে নিদ গেল। দেখি ধনি অতি উতকণ্ঠিত ভেল।
বিছুরল আপনক বেশ বনান। সখীগণ সঞে তব করত পয়ান॥
পূর্ণিমক চান্দ জিনিয়া মুখ জোতি। ঝলমল করে তনু কতয়ে মণিমোতি।
থল-কমল-দল চরণ সঞ্চার। নব অনুরাগে কত আরতি বিথার॥
আয়ল মদন-কুঞ্জ গৃহমাঝ। না হেরল তাহি বরজ-যুবরাজ॥
নৈঠলি তঁহি পুন ছোড়ি নিশ্বাস। নাগর আনিতে চলু বলরামদাস॥

ধানশী।

রাতি দিনে চোখে চোখে, বসিয়া সদাই দেখে, ঘন ঘন মুখ খানি মাজে।
উলটী পালটী চায়, সোয়াস্তি নাহিক পায়, কত বা আরতি হিয়ার মাঝে॥
সই ও দুখ লাগিয়াছে মনে।
যারে বিদগধ রায়, বলিয়া জগতে গায়, মোর আগে কিছুই না জানে॥

জ্বালিয়া উজ্জ্বল বাতি, জাগি পোহাইল রাতি, নিদ নাহি যায় পিয়া ঘুমে।
ঘন ঘন করে কোলে, ক্ষণে করে উতরোলে, তিলে শতবার মুখ চুমে॥
ক্ষণে বুকে ক্ষণে পিঠে, ক্ষণে রাখে দিঠে দিঠে, হিয়া হৈতে শেজে না শোয়ায়
দরিদ্রের ধন হেন, রাখিতে না পায় স্থান, অঙ্গে অঙ্গে সদাই ফিরায়॥
ধরিয়া দুখানি হাতে, কখন ধরে মাথে, ক্ষণে ধরে হিয়ার উপরে।
ক্ষণে পুলকিত হয়, ক্ষণে আঁখি মুদি রয়, বলরাম কি কহিতে পারে॥

কেদার।

একে সে মোহন যমুনার কূল, আরে সে কেলি কদম্ব-মূল,
আরে সে বিবিধ ফুটল ফুল, আরে সে শারদ যামিনী।
ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব, পিক কুহু কুহু করত গাব,
সঙ্গিণী রঙ্গিণী মধুর বোলনি, বিবিধ রাগ গায়নী॥
বয়স কিশোর মোহন ঠাম, নিরখি মুরছি পড়ত কাম,
সুজল-জলদ শ্যাম-ধাম, পিঙল বসন দামিনী।
শাঙল ধবল কালিম গোরী, বিবিধ বসন বনি কিশোরী,
নাচত গাওত রস বিভোরি, সবহু বরজ কামিনী॥
বীণা কপিনাস পিনাক ভাল, সপ্ত-সুর বাজত তাল,
এ স্বর মণ্ডল মন্দিরা ডম্বু কেলি কতহুঁ গায়নী।
নূপুর ঘুঙ্গুর মধুর বোল, ঝনন ননন নটন লোল,
হাসি হাসি কেহু করত কোল, ভালি ভালি বোলনী॥
বলরাম দাস করত তাল, গাওত মধুর অতি রসাল,
শুনত ভুলত জগত উমত, হৃদয়-পুতলী দোলনী॥

তুড়ী।

বিহরে আজু রসিকরাজ, গৌরচন্দ্র নদীয়া মাঝ,
কুঞ্চ কেশরপুঞ্জ উজার কনক-রুচির-কাঁতিয়া।
কোটী কামরূপ ধাম, ভুবনমোহন লাবণী ঠাম,
হেরত জগত যুবতী উমাত ধৈরজ ধরম তেজিয়া॥
অসীম পূর্ণিমা-শরদ চন্দ, কিরণ মদন বদন-ছন্দ,
কুন্দ কুসুম নিন্দি সুষম, মঞ্জু বসন-পাঁতিয়া।
বিম্ব অধরে মধুর হাসি, বমই কতহু অমিয়া রাশি,
সুধই সীধুনিকরে নিঝরে, বচন ঐছন ভাতিয়া॥
মধুর বরজ-বিপিন-কুঞ্জ মধুর পিরীতি আরতিপুঞ্জ,
সোঙরি সোঙরি অধিক অবশ, মুগধ দিবস রাতিয়া।

আবেশে অবশ অলস ধন্দ, চলত চলত খলত মন্দ,
পণ্ডিত কোর পড়ত ভোর, নিবিড় আনন্দে মাতিয়া॥
অরুণ নয়ানে করুণ চাই, সঘনে জপয়ে রাই রাই,
নটত উমত লুঠত ভ্রমত, ফুটত মরম ছাতিয়া।
উত্তম মধ্যম অধম জীব, সবহু প্রেম-অমিয়া পিব,
তহি বলরাম বঞ্চিত একলে, সাধু-ঠামে অপরাধিয়া॥

তুড়ী।

কুসুমে খচিত, রতনে রচিত চিকণ চিকুর বন্ধ।
মধুতে মুগধ, সৌরভে লুবধ, ক্ষুবধ মধুপবৃন্দ॥
ললাট ফলক, পটীর তিলক, কুটিল অলকা সাজে।
তাণ্ডবে পণ্ডিত, পুলকে মণ্ডিত, গণ্ড মণ্ডল রাজে॥
ও রূপ দেখিয়া, সতী কুলবতী, ছাড়ল কুলের লাজ।
ধরম করম, সরম ভরম, মাথাতে পড়িল বাজ॥
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে, ভাঙর ভঙ্গিতে, অনঙ্গ রঙ্গিত সঙ্গ।
মদন কদন, হোয়ল সদন, জগত যুবতী অঙ্গ॥
অধর বন্ধুক মাধ্বীক অধিক, আধ মধুর হাসি।
বোলমী অলসে, কলসে কলসো, বময়ে অমিয়া রাশি॥
কুন্দদাম ঠামহি ঠাম, কুসুম সুষম পাঁতি।
ততহি লোলুপ, মধুপী মধুপ, উড়িয়া পড়য়ে মাতি॥
হিরণ হীর বিজুরী থীর, শোহন মোহন দেহে।
অরুণ কিরণ, হরণ বসন, বরণে যুবতী মোহে॥
কাম চমক ঠাম ঠমক, কুন্দন কনক গোরা।
মত্তা সিন্ধুর গমন মন্থর, হেরিয়া ভুবন ভোরা॥
কঞ্জ-চরণ খঞ্জন-গঞ্জন, মঞ্জু মঞ্জীর ভাষ।
ইন্দু-নিন্দন নখর ছন্দন, বলি বলরামদাস॥

যদুনন্দন দাস।



বৈষ্ণব সাহিত্যে যদুনন্দন দাস অন্যতম প্রসিদ্ধ পদ-কর্ত্তা,—প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। বীরভূম-মালিহাটীর বৈদ্যবংশে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর জন্ম। যদুনন্দন,—শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র সুবলচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রণীত কর্ণানন্দ গ্রন্থ অতীব আদরের সামগ্রী। কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত গোবিন্দলীলামৃত এবং রূপ-গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত বিদগ্ধ মাধব নাটকের ইনি পদ্যানুবাদ করেন। অনুবাদ মনোহর। বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রণীত সংস্কৃত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতেরও পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

গোবিন্দ-লীলামৃতে শ্রীরাধিকার সজ্জা-বর্ণন,—

"ললিতা করয়ে বেশ কেশ বনাইয়া।
ধূপ ধূনা দিঞা সেই কেশ শুকাইল। স্নিগ্ধ সুকুঞ্চিত কেশ সুগন্ধিত কৈল॥
সহজে সুগন্ধিকেশ অগুরুর গন্ধ। তাহাতে দিলেন আর অনেক সুগন্ধ॥
বেণী বিনাইয়া দিল শঙ্খচূড়-মণি। কাল-সর্প-ফণে যেন শোভে দিনমণি।
বকুলের দিব্যমালা মুকুতার মালা। তাতে দিল যেন ভেল ত্রিবেণীর মালা॥
সমষ্টি করয়ে পুনঃ স্বর্ণসূত্র দিঞা। মুলেতে বান্ধিল পট্টযোগ তাতে দিয়া॥
সূক্ষ্ম রক্তবস্ত্র ধনী ভিতরে পরিল। তাহার উপরে ধনী নীলবসন পরিল।
ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র অতি সূক্ষ্মতর। মেঘাম্বর নাম তার অতি মনোহর॥
আশ্চর্য্য কোচার শোভা নাহিক উপমা। যে শোভা দেখিতে লাজ পায় ব্রজরামা।
সম্মুষ্টি করিয়া মধ্যে স্বর্ণসূত্র দিয়া। রক্ত পট্টজাদ দিল সুছান্দ করিয়া।
স্বর্ণসূত্রে করি মণি কিঙ্কিণীর জাল। রত্নবন্ধ জাল তাতে শোভয়ে বিশাল॥
নিতম্ব দেশেতে তার করিল যোজনা। যে শোভা হইল তার নাহিক উপমা॥
চন্দন কর্পূর আর অগুরু কাশ্মীর। পঙ্ক করি লঞা আইলা বিশাখা সুধীর॥
পৃষ্ঠে বক্ষে বাহু আর কুচযুগ দেশে। লেপন করিল সেই পরম হরিষে।
উরজের দুই পাশে মৃগমদ চিত্র। লিখিয়া দেখেন শোভা পরম বিচিত্র॥
কস্তুরীর পত্রাবলী লিখন কপোলে। সুন্দর সিন্দুর বিন্দু রচিলেক ভালে॥
কার তলে চন্দনের বিন্দু যে রচিল। তার মধ্যে পুনঃ কস্তুরীর বিন্দু দিল॥
কামযন্ত্র নাম সেই ললাটে তিলক। তাহা দেখি কৃষ্ণ হয় সর্ব্বাঙ্গে পুলক॥
সিঁথির উপরে দিল সিন্দুরের রেখা। মদন কাপনি কিবা নবঘন লেখা॥
তবে চিত্রা ঠাকুরাণী রাই বক্ষঃস্থলে। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র বক্ষের উপরে॥

পুষ্প গুচ্ছ ইন্দুরেখা নবীন পল্লব। লিখিল আশ্চর্য্য চিত্র পদ্ম আদি সব॥
মীন পুষ্প পল্লব আর নব চন্দ্ররেখা। কন্দর্পের বাণ গুণ ধনুকের দেখা॥
রাধিকার ভ্রূধনুভংগির তরাসে। কাম নিজ বাণ থুইল ধনী কুচকোষে॥
রক্ত বস্ত্র মুক্তা রচিত অনেক রতন। দিব্য চুনী দিল কুচে করিয়া যতন॥
ইন্দ্রধনু প্রায় সেই সুবর্ণ পর্ব্বতে। রক্ত সন্ধ্যা আসি যেন করিল উদিতে॥
সুবর্ণের তালপত্র বলয় করিঞা। কর্ণে দিল নীলমণি পুষ্প তাতে দিয়া॥
আশ্চর্য্য তাড়ঙ্ক তার কি কহিব শোভা। স্বর্ণ পদ্ম কলিতে যেন মধুকর লোভা॥
সুবর্ণের চক্রী ঊর্দ্ধ শ্রবণেতে দিল। প্রভাতের সূর্য্য যেন উদয় করিল॥
চতুর্দ্দিকে মুক্তা তার মধ্যে নীলমণি। রত্নমণি উপরে শোভে হীরার সাজনী॥
আশ্চর্য্য শলাকা শোভে কহিল না হয়। যাহা দরশনে কৃষ্ণের মন উল্লাসয়॥
তবে ত বিশাখা আনি মৃগমদ বিন্দু। চিবুকেতে দিঞা হেরে রাই মুখ-ইন্দু॥
কি কহিব সেই শোভা অতি মনোহর॥ স্বর্ণ পদ্মদল আগে যৈছে মধুকর।
সুবর্ণ বেসরে শোভে মুকুতার ফল॥ নাসা অগ্রভাগে সেই করে ঝলমল।
বোঁট সঙ্গে শুক মুখে নেয়ালের ফল। ঐছন যেমন তেন নাসার উপর॥
সুদীর্ঘ নয়নে দিল দলিত অঞ্জন। কি কহিব সেই শোভা অতি মনোরম॥
কৃষ্ণ মুখচন্দ্র সুধাপানের লালসা। চকোর রহিল যেন করি বহু আশা॥
নির্ম্মল স্বর্ণের পাতি বিশাখা আনিয়া। রাধিকার কণ্ঠে দিল শ্রীকণ্ঠ ঢাকিয়া॥
হরি-করে আছে শঙ্খ চিহ্ন মনোহর। আচ্ছাদিল কম্বু-কণ্ঠ পাঞা কৃষ্ণ ডর॥
স্বর্ণহংস দিল রাধা কণ্ঠের উপরে। যে শোভা হইল তাহা কে কহিতে পারে॥
মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম আগে নীলরত্নমণি। স্বর্ণসূত্র ছিল তাহে হীরার থেচনি॥
অতি সূক্ষ্ম মুক্ত ফলে গুচ্ছ নিরমিয়া। হিয়ার উপরে দিল হরষিত হঞা॥
দুই গুচ্ছের মধ্যে মধ্যে দিল স্বর্ণকাঁঠি। স্বর্ণকাঁঠির দুই পার্শ্বে দিল মণিকাঁঠি॥
তবে রত্নমালা দিল হিয়ার উপরে। গোল কাঁঠি সব সেই অতি মনোহরে॥
ইন্দ্র নীলমণি আর পদ্মরাগ মণি। হেমমণি স্থূল মুক্তা প্রবাল গাঁথনি॥
তবে ত হৃদয়ে দিল মুক্তাগুচ্ছ মাল। মধ্যে স্বর্ণকাঁঠি পার্শ্বে যুগল প্রবাল॥
রাসে নৃত্য গনি কৈল রাধা বিনোদিনী। সুখী হঞা কৃষ্ণ দিল গুঞ্জমালা আনি॥
গুঞ্জমালা নহে সেই হৃদয়ের রাগে। সমর্পণ কৈল কৃষ্ণ অতি অনুরাগে॥
সেই মালা আনি ধনী ধরিল হিয়ায়। তাহার পরশে কৃষ্ণ পরশ জাগায়॥
তবে একাবলী হার নায়ক সহিতে। স্থূল তারা বলি যেন অম্বর উদিতে॥
চতুষ্কি আনিয়া তার হৃদয়েতে দিল। সুবর্ণ শিকলি দিয়া চতুষ্কি গাঁথিল॥
ইন্দ্র নীলরত্নে সেই চতুষ্কি রচিল। পদ্মরাগ হীরামণি কনকে খচিল॥
পট্টথোপ পৃষ্ঠদেশে ক্রমে নামিয়াছে। আকণ্ঠ হইতে শোভে নিতম্বের কাছে॥
নিতম্ব পর্ব্বত হৈতে বেণী ভুজঙ্গিনী। মস্তকে উঠিতে কৈল সোপান সাজনি॥

স্বর্ণাঙ্গদ ভুজে দিল বিশাখা আনিয়া। কাল পট্টডোর রত্নমালাতে রচিয়া।
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র মহাসুখ পায়। হেন সে অঙ্গদ শোভা কহনে না যায়॥
নীলরত্ন বলয়া তবে দিল দুই করে। যে শোভা হইল তাহা কে বলিতে পারে॥
রক্ত-পদ্মমৃণালে যেন মধুবিগলিত। তাহাতে রচিল যেন ভ্রমর বেষ্টিত॥
সুবর্ণ কঙ্কণ দিল তাহার উপরে। মুক্তাবলি শোভে তাহে অতি মনোহরে॥
সূর্য্যের মণ্ডলে যেন চন্দ্র বিম্বগণ। উদয় সময়ে যেন শোভা এই মন॥
সুবর্ণ মাদুলি অতি শোভিয়াছে করে। পট্টথোপ নামিয়াছে তাহার অন্তরে
অনেক রতনে কৈল থোপের সাজনি। এইরূপে হস্তে মণিবন্ধের বন্ধনি॥
অদ্ভুত রত্নমুদ্রিকা অঙ্গুলিতে দিল। বিপক্ষ-মর্দ্দন নাম তাহাতে লিখিল॥
আশ্চর্য্য কটক দিল চরণ যুগলে। নানারত্ন অংশ তাতে করে ঝলমলে।
তার ধ্বনি যেন মত্ত হংস ধ্বনি করে। শুনি কৃষ্ণ-হংস-মতি-শ্রুতি-ধৃতি হরে॥
মৃদু পাদপদ্মে দিল রতন মঞ্জরি। কালিন্দীর হংস পাঠে যায় ধ্বনি ধীরি॥
পায়ের অঙ্গুলে রত্ন উজঝটীকা দিল। তাহা দেখি বিশাখার বিস্ময় জন্মিল॥
নর্ম্মদা মালির কন্যা দিল নীলপদ্ম। কৃষ্ণ-মনোহরে যাহা হেরি শোভা-সদ্ম॥
সেই পদ্ম হস্তে দিল বিশাখা আনিঞা। পদ্মদৃশা পদ্মহস্তে সপিলা আসিয়া॥
নর্ম্মদা মালির কন্যা দিল পুষ্পমালা। হাসিয়া বিশাখা তাহা ধনী গলে দিলা॥
নাপিতের কন্যা সে সুগন্ধা নাম তার। মণি দর্পণ দিল আগেতে তাহার
দর্পণে আপন অঙ্গ দেখি বিনোদিনী। কৃষ্ণ সুখ যোগ্য বেশ মনে অনুমানি
কৃষ্ণের মিলন লাগি হইয়া চঞ্চল। নারীবেশ কান্ত-প্রাপ্তি এই তার ফল"

শ্রীবৃন্দাবনের কুঞ্জ বর্ণনা,—

"রাধিকার সঙ্গ লাগি উৎকণ্ঠিত মন। তার কুণ্ড তটে কৃষ্ণ কৈলা আগমন॥
আসি দেখে কুণ্ড শোভা অতি বিলক্ষণ। দেখিয়া হইলা তাঁর আনন্দিত মন।
চারিদিকে চারি ঘাট মণিরত্ন নানা। সর্ব্বদিকে রত্ন বদ্ধ আশ্চর্য্য ঘটনা॥
প্রতি ঘাটে দিব্য রত্ন মণ্ডপ শোভয়। সব রত্নময় সেই মণ্ডপ আলয়॥
ঘাটের দুই পাশে আছে মণি কুট্টিমা। অতি মনোহর শোভা নাহিক উপমা॥
মণ্ডপের পার্শ্বে আছে তরু শাখাগণ। নানা পুষ্প নানা বস্ত্র হিন্দোলা সাজন॥
দক্ষিণে চাঁপার বৃক্ষে রত্ন হিন্দোলিকা। পর্ব্বতে কদম্বে দোলা নানা রত্নাধিকা॥
পশ্চিম রসালে রত্ন হিন্দোলার সাজে। উত্তরে বকুলে রত্ন হিন্দোলা বিরাজে॥
পূর্ব্ব অগ্নিদিগে মধ্যে শ্যামকুণ্ড সঙ্গে। রত্নস্তম্ভে অবলম্বে বড় সেতু বন্ধে॥
রাধাকুণ্ড বেড়ি যত আছে বৃক্ষবৃন্দ। প্রতি বৃক্ষমূলে নানা রত্ন কৈল বন্ধ॥
যেচারা সব আসে সেই বৃক্ষের নিকটে। আশ্চর্য্য তাহার শোভা হয় নীর-তটে॥
রত্ন বেদী আছে রাধাকৃষ্ণ বসিবারে। সখীগণ লঞা সুখে সেখানে বিহারে॥
কুট্টিমা মণিতে বান্ধা প্রতি বৃক্ষতলে। তথা বসি রাধাকৃষ্ণ চৌদিগে নেহালে॥

গলা সম উচ্চ কাঁহো কাঁহো বৃক্ষসম। কাঁহো নাভি সম কাঁহো হয়ে জানু সম॥
কাঁহো উরু সম বেদী আর যে কুট্টিমা। চতুর্দ্দিকে আছে রত্ন সোপানঘটনা॥
সে সব বৃক্ষের তল অতি মনোহর। যেখানে বিহরে রাই শ্যামল সুন্দর॥
শ্বেতরত্ন চারি ঘাটে রত্ন বেদী আরে। বিচিত্র কুট্টিমা শোভা কে কহিতে পারে॥
এইত কহিনু কিছু শুন এবে আর। যাহা শুনি লাগে চিত্তে অতি চমৎকার॥
কুণ্ড চারি কোণে আছে মাধবীর কুঞ্জ। বাসন্তীর চতুঃশালা অতি মনোরঞ্জ॥
সেই চতুঃশালা বেড়ি কুঞ্জ বহুতর। কাঞ্চন কেশর আর অশোক বিস্তর॥
তার বাহে কুণ্ড বেড়ি কদলীর বৃক্ষ। পক্ক অপক্ক ফল পুষ্প সহ লক্ষ॥
তাহার বাহিরে পুনঃ সে কুণ্ড বেড়িয়া। উপবন পুষ্পবন একত্র মিলিয়া॥
কুণ্ড মধ্যে অতি শোভা জলের উপরি। রতন-মন্দির আছে সেতু বন্ধ করি॥
ঋতুরাজ আদি করি যত ঋতুগণ। শ্রীকুণ্ডকাননে সেবা করে অনুক্ষণ॥
বৃন্দাদেবী সেবা করে শ্রীকুণ্ড-আলয়। সুগন্ধি সলিলে সাজে অঙ্গনের চয়॥
হিন্দোলিকা কুঞ্জপথ মণ্ডলাদি যত। চান্দোয়া পতাকা পুষ্প গুচ্ছ আছে কত॥
লীলা কুঞ্জে আছে শয্যা কমলে রচিত। বোঁটি ত্যাগ নানা পুষ্প অতি সুগন্ধিত॥
পুষ্প চন্দ্র উপাধান আছয়ে কমলে। মধুপাত্র তাম্বুলপাত্র আছে মনোহরে॥
কুঞ্জদাসী শত শত আছেন তথাই। পুষ্প তোলা সেবা যোগ্য সামগ্রী বানাই॥
কুঞ্জ বেড়ি পুষ্পবাটী উপবন মাঝে। সেবার সামগ্রী ঘর অনেক বিরাজে॥
বৃন্দাদেবী সেইখানে নিজগণ লঞা। রাধাকৃষ্ণ সেবা করে আনন্দ পাইয়া॥
কহ্লার রক্তোৎপল পুণ্ডরীকে করি। পঙ্কে রুই ইন্দিবর কৈরবাদি ভরি॥
আছয়ে কুণ্ডের জল সৌরভ্য করিয়া। মকরন্দ পরাগ চর আছয়ে ভরিয়া॥
কলহংস-হংসী চক্রবাকী চক্রবাক। সারস সারসী কোক ডাহুকী ডাহুক॥
শ্রবণের প্রিয় যাতে সে শব্দ করয়। কত কত আছে তাহা কথিত না হয়॥
শুক শারী অন্যান্য আশঙ্কা করিয়া। কৃষ্ণলীলা রস কাব্য গায় সুখ পাঞা॥
নাচে সখীগণ যাহা দেখে কৃষ্ণকান্তি। কুণ্ডতট-অঙ্গনাদি করি কত ভাঁতি॥
পারাবত হরিতাল চাতকাদি যত। কৃষ্ণ দেখি কর্ণামৃতে ধ্বনি করে কত॥
কৃষ্ণমুখ শোভা কটি চন্দ্র বিনিন্দিত। দেখিয়া চকোরগণ অতি হরষিত॥
অবজ্ঞা করিয়া সব চন্দ্র তেয়াগিয়া। কৃষ্ণমুখ-চন্দ্র-রশ্মি পিয়ে সুখ পাঞা॥
লতাবৃক্ষ সব পুষ্প ফলে পূর্ণ হৈলা। পক্ক পক্ক ফল জানি ভয়ে নর্ম্ম কৈলা॥
অনেক নদীর তীরে নীর চারি পাশে। শ্রীকৃষ্ণ বিলাস যোগ্য শোভা কুঞ্জে ভাসে॥
নানা পদ্মকান্তিগণে করে ঝলমল। গুণেতে জিনিল ক্ষীর সমুদ্র সকল॥
যেমন কহিল এই রাধিকার কুঞ্জ। শ্যামকুণ্ড এইমত গুণে অতি চণ্ড॥
রাধাকৃষ্ণ পাশে সেই আছয়ে বিরাজ। তীর নীর সম সর্ব্ব রত্নের সমাজ॥
কুণ্ড তীরে অষ্ট দিকে অষ্ট কুণ্ড আর। অষ্ট সখী নামে আছে অন্যান্য প্রকার॥

নিজ নিজ হস্তে তাহার করেন সংস্কার। যাতে রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়া সুখময়াগার॥
সেই সেই সীমাতে আছে যত উপবন। তাহার নিকটে আছে শিল্পশালাগণ॥
সেই সেই সীমাতে আছে বৃক্ষগণ কত। দুই দিকে বন মধ্যে আছে রত্নগৃহ॥
পরিসর পথগণ মরকত মণি। ভিতরে রচিয়া বহু করিয়া সাজনি॥
পথের দুই পার্শ্বে মণি স্ফটিকের ভিত। উপরে স্ফটিক মণি তাহাতে রচিত॥
ছোট ছোট তরঙ্গ যেন নদীতে বহয়। এমতি স্ফটিক মণি চিত্র তাতে হয়।
অন্য লোক প্রবেশ যদি করয়ে তাহাতে। ভিতে পথ জ্ঞান হয় পথ হয় ভিতে।
এই মত দ্বারবৃন্দ উপবন মাঝে। কত কত রত্ন বৃন্দ করিয়াছে সাজে॥
কুণ্ডের উত্তরদিকে ললিতার কুঞ্জ। অনঙ্গ অম্বুজ নাম চতুর সুচ্ছন্দ॥
অষ্টদশ পদ্মতুল্য তাহার ঘটনা। হেম রম্ভা বলি তার কেশর কুসুমা॥
অষ্টাদলে অষ্ট কুঞ্জ আছে বিলক্ষণ। পশ্চাৎ বিস্তার তার করিব লক্ষণ।
আগে কহি কর্ণিকার যে কুঞ্জ ঘটনা। আশ্চর্য্য কুট্টিমা সেই সর্ব্ব মনোরমা॥
কর্ণিকাতে সুবর্ণের কুট্টিমা বিরাজে। সহস্র-পত্র-পদ্ম তুল্য তাহা ভাল সাজে।
রাধাকৃষ্ণ যে সময়ে যে লীলা করয়। তখনি তেমতি লঘু বিস্তারিত হয়।
ললিতা দেবীর শিষ্য নাম কলাবতী। সংস্কার করে তেঁহো সেই কুঞ্জ নিতি।
ছয় ঋতু সংপূর্ণ তাহা সর্ব্ব কেলি মূল। রাধাকৃষ্ণ লীলা তাতে সুখী অনুকূল।
ললিতা নন্দদাকুঞ্জ রাজপট্ট নাম। যত শোভা আছে তার সেই মূল স্থান।
সুবর্ণ কর্ণিকা তার মাণিক কেশর। ক্রমে ক্রমে কুণ্ডলিকা দ্বিগুণ অন্তর।
এক বর্ণ রত্নে তার সম পত্র কৈলা। পঞ্চেন্দ্রিয়াহ্লাদ তুল্য পঞ্চ গুণ লৈলা॥
অতি সুশীতল মৃদু সৌরভ পূরিত। পরম নির্ম্মল আর মাধুর্য্যান্বিত॥
তাহার বাহিরে বদ্ধ সুবর্ণ মণ্ডলী। তাহার বাহিরে বান্ধা প্রবাল মণ্ডলী
তাহার বাহিরে শোভে মণি পদ্মরাগ। তাহার বাহিরে মণিস্ফটিকের ভাগ।
তাহার বাহিরে বান্ধা ইন্দ্রনীলমণি। পঞ্চরতন মণ্ডলীতে ভিতর সাজনি।
তাহার ভিতরে নানা রতনে বিনির্ম্মিত। দেবতা মনুষ্য পক্ষী মৃগাদি চিত্রিত।
স্ত্রীপুরুষ বিনির্ম্মিত দোঁহে এক ভাব। রস উদ্দীপনা করে যার যেই ভাব।
জামদগ্ন্য তুল্য সেই কুট্টিম-ভিতর। সহস্র-পত্র কর্ণিকার রসের আকার।
বায়ব্য দিশাতে তার অষ্ট কুঞ্জ আর। অষ্টদল শ্বেত পদ্ম পুষ্পের আকার॥
অশোক লতার পুষ্প আমূল হইতে। শ্বেতারুণ হরিত, পীত, শ্যাম পুষ্প সাতে।
প্রবীণ অশোক বৃক্ষ পুষ্প মনোরম। মধ্যে এক কুঞ্জ হয় কর্ণিকার সম।
বসন্ত সুখদা নাম অতি অনুপাম। এই ত কহিলে নয় কুঞ্জের বিধান॥
ভ্রমরগুঞ্জরে তথা কোকিলের ধ্বনি। অতি সুখ পান রাধা কৃষ্ণ যাহা শুনি।
ললিতা নন্দদা কুঞ্জের নৈঋত কোণেতে। শ্রীপদ্ম মন্দির আছে অপূর্ব্ব নির্ম্মিতে॥
ষোল পত্র পদ্ম তুল্য তাহার রচনা। কহিতে না জানি আমি মাধুর্য্য ঘটনা॥

নানা মণি বিরচিত তাহার চারি ভিত। বিচিত্র রচনা চতুর্দ্বার বিনির্ম্মিত॥
চারিদ্বার পাশে তার আছে গবাক্ষগণ। সেই দ্বারে গূঢ় লীলা দেখ সখীগণ॥
পূর্ব্বরাগ চেষ্টা হয়ে মন্দির ভিতর। রাসকুঞ্জ বিলাসাদি বিচিত্র প্রকার॥
পতনাদি বৈরিগণ বধ আদি যত। এই মত ভিতরে বিচিত্র নানা মত॥
নানা রত্ন বাহ্য তার কেশর সমান। মধ্যে যে মন্দির সেই কর্ণিকার ভাণ॥
যোল রত্ন কোঠা তাতে শোভে যোল পত্র। এই মত অপূর্ব্ব শোভা না শুনি অন্যত্র॥"

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে,—

"প্রথমে ত কৃষ্ণের লাবণ্য-ছটা সনে। ভূষণ অম্বর কান্তিছটা উছলনে॥
তৈছে গোপাঙ্গনা-অঙ্গ লাবণ্যের ছটা। তাহার ভূষণ বাস জ্যোতিঃপুঞ্জ ঘটা॥
নির্ব্বিশেষ জ্যোতিঃপুঞ্জ দেখি লোভ হৈল। সসংভ্রম হৈয়ে কিছু কহিতে লাগিল॥
নিজ-পর-প্রকাশক এই জ্যোতিঃপুঞ্জ। মনোনেত্র রসায়ন সর্ব্বজন-রঞ্জ॥
আমার মনেতে সদা রহুক জাগিয়া। তিল এক কভু যেন না ছাড়য়ে হিয়া॥
এতেক কহিতে অঙ্গ বিশেষ স্ফুরিলা। তাহার কারণে কিছু কহিতে লাগিলা॥
কুণ্ডলমণ্ডিত-গণ্ড অধরমাধুরী। মন্দ মন্দ হাস্য তাহে বচন চাতুরী॥
মাধুর্য্য প্রবাহে মগ্ন কৃষ্ণের আনন। দেখ দেখ স্বমাধুর্য্যে করয়ে মজ্জন॥
কহিতেই সমগ্র বিশেষ স্ফূর্ত্তি হৈলা। বিবরিয়া সেই কথা কহিতে লাগিলা॥
নবীন যৌবন বয়ঃ উদয় হইলা। চরম কৈশোর স্থির হইয়া রহিলা॥
চাচর-কেশর চূড়া তাতে মনোহর। তাহাতে বরিহা শোভে পরম সুন্দর॥
নটন গমনে মন্দ বাতাসে দোলয়। তাঁহার বিলাসে সদা ভুবন ভুলায়॥
বিম্বাধরে বিলাসে মুরলী মনোহর। স্বরভঙ্গী আলাপনে মাধুরী বিস্তর॥
কেবল অমৃত-ধ্বনি সদা বরিষয়। শুষ্ক-কাষ্ঠ আদিগণে জীবন রচয়॥
তাতে পীনস্তনী রহু গোপাঙ্গনাগণ। চুম্বন আলিঙ্গনে সদা করয়ে সেবন॥
তথা জগজন-মনে স্পর্শ-তৃষ্ণা হয়। হেন রূপ-শোভা সখি বর্ণন না হয়॥
গোপকিশোরীর মধ্যে রাধা গুণবতী। রাসমধ্যে দেখ কৃষ্ণের যাতে আর্ত্তি অতি॥
দুহুঁ স্কন্ধে দুহুঁ বাহু আরোপণ করি। অন্যোন্যে নাচয়ে সুখে সর্ব্ব মনোহারী॥
রাধাতেই কৃষ্ণ মন নয়ন বিলাসে। কার মনে সুখ যে না আইসে॥
এই ত কহিল শ্লোকের অন্তর্দশার অর্থ। বাহ্যদশা স্পষ্ট আছে সঙ্গী প্রতি সর্ব্ব॥
ত্রিজগতের শোভা এক অভিরাম রূপ। বৃন্দাবনে আছে সর্ব্ব মাধুর্য্যের ভূপ॥"

"ওহে কৃষ্ণ। তোমা না দেখিয়া।
এ রাত্রি দিবস মাঝে, যত ক্ষণবৃন্দ আছে, কৈছে আমি গোঙাব কাটিয়া॥
কোটিকল্প তুল্য মনে, হৈল মোর একক্ষণে, তোমা বিনু নারো গোঙাইতে।
হাহা তোমা দরশন, বিনা আমি ক্ষণগণ, তুমি বল গোঙাই কেমতে।
অধন্য সকল ক্ষণ, বিনা তোমা বিলোকন, এই কাল কাটা নাহি যায়।

কেমনে কাটাবে কাল, তুমি কহ সে বিচার, বিচারিয়া কহ ত উপায় ॥
যদি বল কামতাপে, তাপিত হইলা যবে, তবে যাহ নিজপতি ঠাঁই।
সেহ অন্বেষয়ে তোমা, আমা প্রতি দিয়া ক্ষমা, পতি সহ বিলাসহ যাই ॥
তবে শুন তার বাণী, পতি ছাড়াইলা তুমি, সে লাগি অনাথাগণ মোরা।
তুমি অনাথের বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু, দরশন দেহ আসি ত্বরা ॥
যদি বল পতি সেবা, ধর্ম্ম কেনে উপেখিবা, যোগ্য নহে সে সেবা ছাড়িতে।
তাতে দোষ নাহি মোর, সে দোষ হইবে তোর, মনেন্দ্রিয় হরি নিলা যাতে ॥
তবে যদি বল হেন, আমি বা তোমার কেন, ধর্ম্ম ছাড়াইব মন হরি।
চপলা কামিনী তোরা, আপনি হইয়া ভোরা, ধর্ম্ম ছাড়ি ফির মোহে হেরি ॥
তবে শুন তার বাণী, ধর্ম্মত্যাগী যদি আমি, তবে উদ্ধারিবে কেবা আর।
করুণাসমুদ্র তুমি, দেখ ধর্ম্ম ছাড়া আমি, কৃপা করি মোরে কর পার ॥"

জগদানন্দ।

জগদানন্দ,—সম্ভবতঃ ১৬২৪ শকে বর্দ্ধমান শ্রীখণ্ডের বৈদ্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম,—নিত্যানন্দ; পিতামহের নাম পরমানন্দ। জগদানন্দের অপর তিন সহোদরের নাম,—সর্ব্বানন্দ, কৃষ্ণানন্দ এবং সচ্চিদানন্দ। জগদানন্দ ভ্রাতৃগণ হইতে পৃথক হইয়া, যোফলাই গ্রামে বাসস্থাপন করেন। যোফলাই,—বীরভূম জেলায়, দুবরাজপুর থানা অন্তর্গত।

জগদানন্দ,—স্বপ্নে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর রূপ দর্শন করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ অদ্যাপি যোফলাই গ্রামে বিরাজিত। ১৭০৪ শকে বা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে—৫ই আশ্বিন বামন দ্বাদশীর দিন নন্দের দেহত্যাগ হয়। ইহাঁর স্মরণার্থ অদ্যাপি যোফলাই গ্রামে প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে।

র পদাবলী সুললিত শব্দ-সমৃদ্ধ। দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"মৌলি মিলিত শিখি-শিখণ্ড, চলকুণ্ডল ললিত গণ্ড,
জলধর জনু, জগমগ তনু, জগজন মনুহারী।
মদন-সদন বদন-ইন্দু, নিরখি যুবতী হৃদয়-সিন্ধু,
ছল ছল দিঠি, জল ছলে কি এ, উছলি পড়ত বারি ॥

খঞ্জন-গতি গরবভঙ্গ, অঞ্জন যুতনয়ন-কঞ্জ,
অবিচল কুল—কুল-যুবতিক—কুল টলমলকারী॥
হেরি অপরূপ রূপ-কূপ, নিরুপম রস-রসিক ভূপ,
কো হেন ধনি, ধূরব থিরজ, ধরিতি ধরিত্র পারি॥
মন্দ মন্দ বহ সমীর, তপন-তনয়া তটিনী-তীর,
গজপতি জিতি, সুললিত অতি, গতি চলু গিরিধারী॥
কেশরী জিনি ক্ষীণ মাঝ, পীন পীত বসন সাজ,
পদযুগে শশী, খসি পড়ে পশি, রহ দশরূপধারী॥
সুরপুর-বধূ পড়ল ধন্দ, সঘন খলত নীবি নিবন্ধ,
মনমথ-মন মথন মুরতি নিরখি বদন-কারী।
যাক লখিমী করত আশ, জগদানন্দ নবীন দাস,
রাতুল থল, জলরুহ-দল, পদতল বলিহারী॥"

শ্রীরাধার অভিশাপ" শুনুন,—

মঞ্জু বিকচ কুসুম পুঞ্জ, মধুপ শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ,
কুঞ্জর গতি গঞ্জি গমন মঞ্জল কুলনারী।
ঘন গঞ্জন চিকুর পুঞ্জ, মালতী-ফুল-মালে রঞ্জ,
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী, খঞ্জন, গতিহারী॥
কাঞ্চন রুচি রুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ,
কিঙ্কিণী কর কঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কৃত মনুহারী।
নাচত যুগ ভ্রূ-ভুজঙ্গ, কালি-দমন-দমন রঙ্গ,
সঙ্গিণী সব রঙ্গে বিহরে রঙ্গিল নীলসাড়ী॥
দশন কুন্দ-কুসুম নিন্দু, বদন জিতল শরদ ইন্দু,
বিন্দু বিন্দু ছরম ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী॥
ললিতাধরে মিলিত হাস, দেহ দীপতি তিমির নাশ
নিরখি রূপ রসিক ভূপ ভুলন গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতী বৃন্দ, হেরি হেরি পড়ল ধন্দ,
মন্দ মন্দ হসনানন্দ-নন্দনাসুখকারী।
মণি মাণিক নথ বিরাজ, কনক নূপুর মধুর রাজ,
জগদানন্দ থলজল-রুহ চরণক বলিহারী॥

জগদানন্দের আর একটী ভাবময় মধুর পদ শুনুন ;—

"সজনি গো! কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ, ব্যাধ-ছলে কদম্বের তলে॥
দিয়া হাস্য-সুধাধার, অঙ্গ ছটা আটা তার, আঁখি পাখি তাহাতে পড়িল।

মনোমৃগী সেই কালে, পড়িল রূপের জালে, শুধু দেহ-পিঞ্জর রহিল॥
গর্ব্বকালে মত্ত-হাতী, বাঁধা ছিল দিবা রাতি, ক্ষিপ্ত হইল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দক্ষের শিকল কাটি, চারিদিগে যায় ছুটি, পলাইয়ে গেল কোন্ দেশে॥
লজ্জাশীল হেমহার, গুরু গৌরব সিংহদ্বার, ধরম-কপাট ছিল তায়।
বংশীধর বজ্রাঘাতে, পড়ি গেল অকস্মাতে, সমভূমি করিল আমায়॥
কালিয় ত্রিভঙ্গবাণে, কুলমান হৈল খানে, ঘুচিল উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ শেষে আছে বাকি, তাহা বুঝি যায় দেখি, ভণয়ে জগদানন্দ দাস॥"

জগদানন্দ,—"ভাষা-শব্দার্ণব' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

গোবিন্দ কর্ম্মকার।

গোবিন্দদাস' নামেই ইনি পরিচিত। ইহাঁর কড়চা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। গোবিন্দদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন,—মহাপ্রভুর লীলা-কাহিনী তিনি বিশদভাবে লিখিয়া রাখিতেন। সেই সংগ্রহই পদ্যাকারে কড়চা। কড়চার বর্ণনা,—অতিরঞ্জন-দোষ-শূন্য, পরন্তু সরল ও মধুর।

বর্দ্ধমান-কাঞ্চননগরে গোবিন্দদাস জন্মগ্রহণ করেন। একদিন তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে কটু ভাষায় ভৎ'সনা করেন ; ইহাতেই তিনি সংসারে সাতিশয় বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠেন,—সেই দিনই গৃহত্যাগ করেন।

মহাপ্রভুর সঙ্গ পাইয়া কৃতার্থ হন। সন্ন্যাসী গোবিন্দদাসকে গৃহাশ্রমী করিবার জন্য, তাঁহার স্ত্রী বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু গোবিন্দ আর মোহে ভুলিবেন কেন ?

মহাপ্রভুর সহিত গোবিন্দদাসের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, মহাপ্রভু তখন স্নান করিবার জন্য গঙ্গাঘাটে উপস্থিত। গোবিন্দদাস কড়চায় লিখিয়াছেন,—

'কটিতে গামছা বাঁধা অদৃশ্য দর্শন। সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন।
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই। এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই॥
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া। দাড়ী পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥"

মহাপ্রভুর বাসভবন সম্বন্ধে গোবিন্দ দাস লিখিয়াছেন,—

"গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর। পাঁচ খানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
শান্তমূর্ত্তি শচীদেবী অতি খর্ব্বকায়। নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী। প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী॥
লজ্জাবতী বিনোদিনী মৃদু মৃদু ভাষ। মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস॥"

গোবিন্দের লেখনী-অঙ্কিত,—গৌরাঙ্গদেবের সাধন-মূর্ত্তিটী কি সুন্দর!—

"কি কব প্রেমের কথা কহিতে ডরাই। এমন আশ্চর্য্য ভাব কভু দেখি নাই॥
কৃষ্ণ হে বলিয়া ডাকে কথায় কথায়। পাগলের ন্যায় কভু ইতি-উতি চায়॥
কি জানি কাহারে ডাকে আকাশে চাহিয়া। কখন চমকি উঠে কি যেন দেখিয়া॥
উপবাসে কেটে যায় দুই এক দিন। অন্ন না খাইয়া দেহ হইয়াছে ক্ষীণ।
একদিন গুহামধ্যে পঞ্চবটী বনে। ভিক্ষা হতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥
নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন। মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারি জন॥
ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে বনের ভিতর। চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গোরাঙ্গসুন্দর॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজ-রাশি। ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥"

প্রেমদাস।

ইহাঁর রাশিনাম পুরুষোত্তম মিশ্র,—গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। নবদ্বীপের কুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে কাশ্যপগোত্রে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গঙ্গাদাস। বংশী-শিক্ষা গ্রন্থে প্রেমদাস লিখিয়াছেন,—

"কশ্যপ মুনির বংশ, বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র, নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, তাঁর পুত্র গঙ্গাদাসাখ্যান॥
তাঁর পুত্র ছয় ছিলা, তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা, তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম, রাধাচরণ মধ্যম, রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্মনিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম, মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম, গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি, নাম দিলা বিজ্ঞাবলী, কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥"

ষোল বৎসর বয়সেই ইনি গৃহ ত্যাগ করেন। নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, বৈরাগ্যব্রত প্রেমদাস অবশেষে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। কেহ বলেন,—তথায় তিনি ৺গোবিন্দ জীউর ভোগ রন্ধন করিতেন,—কেহ বলেন,—তিনি পূজারি হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর বৃন্দাবন-

বাসের পর, তাঁহার অগ্রজের আগ্রহে প্রেমদাস বাটী প্রত্যাগমন করেন; —এই সময়ে এক দিন তিনি স্বপ্নে চৈতন্যচন্দ্রের দর্শন পান। ইহার পর, তিনি কবিকর্ণপুর-প্রণীত সংস্কৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের পদ্যানুবাদ করেন। এই পদ্যানুবাদ-গ্রন্থ ১৬৩৪ শকে লিখিত। ১৬৩৮ শকে তিনি বংশী-শিক্ষা গ্রন্থ রচনা করেন। বংশী-শিক্ষায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে।
ষোল শত অষ্টত্রিংশ শকের গণন। শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা গ্রন্থ করিল বর্ণন॥"

প্রেমদাসের কয়েকটী পদ,—

দেশ-বরাড়ী।

কত কোটি চন্দ্র জিনি, উজোর বদন খানি, মল্ল ছাঁদে পরে নীল ধটী।
কর পদ সুরাতুল, জিনি কোকনদ ফুল, বিনোদরূপের পরিপাটী॥
বলাই মল্ল-বেশে আইলা বাথানে।
শ্রীকরে চম্পক বেড়া, চাচর চিকুরে চূড়া, শিখি-পুচ্ছ উড়িছে পবনে॥
কনক অঙ্গদ বালা, গলে বৈজয়ন্তী মালা, মকর কুণ্ডল এক কাণে।
কান্ধে শোভে শিঙ্গা বেত্র, ঘূর্ণিত রাতুল নেত্র, রাতা উৎপলে আর কাণে॥
বাথানে আসিয়া সুখে, শিঙ্গা দিল চাঁদমুখে, ডাকে শিঙ্গা ধাও ধাও বলি।
শুনিয়া শিঙ্গার রব, ধাইল ধবলী সব, মেলি গেল রাখাল মণ্ডলী॥
হাঁকি নিজ নিজ পাল, সব হয় নবিশাল, সবে মেলি করি এক ছাঁদ॥
বলাই রঙ্গিয়া বড়ি, হাতে ছিল হাজন ছুরি, চলিলা যেমন সোণার চাঁদ:
সকল রাখাল সঙ্গে, পরম কৌতুক রঙ্গে, তাল-বন পানে মন চায়।
রূপ গুণ বেশ দেখি, জুড়ায় তাপিত আঁখি, প্রেমদাস কি বলিবে তায়॥

করুণ ভাটিয়ারি।

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা, আনন্দে হইল ভোলা, দূর বনে গেল সব গাই॥
ধেনু না দেখিয়া বনে, চকিত রাখাল গণে, শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই, খেলা ভাঙ্গা হবে নাই, আনিব গোধন বেণু-রবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া, ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বারব করি, দাঁড়াইল কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, স্নেহে গবী শ্যাম অঙ্গ চাটে।
দেখি সব সখাগণ, আবা আবা বলে ঘন, কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী, কানাইর মুরলী শুনি, পশু পাখী পাইল চেতন॥

তিরোতা-সিন্ধুড়া।

মরকত-দরপণ, শ্যাম সুন্দর-ন্যায়, আপন মূরতি দেখি যাই।
গুরয়া কোপে, অধর ঘন কাঁপই, অরুণ নয়ান ভৈ যাই॥
দেখ দেখ কানুক রঙ্গ।
আনহি রমণী, হৃদয়ে করি বকই, ঐছন না দেখিয়ে ঢঙ্গ॥
যত অনুমানি, বিমুখ ভৈ বৈঠই, কানু সে পড়লহুঁ ধন্দ।
কাঁহে কমল-মুখি, মোহে উপেখসি, তুহু হাম নহ কিছু মন্দ॥
কত পরকারে, মিনতি করু মাধব, তব ধনী উত্তর না দেল।
দর দর হৃদয়, নয়ন-যুগ ছল ছল, মনমথে জর জর ভেল॥
চরণ-কমল করে, পরশি মাথে ধরু, সরস পরশ অভিলাষ।
তুয়া বিনু রাতি, দিবস নাহি জানত, কহতহিঁ প্রেমিক দাস॥

ইমন।

প্রতপ্ত নির্ম্মল স্বর্ণ, পুঞ্জ গঞ্জি গৌর-বর্ন, গৌরাঙ্গসুন্দর রূপ-ধাম।
জিনি রক্ত পদ্মদল, শ্রীপদযুগল-তল, দশাঙ্গুলি শোভে অনুপাম॥
শরদ-শশীর ঘটা, নিন্দি দশনখ-ছটা, তুঙ্গ গুলফ জঙ্ঘা মনোহর।
সুবর্ণ সম্পুটাকার, জানু-যুগ রূপাধার, রম্ভা-রুচি উরু চারুতর॥
প্রসন্ন নিতম্ব স্থল, তাহে শুক্ল পট্টাম্বর, কাঁকলি কেশরী জিনি
অশ্বত্থ-পত্রের হেন, উদর বলিয়া তেন, বক্ষদেশ তুঙ্গ অতি পীন॥
জানু-দেশ-বিলম্বিত, হেমার্গল-সুবলিত, বাহু-যুগ্ম অঙ্গদ-ভূষিত।
কর-তল সুরাতুল, জিনিয়া জবার ফুল, মাধুরীতে ভুবন মোহিত।
দশ- নখ চন্দ্র আগে, শুক্লবর্ণ মূল-ভাগে, দশ অর্দ্ধচন্দ্রের আকার।
সিংহ গ্রীব তিন রেখা, তাহাতে দিয়াছে দেখা, অধর বন্ধুক পুষ্পাক
সুবর্ণ-দর্পণ জিতি, গণ্ডস্থল-যুগ্ম [illegible]তি, মুক্তা-পাঁতি জিনি দন্তাবলী।
নাসা তিল-পুষ্প জয়, ভুরুযুগ কামধনু, সালক সুন্দরালীস্থলী॥
অমল কমল আঁখি, তারা যেন ভৃঙ্গপাখী, অনুরাগে অরুণ সজল।
কামের কামান গুণ, শ্রুতিযুগ সুগঠন, তাহে শোভে মকর-কুণ্ডল॥
স্নিগ্ধ সুক্ষ্ম বক্র শ্যাম, কুন্তল লাবণ্যধাম, নানা ফুল মঞ্জুল সাজনি।
বদন কমলে হাস, কোটি-কলা-নিধি-ভাস, কুন্দবৃন্দ করিয়ে নিছনি॥
ভুবনমোহন অঙ্গ, তাহে নটবর-ভঙ্গ, নৃত্য কৃত্য ভৃত্য গানকলা।
দুবাহু তুলিয়া যবে, ভাব ভরে কিয়ে তবে, উঠে যেন অনন্ত চপলা॥
এই রূপ দেখে যেই, ধর্ম্মাধর্ম্ম ছাড়ে সেই, প্রবেশয়ে পরম আনন্দে।
প্রেমদাস জীব দে[illegible] ধর্ম্মাধর্ম্ম ছা[illegible] সহ, গুণ শুনি গৌরপদ দ্বন্দ্বে॥

নরহরি চক্রবর্ত্তী।

ইঁহার বিরাট গ্রন্থ,—ভক্তি-রত্নাকর। ইনি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। যথা,—প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গৌরচরিত-চিন্তামণি, ছন্দ-সমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাস-চরিত।

গঙ্গাতীর-বাসী। ইঁহার পিতার নাম,—জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য।

ইঁহার গৌরচরিত-চিন্তামণি যেন কিন্নর-কণ্ঠের মধুর সঙ্গীত;—

নিশি গত শশি-দরপ দূরে। অতিশয় দুঃখে চকোর ফিরে॥
পতি-বিড়ম্বন লজ্জিত মনে। লুকাইল তারা গগন-বনে॥
নদীয়ায় লোক জাগিল ত্বরা। উঠ বলি শেজ তেজহ গোরা॥
ময়ূর-ময়ূরী পৃথক্ আছে। কেহ না আইসে কাহারো কাছে॥
ভ্রমর-ভ্রমরী রুচির কুঞ্জে। ভুলি না বৈসয়ে কুসুম-পুঞ্জে॥

ভক্তি-রত্নাকর পঞ্চদশ তরঙ্গে গ্রথিত। গ্রন্থকার বলিতেছেন,—

"গ্রন্থ নাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তি-রত্নাকর। বিবিধ তরঙ্গ ইথে অতি মনোহর॥
শ্রীভক্ত গোষ্ঠীর পাদপদ্ম ধরি শিরে। সতত ডুবহ এই ভক্তিরত্নাকরে॥
ভক্তের সম্পত্তি ভক্তি কহে সর্ব্বজন। ভক্তি দিলে মিলে এই ভকতি-রতন॥
জয় জয় ভক্তি-দেবি কৃপা কর দীনে। অভিলাষ পূর্ণ নহে ভক্তি-স্পর্শ বিনে॥
বহু জন্ম করে যদি বিবিধ সাধন। তথাপি দুর্লভ কৃষ্ণপদে ভক্তিধন॥
প্রভুপদে সে ধন পাইতে যার সাধ। সে করুক নিরন্তর ভক্তিরসাস্বাদ॥
ভক্তিরত্ন যত্ন করি রাখহ হিয়ায়। সবায় প্রধান ভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥"

ভক্তি-রত্নাকরের পঞ্চদশ তরঙ্গের বিষয়-বিবরণ ভক্তি-রত্নাকর হইতেই শুনুন,—

"পঞ্চদশ তরঙ্গ শ্রী-ভক্তি-রত্নাকরে। যে তরঙ্গে যে বিলাস কহি অল্প স্বরে॥"
প্রথম তরঙ্গে কৈনু মঙ্গলাচরণ। শ্রীজীব গোসাঞীর পূর্ব্ব-পুরুষ কথন
গোস্বামিগণের যত গ্রন্থ নাম তার। শ্রীনিবাসাচার্য্যের জ—
দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস। নীলাচলে গেলা পূর্ণ হৈল অভিলাষ॥
শ্রীনিবাস-জন্ম পিতা পুত্রে বহু কথা। বৃন্দাবনে গোবিন্দ প্রকট হৈল যথা॥
তৃতীয় তরঙ্গে ক্ষেত্রে আচার্য্য চলিলা। শ্রীচৈতন্য-সঙ্গোপন শুনি দগ্ধ হৈলা॥
নীলাচলে গেলা স্বপ্নে প্রভুর-আদেশে। প্রভুগণ কৃপা কৈল আইলা গৌড়দেশে॥
চতুর্থ-তরঙ্গে গৌড়ে আচার্য্য ভ্রময়। শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়ার কৃপা হৈল অতিশয়॥

প্রভু পরিকর মহা-অনুগ্রহ কৈল। বৃন্দাবন গমনাদি ইহাতে বর্ণিল॥
পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস নরোত্তম। শ্রীরাঘব সঙ্গে কৈল ব্রজেতে গমন॥
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত তিনের বিহার। মধ্যে মধ্যে হৈল নানা প্রসঙ্গ প্রচার॥
ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ ব্রজে গেলা। মদনগোপাল গোবিন্দের প্রিয় আইলা॥
শ্রীনিবাস লৈয়া গোস্বামীর গ্রন্থগণ। বিদায় হইয়া গৌড়ে করিলা গমন॥
সপ্তম তরঙ্গে গ্রন্থ চুরি বিষ্ণুপুরে। আচার্য্যানুগ্রহ রাজা শ্রীবীর হাম্বিরে॥
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল উৎকলে গমন। বিবিধ-প্রসঙ্গ ইথে কর্ণ-রসায়ন॥
অষ্টম তরঙ্গে শ্রীঠাকুর মহাশয়। শ্রীগৌর ভ্রমিয়া ক্ষেত্র করিলা বিজয়॥
ক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রীআচার্য্যে মিলিল। শ্রীআচার্য্য রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কৈল॥
নবম তরঙ্গে ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিয়া। শ্রীআচার্য্য আইল পুন বৃন্দাবন গিয়া॥
আর যে প্রসঙ্গ এথা হৈল প্রচার। সে সব শুনিতে ধৈর্য্য ধরে শক্তি কার॥
দশম তরঙ্গে গ্রাম কাঞ্চন-গৈড়ায়। হইল যে মহোৎসব কহনে না যায়॥
শ্রীখেতরি গ্রামে মহা-মহোৎসব হৈল। গণসহ গৌর সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য কৈল॥
একাদশ তরঙ্গে শ্রীখেতরি গ্রামেতে। শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আইলা ব্রজ হৈতে॥
ঈশ্বরী গমন হৈল একচক্র দিয়া। শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণিলেন খড়দহে গিয়া॥
দ্বাদশ তরঙ্গে আচার্য্যাদি তিন জন। শ্রীঈশান-সঙ্গে কৈল নদীয়া ভ্রমণ॥
হৈল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যাতে। প্রভু নিত্যানন্দে বিবাহ আদি ইথে॥
ত্রয়োদশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। দ্বিতীয় বিবাহ কৈল কৌতুক প্রচুর॥
প্রভু বীরচন্দ্র করি বিবাহ উল্লাসে। গণসহ ব্রজে গিয়া আইলা গৌড়দেশে॥
চতুর্দ্দশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য্য গণসনে। কৈলা মহা মহোৎসব বোরাকুলি গ্রামে॥
সঙ্কীর্ত্তনে হইলা নিমগ্ন নিরন্তর। ইথে আর বিবিধ প্রসঙ্গ মনোহর॥
পঞ্চদশ তরঙ্গে প্রকাশ মহানন্দ। গণসহ উৎকলে বিলাস মহানন্দ॥
মহা মহা পাষণ্ডিরে কৈল ভক্তিদান। এ সব প্রসঙ্গ আস্বাদয়ে ভাগ্যবান্॥
ভক্তি-রত্নাকর গ্রন্থ পরম সুরস। আস্বাদহ নিরন্তর না কর অলস॥

ইনি বহুসংখ্যক সুমধুর পদ গ্রন্থনও করিয়াছেন। কিছু পরিচয় লউন;—

বেলাবলী।

বলি-কলিদমনশমনভয়ভঞ্জন, নিখিল, ভুবন-জনরঞ্জনকারী।
দুলহ প্রেমধন বিতরণ পণ্ডিত, সুরতরুনিকর-গরব-অপহারী॥
নাচত শচীসুত কীর্ত্তন-মাঝ।
কনক-ধরাধর নিন্দি রুচির তনু, বিলসত জনু নব মনমথরাজ॥ ধ্রু॥
পদতল-তালে ধরণী করু টলমল, ললিত ভঙ্গী ভুজ যুগত পসারি।
হাসত মৃদু মৃদু, অধর কম্প অতি, অথির গদাধর বদন নেহারি॥
ডগমগ নয়ন কমল ঘন ঘুরত, নিরুপম পুরব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ, ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস॥

কামোদ।

নাচে গোরা গুণমণি, কেবল প্রেমের খনি, প্রিয় পরিকর চারি পাশ।
শোভা অপরূপ হেন, উড়ুগণ মাঝে যেন, কনক-চন্দ্রমা পরকাশ॥
শিরীষ-কুসুম জিনি, সুকোমল তনুখানি, পুলক বলিত মনোহর।
প্রফুল্ল কমল দূরে, বদনে মদন ঝুরে, হাসি-মাখা অরুণ অধর॥
কত না ভঙ্গিমা করি, ভুজ তুলি বোলে হরি, বরিষে অমিয়া অনিবার।
অতি সকরুণ হিয়া, পতিতেরে নিরখিয়া, আঁখি বহে সুরধুনী ধার॥
বাজে খোল করতাল, চন্দন চাননি ভাল, দেখি কে বা না হয় মোহিত
না রহিল দুখ শোক, মাতিল সকল লোক, নরহরি এ সুখে বঞ্চিত॥

সুহই।

নাচত নটবর গৌরকিশোর। অভিনব ভঙ্গী ভুবন কর ভোর॥
ঝলমল অঙ্গ-কিরণ অনুপাম। হেরইতে মুরছত কত কত কাম॥
টলমল লোচনযুগল বিশাল। দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল॥
ঝরত অমিয় বিধু-বরণ চকোর। পীবই নয়ন ভরি ভকত-চকোর॥
ঘন ঘন বোলয়ে মধুর হরিনাম। শুনইতে কো ন রোয়ই অবিরাম॥
পামর পতিত প্রেমজলে মাতি। না দ্রবে কঠিন এ নরহরি ছাতি॥

সঙ্করাভরণ।

ভুবনমোহন গৌর নটবর, ব্রজমোহন রসিকশেখর,
আজু রঙ্গিণী বেশে কর নব নৃত্য, নিরুপম রাজয়ে।
অঙ্গ রুচি জিনি কনক দরপণ, করত ঝলমল ললিত চিকণ
রুচির পরম বিচিত্র পহিরণ, বিবিধ অংশুক সাজয়ে॥
চিকুরচয় কমনীয় বন্ধন, যোরি মৃগমদ চিত্রচন্দন,
সরস লসত ললাট তট মণি, বঙ্কনী মন মোহয়ে।
কর্ণভূষণ তরল মৃদুতর, গণ্ডযুগ জনু ভ্রমর ভূরুবর,
কঞ্জ লোচন মঞ্জু অঞ্জন, রঞ্জিতাধিক শোহয়ে॥
বিম্বফলাধিক বন্ধুরাধর, নাসিকা শুক-চঞ্চু বেশর,
বলিত বয়ন-মরম দশন মুকুল মদভরভঞ্জন।
কম্বু অঙ্কিত বঙ্ক মৃদুতর, হার রতন অনঙ্গ-ধৃতি-হর,
শঙ্খ সরুকর কঙ্কণাঙ্গুলি অঙ্গুরী জনু রঞ্জন॥
অতুল উদর সুঠাম রস ঝরু, নবীন কেশরি-গৌরব দূর কর,
ক্ষীণ মধ্য সুমধুর মাধুরী, কনক কিঙ্কিণী রাজয়ে।
ভঙ্গী সঞে পদ ধরণী ধর যব, অতিহি কোমল হোত ক্ষিতি তব,
নিছুই নরহরি-জীবন ঘন মঞ্জীর রুনুঝুনু বাজয়ে॥

রাজা নৃসিংহ দেব।

ইনি পণ্ডিত;—ইনি বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্ত্তা; পদসমুদ্রে বিস্তর পদ সন্নিবিষ্ট। ইনি ক্ষত্রিয় ছিলেন। "সারাবলী" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"আচার্য্য প্রভুর শিষ্য নৃসিংহ রাজন্। পরম পণ্ডিত হয় ভক্তি-পরায়ণ॥
পূর্ব্ব পুরুষ হইতে মানভূমে স্থিতি। পদকর্ত্তা বলিয়া সর্ব্বত্র যাঁর খ্যাতি॥"

বাঁকুড়া—বিষ্ণুপুরপতি রাজা বীর হাম্বিরের সহিত নৃসিংহদেবের সবিশেষ সখ্য ছিল। বীর হাম্বির ইঁহাকে আদিবন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। বিশেষ অন্তরঙ্গ এবং স্বগুরুর শিষ্যই,—"আদিবন্ধু"—বাচ্য।

রাজা নৃসিংহ দেব তোটকছন্দেই অধিকাংশ পদ লিখিয়াছেন। ইঁহার পদ বড় মধুর,—

"নব নীরদ নীল সুঠাম তনু। শ্রীমুখাকৃত ঝলমল চাঁদ জনু।
শিরে কুঞ্চিত কুন্তলবন্ধ ঝুটা। ভালে শোভিত গোময় চিত্র কোঁটা॥
অধরোজ্জ্বল রঙ্গিম বিম্ব জানি। গলে শোভিত মতিম হার মণি॥
ভুজলম্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া। নখচন্দ্রক-পর্ব্ব বিধুগুনয়া॥
হিয়ে হার কর নখ রত্নে যোড়া। কিট কিঙ্কিণী ঘাঘর তাহে মোড়া॥
পাদ নূপুর বক্ষরাজ সুশোভে। কল পঙ্কজে বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ-বালক মাখন লেই করে। সবে খাওত দেওত শ্যাম করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে। পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥"

আউলিয়া মনোহর দাস।

ইনি বিস্তর সুমধুর পদগ্রন্থন করিয়াছেন। পদ-সমুদ্র ইঁহার বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ। প্রায় দেড় সহস্র পদ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট।

মনোহর দাস,—হুগলী জেলার অধীন বদনগঞ্জে পাঠ নির্দ্দেশ করেন। বদনগঞ্জে অদ্যাপি ইঁহার সমাধি বিদ্যমান। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে এই স্থানে মেলা হইয়া থাকে।

মনোহর দাস যখন বদনগঞ্জে আসিয়া বাস করেন, তখন সে স্থান জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই জঙ্গলে একখানি পত্রকুটীর বাঁধিয়া, মনোহর দাস সেই কুটীরে বাস করিতেন; পরে বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির জঙ্গল কাটাইয়া, জনপদ স্থাপন করেন।

মনোহর দাস,—তেজঃপুঞ্জশালী সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। ইনি সখীভাবে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিতেন; হাতে সোনার বালা, কানে কানবালা এবং নাকে নোলক পরিতেন; কাঁচলি কষিতেন,—খোঁপা বাঁধিতেন,—কাজল পরিতেন; ঘাঘরা-উড়ানি ব্যবহার করিতেন; পাঁয়জোর পরিয়া নাচিতেন। ১৩০০ সালের কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে পরলোকগত হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"মনোহর দাস সাধন-বলে আড়াই শত বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিলেন।" ইনি বহুবার বৃন্দাবন-তীর্থ পর্য্যটন করেন।

ইহাঁর দুইটী পদ শুনাইতেছি। একটী পদে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর প্রতি আক্ষেপ করিয়া, মনোহর দাস বলিতেছেন,—

"শ্যামের মুরলী, হৃদয় খুরলী, করিলি সকল নাশ।
মোহর মিনতি, না শুনি আরতি, বাজিতে করই আশ॥
শুন শুনরে ধরম-নাশা।
দৈব আরাধিয়া, ও মুখ বাঁধিব, ঘুচাব তোমার আশা॥
আমরা অবলা, সহজে অখলা, দেখিয়া তোমার লোভ।
অলপে অলপে, সকল হইয়া, জীবনে করহ ক্ষোভ॥
এখন আমরা, সতর হইনু, তেজহ সকল আশ।
যাহার যে রীতি, না ছাড়ে কখন, কহে মনোহর দাস॥"

সোনাতন গোস্বামীর গুণ-প্রসঙ্গ,—

॥

জয় জয় পহুঁ শ্রীল সনাতন নাম। সকল ভুবন যাহা যছু গুণগ্রাম।
তেজল সকল সুখ সম্পদ পায়। শ্রীচৈতন্য-চরযুগল কর সার॥
শ্রীবৃন্দাবন-ভূমে করি বাস। লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ॥
শ্রীগোবিন্দসেবা পরচারি। করল ভাগবত অর্থ বিচারি॥
যুগল ভজনলীলা গুণ নাম। করল বিথার গ্রন্থ অনুপাম॥
সতত গৌরপ্রেমে গর গর দেহ। ভ্রমই বৃন্দাবনে না পাওই থেহ॥
বিপুল পুলক ভর নয়ন নীর॥ রাই কানু বলি পড়ই অথির॥

ভাব-বিভূষণ সকল শরীর। অনুখন বিহরই যমুনাতীর॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই। ভাবই মনোহর সোই গোসাঞী॥

লালদাস বাবাজী।

ভক্তমাল ইহাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ,—সাতাইশ মালায় অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহাতে প্রসিদ্ধ ভক্তবৃন্দের জীবনী লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থ পদ্যময়: কবি নাভাজী হিন্দী-ভাষায় ভক্তমাল গ্রন্থ রচনা করেন; প্রধানতঃ সেই গ্রন্থ অবলম্বনেই নাভাজীর এই বাঙ্গলা কবিতা-গ্রথিত ভক্তমালগ্রন্থ।

কলিকাতা-সিমুলিয়া-নিবাসী প্রভুপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় ভক্তমাল গ্রন্থের একটী উৎকৃষ্ট সংস্করণ সম্পাদন করিয়াছেন। সম্পাদকীয় বক্তব্যে তিনি লিখিয়াছেন,—"ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিবিধ তত্ত্ববিষয়, ভক্তচরিত্রের আনুষঙ্গিক। এই জন্য এই বাঙ্গলা ভক্তমাল গ্রন্থ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—একটী চরিত্র বিভাগ, আর একটী তাত্ত্বিক বিভাগ। চরিত্র বিভাগটি প্রধানতঃ নাভাজীকৃত হিন্দী ভক্তমাল ও তাহার প্রিয়াদাসকৃত টীকা হইতে, আর তাত্ত্বিক বিভাগটী উক্ত গ্রন্থদ্বয় এবং শ্রীহরিভক্তি-বিলাস, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, ষটসন্দর্ভ, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি অপরাপর বহুতর ভক্তি শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত।" ফলকথা, এ গ্রন্থ ভক্তের অতি-প্রিয় সামগ্রী।

ভক্তমালে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত-বর্ণনা,—

শ্রীমান রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী। প্রচণ্ড বৈরাগ্য যাঁর মহাভক্ত প্রেমী॥
অনুরাগ পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা-গোবিন্দে। দিবানিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাবলে বৈরাগ্য জন্মিল। পিতার যে রাজ্যাম্পদ তাহে ঘৃণা হৈল॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত। বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে। যাইয়া প্রপন্ন হইবারে হৈল মনে॥
নিকষিয়া যায় পুন পুন ধরি আনে। পিতামাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে।

নবলক্ষের রাজ্যাস্পদ সোঁপিল তাঁহারে। অপ্সরার তুল্য যে যুবতী নারী ঘরে॥
তথায় রাখিতে নারে কৃষ্ণ অনুরাগে। সে সকল তুচ্ছ করি বিষয়ভয়ে ভাগে॥
অনেক পহরা চৌকি রাখিয়া হারিল। শেষে রজ্জু দিয়া হাত বাঁধিয়া রাখিল॥
রঘুনাথ উৎকণ্ঠাতে গৌরাঙ্গ বলিয়া। উচ্চস্বরে কান্দে সাধু ভূমেতে পড়িয়া॥
কেহ শিষ্ট লোক কহে অনুচিত ইহ। নির্ব্বোধ তোমরা কেহ বুঝিতে নারহ॥
এ হেন ঐশ্বর্য্য আর এ যুবতী নারী। হেন রজ্জু ছিণ্ডে যেই তারে হরি হরি॥
পট্টরজ্জু দিয়া কি বাঁধিয়া রাখা যায়। কেন বৃথা বান্ধ, খুলি দেহ হায় হায়॥
এত শুনি বন্ধন খুলিয়া নিজ জন। অনেক বুঝায় সভে করিয়া ক্রন্দন॥
তেঁহো হেঁটমাথে রহে কিছু নাহি কহে। গৌরাঙ্গ-হৃদয়ে যথা গ্রহ চাপে দেহে।
লোক চৌকি রাখি সভে সতর্ক রহিল। রাত্রিযোগে রঘুনাথ উঠি পলাইল॥
অতি উৎকণ্ঠিত মন উন্মত্তের প্রায়। দিগ বিদিগ নাহি ফিরিয়া তাকায়॥
জল কি জঙ্গল তৃণ কণ্টক শর্করা। নাহি মানে ধায় মাত্র বাউলের পারা॥
বারো দিনে উত্তরিলা শ্রীপুরুষোত্তম। তার মধ্যে তিন সন্ধ্যা আহার যে নাম॥
পুরুষোত্তম গিয়া শ্রীমান্ চৈতন্যচরণে। পড়িলা হঠাৎ গিয়া করিয়া ক্রন্দনে॥
হে নাথ হে প্রভো হে হে করুণা নিধান। কৃপা কর শ্রীচরণে লইনু শরণ॥
অনাথ অধম মুঞি গতিহীন দীন। কৃপাবলোকন কর জানিয়া অধীন॥
শ্রীচরণতলে পড়ি ধূলায় ধূসর। স্তুতি নতি করে অতি কাতর অন্তর॥
কাতর দেখিয়া প্রভুর দয়া উপজিল। মুচকি হাসিয়া তুলি আলিঙ্গন কৈল॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তবে প্রেমভক্তি দিল। নিজ পারিষদে প্রভু প্রধানে গণিল॥
শ্রীমান্ দাস রঘুনাথ নাম হৈল খ্যাত। পরম বৈরাগ্য কৃষ্ণপ্রেমে উনমত॥
সিংহদ্বারি থাকি কৈল অযাচক বৃত্তি। কথো দিনে তাহা ছাড়ি কৈল কিছু যুক্তি॥
শড়া মহাপ্রসাদ যাহা বুভুক্ষে ডারয়ে। ধুইয়া তাহার মধ্যে কণা যে থাকয়ে॥
তাহাই আহার মাত্র প্রাণরক্ষা কাজে। বিষয় সুখের লেশমাত্র নাহি সুজে॥
প্রভু তাহা শুনি অতি আনন্দিত হঞা। প্রশংসেন অন্য ভক্তগণে শুনাইয়া॥
প্রভুর আজ্ঞায় দাস গোসাঞি মহান্। কথো দিনে কৈল বৃন্দাবনেরে গমন॥
শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে করিলেন বাস। দিবানিশি সদা রাধাকৃষ্ণ প্রেমোল্লাস॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি লাগি সদা উৎকণ্ঠিত। সদা হাহাকার ক্ষণে স্থির নহে চিত॥
হে হে বৃন্দাবনেশ্বরি হে ব্রজনাগর। দেখাইয়া শ্রীচরণ প্রাণ রাখ মোর॥
নিদ্রাহার নাহি সদা করয়ে ফুৎকার। বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাহি সদা যেন মাতোয়ার॥
দাস গোস্বামীর পূর্ব্বাপর যত লীলা। কহিতে নারি এ কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা॥

"ভক্তমাল" গ্রন্থে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রস-গীত ;—

"রাধাকুণ্ড তীরে কুঞ্জ, কল্পলতিকা পুঞ্জ, পুষ্পশ্রেণী পরম সুন্দর।
সৌরভে আমোদ অতি, নানা বর্ণে নানা জ্যোতি, ঝাঁকে ঝাঁকে গুঞ্জরে ভ্রমর॥

তার মধ্যে রাধাশ্যাম, দুহুঁ রূপ অনুপাম, ত্রিভুবন যাহার নিছনি।
শ্যাম নব কাদম্বিনী, রাই তাহে সৌদামিনী, কিংবা হেম-জড়া নীলমণি॥
কিংবা স্বর্ণ কুবলয়, ভ্রমর পশিয়া তায়, মধুপান করয়ে উল্লাসে।
কিংবা পূর্ণ সুধাকর, উগারি অমৃতধার, প্রকাশয়ে নবঘন পাশে॥
হাসির অমৃতধার, দোঁহে দোঁহা পরস্পর, পান করি আনন্দিত হিয়া।
রসিক নাগর হেরি, রসিকা কিশোরী গোরী, মত্ত রস-সাগরে ডুবিয়া॥
শ্যাম শ্রীঅঙ্গের শোভা, রাই শ্রীবদনে আভা, রাই প্রতিবিম্ব শ্যাম-অঙ্গে।
পরম আশ্চর্য্য হেরি, সখীগণ ঠারাঠারি, করিয়া দেখয়ে রস-রঙ্গে॥
কিশোর বয়েস শ্যাম, কিশোরী রূপের ধাম, দোঁহা রূপে করিয়াছে আলো।
পরম আনন্দে রমে, কিশোরী কিশোর বামে, অপরূপ সাজিয়াছে ভালো॥
পরিহাস রস-রঙ্গ, নানা রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ, প্রিয়া সঙ্গে আনন্দ-হিল্লোলে।
হাসি হাসি কহে বাণী, কি শোভা তাহাতে জানি, গজমতি দোলে নাসাতলে॥
তা দেখি নাগর বরে, দেহ না ধরিতে পারে, রসে ডুবি আপনা পাসরে।
শত শত চুম্বে মুখ, পাইয়া পরম সুখ, লালদাস আনন্দ অন্তরে।

মাধবী দেবী।

নীলাচল-নিবাসিনী;—গৌরাঙ্গের প্রেমানুরাগিণী;—ইহাঁর পরিচয়,—চরিতামৃতে,—

"মাধবী দেবী শিখি মাহিতীর ভগিনী। শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যার নাম গণি॥"

কবিরাজ গোস্বামী, চৈতন্য-চরিতামৃতের অন্যত্র লিখিয়াছেন,—

"শিখি মাহিতীর ভগ্নী শ্রীমাধবী দেবী। বৃদ্ধা তপস্বিনী তেঁহ পরমা বৈষ্ণবী॥"

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পর স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করিতেন না; কাজেই, মাধবী দেবী গোপনে থাকিয়াই গৌরাঙ্গের গৌর-কান্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিতেন। মাধবী দেবী একটী গানে বলিয়াছেন,—

"যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে। মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্মদোষে॥"

ইহাঁর রচিত পদসমূহ অতীব প্রাঞ্জল। শ্রীমহাপ্রভুর নীলাচল গমনে মাধবী লিখিয়াছেন,—

"কলহ করিয়া ছলা, আগে পহু চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল রায়।
যতেক ভকতগণ, হৈয়া সকরুণ মন, পদচিহ্ন অনুসারে ধায়॥

নিতাই বিরহ অনলে ভেল অন্ধ।
আঠারনালাতে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, যায় নিতাই অবধৌত চন্দ্র ॥
সিংহ দুয়ারে গিয়া, মরমে বেদনা পাইয়া, দাঁড়াইলা নিত্যানন্দ রায়।
হরেকৃষ্ণ হরিবোলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে, নীলাচলবাসীরে সুধায় ॥
জাম্বুনদ হেম জিনি, গৌরাঙ্গ বরণখানি, অরুণ বসন শোভে গায়।
প্রেমভরে গর গর, আঁখি-যুগ ঝর ঝর, হরি হরি বোল বলি ধায় ॥
ছাড়ি নাগরালী বেশ, ভ্রমে পহু দেশ দেশ, এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ।
মাধবী দাসীতে কয়, অপরূপ গোরা রায়, ভট্টগৃহে করল প্রবেশ ॥"

নবদ্বীপ-চাঁদ-বিরহে নবদ্বীপের অবস্থা,—

"নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ।
রহি কথো দূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছন্দ ॥
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়।
পাই কি না পাই, শচীর দেখিতে, এই অনুমানে চায় ॥
লতা তরু যত, দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা।
র কিরণ, না হয় স্ফুটন, মেঘগণ দেখে রাতা ॥
ডালে বসি পাখী, মুদি দুটী আঁখি, ফুল জল তেয়াগিয়া।
কান্দয়ে ফুকারি, ডুকরি ডুকরি, গোরা চান্দ নাম লৈয়া ॥
ধেনু যূথে যূথে, দাঁড়াইয়া পথে, কার মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসীর, পণ্ডিত ঠাকুর, পড়িলা আছাড়ে গা ॥"

ব্রজেশ্বরের মিলন-মোহ,—

"পরশিতে রাই তনু, আপনে ভুলল কানু, মুরছি পড়ল ধনী কোর।
শ্যামক হেরইতে, ধনী ভেল গদ গদ, চরকি চরকি বহে লোর ॥
শ্যাম মুরছিত হেরি, চকিতে ললিতা ফেরি, রাধামন্ত্র শ্রুতিমূলে দেল।
অঙ্গ মোড়াইয়া কানু, নিরখই রাই-তনু, হেরি সখি চমকিত ভেল।
চিত্র-পুতলী যেন, বেঢ়ল সখীগণ, নিরখই শ্যাম মুখচন্দ ॥
কি ভেল কি ভেল বলি, ধাওল বিশাখা আলী, সব জনে লাগল ধন্দ ॥
শ্যামর সুন্দর, বদন-সুধাকর, সুমুখী নেহারই সাধে।
উপজল উল্লাস, কহই মাধবী দাস, বিদগধ মাধব রাধে ॥

রায় শেখর।

ইঁহার জন্মভূমি বর্দ্ধমান জেলার পড়ানগ্রাম। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন গোস্বামী ইঁহার দীক্ষা-গুরু। ইনি নিত্যানন্দ বংশীয়। কেহ বলেন,—ইঁহার প্রকৃত নাম শশিশেখর; কেহ বলেন চন্দ্রশেখর। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাসের পরবর্ত্তী কবি। ইঁহার তিনটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

তুড়ী।

হাটের পত্তন, শ্রীশচীনন্দন, করল পাইয়া সুখ।
হাটের ঠাকুর, নিতাই সুন্দর, খণ্ডিল জীবের দুখ॥
দেখ হাট মনোহর রঙ্গ।
নরহরি দাস, হাটের বিশ্বাস, শ্রীনিবাস তার সঙ্গ॥ ধ্রু॥
আর অদ্ভুত, ঠাকুর অদ্বৈত, মুনসি হাটের মাঝ।
হরিদাস আদি, ফিরে হাট সাধি, রামানন্দ সত্যরাজ॥
করতাল যত, বাদ্য বাজে কত, মৃদঙ্গ কাহার ঢোল।
হাট কলরব, নৃত্য গীত সব, ঘন ঘন হরিবোল॥
প্রেমের পসার, লৈয়া গদাধর, সঙ্গে পসারির গণ।
রায় রামানন্দ, মুরারি মুকুন্দ, বাসুদেব সুলোচন॥
সনাতন রূপ, পণ্ডিত স্বরূপ, দামোদর যার নাম।
বসু রামানন্দ, সেন শিবানন্দ, বক্রেশ্বর গুণধাম॥
পণ্ডিত শঙ্কর, আর কাশীশ্বর, মুকুন্দ মাধব দাস।
রঘুনাথ আদি, গুণের অবধি, পূরল মনের আশ॥
কত নাম নিব, পসারি এ সব, পসার লইয়া কাছে।
পসার ভূষণ, পুলক রোদন, মহাভাব আদি আছে॥
হাটের হাটুয়া, ভকত নাটুয়া, পসারি মহিমা জানি।
দৈন্য দান দিয়া, সে প্রেম আনিয়া, সদা করে বিকি-কিনি॥
হাটের কোটাল, ঠাকুর গোপাল, দানঘাটী গোপীনাথ।
হাটের পালন, শ্রীরঘুনন্দন, করেন সুন্দর সাথ॥
দিবা রাতি নাই, বাজার সদাই, সে যার সে প্রেম পায়।
প্রেমের পসার, করল বিথার, শচীর দুলাল রায়॥
ভাঙ্গিল আকাল, মাতিল কাঙ্গাল, খাইয়া ভরল পেট।

দেখিয়া শমন, করয়ে ভাবন, বদন করিয়া হেট।
জরা-মৃত্যু নাই, আনন্দ সদাই, শোকভয় নাহি হয়॥
আশা-ঝুলি করি, শেখর ভিখারী, বাজারে মাগিয়ে খায়।

কানড়।

নাচত নগরে নাগর গৌর, হেরি মুরতি মদন ভোর,
যৈছন তড়িৎ রুচির অঙ্গ, ভঙ্গ নটবর শোভিনী।
কাম কামান ভুরুক জোর, করতহি কেলি শ্রবণ ওর
পীন শোহত রতন পদক জগজন-মনোমোহিনী॥
কুসুমে রচিত চিকুরপুঞ্জ, চৌদিকে ভমরা ভমরী গুঞ্জ,
পীঠে দোলয়ে লোটন ঝার, শ্রবণে কুণ্ডল দোলনী।
মাহিষ দধি রুচির বাস, হৃদয়ে জাগত রাস বিলাস,
ভিতল পুলক কদম্বকোরক অনুখন মন ভোলনী॥
গজপতি জিনি গমন ভাঁতি, প্রেমে বরখ দিবস রাতি,
হেরি গদাধর রোঁয়ত হাসত, গদ গদ আধ বোলনী।
অরুণ নয়ন চরণ কঞ্জ, তহি নখমণি মঞ্জীর রঞ্জ,
নটনে বাজন ঝনর ঝনন, শুনি মুনিমন-লোলনী।
বদন চৌদিকে শোহত ঘাম, কনক-কমলে মুকুতাদাম,
অমিয়া ঝরণ মধুর বচন, কত রস পরকাশনী।
মহাভাব রূপ রসিকরাজ, শোহত সকল ভকত মাঝ,
পিরীতি মুরতি ঐছন চরিত, রায়শেখর ভাবণি॥

করুণ বা কামোদ।

মধুর মধুর গৌরকিশোর, মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর, মধুর মধুর হাট॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত, মধুর মধুর তান।
মধুর রসে মাতল ভকত, গাওত মধুর গান॥
মধুর হেলন মধুর দোলন, মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর, মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধরে জিনি শশধর, মধুর মধুর হাস।
মধুর আরতি মধুর পিরীতি, মধুর মধুর ভাষ॥
মধুর যুগল নয়ান রাতুল, মধুর ইঙ্গিতে চায়
মধুর প্রেমের মধুর বাদর বঞ্চিত শেখর রায়॥

পরমানন্দ সেন।

ইহাঁর নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রামে। পিতার নাম শিবানন্দ সেন। শিবানন্দ সেনের তিন পুত্র,—চৈতন্য দাস, রামদাস আর কর্ণপুর বা পরমানন্দ। যথা,—

"চৈতন্যদাস রামদাস আর কর্ণপুর। তিন পুত্র শিবানন্দের প্রভুর ভক্ত পূর॥"

পরমানন্দ সেন ১৪৪৯ শকে কাঁচড়াপাড়া গ্রামে—মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পরমানন্দ যখন সাত বৎসরের বালক, তখন পিতৃদেব তাঁহাকে নীলাচলে লইয়া যান। শ্রীধাম নীলাচলে শিশু পরমানন্দ একদা গৌরাঙ্গ দেবের পদাঙ্গুষ্ঠ লেহন করেন। অতঃপর, তাঁহার মুখ হইতে মধুর কবিতা নির্গত হইতে থাকে। ফল কথা, পরমানন্দ আবাল্য কবি। তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থ—শ্রীচৈতন্যশতক, স্তবাবলী, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা, চৈতন্যচরিত- আনন্দবৃন্দাবন চম্পু, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা এবং অলঙ্কার- কৌস্তুভ। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতে সেন বা কবিকর্ণপুরের গ্রন্থ হইতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুই ইহাঁকে কবি কর্ণপুর উপাধি প্রদান করেন; ইহাঁর আর একটী সংক্ষিপ্ত নাম পুরীদাস। যথা বৈষ্ণবাচার-দর্পণে,—

"গুণচূড়া সখী হন কবি কর্ণপুর। কাঁচড়াপাড়ায় বাস চৈতন্য শাখাশূর॥
বৃদ্ধপদাঙ্গুষ্ঠ প্রভু যাঁর মুখে দিলা। পুরী দাস নাম বলি শক্তি সঞ্চারিলা॥"

ইনি বহু পদ রচনা করিয়াছেন।

পাহিড়া।

নাচিতে না জানি তমু, নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি, গাইতে না জানি তমু গাই।
সুখে বা দুঃখেতে থাকি, গৌরাঙ্গ বলিয়া ডাকি, নিরন্তর এই মতি চাই॥
বসুধা জাহ্নবী সহ, নিতাইচাঁদেরে ডাকি, নাম সহিতে সীতাপতি।
নরহরি গদাধর, শ্রীবাসাদি সহচর, ইহা সভার নামে যেন মাতি॥
রূপ সনাতন, রঘুনাথ সকরুণ, ভট্টযুগ জীব লোকনাথ।
ইহা সভার সহকারে, দীনপ্রায় সদা ফিরে, যেন হয় তা সবার সাথ॥

মহান্ত-সন্তান কিবা, মহান্তের জন যেবা, ইহা সভার স্থানে অপরাধ।
না হয় উদ্দাম কভু, ভয়ে প্রাণ কাঁপে কভু, এ সাধে না পড়ে যেন বাদ
অন্তে শ্রীবাস-পদ, সেবা উক্ত সে সম্পদ, সে সম্পদের সম্পদী যে হয়।
তার ভুক্তগ্রাস শেষে, কিবা গৌর ব্রজবাসে, পরমানন্দ এই ভিক্ষা চায়॥

কামোদ।

গোরা অবতারে যার, না হৈল ভক্তিরস, আর তার না দেখি উপায়।
রবির কিরণে যার আঁখি পরসন্ন নৈল, বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায়॥
ভজ গোরাচাঁদের চরণ।
এ তিন ভুবনে ভাই, দয়ার ঠাকুর নাই, গোরা বড় পতিতপাবন॥
হেন জলদ কিয়ে, প্রেম সরোবর, করুণাসিন্ধু অবতার।
পাইয়া যেজন না হয় শীতল, কি জানি কেমন মন তার॥
ভব তরিবারে হরি, নাম-মন্ত্র ভেলা করি, আপনি গৌরাঙ্গ করে পার।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কেবা উদ্ধারিবে তারে, পরমানন্দের পরিহার॥

বিহাগড়া।

হরে হরে গোবিন্দ হরে। কালিয়মর্দ্দন, কংস-নিসূদন, দেবকীনন্দন রাম
মৎস্য কচ্ছপবর, শূকর নরহরি, বামন ভৃগুপতি রঘুকুলারে।
শ্রীবল বৌদ্ধ, কল্কি নারায়ণ, দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে॥
কেশব মাধব, যাদব যদুপতি, দৈত্য-দলন দুঃখভঞ্জন শৌরে।
গোলক-গোকুল-চন্দ্র, গদাধর গরুড়-ধ্বজ, গজ-মোচন মুরারে॥
শ্রীপুরুষোত্তম, পরমেশ্বর প্রভু, পরমব্রহ্ম পরমেষ্ঠী অধারে।
দুঃখিতে দয়াং কুরু, দেব দেবকীসুত, দুর্ম্মতি পরমানন্দ পরিহারে॥

নরহরি দাস।

বর্দ্ধমান-শ্রীখণ্ডে ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জাতি বৈদ্য। পিতার নাম নারায়ণ। নারায়ণের দুই পুত্র—মুকুন্দ ও নরহরি। মুকুন্দ গৌড়াধিপতির চিকিৎসক ছিলেন। নরহরি আবাল্য সংসার-বিরাগী।

নরহরির গ্রন্থ,—ভক্তিচন্দ্রিকা-পটল ও ভক্তামৃত-অষ্টক প্রসিদ্ধ। ইনি বড় সুকান্তি পুরুষ ছিলেন; গৌর-অঙ্গে সর্ব্বদাই চন্দন মাখিয়া

থাকিতেন। শ্রীখণ্ডের গৌরনিতাই মূর্ত্তি ইহাঁরই স্থাপিত। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর তিরোভাব হইয়াছে। নরোত্তম দাস 'হাটপত্তনে' লিখিয়াছেন,—

"প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি। চৈতন্যের হাটে ফিরে লইয়া গাগরি।"

প্রসিদ্ধি এইরূপ,—নরহরিই প্রথমে গৌরলীলার পদ রচনা করেন সেইজন্য বৈষ্ণব-সমাজে ইহাঁর যথেষ্ট সমাদর। নরহরি—চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচন দাসের গুরু। ইনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত অবস্থান করিতেন। ইহাঁর কয়েকটী পদ ;—

পাহিড়া।

গৌরলীলা দরশনে, ইচ্ছা বড় হয় মনে, ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।
মুঞি ত অতি অধম, লিখিতে না জানি ক্রম, কেমন করিয়া তাহা লিখি॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে, এখনো জন্মে নাই সে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে, বুঝিবে লোক সকলে, কবে বাঞ্ছা পূরাবেন পহু॥
গৌর গদাধরলীলা, আদ্রব করয়ে শিলা, কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি, নিরন্তর নিরবধি, আর সদাশিব পঞ্চানন॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করয়ে প্রভুলীলা॥
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ, গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা।

পাহিড়া।

ব্রজ ভূম করি শূন্য, নদীয়ায় অবতীর্ণ, এতেক তোমার চতুরাল।
দুঃখ দিয়া নিরন্তর, বর্ণ করি ভাবান্তর, পুনঃ বাড়াও বিরহ-জঞ্জাল॥
নাহি শিখি পুচ্ছচূড়া, নাই সেই পীতধড়া, করে নাই সে মোহন বাঁশরি।
যে বাঁশরি করি গান, বধিলে গোপীর প্রাণ, সে বাঁশরি কোথা গৌরহরি॥
নাহি সে বাঁকা নয়ন, এবে হেরি সুলোচন, নাই সে ভঙ্গিমা বাঁকা নাই।
যদি দিলে দরশন, এরূপে ভুলে না মন, তুমি সেই ব্রজের কানাই॥
কহে নরহরি দাস, যার নাই বিশ্বাস, সে আসিয়া দেখুক নয়নে।
সে দিনের যেই কথা, বলিতে মরমে ব্যথা, যে হইল উভয় মিলনে॥

পাহিড়া।

রসে তনু ঢরঢর, গৌরকিশোর-বর, এবে নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সে সব নিগূঢ় কথা, কহিতে অন্তরে ব্যথা, ভক্তি বিনা নাহি জানে অন্য॥
দ্বাপর যুগেতে শ্যাম, কলিতে চৈতন্য নাম, গর্গবাক্য ভাগবতে লিখি।
চিত্তে করি অনুমান, শ্যাম হৈল গৌরাঙ্গ, রাধাকৃষ্ণতনু তার সাখী॥
অন্তরেতে শ্যামতনু, বাহিরে গৌরাঙ্গ তনু, অদ্ভুত গৌরাঙ্গ-লীলা।

রাই সঙ্গে খেলাইতে, কুঞ্জবন বিলাসিতে, অনুরাগে গৌরতনু হৈলা॥
কহিবার কথা নয়, কহিলে কি জানি হয়, না কহিলে মনে বড় তাপ।
মনে অনুমান করি, গৌরাঙ্গ হৃদয়ে ধরি, নরহরি করয়ে বিলাপ॥

বিভাস।

পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো, একদিন দেখিনু নয়নে।
ধূলায় ধূসর তনু কিবা অপরূপ গো, হামাগুড়ী ফিরয়ে অঙ্গনে॥
মুচাঁদ বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো, অমনি আইল শচী ধাঞা।
কোলেতে চড়িয়া অতি কান্দিয়া বিকল গো, তা দেখি বিদরে যেন হিয়া॥
কত যতন করি তমু প্রবোধ না মানে গো, হাসয় তাহার গলা ধরি।
পুলক মোহিত যত ব্রজ নাগরিয়া গো, সেই রূপ নয়নে নেহারি॥
সভাই হরষ হইয়া হরি হরি বলে গো, নিমাই নামিয়া কোলে হইতে।
দাঁড়াইতে নারে তমু নাচয়ে কৌতুকে গো, হাত দিয়া জননীর হাতে॥
কি লাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো, সভাই ভাবয়ে মনে মনে।
নরহরি পরাণ নিমাই এইরূপে গো, খেপানো করিতে ভাল জানে॥

বেলোয়ার।

ঝুলত সুখময় শ্যাম গোরী।
বৃন্দাবন-বিপিন, নিকুঞ্জ মাঝ মিলি, প্রিয় ললিতাদি ঝুলাওত থোরি॥
সুললিত তরল, হিন্দোল মাঝ অতি, ঝলকত যুগল-রূপ রুচি ধাম।
মৃগমদ-অঞ্জন পুঞ্জ, জলদ-তনু কেশর, বিদলিত দামিনী-দাম॥
শোভা ভুবন, বিজয় নহ সমতুল, দুহুঁ মুখ চন্দ বিমল পরকাশ।
হেরি দুহুঁক গুণ, গাওত চৌদিশে, শুক পিককুল হিয়া অধিক উল্লাস।
ঝঙ্কর ভ্রমর, যন্ত্র জনু বাজত, নৃত্যতি শিখিকুল উমগ অভঙ্গ।
নরহরি কহ করি, কো বরণিব ইহ, বৃন্দাবন মধি বিবিধ তরঙ্গ॥

রাধামোহন দাস।

ইহাঁর সুবিখ্যাত সংগ্রহ-গ্রন্থ,—পদামৃত-সমুদ্র। অনেকের মতে ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র,—গতিগোবিন্দ ঠাকুরের পুত্র। ১০৯৫ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

শ্যামানন্দপুরী রাধামোহনের দীক্ষাগুরু। রাধামোহন সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। অনেক শাস্ত্র বিচারে ইনি জয় লাভ করেন; এ হেতু

শদাবাদের নবাব দরবারেও ইঁহার প্রভূত প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক সমৃদ্ধ ব্যক্তি ইঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ১১৭৫ সালে ইঁহার তিরোধান হইয়াছে। ইহার কয়েকটী পদ তুলিয়া দিতেছি ;—

সুহই।

আজু শচীনন্দন, নব বিরহিণী জনু, রহি রহি রোয় অনিবার।
কহে মধু বল্লভ, কো হেরি নেওল, হিয়া গেহ কর আঁধিয়ার॥
আহা কানু মব ছোড়ি গেল।
কাহে এ পাষাণ হিয়া, ফাটি নাহি গেও তব, কাহে মধু মরণ না ভেল॥ ধ্রু
যছুকা গরবে হাম, গরবিণী গোকুলে, সো যদি বিছুরল মোহে।
বিনু নবঘন জল, আন নীরে কো ফল, চাতক পীয়ব বারি কাহে॥
চাঁদ চন্দ্রিমা লাগি, চকোরিণী আকুলি, রাহু যদি গরাসব চাঁদে।
চকোরিণী পিয়াস, তব কাহে মিটব, কাহে সোই হিয় থির বাঁধে॥
যদি প্রাণপিয় মোহে, ছোড়ি গেও মধুপুর, হাম কাহে জীয়ব জীয়ে।
কহ রাধামোহন, পহুঁ সঙ্গে তেজব এ পরাণ কালকূট পিয়ে॥

ধানশী।

বছু মুখলাবণি, হেরি কত কামিনী, হেরই বদন আমোর।
সো অব বরজক, রমণী-শিরোমণি, নব সকভাবে বিভোর।
অপরূপ গোরা অবতার।
ঐছন প্রেমধনে, বিতরই জগজনে, তারল সকল সংসার॥ ধ্রু
গদ গদ কহত, মোহে যদি নিকরুণ, নাগর করুণা সীম।
অখিল রসামৃত, সকল সুধাকর, বিগুণধ গুণ গরীম॥
এত কহি তৈখনে, কয়ল প্রিয়ক হেরি, দশমী দশা পরকাশ।
কাঁদি ভকত সব, উচ্চ হরি বোলত, কহ রাধামোহন দাস॥

কামোদ।

হের দেখ সজনি গৌরাঙ্গের অকূল নদী যেন বরয়ে নয়ান।
কোই ভাবে ভাবিত, অন্তর হেরি হেরি, ঝুরয়ে পরাণ॥
সজনি ক্ষণে কহই বাত।
ঐছন তন্ত্র মন্ত্র পড়ত কেহ যৈ জানে রহে পরতাত॥ ধ্রু॥
তাক বিচ্ছেদ হাম, সহই না পারব, নিকসে পাপ-পরাণ।
কি করব কৈছনে, ইহ দুখ মিটব, তুরিতে করহ বিধান॥
এত শুনি ভকতগণ কাঁদহি তহি করব অনুবাদ।
রাধামোহন দীন, কিছুই না জানত, অন্তরে যে করত বিষাদ॥

...গ।

যো মুখ জিতিল, কমল অতি নিরমল, সোঅব হেরিসে মৈলান।
যোবর অধর বিম্বফল নিন্দল, তছু রাগ হেরি আন ভাগ॥
গৌরাঙ্গ দেখিতে কাটে প্রাণ।
বিরহক তাপে লুঠত সতত মহী, নিরবধি ঝুরয়ে নয়ান॥ ধ্রু॥
কাঞ্চন বরণ, মলিন হেন হেরইতে, মঝু হিয়া বিদরিয়া যায়।
কহ সই যুকতি যাহে পুন গৌরক, বিরহক তাপ পলায়॥
যৈছন ভাতি, ভকতগণ অনুভাবি, করতহি বিরহ হুতাশ।
নবদ্বীপচাঁদক, ভাবহি ঐছন, কহ রাধামোহন দাস॥

শ্রীরাগ—বড়দশকুশী।

রাধা বলি নাচে গোরা রাধা বলি গায়। হা রাধা হা রাধা বলি ইতিউতি চায়॥
রাধা বলি গোরা মোর নেত্রনীরে ভাসে। রাধা বলি ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে ক্ষণে হাসে।
রাধা রাধা বলি গোরা করয়ে হুঙ্কার। দেহ রে সুবল মোর রাধা প্রেমাধার॥
মোহন মুরলি মোর রাধানামে সাধা। দেহ রে মুরলী করে ডাকি রাধা রাধা॥
মরম জানহ ভাই এবে কেন দেরি। দেখায়ে রাধায় আনি নৈলে প্রাণে মরি॥
...মিলেন জলে। ছায়া দেখাইয়া অই তব রাধা বলে॥
নিজ মুখ-প্রতিবিম্বে ভাবি রাধামুখ। প্রেমধারা বহে চিতে উপজিল সুখ॥
...ধামোহন কহে গৌরীদাস বিনে। মনের মরম পহুঁর আর কেবা জানে॥

কামোদ।

রাইক কুঞ্জ, গমন শুনি মাধব, অচপল প্রেম অনুমানি।
মিলইতে গমন, করল বর নাগর, আনন্দে আপনা না জানি॥
চলইতে মথই, চলই না পারই, কত কত ভাব বিথারি।
পদে পদে হেম, কদলি হেরি আকুল, গদ গদ পুছে সেই নারী॥
ঐছে বহু যতনে, পহুঁ মলিন দুহুঁ, হেরি দুহুঁ ভেল ভোর।
...মন মানস, সফল ভেল জীবন, দুহুঁক গলয়ে প্রেম নোর॥
ধৈরজ ধরি হরি, অঞ্চল পরশিতে, ধনিক মুগধি পরকাশ।
রাধামোহন, বুঝিতে সংশয়, পিছে বুঝল পরিহাস॥

কর্ণাট রাগ।

মঞ্জুর-মরকত-নিন্দি-সুন্দর, সুভগকলেবর শ্যাম।
ইন্দু-বিনিন্দিত, যাক রূপহি, ঐছে বদনক ঠাম॥
জয় নন্দনন্দন কৃষ্ণ।
বিরহ আকুল, গোপ গোকুল, ততহিঁ মানস-তৃষ্ণ॥
গান্ধিনীসুত, হৃদয়-নন্দন, স্যন্দন-কৃত-রোহ।

বল্লবীগণ, বলবন্ত তাপহিঁ, হৃদয় কৃত বরমোহ ॥
ভকত-চাতক, নীল-নীরদ, অধিক পুরণ আশ।
কহই পাতক, দুঃখিত অন্তর, এ রাধামোহন দাস ॥

গান্ধার।

জয় জয় সুন্দর শ্যাম।
জলধর রুচির, রুচিরানন শোহন, মোহন কত কোটি কাম ॥
পূর্ণিমক-চাঁদ-কান্ত মুখমণ্ডল, কুণ্ডল শ্রবণ-বিলাস।
ব্রজজন-ভাব, বিভাবিত অন্তর, মহুরু মন্থর হাস ॥
কেলিকলা-গুরু, অন্তরে অন্তর, গতি অতি বারণবার।
রাধারমণ, রমণীগণ-মোহন, মোজন প্রেম-বিথার ॥
রাধা রাস, রসিকবর শেখর, শেখর জন-মন জান।
রাধামোহন, মোহন বন্ধুক, নিন্দুক পদতল খান ॥

বংশীবদন দাস।

নবদ্বীপ—কুলিয়াপাহাড়ে ১৪১৬ শকাব্দে "মধু পূর্ণিমায়" বংশীবদন দাস জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়। যথা প্রেম-দাসের একটী পদে,—

"নদীয়ার মাঝখানে, সকল লোকেতে জানে, কুলিয়া পাহাড় নামে স্থান।
তথায় আনন্দধাম, শ্রীছকড়ি চট্টো নাম, মহাতেজা কুলীন সন্তান ॥
ভাগ্যবতী পত্নী তাঁর, রমণী কুলেতে যাঁর, যশোরাশি সদা করে গান।
তাঁহার গর্ভেতে আসি, কৃষ্ণের সরলা বাঁশী, শুভক্ষণে কৈলা অধিষ্ঠান ॥"

কুলিয়াপাহাড় গ্রামে প্রাণবল্লভ বিগ্রহটী বংশীবদনেরই স্থাপিত। বংশীবদন পরে বিল্বগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা বংশীবদনের জ্ঞাতি। শ্রীগৌরাঙ্গ,—সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে পর বংশীবদন কিছুদিন নবদ্বীপে গিয়া, গৌরাঙ্গের বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহার পদ সমূহ সরলে মধুরে মনোহর।

বড় দশকুশি।

শচীর নন্দন গোরা ও চাঁদ বয়ানে। ধবলী শাঙলী বলি ডাকে ঘনে ঘনে ॥
বুঝিয়া ভাবের গতি নিত্যানন্দ রায়। শিঙ্গার শবদ করি বদন বাজায় ॥

নিতাইচাঁদের মুখে শিঙ্গার নিশান। শুনিয়া ভকতগণ প্রেমে অগেয়ান ॥
ধাইল পণ্ডিত গৌরীদাস ধায় ধায়। ভাইয়া রে ভাইয়া রে বলি ধায় অবিরায় ॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ প্রেমের আবেশ। শিরে চূড়া শিখি-পাখা নটবরবেশ ॥
চরণে নূপুর সাজে সর্ব্বাঙ্গে চন্দন। বংশীবদনে কহে চল গোবর্দ্ধন ॥

ধানশী।

হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যে অঙ্গে নয়ন থুই, সেই অঙ্গ হৈতে মুই, ফিরাইয়া আনিতে নারি আঁখি ॥
অঙ্গে নানা অভরণ, কালিন্দী তরঙ্গ যেন, চাঁদ ঝলিছে হেন বাসি।
মিশামিশি হইল রূপে, ডুবিলাম রসের কূপে, প্রতি অঙ্গে হেরি কত শশী ॥
জিনি মেঘে ঘন আভা, পীত বসন শোভা, অলপ উড়িছে মন্দ বায়।
কিবা সে মোহন চূড়া, দোহুতি মুকুতা বেড়া, কত ময়ূরপুচ্ছ তায়।
গলায় কদম্বমালা, জিনিয়া মদন কলা, অধরে মধুর মৃদু হাস।
তাহাতে মুরলী ধ্বনি, অবলা পরাণে হানি, বলিহারি যাও বংশী দাস ॥

যদুনাথ দাস।

শ্রীহট্ট জেলার বুরঙ্গা গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। পিতার নাম রত্নগর্ভ আচার্য্য। গৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ আচার্য্যের ইনি প্রতিবেশী ছিলেন। যদুনাথ কবিত্ব-শক্তিগুণে কবিচন্দ্র উপাধি লাভ করেন। যথা চৈতন্য-ভাগবতে,—

"যদুনাথ কবিচন্দ্র প্রেমরসময়। নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার সদয় ॥"

ইঁহার রচিত কয়েকটী পদ;—

আনন্দ-কৌমদী।

গৌরবরণ তনু সুন্দর সুখময় সদয় হৃদয় রসাল রে।
কুন্দ-করবীর, গাঁথন থরে থর, দোলনী বনি বনমাল
গৌরবামে বর প্রিয় গদাধর, নিগূঢ় রস পরকাশ রে।
রাসমণ্ডল ঐছে ভাণল প্রেমে গদগদ ভাষ রে ॥
নদীয়া-নগরে চাঁদ কত কত, দূরে গেও আন্ধিয়ার রে।
কভহু উয়ল দীপ নিরমল ইথেহ নামই না পার রে ॥
গৌর গদাধর প্রেমসরোবর, উথলি মহীতল পূর রে।
দাস যদুনাথ, বিধি বিড়ম্বিত, পরশ না পাইয়া ঝুর রে ॥

কামোদ।

দেখ গোরা রঙ্গ সই দেখ গোরা রঙ্গ। নদীয়া নগরে যায় কনয়া অনঙ্গ।
হেমমণি দরপণ জিনিয়া লাবণি। অরুণ চরণে আলো করিল অবনী॥
পূর্ণিমাচাঁদের ঘটা ধরিয়াছে মুখ। ছটায় গগন আলো দিশা নারীসুখ।
ভুরুধনু আঁখি বাণ বঙ্কিম সন্ধান। বরজ মদন হেন সকল বন্ধান॥
জানু বিলম্বিত বাহু পরিসর বুক। দরশনে কে না পায় পরশন সুখ॥
গতি মত্ত গজপতি জিনি কমনিয়া। মজিল তরুণী ও না চায় ফিরিয়া॥
যদু কহে ও না সেই গোকুলসুন্দর। জানিয়া না জান তুমি তেঞি লাগে ডর॥

বিভাস।

হেদে গো রামের মা ননীচোরা গেল এই পথে।
মন্দ মন্দ বলু মোরে, লাগালি পাইলে তাবে, সাজাই করিব ভাল মতে॥
শূন্য ঘরখা নি পাইয়া, সকল নবনী খাইয়া, দ্বারে মুছিয়াছে হাতখানি।
অঙ্গুলের চিনা গুলি, বেকত হইবে বলি, ঢালিয়া দিয়াছে তাতে পাণী॥
ক্ষীর ননী ছেনা চাঁচি, উভ করি শিকা গাছি, যতনে তুলিয়া রাখি তাকে
আনিয়া মথন দণ্ড, ভাঙ্গিয়া ননীর ভাণ্ড, নাবতে থাকিয়া মুখ পাতে॥
ক্ষীর স শত হয়, কিছুই নাহিক রয়, কি ঘর করণে বসি মোরা।
যে মোরে দিলেক তাপ, সে মোর হইয়াছে বাপ, পরাণে মারিব ননীচোরা॥
যশোদার মুখ হেরি, রোহিণী দেখায় ঠারি, যে ঘরে আছয়ে যাদুমণি।
ঘরে আঁধিয়ারে পশি, বেকত হইল শশী, ধাইয়া ধরিল নন্দরাণী।
যদুনাথ কয় দঢ়, এবার কানুরে এড়, আর কভু না খাইবে ননী॥

প্রেমানন্দ দাস।

প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মনঃশিক্ষা। এই গ্রন্থ মায়ামুগ্ধ জীবের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশে পূর্ণ। ইহাতে এক শত আটটী পদ সন্নিবিষ্ট। সকল পদই ভাবে ঢল ঢল,—রসে মনোহর। প্রত্যেক মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে এ গ্রন্থ অতীব আদরের সামগ্রী। গুটী কয়েক পদ শুনুন,—

এ মন! ঘর কি ছাড়িলে তরে।
যত পশুগণ, তেকেন তরে না, বনেতে যাহারা চরে॥
আহার তেজিলে, যদি হরি পাই, বিচারি কহ না তাই।

যত ফণিগণ, তে কেন ডরে-না, ভক্ষণ যাহার নাই॥
না ভজিয়া যদি, বেশ ধরি পাই, অভাব থাকিত কারে।
রাখালে মিলিলা, প্রলম্ব তে কেনে, বাছিয়া ফেলিল তারে॥
সাধন ভজন, কথায় করিছ, অন্তর রাখিছ কাতে।
শরম রাখিতে, ভরম রাখিছ, ধরম ছুবিল তাতে॥
প্রেমের আচার লোকের প্রচার, মদনে মাতিছ সুখে।
তাঁহার পরশে, সে প্রেম বিলাসে, তাহারে ধরিছ বুকে॥
স্বভাব ছাড়িতে, যদি না পারিছ, তে-কেনে ছাড়িছ লোকে।
কহে প্রেমানন্দ, স্বভাব না গেলে, ভরমে নাশিবে তোকে॥

এ মন! কি করে বরণ কুল।
কোন কুলে কেনে, জনম তা হয়, কেবল ভকতি মূল॥
কপিকুলে ধন্ত, বীর হনুমান, শ্রীরাম-ভকত-রাজ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে, ঈশ্বর-সভার মাঝ॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি, ভবেতে রাখিল যশ।
স্ফটিক স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি, হইয়া যাহার বশ॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালি করিলা, গুহক চণ্ডালবর।
বলনা কি কুল, বিদুরের ছিল, খাইল তাহার ঘর॥
দেখ না কেমন, সাধন করিল, সে হরি যে ভজে তারি।
জানিহ সর্ব্বথা, না হয় অন্যথা, শ্রীকৃষ্ণ ভব-কাণ্ডারী॥
শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে, সবে অধিকারী, কুলের গরব নাই।
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব, নিতান্ত মুখর ভাই॥

ওরে মন! ভাব-সিদ্ধি কেবল বিশ্বাস।
সাক্ষাতে আছয়ে রত্ন, তাহাতে না কর যত্ন, কিবা হবে খুজিলে আকাশ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ-ভক্ত এক, নাহি দেখ পৃথক, কৃষ্ণ-বাক্য ভগবদ্গীতাতে।
তাহাতে নহিল রতি, শূন্য ভাবি পাবে কৃতি, করে মুকুর দেখ কি কূপেতে॥
যদি না আস্বাদ জানে, নিকটে থাকে না কেনে, কিবা বস্তু জানে সে কেমনে॥
বনে অলি,—পদ্ম সরে, খুজি মধু পান করে, কাছে থাকি ভেক তা না জানে।
যার সঙ্গে প্রীত যার, দূরেহ নিকটে তার, পদ্ম ভানু কুমুদ তার সাক্ষী।
শিখী উনমত্ত হৈয়া, নাচে পুচ্ছ প্রসারিয়া, গগনে জলদপুঞ্জ দেখি॥
অনিত্য হে নিত্য হয়, যদি কর সুপ্রত্যয়, অসাহস কেন কর ভাই।
প্রেমানন্দ কহে মতি, স্বভাব জানিয়া রতি, দৃঢ় কর তবে কি হারাই॥

এ মন! তুমি সে অবোধ বড়।
দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিয়া, করিতে না পার দড়॥
কে সার অসার, না কর বিচার, কে তুমি কর কি কাজ।
পরের কারণে, শরীর খোয়ালি, আপন কাযেতে বাজ।
এ ধন এ জন, আপনা ভাবিছ, সে তোর বুদ্ধির ভুল।
এখন তখন, কখন কি হয়, না বুঝ আপনা মূল॥
দেখ না জীবন, কেবল পবন, যাইতে কি তবে বাধা।
কিসের কারণে, এতেক আরতি, খাটিয়া মরিছ সদা।
দিবস রজনী, তিলেক না বিরাম, গণিছ পড়িল কিবা।
রবির নন্দন, আসিবে যখন, তারে কি উত্তর দিবা॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল, বসিয়া সাধুর সঙ্গ।
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয়ে শমনে, আপনি দিবে সে ভঙ্গ॥

ওরে মন! ধন জন জীবন যৌবন।
এই আছে এই নাই, চক্ষে কি না দেখ তাই, তুমি কিসে বলিছ আপন॥
নিশির স্বপন যেন, এ ধন সম্পদ তেন, তিলেকে সকলি হয় মিছে।
দেখিয়া না দেখ কেনে, শুনিয়া না শুন কাণে, কি লাগি ছাড়িতে নার ইচ্ছে।
কন্যা পুত্র যত ইতি, সে মরিলে যায় তথি, কি জানি কোথায় তুমি যাও।
মিছা মোর মোর কর, রাত্রি দিন ভাবি মর, পর লাগি আপনা হারাও॥
কেবা আর অন্ত পরে, আপনা এ কলেবরে, সে না কি তোমার সঙ্গে যায়।
পাছু নাহি দেখ এবা, তোর লাগি কান্দে কেবা, কার লাগি কর হায় হায়॥
যেবা হইয়াছে আয়ু, সে মাত্র নাসায় বায়ু, মরিয়া পড়িলে আর নাই॥
কিবা বৃদ্ধ কিবা বাল, নাহি তার কালাকাল, কোথা থাকে যৌবন বড়াই॥
এ সকল যার মায়া, তারে কেন ভুল ভায়া, যার নামে ত্রিভুবন তরে।
প্রেমানন্দ কহে যদি, ভোল কৃষ্ণ নিরবধি, তবে কি কোথায় কেহ ডরে॥

এ মন! তোমারে বলিব কি।
সংসার-বাসনা, যে শ্রম কেবল, ছাইতে ঢালিছ ঘি॥
দিবস রজনী, লিখিছ পড়িছ, ভাবিছ গণিছ তাই।
খাইতে শুইতে, উঠিতে বসিতে, তিলেক বিরাম নাই॥
চল্লিশ পঞ্চাশ, ষাটি বা সত্তরি, নহে বা শতেক পর॥
ইহারি ভিতরে, কখন কি হয়, তা না কি নিয়ম তোর।
এখানে যেমন, সুখটি চাহিছ, দুখটি ভাবিছ ভয়।
মরিলে এ সুখ, কোথায় পাইবে, তা না কি ভাবিতে হয়।

এ আয়ু শতেক, জানিবে কতেক, গরব করিহ যত।
হরি না বলিয়ে, শমন নরকে, মজাবে কল্প শত॥
চরণে ধরিয়ে, মিনতি করিয়ে, হরি হরি বল ভাই।
কহে প্রেমানন্দ, নামের প্রসাদে, এ সব তরিয়ে যাই॥

ওরে মন! রুচি নহে কেন কৃষ্ণ নাম।
তবে জানি পূর্ব্ব জন্মে, আছে কত পাপ কর্ম্মে, তে আগি বিধাতা তোরে বাম।
যদি অন্য কথা পাও, আঁটিয়া সাঁটিয়া কও, কৃষ্ণ নাম লইতে আলিস।
যদি শুন কৃষ্ণ কথা, বজ্র যেন পড়ে মাথা, ঘুমে ঝুমে তল্লাস বালিস॥
যদি হয় অসৎ কথা, ঘুমেতে চিয়ায় তথা, শুনিতে বাড়য়ে কত রতি।
নীচ সঙ্গে সদা বাস, সাধুজন দেখি হাস, কুলটা বাখিয়া নিন্দ সতী॥
শ্রাদ্ধ দেব অধিকারী, ভাঙ্গিবে এ ভারি ভুরি, আসি দূত লইবে বান্ধিয়া।
কি গুমান কর দেহ, পচি যাবে নিঃসন্দেহ, ধন জন রহিবে পড়িয়া॥
যে সুখে হয়েছ মত্ত, বুঝি দেখ তার তত্ত্ব, ইহা তোর রহিবে কোথায়॥
আজি মর—মর কালি, মরণ এ নহে গালি, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহ দিন যায়॥
যে কৈলে মন, এবে হও সাবধান, ফিরে বৈস কে তোরে হারায়।
কহে প্রেমানন্দ সুখে, রাধা, কৃষ্ণ বল মুখে শমন জিনিয়া উঠ নায়॥

এ মন তুমি কি ভাড়ামি কর।
সেবক হঞাছি, আশ্রয় করেছি, কিসে এ গৌরব ধর॥
সেবক বলিয়া এ তিন আখর, তিনের তিনটি কাম।
তা যদি কর, কি মত আচার, তৈ কিসে সেবকের নাম॥
সে আঁখর যেবা করে গুরুসেবা, স্বীকার গুরুর বাক।
ছাড়িয়া সেবিলি, স্ত্রী বাক্য পালিলি, সে ঘুচি রহিল বক।
বৈষ্ণব সঙ্গেতে, বাসুদেব ভজ, ফুকারি করিছে বক।
তাহা না শুনিলি, অসতে মজিলি, ব ছাড়ি রহিল ক॥
ক বলে কহনা, কৃষ্ণের চরিত্র, শ্রবণ কীর্ত্তন ধ্যান।
তা কৈলি কখন, সংসারে গমন, ক গেল না করি নাম॥
একে একে দেখ, তিনেই ছাড়িল, বর্সাত হইল খালি।
কহে প্রেমানন্দ, তে যম, কিঙ্কর হাতে—বাজাইছে তালি॥

ইনি বিস্তর মধুর পদও রচনা করিয়াছেন,—

যথা রাগ।

এমন গৌরাঙ্গ বিনা নাহি আর।
হেন অবতার হবে কি, হয়েছে হেন প্রেম পরচার॥ ধ্রু॥

দুর্মতি অতি পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া হৃদয় শুধিল, যাচিঞা যে ঘরে ঘরে॥
ভব-বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত যে দুর্ল্লভ প্রেম, জগত ফেলিল ডালি।
কাঙ্গালে পাইয়া, খাইয়া নাচিয়া, বাজাইল করতালি॥
হাসিয়া কাঁদিয়া প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়া হাকিয়া খোল করতালে, গাইয়া ধাইয়া ফিরে।
দেখিয়া শমন তরাস পাইয়া, কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ এমন—গৌরাঙ্গে রতি, না জন্মিল মোর॥

এমন শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কাণে?
শ্রীকৃষ্ণ নামের স্বগুণ মহিমা, কেবা জানাইত আর?
বৃন্দা বিপিনের মহা মধুরিমা, প্রবেশ হইত কার?
কেবা জানাইত রাধার মাধুর্য্য, রস যশ চমৎকার?
তার অনুভব সাত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার?
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয় তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যভিচারী সীমা, কার অবগতি ছিল এত?
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা করি।
বিধি-অগোচর, যে প্রেমবিকার, প্রকাশে জগত ভরি॥
উত্তম অধম, কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গ, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

উদ্ধব দাস।

ইনি অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভুত। নিবাস ছিল টেঞা বৈদ্যপুর। ইহাঁর আসল নাম কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। ইহাঁর গুরু ছিলেন, রাধামোহন ঠাকুর;—শ্রীনিবাসাচার্য্যের প্রপৌত্র। ইহাঁর রচিত বহু পদেই গৌরাঙ্গ-ভক্তগণের স্বল্প পরিচয় সন্নিবিষ্ট। যথা,—

সুহই।

জয় রে জয় রে, শ্রীনিবাস নরোত্তম, রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দ দাস।
জয় শ্রীগোবিন্দ গতি, অগতি-জনার গতি, প্রেমমুরতি পরকাশ॥

শ্রীদাস গোকুলানন্দ, চক্রবর্ত্তী শ্রীগোবিন্দ, শ্রীরামচরণ শ্রীল ব্যাস।
শ্যামদাস চক্রবর্ত্তী; কবিরাজ নৃসিংহ খ্যাতি, কর্ণপুর শ্রীবল্লবীদাস ॥
শ্রীগোপীরমণ নাম, ভগবান গোকুলাখ্যান, ভক্তিগ্রন্থ কৈল পরকাশ।
প্রভুর প্রেয়সী রাম, শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া নাম, যাজীগ্রামে সতত বিলাস ॥
শ্রীমতী দ্রৌপদী আর, ঈশ্বরী বিখ্যাত যার, গৌরপ্রেমভক্তিরসে ভাস।
প্রভুর কন্যা হেমলতা, সর্ব্বলোকে যশঃখ্যাতা, স্মরণ-মনন-রসোল্লাস।
রামকৃষ্ণ মুকুন্দাখ্যা, চট্টরাজ যার ব্যাখ্যা, শুদ্ধ ভক্তি মত বিনির্য্যাস।
রাঢ়দেশে সুধানিধি, মণ্ডল ঠাকুরখ্যাতি, প্রভুপদে সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥
নটক শ্রীরূপ নাম, রসবতী রাইশ্যাম, লীলার ঘটনারসে ভাস।
শ্রীবীর হাম্বীর নাম, বিষ্ণুপুর যার ধাম, যেহোঁ আদি শাখা প্রভু পাশ ॥
চট্টরাজ-কুলোদ্ভব, গোপীজনবল্লভ, সদা প্রেম সেবা অভিলাষ ॥
শ্রীঠাকুর মহাশয়, তার যত শাখা হয়, মুখ্য কিছু করিয়ে প্রকাশ ॥
রামকৃষ্ণ আচার্যাখ্যাতি, গঙ্গানারাণ চক্রবর্ত্তী, ভক্তিমূর্ত্তি গামিলা-নিবাস।
রূপ মাধু রায় নাম, গোকুল শ্রীভগবান্, ভক্তিমান শ্রীউদ্ধব দাস ॥
শ্রীল রাধাবল্লভ, চাঁদ রায় প্রেমার্ণব, চৌধুরী শ্রীখেতুরী নিবাস।
শ্রীরাধামোহনপদ, যার ধন সম্পদ, নাম গায় এ উদ্ধবদাস ॥

কেদার।

রাসবিহারে মগন, শ্যাম নটবর, রসবতী রাধা বামে।
মণ্ডল ছাড়ি, রাই করে ধরি, হরি চলিল বন-ধামে ॥
যব হরি অলখিত ভেল।
সবহুঁ কলাবতী, আকুল ভেল অতি, হেরইতে বন মাহা গেল ॥
সখীগণ মেলি, সবহুঁ ঢুঁঢ়ত, পুছত তরুগণ পাশে।
কাঁহা মঝু প্রাণনাথ, ভেল অলখিত, না দেখি জীবন নৈরাশে ॥
কহ কহ কুসুম, পুঞ্জ তুহু ফুল্লিত, শ্যাম ভ্রমরা কাঁহা পাই।
কোন উপায়ে, শ্যামে ভেটিব, উদ্ধব দাস তাঁহা যাই ॥

ধানশী।

সকল রমণীগণ, ছাড়ি বর নগর, রাইক কর ধরি গেল।
বনে বনে ভ্রমই, কুসুম ফুল তোড়ই, কেশ বেশ করি দেল।
চলইতে রাই, চরণে ভেল বেদন, কান্ধে চড়ব মনে কৈল।
ধুরইতে ঐছে, বচন বহু বল্লভ, নিজ তনু অলখিত ভেল ॥
না দেখিয়া নাহ, তোহি ধনী রোয়ত, হা প্রাণনাথ উভরোলে ॥
ব্রজরমণীগণ, না দেখিয়া মনোদুঃখে, ভাসল বিরহ হিল্লোলে ॥
তুমি সে কহ কহ, বব পরবেশিয়া, হেরল রোদিত রাধা।
সখীগণ মেলি, ধরণীতল লুটই, উদ্ধব দাস চিত বাঁধা ॥

উদ্ধব দাস।

মঙ্গল।

নবঘন জিনি তনু, দক্ষিণ করেতে বেণু, সুবলের কান্ধে বাম-ভুজ।
চূড়া শিখি-পুচ্ছ, বরিহা মালতী-গুচ্ছ, ভাঙভঙ্গী নয়ান-অম্বুজ॥
অলকা-তিলকা ভালে, কাণে মকর-কুণ্ডলে, পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর।
দশন মুকুতা-পাঁতি, কম্বু-কণ্ঠ শোভা অতি, মণি-রাজ হিয়া পরিসর॥
বনমালা তহিঁ লম্বে, সারি সারি অলি চুম্বে, ক্ষীণ কটি সুপীত বসন।
নাভি-সরোবর পাশে, ত্রিবলী লতিকা ভাসে, নিমগন রমণীর মন।
রামরম্ভা-উরু ছান্দে, কত বিধু নখচান্দে, অরুণ কমল পদ-তলে।
দাড়াঞা কদম্ব তলে, বঙ্কিম লগুড় হেলে, রঙ্গভঙ্গী নয়ান-অঞ্চলে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রঙ্গে, বেশ নটবর অঙ্গে, হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে।
এ দাস উদ্ধব ভণে, ভুলিল রমণীগণে, রূপ দেখি নিমিখ না চলে॥

কামোদ।

কালিয়া রূপ, মরমে লাগিয়া, সোয়াস্তি না হয় মনে।
বিরলে বসিয়া, সখীরে কহই, দেখাইলে রহে প্রাণে॥
এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে, পটের উপরে লেখি॥
আনি চিত্রপট, রাইয়ের নিকট, সমুখে রহিলা সখী।
সে রূপ দেখিয়া, মুরছিত হৈয়া, পড়িলা কমল-মুখী॥
মন্দাকিনী পারা, শত শত ধারা, ও দুটি নয়ানে বহে।
করহ চেতন, পাবে দরশন, দাস উদ্ধবে কহে॥ ৩

গুর্জ্জরী ধামাল।

রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দদুলাল।
অরুণিত মরকত, অরুণিত হেমযুত, ঐছন মুরতি রসাল॥
অরুণাম্বর বর, শোভে কলেবর, অরুণ মোতি মণি-মাল।
নটপটি পাগ, উপরে শিখি-চন্দ্রক, ওড়নি রঙ্গ গোলাল॥
দুহুঁ করে আবির, দুহুঁ অঙ্গে ডারত, পিচকারী রঙ্গে পাথাল।
অরুণিত যমুনা-পুলিন কুঞ্জবন, অরুণিত যুবতী জাল॥
অরুণিত তরুকুল, অরুণ লতাফুল, অরুণ ভ্রমরগণ ভাল।
অরুণিত সারী শুক, অরুণ শিখী কোকিল, উদ্ধব ভণিত রসাল॥

সুহিনী।

মুরলীরে! মিনতি করয়ে বারে বার।
শ্যামের অধরে রৈয়া, 'রাধা রাধা' নাম লৈয়া, তুমি যেনে না বাজিহ আর।
পরের বদনে থাক, নাম ধরি সদা ডাক, গুরুজনা করে অপযশ।

খল হয় যেই জনা, সে কি ছাড়ে খলপনা, তুমি কেনে হও তার বশ॥
তোমর মধুর স্বরে, রহিতে নারি এ ঘরে, নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান।
পহিলে বাজিলে যবে, কুলশীল গেল তবে, অবশেষে আছে মোর প্রাণ॥
যে বাজিলে সেই ভাল, ইথেই সকল গেল, তোরে আমি কহিনু নিশ্চয়।
এ দাস উদ্ধবে, ভণে, যে বংশীর গান শুনে, সে জন তাজেই কুলভয়॥

নরোত্তম দাস।

নরোত্তমের পদাবলী,—নরোত্তমের প্রেম-ভক্তি-চন্দ্রিকা, হাটপত্তন প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণব-সমাজে বড় আদরের সামগ্রী।

ইহাঁর নিবাস রাজসাহী জেলার গোপালপুর গ্রামে। গোপালপুর পদ্মাতটে। ইহাঁর পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত। মাতার নাম নারায়ণী দাসী। ইহাঁরা কায়স্থ। রাজৈশ্বর্য্যে নির্ম্মম হইয়া, রাজপুত্র নরোত্তম সংসার ত্যাগ করেন,—বৃন্দাবনবাসী লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষিত হন। শুনিতে পাই, নরোত্তম শূদ্র হইলেও, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ইহাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁরই শিষ্য কবি বসন্ত রায় এবং গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

নরহরি চক্রবর্ত্তীগ্রথিত ভক্তি-রত্নাকরে নরোত্তমের পরিচয় এইরূপ;—

"মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম। দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম॥
সর্ব্ব প্রকারেতে গৃহে হইলা প্রবীণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুণে মগ্ন রাত্রিদিন॥
প্রেম ভক্তিময় মূর্ত্তি প্রভুর ইচ্ছাতে। মহারাজ বিষয় না ভায় কভু চিতে॥
অল্পকালে এই চিন্তা করে রাত্রিদিন। কিরূপে ছাড়িব গৃহ হব উদাসীন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগণে। করয়ে বিজ্ঞপ্তি অশ্রু ঝরে দুনয়নে॥
স্বপ্নছলে প্রভুগণ সহ দেখা দিয়া। প্রিয় নরোত্তমে স্থির কৈল দেখা দিয়া॥
অকস্মাৎ গৌড়-রাজ-মনুষ্য আইল। গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল॥
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা। প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হইলা॥
অতি সুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী। পুত্রগত প্রাণ চেষ্টা কহিতে না জানি॥
স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে। পুত্র যে ছাড়িবে ঘর ইহা নাহি জানে॥
হেথা নরোত্তম অতি সংগোপন হইয়া। করিলেন যাত্রা প্রভু-চরণ চিন্তিয়া॥
কিবা নব্য যৌবন সে পরম সুন্দর। কার্ত্তিক পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর॥
ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা। লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে। করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে॥

১৫০৪ শকে ইনি বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমন করেন। ইহাঁর পিতা কৃষ্ণানন্দের রাজধানী ছিল তখন খেতুরী গ্রামে। এই খেতুরীর এক ক্রোশ দূরে নরোত্তমের নিমিত্ত একটী "ভজন-বেদিকা" নির্ম্মিত হয়। নরোত্তম,—এই স্থানে বসিয়া ভজন-সাধনে নিবিষ্ট রহিতেন।

ইহাঁরই একান্ত ইচ্ছায়,—রাজা সন্তোষ দত্ত খেতুরে ছয়টী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন,—যথা শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লবীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ এবং রাধাকান্ত। এই উপলক্ষে খেতুরী ধামে সাত দিন কাল ধরিয়া বিরাট মহোৎসব হইয়াছিল। বহু স্থান হইতে বহু ভক্ত বৈষ্ণব এই মহোৎসব দর্শনে খেতুরী গমন করিয়াছিলেন। ইহাই খেতুরীর মহোৎসব।

নরোত্তমের অন্যান্য গ্রন্থাবলী,—সদ্ভাবচন্দ্রিকা, রসভক্তিচন্দ্রিকা, সিদ্ধ-ভক্তিচন্দ্রিকা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, রাগমালা, স্মরণমঙ্গল, কুঞ্জবর্ণন, চমৎকার-চন্দ্রিকা, সাধ্য প্রেমচন্দ্রিকা, সাধনভক্তি চন্দ্রিকা, চন্দ্রমণি, সূর্য্যমণি, গুরুশিষ্যসংবাদ, উপাসনাপটল, প্রেমভক্তি-চিন্তামণি তাঁহার 'প্রার্থনা' —অনুপম।

পরম শ্রদ্ধাপদ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় "শ্রীনরোত্তম চরিত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

"সংসারে বিপুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থাকিয়া যে কঠোর ভজন সাধন করা যায়, ইহার উদাহরণ স্থলে ঠাকুর মহাশয় হইলেন। ইনি রাজার ছেলে, পিতা রাজা, মাতা রাণী, উভয়ে বর্ত্তমান। রাজধানী তাঁহার বাসস্থান। এরূপ স্থলে থাকিয়া বিষয় হইতে অন্তর থাকা অতি কঠিন, অসম্ভব। ঠাকুর মহাশয় তাহাই করিলেন।

"ঠাকুর মহাশয়ের নূতন যৌবন। দার-পরিগ্রহ করিলেন না। যাঁহারা এরূপ ব্রহ্মচর্য্য লয়েন, তাঁহারা সমাজের প্রলোভনের মধ্যে না থাকিয়া, বনে বাস করেন। কিন্তু ঠাকুর মহাশয় গৃহে রহিলেন, তবু তাঁহার বিশুদ্ধ চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে পারিল না।"

নরোত্তমদাসের হাটপত্তন,—

"শচীগর্ভ সিন্ধু মাঝে চন্দ্রের প্রকাশ। পাপতাপ দূরে গেল তিমির বিনাশ॥
ভকত চকোর তার মধুপান কৈল। অমিয়া মথিয়া তাপ বিস্তার করিল॥

পুর্ণকুম্ভ নিত্যানন্দ অবধৌত রায়। ইচ্ছা ভরি পান কৈল অদ্বৈত তাহায়।
চাকিয়া চাকিয়া খায় আর যত জন। প্রেমদাতা নিতাই চাঁদ পতিত পাবন॥
প্রেমেতে সমুদ্র ভেল চৈতন্য গোসাঞি। নদী নালা সব আসি হৈল এক ঠাই॥
পরিপুর্ণ হয়ে বহে প্রেমামৃত ধারা। হরিদাস পাতিল তাহে নাম নৌকা পায়া॥
সঙ্কীর্ত্তন-ঢেউ তাহে তরঙ্গ বাড়িল। ভকত-মকর তাহে ডুবিয়া রহিল॥
তৃণ কপি ভাসে যত পাষণ্ডীর গণে। ফাফরে পড়িয়া তারা ভাবে মনে মনে॥
হরিনামের নৌকা করি নিতাই সাজিল। দাঁড় ধরি হরিদাস বাহিয়া চলিল॥
প্রেমের পাথারে নৌকা ছাড়ি দিল যবে। কুল পাব বলি কেহ নৌকা ধরে লোভে॥
চৈতন্যের ঘাটে নৌকা চাপিল যখন। হাটপত্তন নিতাই চাঁদ রচিল তখন।
ঘাটের উপরে হাট খানা বসাইল। পাষণ্ডদলন বলি নিশান গাড়িল॥
চারিদিকে চারি রস কুঠারি পুরিয়া। হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া।
চৌকিদার হরিনাম ফুকারে ঘনে ঘন। হাট করি বেচ কিন যার সেই মন॥
হাটে বসি রাজা হৈল প্রভু নিত্যানন্দ। মুচ্ছুদ্দি হইলা তাহে মুরারী মুকুন্দ।
ভাণ্ডারী চৈতন্য দাস আর গদাধর। অদ্বৈত মুন্সী ভেল পরখাই দামোদর।
প্রেমের রমণী ভেল দাস নরহরি। চৈতন্যের ঘাটে ফিরে লইয়া গাগরি॥
ঠাকুর অভিরাম আইল হাসিয়া হাসিয়া। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়ে ফেরেন গর্জ্জিয়া।
আর কত ভক্ত আইল মণ্ডলি করিয়া। হাট মধ্যে বৈসে সব সদাগর হৈয়া॥
দাঁড় ধরি গৌরদাস পণ্ডিত ঠাকুর। তৌল করি ফেলেন প্রেম যড়া যত দূর॥
শ্রী নিবাস শিবানন্দ লিখেন দুইজন। এইমত প্রেমসিন্ধু হাটের পত্তন॥
সঙ্কীর্ত্তন রূপ মদ হাটে বিকাইল। রাজাজ্ঞা শিরেতে ধরি সবে পান কৈল।
পান করি মত্ত সবে হইল বিহ্বল। নিতাই চৈতন্যের হাটে হরি হরি বোল॥
দীন হীন দুরাচার কিছু নাহি মানে। ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম দিলা জনে জনে।"

নরোত্তমদাসের প্রার্থনা,—

"নিতাই পদ কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল, যে ছায়ায় জগত যুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতায়ের পায়॥
সম্বন্ধ নাহিক যার, বৃথা জন্ম গেল তার, সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে, বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, নিতাই পদ পাসরিয়ে, অসত্যেরে সত্য করি মানি।
নিতায়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ভজ নিতায়ের চরণ দুখানি॥
নিতাই চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা কর আশ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী, রাখ রাখ চরণের পাশ॥

ওরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুমি গৃহ বিষকূপে, দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ॥

তাপ-ত্রয়-বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে, দেহ সদা হয় অচেতন ॥
রিপু-বশ-ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাসরিল, বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়, কায়মনে লওরে শরণ।
পামর দুর্মতি ছিল, তাঁরে গোরা উদ্ধারিল, তারা হৈল পতিতপাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজে, বান্ধহ হৃদয় মাঝে, কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাস কয়, গোরা সম হেন নয়, না ভজিয়ে দেন প্রেমধন ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের দুটি পদ, যাঁর পদ সম্পদ, সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা, হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়, তারে মুঞি যাই বলিহারি।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্য লীলা তারে স্ফুরে, সে জন ভকতি অধিকারী ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে, সে যায় ব্রজেন্দ্র-সুত-পাশ।
শ্রীগৌর-মণ্ডল ভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি, তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥
গৌর-প্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেই ডুবে, সেবা রাধা মাধব অন্তরঙ্গ ॥
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে, নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সুসম্পদ, শুন ভাই হয়ে এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে, আর সব মরে অকারণ ॥
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু, আর নাহি ভূষণের অন্ত।
বৈষ্ণব চরণ জল, কৃষ্ণভক্তি দিতে বল, আর কেহ নাহি বলবন্ত ॥
তীর্থ জল ত্রিভুবনে, লিখিয়াছেন পুরাণে, সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পদোদক, ভূষণ করি মস্তক, যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মনে, আনন্দিত অনুক্ষণে, সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে, মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, করি মুই নিবেদন, মুই বড় অধম দুরাচার।
দারুণ সংসার নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি, কেশে ধরি মোরে কর পার ॥
বিধি বড় বলবান, না শুনে অধম জ্ঞান, সদাই করম পাশে বান্ধে।
না দেখি চরণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ, অনাথ কাতর তেঁই কান্দে ॥
কাম ক্রোধ মদ যত, নিজ অভিমান তত, আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন, কুপথ বিপথ নাহি মানে ॥
না লইনু সত মত, অসতে মজিল চিত, তুয়া পদে না করিনু আশ।
নরোত্তম দাস কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়, এই বার তরায়ে লহ পাশ ॥

হরি হরি! মোর করম অতি অভাগী।
বিফলে জনম গেল, হৃদয়ে পহিল শেল, নাহি ভেল হরি অনুরাগী॥
যজ্ঞ দান তীর্থ স্নান, পুণ্য কর্ম্ম ধর্ম্ম জ্ঞান, অকারণে সব গেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপবাস হয় যেন, বস্ত্রহীন অলঙ্কার দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ কারণ।
সদত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইলে শমন॥
শ্রুতিস্মৃতি সদা কয়, শুনিয়াছি এই হয়, হরিপদ অভয় শরণ।
জনম হইল সুখে, রাধা কৃষ্ণ বল মুখে, চিত্তে কর ওরূপ ভাবন॥
রাধাকৃষ্ণ পদাশ্রয়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে যাউক ভাবনা।
নরোত্তম দাস কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মম সঁপিনু আপনা॥

———

হরি হরি! আর কি এমন দশা হব।
এ ভব সংসার ত্যজি, পরম আনন্দে মজি, আর কবে ব্রজভূমে যাব॥
সুখ জয় বৃন্দাবন, কবে হবে দরশন, সে ধূলি মাখিব কবে গায়।
ভাবে গদ গদ হয়ে, রাধাকৃষ্ণ নাম লয়ে, কান্দিয়া বেড়াব উভরায়॥
নির্ভয়ে নিকুঞ্জে যায়ে, অষ্টাঙ্গ প্রণাম হয়ে, ডাকিব হা রাধানাথ বলি।
কবে যমুনার তীরে, পরশ করিব নীরে, কবে পিব করপুটে তুলি॥
আর কবে এমন হব, শ্রীরাস মণ্ডলে যাব, কবে গড়াগড়ি দিব তায়।
সখীর অনুজ্ঞা হয়ে, কৃষ্ণসেবা লব চায়ে, দোঁহে ডাকিবে সখী আয়॥
কিবা গোবর্দ্ধন গিরি, দেখিব নয়ন ভরি, রাধাকুণ্ড করিব প্রণাম।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে কবে, এ দেহ পতন হবে, এই আশা করে নরোত্তম॥

———

হরি হরি! আর কবে পালটিবে দশা।
এ সব করিয়া বামে, যাব বৃন্দাবন-ধামে, এই মনে করিয়াছি আশা॥
ধন জন পুত্র দারে, এ সব করিয়া দূরে, একান্ত করিয়া কবে যাব।
সর্ব্ব দুঃখ পরিহরি, ব্রজপুরী বাস করি, মাধুকরী মাগিয়া খাইব॥
যমুনার জল যেন, অমৃত সমান হেন, কবে পিব উদর পুরিয়া।
কবে রাধাকুণ্ড জলে, স্নান করি কুতূহলে, শ্যামকুণ্ডে রহিব পড়িয়া॥
ভ্রমিব দ্বাদশ বনে, কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে, প্রেমে গড়াগড়ি দিব তায়।
সুধাইব জনে জনে, ব্রজবাসিগণ স্থানে, নিবেদিব শ্রীচরণে কায়॥
ভজনের স্থান কবে, নয়ন গোচর হবে, আর যত আছে উপবন।
তার মধ্যে বৃন্দাবন, নরোত্তম দাসের মন, আশা করে যুগল চরণ॥
করঙ্গ কৌপীন লয়ে, ছেড়া কান্থা গায়ে দিয়ে, তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে, ব্রজের নিকুঞ্জ কবে, যাইয়া করিব নিজালয়॥

হরি হরি! কবে মোর হইবে সুদিন।
ফল মূল বৃন্দাবনে, খাব দিবা অবসানে, ভ্রমিব হইয়া উদাসীন॥
শীতল যমুনা-জলে, স্নান করি কুতূহলে, প্রেমাবেশে আনন্দ হইয়া।
বাহুপর বাহু তুলি, বৃন্দাবনে কুলি কুলি, কৃষ্ণ বলি বেড়াব কান্দিব॥
দেখিব সঙ্কেত স্থান, যুড়াবে তাপিত প্রাণ, প্রেমাবেশে গড়াগড়ি দিব।
কাঁহা রাধা প্রাণেশ্বরী, কাঁহা গোবর্দ্ধন গিরি, কাঁহা নাথ বলিয়া কান্দিব॥
মাধবী কুঞ্জের পরি, তাহে বসে শুক সারী, গায় সদা রাধাকৃষ্ণের রস।
তরুতলে বসি তাহা, শুনি পাসরিব দোঁহা, কবে সুখে গোঙাব দিবস।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন সাথ, দেখিব রতন সিংহাসনে।
দীন নরোত্তম দাস, করে এই অভিলাষ, এমতি হইবে কত দিনে॥

হরি হরি কবে বৃন্দাবন বাসী। নিরখিব নয়ন যুগলে রূপরাশি॥
তাজিব শয়ন সুখ বিচিত্র পালঙ্ক। কবে ব্রজের ধূলায় সব হবে অঙ্গ॥
ষড়রস ভোজন দূরেতে পরিহরি। কবে ব্রজে মাগিয়া খাইব মাধুকরী॥
পরিক্রমা করিয়া ফিরিব বনে বনে। বিশ্রাম করিব গিয়া যমুনা পুলিনে॥
তাপ দূর করিব শীতল বংশীবটে। কবে কুঞ্জে বসিব সে বৈষ্ণব নিকটে॥
নরোত্তম দাস কহে করি পরিহার। হেন দশা কবে আর হইবে আমার॥

নরোত্তম দাসের পদাবলী,—

বিভাস।

যজ্ঞ দান তীর্থস্নান, পুণ্যকর্ম্ম ধর্ম্মজ্ঞান, অকারণ সব ভেল মোহে।
বুঝিলাম মনে হেন, উপহাস হয় যেন, বসনহীন অভরণ দেহে॥
সাধুমুখে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ কারণে।
সতত অসৎ সঙ্গ, সকলি হইল ভঙ্গ, কি করিব আইল শমনে॥
শ্রুতিস্মৃতি সদা রবে, শুনিয়াছি এই সবে, হরিপদ অভয় শরণ।
জনম লইয়া সুখে, কৃষ্ণ না বলিলাম মুখে, না করিলাম সে রূপ-ভাবন।
রাধা-কৃষ্ণ-দুহুঁ পায়, তনু মন রহু তায়, আর দূরে রহুক বাসনা॥
নরোত্তমদাস কয়, আর মোর নাহি ভয়, তনু মন সঁপিনু আপনা॥

সারঙ্গ।

আরে ভাই! বড়ই বিষম কলি-কাল।
গরলে কলস ভরি, মুখে তার দুগ্ধ পূরি, তৈছে দেখ সকলি বিটাল॥
ভকতের ভেক ধরে, সাধুপথ নিন্দা করে, গুরুদ্রোহী সে বড় পাপিষ্ঠ।
গুরু-পদে যার মতি, খাট কয়ায় তার রতি, অপরাধী নহে গুরু-নিষ্ঠ॥
প্রাচীন প্রবীণ পথ, তাহা দোষে অবিরত, করে দুষ্ট-কথার সঞ্চার।
গঙ্গা-জল যেন নিন্দে, কূপ-জল যেন বন্দে, সেই পাপী অধম সবার।

যার মন নিরমল, তারে করে টলমল, অবিশ্বাসী ভকত পাষণ্ড।
হেতু সে খলের সঙ্গ, মৃদুমতি করে অঙ্গ, তার মুণ্ডে পড়ে যেন দণ্ড॥
কাল-ক্রিয়া লেখা ছিল, এবে পরতেক ভেল, অধমের শ্রদ্ধা বাড়ে তায়।
নরোত্তম দাস কহে, এ জনার ভাল নহে, এরূপে বঞ্চিল বিহি তায়॥

নরোত্তম দাসের প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা,—

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধরাতল, বৃন্দাবন লীলাস্থল, সুপ্রকাশ প্রেমানন্দ ধন।
যাহাতে প্রকট সুখ, নাহি জরা মৃত্যু দুঃখ, কৃষ্ণ-লীলা রস অনুক্ষণ॥
রাধা কৃষ্ণ দোহে প্রেম, শতবান যেন হেম, হাজার হিল্লোলে রসসিন্ধু।
নয়ন চকোর প্রাণ, কাম রতি করে ধ্যান, পিরীতি সুখের দোহে বন্ধু॥
রাধিকা প্রেয়সীবরা, বামদিকে মনোহরা, কনক-কেশর কান্তি ধরে।
অনুরাগে রক্তশাড়ি, নীল পদ্ম মনোহারী, অঙ্গে অঙ্গ ঝলমল করে॥
করয়ে লোচন পান, রূপলীলা দোঁহে ধ্যান, আনন্দে মগন সহচরী।
বেদ বিধি অগোচর, রতন-বেদিরোপর, সেবে নীতি কিশোর-কিশোরী॥
দুর্ল্লভ জনম তেন, নাহি ভজ হরি কেন, কি লাগিয়া মর ভব-বন্ধে।
ছাড় অন্য ক্রিয়া কর্ম্ম, নাহি দেখ বেদ ধর্ম্ম, ভক্তি কর কৃষ্ণ পাদপদ্মে॥
বিষম বিষয়ে রীতি, নাহি ভজ ব্রজপতি, নন্দের নন্দন সুখ-সার।
স্বর্গ আর অপবর্গ, সংসার-নরক ভোগ, সর্ব্বনাশ জনম-বিকার॥
দেহে না করিহ আস্থা, মৈলে দেহে কি অবস্থা, দুখের সমুদ্র কর্ম্ম গতি।
দেখিয়া শুনিয়া ভজ, সাধু শাস্ত্রমত যজ, যুগল চরণে কর রতি॥
জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে, তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
রাধাকৃষ্ণে নাহি রতি, অন্যদেবে বলে পতি, প্রেমভক্তি কিছু নাহি জানে।
নাহি ভক্তির সন্ধান, ভরম করয়ে ধ্যান, বৃথা তার সে ছার ভবন॥
জ্ঞান কর্ম্ম করে লোক, নাহি জানে ভক্তিযোগ, নানামতে হইয়া অজ্ঞান।
তার কথা নাহি শুনি, পরমার্থ তত্ত্ব জানি, প্রেমভক্তি পরম কারণ॥
জগৎ ব্যাপক হরি, অজভব আজ্ঞাকারী, মধুর মুরতী সার লীলা।
এইতত্ত্ব জানে যেই, পরম মহৎ সেই, তার সঙ্গ করিব সর্ব্বথা॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ, তাঁহে রহু মন তুষ্ট, ভজ তাঁতে ব্রজভাব হয়ে।
রসিক ভকত সঙ্গে, রহিবা পীরিতি রঙ্গে, ব্রজপুরে বসতি করিয়ে॥
আর কথা না শুনিব, আর কথা না কহিব, সকলি কহিব পরমার্থ।
প্রার্থনা করিব যথা, লালসা হে কৃষ্ণকথা, ইহা বিনু সকল অনর্থ॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যত, তাহা বা কহিব কত, অনন্ত অপার কেবা জানে।
ব্রজপুরে প্রেম নিত্য, এই সে পরম তত্ত্ব, ভজ সদা অনুরাগ মনে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র, শত শত রসকন্দ, পরিবার গোপ গোপী সঙ্গে॥

নন্দীশ্বর যার নাম, গিরিধারী যার নাম, সখী সঙ্গে তারে ভজ রঙ্গে ॥
প্রেমভক্তি তত্ত্ব তাই, তোমারে কহিল ভাই, আর দুর্ব্বাসনা পরিহরি।
শ্রীগুরু প্রসাদে ভাই, এ সব ভজন পাই, প্রেমভক্তি সখা পদ্ম স্মরি ॥
সার্থক ভজন পথ, সাধু সঙ্গ অবিরত, স্মরণ ভজন কৃষ্ণ-কথা।
প্রেমরস হয় যদি, তবে হবে মন শুদ্ধি, তবে যাবে হৃদয়ের ব্যথা ॥
বিষয় বিপত্ত জান, সংসার স্বপন মান, নর-তনু ভজনের মূল।
অনুরাগে ভজ সদা, প্রেমভাবে লীলা কথা, আর যত হৃদয়ের শূল ॥
রাধিকা চরণ রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, অনায়াসে পাবে গিরিধারী।
রাধিকা চরণাশ্রয়, যে করে স মহাশয়, তারে মুক্তি যাই বলিহারী ॥
জয় জয় রাধানাম, বৃন্দাবন যার ধাম, কৃষ্ণ সুখ বিলাসের নিধি।
হেন রাধাগুণ গান, না শুনিল মোর কান, বঞ্চিত করিল মোরে বিধি ॥
তার ভক্ত হয় যথা, রসলীলা প্রেম কথা, সে কহে সে পাবে ঘনশ্যাম।
ইহাতে বিমুখ যেই, তার কভু সিদ্ধি নাই, নাহি শুনি যেন তার নাম ॥
কৃষ্ণ নাম গুণে ভাই, রাধিকা চরণ পাই, রাধা নাম গানে কৃষ্ণচন্দ্র।
সংক্ষেপে কহিলা কথা, ঘুচাই মনের ব্যথা, সুখ নাই—অন্য কথা দ্বন্দ্ব ॥

যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী।

যদুনন্দন বিস্তর মধুর পদ গ্রন্থন করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণ-লীলাকদম্ব ইঁহার বিরাট গ্রন্থ,—এই গ্রন্থের শ্লোকসংখ্যা ছয় সহস্র। ইঁহার রচিত তিনটী পদ শুনুন,—

কর্ণাটিকা।

সজনি! সই শুন গোরা-অপরূপ গাথা।
বরজবধূর সঙ্গে, বিলাস গোপনরঙ্গে, ভুবন ভাসিল সেই কথা ॥ ধ্রু ॥
অঙ্গের সৌরভে কত, মনমথ উনমত, মধুকর ছলে উড়ি ধায়।
রঙ্গণ ফুলের মালা, হিয়ার উপরে খেলা, কুলবতী মতি মুরছায়।
গৌরবরণ দেখি, আর সব সেই শাখী, বলন গমন অঙ্গছটা।
গোকুলচাঁদের ছাঁদ, পরতেকে ভুরুফাঁদ, কুলবতী দুই কুলে কাঁটা ॥
কে আছে এমন নারী, নয়ান-সন্ধান হেরি, মুখচাঁদে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরজ ধরে, তবে সে যাইবে ঘরে, মনমথে না ক'রে বাউরী ॥
খেনে রাধা বলি ডাকে, নয়ান মুদিয়া থাকে, খেনে হাসে ভাবের আবেশে।
খেনে কাঁদে উভরায়, পুলকিত সর্ব্বকায়, এ যদুনন্দন ভালবাসে ॥

আশাবরী।

গৌর বরণ সোণা। ছটক চাঁদের জোনা॥
তরুণ অরুণ, চরণে থির, ভাবে বিয়াকুল মন॥
অরুণ নয়ানে ধারা। যনু সুরধুনী বারা॥
পুলক গহন, সিচয়ে সঘন, মহী জিনি ভার ভরা॥
বদনে ঈষৎ হাসি। তরুণী ধৈরজ নাশি।
খেনে খেনে, গদ গদ হরি বোলে, কাঁদনে ভুবন ভাসি॥
গদাই ধরিয়া কোলে। মধুর মধুর বোলে॥
আর কি আর কি, করিয়া কাঁদয়ে, না জানি কি রসে ভুলে॥
যে জানে সে জানে হিয়া। সে রসে মজিল থিয়া॥
এ যদুনন্দন ভণয়ে আকুলি, ওই না গোকুল পিয়া॥

মল্লারিকা।

সোই লো নদীয়া-জাহ্নবীকুলে। কো বিহি কেমনে গঢ়ল ও তনু, কনয়া শিরীষ ফুলে॥
কে না পরতীত যায়। বদন কমল, বাঁধুলি অধর, দশন কুনকি তায়॥
কাহারে কহিব কথা। কিংশুক কোরক, নাসিকা সুভগা, আঁখি উতপল রাতা॥
কহিতে না জানি মুখে। বাহু হেমলতা, উপরে পদুম, মল্লিকা ফুটল নখে॥
নয়ান আনন্দ সিন্ধু। পদতল থল, রাতা উতপল, নখে মোতিঙ্কল বিন্দু॥
পীরিতি সৌরভ ধরে। ত্রিভুবন জন, মাতল তা হেরি, পালটী না যায় ঘরে॥
হরি হরি হরি বোলে। না জানি কি লাগি, কাঁদয়ে গৌরাঙ্গ, দাস গদাধর কোলে॥
অতএ লাগয়ে ধন্দ। এ যদুনন্দন, কহে কি না জানো, ওই না গোকুলচন্দ॥

রামানন্দ বসু।



বৰ্দ্ধমান-কুলীনগ্রামে বিখ্যাত বসু বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহের নাম গুণরাজ খান বা মালাধর বসু। পিতার নাম সত্যরাজ খান। মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক বলিয়া প্রসিদ্ধ। রামানন্দ,—দ্বারকানগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। দ্বারকাধামেই মহাপ্রভুর সহিত ইহাঁর পরিচয়। ইহাঁর একটী পদ এইরূপ,—

পঠমঞ্জরী।

নাচয়ে চৈতন্য চিন্তামণি। বুক বাহি পড়ে ধারা মুকুতা-গাঁথনি।
প্রেমে গদ গদ হৈয়া ধরণী লোটায়। হুহুঙ্কার দিয়া ক্ষণে উঠিয়া দাঁড়ায়॥

ঘন ঘন দেন পাক ঊর্দ্ধ বাহু করি। পণ্ডিত জনারে পহু বোলয় হরি হরি ॥
হরিনাম করে গান জপে অনুখন। বুঝিতে না পারে কেহ বিরল লক্ষণ ॥
অপার মহিমা গুণ জগজনে গায়। বসু রামানন্দে তাহে প্রেমধন চায় ॥

দেবকীনন্দন দাস।

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। 'বৈষ্ণব বন্দনা' এবং 'বৈষ্ণবাভিধান' ইহাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাঁর গুরুদেবের নাম পুরুষোত্তম দাস। যথা বৈষ্ণব-বন্দনায়,—

"ইষ্টদেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম নাম। কি কহিব তাঁহার যে গুণ অনুপাম ॥
সর্ব্বগুণ হীন যে, তাহারে দয়া করে। আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে ॥
সপ্তম বৎসরে যার কৃষ্ণের উন্মাদ। ভুবন-মোহন নৃত্য শকতি অগাধ ॥"

ইহাঁর দুইটী পদ তুলিয়া দিতেছি ;—

গৌরী।

মরি লো নদীয়ার মাঝারে ও না রূপ। সোণার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ॥
অলকা তিলকা শোভে মুখের পরিপাটী। রসে ডুবু ডুবু করে রাঙ্গা আঁখি দুটী ॥
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়। গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি পরাণ কোথা রয় ॥
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ ফুলের মালা। কত রস লীলা জানে কত রস কলা ॥
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোচা। চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা ॥
দেবকীনন্দন বলে শুন লো আজুলী। তুমি কি না জান গোরা নাগর বনমালী ॥

ভাটিয়ারি।

ভুবনমোহন গোরা, রূপ নেহারিয়া আজু, নয়ান সার্থক ভেল মোর।
ও চাঁদ মুখের কথা, অমিঞা সমান জনু, শ্রবণে সার্থক শ্রুতি জোর ॥
এদুহুঁ নাসিকা মঝু, সার্থক হোয়ল সই, গৌর গুণমণি-অঙ্গগন্ধে।
এ চিত-ভোমরা মঝু, অতিহুঁ সার্থক ভেল, মধু পীয়ে ও পদারবিন্দে ॥
এ কাঠ কঠিন হিয়া, সার্থক হোয়ব কবে, ও নাগরে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া।
এ কুচ-কমল মঝু, সার্থক হোয়ব কবে, ও ভোমরে মকরন্দ দিয়া ॥
এ গণ্ডযুগল মঝু, সার্থক হোয়ব কবে, ও না মুখের চুম্বন লভিয়া।
দেবকীনন্দন শির, সার্থক হোয়ব কবে, নাথের চরণে লুটাইয়া ॥

নয়নানন্দ দাস।

ইহাঁর পিতার নাম বাণীনাথ মিশ্র। ইনি গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। মুর্শিদাবাদ-ভরতপুর গ্রামে অদ্যাপি ইহাঁর বংশধর বর্ত্তমান। ভরতপুরের "গোপীনাথ,"—গদাধর পণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত। নয়নানন্দের প্রকৃত নাম,—ধ্রুবানন্দ। ইহাঁর দুইটী পদ শুনুন,—

দুহু দুহু পিরীতি আরতি নাহি টুটে পরশে পরম কত কত সুখ উঠে॥
নাচয় গৌরাঙ্গ মোর গদাধর রসে। গদাধর নাচে পুনঃ গৌরাঙ্গ বিলাসে॥
প্রকৃতি পুরুষ কিবা জানকী শ্রীরাম। রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেব কাম॥
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি। উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি॥
মুখচাঁদ কি বর্ণিব নিতি জীয়ে মরে। করপদে পদ্ম কিবা হিমে সব ঝরে॥
প্রেম কীর্ত্তনসুখ নদীয়ানগরে। প্রেমের গৃহিণী সে পণ্ডিত গদাধরে॥
প্রেম-পরশ-মণি শচীর নন্দন। উদ্ধারিল জগজন দিয়া প্রেমধন॥
কহয়ে নয়নানন্দ চন্দ্র বিহার। শুনিতে হরয়ে মন ইথে কি বিচার॥

ধানশী।

সজনি অপরূপ দেখসিয়া। নাচয়ে গৌরাঙ্গচাঁদ হরিবোল বলিয়া॥
সুগন্ধি চন্দন সার, করবীর মাল, গোরা অঙ্গে দোলে হিলোলিয়া।
পুরুষ পরোক্ষ ভাব, পরতেক দেখ লাভ, সেই এই গোরা বিনোদিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে, মধুর মুরলী চাহে, বাঁধে চূড়া চাঁচর চিকুরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে, মালসাট মারে বুকে, ক্ষণে বোলে মুই সেই ঠাকুরে॥
জাহ্নবী যমুনা ভ্রম, তীরে তরু বৃন্দাবন, নবদ্বীপে গোকুল মথুরা।
কহয়ে নয়নানন্দ, সেই সখা সখীবৃন্দ, কালাতনু এবে হৈল গোরা॥

পরমেশ্বর দাস।

ইহাঁর জন্মস্থান,—কাউগ্রাম,—কিন্তু প্রধানতঃ ইনি খড়দহেই বাস স্থাপন করেন। নিত্যানন্দ প্রভু ইহাঁর গুরুদেব।

খেতরির মহোৎসবে ইনি উপস্থিত ছিলেন। তথা হইতে বৃন্দাবন যাত্রা করেন। অতঃপর কিছু কাল ইনি গরলগাছা গ্রামে অবস্থান

শেষে জাহ্নবা ঠাকুরাণীর আদেশে তড়া-আঁটপুর গ্রামে ইহাঁর অবস্থিতি হয়। এই গ্রামের "রাধা-গোপীনাথ" ইহাঁরই স্থাপিত। এক্ষণে এই বিগ্রহ শ্যামসুন্দর নামে পরিচিত।

ধানশী।

এক দিন পহুঁ হাসি, অদ্বৈতমন্দিরে বসি, বলিলেন শচীর কুমার।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, অদ্বৈত বসিয়া রঙ্গে, মহোৎসবের করিলা বিচার॥
শুনিয়া আনন্দে আসি, সীতাঠাকুরাণী হাসি, কহিলেন মধুর বচন।
তা শুনি আনন্দমনে, মহোৎসবের বিধানে, বোলে কিছু শচীর নন্দন॥
শুনি ঠাকুরাণী সীতা, বৈষ্ণব আনিয়া এথা, আমন্ত্রণ করিয়া যতনে।
যে বা গায় যে বা বায়, আমন্ত্রণ করি তায়, পৃথক্ পৃথক্ জনে জনে॥
এত বলি গোরারায়, আজ্ঞা দিল সবাকায়, বৈষ্ণব করহ আমন্ত্রণ।
খোল করতাল লৈয়া, অগুরু চন্দন দিয়া, পূর্ণ ঘট করহ স্থাপন॥
আরোপণ কর কলা, তাহে বাঁধি ফুলমালা, কীর্ত্তনমণ্ডলী কুতূহলে।
মালাচন্দন গুয়া, ঘৃত মধু দধি দিয়া, খোল মঙ্গল সন্ধ্যাকালে।
শুনিয়া প্রভুর কথা, প্রীতে বিধি কৈল যথা, নানা উপহার গন্ধবাসে।
সবে হরি হরি বলে, খোল মঙ্গল করে, পরমেশ্বরী দাস রসে ভাসে॥

আত্মারাম দাস।

বর্দ্ধমান-শ্রীখণ্ড গ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি। জাতি অম্বষ্ঠ। ইহাঁর দুইটী পদ শুনুন,—

মঙ্গল।

অঞ্জন গঞ্জন লোচন রঞ্জন, গতি অতি ললিত সুঠান।
চলত খলত পুন, পুন উঠি গরজন, চাহনি বঙ্ক নয়ান॥
গৌর গৌর বলি, ঘন দেই করতালি, কঞ্জ নয়ানে বহে লোর।
প্রেমেতে অবশ হৈয়া, পতিতেরে নিরখিয়া, আইস আইস বলি দেই কোর॥
হুহুঙ্কার গরজন, মালসাট পুনঃ পুন, কত কত ভাব বিথার।
কদম্বকেশর জনু, পুলকে পূরল তনু, ভাইয়ার ভাবে মাতোয়ার॥
আগম নিগম পর, বেদবিধি অগোচর, তাহা কৈল পতিতের দাস।
কহে আত্মারাম দাসে, না পাইয়া কৃপা-লেশে, রহি গেল পাষাণ-সমান॥

ভাটিয়ারি।

আরে মোর নিতাই নাগর।
সংসার সাগর, জীবের জীবন, নিতাই মোর সুখের সাগর ॥ ধ্রু ॥
অবনী-মণ্ডলে, আইলা নিতাই, ধরি অবধূত-বেশ।
পদ্মাবতী-নন্দন, বসু জাহ্নবার জীবন, চৈতন্য লীলায়ে বিশেষ ॥
রাম অবতারে অনুজ আছিলা, লক্ষ্মণ বলিয়া নাম।
কৃষ্ণ-অবতারে, গোকুল-নগরে, জ্যেষ্ঠ ভাই বলরাম ॥
গৌর-অবতারে, নদীয়া বিহরে, ধরি নিত্যানন্দ নাম।
দীনহীন যত, উদ্ধারিলা কত, বঞ্চিত দাস আত্মারাম ॥

রসিকানন্দ দাস।

নিবাস নীলাচল। ১৫১২ শকে ১০ই কার্ত্তিক রবিবার ইনি জন্ম-করেন। ইঁহার পিতা,—রাজা অচ্যুতানন্দ; মাতা ভবানী। অচ্যুতা-নন্দের আর এক পুত্র মুরারি। মুরারিও কবি বলিয়া প্রসিদ্ধ।

উৎকলে গৌরাঙ্গ-ধর্ম্ম-প্রচারে রসিকানন্দের কৃতিত্ব সুপ্রচুর। অনেক দুর্দ্দান্ত লোকেও ইঁহার গুণে হরি-প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া উঠে। রসিক-মঙ্গল ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

ইঁহার দীক্ষাগুরু,—বল্লভপুরনিবাসী শ্যামানন্দ! রসিকানন্দ,—খেতুরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। যথা নরোত্তম-বিলাসে,—

"শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দাদি। সভে মিলাইলা নরোত্তম গুণনিধি ॥
রামচন্দ্র সহ নরোত্তম মহাশয়। শ্যামানন্দে লৈয়া গেলা অপূর্ব্ব আলয় ॥"

ইঁহার দুইটী পদ শুনাইতেছি;—

ধানশী।

নিরবধি মোর, হেন লয় মনে, ক্ষণে ক্ষণে অনিমিষে।
নয়ন ভরিয়া, গৌরাঙ্গবদন, হেরিয়া মন হরিষে ॥
আই আই কিয়ে, সেরূপ মাধুরী, নিরমিল কোন বিধি।
নদীয়ানাগরী, সোহাগে আগরী, পাইল রসের নিধি ॥
অপরূপ রূপ, কেশর করিয়া, ইচ্ছার হিয়ায় লেপি।

সোণার বরণ, বসন পরিয়া, জীবন-যৌবন স'পি ॥
চুলের চাঁপা, ফুল হেন করি, আউলাঞা করিঞা দেখা।
লাজভয় ছাড়ি, লোকে উড়ি পড়ি, দুবাহু করিয়া পাখা ॥
পীরিতি মূরতি, চিত্র বনাইয়া, কহিব মনের কথা।
ভরি বুকে বুকে, রাখি মুখে মুখে, রসিক ঘুচাবে ব্যথা ॥

পাহিড়া।

কহে মধুশীল, আমি কি দুঃশীল, কি কর্ম্ম করিনু আমি।
মস্তক ধরিনু, পদ না সেবিনু, পাইয়া গোলকস্বামী ॥
যে পদে উদ্ভব পতিতপাবনী, তাহা না পরশ হৈল।
মাথে দিনু হাত, কেন বজ্রাঘাত, মোর পাপ মাথে নৈল ॥
যে চাঁচর চুল, হেরিয়া আকুল, হইত রমণী মন।
হৈনু অপরাধী, পাষাণে প্রাণ বাঁধি, কেন বা কৈনু মুণ্ডন ॥
নাপিত ব্যবসায়, আর না করিব, ফেলিনু এ ক্ষুর জলে।
পহু' সঞে যাব, মাগিয়া খাইব, রসিক আনন্দ বলে ॥

হরিবল্লভ দাস।

ইহাঁর অন্য প্রসিদ্ধ নাম বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী,—ইনি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, অলঙ্কার-কৌস্তুভ এবং বিদগ্ধমাধব প্রভৃতির প্রসিদ্ধ টীকাকার; ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, স্বপ্নবিলাসামৃত, গৌরাঙ্গ-লীলামৃত এবং চমৎকারচন্দ্রিকা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের গ্রন্থকার। বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থে ইনি হরিবল্লভ দাস নামেই পরিচিত।

নদীয়া জেলার দেবগ্রাম ইহাঁর জন্মভূমি; ১৫৮৬ শকে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সেই হরিবল্লভ সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। অতি বাল্যকাল হইতেই সংসারেও তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মে। পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া, পিতা,—পুত্রের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন ব্যবস্থা করিলেন, আর সুন্দরী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহও দিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। হরিবল্লভ অবিলম্বেই বৃন্দা-বনবাসী হইলেন। বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড তীরে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে রহিয়া, হরিবল্লভ ভক্তিসাধনা এবং গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করিলেন।

এই বৃন্দাবনেই ইনি ভাগবতের সারার্থদর্শিনী টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ১৬২৬ শকে সম্পূর্ণ হয়। ইঁহার দীক্ষা গুরুর নাম,—কৃষ্ণচরণ চক্রবর্ত্তী। মুরশিদাবাদ-সৈদাবাদে ইহাঁর নিবাস ছিল।

ইহাঁর একটী পদ,—

শ্যামের তনু অব গৌরবরণ।
গোকুল ছোড়ি অব, নদীয়া আওল, বংশী ছোড়ি কীরতন॥ ধ্রু॥
কালিন্দীতট ছোড়ি, সুর-সরিত তটে, অবহুঁ করত বিলাস।
অরুণবরণ ডোরকৌপীন অব, ছোড়ি পীতধড়া বাস॥
বামে নহত অব রাই সুধামুখী, ব্রজবধূ নহত নিয়ড়ে।
গদাধর পণ্ডিত, ফিরত বামে অব, সদা সঞ্চে ভকত বিহরে॥
ছোড়ি মোহনচূড়া, শিরে শিখা রাখল, মুখে কহত রারা রারা।
কহ হরিবল্লভ, ভেরছ চাহনি ছোড়ি, দুনয়নে গলত ধারা॥

রামচন্দ্র দাস গোস্বামী।

ইনি নবদ্বীপ-কুলিয়াপাহাড়নিবাসী বংশীবদন দাসের পৌত্র,—চৈতন্যদাসের পুত্র। ১৪৫৬ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাহ্নবা ঠাকুরাণীর পোষ্যপুত্র অপিচ মন্ত্র-শিষ্য।

রামচন্দ্র বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া, বৃন্দাবন গমন করেন। তথা হইতে রামকৃষ্ণ মূর্ত্তি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। বর্ত্তমান বাগনাপাড়া গ্রাম ইহাঁরই প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে এই স্থান ব্যাঘ্র-ভল্লূক-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যময় ইনিই জঙ্গল ঘুচাইয়া গ্রাম পত্তন করেন। এই গ্রামেই রামকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে ইহাঁর শিষ্য হইয়াছিলেন। ১৫০৬ শকে মাঘমাসের কৃষ্ণতৃতীয়ায় ইহাঁর তিরোধান হইয়াছে। ইহাঁর একটী পদ এইরূপ,—

শ্রীরাগ।

পহু মোর গৌরাঙ্গ রায়। শিব শুক বিরিঞ্চি যার মহিমা গুণ গায়॥ ধ্রু॥
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলি। সেই পহু বাহু তুলি কাঁদে হরি বলি॥
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম। সো অব কীর্ত্তন-ধূলি-ধূসর অবিরাম॥
খেনে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া। গদাধর নরহরি রহে মুখ চাঞা।
পরশ নিবিড় প্রেম পুলকিত অঙ্গ। রামচন্দ্র কহে কে না বুঝে ও রঙ্গ

রাধাবল্লভ দাস।



নিবাস কাঞ্চনগড়িয়া। পিতার নাম সুধাকর মণ্ডল। মাতার নাম শ্যামপ্রিয়া। কর্ণানন্দ গ্রন্থে রাধাবল্লভের গুণ-পরিচয় এইরূপ আছে ;—

"সুধাকর মণ্ডল প্রভুর ভৃত্য এক জন। তাঁর স্ত্রী শ্যামপ্রিয়া কৃপার ভাজন॥
তাঁর পুত্র রাধাবল্লভ মণ্ডল সুচরিত্র। হরি নাম বিনা যাঁর নাহি আর কৃত্য॥

রাধাবল্লভ ;—সংস্কৃত-বিলাপ ও কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন। এই সংস্কৃত গ্রন্থ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর লিখিত। রাধাবল্লভ দাস,— সনাতনগোস্বামীর সূচক ও সহজতত্ত্ব নামক আরও দুইখানি গ্রন্থের পদ্যানুবাদক।

ইহাঁর দুইটী পদ শুনুন,—

তুড়ী।

আনন্দ কন্দ নিতাই চন্দ, অরুণ নয়ান বয়ান ছন্দ,
কম্বু নূপুর সঘন ঝুর হরি হরি বলি বোল রে।
নটন রঙ্গ ভকত সঙ্গ, বিবিধ ভাব রসতরঙ্গ,
ঈষৎ হাস মধুর ভাষ সঘনে গীম দোল রে॥
পণ্ডিত কোর, জগত গৌর, এ দিন রজনী আনন্দে ভোর,
প্রেমরতন, করিয়া যতন, জগজনে করু দান রে।
কীর্ত্তন মাঝ রসিকরাজ, যৈছন কনয়া গিরি বিরাজ,
ব্রজবিহার, রসবিথার, মধুর মধুর গান রে॥
ধূলি ধূসর, ধরণী উপর, কবহুঁ অট্টহাস রে।
কবহুঁ লোটত, প্রেমে গরগর, কবহু চলিত কবহু খেলত,
কবহুঁ স্বেদ, কবহুঁ খেদ, কবহুঁ পুলক স্বর অভেদ,
কবহুঁ লম্ফ, কবহুঁ ঝম্প, দীর্ঘশ্বাস রে॥
করুণাসিন্ধু, অখিল বন্ধু, কলিযুগতম পুলক-ইন্দু,
জগতলোচন, পট মোচন, নিতাই পূরল আশ রে।
অন্ধ অধম দীন দুর্জ্জন, প্রেমদানে করিল মোচন,
পাওল জগত, কেবল বঞ্চিত, এ রাধাবল্লভ দাস রে॥

আড়ানি।

মনোমোহনিয়া গোরা ভুবন মোহনিয়া। হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া॥
রূপের ছটা যুবতী ঘটা বুক ভরিতে চায়। মন গরবের মানের গড় ভাঙ্গিলে মদন রায়॥
রঙ্গিল পাটের ডোর দুইদিগে সোণার নূপুর পায়। ঝুনর ঝুনর বাজিছে ঠমকে তায়॥

মালতীফুলে ভ্রমর বুলে মধ লোটনের দামে। কুলকামিনীর কুল মজিল গীম দোলনীর ঠামে।
আঁখির ঠারে প্রাণেতে মারে কহিতে সহিতে নারি। রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিলে চুরি।

বৈষ্ণব দাস।

ইহাঁর নিবাস ছিল টেক্রা বৈদ্যপুর। জাতি বৈদ্য। পূর্ব্বনাম গোকুলানন্দ সেন। রাধামোহন ঠাকুর ইহাঁর দীক্ষা-গুরু। পদ-কল্পতরু গ্রন্থের ইনিই সংগ্রাহক। গুরু রাধামোহন ঠাকুরের সম্পাদিত পদামৃত-সমদ্র দেখিয়াই, ইনি কল্প-তরু-বিরচনে ব্রতী হন। যথা কল্পতরু গ্রন্থে;—

"আচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধামোহন। কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীত কল্পতরু নাম কৈল সার। পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥"

ইহাঁর সুর আজ পর্য্যন্ত টেঞার ঢপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর দুইটী পদ;—

সুহই।

বিষয়ে সকলে মত্ত, নাহি কৃষ্ণনাম তত্ত্ব, ভক্তিশূন্য হইল অবনী।
কলিকাল-সর্পবিষে, দগ্ধ জীব মিথ্যারসে, না জানয়ে কেবা সে আপনি॥
নিজ কন্যা-পুত্রোৎসবে, মাতিয়া আছয়ে সবে, নাহি অন্য শুভ কর্ম্মলেশ।
যক্ষ পূজে মদ্যমাংসে, নানারূপ জীব হিংসে, এই মত হৈল সর্ব্বদেশ॥
দেখিয়া করুণা করি, কমলাক্ষ নাম ধরি, অবতীর্ণ হৈলা গৌড়দেশে।
ব্রজরাজকুমার, সঙ্গোপাঙ্গ অবতার, করাইব এই অভিলাষে॥
সর্ব্ব আগে আগুয়ান, জীবের করিয়া ত্রাণ, শান্তিপুরে হইলা প্রকাশ।
সকল দুস্কৃতি যাবে, সবে কৃষ্ণনাম পাবে, কহে দীন বৈষ্ণবের দাস॥

বসন্ত বা সুহই-কন্দর্প তাল।

মধুঋতু সময় নবদ্বীপ ধাম। সুরধুনীতীর সবহুঁ অনুপাম॥
কোকিল মধুকর পঞ্চমভাষ। চৌদিশে সবহুঁ কুসুম পরকাশ॥
ঐছন হেরইতে গৌরকিশোর। পূরুব প্রেমভরে পহুঁ ভেল ভোর॥
ঝর ঝর লোচন ঢরকত লোর। পুলকে পূরল তনু গদগদ বোল।
শুনহ মুকুন্দ মরম অভিলাষ। আজু নন্দ-নন্দন করত বিলাস॥

সো মুখ যদি হাম দরশন পাও। তব দুখ খণ্ডয়ে তছু গুণ গাও॥
মোহে মিলাহ ব্রজমোহন পাশ। এত কহি গৌরক দীর্ঘ নিশ্বাস॥
বুঝই না পারই ইহ অনুভাব। বৈষ্ণবদাসক অব দুখলাভ॥

জয়ানন্দ।

বর্দ্ধমান জেলার অধীন আমাইপুরা গ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র; মাতার নাম রোদনী। সুবুদ্ধি, গৌরাঙ্গ দেবের শিষ্য [illegible] পল্লী হইতে বর্দ্ধমান যাইবার কালে চৈতন্য [illegible] বাটীতে শুভগমন করেন। সেই সময়ই তিনি সুবুদ্ধির পুত্রের জয়ানন্দ নাম রাখেন। জয়ানন্দের পূর্ব্ব নাম ছিল গুইয়া।

জয়ানন্দ,—চৈতন্য মঙ্গল নামক গ্রন্থ রচনা করেন। লোচন দাসের চৈতন্য মঙ্গল হইতে জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল অনেকাংশেই বিভিন্ন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ঐতিহাসিকত্বে অপূর্ব্ব। তিনি লিখিয়াছেন,—একদিন মহাপ্রভু সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার পায়ে [illegible] বেদনায় তিনি শয্যাশায়ী হন; ইহাতেই তাঁহার তিরোধান ঘটে।

চৈতন্যদেব যখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই, বিশ্বরূপ যখন সবে মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন, তখন নবদ্বীপের অবস্থা কিরূপ, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল হইতে তাহার পরিচয় লউন;—

"আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম। দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥
নিরবধি ডাকা চুরি অরিষ্ট দেখিঞা। নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইঞা॥
তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিঞা কৌতুকে। বিশ্বরূপে দশকর্ম্ম করি একে একে॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়। ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে। ধন প্রাণ লয় তার জাতিনাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞসূত্র স্কন্ধে। ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী। প্রাণভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গাস্নান বিরোধিল হাট ঘাট যত। অশ্বত্থ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত॥
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥

জয়ানন্দ প্রণীত চৈতন্য মঙ্গলের বহু আদর বাঞ্ছনীয়। অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব এ গ্রন্থে নিহিত।

বৃন্দাবন দাস।

চৈতন্য-ভাগবত ইহাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। নিত্যানন্দ-বংশমালা নামক আর একখানি গ্রন্থও ইনি প্রণয়ন করেন।

ইহাঁর জন্মস্থান নবদ্বীপ। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মাতার নাম নারায়ণী। নারায়ণী শ্রীনিবাস আচার্য্যের ভ্রাতুষ্পুত্রী। ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে ২৮ বৎসর বয়সে ইনি ভাগবত রচনা আরম্ভ করেন। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৮২ বৎসর বয়সে ইহাঁর তিরোধান হইয়াছে।

ইহাঁর চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ প্রথমে চৈতন্য মঙ্গল নামেই অভিহিত হইয়াছিল। লোচনদাস ও স্বকীয় গ্রন্থের নাম রাখেন চৈতন্য মঙ্গল। গ্রন্থের নামকরণ লইয়া বৃন্দাবনদাস ও লোচনদাসে মত-বিরোধ উপস্থিত হয়। বৃন্দাবন দাসের জননী নারায়ণী তখন বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থের নাম রাখেন,—চৈতন্য ভাগবত। ইহাতে সকল বিরোধেরই মীমাংসা হইয়া যায়।

ইনি পদ কর্ত্তা বলিয়াও প্রসিদ্ধ। পদ-সমুদ্র-গ্রন্থে ইহাঁর বহু পদ সন্নিবেশিত। একটী পদ শুনাইতেছি;—চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে এই পদটী রচিত;—

"দুন্দুভি ডিণ্ডিম, বহরি জয়ধ্বনি, গাওয়ে মধুর বিশালরে।
বেদ অগোচর, ভেরিয়া গৌরবর, বিলম্বে নাহি আর কাজ রে॥
হরষে ইন্দ্রপুর, আনন্দে কোলাহল, সাজ সাজ বলি সাজ রে।
বহুপুণ্যে শ্রীচৈতন্য, প্রকাশিল আওল, নবদ্বীপ মাঝে রে॥
অন্যোন্যে আলিঙ্গন, চুম্বন ঘনে ঘন, লাজ কেহ নাহি মানে রে।
নদীয়াপুরবাসী, জনমে উল্লাসি, আপন পর নাহি জানে রে।
ঐছন কৌতুক, দেবতা নবদ্বীপে, আওল শুনি হরিনাম রে।
পাইয়া গৌররসে, বিভোর পরবসে, চৈতন্য জয় জয় গান রে॥
রহিলা শচীগৃহে, গৌরাঙ্গ পরকালে, একত্রে বৈসে কত চাঁদ রে।
মানুষরূপ ধরি, গ্রহণ ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরি নাম রে॥

সকল শক্তি সঙ্গে, আইলা গৌরাঙ্গে, পাষণ্ডি কেহ নাহি জান রে।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আদি ভক্তবৃন্দ, বৃন্দাবনদাস গুণ গান রে॥"

বর্দ্ধমান-দেনুড়নিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, দ্বিতীয় ভাগ বঙ্গরত্ন গ্রন্থে লিখিয়াছেন;—

১৪০৭ শকে শ্রীনবদ্বীপ ধামে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৪২৫ শকে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়ে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রভু নিত্যানন্দের সন্ন্যাসিবেশ দেখিয়া নবদ্বীপবাসী সকলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন। ঐ সকল ঠাকুরের মধ্যে শ্রীবাস ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের নারায়ণী নাম্নী ৯।১০ বৎসর বয়স্কা বিধবা কন্যা ছিল। নিত্যানন্দ প্রভু অপরাপর লোকের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নারায়ণীকে পুত্রবর প্রদান করিলেন। নারায়ণী অতিশয় লজ্জান্বিতা হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বলিয়াছিলেন, 'প্রভো! বিধাতার অকৃপায় আমি বিধবা, আপনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া বিধবাকে এরূপ নিদারুণ বর প্রদান করিলেন কেন?' তদুত্তর নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়াছিলেন, 'আমার আজ্ঞা কখনই অন্যথা হইবার নহে। মহাপ্রভুর তাম্বুলের চর্ব্বিতাবশিষ্ট ভক্ষণ করিয়া তোমার গর্ভ হইবে, তজ্জন্য কেহ কলঙ্কারোপ করিতে পারিবে না, তোমার গর্ব্ভে বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিবেন। তদনুসারে কিছুদিন পরে নারায়ণীর গর্ভ প্রকাশ হইল।

তাম্বুলের চর্ব্বিতাবশিষ্ট ভক্ষণ সম্বন্ধে বৃন্দাবন তাঁহার গ্রন্থে এইমত লিখিয়াছেন;—

"আপন গলার মালা দিল সভাকারে। চর্ব্বিত তাম্বুল আজ্ঞা হইল সভারে॥
মহানন্দে খায় সভে হরষিত হৈঞা। কোটিচন্দ্র শারদ মুখের দ্রব্য পাঞা॥
ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল। নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল॥
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান। তাহারে ভোজন শেষ প্রভু করে দান॥
পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ। সকল বৈষ্ণব তারে করে আশীর্ব্বাদ॥
ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ। বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন॥
খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয় নারায়ণী। কৃষ্ণের পরমানন্দে কাঁদ দেখি তুমি॥

হেন প্রভু চৈতন্তের আজ্ঞার প্রভাব। কৃষ্ণ বলি কাঁদে অতি বালিকাস্বভাব॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে যার ধ্বনি। চৈতন্তের অবশেষ পাত্রী নারায়ণী।"
(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড।)

"মধ্যখণ্ডে চৈতন্তের অবশেষ পাত্র। ব্রহ্মার দুর্লভ নারায়ণী পাইল মাত্র।"

ঠাকুর বৃন্দাবন নারায়ণীর গর্ভজাত পুত্র, তাহার প্রমাণ ;—

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ পাত্রে নারায়ণীর গর্ভজাত॥"
শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড।)

শ্রীচৈতন্যদেবের তাম্বুলের অবশিষ্ট ভক্ষণে বৃন্দাবন দাসের জন্ম বলিয়া শ্রীচৈতন্য ভাগবতের অনেক স্থলে শচী মাতাকে, বৃন্দাবন, আই বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—

"শ্যাম শুক্লরূপ দেখিলেন শচীআই।"

"যে দিবসে গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস। সে দিবস হইতে আইর উপবাস॥"

কাজী নারায়ণীর এই গর্ভসংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে আনয়নপূর্ব্বক দণ্ড দিবার উদ্যোগ করায় নারায়ণী ভয়ে নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া কাজীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিয়াছিলেন—'তুমি জান, মায়ের গর্ভে ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; ইহা প্রত্যক্ষ করিতে চাহ?' এই কথা বলিতে বলিতে গর্ভ হইতে 'হরিধ্বনি' হইল। কাজী ভীত হইয়া অবধূত নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শিবিকা দ্বারা নারায়ণীকে শ্রীবাস ঠাকুরের আলয়ে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

নারায়ণী নবদ্বীপে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়া স্বীয় মাতুলালয় কুমারহট্টে গমন করিয়াছিলেন, তথায় আনুমানিক ১৪২৯ শকে বৈশাখী কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশীতে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হইয়াছিল। এরূপ কিম্বদন্তী, বৃন্দাবন ১৮ মাস গর্ভে থাকিয়া ভূমিষ্ঠ হয়েন।

নারায়ণীর বৈধব্য দশায় যে দিন সন্তান হয়, সেদিন কুমারহট্টে। সকল স্থানে লোকে 'ছি ছি, হরি হরি' বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। ভক্তেরা বলেন, নিন্দাচ্ছলে হরিনাম শুনিতে শুনিতে বৃন্দাবন ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন ; বৃন্দাবন ক্রমশঃ শশি-কলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন, লোকনিন্দাবাদে জননীর পুত্রস্নেহের ক্রটী হয় নাই। নারায়ণী

চৈতন্যের কৃপাপাত্রী ছিলেন, তিনি কাহাকেও ভয় বা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না। ক্রমে বৃন্দাবন এক বৎসরের শিশু হইয়া উঠিলেন, নারায়ণী নিন্দাবাদ হইতে অন্তরে থাকিয়া ভক্তিরসে মনোনিবিষ্ট করিবার বাসনায় কুমারহট্ট পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী মামগাছী গ্রামে আসিয়া কিছুদিন দীনবেশে কালাতিপাত করেন, ঐ গ্রামে অদ্যাপি নারায়ণীপাট নামে একটি পাট আছে। নারায়ণী মধ্যে মধ্যে নবদ্বীপ যাইয়া মহাপ্রভুকে দেখিতেন এবং হরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিতেন। অনুসন্ধানে মামগাছী গ্রামে এইমত জানা গিয়াছে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করার কিছু দিবস পূর্ব্বে মামগাছী গ্রামে আসিয়া সারঙ্গমুরারী ও বাসুদেব দত্তের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাসুদেবকে সঙ্গে লইয়া যাইবার সময় নারায়ণীকে বাসুদেবের বিগ্রহসেবার ভারার্পণ করিয়াছিলেন। তদবধি নারায়ণী মামগাছীতেই বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু যে রাত্রে মহাপ্রভু গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সে দিবস নারায়ণী মহাপ্রভুর আলয়ে উপস্থিত ছিলেন।"

কলিকাতা-সিমুলিয়া-নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ বাগ্মী প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে বৃন্দাবন দাসের জীবনী প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—

"শিশুকালে বৃন্দাবন দাসঠাকুর তদীয় পবিত্র জননীর সঙ্গে মামগাছীর ঠাকুরবাটীতে বাস করিতেন, ইহাতে সন্দেহ কি? সংস্কৃতবিদ্যা তাঁহার সেই গ্রামেই অধীত হয়। মামগাছী নবদ্বীপধামের অংশবিশেষ, সুতরাং তথায় বিদ্যানগরের ন্যায় অনেক পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল, ইহাতে সন্দেহ কি? যে গ্রামে এখনও ব্রহ্মাণীস্থল দেদীপ্যমান, সে গ্রামে যে বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। বিশেষতঃ ঐ গ্রামটী বিশারদভট্টাচার্য্য ও দেবানন্দপণ্ডিত প্রভৃতির বাসগৃহের অতি নিকট, এমন কি একগ্রাম বলিলেও হয়। কাঞ্চনপল্লীবাসী বাসুদেবদত্ত পণ্ডিত ও ধনবান্ ছিলেন, ইহা কবিরাজগোস্বামী ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি যে সেবাপ্রকাশ করেন, তাহা অবশ্য ভদ্রপল্লীর মধ্যে।

সেই মামগাছীর ভদ্রপল্লীতে শ্রীল বৃন্দাবন দাসঠাকুর প্রথমে পাঠশালায় বাল্যবিদ্যা অভ্যাস করেন এবং শেষে কোন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্যলাভ করেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচনা ও সিদ্ধান্তসমূহই তাহার প্রমাণ। বৃন্দাবন দাসঠাকুর যখন কৃতবিদ্য হইলেন, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটকাল উপস্থিত হইয়াছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ করার তিন চারি বৎসর পরে ঠাকুরের জন্ম হয় এবং প্রভুর অপ্রকটকালে তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হয় নাই। ঐ সময়ে মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীগৌড়দেশে প্রেম-প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে দেখা যায় যে, মহাপ্রভুর নিকটে প্রভু নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া, স্বীয় পার্ষদগণসহিত, প্রথমে পাণিহাটীতে কিছুকাল প্রচার কার্য্য করিতে থাকেন। পরে সপ্তগ্রামে কিছুকাল কার্য্য করিয়া শ্রীনবদ্বীপে হিরণ্যগোবর্দ্ধনের গৃহে স্থিত হন। সেখান হইতে নানা গ্রামে নামপ্রচার করেন। যথা চৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ৫ম অধ্যায়ে শ্রীশচীমাতার প্রতি শ্রীনিত্যানন্দের উক্তি,—

'মোর বড় ইচ্ছা তোমা দেখিতে হেথায়। রহিলাম নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায়॥
হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাষিয়া। নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দযুক্ত হৈয়া॥

তাঁহার প্রচারকার্য্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

'তবে নিত্যানন্দ সর্ব্ব পার্ষদের সঙ্গে। প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে কীর্ত্তনের রঙ্গে॥
খানা চোঁতা বড়গাছি আর দোগাছিয়া। গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥
বিশেষ সুকৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম। নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান॥'

শ্রীধাম নবদ্বীপে অবস্থান করত যে সময়ে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমপ্রচার করিতেছিলেন, তাহার শেষকালে, কবিবর বৃন্দাবনদাস মহোদয় তাঁহার সঙ্গ লইয়া, পরমানন্দ লাভ করেন। পঞ্চম-অধ্যায়ের শেষভাগে যে কথাটী আছে, তাহাতে বহুতর অর্থ হয়। কথাটী এই যে,—

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস। অবশেষ পাত্র নারায়ণীগর্ভজাত॥"

একটী অর্থ এই যে, প্রভু নিত্যানন্দের যে সকল পার্ষদ দাস তাঁহার সঙ্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যিনি শেষ আসিয়া ভৃত্য হন, তিনিই আমি—এই বৃন্দাবন দাস। ইহাতে এই উপলব্ধি হয় যে, বৃন্দাবনদাসঠাকুরের পরে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আর কেহ ভৃত্য হন নাই

এ স্থলে শিক্ষাভৃত্য ও পার্ষদভৃত্যের মধ্যে একটু ভেদ আছে। এই কথাটীতে আর একটী বিষয় অনুমিত হয়। শ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকটের অল্পদিন পরেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু অপ্রকট হন। বৃন্দাবন ঠাকুরের আগমনের পরে, আর অধিক দিন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রকটলীলা ছিল না। শ্রীবৃন্দাবনদাস তাঁহার অপ্রকটের পর অনেক দিন বর্ত্তমান ছিলেন; কেননা, তিনি শ্রীজাহ্নবা গোস্বামিনীর সহিত শ্রীনরোত্তমের নিমন্ত্রণে খেতরি গ্রামে গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে জগাই-মাধাই উদ্ধার বর্ণন,—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা অপার। পতিতের ত্রাণ লাগী যাঁর অবতার॥
এ সব চিন্তিয়া মনে হরিদাস প্রতি। বোলে "হরিদাস!" দেখ দোঁহার দুর্গতি।
ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার। এ দোঁহার যম-ঘরে নাহি প্রতিকার॥
প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবনগণে। তাহাঁও করিলা তুমি ভাল মনে মনে॥
যদি তুমি শুভানুসন্ধান কর' মনে। তবে সে উদ্ধার পায় এই দুই জনে॥
তোমার সংকল্প প্রভু না করে অন্যথা। আপনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্ব কথা॥
প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার। চৈতন্য করিল হেন-দুইর উদ্ধার॥
যেন গায় অজামিল উদ্ধার পুরাণে। সাক্ষাতে দেখুক এবে এতিনভুবনে॥
নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে। 'পাইল উদ্ধার' দুই জানিলেন মনে।
হরিদাস প্রভু বোলে "শুন মহাশয়। তোমার যে ইচ্ছা, সেই প্রভুর নিশ্চয়।
আমারে ভাণ্ডাহ যেন পশুরে ভাণ্ডাহ। আমারে সে তুমি পুনঃপুনঃ পরিখাহ॥"
হাসি নিত্যানন্দ তানে দিলা আলিঙ্গন। অত্যন্ত কোমল হই বোলেন বচন।
"প্রভুর যে আজ্ঞা লই আমরা বেড়াই। তাহা কহি এই দুই মদ্যপের ঠাঁই॥
সভারে ভজিতে 'কৃষ্ণ' প্রভুর আদেশ। তারমধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ॥
বলিবার ভার মাত্র আমরা দুইর। বলিলে না লয় তবে সেই মহাবীর॥
বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দুইর স্থানে। নিত্যানন্দ হরিদাস করিলা গমনে॥
সাধু-লোকে মানা করে "নিকটে না যাও। নাগালি পাইলে পাছে পরাণ হারাও॥
আমরা অন্তরে থাকি পরম তরাসে। তোমরা নিকটে যাহ কেমন সাহসে॥
কিসের সন্ন্যাসি জ্ঞান ও'দুইর ঠাঞি। ব্রহ্মবধে গোবধে যাহার অন্ত নাঞি॥"
তথাপিহ দুইজন 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি। নিকটে চলিলা দোঁহে মহা-কুতূহলী॥
শুনিবারে পায় হেন নিকটে থাকিয়া। কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া॥
"বোল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ' লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণমাতা, কৃষ্ণপিতা, কৃষ্ণধন প্রাণ॥
তোমা সভা' লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার। হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার

তাহা শুনি মাথা তুলি চা'হে দুই জন। মহা-ক্রোধে দুইজন অরুণ-নয়ন॥
সন্ন্যাসি আকার দেখি মাথা তুলি চাহে। "ধর ধর" বলি দোঁহে ধরিবারে যায়ে॥
আথে-ব্যথে নিত্যানন্দ হরিদাস ধায়॥ "রহ রহ" বলি দুই দস্যু পাছে যায়॥
ধাইয়া আইসে পাছে তর্জ্জে গর্জ্জে করে। মহা-ভয় পাই দুই প্রভু ধায় ডরে॥
লোকে বোলে "তখনেই নিষেধ করিল। এ দুই সন্ন্যাসী আই সঙ্কটে পড়িল॥
যতেক পাষণ্ডি সব হাসে মনে মনে। "ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে॥"
"কৃষ্ণ! রক্ষ, কৃষ্ণ, রক্ষ সুব্রাহ্মণে বোলে। সে-স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে॥
দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়। "ধরিনু" ধরিনু" বলি লাগি নাহি পায়॥
নিত্যানন্দ বোলে "ভাল হইল বৈষ্ণব। আজি যদি প্রাণ বাঁচে তবে পাই সব॥
হরিদাস বোলে "ঠাকুর আর কেন বোল। তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল।
মদ্যপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ উপদেশ। উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ॥"
এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া। দুই দস্যু পাছে ধায় তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া॥
দোঁহার শরীর স্থূল—না পারে ধাইতে। তথাপিহ যাই দুই মদ্যপ দেখিতে॥
দুই দস্যু বোলে "ভাই! কোথারে যাইবা। জগা মাধার ঠাই আজি কেমনে এড়াইবা॥
তোমরা না জান' এথা জগা-মাধা আছে। খানি রহ উলটিয়া হের-দেখ পাছে॥"
ত্রাসে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া। "রক্ষ কৃষ্ণ! রক্ষ কৃষ্ণ! গোবিন্দ" বলিয়া॥
হরিদাস বোলে "আমি না পারি চলিতে। জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে॥
রাখিলেন কৃষ্ণকাল যবনের ঠাই। চঞ্চলের বুদ্ধ্যে আজি প্রাণ সে হারাই॥"
নিত্যানন্দ বোলে "আমি নহিয়ে চঞ্চল। মনে ভাবি দেখ তোমার প্রভু সে বিহ্বল॥
ব্রাহ্মণ হৈয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে। তান বোল বলি সব প্রভি ঘরে ঘরে॥
কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তাঁর।'চোরঢঙ্গ'বই লোক নাহি বোলে আর।
না করিলে আজ্ঞা তান সর্ব্বনাশ করে। করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে॥
আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি। দুইজনে বলিলাও দোষভাগী আমি?"
হেনমতে দুই-জনে আনন্দ-কন্দল। দুই দস্যু ধায় পাছে, দেখিয়া বিকল॥
ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী। মদ্যের বিক্ষেপে দস্যু পাড়ে রড়ারড়ি।
দেখা না পাইয়া দুই মদ্যপ রহিল। শেষে হুড়াহুড়ি দুই জনেই বাজিল।
মদ্যের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল। আছিল বা কোন স্থানে কোথা বা রহিল॥
কথোক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চাহে। কোথা গেল দুই দস্যু দেখিতে না পায়ে॥
ই জনে কোলাকোলি করে। হ াসিয়া চলিলা যথা প্রভু-বিশ্বম্ভরে॥
বসি আছে মহাপ্রভু কমললোচন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রূপ মদন-মোহন॥
চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল। অন্যোহন্যে কৃষ্ণকথা কহেন সকল॥
কহয়ে আপন তত্ত্ব সভা মধ্যে রঙ্গে। শ্বেতদ্বীপপতি যেন সনকাদি-সঙ্গে॥
নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়। দিবস বৃত্তান্ত যত সম্মুখে কহয়॥

"অপরূপ দেখিলাও আজি দুইজন। পরম মদ্যপ, পুনঃ বোলায় 'ব্রাহ্মণ'॥
ভাল রে বলিল তারে বোল কৃষ্ণ-নাম'। খেদাড়িয়া আইল, ভাগ্যে রহিল পরাণ॥
প্রভু বোলে "কে সে দুই, কিবা তার নাম। ব্রাহ্মণ হইয়া কেন করে হেন কাম।
সম্মুখে আছিলা গঙ্গাদাস শ্রীনিবাস। কহয়ে যতেক তার বিকর্ম প্রকাশ॥
'সে দুইর নাম প্রভু!—জগাই মাধাই। সুব্রাহ্মণ পুত্র দুই, জন্ম এই ঠাঁই।
সঙ্গ দোষে সে দোহাঁর হৈল হেন মতি। আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি॥
সে দুইর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে। হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে॥
সে দুইর পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি। আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঞি॥
প্রভু বোলে "জানো জানো সেই দুই বেটা। খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর এথা॥"
নিত্যানন্দ বোলে "খণ্ড খণ্ড কর" তুমি। সে দুই থাকিতে কতি না যাইব আমি॥
কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই। আগে সেই দুইরে যে 'গোবিন্দ' বোলাই॥
স্বভাবেই ধার্ম্মিক বোলয়ে কৃষ্ণনাম। এ দুই বিকর্ম্ম বই নাহি জানে আন॥
এ দুই উদ্ধার যদি দিয়া ভক্তি দান। তবে জানি পাতকি পাবন হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা। ততোধিক এ দোঁহার উদ্ধারের সীমা।"
হাসি বোলে বিশ্বম্ভর "হইল উদ্ধার। যেই ক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষে চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল। অচিরাত কৃষ্ণ তার করিব কুশল॥"
শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ। জয়-জয় হরি-ধ্বনি করিলা তখন॥
"হইল উদ্ধার" সভে মানিলা হৃদয়ে। অদ্বৈতের স্থানে হরিদাস কথা কহে॥
"চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়। আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিগে যায়॥
বরিষায় জাহ্নবীরে কুম্ভীর বেড়ায়। সাঁতার এড়িয়া তারে ধরিবারে যায়॥
কূলে থাকি ডাক পাড়ি, করি 'হায় হায়'। সকল গঙ্গার মাঝে ভাসিয়া বেড়ায়॥
যদি বা কূলেতে উঠে ছাওয়াল দেখিয়া। মারিবার ভয়ে শিশু যায় খেদাড়িয়া॥
তার পিতা মাতা আইসে হাতে ঠেঙ্গা লইয়া। তা সভা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া
গোয়ালার ঘৃত দধি লইয়া পলায়॥ আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায়॥
সে সে করয়ে কর্ম্ম, যে যুগত নহে। কুমারী দেখিয়া বোলে মোরে বিবাহিয়ে॥
চড়িয়া ষাড়ের পিঠে 'মহেশ বোলায়। পরের গাভীর দুগ্ধ—তাহা দুহি খায়॥
আমি শিখাইতে গালি পাড়য়ে তোমারে। তোহোর অদ্বৈত মোর কি করিতে পারে।
চৈতন্য—বলিস যারে ঠাকুর করিয়া। সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া॥
কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে। দৈবে ভাগ্যে আজি রক্ষা পাইল পরাণে॥
মহা মাতোয়াল দুই পথে পড়ি আছে। কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে॥
মহা ক্রোধে ধাইয়া আইসে মারিবার। জীবন রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার॥
হাসিয়া অদ্বৈত বোলে "কোন চিত্র নহে। মদ্যপের উচিত—মদ্যপ সঙ্গ হয়ে॥
তিন মাতোয়াল সঙ্গ একত্র উচিত। নৈষ্ঠিক হইয়া কেনে তুমি তার ভিত॥"

নিত্যানন্দ করিব—সকল মাতোয়াল। উহান চরিত্র আমি জানি ভালে ভাল॥
এই দেখ তুমি দিন দুই তিন ব্যাজে। সেই দুই মদ্যপ আনিব গোষ্ঠী মাঝে॥"
বলিতে অদ্বৈত হইলেন ক্রোধাবেশ। দিগম্বর হই বোলে অশেষ বিশেষ॥
"শুষিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি। কেমনে নাচয়ে গায় দেখো তাঁর শক্তি॥
দেখ কালি সেই দুই মদ্যপ আনিয়া। নিমাই নিতাই দুই নাচিব মিলিয়া॥
একাকার করিবেক সেই দুই জনে। জাতি লই তুমি আমি পলাই যতনে॥
অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস। মদ্যপ উদ্ধার চিত্তে হইল প্রকাশ।
অদ্বৈত বচন বুঝে কাহার শকতি। বুঝে হরিদাস প্রভু যার যেন মতি॥
এবে পাপি-সব অদ্বৈতের পক্ষ হৈয়া। গদাধর নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া॥
যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়। অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয়॥
সেই দুই মদ্যপ বেড়ায় স্থানে স্থানে। আইল—যে ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে॥
দৈবযোগে সেই খানে করিলেক থানা। বেড়াইয়া বোলে সর্ব্ব ঠাঞি দেই হানা॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক। কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারঙ্ক॥
নিশা হৈলে কেহো নাহি যায় গঙ্গাস্নানে। যদি যায় তবে দশ বিশের গমনে॥
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে। সর্ব্ব রাত্রি প্রভুর কীর্ত্তন শুনে জাগে॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে কীর্ত্তনের সঙ্গে। মদ্যের বিক্ষেপে তারা শুনি নাচে রঙ্গে॥
দূরে থাকি সব ধ্বনি শুনিবারে পায়। শুনিলেই নাচিয়া অধিক মদ্য খায়॥
যখন কীর্ত্তন রহে, সেহ দুই রহে। শুনিয়া কীর্ত্তন পুন উঠিয়া নাচয়ে॥
মদ্যপানে বিহ্বল, কিছুই নাহি জানে। আছিল বা কোথায়,আছয়ে কোন্ স্থানে॥
প্রভুরে দেখিয়া বোলে "নিমাই পণ্ডিত। করাইলা সংপূর্ণ মঙ্গলচণ্ডী গীত॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাও। সকল আনিঞা দিব, যথা সেই পাও॥
দুর্জ্জন দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায়। আর আর পথ দিয়া সবাই পলায়॥
একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া। নিশায় আইসে দোঁহে ধরিলেক গিয়া॥
"কে রে, কে রে" বলি ডাকে জগাই মাধাই। নিত্যানন্দ বোলেন "প্রভুর বাড়ী যাই।
মদ্যের বিক্ষেপে বোলে "কিবা নাম তোর। নিত্যানন্দ বোলে অবধূত নাম মোর॥"
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়। মদ্যপের সঙ্গে কথা কহেন লীলায়॥
উদ্ধারিব দুই জন হেন আছে মনে। অতএব নিশাভাগে আইলা সে স্থানে॥
অবধূত নাম শুনি মাধাই কুপিয়া। মারিল প্রভুর শিরে মুটুকী তুলিয়া॥
ফুটিল মুটুকী শিরে, রক্ত পড়ে ধারে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ স্মঙরে॥
দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি মাথে। আর-বার মারিতে—ধরিল দুই-হাতে॥
"কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দঢ়। দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড়॥
এড় এড়—অবধূত না মারিহ আর। সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার॥
আথে-ব্যাথে লোক গিয়া প্রভুরে কহিলা। সাঙ্গোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা॥

নিত্যানন্দ-অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে। হাসে নিত্যানন্দ সেই দুইর ভিতরে॥
রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি মানে। "চক্র-চক্র-চক্র!" প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
আথে-ব্যাথে চক্র আসি উপসন্ন হৈল। জগাই মাধাই তাহা দেখিয়া নয়নে॥
প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ। আথে-ব্যাথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন॥
"মাধাই মারিতে প্রভু! রাখিল জগাই। দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু! এ দুই শরীর। কিছু দুঃখ নাহি মোর, তুমি হও স্থির॥"
"জগাই রাখিল" হেন বচন শুনিয়া। জগাইরে আলিঙ্গন কৈলা সুখী হৈয়া॥
জগাইরে বোলে "কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে। নিত্যানন্দ রাখিয়া, কিনিলি তুঞি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ, তাহা তুমি মাগ। আজি হৈতে হউ তোর প্রেম-ভক্তি লাভ॥
জগাইরে বর শুনি বৈষ্ণবমণ্ডল। জয়-জয়-হরি-ধ্বনি করিলা সকল॥
"প্রেম-ভক্তি হউ" করি যখন বলিল। তখনে জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইল॥
প্রভু বোলে "জগাই! উঠিয়া দেখ মোরে। সত্য আমি প্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে॥
চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর। জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর॥
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল জগাই। বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য-গোসাঞি॥
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষ্মীর জীবন। ধরিল জগাই যেন অমূল্য রতন॥
চরণে ধরিয়া কান্দে সুকৃতি জগাই। এমত অপূর্ব্ব করে গৌরাঙ্গ-গোসাঞি॥
এক জীব, দুই দেহ,—জগাই মাধাই। এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঁই॥
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল। মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল॥
আথে-ব্যাথে নিত্যানন্দ বসন এড়িয়া। পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবৎ হৈয়া॥"

প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় সম্পাদিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থ হইতেই এই অংশ উদ্ধৃত।

রামানন্দ রায়।

ইনি নীলাচলবাসী; বিদ্যানগরের রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। পিতার নাম রাজা ভবানন্দ। রামানন্দ জগন্নাথবল্লভ নাটকের রচয়িতা, পরম পণ্ডিত। চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুর সহিত শাস্ত্রালোচনাপ্রসঙ্গে ইহাঁর পাণ্ডিত্য-পরিচয় যথেষ্ট পরিস্ফুট; মহাপ্রভুর প্রেমেই ইনি বিষয়-বিরাগী হইয়াছিলেন। ইহাঁর দুইটী পদ.—

পহিলহি রাগ নয়ন-ভঙ্গ ভেল। অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল ॥
না সো রমণ—না হাম রমণী। দুহুঁ মন মনোভব পেষল জানি ॥
এ সখি! সে সব প্রেম-কাহিনী। কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি ॥
না খোজলু দূতী, না খোজলু আন। দুহুকেরি মিলনে মধ্যত পাঁচবাণ ॥
অব সেই বিরাগ তুহু ভেলি দূতী। সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি ॥

বেলোয়ার।

নাচত গৌরবর রসিয়া।
প্রেম-পয়োধি, অবধি নাহি পাওত, দিবস রজনী ফিরত ভাসি ভাসিয়া। ধ্রু ॥
সোঙরি বৃন্দাবন, শ্বাস ছাড়ে ঘন ঘন, রাই রাই বোলে হাসি হাসিয়া।
নিজমন মরম, ভরম নাহি রাখত, ত্রিভঙ্গ বাজাওত, বাঁশিয়া।
মত্ত সিংহ সম, ঘন ঘন গরজন, চঞ্চল পদনখ-শশিয়া।
কটিতটে অরুণ, বরণ বর অম্বর, খেনে খেনে উড়ত পড়ত খসি খসিয়া ॥
পুলকাঞ্চিত সব, গৌরকলেবর, কাটত অখিল পাপ পুণ্য ফাঁসিয়া।
ধরণী উপরে খেলে, লুঠত, উঠত, বৈঠত, দীন রামানন্দ ভয়নাশিয়া ॥

মুরারি গুপ্ত।

ইহাঁর জন্মভূমি শ্রীহট্ট; কিন্তু নবদ্বীপেই প্রধানতঃ ইনি অবস্থান করিতেন। বাল্যে ইনি এক চতুষ্পাঠীতেই শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করেন; সুতরাং ইনি মহাপ্রভুর একান্ত অন্তরঙ্গ। ইনি পণ্ডিত এবং শান্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন। চিকিৎসাই ইহাঁর বৃত্তি ছিল। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে,—

"শ্রীমুরারি গুপ্তিশাখ প্রেমের ভাণ্ডার। প্রভুর হৃদয় দ্রব শুনি দৈন্য যার॥
প্রতিগ্রহ না করে না লয় কার ধন। আত্মবৃত্তি করি করে কুটুম্ব ভরণ॥
চিকিৎসা করেন যারে ইহার সদয়। দেহরোগ ভবরোগ দুই তার ক্ষয়॥"

১৪৩৫ শকে ইনি সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচরিত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাই মুরারি গুপ্তের কড়চা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর কড়চা—চৈতন্যচরিত বড়ই প্রামাণিক গ্রন্থ। কেননা, ইনি চৈতন্য দেবের প্রিয়সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার জীবনের বহু ঘটনাই ইনি বিশেষরূপ জানিতেন। কবিরাজ গোস্বামী,—চৈতন্য চরিতামৃতে লিখিয়াছেন,—

"আদি লীলা মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। সূত্ররূপে মুরারি গুপ্ত করিলা গ্রন্থিত॥"

ইহাঁর তনটি পদ শুনুন,—

পাহিড়া।

শচীর আঙ্গিনা মাঝে, ভুবনমোহন সাজে, গোরাচাঁদ দেয় হামাগুড়ি।
মায়ের অঙ্গুলি ধরি, ক্ষণে চলে গুড়ি গুড়ি, আছাড় খাইয়া যায় পড়ি॥
বাঘনখ গলে দোলে, বুক ভাসি যায় লোলে, চাঁদমুখে হাসির বিজুলি।
ধূলামাখা সর্ব্ব গায়, সহিতে কি পারে মায়, বুকের উপরে লয় তুলি।
কাঁদিয়া আকুল তাতে, নামে গোরা কোল হৈতে, পুন ভূমে দেয় গড়াগড়ি।
হাসিয়া মুরারি বোলে, এ নহে কোলের ছেলে, সন্ন্যাসী হইবে গৌরহরি॥

কামোদ।

শচীর দুলাল মনোরঙ্গে। খেলে সমবয় শিশুসঙ্গে॥
মাঝে গোরা শিশু চারি পাশে॥ নাচে আর মৃদু মৃদু হাসে॥
হাতে হাতে হাতে ধরাধরি। তালে তালে নাচে ঘুরি ঘুরি॥
ক্ষণে ঘন দেয় করতালি। ক্ষণে কেহ কহে ভালি ভালি॥
গোরা যবে বলে হরি হরি। শিশুগণ বলে সঙ্গে হরি॥
ঘন ঘন হরিবোল শুনি। কাঁপে কলি পরমাদ গণি॥
মুরারি আনন্দে ভরপুর। পাপের রাজত্ব হৈল দূর॥

সুই।

রসবতী ইহ, রসিকজন মানস, যদি না পুরিব রামা।
গুণগণ তেজি, দোষ সব সঞ্চরু, তব কৈছে গুণবতী নামা॥
মানিনী মোহে তেজসি কতি লাগি।
এক তুয়া সঙ্গে রসসিন্ধু নিমজনু, কত কত যামিনী জাগি॥ ধ্রু॥

পহিল মিলনে, সদয় হৃদয়ে ছিল, এবে হইল অতি কাঠ নাই।
কঠিন পয়োধর, সঙ্গে কঠিন ভেলে, সঙ্গদোষ নাহি যাই॥
যা লাগি নয়ন, শাঙন ঘন বরিখয়ে, নিশি দিশি অন্তরে বাধা।
কাতর মনে যদি, করুণা না উপজয়ে, তব কিয়ে জীবন সাধা॥
এ দুই চরণ, অমিয়া নিধি সন্তত; অন্তরে লেখই মোর।
ভণই মুরারি, প্রাণপতি ইহ, তনু জীবন তোর॥

শিবানন্দ সেন।

ইহাঁর নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কুলীনগ্রাম। ইনি অম্বষ্ঠবংশীয়। শিবানন্দ গৌরাঙ্গের একান্ত অনুরাগী ছিলেন; তাঁহারই সহিত নীলাচল-গামী হইতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু মহাপ্রভু ইহাতে সম্মত হন নাই। মহাপ্রভু তাঁহাকে গৃহেই থাকিতে বলেন,—তবে তাঁহার প্রতি কর্ম্মবিশেষের ভারার্পণকরেন। শিবানন্দ প্রতিবৎসর রথযাত্রার দুই মাস পূর্ব্বে বহু ভক্ত যাত্রী লইয়া, নীলাচল গমন করিতেন। ইহাই তাঁহার গৌরাঙ্গাদিষ্ট কর্ম্ম। কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিত আছে,—

"কুলীন গ্রামী ভক্ত আর যত খণ্ডবাসী। আচার্য্য শিবানন্দ সেন মিলিলা সবে আসি॥
শিবানন্দ করে সব ঘাটি সমাধান। সবাকে পালন করে দিয়া বাসস্থান॥

অর্থাৎ শ্রীখণ্ডের জগন্নাথযাত্রী বহু ভক্তই কুলীনগ্রামে এই শিবানন্দের ভবনে আসিয়া সমবেত হইতেন। শিবানন্দ পরমানন্দে তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন; পরমাদরে তাঁহাদিগকে নীলাচল লইয়া যাইতেন। তখন গৌরাঙ্গভক্তের জন্য শ্রীখণ্ডের যেমন প্রসিদ্ধি ছিল, কুলীনগ্রামেরও তেমনি। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে,—

"প্রভু কহে কুলীন গ্রামের যে হয় কুকুর। সেহো মোর প্রিয় অন্য জন বহুদূর॥
কুলীনগ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়। শূকর চরায় ডোম সেহো চৈতন্য গায়॥

শিবানন্দের তিন পুত্র,—পরমানন্দ, চৈতন্যদাস ও রামদাস। শিবানন্দের ধনৈশ্বর্য্য যেমন, প্রেমৈশ্বর্য্যও তেমনি। প্রচুর মণি-কাঞ্চনেও

তাঁহার ইষ্টার্চ্চনার ব্যাঘাত হয় নাই। শিবানন্দ বস্তুতই বিষয়নিমগ্ন অথচ বিষয়-নির্লিপ্ত প্রেমযোগী মহাপুরুষ।

তাঁহার দুইটী পদ,—

মঙ্গল।

অখিল ভুবন ভরি, হরি রসবাদর, বরিখয়ে চৈতন্য-মেঘে।
ভকত চাতক যত, পিবি পিবি অবিরত, অনুখন প্রেমজল মাগে॥
ফাল্গুন-পূর্ণিমা তিথি, মেঘের জনম তথি, সেই মেঘে করল বাদর।
উচানীচ যত ছিল, প্রেমজলে ভাসাওল, গোরা বড় দয়ার সাগর॥
জীবেরে করিয়া যত্ন, হরিনাম মহামন্ত্র, হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।
অধম দুঃখিত যত, তারা হৈল ভাগবত, বাঢ়িল গৌরাঙ্গ-ঠাকুরালী॥
জগাই মাধাই ছিল, তারা প্রেমে উদ্ধারিল, হেন জীবে বিলাওল দয়া।
দাস শিবানন্দ বলে, কেন রইনু মায়াভোলে, প্রভু মোরে দেহ পদচ্ছায়া॥

গৌরী।

সোণার বরণ গোরা প্রেম-বিনোদিয়া। প্রেমজলে ভাসাওল নগর নদীয়া॥
পরিসর বুক বাহি পড়ে প্রেমধারা। নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মাতোয়ারা॥
গোবিন্দের অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া। বৃন্দাবনগুণ শুনে মগন হইয়া॥
রাধা রাধা বলি পহুঁ পড়ে মুরছিয়া। শিবানন্দ কাঁদে পহুঁর ভাব না বুঝিয়া॥

বসন্ত রায়।

কবি বসন্ত রায়ের পরিচয়-নির্ণয় একান্ত দুরূহ। কেহ বলেন,—"ইনি ভবানন্দ রায় বা মজুমদারের পুত্র; নাম,—বসন্ত;—ইনি বিদ্যাপতি উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৩৫৫ শকে ভুরশুটে জন্মগ্রহণ করেন;—১৪০৩ শকে ইঁহার পরলোক হইয়াছে। ইঁহার রচিত পদ-গ্রন্থের নাম বসন্ত-সুকুমার কাব্য।" কেহ বলেন,—যশোহরের রাজা,—প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ই কবি বসন্ত রায়।—ইঁহার প্রচুর পদে গোবিন্দ দাসের উল্লেখ আছে! যথা,—

(ক) "রায় বসন্ত, মধুপ অনুলম্বিত, বঞ্চিত দাস গোবিন্দ।
(খ) রায় বসন্ত, মধুপ আনন্দিত, নিন্দিত দাস গোবিন্দ॥

(গ) গোবিন্দ দাস, কহয়ে মতিমন্ত, ভুলিল যাহে দ্বিজরাজ বসন্ত।

অনেকেই মনে করেন, বসন্ত রায় তবে,—গোবিন্দ দাসেরই সমসাময়িক কবি।

ইহাঁর দুইটী পদ উদ্ধৃত করিলাম,—

বরাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি, নয়লী কুঞ্জের মাঝে।
ইন্দ্রনীল-মণি, কনকে জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে॥
কুসুম শয়নে মিলিত নয়নে, উলসিত অরবিন্দ।
শ্যাম-সোহাগিনী, কোরে ঘুমায়লি, চান্দের উপরে চান্দ।
কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিককুল গান।
মরমে মদন-বাণ, দোঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈলা নিরমাণ॥
মন্দ মলয়জ, পবন বহ মৃদু, ও সুখ কো করু অন্ত।
সরবস ধন, দোহার দুহু জন, কহয়ে রায় বসন্ত॥

ধানশী।

সুন্দরি! থির কর আপনক চিত।
কানু-অনুরাগে, অথির যব হোয়বি, কৈছে বুঝবি তছু রীত॥
সমুচিত বেশ, বনায়ব অব তুয়া, মিলাওনাগর পাশ।
তা সঞে নিরুপম, নটন বিলাসবি, পুরবি সব অভিলাষ॥
কালিন্দী-তীর, সমীর বহই মৃদু, নিভৃত-নিকুঞ্জক মাহ।
কত কত কেলি, বিলাসবি কানু সঞে, করবি অমিয়া-অবগাহ॥
এত কহি বেশ, বনাওত সহচরী, সুন্দরী চিত থির ভেল।
অভিসার লাগিয়া, সমুচিত উপহার, রায় বসন্ত কেল॥

বাসুদেব ঘোষ।

শ্রীহট্টের বুড়ন গ্রাম বাসুদেবের জন্মভূমি। মাধব ও গোবিন্দ,—ইহাঁর অপর দুই সহোদর। তিন সহোদরই গৌরাঙ্গ ভক্ত,—তিন সহোদরই নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। ইহাঁদের তিন ভ্রাতার তিনটী

সংকীর্ত্তন-সম্প্রদায় ছিল। এই তিন সম্প্রদায়ে ইহাঁরা তিন জন মধুরকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে,—

"গায়ন মাধবানন্দ ঘোষ মহাশয়। বাসুদেব ঘোষ অতি প্রেমে রসময়।"

ইহাঁর কয়েকটী পদ,—

কামোদ।

স্বরূপের করে ধরি, বলে কাঁদি গৌরহরি, বিহনে আমার শ্যাম রায়।
বিফলে বঞ্চিনু নিশি, অস্তমিত ভেল শশী, এ পরাণ ফাটি মরু যায়॥
কোথায় আমার শ্যাম বঁধু।
ফুল-শেজ বাসি ভেল, ফুলহার শুখাওল, না মিলল শ্যাম-প্রেমমধু॥
চল রে স্বরূপ চল, যাই সুরধুনী জল, এ সকল দেই ভাসাইয়া।
গেল যাক্ কুলমান, আর না রাখিব প্রাণ, তেজিব সলিলে ঝাঁপ দিয়া॥
আমার সে কালশশী, কার কুঞ্জে বঞ্চে নিশি, কাঁহে মুঝে ভেলত বৈমুখ।
বাসুদেব ঘোষ কহে, এ দুখে পরাণ দহে, কাঁহা মিটায়ব হিয়াদুখ॥

ধানশী।

পাগলিনী বিষ্ণুপ্রিয়া ভিজা বস্ত্র চুলে। ত্বরা করি বাড়ী আসি শাশুড়ীরে বলে॥
বলিতে না পারে কিছু কাঁদিয়া কাঁফর। শচী বোলে মাগো এত কি লাগি কাতর॥
বিষ্ণুপ্রিয়া বলে আর কি কব জননি। চারিদিকে অমঙ্গল কাঁপিছে পরাণি॥
নাহিতে পড়িল জলে নাকের বেশর। ভাঙ্গিবে কপাল, মাথে পড়িবে বজর॥
থাকি থাকি প্রাণ কাঁদে নাচে ডানি আঁখি। দক্ষিণে ভুজঙ্গ যেন বহি রহি দেখি॥
কাঁদি কহে বাসুঘোষ কি কহিব সতি। আজি নবদ্বীপ ছাড়ি যাবে প্রাণপতি॥

শ্রীরাগ।

কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর। সুরধুনীতীরে তরু ছায়া যে সুন্দর।
তার তলে বসিয়াছেন গৌরাঙ্গসুন্দর। কাঞ্চনের কান্তি জিনি দীপ্তিকলেবর॥
নগরের লোক ধায় যুবক-যুবতী। সতী ছাড়ে নিজ পতি, জপ ছাড়ে যতি॥
কাঁকে কুম্ভ করি নারী দাঁড়াইয়া রয়। চলিতে না পারে যেই নড়ি হাতে ধায়॥
কেহ বলে হেন নাগর কোন্ দেশে ছিল। সে দেশে পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥
কেহ বলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া। কেহ বলে মা বাপেরে এসেছে বধিয়া॥
কেহ বলে ধন্যা মাতা ধৈরাছিল গর্ভে। দেবকী সমান যেন শুনিয়াছি পূর্ব্বে॥
কেহ বলে কোন নারী পেয়েছিল পতি। ত্রৈলোক্য তাহার সমান নাহি ভাগ্যবতী॥
কেহ বলে ফিরে যাও আপন আবাসে। সন্ন্যাসী না হও বাছা না মুড়াও কেশে॥
প্রভু বলে আশীর্ব্বাদ কর মাতা পিতা। সাধ কৃষ্ণপদে বেচিব মোর মাথা॥

হেন কালে কেশব ভারতী মহামতি। দেখিয়া তাঁহারে প্রভু করিলা প্রণতি॥
কৃষ্ণদাস কয় গোসাঞী দেও ভক্তিবর। বাসুঘোষ কহে মুণ্ডে পড়ুক বজর॥

শ্রীরাগ।

প্রভু কহে "নিজগুণে দেওত সন্ন্যাস। "হৈয় না সন্ন্যাসী নিমাই না মুড়াও কেশ।'
কাঞ্চননগরের লোক সব মানা করে। "সন্ন্যাস না কর বাছা ফিরা যাও ঘরে॥
"পঞ্চাশের উর্দ্ধ হৈলে রাগের নিবৃত্তি। তবে ত সন্ন্যাস দিতে শাস্ত্রে অনুমতি॥"
এবোল শুনিয়া প্রভু বলে এই বাণী। "তোমার সাক্ষাতে গুরু কি বলিতে জানি॥
পঞ্চাশ হইতে যদি হয় ত মরণ। তবে আর সাধু সঙ্গ হইবে কথন।"
এ বোল শুনিয়া কহে ভারতী গোসাঞী। "সন্ন্যাস দিব রে তোরে শুনরে নিমাই"
এ কথা শুনিয়া প্রভুর আনন্দ উল্লাস। নাপিত ডাকাইল তবে মুড়াইতে কেশ
নাপিত বলয়ে "প্রভো করি নিবেদন। এরূপ মনুষ্য নাহি এ তিন, ভুবন
তব শিরে হাত দিয়া ছোব কার পায়। যে বোল সে বোল প্রভো কাঁপে কোর কায়
কার পায় হাত দিয়া কামাইব নিতি॥ অধম নাপিত জাতি মোর এই রীতি"
এ বোল শুনিয়া কহে বিশ্বম্ভর রায়। "না করিও নিজবৃত্তি" ঠাকুর কহয়॥
"কৃষ্ণের প্রসাদে জন্ম গোয়াইবা সুখে। অন্তকালেতে গতি হবে বিষ্ণুলোকে
কাঞ্চননগরের লোক সদয়হৃদয়; বাসুঘোষ জোড় হাতে ভারতীরে কয়॥

বারাড়ি।

আর এক দিন, গৌরাঙ্গ সুন্দর নাহিতে দেখিনু ঘাটে।
কোটি চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
অঙ্গ ঢল ঢল, কনক কষিল, অমল কমল আঁখি।
নয়ানের শর, ভাঙ ধনুবর, বিঁধয়ে কাম-ধানুকী॥
কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেযে মুকুতার দাম।
জলবিন্দু তনু, হেমে মোতি জনু, হেরিয়া মুরছে কাম॥
মোছে নব অঙ্গ, নিঙ্গাড়ি কুন্তল, অরুণ বসন পরে।
বাসুঘোষে কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥

লোচন দাস।

চৈতন্যমঙ্গল ইহাঁর গ্রন্থ। কবিত্ব-সম্পদে চৈতন্যমঙ্গল,—চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

লোচনদাস ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার অধীন কোগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোগ্রাম,—ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলপথে লুপ লাইনে গুস্করা ষ্টেশনের পাঁচক্রোশ দূরবর্ত্তী। ইহাঁর পিতার নাম কমলাকর দাস; মাতার নাম সদানন্দী। ইহাঁর পূর্ণ নাম ত্রিলোচন দাস। চৈতন্যমঙ্গলে ইহাঁর পরিচয়-বর্ণনা এইরূপ;—

"বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস।
মাতা শুদ্ধমতি সদানন্দী তাঁর নাম। যাঁহার উদরে জন্মি কহি কৃষ্ণ নাম॥
কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা। শ্রীনরহরি মোর প্রেমভক্তিদাতা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে। ধন্য মাতামহী সে অভয়াদেবী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত। সর্ব্ব-তীর্থপূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি একমাত্র। সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
যথা যাই তথাই দুলিন করে মোরে। দুলিন দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখান আখর। ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥"

আদুরে ছেলে লোচনদাস বাল্যে যথোচিত লেখাপড়া শিক্ষার অবসর পান নাই। আমোদপুর কাকুটে গ্রামে অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহ হইল বটে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ী তিনি যাইতেন না। এক দিন নরহরি ঠাকুরের উপদেশে তিনি দায়ে পড়িয়া কাকুটে যাত্রা করিলেন। স্ত্রী তখন যুবতী হইয়াছেন। লোচনদাস গ্রামের প্রান্তবর্ত্তী এক পুকুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন;—শ্বশুরের ঘর গ্রামের কোন্ দিকে, তাহা তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে দেখিলেন, একটী নবযুবতী পুকুরে জল লইতে আসিয়াছেন। লোচনদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা! অমুকের বাড়ী গ্রামের কোন্ দিকে?" যুবতী—তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলেন। লোচনদাস শ্বশুরবাড়ী গিয়া দেখিলেন,—সে যুবতী তাঁহারই স্ত্রী; তাঁহাকেই তিনি মাতৃ সম্বোধন করিয়াছেন। কিন্তু সংসার-

বিরাগী লোচনদাস,—কৃষ্ণপ্রেম-ভিখারী লোচনদাস—ইহাতে দুঃখিত হইলেন না। তিনি ত সংসার চাহেন না,—তিনি ত স্ত্রীর সহিত প্রাকৃত ব্যবহার করিতে চাহেন না। এইবার তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইল। স্ত্রীকে বুঝাইয়া বলিলেন,—'দেখ! সংসার-ভোগে আমার প্রবৃত্তি নাই। কৃষ্ণ-ভজনে প্রাণপাত হউক, ইহাই আমার মনস্কামনা। তুমি আমার সেই কার্য্যেই সহায় হইবে। তোমাকেও আমি কখন ভুলিব না।" লোচনদাস চিরকাল এই ভাবেই চলিয়াছিলেন। স্ত্রীও তাঁহার সাধন সঙ্গিনী ছিলেন।

চৈতন্যমঙ্গল ব্যতীত,—লোচনদাস,—দুর্লভসার নামক আরও একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। চৈতন্য-মঙ্গল তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সকালে রচিত। ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে ৬৬ বৎসর বয়সে ইহাঁর তিরোধান হইয়াছে।

বর্দ্ধমান-কাঁকড়া গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য-মঙ্গল-গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাড়ীতে,—লোচনদাসের স্বহস্ত-লিখিত চৈতন্যমঙ্গল পুঁথি অদ্যাপি বিরাজিত। লোচনদাসের হস্তাক্ষর বড়ই কদর্য্য ছিল; ইনি "উঠান- যোড়া ক" লিখিতেন।

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে শিশু গৌরাঙ্গের লীলা-রূপ বর্ণন,—

"এইমতে দিনে দিনে শচীর কুমার। বাড়য়ে শরীর যেন অমিয়ার সার॥
কি দিব উপমা রূপের না দিলে সে নারী। থলথল করে প্রাণ কহিলে সে পারি॥
নিতি ষোলকলা-পূর্ণ ইন্দু মুখচন্দ্র। সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ॥
একে সে অধর রাঙা মুচকি হাসিতে। অমিয়া সায়রে যেন হিল্লোল নহিতে।
রসে ডুবুডুবু রাঙা নয়নযুগল। কাজরে অমিয়াপঙ্কে কে বান্ধ বান্ধল॥
শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান। সাদরে নিরিখে হেন পুত্রের বয়ান॥
ক্ষণে কান্দে ক্ষণে হাসে ক্ষণে থটি করে। ক্ষণে কোলে ক্ষণে দোলে হিয়ার উপরে।
শচী স্তনযুগে দুটি চরণ রাখিয়া। দোলে যেন সোণার লতিকা বায়ু পাঞা॥
অতি দীর্ঘ নয়ান সুন্দর অট্টহাসি। অধরে অমিয়া যেন ঢালিছেন শশী॥
নাসিকা শুকের ওষ্ঠ জিনিয়া সুন্দর। গণ্ডযুগ জ্যোতির্ম্ময় গঠন সোসর॥
এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় মাসে। নামকরণ হৈল অন্নপ্রাশন দিবসে॥
পুত্রমহোৎসব করে মিশ্র পুরন্দর। অলঙ্কারে ভূষিত সোণার কলেবর॥
অঙ্গদ কঙ্কণ গলে গজমতিহার। কটি স্বর্ণ শিকলি মগরা পায়ে আর॥
ভল হিঙ্গুল যেন কর পদতল। অধর বান্ধুলী আঁখি রাঙা উত্পল॥

বিজুরী মাজিল গা রাতুল ঠাঞি ঠাঞি। অঙ্গঝলমলতেজ চাহিতে না পাই॥
বিশ্বপালনহেতু থুইল 'বিশ্বম্ভর" নাম। সরস্বতী সংবাদ যে পুরুষপ্রধান॥
ক্ষণে পিতামাতা কর অঙ্গুলি ধরিয়া। অথির শরীর পড়ে পদ দুই গিয়া॥
অবেকত আধ আধ লহলহু বোলে। চাঁদের সায়রে যেন অমিয়া উথলে॥
এইমতে দিনে দিনে আঙ্গিনা বেড়ায়। ঘুচিল বিবিধ তাপ জগত জুড়ায়॥
লখিমীলালিত পদ ধরণীর কোলে। আনন্দে পৃথিবী দেবী আপনা পাসরে।
গগনে এক চাঁদ ভূমে দশ নখ চাঁদ। কিরণের তেজ সে যে আঁখি পাইল আন্ধ॥
দশ চাঁদ কর নখ অঙ্গুলির আগে। পাতকী দেখিলে হিয়া আন্ধিয়ার ভাঙ্গে॥
শ্রীমুখ চাঁদ প্রভুর কোটি চাঁদের রাজা। ভুরু কামধনু দিয়া কাম কৈল পূজা॥
কি কহিব আর তার করুণ চন্দ্রিমা। অন্তর তিমির কাটে নাহি করে ক্ষমা॥
কে কহিতে পারে তার বালক চরিত্র। লৌকিক আচারে কৈল সংসার পবিত্র॥
অগ্রজ যাহার বিশ্বরূপ মহাশয়। অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্র জানয়ে আশয়॥
তাহার মহিমা তত্ত্ব কে কহিতে পারে। যাহার অনুজ মহাপ্রভু বিশ্বম্ভরে॥
দিনে দিনে করে প্রভু করুণা প্রকাশ। শুনি আনন্দিত কহে এ লোচনদাস।

বরাড়ী রাগ।

চান্দা চান্দা চান্দা, গগন উপরে, কে পাড়ি আনিয়া দিব।
কলঙ্ক মুছিয়া, গোরা রায়ের, কপালে চিত্র লিখিব॥
আরে বাছা আয় আয় আমার সোণার সুত নিন্দের লাগিয়া কান্দে।
আধটি করিতে, একটী বোল নিমাইর, অমিয়া অধিক লাগে॥ ধ্রু॥
এখনি আসিব, নিমাইর বাপ, ক্ষীর কদলক লঞা।
হোর আসিছে বাছা, হাম দুরন্ত, নিন্দ যাহ আঁখি মুদিয়া॥
সোণার পদ্মমুখ, পরাতা ঘুম আঁখি, আধ মুদিত তারা।
হেন বুঝি পারা, মহুর পাথারে, ডুবিল আধ ভমরা॥
পাটের গিলাপ, নেতের তুলি, রচিয়া শয্যাখানি।
পাখালি হইয়া, পুত্র কোলে লয়া, শুতিলা দেবী শচীরাণী।
এক স্তন মুখে, রহি রহি চাখে, অঙ্গুলি নাড়য়ে আর।
লোচন বোলে সব, দেব শিরোমণি, বালক রূপেতে বিহার॥

গৌরাঙ্গ,—সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, ইহা শুনিয়া, শচীর বিলাপ,—

আহিরী রাগ। দিশা।

আরে না ছাড়িহ মোরে। তোমা বহি কেহো নাহি সকল সংসারে॥
এইমনে অনুমানে জানা জানি কথা। সন্ন্যাস করিবে পুত্র শুনে শচীমাতা।
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে মস্তক উপরে। অচেতন হৈলা শচী মূর্চ্ছিত অন্তরে॥
উমতী পাগলী শচী বেড়ায় চৌদিগে। যারে দেখে তারে পুছে সর্ব্ব নবদ্বীপে॥

নিশ্চয় জানিল পুত্র করিব সন্ন্যাস। বিশ্বম্ভরের কাছে গিয়া ছাড়য়ে নিশ্বাস॥
তুমি মাত্র পুত্র মোর দেহে এক আঁখি। তুমি না থাকিলে অন্ধকারময় দেখি॥
লোকমুখে শুনি বাছা করিবে সন্ন্যাস। মোর মুণ্ডে ভাঙ্গি যেন পড়িল আকাশ॥
সাত কন্যা মরি তোরে পাঞাছিলু কোলে। না জানি বিধাতা কিবা লেখিল কপালে
একাকিনী অনাথিনী আর কেহো নাহি। সকল পাসরি এক তোর মুখ চাহি॥
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ। তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বোলে নবদ্বীপ।
না ঘুচাইহ আরে পুত্র মোর অযশ্বার। তুমি না থাকিলে সব ছারখার॥
ভাগ্য করি মানে লোক দেখে মোর মুখ। এখন আমারে দেখি হইব বিমুখ॥
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে শস্ত। তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য॥
দুখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি। গঙ্গায় প্রবেশ করি মরি যাব আমি॥
এহেন কোমল পায়ে কেমনে হাটিবে। ক্ষুধায় তৃষায় অন্ন কাহারে মাগিবে॥
নবনীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়। কেমনে সহিবে ইহা এ দুখিনী মায়।
হাপুত্রির পুত মোর সোণার নিমাই। আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই।
বিষ খাঞা মরিব রে তোর বিদ্যমানে। তোমার সন্ন্যাস কথা না শুনিব কাণে॥
আমারে মারিয়া বাপু যাইবে বিদেশ। আগুনি জ্বালিয়া তাথে করিব প্রবেশ॥
সর্ব্বজীবে দয়া তোর মোরে অকরুণ। না জানি কি লাগি মোরে বিধাতা দারুণ॥
রূপে গুণে শীলে পুত্র ত্রিজগত ধন্য। কামিনীমোহনবেশ কেশের লাবণ্য॥
স্কন্ধবিলম্বিত কেশে মালতী বান্ধিয়া। জুড়ায় পরাণ মোর সে বেশ দেখিয়া॥
বয়স্যবেষ্টিত তুমি চলি যাহ পথে। দেখিয়া জুড়ায় হিয়া পুথি বাম হাথে॥
কেমনে ছাড়িবা বাপু নিজসঙ্গিগণ। না করিবে তা সভা সহিত সঙ্কীর্ত্তন॥
সেহেন সুন্দর বেশে না নাচিবে আর। যাহা দেখি মোহ পায় সকল সংসার॥
কেমনে বা জীবে তোর নিজপ্রিয়জন। সভারে মারিয়া তোর সন্ন্যাস করণ॥
আগেত মরিব আমি, পাছে বিষ্ণুপ্রিয়া। মরিব ভকত সব বুক বিদরিয়া॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত আর শ্রীনিবাস। অদ্বৈত আচার্য্য আদি আর হরিদাস॥
মরিব কত লোক না দেখিয়া তোমা। এ সব দেখিয়া বাপু চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
পিতৃহীন পুত্র তুমি দিল দুই বিভা। অপত্য সন্ততি কিছু না দেখিল ইহা॥
তরুণ বয়স নহে সন্ন্যাসের ধর্ম্ম। গৃহস্থ আশ্রমে থাকি সাধ সব কর্ম্ম॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ যৌবনে প্রবল। সন্ন্যাস কেমনে তোর হইবে সফল॥
মনের নিবৃত্তি কলিযুগে নাহি হয়। মনের চাঞ্চল্য সন্ন্যাসের ধর্ম্মক্ষয়॥
গৃহিজন মনঃপাপে নাহি হয় বদ্ধ। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যায় মনোজয় শুদ্ধ॥
এতেক বচন যদি শচীদেবী বৈল। শুনিঞা প্রবোধবাণী কহিতে লাগিল॥
চৈতন্যচরিত্র শুন করিয়া উল্লাস। আনন্দ হৃদয়ে কহে এ লোচনদাস॥
অস্তব্যস্ত নহ শুন আমার বচন। মিথ্যা চিত্তে দুঃখ কেন কর অকারণ॥

বারে বারে কহি তোরে নাহি অবধানে। মিছা মাত্র লোভ মোহ ক্রোধ অভিমানে॥
কে তুমি তোমার পুত্র কেবা কার বাপ। মিছা তোর মোর করি কর অনুতাপ॥
কি নারী পুরুষ কিবা কেবা কার পতি। শ্রীকৃষ্ণচরণ বহি অন্য নাহি গতি॥
সেই মাতা সেই পিতা সেই বন্ধুজন। সেই হর্ত্তা সেই কর্ত্তা সেই মাত্র ধন॥
তা বিনু সকল মিছা কহিল এ তত্ত্ব। তা বিনু সকল মিথ্যা সকল জগত॥
বিষ্ণুমায়াবন্ধে সব লোক সুখন্নিত। নিজ মদ অহঙ্কারে কেবল পীড়িত॥
নিজ ভাল বলি যেই যেই করে কর্ম্ম। পরকালে বন্দী হয় সেই সব ধর্ম্ম॥
কর্ম্মসূত্রে বন্দী হৈয়া বুলয়ে ভ্রমিয়া। আপনা না জানে জীব কৃষ্ণ পাসরিয়া॥
চতুর্দ্দশ লোক মাঝে মানুষের জন্ম। দুর্লভ করিয়া মানি কহিল এ মর্ম্ম॥
বিষয়বিপাক ইতি আছয়ে অপার। ক্ষণেক ভঙ্গুর এই অনিত্য সংসার॥
তবহু দুর্লভ জানি মনুষ্যশরীর। শ্রীকৃষ্ণ ভজয়ে যে মায়ায় হৈয়ে স্থির॥
শ্রীকৃষ্ণভজন সবে মাত্র এই দেহে। মুক্তবন্ধ হয় যদি কৃষ্ণে করে নেহে॥
পুত্রস্নেহে কর মোরে যত বড় ভাব। শ্রীকৃষ্ণচরণে হৈলে কত হৈত লাভ॥
সংসারে আরতি করি মরিবার তরে। শ্রীকৃষ্ণে আরতি করি ভব তরিবারে॥
সেই সে পরমবন্ধু সেই মাতা-পিতা। শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥
কৃষ্ণের বিরহে মোর পোড়য়ে অন্তর। চরণে পড়িয়া বোল বচন কাতর॥
বিস্তর পিরিতি মোরে করিয়াছ তুমি। তোমার আজ্ঞায় চিত্তে শুদ্ধ হই আমি॥
আমার নিস্তার আর তোর পরিত্রাণ। শ্রীকৃষ্ণচরণ ভজ ছাড় পুত্রজ্ঞান॥
সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণপ্রেমার কারণে। দেশে দেশে হৈতে আনি দিব প্রেমধনে॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ। খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম্ম॥
ধন উপার্জ্জন করে আনে বড় দুঃখ। ধনই যাউক কিবা আপনি মরুক॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন। সকল সম্পদ সেই শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
ইহলোকে পরলোকে অবিনাশী প্রেমা। আজ্ঞা দেহ বেদনী মা চিত্তে দেহ ক্ষমা॥
সকল জনমে সভে পিতা মাতা পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে বুঝিবে হিয়ায়॥
মনুষ্যজনমে কৃষ্ণগুরু সভে জানি। যেই গুরু নাহি করে পশু পক্ষ মানি॥
এত শুনি শচীদেবী বিস্মিত হিয়ায়। বিশ্বম্ভর মুখপদ্ম একদীঠে চায়॥
চতুর্দ্দশ লোকনাথ মায়া করে দূর। সর্ব্বজীবে দেখে শচী এক সমতুল॥
সেইক্ষণে বিশ্বম্ভরে কৃষ্ণবুদ্ধি হৈল। আপনার পুত্র বলি মায়া দূরে গেল॥
নবমেঘজিনি দ্যুতি শ্যাম কলেবর। ত্রিভঙ্গ মুরলীধর বর পীতাম্বর॥
গোপ গোপী গো গোপাল সনে বৃন্দাবনে। দেখিল আপন পুত্র চকিত তখনে॥
দেখি শচী চমৎকার হইলা অন্তরে। পুলকে প্রফুল্ল অঙ্গ কম্প কলেবরে॥
স্নেহ নাহি ছাড়ে পুন আপন সম্বন্ধ। কৃষ্ণ হঞা পুত্র হৈলা ভাগ্যের নির্ব্বন্ধ॥
জগতদুর্ল্লভ কৃষ্ণ আমার তনয়। কার বশ নহে মোর শক্ত্যে কিবা হয়।

এত অনুমানি শচী কহিল বচন। স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি পুরুষরতন ॥
মোর ভাগ্যে এতদিন ছিলা মোর বশ। এখনে আপনসুখে করগা সন্ন্যাস ॥
এক নিবেদন মোর আছে তোর ঠাঁয়। এহেন সম্পদ মোর কি লাগিয়া যায় ॥
ইহা বলি সকরুণ ভেল কণ্ঠস্বর। সাত পাঁচ ধারা বহে নয়নের জল ॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে শচী সুচরিতা। মায়ের কান্দনে প্রভু হেট কৈল মাথা ॥
পুনরপি মুখ তুলি বোলে বিশ্বম্ভর। শুনহ জননী তুমি আমার উত্তর ॥
যে দিন দেখিতে মোরে চাহ অনুরাগে। সেইক্ষণে তুমি মোর দরশন পাবে ॥
এ বোল শুনিঞা শচী সম্বরে ক্রন্দনে। ব্যথিতহৃদয় কহে এ দাস লোচনে ॥"

লোচনদাসের পদাবলীও অতি মধুর। তাঁহার একটী ধামালী পদ শুনুন,—

"শুন শুন সই, আর কিছু কই, গৌরাঙ্গ মানুষ নয়।
ভুবন মাঝারে, শচীর কুমারে, উপমা কিসে বা হয় ॥
ছাড়িতে না পারি, যে অবধি হেরি, গৌরাঙ্গ বদন চান্দ।
সে রূপ সায়রে, নয়ন ডুবিল, লাগিল পিরিতী ফান্দ ॥
ঘাটে মাঠে যাই, হেরি গো সদাই, কনককেশর গোরা।
কুলের বিচার, ধরম আচার, সকলি করিল ছাড়া ॥
থাকি গুরু মাঝে, হেরি গো নয়নে, বয়ান পড়িছে মনে।
নিবারিতে যাই, নহে নিবারণ, বিকল করিল প্রাণে ॥
গৌরাঙ্গ চাঁদের, নিছনি লইয়া, সকলি ছাড়িয়া দিব।
লোচনের মনে, হয় রাতি দিনে, হিয়ার মাঝারে থোব ॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী ঝামটপুর গ্রামে বৈদ্যবংশে ১৪১৮ শকে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ভগীরথ; মাতার নাম সুনন্দা। জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণদাস কৃষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্যামদাস। শ্যামদাস কৃষ্ণদাস হইতে দুই বৎসরের ছোট।

ভগীরথের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না। ভগীরথ কবিরাজী করিতেন। কবিরাজীতে তাঁহার আয় অল্পই ছিল।

কৃষ্ণদাসের বয়স যখন চারি বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়।

ইহার কিছুদিন পরে, তাঁহার মাতাও পরলোক গমন করেন। তখন অসহায় দুই ভাই,—কৃষ্ণদাস ও শ্যামদাস,—পিসির আশ্রয় লইলেন। পিসি তাঁহাদিগকে যত্নে পালন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণদাস প্রথমতঃ গ্রাম্য পাঠশালে কিছু শিক্ষালাভ করিয়া, সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। মেধাবলে অল্পদিনেই তিনি ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হন।

কবিরাজের বয়স যখন ছাব্বিশ বৎসর, তখন তাঁহার পিসির মৃত্যু হয়। কবিরাজ কৃষ্ণদাস তখন,—সংসারের ভার শ্যামদাসের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই।

শৈশব হইতেই, ইঁহার ধর্ম্মানুষ্ঠান অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। ফলে তিনি সংসারে বীতস্পৃহ হইয়া পড়িলেন। চৈতন্যের লীলাশ্রবণে একান্ত মোহিত হইতেন;—শেষে তিনি অতিমাত্র চৈতন্যভক্ত হইলেন। কৃষ্ণদাস একদিন স্বপ্নাবেশে যেন দেখিতে পান,—'নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে ডাকিতেছেন।'—পরদিনই তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন-যাত্রা করেন।

বৃন্দাবনে গিয়া তিনি রূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শরণ গ্রহণ করেন; রঘুনাথ দাসের নিকট দীক্ষিত হন। শাস্ত্রালোচনাতেই তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া দেন। এই বৃন্দাবনেই রাধাকুণ্ডতীরে কৃষ্ণদাস বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ১৪৯৪ শকে রচনা আরম্ভ,—১৫০৩ শকে ৯ বৎসরে গ্রন্থ সমাপ্তি হয়। শ্রীমুরারি গুপ্ত এবং স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন ঠাকুরের চৈতন্য-মঙ্গল (চৈতন্য-ভাগবত), কবি কর্ণপুরকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় এবং নানাপুরাণ ইতিহাস অবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। চৈতন্য মহাপ্রভুর শেষাবস্থায় নীলাচলে তাঁহার সহিত [illegible]থ দাস ও স্বরূপ সর্ব্বদাই থাকিতেন,—স্বরূপ মহাপ্রভু[illegible] মনের কথা শুনিতে পাইতেন,—স্বরূপ এ[illegible]কল কথা রঘুনাথকে ব[illegible]লতেন। কৃষ্ণদাস দীক্ষাগুরু রঘুনাথের নিকট [illegible] এই সমুদা[illegible] বিবরণ প্রাপ্ত হন;—চৈতন্য-চরিতামৃতে তাহ[illegible]রেন। বিশেষতঃ মহাপ্রভুর লীলাঘটিত চৈতন্যমঙ্গল নামক [illegible]ক রচিত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহার অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে কিছুই বর্ণিত হয় নাই। এই অন্ত্য-

লীলা লিখিবার জন্যও, কৃষ্ণদাস অনুরুদ্ধ হন। ইহারই ফলে,—চৈতন্য-চরিতামৃতে মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলাও প্রকটিত হয়।

এই গ্রন্থ রচিত হইবার পর, জীব গোস্বামী দেখিলেন, রূপসনাতনের মহাদৃত গ্রন্থ আর আদৃত হইবে না; এই আশঙ্কা করিয়া, তিনি কৃষ্ণদাসের চৈতন্য-চরিতামৃতখানি যমুনার জলে ভাসাইয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস একান্ত ক্ষুণ্ণ হইলেন; কিন্তু তাঁহার প্রিয় শিষ্য মুকুন্দ সমগ্র চরিতামৃতের একখণ্ড প্রতিলিপি নিজের নিকট সঙ্গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন,—গুরুদেবের কাছে অবিলম্বে তাহা আনিয়া দিলেন। কৃষ্ণদাস স্বস্থ হইলেন।

এদিকে যমুনার জলে ভাসিতে ভাসিতে গ্রন্থখানি মদনমোহনের ঘাটে গিয়া উপস্থিত হইল। জীব গোস্বামী তখন তাহা তুলিয়া লইয়া, যত্নের সহিত রক্ষা করিলেন। অতঃপর, কবি কর্ণপুর বৃন্দাবনে আগমন করেন। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত-সম্পর্কীয় সমুদয় ঘটনা অবগত হন। জীব-গোস্বামীকে বলেন,—'গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাসকে প্রদান করা কর্ত্তব্য।' ইঁহারই উপদেশানুসারে জীব গোস্বামী গ্রন্থ অনুমোদন করেন; তিনি "চৈতন্য-চরিতামৃত" এই কথার পরিবর্ত্তে গ্রন্থে 'কহে কৃষ্ণদাস'—এইরূপ ভণিতা বসাইয়া দেন এবং গ্রন্থখানি কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করেন।

এইরূপে বৃন্দাবনে চৈতন্যচরিতামৃত প্রচারিত হইল। আর মুকুন্দ যে পুঁথিখানি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দ্বারাই নবদ্বীপে প্রেরিত হয়। ফলে বঙ্গভূমেও চরিতামৃত প্রচারিত হইয়া পড়ে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের স্বহস্তলিখিত পুঁথি অদ্যাপি শ্রীবৃন্দাবনে ৺রাধাদামোদরের মন্দিরে পরম ভক্তি সহকারে অর্চ্চিত হইয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণ[illegible]সর অন্যান্য গ্রন্থ,—বৈষ্ণবাষ্টক; গোবিন্দলীলামৃত; কৃষ্ণকর্ণামৃতের স[illegible]ঙ্গরঙ্গদা নাম্নী [illegible]

১৫০[illegible] শকের চা[illegible] দ্বাদশী তিথিতে ৮৭ বৎসর বয়সে কবিরাজ গোস্বা[illegible] হইয়াছে। তিনি কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন,—ইহাই তাঁহার দেহান্তের কারণ,—এইরূপই প্রসিদ্ধি।

ঝামটপুরে অদ্যাপি কবিরাজ গোস্বামীর পাঠ বর্ত্তমান। বর্দ্ধমান-ক্ষিণখণ্ড নিবাসী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তন-কর শ্রীযুক্ত রসিকলাল দাস মহাশয় ামটপুরে এই 'পাঠ' রক্ষার্থ একান্ত যত্নশীল। ঝামটপুরে কবিরাজ াস্বামীর কাষ্ঠ-পাদুকার নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

কবিরাজ গোস্বামী বিস্তর সুমধুর পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি,—

ভৈরব—একতালা।

"গোরা নব, গৌউর সুন্দর, নাগর বনওয়ারি।
নদীয়া ইন্দু, করুণাসিন্ধু, ভকতবৎসল কারী॥
বদন চন্দ্র, অধর কন্দ, নয়নে গলত প্রেম তরঙ্গ,
চন্দ্র কোটি, ভানু মুখ, শোভা নিছুয়ারি॥
কুসুম শোভিত চাঁচর চিকুর,
ললাট তিলক নাসিকা উপর,
দশন মতিম, অমিয়া হাস, দামিনী ঘনয়ারি॥
মকর কুণ্ডল ঝলকে গণ্ড,
মণি কৌস্তুভ দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভা অতি ভারি॥
মালা চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গ, লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
চন্দন বলয়া, রতন নুপুর, যজ্ঞসূত্রধারী॥
সঘনে গাওয়ত, ভকতবৃন্দ, কমলা সেবিত পাদদ্বন্দ্ব,
ঠমকে চলত, মন্দ মন্দ, যাহু বলিহারি॥
কহত দীন কৃষ্ণদাস, গৌর চরণে করত আশ,
পতিত পাবন, নিতাই চাঁদ, প্রেমদানকারী॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে পঞ্চতত্ত্ব-আখ্যান-নিরূপণ,—

"স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর। অদ্বিতীয় নন্দাত্মজ রসিক-শেখর॥
রাসাদি-বিলাসী ব্রজললনা-নাগর। আর যত দেখ সব—তাঁর পরিকর॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই পরি[illegible] ন্য॥
একলে ঈশ্বরতত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর। ভক্তভাবময় [illegible]
কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এক অদ্ভুত স্বভাব। আপনা আ[illegible] ভাব।
হথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্যগোসাঞি। [illegible] কৃষ্ণস্বরূপ [illegible] ভাই॥
ভক্ত-অবতার তাঁর আচার্য্যগোসাঞি। এই তিন তত্ত্ব সবে 'প্রভু' করি গাই॥

এক মহাপ্রভু. আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ॥
এই তিন তত্ত্ব—সর্ব্বারাধ্য করি মানি। চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—আরাধক জানি॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ। শুদ্ধভক্ততত্ত্ব-মধ্যে সভার গণন॥
গদাধর-আদি প্রভুর শক্তি-অবতার। 'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি গণন যাঁহার॥
যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর নিত্য বিহার। যাঁহা-সভা লৈয়া প্রভুর কীর্ত্তনপ্রচার॥
যাঁহা-সভা লৈয়া করেন প্রেম-আস্বাদন। যাঁহা-সভা লৈয়া দান করেন প্রেমধন.
এই পঞ্চতত্ত্ব মিলি পৃথিবী আসিয়া। পূর্ব্বপ্রেম-ভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া॥
পাঁচে মিলি লুটে প্রেম করে আস্বাদন। যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাড়ে অনুক্ষণ॥
পুনঃপুন পিয়াপিয়া হয় মহামত্ত। নাচে কান্দে হাসে গায় যৈছে মদমত্ত॥
পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান। যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান॥
লুটিয়া খাইয়া দিয়া ভাণ্ডার উজাড়ে। আশ্চর্য্য ভাণ্ডার—প্রেম শতগুণ বাড়ে॥
উথলিল প্রেমবন্যা—চৌদিগে বেড়ায়। স্ত্রী-বৃদ্ধ-বালক-যুবা সভারে ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ। প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
জগত ডুবিল, জীবের হৈল বীজনাশ। তাহা দেখি পাঁচজনের পরম উল্লাস॥
যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে। তত তত বাঢ়ে জল—ব্যাপে ত্রিভুবনে॥
মায়াবাদী কর্ম্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ। নিন্দুক পাষণ্ডী যত পঢ়ুয়া অধম॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল। সেই বন্যা তা-সভারে ছুঁইতে নারিল॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু করেন চিন্তন—। জগৎ ডুবাইতে আমি করিল যতন॥
কেহো কেহো এড়াইল—প্রতিজ্ঞা হৈল ভঙ্গ। তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ
এত বলি মনে কিছু করিয়া বিচার। সন্ন্যাস আশ্রম প্রভু কৈলা অঙ্গীকার॥
চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্ম্মে॥
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈল আকর্ষণ। যতেক পলাঞাছিল তার্কিকাদিগণ॥
পঢ়ুয়া পাষণ্ডী কর্ম্মী নিন্দকাদি যত। তারা আসি প্রভু-পায় হয় অবনত॥
অপরাধ ক্ষমাইল—ডুবিল প্রেমজলে। কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে?॥
সভা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার। সভা-নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার॥
তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ-আদি। সবে এক এড়াইল কাশীর মায়াবাদী॥
বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কা[illegible]তে। মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিলা নিন্দিতে—॥
সন্ন্যাসী হইয়া [illegible]ন। না করে বেদান্তপাঠ—করে সঙ্কীর্ত্তন॥
[illegible] সন্ন্যাসী [illegible]নে। ভাবক হইয়া ফিরে ভাবকের সনে॥
[illegible]রিক [illegible]নে মনে। উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে॥
উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরাগমন। মথুরা দেখিয়া পুন কৈল আগমন॥
কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর। তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
তপনমিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্ব্বাহণ। সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥

নাতনগোসাঞি আসি তাঁহাই মিলিলা। তাঁর শিক্ষা-লাগি প্রভু দু'মাস রহিলা॥
তাঁরে শিখাইল সব বৈষ্ণবের ধর্ম্ম। ভাগবত-আদি শাস্ত্রে যত মূঢ় মর্ম্ম॥
ইথিমধ্যে চন্দ্রশেখর মিশ্রতপন। দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন—॥
কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন। না পারি সহিতে এবে ছাড়িব জীবন॥
তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ। শুনিতে না পারি ফাটে হৃদয়-শ্রবণ॥
ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া। সেইকালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া।
আসি নিবেদন করে চরণে ধরিয়া—। এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া॥
সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈল নিমন্ত্রণ। তুমি যদি আইস—পূর্ণ হয় মোর মন॥
না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি। মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি॥
প্রভু হাসি নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার। সন্ন্যাসীরে কৃপা-লাগি এ ভঙ্গী তাঁহার॥
সে বিপ্র জানেন—প্রভু না যান কারো ঘরে। তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে॥
আর দিনে গেলা প্রভু সে-বিপ্র-ভবনে। দেখিলেন—বসি আছেন সন্ন্যাসীর গণে॥
সভা নমস্করি গেলা পাদ-প্রক্ষালনে। পাদ-প্রক্ষালন করি বসিলা সেইস্থানে॥
বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য্য প্রকাশ—। মহাতেজোময় বপু—কোটিসূর্য্যভাস॥
প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন। উঠিলা সন্ন্যাসিগণ ছাড়িয়া আসন॥
প্রকাশানন্দ-নামে সর্ব্বসন্ন্যাসিপ্রধান। প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান—॥
ইহাঁ আইস ইহাঁ আইস শুনহ শ্রীপাদ! । অপবিত্র স্থানে বৈস—কিবা অবসাদ?
প্রভু কহেন—আমি হই হীনসম্প্রদায়। তোমা-সভার সভায় বসিতে না জুয়ায়॥
আপনে প্রকাশানন্দ হাথেতে ধরিয়া। বসাইল সভামধ্যে সম্মান করিয়া॥
পুছিল—তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য? কেশব-ভারতীর শিষ্য—তাতে তুমি ধন্য॥
সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী তুমি রহ এই গ্রামে। কি কারণে আমা-সভার না কর দর্শনে?॥
সন্ন্যাসী হইয়া কর নর্ত্তন-গায়ন। ভাবক সব সঙ্গে লৈয়া কর সঙ্কীর্ত্তন॥
বেদান্ত পঠন ধ্যান সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। তাহা ছাড়ি কেন কর ভাবকের কর্ম্ম?॥
প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ। হীনাচার কর কেনে, কি ইহার কারণ?
প্রভু কহে—শুন শ্রীপাদ! ইহার কারণ। গুরু মোরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন—॥
মূর্খ তুমি, তোমার নাহি বেদান্তাধিকার। কৃষ্ণমন্ত্র জপ সদা, এই মন্ত্র সার॥
কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসারমোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ॥
নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম্ম। স[illegible]-সার নাম—এই শাস্ত্র-মর্ম্ম॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে। [illegible] করিহ বিচারে॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়বচনম্।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ না[illegible] [illegible]রন্যথা॥
এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ। নাম লৈতে-লৈতে [illegible] ভ্রান্ত হৈল মন॥
ধৈর্য্য করিতে নারি—হৈলাম উন্মত্ত। হাসি কান্দি নাচি গাই—যৈছে মদোন্মত্ত॥

তবে ধৈর্য্য করি মনে করিল বিচার—। কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার॥
পাগল হইলাঙ আমি—ধৈর্য্য মনে মনে। এত চিন্তি নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে -
কিবা মন্ত্র দিলা গোসাঞি! কিবা তার বল। জপিতে-জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
হাসায় নাচায় মোরে করায় ক্রন্দন। এত শুনি গুরু হাসি বলিলা বচন—॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত স্বভাব। যেই জপে,—তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব॥
কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ। যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু। মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥
'কৃষ্ণনামের ফল প্রেমা'—সর্ব্ব-শাস্ত্রে কয়। ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমার করিল উদয়॥
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু-ক্ষোভ। কৃষ্ণের চরণপ্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥
প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে কান্দে গায়। উন্মত্ত হইয়া নাচে—ইতি-উতি ধায়॥
স্বেদ কম্প রোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য। উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়। কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায়॥
ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ। তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাম কৃতার্থ॥
নাচো গাও ভক্তসঙ্গে কর সঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণনাম উপদেশি তার' সর্ব্বজন॥
এত বলি এক শ্লোক শিখাইল মোরে। 'ভাগবতের সার এই' বোলে বারেবারে॥

তথাহি (ভাঃ—২।৪৭।৩৮)—

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

এই তাঁর বাক্যে আমি দৃঢ়-বিশ্বাস করি। নিরন্তর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন করি॥
সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায় নাচায়। গাই নাচি নাহি আমি আপন ইচ্ছায়॥
কৃষ্ণনামে যে-আনন্দ-সিন্ধু-আস্বাদন। ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক সম॥

তথাহি হরিভক্তিসুধোদয়ে (১৪।৩৬)—

ত্বৎ সাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো॥

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি সন্ন্যাসীর গণ। চিত্ত ফিরি গেল, কহে মধুরবচন—।
যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয়। কৃষ্ণপ্রেমা সে-ই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥
কৃষ্ণভক্তি কর, ইহায় সভার সন্তোষ। বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ?॥
এত শুনি হাসি প্রভু বলি[illegible]ন।—। দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন॥
ইহা শুনি [illegible]গণ—। তোমারে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ।
[illegible]ণ। তোমার মাধুরী দেখি জুড়ায় নয়ন॥
[illegible]নন্দিত মন। কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন॥
[illegible] কহে—বেদান্তসূত্র ঈশ্বরবচন। ব্যাসরূপে কহিল যাহা শ্রীনারায়ণ॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে যেই তত্ত্ব। মুখ্যবৃত্তি সেই অর্থ—পরম-মহত্ত্ব॥
গৌণবৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য্য। তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব্বকার্য্য॥
তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা। গৌণার্থ করিল মুখ্য-অর্থ আচ্ছাদিয়া॥
'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য-অর্থে কহে—ভগবান্। চিদৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ—অনূর্দ্ধ-সমান॥
তাঁর বিভূতি-দেহ—সব চিদাকার। চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি তাঁরে কহে 'নিরাকার'॥
চিদানন্দ তেঁহো—তাঁর স্থান পরিবার। তাঁরে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার?
তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস। আর যেই শুনে, তার হয় সর্ব্বনাশ॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর। প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন। জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥
জীবতত্ত্ব শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান্। গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি ইথে পরমাণ॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্ (৭।৫)—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে (৬।৭।৬১)—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি পরতত্ত্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব॥
ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ। 'ব্যাস ভ্রান্ত' বলি তাঁহা উঠাইল বিবাদ॥
'পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।' এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ। 'দেহে আত্মবুদ্ধি' এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়?॥
প্রণব সে মহাবাক্য—বেদের নিদান। ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয়-ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ। 'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ॥
প্রণব মহাবাক্য—তাহা করি আচ্ছাদন। [illegible]বাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥
সর্ব্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান। মুখ্য[illegible]ক্ষণা-ব্যাখ্যান॥
স্বতঃপ্রমাণ বেদ—প্রমাণশিরোমণি। লক্ষণা [illegible]তঃ-হানি॥
এইমত প্রতি সূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া। গৌণার্থ [illegible]
এইমত প্রতিসূত্রে করেন দূষণ। শুনি চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ॥
সকল সন্ন্যাসী কহে—শুনহ শ্রীপাদ।। তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ॥
আচার্য্যকল্পিত অর্থ ইহা সভে জানি। সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি॥

মুখ্য-অর্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল। মুখ্যার্থ লাগাইল প্রভু সূত্রসকল— ॥
বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান্। ষড়্‌বিধ-ঐশ্বর্য্য-পূর্ণ পরতত্ত্বধাম ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ। সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥
তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি
ভগবান্‌-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়। শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥
সেই সর্ব্ববেদের 'অভিধেয়'-নাম। সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গাম ॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ। কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥
পঞ্চমপুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্তবশ। প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণসেবাসুখরস ॥
সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম। এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যবসান ॥
এইমত সবসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া। সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥
বেদময়-মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈনু নিন্দন ॥
সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন। কৃষ্ণকৃষ্ণনাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥
এইমত তা-সভার ক্ষমি অপরাধ। সভাকারে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রসাদ ॥
তবে তব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া। ভিক্ষা করিলেন সভে মধ্যে বসাইয়া ॥
ভিক্ষা করি মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর। হেন চিত্র লীলা করে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥
চন্দ্রশেখর তপনমিশ্র সনাতন। শুনি দেখি আনন্দিত সভাকার মন ॥
প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী। প্রভুর প্রশংসা করে সর্ব্ব বারাণসী ॥
বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পুরীসহ সর্ব্বলোক হৈল মহাধন্য ॥
লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে। মহাভিড় হৈল, দ্বারে নারে প্রবেশিতে
প্রভু যবে যান বিশ্বেশ্বর-দরশনে। লক্ষলক্ষ লোক আসি মিলে সেইস্থানে ॥
স্নান করিতে যবে যান গঙ্গাতীরে। তাঁহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥
বাহু তুলি বোলে প্রভু—বোল হরিহরি। হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গ-মর্ত্ত ভরি ॥
লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন। বৃন্দাবনে পাঠাইলেন শ্রীসনাতন ॥
রাত্রি-দিবসে লোকের দেখি কোলাহল। বারাণসী ছাড়ি প্রভু আইলা নীলাচল ॥
এই লীলা কহিব আগে বিস্তার [illegible]রিয়া। সংক্ষেপে কহিল ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥
এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ[illegible]। কৃষ্ণনাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য ॥
মথুরাতে প[illegible]। দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি-প্রচারণ ॥
[illegible] আনন্দ[illegible] গৌড়দেশে। তেঁহো ভক্তি প্রচারিল অশেষ-বিশেষে ॥
[illegible] গমন্। গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণ নাম প্রচারণ ॥
[illegible]ন্ধুপর্য্যন্ত কৈল ভক্তির প্রচার। কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈল সভার নিস্তার ॥
[illegible]ত কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান। ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্য-তত্ত্বজ্ঞান ॥
চৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত তিনজন। শ্রীবাস-গদাধর আদি যত ভক্তগণ ॥

সভাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার। যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্যবিহার॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গুণ্ডিকা-মন্দির-মার্জ্জন,—

"পূর্ব্বে দক্ষিণ হইতে যবে প্রভু আইলা। তাঁরে মিলিতে গজপতি উৎকণ্ঠিত হৈলা॥
কটক হৈতে পত্রী দিল সার্ব্বভৌম-ঠাঞি—। প্রভু আজ্ঞা হয় যদি—দেখিবারে যাই।
ভট্টাচার্য্য লিখিলা—প্রভুর আজ্ঞা না হইল। পুনরপি রাজা তারে পত্রী পাঠাইল—॥
প্রভুর নিকটে যত আছেন ভক্তগণ। মোর লাগি তাঁ-সভারে করিহ নিবেদন॥
সেই সব দয়ালু মোরে হইয়া সদয়। মোর লাগি প্রভুপদে কহেন বিনয়॥
তাঁ-সভার প্রসাদে মিলো শ্রীপ্রভুর পায়॥ প্রভুকৃপা-বিনু মোরে রাজ্য নাহি ভায়॥
যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি। রাজ্য ছাড়ি প্রাণ দিব—হইব ভিখারী॥
ভট্টাচার্য্য পত্রী দেখি চিন্তিত হইয়া। ভক্তগণ-পাশ গেলা সে পত্রী লইয়া॥
সভারে মিলিয়া কহিলা রাজ-বিবরণ। পাছে সেই পত্রী সভারে করাইল দর্শন॥
পত্রী দেখি সভার মনে হইল বিস্ময়—। প্রভুপদে গজপতির এত ভক্তি হয়॥
সভে কহে প্রভু তারে কভু না মিলিবে। আমি সব কহি যবে—দুঃখ সে মানিবে॥
সার্ব্বভৌম কহে—সভে চল একবার। মিলিতে না কহিব কহিব রাজব্যবহার॥
এত কহি সভে গেলা মহাপ্রভু-স্থানে। কহিতে উন্মুখ সভে—না কহে বচনে॥
প্রভু কহে—কি কহিতে সভার আগমন? দেখি যে কহিতে চাহ না কহ কি কারণ॥
নিত্যানন্দ কহে—তোমায় চাহি নিবেদিতে! না কহিলে রহিতে ভয় চিতে॥
যোগ্যাযোগ্য সব তোমার চাহি নিবেদিতে। তোমা না মিলিলে রাজা চাহে যোগী হৈতে
যদ্যপি শুনিঞা প্রভুর কোমল হইল মন। তথাপি বাহিরে কহে নিষ্ঠুরবচন॥
তোমাসভার ইচ্ছা এই—আমাসভা লঞা। রাজাকে মিলহ ইহো কটক যাইয়া॥
পরমার্থ যাউ, লোকে করিবে নিন্দন। লোক রহু, দামোদর করিব ভৎসর্ন॥
তোমাসভার আজ্ঞায় আমি না মিলি রাজারে। দামোদর কহে—যদি—তবে মিলি তারে॥
দামোদর কহে—তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্রজীব তোমারে বিধি দিব?। আপনে মিলিবে তাঁরে, তাহা যে দেখিব॥
রাজা তোমার স্নেহ করে, তুমি স্নেহবশ। তার স্নেহে করাবে তারে তো[illegible] পরশ॥
যদ্যপি ঈশ্বর তুমি পরম স্বতন্ত্র। তথা[illegible]স্বভাবে হও প্রেমপরতন্ত্র॥
নিত্যানন্দ কহে—ঐছে হয় কোন জন। [illegible]—কর রাজারে [illegible]লন॥
কিন্তু অনুরাগিলোকের স্বভাব এক হয়। [illegible] প্রাণ সে [illegible]য়॥
যাজ্ঞিকব্রাহ্মণী হয় তাহাতে প্রমাণ। কৃষ্ণ-লা[illegible]
তৈছে যুক্তি করি, যদি কর, অবধান। তুমিহ না [illegible], রহে [illegible]॥
এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি। তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমা[illegible]
প্রভু কহে—তুমি সব পরমবিদ্বান্। যেই ভাল হয়—সেই কর সমাধান॥

তবে নিত্যানন্দগোসাঞি গোবিন্দের পাশ। মাগিয়া লইল প্রভুর এক বহির্ব্বাস।
সেই বহির্ব্বাস সার্ব্বভৌম-পাশ দিল। সার্ব্বভৌম সেই বস্ত্র রাজারে পাঠাইল॥
বস্ত্র পাঞা আনন্দিত হৈল রাজার মন। প্রভুরূপ করি করে বস্ত্রের পূজন॥
রামানন্দরায় যবে দক্ষিণ হৈতে আইলা। প্রভুসঙ্গে রহিতে রাজারে নিবেদিলা॥
তবে রাজা সন্তোষে তাহারে আজ্ঞা দিলা। আপন মিলন লাগি সাধিতে লাগিলা—
মহাপ্রভু মহা কৃপা করেন তোমারে। মোরে মিলাইতে অবশ্য সাধিবে তাঁহারে॥
একসঙ্গে দুইজন ক্ষেত্রে যবে আইলা। রামানন্দরায় তবে প্রভুরে মিলিলা॥
প্রভু-পদে প্রেমভক্তি জানাইল রাজার। প্রসঙ্গ পাইয়া ঐছে কহে বারবার॥
রাজমন্ত্রী রামানন্দ—ব্যবহারে নিপুণ। রাজার প্রীতি কহি দ্রবায় মহাপ্রভুর মন॥
উৎকণ্ঠাতে প্রতাপরুদ্র নারে রহিবারে। রামানন্দ সাধিলেন প্রভু মিলিবারে॥
রামানন্দ প্রভু-পদে কৈল নিবেদন—। একবার প্রতাপরুদ্রে দেখাহ চরণ॥
প্রভু কহে—রামানন্দ! কহ বিচারিয়া। রাজারে মিলিতে যুয়ায় সন্ন্যাসী হইয়া?
রাজার মিলনে ভিক্ষুর দুইলোকনাশ। পরলোক রহু, লোকে করে উপহাস॥
রামানন্দ কহে—তুমি ঈশ্বর স্বতন্ত্র। কারে তোমার ভয়, তুমি নহ পরতন্ত্র?॥
প্রভু কহে—আমি মনুষ্য, আশ্রমে সন্ন্যাসী। কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্পছিদ্র সর্ব্বলোকে গায়। শুক্লবস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে— কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি। ঈশ্বরসেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস। সুরাবিন্দুপাতে কেহো না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্বগুণবান্! তাহারে মলিন কৈল এক 'রাজ' নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়। তবে আনি মিলাহ মোরে তাহার তনয়॥
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্রবাণী। পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি।
তবে রায় যাই সব রাজাকে কহিলা। প্রভুর আজ্ঞায় তার পুত্র লঞা আইলা॥
সুন্দর রাজার পুত্র—শ্যামলবরণ। কৈশোরবয়স—দীর্ঘ-চপল নয়ন।
পীতাম্বর ধরে, অঙ্গে রত্ন-আভরণ। কৃষ্ণস্মরণের তেঁহো হৈলা উদ্দীপন॥
তারে দেখি মহাপ্রভুর কৃষ্ণস্মৃতি হৈলা। প্রেমাবেশে তারে মিলি কহিতে লাগিলা—॥
এই মহাভাগবত,—যাহার দর্শনে। ব্রজেন্দ্রনন্দন-স্মৃতি হয় সর্ব্বজনে॥
কৃতার্থ [illegible]লাম আমি ইহার দর্শনে। এত [illegible]লি পুন তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্প[illegible] রাজপুত্রের হৈল প্রেমাবেশ[illegible]দ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥
'কৃষ্ণকৃষ্ণ' [illegible]হে, [illegible]। [illegible] ভাগ্য দেখি শ্লাঘা করে ভক্তগণ॥
তবে ম[illegible] তারে [illegible]নে। [illegible]্য আসি আমায় মিলিহ' এই আজ্ঞা দিল॥
বিদায় [illegible]মার [illegible] নে মনে। রাজা সুখ পাইল পুত্রের চেষ্টা দেখিয়া॥
পু[illegible] প্রমাবিষ্ট হৈলা। সাক্ষাৎ পরশ যেন মহাপ্রভুর পাইলা॥
সেই [illegible]গ্যবান্ রাজার নন্দন। প্রভুর ভক্তগণমধ্যে হৈলা এক জন॥

এইমত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে। নিরন্তর ক্রীড়া করে সঙ্কীর্ত্তন-রঙ্গে॥
আচার্য্যাদি ভক্তগণ করে নিমন্ত্রণ। তাঁহা-তাঁহা ভিক্ষা করে লঞা ভক্তগণ॥
এইমত নানারঙ্গে দিনকথো গেল। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রার দিবস আইল॥
প্রথমেই প্রভু কাশীমিশ্রেরে আনিয়া। পড়িছা-পাত্র সার্ব্বভৌম আনিল ডাকিয়া॥
তিনজনার পাশে প্রভু হাসিয়া কহিল। গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-সেবা মাগি নিল॥
পড়িছা কহে—আমি সব সেবক তোমার। যেই তোমার ইচ্ছা, সেই কর্ত্তব্য আমার॥
বিশেষে রাজার আজ্ঞা হৈয়াছে আমারে। সেই প্রভুর ইচ্ছা সেই শীঘ্র করিবারে॥
তোমার যোগ্য সেবা নহে মন্দির-মার্জ্জন। এহো এক লীলা করয়ে তোমার মন॥
কিন্তু ঘট-সম্মার্জ্জনী বহুত চাহিয়ে। আজ্ঞা দেহ আজি সব ইহাঁ আনি দিয়ে॥
তবে একশত ঘট, শত সম্মার্জ্জনী। নূতন প্রভুর আগে দিল পড়িছা আনি॥
আরদিন প্রভাতে প্রভু লঞা নিজগণ। শ্রীহস্তে সভার অঙ্গে লেপিল চন্দন॥
শ্রীহস্তে সভারে দিল একেক মার্জ্জনী। সবগণ লৈয়া প্রভু চলিলা আপনি॥
গুণ্ডিচামন্দিরে গেলা করিতে মার্জ্জন। প্রথমে মার্জ্জনী লঞা করিল শোধন॥
ভিতরমন্দির উপর সব সম্মার্জ্জিল। সিংহাসন মার্জ্জি চারিভিত সে শোধিল॥
ভিতর মন্দির কৈল মার্জ্জন-শোধন। পাছে তৈছে শোধিলেন শ্রীজগমোহন॥
চারিপাশে শত ভক্ত সম্মার্জ্জনী করে। আপনি শোধয়ে প্রভু শিখায় সভারে॥
প্রেমোল্লাসে গৃহ শোধে—লয় কৃষ্ণ নাম। ভক্তগণ 'কৃষ্ণ' কহে, করে নিজ কাম॥
ধূলিধূসর-তনু দেখিতে শোভন। কাঁহো-কাঁহো অশ্রুজলে করে সম্মার্জ্জন॥
ভোগমণ্ডপ শোধি শোধিল প্রাঙ্গণ। সকল আবাস ক্রমে করিল শোধন॥
তৃণ ধূলি ঝিকর সব একত্র করিয়া। বহির্ব্বাসে করি ফেলায় বাহিরে লইয়া।
এইমত ভক্তগণ করি নিজ-বাসে। তৃণ-ধূলী বাহিরে ফেলে পরম-হরিষে॥
প্রভু কহে—কে কত করিয়াছ মার্জ্জন। তৃণধূলি-পরিমাণে জানিব পরিশ্রম॥
সভার ঝাটিনা বোঝা একত্র করিল। সভা-হৈতে প্রভুর বোঝা অধিক হইল॥
এইমত অভ্যন্তর করিল মার্জ্জন। পুন সভাকারে দিল করিয়া বণ্টন—॥
সূক্ষ্মধূলি তৃণ কাঁকর, সব কর দূর। ভালমতে শোধ সব প্রভুর অন্তঃপুর॥
সব বৈষ্ণব লঞা যবে দুইবার শোধিল। দেখি মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল॥
আর শতজন শত ঘটে জল ভরি। প্রথমেই লঞা আছে কালাপেক্ষা [illegible]॥
'জল আন' বলি যবে মহাপ্রভু কৈল। [illegible] শতঘট [illegible]আনি প্রভু-আগে [illegible]ল॥
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন। [illegible] মহা[illegible] [illegible]মধ্যে সিং[illegible]
থাপরা ভরিয়া জল উর্দ্ধে চাপাইল। [illegible] ভিত[illegible]
প্রথমে করিল প্রভু মন্দির-প্রক্ষালন। শ্রী[illegible]
ভক্তগণ করে গৃহমধ্যপ্রক্ষালন। নিজনিজ হস্তে করে মন্দিরমাজ[illegible]
কেহো জলঘট দেয় মহাপ্রভুর করে। কেহো ছলে জল দেয় চরণ-[illegible]

কেহো লুকাইয়া করে সেই জল পান। কেহে মাগি লয়, কেহো অন্যে করে দান॥
ঘর ধুই প্রণালিকায় জল ছাড়ি দিল। সেই জলে প্রাঙ্গণ সব ভরিয়া রহিল॥
নিজবস্ত্রে কৈল প্রভু গৃহ-সম্মার্জন। মহাপ্রভু নিজবস্ত্রে মার্জিলেন সিংহাসন॥
শতঘট জলে হৈল মন্দির মার্জন। মন্দির শোধিয়া কৈল যেন নিজমন॥
নির্ম্মল শীতল স্নিগ্ধ করিলা মন্দিরে। আপন হৃদয় যেন ধরিল বাহিরে॥
শতশত লোক ভরে সরোবরে। ঘাটে স্থল নাহি, কেহো কূপে জল ভরে॥
পূর্ণকুম্ভ লঞা আইসে শত ভক্তগণ। শূন্যঘট লঞা যায় আর শতজন॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত স্বরূপ ভারতী আর পুরী। ইহা বিনু আর সব আনে জল ভরি॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল। শতশত ঘট তাহাঁ লোকে লঞা আইল।
জল ভরে, ঘর ধোয়, করে হরিধ্বনি। কৃষ্ণ-হরি-ধ্বনি বিনা আর নাহি শুনি॥
"কৃষ্ণকৃষ্ণ" কহি করে ঘট-সমর্পণ। 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই কহে সেই কহে কৃষ্ণনামে। কৃষ্ণনাম হইল সঙ্কেত সর্ব্ব-কামে॥
প্রেমবেশে প্রভু কহে 'কৃষ্ণকৃষ্ণ'-নাম। একলে করেন প্রেমে শতজনের কাম॥
শতহাথে করে যেন ক্ষালন-মার্জন। প্রতিজনপাশে যাই করায় শিক্ষণ।
ভালকর্ম্ম দেখি তারে করেন প্রশংসন। মন না মানিলে করে পবিত্র ভৎর্সন—॥
তুমি ভাল করিয়াছ, শিখাহ অন্যেরে। এইমত ভালকর্ম্ম সেহো যেন করে॥
এ কথা শুনিয়া সভে সঙ্কোচিত হঞা। ভালমতে করে কর্ম্ম সভে মন দিয়া॥
তবে প্রভু প্রক্ষালিল শ্রীজগমোহন। ভোগমণ্ডপ তবে কৈল প্রক্ষালন॥
নাটশালা ধুই ধুইল চত্বর-প্রাঙ্গণ। পাকশালা-আদি সব কৈল প্রক্ষালন॥
মন্দিরের চতুর্দ্দিক্ প্রক্ষালন কৈল। সব অন্তঃপুর ভালমতে ধোয়াইল॥
হেনকালে এক গৌড়িয়া সুবুদ্ধি সরল। প্রভুর চরণযুগে দিল ঘটজল॥
সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল। তাহা দেখি প্রভুর মনে দুঃখ-রোষ হৈল॥
যদ্যপি গোসাঞি তারে হঞাছে সন্তোষ। শিক্ষা-লাগি বাহিরে তথাপি করে রোষ।
স্বরূপগোসাঞিরে আনি কহিল তাহারে—। এই দেখ তোমার গৌড়িয়ার ব্যবহারে॥
ঈশ্বরমন্দিরে মোর পদ ধোয়াইল। সেই জল লইয়া আপনে পান কৈল॥
এই অপরাধে মোর কাহাঁ হবে গতি। তোমার গৌড়িয়া করে এতেক ফৈজতি॥
তবে স্বরূপগোসাঞি তার ঘাড়ে হাথ দিয়া। ঢেকা মারি পুরীর বাহির কৈল লৈয়া॥
পুন [illegible] আসি প্রভুর পায় [illegible] অজ্ঞ-অপরাধ ক্ষমা করিতে জুয়ায়॥
তবে ম[illegible] প্রভু মনে স[illegible] [illegible] করি দুইপাশে সভারে বসাইলা॥
আপ[illegible] [illegible] তৃণ-কাঁটা-কুটা সভে লাগিলা কুড়াইতে॥
'কে[illegible] [illegible] যার অন্ন, তার ঠাঞি পিঠাপানা লব॥'
এ[illegible] করিল শোধন। শীতল নির্ম্মল কৈল যেন নিজমন॥
প্রণালি[illegible] ছাড়ি যদি জল বহাইল। নূতন নদী যেন সমুদ্রে মিলিল॥

এইমত পুর-দ্বার অগ্রে পথ যত। সকল শোধিল তাহা কে বর্ণিবে কত?॥
নৃসিংহমন্দির-ভিতর-বাহির-শোধিল। ক্ষণেক বিশ্রাম করি নৃত্য আরম্ভিল॥
চারিদিগে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন। মধ্যে নৃত্য করে প্রভু-মত্তসিংহ-সম॥
স্বেদ কম্প বৈবর্ণ্যাশ্রু-পুলক হুঙ্কার। নিজ-অঙ্গ ধুই আগে চলে অশ্রুধার॥
চারিদিগে ভক্ত-অঙ্গ কৈল প্রক্ষালন। শ্রাবণমাসে মেঘ যেন করে বরিষণ॥
মহা উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ ভরিল। প্রভুর উদ্দণ্ড-নৃত্যে ভূমিকম্প হৈল॥
স্বরূপের উচ্চগান প্রভুরে সদা ভায়। আনন্দে উদ্দণ্ডনৃত্য করে গৌররায়॥
এইমতে কথোক্ষণ নৃত্য করিয়া। বিশ্রাম করিল প্রভু সময় বুঝিয়া॥
আচার্য্যগোসাঞির পুত্র শ্রীগোপাল নাম। নৃত্য করিতে তারে আজ্ঞা দিলা ভগবান্॥
প্রেমাবেশে নৃত্যে তিঁহো হইলা মূর্চ্ছিতে। অচেতন হঞা তেঁহো পড়িলা ভূমিতে॥
আস্তেব্যস্তে আচার্য্যগোসাঞি তারে লৈল কোলে। শ্বাসরহিত দেখি আচার্য্য হইলা বিকল॥
নৃসিংহের মন্ত্র পড়ি মারে-জলঝাটি। হুহুঙ্কারশব্দে ব্রহ্মাণ্ড যায় ফাটি॥
অনেক করিল, তবু না হয় চেতন। আচার্য্য কান্দেন, কান্দে সব ভক্তগণ॥
তবে মহাপ্রভু তার বুকে হাথ দিল। 'উঠহ গোপাল!" বলি উচ্চ স্বর কৈল॥
শুনিতেই গোপালের হইল চেতন। 'হরি' বলি নৃত্য করে সব ভক্তগণ॥
এই লীলা বর্ণিয়াছেন দাস বৃন্দাবন। অতএব সংক্ষেপ করি করিল বর্ণন॥
তবে মহাপ্রভু ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া। সরোবরে জলক্রীড়া কৈল ভক্ত লঞা॥
তীরে উঠি পরি সভে শুষ্ক বসন। নৃসিংহদেবে নমস্করি গেলা উপবন॥
উদ্যানে বসিল প্রভু ভক্তগণে লঞা। তবে বাণীনাথ আইলা প্রসাদ লইয়া॥
কাশীমিশ্র তুলসী-পড়িছা দুইজন। পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভক্ষণ॥
তত অন্ন পিঠা পানা সব পাঠাইল। দেখিয়া প্রভুর চিত্তে সন্তোষ হইল॥
পুরীগোসাঞি মহাপ্রভু ভারতী ব্রহ্মানন্দ। অদ্বৈত-আচার্য্য আর প্রভু নিত্যানন্দ॥
আচার্য্যরত্ন আচার্য্যনিধি শ্রীবাস গদাধর। শঙ্করারণ্য ন্যায়াচার্য্য রাঘব বক্রেশ্বর॥
প্রভু- আজ্ঞা পাঞা বৈসে আপনে সার্ব্বভৌম। পিণ্ডোপরি বৈসে প্রভু লঞা এতজন॥
তার তলে তার তলে করি অনুক্রম। উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন॥
'হরিদাস!" বলি প্রভু ডাকে ঘনেঘন। দ্বারে রহি হরিদাস করে নিবেদন—॥
ভক্তসঙ্গে প্রভু করুন প্রসাদ অঙ্গীকার॥ এ-সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহি [illegible]ঞি ছার॥
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দিবে বহি[illegible] [illegible]নন জানি প্রভু পুন না ব[illegible]লা তারে॥
স্বরূপগোসাঞি জগদানন্দ দামোদর। [illegible] [illegible]থ বাণীনাথ [illegible]র॥
পরিবেশন করে তাহা এই সাতজন। [illegible] [illegible] করে [illegible]
পুলিনভোজন যৈছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে কৈল। [illegible] [illegible]হল॥
যদ্যপি প্রেমাবেশে [illegible]ভু হইলা অধীর। সময় বুঝিয়া তবু মন [illegible]
প্রভু কহে—মোরে দেহ লাফরা-ব্যঞ্জনে। পিঠাপানা অমৃতগুটিক [illegible]কগণে॥

সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানেন—যারে যেই ভায়। তারে-তারে সেই দেওয়ায় স্বরূপ-দ্বারায়।"
জগদানন্দ বেড়ায় পরিবেশন করিতে। প্রভুর পাতে ভালদ্রব্য দেন আচম্বিতে॥
যদ্যপিহ দিলে প্রভু তারে করেন রোষ। বলে-ছলে তবু দেন দিলে সে সন্তোষ॥
পুন আসি সেই দ্রব্য করে নিরীক্ষণ। তার ভয়ে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
না খাইলে জগদানন্দ করিবে উপবাস। তার আগে কিছু খায় মনে এই ত্রাস॥
স্বরূপগোসাঞি ভাল মিষ্টপ্রসাদ লঞা। প্রভুকে নিবেদন-করে আগে দাণ্ডাইয়া—।
এই মহাপ্রসাদ অল্প কর আস্বাদন। দেখ জগন্নাথ কৈছে করিয়াছেন ভোজন॥
এত বলি কিছু আগে করে সমর্পণ। তার স্নেহে প্রভু কিছু করেন ভক্ষণ॥
এইমত দুইজন করে বারবার। চিত্র এই দুইভক্তের স্নেহব্যবহার॥
সার্ব্বভৌমে প্রভু বসাইয়াছেন নিজ-পাশে। দুইভক্তের স্নেহ দেখি সার্ব্বভৌম-হাসে॥
সার্ব্বভৌমেরে প্রভু প্রসাদ উত্তম। স্নেহ করি বারবার করান ভোজন॥
গোপীনাথাচার্য্য উত্তম মহাপ্রসাদ আনি। সার্ব্বভৌমে দিয়া কহে সুমধুর বাণী॥
কাঁহা ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব জড়ব্যবহার। কাঁহা এই পরমানন্দ, করহ বিচার॥
সার্ব্বভৌম কহে—আমি তার্কিক কুবুদ্ধি। তোমার প্রসাদে আমার এ সম্পদ্‌সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু-বিনা কেহো নাহি দয়াময়। কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়?।
তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউভেউ করি। সেই মুখে এবে সদা কহি "কৃষ্ণ-হরি"॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ-তার্কিক-শিষ্যগণ সঙ্গে। কাঁহা এই সঙ্গ-সুধাসমুদ্র-তরঙ্গে॥
প্রভু কহে—পূর্ব্বসিদ্ধ কৃষ্ণে তোমার প্রীতি। তোমা সঙ্গে আমাসভার হৈল কৃষ্ণে মতি।
ভক্তমহিমা বাড়াইতে, ভক্তে সুখ দিতে। মহাপ্রভু-সম আর নাহি ত্রিজগতে॥
তবে প্রভু প্রত্যেকে সবভক্ত-নাম লঞা। পিঠাপানা দেওয়াইলা প্রসাদ করিয়া॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ বসিয়াছেন একঠাঞি॥ দুইজনে ক্রীড়া-কলহ লাগিল তথাই।
অদ্বৈত কহে—অবধূত-সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তি। ভোজন করি না জানিয়ে হবে কোন্ গতি?
প্রভু ত সন্ন্যাসী, উহার নাহি অপচয়। অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥
"নান্নদোষেণ মস্করী" এই শাস্ত্রের প্রমাণ। গৃহস্থ ব্রাহ্মণ আমার এই দোষস্থান॥
জন্মকুলশীলাচার না জানি যাহার। তার সঙ্গে একপঙ্‌ক্তি—বড় অনাচার॥
নিত্যানন্দ কহে—তুমি অদ্বৈত-আচার্য্য। অদ্বৈতসিদ্ধান্তে বাধে শুদ্ধভক্তিকার্য্য॥
তোমার [illegible]ন্ত-সঙ্গ করে যেই জনে। একবস্তু-বিনা সেই দ্বিতীয় না মানে॥
হেন তো[illegible]র সঙ্গে মোর একত্র ভোজন। [illegible] জানি তোমার সঙ্গে কৈছে হয় মন?
এইমত [illegible]জনে করে [illegible] [illegible]। [illegible]তি করে দোঁহে যেছে গালাগালি॥
তবে প্র[illegible] [illegible]বৈষ্ণবে [illegible] [illegible]নে। [illegible] দেয়ান কৃপা অমৃত সিঞ্চিয়া॥
ভোজ[illegible]মার [illegible] [illegible]নে মধ্যে। হরিধ্বনি উঠিল সেই স্বর্গমর্ত্ত্য ভরি॥
ত[illegible]-নিজ ভক্ত সনে। সভাকে শ্রীহস্তে দিলা মাল্যচন্দনে॥
তবে [illegible] স্বরূপাদি সাতজন। গৃহ-ভিতর বসি কৈল প্রসাদভোজন॥

প্রভুর অবশেষ গোবিন্দ রাখিল ধরিয়া। সেই অন্ন কিছু হরিদাসে দিল লঞা॥
ভক্তগণ গোবিন্দ-পাশ কিছু মাগি নিল। সেই প্রসাদান্ন গোবিন্দ আপনি পাছে পাইল॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা। "ধোয়াপাখালা" নাম কৈলা এই এক লীলা॥
আরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব-নাম। মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ-সমান॥
পক্ষদিন দুঃখী লোক প্রভু-অদর্শনে। আনন্দিত হৈলা জগন্নাথ-দরশনে॥
মহাপ্রভু সুখে লৈয়া সবভক্তগণ। জগন্নাথ-দরশনে করিলা গমন॥
আগে কাশীশ্বর যায় লোক নিবারিয়া। পাছে গোবিন্দ যায় জলকরঙ্গ লঞা॥
প্রভু-আগে পুরী ভারতী দোঁহার গমন। স্বরূপ অদ্বৈত দুই পার্শ্বে দুইজন॥
পাছে পার্শ্বে চলি যায় আর ভক্তগণ। উৎকণ্ঠায় গেলা জগন্নাথের ভবন॥
দরশন-লোভেতে করি মর্য্যাদা-লঙ্ঘন। ভোগ যাচঞা করে শ্রীমুখ দরশন॥
তৃষার্ত্ত প্রভুর নেত্র ভ্রমর-যুগল। গাঢ়াসক্ত্যে পিয়ে কৃষ্ণের বদনকমল॥
প্রফুল্ল-কমল জিনি নয়ন-যুগল। নীলমণিদর্পণকান্তি গণ্ড ঝলমল॥
বান্ধুলীর ফুল জিনি অধর সুরঙ্গ। ঈষৎ হসিত কান্তি অমৃত-তরঙ্গ॥
শ্রীমুখ-সৌন্দর্য্য-মধু বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে। কোটিকোটি-ভক্তনেত্রভৃঙ্গ করে পানে॥
যত পিয়ে তত তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর। মুখাম্বুজ ছাড়ি নেত্র না হয় অন্তর॥
এইমত মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ। মধ্যাহ্নপর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখদর্শন॥
স্বেদ কম্প অশ্রুজল বহে অনুক্ষণ। দর্শনের লোভে প্রভু করে সম্বরণ॥
মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে, মধ্যে দরশন। ভোগের সময়ে প্রভু করে সঙ্কীর্ত্তন॥
দর্শন-আনন্দে প্রভু সব পাসরিলা। ভক্তগণ মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু লঞা গেলা॥
"প্রাতঃকালে রথযাত্রা হবেক" জানিয়া। সেবকে লাগায় ভোগ দ্বিগুণ করিয়া॥
গুণ্ডিচামার্জ্জন-লীলা সঙ্ক্ষেপে কহিল। যাহা দেখি-শুনি পাপীর কৃষ্ণভক্তি হৈল॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে হরিদাস-মহিমা কথন,—

"হরিদাস যবে নিজগৃহ ত্যাগ কৈলা। বেণাপোলের বনমধ্যে কথোদিন রহিলা॥
নির্জ্জনবনে কুটীর করি তুলসীসেবন। রাত্রি-দিনে তিনলক্ষনামসঙ্কীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষানির্ব্বাহণ। প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥
সেইদেশাধ্যক্ষ—নাম রামচন্দ্রখান। বৈষ্ণবদ্বেষী সেই পাষণ্ডি-প্রধান॥
হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে। তার অপমান করিতে নানা উ[illegible] করে॥
কোনপ্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পা[illegible] [illegible]বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের [illegible]ায়॥
বেশ্যাগণে কহে—"এই বৈরাগী হরিদাস [illegible] [illegible]র বৈরাগ্যধর্ম্ম [illegible]শ"॥
বেশ্যাগণমধ্যে এক সুন্দরী যুবতী। সেই ক[illegible] [illegible]রিব তা[illegible]॥
[illegible]খান কহে মোর পাইক যাউক তোমার সনে। তো[illegible] [illegible]আনে
বেশ্যা কহে—মোর সঙ্গ হউক একবার। দ্বিতীয়ে ধরিতে পাইক ল[illegible]
রাত্রিকালে সেই বেশ্যা সুবেশ করিয়া। হরিদাসের বাসা গেলা উল্লাসি[illegible]

তুলসী নমস্করি হরিদাসের দ্বারে যাঞা। গোসাঞিরে নমস্করি রহিলা দাণ্ডাইয়া॥
অঙ্গ উঘাড়িয়া দেখাই বসিলা দুয়ারে। কহিতে লাগিল কিছু সুমধুরস্বরে—॥
ঠাকুর! তুমি পরমসুন্দর প্রথমযৌবন। তোমা দেখি কোন্ নারী ধরিতে পারে মন?॥
তোমার সঙ্গম লাগি লুব্ধ মোর মন। তোমা না পাইলে প্রাণ না যায় ধারণ॥
হরিদাস কহে—তোমা করিব অঙ্গীকার। সংখ্যানামসমাপ্তি যাবৎ না হয় আমার॥
তাবৎ তুমি বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন। নামসমাপ্তি হৈলে করিব যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা। কীর্ত্তন করে হরিদাস, প্রাতঃকাল হৈলা॥
প্রাতঃকাল দেখি বেশ্যা উঠিয়া চলিলা। সব সমাচার যাই খানেরে কহিলা—॥
আজি আমা অঙ্গীকার করিয়াছে বচনে। কালি অবশ্য তার সঙ্গে হইবে সঙ্গমে॥
আরদিন রাত্রি হৈল, বেশ্যা আইলা। হরিদাস তারে বহু আশ্বাস করিলা—॥
কালি দুঃখ পাইলে, অপরাধ না লৈবে মোর। অবশ্য করিব আমি তোমারে অঙ্গীকার॥
তাবৎ ইহাঁ বসি শুন নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম পূর্ণ হৈলে পূর্ণ হবে তোমার মন॥
তুলসীকে তাঁকে বেশ্যা নমস্কার করি। দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরিহরি'॥
রাত্রিশেষ হৈল, বেশ্যা উষিমিষি করে। তার রীত দেখি হরিদাস কহেন তাহারে—॥
কোটিনামগ্রহণ-যজ্ঞ করি একমাসে। এই দীক্ষা করিয়াছি, হৈল আসি শেষে॥
'আজি সমাপ্তি হইবে' হেন জ্ঞান ছিল। সমস্তরাত্রি নিল নাম, সমাপ্তি করিতে নারিল॥
কালি সমাপ্ত হবে, তবে হবে ব্রতভঙ্গ। স্বচ্ছন্দে তোমার সঙ্গে হইবেক সঙ্গ॥
বেশ্যা যাই সমাচার খানেরে কহিলা। আর দিন সন্ধ্যা হৈতে ঠাকুর ঠাঞি আইলা॥
তুলসীকে ঠাকুরকে দণ্ডবৎ করি। দ্বারে বসি নাম শুনে—বোলে 'হরিহরি'॥
'নাম পূর্ণ হবে আজি' বোলে হরিদাস—। তবে পূর্ণ করিব আজি তোমার অভিলাষ॥
কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল। ঠাকুরের সঙ্গে বেশ্যার মন ফিরি গেল॥
দণ্ডবৎ হঞা পড়ে ঠাকুরের চরণে। রামচন্দ্রখানের কথা কৈল নিবেদনে—॥
বেশ্যা হঞা মুঞি পাপ করিয়াছোঁ অপার। কৃপা করি কর মো-অধমের নিস্তার॥
ঠাকুর কহে—খানের কথা সব আমি জানি। অজ্ঞ মূর্খ সেই, তারে দুঃখ নাহি মানি॥
সেইদিন আমি যাইতাঙ এ স্থান ছাড়িয়া। তিনদিন রহিলাঙ তোমা-নিস্তার লাগিয়া॥
বেশ্[illegible]হে—কৃপা করি কর উপদেশ। কি মোর কর্ত্তব্য, যাতে যায় ভবক্লেশ?
ঠাকু[illegible]হে—ঘরের দ্রব্য ব্রাহ্মণে কর দা[illegible] এই ঘরে আসি তুমি করহ বিশ্রাম॥
নিরন্ত[illegible] নাম লও, কর[illegible] অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥
এত [illegible] তারে নাম[illegible] [illegible]ঠিয়া চলিলা ঠাকুর বলি 'হরিহরি'॥
[illegible] নে মন্ধে[illegible] গৃহবৃত্তি যেবা ছিল ব্রাহ্মণেরে দিল॥
[illegible]মার [illegible]ন্ত্রে [illegible]মে। রাত্রিদিন তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করে॥
[illegible] করে চর্ব্বণ উপবাস। ইন্দ্রিয়দমন হৈল প্রেমের প্রকাশ॥
প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্ত। বড়বড় বৈষ্ণব তাঁহার দর্শনেতে যান্ত॥

বেশ্যার চরিত্র দেখি লোকে চমৎকার। হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্রখান অপরাধবীজ রুইল। সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগে ত ফলিল॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুতকথন। প্রস্তাব পাইয়া কহি, শুন ভক্তগণ!॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্রখান। হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুরসমান॥
বৈষ্ণবধর্ম্ম-নিন্দা করে বৈষ্ণব-অপমান। বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দগোসাঞি যবে গৌড়ে আইলা। প্রেম-প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেমপ্রচারণ আর পাষণ্ডদলন। দুইকার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইলা তার ঘরে। আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ-উপরে॥
অনেক লোকজন সঙ্গে,—অঙ্গন ভরিল। ভিতর হৈতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক কহে,—গোসাঞি! মোরে পাঠাইল খান। গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসাস্থান॥
গোয়ালের ঘরে গোহালি সে অত্যন্ত বিস্তার। ইহাঁ সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥
ভিতরে আছিল শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা। অট্টঅট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়। ম্লেচ্ছ গো-বধ করে তার যোগ্য হয়॥
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা। তারে দণ্ড করিতে সেই গ্রামে না রহিলা॥
ইহাঁ রামচন্দ্রখান সেবকে আজ্ঞা দিল। গোসাঞি যাহা বসিলা তাহাঁ মাটি খোদাইল॥
গোময়জলে লেপিল সব মন্দির অঙ্গন। তভু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র—না দেয় রাজকর। ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গামণ্ডপে বাসা কৈল। অবধ্য করি মাংস সে-ঘরে রান্ধাইল॥
স্ত্রী-পুত্র-সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া। তার ঘর গ্রাম লুটে তিনদিন রহিয়া॥
সেইঘরে তিনদিন করে অমেধ্য-রন্ধন। আরদিন সভা লঞা করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল। বহুদিনপর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান যেই গ্রামে দেশে হয়। একজনের দোষে সব দেশ ক্ষয় হয়॥
হরিদাসঠাকুর চলি আইলা চান্দপুরে। আসিয়া রহিলা বলরাম-আচার্য্যের ঘরে॥
হিরণ্য গোবর্দ্ধন দুই—মুলুকের মজুমদার। তাঁর পুরোহিত—বলরাম নাম তাঁর॥
হরিদাসের কৃপাপাত্র—তাতে ভক্তিমানে। যত্ন করি ঠাকুরে রাখিল সেইগ্রামে॥
নির্জ্জনে পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন। বলরামাচার্য্যগৃহে ভিক্ষানির্ব্বাহণ॥
রঘুনাথদাস বালক করে অধ্যয়ন। হরিদাসঠাকুরে যাই করে দরশন॥
হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে। সেই [illegible] তাঁরে চৈতন্য পাইবারে॥
তাহাঁ যৈছে হৈল হরিদাসের মহিমা-কথা [illegible] কথা শুন ভক্তগণ!॥
একদিন বলরাম বিনতি করিয়া। মজুমদার [illegible] ঠাকুর [illegible]
ঠাকুর দেখি দুইভাই কৈল অভ্যুত্থান। পায় [illegible]
অনেক পণ্ডিত সভায় ব্রাহ্মণ সজ্জন। দুইভাই মহাপণ্ডিত হিরণ্য [illegible]
[illegible] গুণ সভে কহে পঞ্চমুখে। শুনিয়া দুই ভাই মনে পাইল ব[illegible]

তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন। নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতের গণ॥
কেহো বোলে নাম—হৈতে হয় পাপক্ষয়। কেহো বোলে—নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয়
হরিদাস কহে—নামের এই দুই ফল নহে। নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজায়ে॥

তথাহি (ভাঃ—১১।২।৪০)—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা, জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

আনুষঙ্গিক ফল নামের—মুক্তি, পাপনাশ। তাহার দৃষ্টান্ত যৈছে সূর্য্যের প্রকাশ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাম্ (১৫)—

অংহঃ সংহরদখিলং, সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধেং, জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

এই শ্লোকের অর্থ কর পণ্ডিতের গণ!! সভে কহে—তুমি কহ অর্থবিবরণ॥
হরিদাস কহে—যৈছে সূর্য্যের উদয়। উদয় না হৈতে আরম্ভে তমের হয় ক্ষয়॥
চৌর-প্রেত-রাক্ষসাদির হয় ভয়-ত্রাস। উদয় হৈলে ধর্ম্মকর্ম্ম-মঙ্গল-প্রকাশ॥
তৈছে নামোদয়ারম্ভে পাপাদির ক্ষয়। উদয় হৈলে কৃষ্ণপদে হয় প্রেমোদয়॥
মুক্তি তুচ্ছফল হয় নামাভাস হৈতে।

তথাহি (ভাঃ—৬।২।৪৯)—

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্। অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥
সেই মুক্তি ভক্ত না লয়, কৃষ্ণ চাহে দিতে॥

তথাহি (ভাঃ—৩।২৯।১৩)—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
গোপালচক্রবর্ত্তী নাম এক ব্রাহ্মণ। মজুমদারের ঘরে সেই আরিন্দা প্রধান॥
গৌড়ে রহে, পাৎশাহা-আগে আরিন্দাগিরী করে। বারলক্ষ মুদ্রা সেই পাৎসার ঠাঞি ভরে॥
পরমসুন্দর পণ্ডিত নূতনযৌবন। 'নামাভাসে মুক্তি' শুনি না হৈল সহন॥
ক্রুদ্ধ হঞা বোলে সেই সরোষ বচন—। ভাবকের সিদ্ধান্ত শুন পণ্ডিতের গণ!॥
কোটিজন্মে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি নয় এই কহে—নামাভাসে সেই মুক্তি হয়॥
হরিদাস কহে—কেনে করহ সংশয়?। শাস্ত্রে কহে—নামাভাসমাত্রে মুক্তি হয়॥
ভক্তি[illegible]-আগে মুক্তি অতিতুচ্ছ হয়। অতএব ভক্তগণ মুক্তি নাহি লয়॥

[illegible] য়ে (১৪। ৩৬)—

[illegible]সাক্ষাৎ[illegible]হ্লাদবি[illegible] [illegible]খানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মণোপি জগদ্গুরো॥
বি[illegible] [illegible] তবে তোমার নাক কাটি, করহ নিশ্চয়॥
হরি[illegible] নামা[illegible] নয়। তবে আমার নাক কাটি, এই সুনিশ্চয়॥
শু[illegible]র লোক করে হাহাকার। মজুমদার সেই বিপ্রে করিল ধিক্কার॥
বলাই [illegible]রোহিত তারে করিল ভৎর্সন—। ঘট-পটিয়া মূর্খ-তুঞি ভক্তি কাঁহা জান॥

হরিদাসঠাকুরের তুঞি কৈলি অপমান। সর্ব্বনাশ হবে তোর—না হবে কল্যাণ ॥
এত শুনি হরিদাস উঠিয়া চলিলা। মজুমদার সেই বিপ্রে ত্যাগ করিলা ॥
সভাসহিত হরিদাসের পড়িলা চরণে। হরিদাস হাসি কহে মধুর বচনে— ॥
তোমা সভার কি দোষ, এই অজ্ঞ ব্রাহ্মণ। তার দোষ নাহি, তার তর্কনিষ্ঠ মন ॥
তর্কের গোচর নহে নামের মহত্ত্ব। কোথা হৈতে জানিবেক সে এইসব তত্ত্ব ? ॥
যাহ ঘর, কৃষ্ণ করুন্ কুশল সভার। আমার সম্বন্ধে যেন দুঃখ না হয় কাহার ॥
তবে সে হিরণ্যদাস নিজঘর আইলা। সেই ত ব্রাহ্মণে নিজদ্বার মানা কৈলা ॥
তিনদিনভিতরে সেইবিপ্রের কুষ্ঠ হৈল। অতি উচ্চ নাসা তার গলিয়া পড়িল ॥
চম্পককলিকাসম হাতপায়ের অঙ্গুলী। কোঁড়ক হইল সব, কুষ্ঠে গেল গলি ॥
দেখিয়া সকল লোকের হৈল চমৎকার। হরিদাস প্রশংসে লোক করি নমস্কার ॥
যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইল। তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইল ॥
ভক্তের স্বভাব—অজ্ঞের দোষ ক্ষমা করে। কৃষ্ণের স্বভাব ভক্তনিন্দা সহিতে না পারে ॥
বিপ্রের কুষ্ঠ শুনি হরিদাস দুঃখী হৈলা। বলাইপুরোহিতে কহি শান্তিপুর আইলা ॥
আচার্য্যে মিলিয়া কৈল দণ্ডবৎ প্রণাম। অদ্বৈত আলিঙ্গন করি করিল সম্মান ॥
গঙ্গাতীরে গোফা করি নির্জ্জনে তাঁরে দিল। ভাগবত-গীতার ভক্তি-অর্থ শুনাইল ॥
আচার্য্যের ঘরে নিত্য ভিক্ষানির্ব্বাহণ। দুইজনা মিলি কৃষ্ণকথা-আস্বাদন ॥
হরিদাস কহে—গোসাঞি! করোঁ নিবেদন। মোরে প্রত্যহ অন্নদেহ কোন্ প্রয়োজন ? ॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীনসমাজ। নীচে আদর কর, না বাসহ ভয় লাজ ? ॥
অলৌকিক আচার তোমার, কহিতে বাসোঁ ভয়। সেই কৃপা করিবে, যাতে মোর রক্ষা হয়
আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়। সেই আচরিব, যেই শাস্ত্র মত হয় ॥
'তুমি খাইলে হয় কোটিব্রাহ্মণভোজন।" এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন ॥
জগত-নিস্তার-লাগি করেন চিন্তন—। অবৈষ্ণব জগৎ কৈছে হইব মোচন ? ॥
কৃষ্ণ অবতারিতে আচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিল। জল-তুলসী দিয়া পূজা করিতে লাগিল ॥
হরিদাস করে গোফায় নামসঙ্কীর্ত্তন। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে—এই তাঁর মন ॥
দুই জনার ভক্ত্যে চৈতন্য কৈল অবতার। নাম-প্রেম প্রচারি কৈল জগত উদ্ধার।
আর এক অলৌকিক চরিত্র তাঁহার। যাহার শ্রবণে লোকে হয় চমৎকার ॥
তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি। বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতী[illegible]
একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া। না[illegible] করিয়া ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, দশ দিশা সুনির্ম্মল। [illegible] ৎস্না করে [illegible]
দুয়ারে তুলসী লেপা পিণ্ডির উপর। গোফা[illegible]
হেনকালে এক নারী অঙ্গনে আইলা। তাঁর অঙ্গ[illegible] পীতব[illegible]
তাঁর অঙ্গগন্ধে দশদিগ আমোদিত। ভূষণধ্বনিতে কর্ণ হয় চমকিত।
আসিয়া তুলসীকে সেই কৈল নমস্কার। তুলসী-পরিক্রমা করি গেলা গোফা[illegible]র ॥

যোড়হাথে হরিদাসের বন্দিল চরণ। দ্বারে বসি কহে কিছু মধুরবচন—॥
জগতের বন্দ্য তুমি রূপগুণবান্। তোমার সঙ্গ লাগি মোর এথাকে প্রয়াণ॥
মোরে অঙ্গীকার কর হইয়া সদয়। দীনে দয়া করে—এই সাধুস্বভাব হয়॥
এত বলি নানাভাব করায় প্রকাশ। যাহার দর্শনে মুনির হয় ধৈর্য্যনাশ॥
নির্ব্বিকার হরিদাস গম্ভীর-আশয়। বলিতে লাগিলা তাঁরে হইয়া সদয়—
সংখ্যানামসঙ্কীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মাঙ্গে। তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তনসমাপ্তি নহে, না করি অন্য কাম। কীর্ত্তনসমাপ্তি হইলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি শুন তুমি নামসঙ্কীর্ত্তন। নাম সমাপ্ত হৈলে করিব তোমার প্রীতি-আচরণ।
এত বলি করেন তেঁহো নামসঙ্কীর্ত্তন। সেই নারী বসি করে নাম শ্রবণ।
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল। প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥
এইমত তিনদিন করে আগমন। নানাভাব দেখায় যাতে ব্রহ্মার হরে মন॥
কৃষ্ণনামাবিষ্টমন সদা হরিদাস। অরণ্যে রোদিত হৈল স্ত্রীভাবের প্রকাশ॥
তৃতীয়দিবসের যদি শেষরাত্রি হৈল। ঠাকুরেরে তবে নারী কহিতে লাগিল—॥
তিনদিন বঞ্চিলা আমা করি আশ্বাসন। রাত্রিদিনে নহে তোমার নামসমাপন॥
হরিদাস ঠাকুর কহে—আমি কি করিব?। নিয়ম করিয়াছি, তাহা কেমনে ছাড়িব?।
তবে নারী কহে তাঁরে করি নমস্কার—। আমি মায়া, করিতে আইলাম পরীক্ষা তোমার
ব্রহ্মাদিজীবেরে আমি সভারে মোহিল। একলা তোমারে আমি মোহিতে নারিল॥
মহাভাগবত তুমি, তোমার দর্শনে। তোমার কীর্ত্তন-কৃষ্ণনাম-শ্রবণে॥
চিত্ত মোর শুদ্ধ হইল, চাহে কৃষ্ণনাম লৈতে। কৃষ্ণনাম উপদেশি কৃপা কর মোতে॥
চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা। সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার। কোটিকল্পে কভো তার নাহিক নিস্তার॥
পূর্ব্বে আমি রামনাম পাঞাছি শিব হৈতে। তোমাসঙ্গে লোভ হৈল কৃষ্ণনাম লৈতে॥
মুক্তিহেতুক 'তারক" হয় রামনাম। কৃষ্ণনাম 'পাবক" হয়ে—করে প্রেমদান॥
কৃ নাম দেহ মোরে, কর মোরে ধন্যা। আমারে ভাসয়ে যৈছে এই প্রেমবন্যা॥
এতবলি বন্দিল হরিদাসের চরণ। হরিদাস কহে—কর কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন।
উপদেশ [illegible] ঞা মায়া চলিলা হঞা প্রীত। এ সব কথাতে কারো না জন্মে প্রতীত।
প্রতীত [illegible]রিতে কহি কারণ ইহার। [illegible] ভক্তর শ্রবণে হয় বিশ্বাস সভার।
চৈতন্যা[illegible] ধরে কৃষ্ণপ্রে[illegible] চলিলা [illegible]য়ে (১৪ [illegible]া-শিব-সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণনাদবি[illegible] নাচে প্রে[illegible] [illegible]রে। [illegible]বৃত্তি যে[illegible]খানি পৌরদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্যে প্রকাশে॥
লক্ষ্মী[illegible] [illegible]। [illegible]দিন [illegible] তবে। নাম-প্রেম আস্বাদয়ে মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অ[illegible] উ[illegible] নামভ[illegible] আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন। অবতরি করে প্রেমরস-আস্বাদন॥
মায়াদ লোক[illegible]ম মাগে, ইথে কি বিস্ময়। সাধুকৃপা নাম বিনে প্রেম নাহি হয়॥
চৈতন্যগোসাঞির লীলার এই ত স্বভাব। ত্রিভুবন নাচে গায় পাঞা প্রেমভাব॥

কৃষ্ণ-আদি আর যত স্থাবর-জঙ্গম। কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন॥
স্বরূপগোঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল। রঘুনাথদাসমুখে যেসব শুনিল॥
সেইসব লীলা লেখি সংক্ষেপ করিয়া। চৈতন্যকৃপায় লেখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা॥
হরিদাসঠাকুরের কৈল মহিমা-কথন। যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণপ্রেম-মাধুরী বর্ণন,—

"কস্তুরীলিপ্ত নীলোৎপল, তার যেই পরিমল, তাহা জিনি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ।
ব্যাপে চৌদ্দ ভুবনে, করে সর্ব্ব-আকর্ষণে, নারীগণের আঁখি করে অন্ধ॥
সখি হে! কৃষ্ণগন্ধ জগত মাতায়।
নারীর নাসায় পৈশে, সর্ব্বকাল তাঁহা বৈসে, কৃষ্ণ-পাশে ধরি লঞা যায়॥ ধ্রু॥
নেত্র নাভি বদন, করযুগ চরণ, এই অষ্ট পদ্ম কৃষ্ণ-অঙ্গে।
কর্পূরলিপ্ত কমল, তার যৈছে পরিমল, সেই গন্ধ অষ্টপদ্ম-সঙ্গে॥
হেমকীলিত চন্দন, তাহা করি ঘর্ষণ, তাহে অগুরু কুঙ্কুম কস্তুরী।
কর্পূরসনে চর্চ্চা অঙ্গে, পূর্ব্ব অঙ্গের গন্ধ সঙ্গে, মিলি ডাকা যেন কৈল চুরি॥
হরে নারীর তনুমন, নাসা করে ঘূর্ণন, খসায় নীবি, ছুটায় কেশবন্ধ।
করি আগে বাউরী, নাচায় জগত-নারী, হেন ডাকাতি কৃষ্ণ-অঙ্গগন্ধ॥
সেই গন্ধের বশ নাসা, সদা করে গন্ধের আশা, কভু পায় কভু নাহি পায়।
পাইলে পিয়া পেট ভরে, 'পিঙো পিঙো' তভু করে, না পাইলে তৃষায় মরি যায়॥
মদনমোহনের নাট, পসারি গন্ধের হাট, জগন্নারী গ্রাহক লোভায়।
বিনিমূল্যে দেয় গন্ধ, গন্ধ দিয়া করে অন্ধ, ঘর যাইতে পথ নাহি পায়॥
এইমত গৌরহরি, গন্ধে কৈল মন চুরি, ভৃঙ্গপ্রায় ইতি-উতি ধায়।
যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, কৃষ্ণ স্ফুরে সেই-আশে, কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায়॥
স্বরূপ রামানন্দ গায়, প্রভু নাচে সুখ পায়, এইমতে প্রাতঃকাল হৈল।
স্বরূপ রামানন্দ গায়, করি নানা উপায়, মহাপ্রভুর বাহ্য স্ফূর্ত্তি কৈল॥
মাতৃভক্তি প্রলপন, ভিত্ত্যে মুখসংঘর্ষণ, কৃষ্ণগন্ধস্ফূর্ত্ত্যে দিব্য নৃত্য।
এই-চারি-লীলাভেদে; গাইল এই [illegible]চ্ছেদে, কৃষ্ণদাস রূপগোসাঞি ভৃত্য॥"

চৈতন্য-চরিতামৃত পাণ্ডিত্য [illegible] শাস্ত্র-[illegible]র ইহাতে সুন্দররূপ মীমাংসিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস, বা কীর্ত্তিবাস বাঙ্গালা-সাহিত্যের শক্তিশালী বিধাতা,—কৃত্তিবাস সাধারণ বাঙ্গালী-পাঠকের মুকুট-মণি; কৃত্তিবাস মহাকবি। ইহাঁর রামায়ণ বঙ্গ-সাহিত্যে অবিনশ্বর।

কৃত্তিবাস মুখুটি ব্রাহ্মণ; নিবাস ফুলিয়া। ফুলিয়া গ্রাম নদীয়া জেলায়। কৃত্তিবাসের প্রপিতামহের নাম নারসিংহ বা নৃসিংহ; উপাধি ওঝা। ওঝা—নবাবদত্ত উপাধি। নারসিংহ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন। আগন্তুক বিপক্ষের উৎপীড়ন-ভয়ে ইনি ব্রাহ্মণ-প্রধান "বঙ্গ"ভূমি পরিত্যাগ করিয়া, গঙ্গাতীরে বাস করিতে ইচ্ছুক হন; ফুলিয়া গ্রামে বাস নির্দ্দেশ করেন। ফুলিয়া তখন সমৃদ্ধ স্থান,—"গ্রামরত্ন' বলিয়া প্রসিদ্ধ; তখন ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়া সুরধুনী প্রবাহিত হইত।

নারসিংহের চারি পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র,—মুরারি; মুরারি সুপণ্ডিত, সুন্দরকান্তি; সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলনে রত। ইহাঁর সাত পুত্র। বনমালী এই সাত পুত্রের অন্যতম। বনমালীর ছয় পুত্র; এক কন্যা; এই বনমালী কৃত্তিবাসের [illegible]তা, কৃত্তিবাসের মাতার নাম মালিনী। ১২৩০ শকে রবিবার শুক্ল পঞ্চমীর দিন,—বাণীপূজার শুভ মুহূর্ত্তে;—বাণীপুত্র কৃত্তিবাস ভূমিষ্ঠ হন [illegible]

দ্বাদশ [illegible]সে [illegible] [illegible]পক্ষে শিক্ষারম্ভ। যশোহরের কোন [illegible] [illegible]পকের নিকট ইহাঁর বিদ্যাশিক্ষা। গুরুভক্ত [illegible] গুরুর নিকট বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিক্ষান্তে গুরুদেবের [illegible] আশীর্ব্বাদ পাইয়া—গুরুদেবের মেলানী লইয়া,—ইনি

গুরুগৃহ হইতে বিদায় লন। পণ্ডিত বলিয়া এই সময়ে কৃত্তিবাসের প্রসিদ্ধি বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

কৃত্তিবাসের আবাল্যকামনা,—"তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইবেন,—তাহার সুনাম-সৌরভ সুচিরস্থায়ী হইবে।' শিক্ষাসমাপ্তির পর তাঁহার এ কামনা একান্ত বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি গৌড়ের রাজপণ্ডিত হইবার অভিলাষে অবিলম্বে গৌড় যাত্রা করিলেন।

রাজা কংসনারায়ণ তখন গৌড়েশ্বর। কৃত্তিবাস পণ্ডিত রাজপ্রাসাদের দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন, দ্বাররক্ষকের দ্বারা স্বরচিত পাঁচটী শ্লোক গৌড়েশ্বরের নিকট প্রেরণ করিলেন। গৌড়েশ্বর এই শ্লোক পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কৃত্তিবাসকে তিনি রাজদরবারে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। রাজদরবারে যাইয়া কৃত্তিবাস রাজার নিকট আরও সাতটী শ্লোক পাঠ করিলেন। সভায় তাঁহার পাণ্ডিত্যের ভূয়সী প্রশংসা হইল। রাজাদেশে রাজকর্ম্মচারী তাঁহার শিরে চন্দনের ছড়া ছিটাইলেন। রাজা তাঁহাকে পট্টবস্ত্র পুরস্কার করিলেন। শুধু ইহাই নহে,—কৃত্তিবাসে অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং কবিত্বের একত্র সমাবেশ দেখিয়া, গৌড়পতি তাঁহার উপর ভাষা-কাব্যে রামায়ণ-রচনার ভার দিলেন। কৃত্তিবাস রাজাদেশ প্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; রামায়ণ-রচনায় মনোযোগী হইলেন। ১২৬০ শকে তিনি রামায়ণ রচনা আরম্ভ করিলেন।

বহু অনুসন্ধানেও তাঁহার তিরোধানের তারিখ প্রাপ্ত হই নাই। তবে তিনি দীর্ঘায়ু পুরুষ ছিলেন, ইহাই অনুমান।

কৃত্তিবাস কথকতা শুনিয়া রামায়ণ রচনা করিয়াছেন,—এ প্রবাদ একান্ত ভিত্তিহীন। কৃত্তিবাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত,—অ[illegible] কথকতা শুনিলেই যে, তাঁহাকে সংস্কৃত ভ[illegible]ইতে হইবে, ইহা কোন্ ন্যায়ানুমোদিত! একে সংস্কৃত [illegible] পণ্ডি[illegible]হার উপর কথকতার মুখে পুরাণ-শ্রবণ, ইহাতে [illegible]কনের [illegible] হইয়াছিল বলিতে হইবে। অপরন্তু, কৃত্তিবাস কেবলমাত্র [illegible] রামায়ণ অনুবাদ করেন নাই; তাঁহার আদর্শ,—অদ্ভুত রামায়[illegible] [illegible]দ্মপুরাণীয়

রামায়ণ এবং বাল্মীকির রামায়ণ প্রভৃতি। একথা তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশ। তবে প্রসঙ্গবিশেষে তিনি বাল্মীকির রামায়ণের যথাযথ অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। রাবণবধ-বর্ণনে,—ব্রহ্মাকর্তৃক রাবণকে অমরবর দানপ্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,—

"পুরাণ অনেক মত কে পারে কহিতে।
বিস্তারিয়া কহি শুন বাল্মীকির মতে॥"

আবার অন্যত্র,—গন্ধমাদন হইতে হনুমানের ঔষধ আনয়নপ্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন,—

"নাহিক এসব কথা বাল্মীকি-রচনে।
বিস্তারিত লিখিত অদ্ভুত-রামায়ণে॥"

মহীরাবণ বধ, অহিরাবণবধ, মুমূর্ষু রাবণের মুখে রাজনীতির কথা, সমুদ্র কর্তৃক সেতুভঙ্গ ইত্যাদি উপাখ্যান, বাল্মীকির রামায়ণে নাই; এই সকল স্থলে কৃত্তিবাস পুরাণান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন,—অথবা কথকতার আরোপিত আখ্যানে নির্ভর করিয়াছেন,—ইহাই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।

কৃত্তিবাস,—পাঁচ ফুলে সাজি সাজাইয়াছেন। বস্তুতই তিনি সুনিপুণ মালাকর। লোক-চরিত্রবর্ণনে তিনি সিদ্ধহস্ত। এই রামায়ণ পাঠ করিয়াই, এদেশের অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকেও ধর্ম্মসূত্র এবং নীতিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। বটতলায় যে "কৃত্তিবাসী" রামায়ণ বিক্রীত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নহে,—জয়গোপালী রামায়ণ। ষাট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামক একজন সাহিত্যাধ্যাপক ছিলেন। তিনিই মূল রামায়ণকে কাটিয়া ছাটিয়া বিবর্ণ বদলাইয়া [illegible] গড়িয়া লন,—প্রধানতঃ এই রামায়ণই [illegible] বাজারে। [illegible] তপক্ষে শিক্ষহস্তলিখিত পুঁথি দৃষ্টে রামায়ণ প্রথম মু[illegible]পকের নিক[illegible]লী জেলার অধীন শ্রীরামপুরের মিশনরী[illegible]র নিকট এ রামায়ণ[illegible] এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। এই শ্রীরামপুরে মুদ্রিত রামায়ণের [illegible] নমুনা দেখুন,—

"ইন্দ্রজিত পতনে মন্দোদরীর আক্ষেপ।

অনেক উপহারে, পুজিলাম মহেশ্বরে, তোমাপুত্র পাইনু যে কারণে।
জন্মিয়ামাত্র সিংহনাদ, ত্রিভুবনে বিসম্বাদ, হেন পুত্র মারিল লক্ষ্মণে॥
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ, কি করিবে ছত্র নব দণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ, বীরভাগ আছে যত, তোমাবিনে সব লণ্ড ভণ্ড॥
ভূমিতলে লোটাইয়া, পুত্রশোক বিনাইয়া, ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হা হা পুত্র মেঘনাদ, কার এত পরমাদ, আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী॥
শচীর সহিত ইন্দ্র, সুখে আজি যাউক নিদ্র, স্বচ্ছন্দে ভজুক দিনপতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরসিত পুরন্দর, লঙ্কার যে দেখিয়া দুর্গতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ, জিনিলে যে ত্রিভুবন, তব ডরে কেহ নহে স্থির।
চণ্ডাল যে বিভীষণে, শত্রু আনে মত্তস্থানে, তেঁই সে বধিল লক্ষ্মণ বীর॥
লক্ষ্মীস্বরূপা নারী, শ্রীরামের সুন্দরী, হরিয়া আনিল তোর বাপে।
সতী পতিব্রতা সার, ব্যর্থ নহে বাণী, লঙ্কা মজিল তার শাপে॥
যখন পুত্র যুদ্ধ করে, দেবগণ কাঁপে ডরে, দেবগণ না যায় সেখানে।
হেন পুত্র মরে যার, সকল অসার তার, হা পুত্র কি মোর জীবনে॥
শ্রীরাম রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি, রাক্ষসকুল করিতে বিনাশ।
নররূপ সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি, না চাড়ি রচিল কৃত্তিবাস॥"

বিভিন্ন সময়ের বটতলার পুঁথিতেও সামঞ্জস্য নাই,—দৃষ্টান্ত দেখুন ;—

অরণ্যকাণ্ডে—সীতার অদর্শনে রামের বিলাপ।

বটতলার ১৩০০ সালের রামায়ণ ;—

"হাতে ধনুর্ব্বাণ রাম আইসেন ঘরে। পথে অমঙ্গল রাম দেখেন সত্বরে॥
বামে সর্প দেখিলেন শৃগাল দক্ষিণে। তোলা পাড়া শ্রীরাম করেন কত মনে॥
বিপরীত ধ্বনি করিলেন নিশাচর। লক্ষ্মণ আইসে পাছে শূন্য রাখি ঘর॥
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষ্মণ ভুলিবে। সীতারে রাখিয়া একা অন্যত্র যাইবে॥
দুঃখের উপরে দুঃখ দিবে কি বিধাতা। যে ছিল কপালে তাহা দিলো বিমাতা॥
বলেন শ্রীরাম শুন সকল দেবতা। আজিকার দিন মম রক্ষা কর সীতা॥
যেমন চিন্তেন রাম ঘটিল তেমন। [illegible] পথে সম্মুখে লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণেরে দেখিয়া বিস্ময় মনে মানি। [illegible] সা করেন রঘুমণি॥
কেন ভাই আসিতেছ তুমি যে একাকী। [illegible] রাখি।
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী। [illegible] হরিরাছে [illegible]"

বটতলার ১২৫৭ সালের রামায়ণ ;—

"ওখানেতে রামচন্দ্র মৃগ লয়ে হাতে। অতি ব্যস্ত ত্রস্তে চলিলেন [illegible] তে॥

"দেখিলেন সম্মুখেতে পেচক করে রব। শিবে সনে শব টানে কান্দে অসম্ভব॥
উল্কাপাত বিনি মেঘে রক্ত বৃষ্টি হয়। কত শত অমঙ্গল না হয় নির্ণয়॥
বাম চক্ষু স্পন্দন করে পদ কম্পে ঘন। অমঙ্গল দেখে ত্রাস কমললোচন॥
হেনকালে সম্মুখেতে দেখিলা লক্ষ্মণে। দ্বিগুণ চিন্তিত রাম হইলেন মনে।
কহ রে প্রাণের ভাই লক্ষ্মণ আমারে। কি বুঝিয়া শূন্যঘরে রাখিয়া সীতারে॥
জানি পুন আগমন কৈলে কি কারণ। দেখে শুনে মন প্রাণ হলো উচাটন॥
লক্ষ্মণ বলেন দাদা বলিয়ে এখন। উচ্চৈঃস্বরে তুমি রব করিলে যখন।
শুনিয়া চিন্তিত হৈল জনকনন্দিনী। আমারে আসিতে আজ্ঞা করিলেন আপনি॥
রাম বলেন শীঘ্র চল প্রাণের লক্ষ্মণ। বুঝি কোন বিপদ ঘটিল এতক্ষণ।"

প্রাচীন পুঁথির সহিত বটতলার রামায়ণের পার্থক্য কিরূপ,—নিম্নোদ্ধৃত অংশেই তাহার পরিচয়,—

বটতলার রামায়ণ,—

"বামা জাতি স্বভাবতঃ বামা বুদ্ধি ধরে। তার বাক্যে কে কোথা গিয়াছে দেশান্তরে।
শ্রীরাম বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত। না বুঝিয়া কেন বল এ নহে উচিত॥
মিথ্যা অনুযোগ কেন কর বিমাতায়। বনে আইলাম আমি পিতার আজ্ঞায়॥
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল। বলহ ভরত আগে পিতার কুশল॥
বশিষ্ঠ কহেন রাম না কহিলে নয়। স্বর্গবাসে গিয়াছেন পিতা মহাশয়॥
শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়। ভরতের প্রতি রাম কি অনুজ্ঞা হয়॥
শ্রীরাম বলেন মুনি হইলাম সুখী। প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
যাও ভাই ভরত ত্বরিত অযোধ্যায়। মন্ত্রিগণ লয়ে রাজ্য করহ তথায়॥
সিংহাসন শূন্য আছে ভয় করি মনে। কোন শত্রু আপদ ঘটাবে কোন ক্ষণে॥"

৯০ বৎসরের পুঁথি;—

"আমি দুষ্ট চণ্ডাল হইলাম মায়ের দোষে। এখন বাহুড়িয়া গোসাঞি চল নিজ দেশে॥
রাম বলে ভরত তুমি বিচারে পণ্ডিত। বিমাতার দোষ নাই মোর কপালের লিখিত॥
বিমাতার ভরে [illegible]ষ দেহ অকারণ। বনবাস করিব আমার কপাল লিখন॥
ঝাট বাপের ক[illegible] তুমি করোহ কুশল। রাজ্যশূন্য [illegible]রিয়া আসিলে বাপ একেশ্বর রইল॥
বশিষ্ঠ কহেন [illegible]ম কহিতে বাসি [illegible] গেলা বুড়া রাজা মহাশয়॥
বশিষ্ঠ বলেন [illegible] শুন মহাতপস্বে শিক্ষাত্র এখন কোন্ যুক্তি হয়॥
রাম বলেন [illegible] প্রাপকের নিকট[illegible] প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
ভরত লইর নিকট [illegible]রা সই[illegible] যাবৎ নাহি হয় রাজ্যের অমঙ্গল॥
রাজ্য শূন্য [illegible] [illegible]রা আসিয়াছ সব পুরী। ভাঙ্গিল বাপের রাজ্য অযোধ্যা নগরী॥"

গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত রামায়ণের সহিত বটতলার রামায়ণের পার্থক্য কিরূপ, দেখুন ;—

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি শরাহত বালির বাক্য।

বটতলার রামায়ণ ;—

"রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান। আমারে মারিলে রাম এ কোন্ বিধান॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম গোধিকা শল্লকী। ভক্ষণীয় জন্তু পঞ্চ এই পঞ্চনখী॥
তার মধ্যে কেহ নহি শুন রঘুবীর। আমার শোণিত মাংস ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে নাহি হইবে আসন। মৃগ নহি,—শাখা-মৃগে কোন্ প্রয়োজন॥
নির্দ্দোষী বানর আমি আর কোন কার্য্যে। এই হেতু অধিকার না পাইল রাজ্যে॥
কোন্ দেশ লুটাইয়া দিলাম কারে ক্লেশ। কোন্ দোষে করিলে আমার আয়ুঃশেষ॥
আর বংশে জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে। ধার্ম্মিক বলিয়া সবে তোমারে প্রশংসে॥"

গুপ্তপ্রেসের রামায়ণ ;—

"রাজকুলে জন্মিয়া রাম ধর্ম্ম নাই শিক্ষি। পঞ্চনখীর ভিতর আমি নহি পঞ্চনখী॥
শশারু গণ্ডার কূর্ম্ম আর শল্লকী গোধা। এই পঞ্চনখী মারিতে কিছু নাহি বাধা॥
নর বানর আর কিন্নর কুম্ভীর। এই পঞ্চ নখী রাম ভক্ষ্যের বাহির॥
আমার চর্ম্মেতে তুমি না করিবে বৈসন। আমার মাংস তুমি না করিবে ভক্ষণ॥
নির্দ্দোষ বানর আমি মারিলে কোন্ কার্য্যে। তুমি হেন রাজা হইলে সুখ নাই রাজ্যে॥
কোন্ দেশ লুটিলাম পোড়াইলাম কোন্ দেশ। কোন্‌দোষে করিলে তুমি মোর পরমায়ুঃ শেষ
আর বংশ জন্ম নহে জন্ম রঘুবংশে। ধার্ম্মিক রাম তোমার সর্ব্বলোকে ঘোষে॥"।

বটতলার রামায়ণে কবিত্ব কিরূপ মধুর,—বর্ণনা কিরূপ প্রাঞ্জল,—তাহার একটু পরিচয় দিতেছি,—

সীতার রূপবর্ণন-প্রসঙ্গে ;—

"অদ্ভুত সীতার রূপ গুণ মনে মানি। এ সামান্য কন্যা নহে,—কমলা আপনি॥
কন্যারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে। উম ... কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে॥
হরিণীনয়নে কিবা শোভিত কজ্জল। ... নাসিকা উজ্জ্বল॥
সুললিত দুই বাহু দেখিতে সুন্দর। সুধাংশু ... মনোহর॥
মুষ্টিতে ধরিতে পারি সীতার কাঁকালি। হিঙ্গুলে ...॥
অরুণ বরণ তাঁর চরণকমল। তাহাতে নূপুর বাজে শুনিতে কোমল॥
রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন। অমৃত জিনিয়া তাঁর মধুর বচন॥
দশদিক আলো করে জানকীর রূপে। লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকূপে॥

রাম-শোকে অযোধ্যা ;—

"গেলেন শোকার্ত্ত রাজা কৌশল্যার ঘর। দোহাঁর হইল শোক একই সোসর ॥
রাত্রি দিন নাহি ঘুচে দোঁহার ক্রন্দন। এক শোকে কাতর হলেন দুই জন ॥
মুনি বেদ ছাড়িলেন যোগী ছাড়ে যোগ। পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ:
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস। প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস ॥
যামিনীতে কামিনী না যায় পতিপাশ। সংসার হইল শূন্য সকলি নিরাশ ॥"

কৃত্তিবাসের প্রাঞ্জল উপমার কিঞ্চিৎ পরিচয় ;—

"নির্ম্মল কোমল অঙ্গ যেন যুথীফুল।" "তপস্যা ধরিয়া মূর্ত্তি করেন তপস্যা ॥"

"কাঁপের জানকী যেন কলার বাগুরি।"

"নীলবর্ণ রাবণ সে পীত-বস্ত্রধারী।
নব জলধরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারী ॥"

"চারিভিতে দেবকন্যা মধ্যেতে রাবণ।
আকাশের চান্দ বেড়ি যেন তারাগণ ॥"

"শোভে এক ঠাই সব রমণীর গলা। একসূত্রেগাঁথা যেন পারিজাত মালা ॥"
"চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি। নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধ্বনি ॥"

আরও শুনুন,—

"স্ত্রী পুত্র সকলি মিথ্যা কেহ কারো নয়। পথিকে পথিকে যেন পথে পরিচয় ॥"
"সংসার অসার ভাই! কপটের মেলা। সূতা সঞ্চারিয়া যেন নাচায় পুতুলা।"

কৃত্তিবাসী রামায়ণের বহু "শ্লোক" প্রবচন স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রামায়ণের "অঙ্গদ-রায়বার" কৃত্তিবাসের পরিহাস-পটুতার প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে পয়ার ছন্দই সমধিক। ত্রিপদী, মালঝাঁপ প্রভৃতি অন্য ছন্দও অপ্রচুর নহে। মালঝাঁপ ছন্দে কৃত্তিবাসের রচনা কেমন মধুর দেখুন ;—

হনূমানের লঙ্কায় যাত্রা।

[illegible] ঝাঁপ।

নব [illegible] বায়ুপু[illegible] শিক্ষারম্ভ এখন [illegible]। তবে করি লীলা বাড়াইলা আপন আকারে
[illegible] প্রণামে [illegible] নিকট [illegible] বিস্তার। আর মণ্ডল সুদীঘল দ্বিগুণ তাহার ॥
[illegible] বি[illegible] যাবৎ [illegible] হেন জ্ঞান। যেন সেই গিরি শিরোপরি আন গিরি মান ॥
[illegible] এরা আ[illegible] বিরোচন সম প্রকাশয়। কিবা নাসারব শুনি সব নির্ঘাত মানয় ॥
দিবা[illegible] দীর্ঘপুচ্ছশিরোপরি দোলে। যেন মেরুগিরি শৃঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে

সেই কপিবর কলেবর ভরে সে ভূধর। নাহি সহিবারে বারে বারে করি থর থর॥
তাহে তরুগণ আন্দোলন করে ঘনে ঘন। তাহে পুষ্প ঝরে বুঝি বীরে কররে বর্ষণ॥
আর কত বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ উপাড়ি পড়য়ে। তাহে নানাপাখীছাড়ি শিখী আকাশে উড়য়ে
তাহে কত শৃঙ্গ পাই ভঙ্গভূতলে পড়িলা। তার কত দুষ্ট পশু নষ্ট কষ্টেতে হইলা॥
তাহে পায়ে ভীতি কত হাতী কাতর হইয়া। করে পলায়ন ছাড়ি বন চীৎকার করিয়া
আর কত করী প্রাণে মরি উচ্চ হতে পড়ে। তাহে হল হত পশু কত যে ছিল গিরিচে।
ইথে হল এক পরতেক মহৎ আশ্চর্য্য। কিবা করিহানে হল প্রাণে শূন্য সিংহবর্য্য॥
কিবা জগৎপ্রাণ সুসন্তান কলেবর ভরে। সহিবারে নারি সে শিখরী চড় চড় করে॥
তাহে পাই তাপযত সাপ বিবরে আছিল। তারা পাইত্র স মহাখাস ছাড়িতে লাগিল
তবে মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি। করি মহাদন্ত দিলা লক্ষ শ্রীরাম ফুকরি॥
সেই মহারব লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল। যেন কল্পকালে কুতূহলে জলদ গর্জ্জিল॥
সেই শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল। হল অচেতন কত জন ভয়েতে বিকল॥
তাহে কপিগণ ঘনে ঘন জয়ধ্বনি করে। দুই শব্দে মিলি গেলা চলি দশ দিগন্তরে॥
সেই মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি। তার উপমান মরুত্থান পবনেরে লেখি॥
সেই বেগে বৃক্ষ লক্ষ লক্ষ না পারি সহিতে। তারা বীর বায় পাছে যায় ব্যোম উপরিতে॥
মনে এই লিখি তারা দেখি প্রবাসীতাহার। যেন বন্ধুজন দুঃখী মন অনুব্রজি যায়॥
আর কত হাতী শৃঙ্গ তথি উড়িয়া চলিল। তারা কতদূরে গিয়া পরে জলেতে পড়িল॥
তবে বিনা লক্ষে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিলা। করি নিরীক্ষণ সব জন স্তম্ভিত হইলা॥
কিবা শোভা পায় কপি আকাশ উপরে। যেন মেরুগিরি পক্ষ ধরি উড়য়ে অম্বরে।
তার বাহুদ্বয় প্রকাশয় সঘনে দোলয়। যেন নাগরাজ গিরিরাজ উপরি শোভয়॥
তার উর্দ্ধদেশে কিবা ভাসে পুচ্ছ উচ্চতর। যেন ভাদ্রমাসে সুপ্রকাশে ইন্দ্রধ্বজবর।
তার অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে বয়। যার শুনি রব লোক সব নির্ঘাত মানয়॥
সেই বেগবান মরুত্থান লাগয়ে যাহারে। সেই কোনমতে স্বস্থানেতে স্থির হতে নারে॥
সেই সমীরণ বেগে ঘন আকর্ষিত। তার পাছে পাছে কাছে কাছে চলিত ত্বরিত॥
আর বহুতর ধরাধর সাগরে পড়িল। কত ব্যোমচারী সিন্ধুবারি মাঝারে ডুবিল॥
আর সিন্ধুজল কলকল করে অতিশয়। সেই উত্তরিল জল স্থল অবধি কাঁপয়॥
তাহে সমকর জলচর যাবৎ আছিল। তারা পাই ভয় অতিশয় দূরে পলাইল॥
তবে ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবননন্দন। হলে প্রথমেতে তারা মাতে মুকুট তপন॥
পরে সে তরণি কণ্ঠমণি সমান শোভিলা। শেষে দুই পদে কোকনদ ভূষণ হইলা॥
হেন মারুতির মহাবীরপণা নিরীক্ষণে। পাই মহা [illegible] করে দেবগণে॥
তবে এইমতে আকাশেতে চলিল বানর। কিবা [illegible] মনু [illegible]

কৃত্তিবাস রামায়ণ সপ্ত কাণ্ডে সম্পূর্ণ; বিশ[illegible] [illegible]
রামায়ণের যেরূপ রূপান্তর করিয়াছেন, অনেকের বিশ্বাস, [illegible]

দেহান্তরও তিনি করিয়াছেন। জয়গোপালের হাতে পড়িয়া, মূল রামায়ণ যে খর্ব্বদেহ হইয়াছে,—মূল রামায়ণের যে স্থানবিশেষ তিনি বর্জ্জিত করিয়াছেন,—ইহা অনুমান করিবার প্রচুর কারণ বিদ্যমান। কৃত্তিবাসের মূল রামায়ণ যিনি সংরক্ষা করিতে পারিবেন, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমর কীর্ত্তিলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

রামায়ণের বিশুদ্ধি-সম্পাদনে ইদানীং সবিশেষ চেষ্টাও হইতেছে। পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ পক্ষে সবিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। এ বিষয়ে ভূতপূর্ব্ব সাধারণী ও নবজীবনের সুবিখ্যাত সম্পাদক সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়—কলিকাতার 'সাহিত্য পরিষৎ এবং গুপ্তপ্রেসের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ প্রভৃতির উদ্যোগশীলতাও একান্ত প্রশংসার্হ।

কৃত্তিবাস,—যোগাদ্যার বন্দনা এবং শিবরামের যুদ্ধ নামক আরও খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মাধবাচার্য্য।

'দুর্গা মাহাত্ম্য"—ইঁহার গ্রন্থ। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে বা ১৫০১ শকে এই গ্রন্থ রচিত। এই গ্রন্থে কবিকঙ্কণ চণ্ডীর ন্যায় ধনপতি সদাগর ও শ্রীমন্তের উপন্যাস লিখিত আছে। কিন্তু কাব্যাংশে ইহা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর সমতুল্য নহে। ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। যথা,—

"পঞ্চ গৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি। কলিযুগে রাম তুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গা দেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর্য্য। [illegible]বজ্র জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি [illegible] তরুবর। আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
[illegible] তনুজ [illegible] পকে আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মহাত্ম্য॥
গুরুর [illegible] বিবিধ [illegible]ায়ে গান। তার দোষ ক্ষমা কর—কর অবধান॥
[illegible] দোষ [illegible] না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার।
[illegible] বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় শারদা-চরিত।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম।



দরিদ্র কবি মুকুন্দরামের রত্ন-জড়িত রচনা,—তাঁহার চমৎকার কাব্য,—"চণ্ডী।" এক সময়ে এই "চণ্ডীগান" মন্দিরা-সংযোগে গ্রামে গ্রামে সুস্বর-লহরে সংগীত হইত। কি মানব-চরিত্র-অঙ্কণে, কি বাহ্য জগদ্ব্যাপার-বর্ণনে, কি করুণ রসের উদ্দীপনে,—মুকুন্দরাম সর্ব্ব বিষয়েই চণ্ডী কাব্যে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা,—বন-ফুল-বিভূষিতা বীণা-ধরা বনদেবীর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাময়ী। অপরন্তু, কবিকঙ্কণ চণ্ডী,—প্রাচীন সমাজের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আলেখ্য।

বর্দ্ধমান জেলায় রায়না থানার অধীন, রত্নাম্বু-তরঙ্গিনীর তীরবর্ত্তী দামুন্যা গ্রামে মুকুন্দরামের জন্ম। বর্ত্তমান কালে ঐ দামুন্যার নিকটে যে একটী ক্ষুদ্র খাল প্রবাহিত আছে, সকল সময়ে উহাতে জল থাকে না। দামুদরের উহা শাখা, বোধ হয় পূর্ব্বকালে উহার নাম রত্নানুতরঙ্গিনী ছিল। এই গ্রামে মুকুন্দরামের সাত পুরুষের বসতি। সম্ভবতঃ ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ইহাঁর পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র,—পিতার নাম হৃদয় মিশ্র; মাতার নাম দৈবকী। মিশ্র ইহাঁদের নবাব-দত্ত উপাধি; ইহাঁরা চক্রবর্ত্তী, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ,—কোয়ারি গাঁঞি। কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে,—কবিকঙ্কণের দুই পুত্র,—শিবরাম ও মহেশ; দুই কন্যা, চিত্ররেখা ও যশোদা। অন্যত্র দেখিতেছি, পুত্রের নাম শিবরাম; পুত্রবধূর নাম চিত্ররেখা; কন্যার নাম যশোদা; জামাতার নাম মহেশ। মুকুন্দরাম,—পারসী এবং সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

মামুদ সরিপ নামক এক মুসলমান ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া, মুকুন্দরাম সপরিবারে জন্মভূমি দামুন্যা পরিত্যাগ করেন; এই অকিঞ্চন মুকুন্দরামকে অর্থাভাবে পথে বড়ই কষ্ট ভোগ করি[illegible]

"তৈল বিনা কৈলু স্নান, করিনু উদক পান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে।

আশ্রম পুখুরি আড়া,—

পথে এমনই অসীম কষ্ট ভোগ করিয়া, তিনি জমিদার বাঁকুড়া

সমীপে উপস্থিত হইলেন। বাঁকুড়া রায় আড়রা গ্রামের জমিদার। আড়রা গ্রাম মেদিনীপুর জেলায় বর্ত্তমান ঘাটাল থানার অধীন।

জমিদার বাঁকুড়া রায় শাস্ত্রনিষ্ঠ সদাচার ব্রাহ্মণ। মুকুন্দরাম স্বরচিত কয়েকটী শ্লোকে বাঁকুড়া রায়ের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। মুকুন্দরামের কবিত্বে তিনি বড়ই প্রীত হইলেন। তখন বাঁকুড়া রায়—কবিকঙ্কণকে "পাঁচ আড়া মাপি দিলা ধান।"

অপিচ,—

"সুধন্ত বাঁকুড়া রায়, ভাঙ্গিল সকল দায়, শিশু পাছে কৈল নিয়োজিত।
তার সুত রঘুনাথ, রাজগুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত॥"

অর্থাৎ, বাঁকুড়া রায়,—মুকুন্দরামকে,—স্বীয় সুত রঘুনাথের শিক্ষা-গুরু পদে নিযুক্ত করিলেন। দরিদ্র মুকুন্দরামের অন্ন চিন্তা দূর হইল।

দামুন্যা গ্রাম হইতে আড়রা আসিবার পথে কুচুটে গ্রাম। কবি যখন এই কুচুটে গ্রামে উপনীত, তখন কবির প্রতি,—

"দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ ছায়া, আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত॥"

দেবীর এই আদেশানুসারে, পরন্তু জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আজ্ঞায়,——মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরলোকগত রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয় বলেন,—"১৪৯৫ শকে মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্যের রচনা আরম্ভ করেন, ১৫২৫শকে শেষ করেন।" অর্থাৎ চণ্ডী রচনায় তাঁহার ত্রিশ বৎসর সময় লাগে। শ্রীযুক্ত দীনেশ বাবু বলেন,—"চণ্ডীরপ্রত্যাদেশের ১১।১২ বৎসর পরে,—মুকুন্দরাম চণ্ডী কাব্যের রচনা সমাপ্ত করেন।

সম্ভবতঃ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে কবিকঙ্কণ দামুন্যা পরিত্যাগ করিয়া আরড়ায় পলায়ন করেন এবং তাহারই দুই চারি বৎসর মধ্যে চণ্ডী কাব্য রচন সম্পূর্ণ করেন।

কবিকঙ্কণের বংশধরগণ এক্ষণে বর্দ্ধমান জেলার ছোট বৈন্যান গ্রামে বাস করিতেছেন। বাঁকুড়া রায়ের বংশীয়দের বর্ত্তমান বাস সেনাপতি গ্রা[illegible] সেনাপতি গ্রামে—ইহাদের বাটীতে মুকুন্দরামের স্বহস্ত-লিখিত [illegible]ণ্ডী পুঁথি প্রত্যহ ফুল চন্দনে পূজিত হইয়া থাকে। এই পুঁ[illegible]ত বটতলা প্রচলিত চণ্ডী পুঁথির স্থানে স্থানে বিস্তর প্রভেদ। যথ[illegible]লার পুঁথিতে,—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণু, পাদাম্বুজ-তুল্য গৌড়-বঙ্গ-উৎকল অধীপ ; সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, ডিহিদার মামুদ সরিপ।" সেনাপতি গ্রামের পুঁথিতে,—

"ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপাদাম্বুজে ভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ উৎকল সমীপে। অধর্ম্মী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মহম্মদ সরিফে।"

ফুল্লরা,—কালকেতু,—ভাঁড়ুদত্ত,—লহনা,—খুল্লনা,—শ্রীমন্ত,—চণ্ডী-কাব্যের বিচিত্র চরিত্র-সৃষ্টি। বর্ণনা সর্ব্বত্রই স্বাভাবিক এবং প্রাঞ্জল। দারিদ্র্যের করুণ রস, দরিদ্র কবির কাব্যে আদ্যোপান্ত প্রবাহিত। কবির বহুদর্শিতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি একান্ত প্রশংসনীয়।

নদীয়া-দামুরহুদা হইতে যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় কবিকঙ্কণ চণ্ডীর এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহা কলিকাতা-খোড়োপোস্তা সাহস যন্ত্রে ১৯১৮ সম্বতের শ্রাবণ মাসে মুদ্রিত। এই গ্রন্থের ভূমিকার একাংশ এইরূপ—

"প্রকৃত কবিত্ব বিষয়ে কবিকঙ্কণের সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবেক। আদৌ প্রকৃত কবির লক্ষণ, কল্পনা এবং বিভাবনা রসের প্রাচুর্য্য, ভারত চন্দ্রের প্রায় তাহা ছিল না। তাঁহার অন্নদামঙ্গল চণ্ডীর অনুকৃতি মাত্র ;—* * কবিকঙ্কণের রচনায় যেরূপ বিভাবনার প্রচুরতা, তদ্রূপ ভারতচন্দ্রের দেখা যায় না। নিসর্গ-বর্ণনে মুকুন্দরামের অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। তিনি আপন সাময়িক আবার ব্যবহারের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, বোধ হয়, তদ্রূপ বর্ণন-কৌশলে স্বল্প কবি ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দরিদ্র দশা বিবৃত করণে তিনি অসাধরণ ক্ষমতা রাখিতেন।"

গ্রন্থের "দিগবন্দনায়" বহু স্থানের দেব-দেবতার বন্দনা দেখিতে পাই। যথা,—বোড়গ্রামের, বলরাম কোয়াগ্রির কামেশ্বর, চন্দ্রকোণার মল্লেশ্বর, গোড়ানের তাটেশ্বর-গোটেশ্বর ; পলাশনের অগ্নিমুখ হর ; নাড়িচার সর্ব্বমঙ্গলা, মুণ্ডখোপের মন্তেশ্বরী, চয়ড়ার জয়চণ্ডী ; [illegible] বাণেশ্বর, মৌলার রঙ্কিণী , ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, তমলুকের বা[illegible] আমতার মেলাই, বিক্রমপুরের বাশুলী, রাজবোলহাটের নীল[illegible]াপুরের

বারাহী, বালিগড়ের ভগবতী; বৈদ্যপুরের ভগিনী; পাড়ামুয়ার কামারবুড়ী; দশঘরার বিশালাক্ষী; রামনগরের ভবানী এবং রাণীহাটের ভগবতী প্রভৃতি। এইবার চণ্ডী কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। হরকোপানলে মদন ভস্ম হইয়াছে; রতি খেদ করিতেছেন,—

"কোলে ল'য়ে নিজপতি, কামকান্তা কাঁদে রতি, ধূলায় ধূসর কলেবর।
লোটায়্যা কুন্তল-ভার, ত্যজে নানা অলঙ্কার, সঘনে ডাকয়ে প্রাণেশ্বর॥
পড়িয়া চরণতলে, রতি সকরুণে বোলে, প্রাণনাথ কর অবধান।
তিলেকে দারুণ হয়্যা, পাশরিলে নিজ জায়া, দূর কৈলে সোহাগ সম্মান॥
চাহিয়া উত্তর দেহ, রতিরে সংহতি লেহ, পাশরিলে পুরব পিরীতি।
তুমি ত যাইবে যথা, আগে আমি যাই তথা, এবে কেন কৈলে বিপরীতি॥
ভুবনে সুন্দর তনু, তোমার কুসুম ধনু, সম্মোহন আদি পঞ্চবাণ।
লোটাহ ধরণীতলে, মোর পাপকর্ম্ম-ফলে, নিদারুণ না যায় পরাণ॥
মোর পরমায়ু লয়্যা, চিরকাল থাক জীয়্যা, আমি মরি তোমার বদলে।
যে গতি পাইবে তুমি, সে গতি ইচ্ছিনু আমি, রহিব তোমার পদতলে॥

শিবের দারিদ্র্যে পার্ব্বতীর খেদ,—

"কি জানি তপের ফলে, হর পেয়েছি বর। পাট-পড়শী নাহি আইসে দেখি দিগম্বর॥
উন্মত্ত ল্যাঙ্গটা জটা চিতা-ধূলি গায়। দাণ্ডাইতে মাথার জটা ভূমিতে লোটায়॥
একশয়নে শুইতে নারি সাপের নিশ্বাসে। তারে ধিক প্রাণ পোড়ে বাঘছালের বাসে॥
ময়ূর-মূষিকে হয় সদাই কন্দল। এই হেতু দুই ভায় দ্বন্দ্ব—মোর কর্ম্মফল।
বাপের সাপ পোয়ের ময়ূর সদাই কলকলি। গণার মূষা ঝুলি কা'টে আমি খাই গালি
বাঘ-বলদে সদাই দ্বন্দ্ব নিবারিব কত। অভাগিনী গৌরীর প্রাণে সদাই উপহত॥
শিরে ফণীপতি শোভে ললাটে দহন। জটায় জাহ্নবী শিরে হরিণ-লাঞ্ছন॥
দারুণ কর্ম্মের দোষে রহিলাম দুঃখিনী। ভিক্ষার ধনে দারুণ বিধি করিল গৃহিণী॥
জয়া বিজয়া পদ্মা গুহ লম্বোদর। সঙ্গে লইয়া যাব মা-বাপের ঘর॥"

গর্ভবতী নিদয়ার সাধ;—

"কৈতে নিজ সাধ বড় লাজ বাসি। পান্ত ওদনে ব্যঞ্জন বাসী॥
বাথুয়া ঠনঠনি তেলের পাক। ডগডগি লাউ ছোলার শাক॥
মীন চড়চড়ি কুসুম-বড়ি। সরল সফরী ভাজা চিংড়ী॥
যদি [illegible] মহিষা দই। চিনি ফেলি কিছু মিশায়ে লই॥
আ[illegible] পাকা চালতা। আমসী কাসান্দী কুল করঞ্জা॥
[illegible] লি মাচে। খাইলে মুখের অরুচি ঘুচে॥
হিয়ে [illegible] অন্তরে ভোক। মুখে নাহি চলে এ বড় শোক॥"

কালকেতু-কামিনী ফুল্লরার দুঃখ বর্ণন,—

'পাশেতে বসিয়া রামা কহে দুঃখবাণী। ভাঙ্গা কুড়্যা ঘর তালপাতার ছাউনী॥
ভেরেণ্ডার থাম ওই আছে মধ্য ঘরে। প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে॥
বৈশাখে অনল-সমান বসন্তের খরা। তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পায় পোড়ে খরতর রবির কিরণ। শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
বৈশাখ হল্য বিষ গো বৈশাখ হল্য বিষ। মাংস নাহি খায় সর্ব্বলোক নিরামিষ॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন। পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ॥
পসরা এড়িয়া জল খাইতে যাত্যে নারি। দেখিতে দেখিতে চিলে লয় আধা সারি॥
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস গো পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস। বেঙচের ফল খায়্যা করি উপবাস॥
আষাঢ়ে পূরিল মহী নব মেঘে জল। বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥
মাংসের পসরা লয়্যা ফিরি ঘরে ঘরে। কিছু খুদ কুড়া পাই, উদর না পুরে॥
কি কহিব দুঃখ মোর কহনে না যায়। কাহারে বলিব কি দুষিব বাপ-মায়॥
শ্রাবণে বরিষে ঘন দিবস রজনী। সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি॥
আচ্ছাদন নাহি, অঙ্গে পড়ে মাংস-জল। কত মাছি খায় অঙ্গে মোর কর্ম্মের ফল॥
বড় অভাগ্য মনে গুণি,—বড় অভাগ্য মনেগুণি। কত শত খায় জোঁক নাহি খায় ফণী॥
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল। সকলে দরিদ্র বীর অন্নেতে বিরল॥
কিরাত নগরে বসি না মিলে উধার। হেন বন্ধু জন নাহি যেবা সহে ভার॥
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান। বৃষ্টি হইলে কুড়ায় ভাসা যায় বাণ॥
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজ্জনে। ছাগ মেষ মহিষ কররে বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ কররে বনিতা। অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
মাংস কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে॥ দেবীর প্রসাদ মাংস সবাকার ঘরে॥
কার্ত্তিক মাসেতে হইল হিমের জনম। কররে সকল লোক শীত নিবারণ॥
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়। অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছাল॥
মাস মধ্যে মাইসর আপনি ভগবান। হাটে মাঠে গৃহে গোষ্ঠে সবাকার ধান॥
উদর ভরিয়া ভক্ষ্য দিল বিধি যদি। যম সমশীত তাহে নিরমিল বিধি॥
দুঃখ কর অবধান্ দুঃখ কর অবধান। জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ॥
পৌষে প্রবল শীত সুখী জগজন। তুলি পাড়ি পাছুড়ি শীতের নিবারণ॥
তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন। কররে সকল লোক শীত নিবারণ॥
হরিণ বদলে পাইনু পুরাণ খোসলা। উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা॥'

দরিদ্র ব্যাধপুত্র কালকেতুর প্রতি,—ভগবতী চণ্ডীর কৃপা হইয়াছে; তিনি কালকেতুর কুঁড়ে ঘরে আসিয়া ঘর আলো করি[illegible]য়া আছেন। কালকেতু-কামিনী ফুল্লরা মহা চিন্তায় চিন্তিত,—মহ[illegible]নে [illegible] নিপতিত।

আমার এ ভাঙ্গা কুটীরে এ অনুপমা সুন্দরী কে? ফুল্লরা কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। তখন সে গোলাহাটে স্বামী কালকেতুর নিকট গমন করিল; কালকেতু মাংস বিক্রয় করিতে গিয়াছিল। হাটে গিয়া ফুল্লরা,—কালকেতুকে কি বলিতেছেন,—কালকেতুই বা তাহার কি উত্তর দিতেছেন, শুনুন;—

"বিষাদ ভাবিয়া কান্দে ফুল্লরা রূপসী। নয়নের লোহেতে মলিন মুখশশী॥
কান্দিতে কান্দিতে বামা করিল গমন। গোলাহাটে বীর-পাশে দিল দরশন॥
হা-কান্দ কান্দনে কান্দে চক্ষে বহে নীর। সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥
শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সাতা। কার সনে দ্বন্দ্ব কর্যা চক্ষু কৈলি রাতা॥
সত্যসতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। এবে ফুল্লরারে হৈল বিমুখ বিধাতা॥
কি দোষ দেখিলে প্রভু আজিকার স্বপনে। দোষ নাহি দেখ্যা কেন কর অপমানে॥
কি লাগিয়া বীর এবে পাপে দিলা মন। সেই পাপে নষ্ট হৈলা লঙ্কার রাবণ॥
পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী। আখেটীর ঘরে শোভা পাইবে উর্ব্বশী॥
শিয়রে কলিঙ্গ রাজা বড় দুরবার। তোমারে বধিয়া জাতি লইবে আমার॥
এ বোল শুনিয়া ক্রোধে বীর বোলে বাণী। পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিজের জননী॥
বেকত করিয়া রামা কহ সত্য ভাষা। মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা॥
সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম-সাক্ষী। তিন দিবসের চাঁদ দুয়ারে বসি দেখি॥"

অতঃপর কি ঘটিল?—

"পাসরা চুপড়ি পাখি নিলেন ফুল্লরা। চলিলেন গোলাহাটের তুলিয়া পাসরা॥
আগে আগে চলিল ফুল্লরা নারী জন। পশ্চাতে চলিলা কানু ব্যাধের নন্দন॥
দূরে হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে। তিমির ফেটেছে যেন তপন তরাসে॥
আপনার ঘরে যায়্যা দিল দরশন। দেখিতে পাইল দুটী অভয়া-চরণ॥
ভাঙ্গা কুড়্যা ঘরখানি করে ঝলমল। কোটি ভানু প্রকাশিত আকাশ মণ্ডল॥"

তখন,—

"শরগাণ্ডী এড়ি বীর হৈলা নতিমান্।"

শুধু প্রণতি নহে,—বিনতি শুনুন,—

"আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি বামাকুলবতী, পরিচয় মাগে কালকেতু।
ত্রিভুবনে এক ধন্যা, কিবা দেব-দ্বিজ-কন্যা, ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু॥
ব্যাঘ্রকুর নিকট বড়, চৌদিকে পশুর হাড়, মসান সমান এই ভূমি।
রাজীর্ব্বাদ বাণী, ঘরে চল ঠাকুরাণী, দেবের সমান মূর্ত্তি তুমি॥

কিবা পথ পরিশ্রমে, আইলে দিগের ভ্রমে, আওয়াস ছাড়িয়া এই ঘর।
চল বন্ধুগণ পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে, পাছু লয়্যা যাব ধনুশর॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজনপাশ, থাকিতে থাকিতে দিনমাথে।
যদি হবে কাল নিশা, লোকে গাবে দুর্ভাষা, রজনী বঞ্চিবে কার সাথে॥
সীতা যে পরম সতী, তার শুন দুর্গতি, দৈবে ছিল রাবণ-ভবনে।
সতী জানকীরে জানি, লোকে বাদে রঘুমণি, পুনর্ব্বার পাঠাল্য কাননে॥
পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা অবস্থিতি, দোঁহাকার এক গতি, হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥
যেমত তিলক পাণী, তেমত অসত্য বাণী, সত্যবর্ণী তিলক চন্দন।"

কালকেতুর এত অনুনয়েও চণ্ডী কথাটী কহিলেন না; তখন,—

"ঈষৎ কুপিত বীর যুড়িলেক পাণি॥
বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার। যে হও সে হও গো আমার নমস্কার॥
ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান। আপনি রাখিলে রহে আপনার মান॥
একাকিনী যুবতী ছাড়িলে নিজ ঘর। উচিত বলিতে কেন না দেও উত্তর॥
বড়র বৌয়ারী তুমি বড় লোকের ঝি। রহিয়া ব্যাধের আগে তোর ভাল কি॥
শতেক রাজার ধন অভরণ অঙ্গে। ভয়হীন ভ্রম, যুবা কেহ নাহি সঙ্গে॥
চোরখণ্ড হৈতে মাতা নাহি কর ভয়। চরণে ধরিয়া সাধি ছাড় গো নিলয়॥
আমার বচনে মাতা কর প্রতিকার। শিয়রে কলিঙ্গ রায় বর দুরবার।"

ভগবতী ইহাতেও নিরুত্তর। কালকেতু আর স্থির রহিতে পারিলেন না।

ভানুসাক্ষী করি বীর ছুড়িলেক শর।"

কিন্তু,—

"ছাড়ি যুড়িতে শর নাহি পারে বীর। পুলক পুরিত তনু চক্ষে বহে নীর॥
শরাসনে আকর্ণ পূরিত কৈল বাণ। হাতে শর রহে যেন চিত্রের নির্ম্মাণ॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন। বল বুদ্ধি হত হৈল আখেটী নন্দন॥"

তখন,—

"নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুশর। ছাড়াইতে নারে শর হইলা ফাঁফর॥"

এইবার চণ্ডীর কৃপা হইল,—

"করুণা করিয়া মাতা বলে ধীরে ধীরে।
আইলাম পার্ব্বতী তোমারে দিতে বর। লহ বর কালকেতু ভীর্
মাণিক অঙ্গুরী লহ সাত রাজার ধন। ভাঙ্গিয়া বসাহ রাজ্য

কালীদহে শ্রীমন্তের কমলবন-দর্শন,—

"শ্রীমন্ত বলেন ভায়্যা, শুনরে সকল ন্যায়্যা, রাখ ডিঙ্গা পুতিয়া আলান।
দেখিলাঙ কি শতদল, অতি পরিমিত জল, চরে পাছে ঠেকে ডিঙ্গা খান॥
দেখ কর্ণধার ভায়্যা, শুনরে সকল নায়্যা, দেখ, মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলে রাজা, কিবা করে শিবপূজা, কিবা পূজে প্রভু ভগবান॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত, শতদলে বিকসিত, কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন হয় মোর জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান, দেখি বহু কুসুম সম্পদ॥
হেন মোর লয় মতি, বিধাতার নহে কৃতি, অপরূপ দেখি কালীদহে।
কমল কুসুম ফুটে, কান্তি কার নাহি টুটে, চিত্রগন্ধ লৈয়া বায়ু বহে॥
মধুকর সনে বধূ, বিকচ কমলে মধু, পান করি গায় কল গীত।
গীতে সমাহিত মন, দলে দলে মৃগীগণ, যেন রহে চিত্রের নির্ম্মিত।
কমল পরাগে গোর, আমার লোচন চোর, ফিরি ফিরি বুলে অলিকুল।
ক্ষণেক কৈরবে বৈসে, ক্ষণে মত্ত মধুরসে, বিরহী জনার চিত্তশূল॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে, বদনে বদন আলিঙ্গন।
চারি পাঁচ মিলি যামী, তাণ্ডব করয়ে কামী, মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন॥
নাহি লখি কিবা হেতু, এককালে ছয় ঋতু, গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।
সঙ্গে মকরকেতু, বরিষা-শরৎ ঋতু, বিরহী জনের করে অন্ত॥
রাজহংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি, প্রিয়া-মুখে করে আরোপণ।
চঞ্চুপুটে বিন্ধি মাছে, সারস সারসী নাচে, উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন॥

শ্রীমন্ত কমলে কামিনী দর্শন করিতেছেন,—

"অপরূপ দেখ আর, ওরে ভাই কর্ণধার! কমলে কামিনী অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগারয়ে করিবরে, পুনরপি করয়ে সংহার।
কমল কনক রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী, মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা উমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা, সত্যভামা রম্ভা অরুন্ধতী॥
উরুযুগ সুন্দর, নাভি গভীর সর, বাহুযুগ মৃণাল সঙ্কাশ।
বিমল অঙ্গের আভা, নাসা অলঙ্কার শোভা, অন্ধকার করয়ে বিনাশ॥
হেমময় হার দুলে, কি শোভা তাহার গলে, স্থির হয়্যা সৌদামিনী বৈসে।
নিরূপম পরকাশ, মন্দ মধুর ভাষ, আইসে ভঙ্গী শিখিবার আশে॥
কলাপি-কলাপ কেশ, ভুবনমোহন বেশ, পায়ে শোভে সোণার নূপুর।
প্রভাতে [illegible]র ছটা, কপালে সিন্দুর ফোঁটা, রবির কিরণ করে দূর॥
[illegible]জিনি, চরণে নূপুর ধ্বনি, দশনখে দশ চান্দ ভাসে।
[illegible]হর, বেষ্টিত যাবক-কর, অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
অধ[illegible] বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু, কুরঙ্গ খঞ্জন বিলোচন।

অতসী কুসুম তনু, ভুরুযুগ কামধনু, সুগন্ধি চন্দন বিলেপন॥
শ্রবণ উপর দেশে, হেমের কলিকা ভাসে, কিঞ্চিৎ কম্পিত কেশপাশে।
আষাঢ়িয়া মেঘ মাঝে, যেমন বিদ্যুৎ রাজে, পরিহরি চপলতা দোষে॥
বালা অতি কৃশোদরী, তার দুই কুচগিরি, নিবিড় নিতম্বে অতি ভার।
বদন ঈষৎ মেলে, কুঞ্জর উগারি গিলে, জাগরণে স্বপন প্রকার॥
বামার ঈষৎ হাসে, গগন মণ্ডল ভাসে, দন্তপাতি বিজিত বিজুলি।
বদন-কমল-গন্ধে, পরিহরি মকরন্দে, কত কত শত ধায় অলি॥
দুই করে শোভে শঙ্খ, ভুবনে উপমা রঙ্ক, গলায় দুলিছে হেমহার॥
সুবর্ণ কুণ্ডল দোলে, কপালে বিজুরী খেলে, তনুরুচি খণ্ডে অন্ধকার॥"

কমলে কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্ত মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন,—

"শুনরে কাণ্ডার ভাই বিপরীত দেখি। কহিব রাজার আগে সভে হয়া সাখী॥
যোজনেক প্রমাণ গভীর বহে জল। ইথে উপজিল ভাই কেমনে কমল॥
সমীর জিনিয়া অতি বেগে বহে নীর। কেমনে কমল গজ হৈল ইথে স্থির॥
কমলিনী নাহি সহি তরঙ্গম-ভর। তরঙ্গ-হিল্লোলে রামা করে থর থর॥
নিবসে পদ্মিনী তায় ধরিয়া কুঞ্জর। হরি হরি! নলিনী কেমনে সহে ভর॥
হেলে কমলিনী উগারয়ে যুথনাথে। পলাইতে চাহে গজ ধরে বাম হাতে॥
পুনরপি রামা ধরি করয়ে গরাস। দেখিয়া হৃদয়ে বড় লাগিল তরাস॥
পুরুষ দেখিয়া রামা নাহি করে লাজ। বাম করে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ॥
গলিয় তাম্বুল রাগ ওষ্ঠে নাহি ছাড়ে। গজ গিলে কামিনী চোয়াল নাহি নাড়ে॥
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন। পঞ্চমে গায় অলি নাচে পিকগণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে মত্ত মধুকর। পরাগে ধূসর তার চারু কলেবর॥
বিকশিত কুন্দবন কুসুম মালতী। দামিনী মরুয়া ফুল ফুটে জাতি যুথী॥
ফুটেছে মাধবীলতা পলাশ কাঞ্চন। কুমদ কুসুম আর বকুল রঙ্গণ॥
তাহার উপরে চন্দ্রাতপ মনোহর। নেতের পতাকা উড়ে ধবল চামর॥
বেলন পাটের থোপ মুকুতার মাল। বিচিত্র বিনোদ তাহে সুরঙ্গ প্রবাল॥
তার মাঝে বিকসিত কমল কানন। কেমনে কামিনী তাহে সংহারে বারণ॥
উগারিয়া মত্ত করী ধরে অবহেলে। ঈষৎ হাসিয়া পুনঃ চৌদিকে নেহালে॥
ক্ষণে ক্ষণে হাসে রামা নাচে বাহু তুলি। পঞ্চম গায় গীত রাগিণীরা মেলি॥
রবাব মুরজ ডম্ফ করয়ে বাজন। রঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ॥
কিবা ঊষা, কিবা উমা, রতি অরুন্ধতী। ভৈরবী ভবানী কিবা লক্ষ্মী
ডাকিনী হাকিনী কিবা যক্ষিণী যোগিনী। কাউরের কামাখ্যা কিবা
বুঝিতে না পারি এই কন্যার চরিত। হেন বুঝি বিধি মোরে করে

কবিকঙ্কণের সময়ে সুন্দর বন প্রদেশ পর্ত্তু-গীজদিগের অধিকৃত ছিল। জলদস্যুর আতঙ্কও খুবই ছিল। সেই জন্যই তিনি লিখিয়াছেন;—

"ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে। রাত্রি দিন বহে যায় হারামদের ডরে॥"

খুল্লনা যখন শ্রীমন্তকে ধনপতি সদাগরের অন্বেষণে বিদায় দেন, তখন তিনি ভ্রমরাতীরবাসিনী চণ্ডিকা দেবীর পূজা করেন এবং পুত্রের হিতার্থে অন্যান্য দেব দেবীর বন্দনা করেন;—

"প্রথমে বন্দিব প্রভু দেব নিরাকার। একই মণ্ডপে বন্দো এ চারি দুয়ার।
বৃষভ বাহনে বন্দো দেব পঞ্চানন। দেবগণ সহিত বন্দো মরাল-বাহন॥
অষ্টলোকপাল আমি করিনু বন্দন। ইন্দ্র চন্দ্র পবন বরুণ হুতাশন॥
উড়িষ্যায় বন্দিনু ঠাকুর জগন্নাথ। বলরাম সুভদ্রা বন্দি করি যোড় হাত॥
নবদ্বীপে বন্দো গৌর শচীর কুমার। হরিনাম দিয়া কৈলা জীবের উদ্ধার॥
অবনী লোটায়ে বন্দো শচী ঠাকুরাণী। যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি।
কীর্ত্তন সৃজন কৈলা খোল করতাল। মুনির মজায় মন অতীব রসাল॥
মধুর কৃষ্ণের কথা পুরাণের সার। প্রকাশিলা জীবের লাগি প্রেমের পসার॥
যেই জন নাম গায় যে জন বিতরে। প্রভু নামে বান্ধে ভেলা সিন্ধু তরিবারে।
দশ অবতার বন্দি হ'য়ে এক মন। মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন॥
নীল অবতার বন্দো রাম হলধর। কল্কি দেব বন্দি দুই যোড় করি কর॥
হংস বাহনে ব্রহ্মা গরুড়ে গোবিন্দ। বৃষভে মহেশ বন্দো ঐরাবতে ইন্দ্র॥
মূষিকে গণেশ বন্দি শিখীতে কুমার। বন্দিলাম যমরাজে ভকতি অপার॥
গয়াতে গদাধর বন্দো প্রয়াগে মাধব। বৃন্দাবন চন্দ্র বন্দো ঠাকুর কেশব॥
বৈদ্যনাথ ঠাকুর বন্দিলাম যোড় হাত। প্রণতি করিয়া বন্দিনু বিশ্বনাথ॥
বন্দিলাম জয়াবতী করিয়া ভকতি। কৈলাস ত্যজিয়া কাশীতে কৈলা স্থিতি॥
শনি মঙ্গলবারে দেবীর পূজার প্রচার। ধূপ ধূনার অন্ধকার জয় জয়কার॥
অষ্টাদশ লোক পূজে করিয়া ভকতি। না জানি ব্রাহ্মণে কত পড়ে স্তব স্তুতি॥
উচ্চ গলা ধরিয়া ছাগে দেয় পুষ্পপাণি। ব্রাহ্মণ সজ্জনে লয়্যা মুড়ি টানাটানি॥
সম্মুখেতে জগমোহন রামেশ্বর বর। বালীডাঙ্গা কৈলা স্থান কৈলাস শিখর॥
হীর গ্রামের ঘাটু বন্দো মৌলার রঙ্কিণী। পাণ্ডুয়ায় বন্দিলাম বিশাললোচনী॥
কামরূপে কামাখ্যা বন্দো আমৃতায় মেলাই। ব্যালমায় কালী বন্দো ক্ষেপুতে ক্ষেপাই।
সো[illegible]রুর নন্দিনী বন্দো করিয়া ভকতি। মুণ্ডমালা গলে দোলে ভীষণ মুরতি॥
[illegible]শীর্ব্বাদে বন্দো সর্ব্বমঙ্গলা। অপূর্ব্ব বধিয়া মায়ের গলে মুণ্ডমালা॥
মণ্ড[illegible]গাঠনে বন্দিনু মুণ্ডেশ্বরী। জয়চণ্ডী বন্দিলাম চড়ুয়া নগরী॥
রাঙ[illegible] বন্দি রাজবল্লভীর চরণ। ইলিপুরে রঙ্গিণী বন্দো হয়ে একমন॥

ধশঘরায় বন্দি বিশালাক্ষীর চরণ। আলায় কামারবুড়ী হয়্যা এক মন॥
বেলায় বাসিনী দেবী কেশরীবাহিনী। ভাঙ্গামোড়ায় বন্দো বিশালাক্ষী ঠাকুরাণী॥
বর্দ্ধমানে বন্দি গাবে সর্ব্বমঙ্গলা। ভৃঙ্গরবাহিনী বন্দো গ্রাম সেহাখাল॥
ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যা বন্দো রাইপুরে দেহারা। বেজোর বন্দিয়া গাবে-মনসার বারা॥
বন্দিলাম সেথপুরে করিয়া ভকতি। দিবানিশি যেখানে জাগ্রত মা জগতী॥
বন্দিলাম নারিকেলডাঙ্গায় সংখতি তক্ষক। আস্যস্থান বন্দো যাহে করিল গোরক্ষ॥
বিষটিকরিতে বন্দো জয় বিষহরি। বিষ বেটে দিল যথা তোলা মাপ করি॥
দুলাল মনসা বন্দো ধূলিয়া অবস্থিত। উনকোটি নাগ যার থাকয়েসংহতি॥
মণ্ডলহাটে বন্দিনু মা মনসারে। স্মরণ করিতে মাগো তারিবে আমারে॥
জাজপুরে আদ্য হর প্রণতি করি শিরে। হনুমান বন্দিব গরুড় মহাবীরে॥
টাটেশ্বর মর্ত্তেশ্বর বন্দিব গোতানে। অগ্নিমুখা হর বন্দো বাস পলাশনে॥
দামুন্সায় বন্দিব ঠাকুর চক্রাদিত্য। যার পদযুগ সেবি কবির কবিত্ব॥
কামেশ্বর লিঙ্গ বন্দিব কুমার নগরে। চন্দ্রকা **গড়পতি বন্দো মানুশরে॥
বসন্তপুরে বন্দি গাবো বাকুড়া চরণ। ধবল ঘোড়ায় বন্দিলাম কাম নিরঞ্জন॥
ঘোড়ায় বন্দিয়া গাবো দেব বলরাম। গোকুল ছাড়িয়া যথা করিল বিশ্রাম॥
কাটোয়ায় বন্দিলাম চৈতন্য নিতাই। জীবের নিস্তার হেতু হৈলা দুই ভাই॥
দেলরায় বন্দি গাবো সর্ব্বমঙ্গলা। অধিষ্ঠান হৈলা মাতা খাজুরের তলা॥
দশরথসুত বন্দো শ্রীরামলক্ষ্মণ। ভরত শত্রুঘ্ন বন্দো সীতার চরণ॥

কালীপুরে বিশালাক্ষী নীলপুরে লীলা। মস্তেশ্বরী বন্দ্যো পুরী ঘাটশিলা॥
চাম্পাই নগরে বন্দো চাম্পার চরণ। প্রণতি করিয়া বন্দো হয়ে একমন॥
বেওড়েতে বন্দিনু জয় বিষহরি। অষ্টনাগ বন্দো আর সিহরা নগরী॥
বন্দিনু বারাহী চণ্ডী হয়্যা এক মন। কুলীনগ্রামেতে বন্দ্যো শিবানীচরণ॥
বিক্রমপুরেতে বন্দি যাবো বিশালাক্ষী চণ্ডী। বিক্রম-আদিত্য ছলি পাইলা ধরণী॥
পাজেরায় বন্দিয়া যাবো গুপ্তিপাড়া তীরে। দফর খাঁ নাজিরে বন্দো ত্রিবেণীর ধারে।
গঙ্গা তুলসী বন্দো কলির দেবতা। যাঁহার গুণ গাহে ভাই ভাগবত কথা॥
আদ্য কবি বন্দি আমি বাল্মীকি মুনি ব্যাস। জয়দেব বিদ্যাপতি কবি কালিদাস॥
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া মিনতি। জনক জননী বন্দো করিয়া ভকতি॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়া বিনয়। যাহা হৈতে তিন ভাই গীতে পরিচয়॥
যত সব কবিগণ বন্দিনু চরণ। গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবিকঙ্কণ॥
ডাইন যোগিনী বন্দো অধমেরে পা। বিনা অপরাধে যেই আসরে দেয় ঘা॥
সে মোর ভগিনী কিম্বা আমি তার ভাই। মোর অঙ্গে দংশ যদি ধর্ম্মের দোহাই।
আসিয়া সেই জন আসরে দেয় ঘা। ইহার ভাল মন্দ জান জয়চণ্ডী মা!
শ্রীকবিকঙ্কণ ভণে অভয়ার পায়। হরি হরি বল সবে বন্দনা হইল সায়।

এই দেবদেবীর বন্দনা অধুনা প্রকাশিত কোন চণ্ডীগ্রন্থেই নাই। হুগলী-ভাঙ্গামোড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় স্বয়ং দামুন্যা-গ্রামে গিয়াছিলেন; তিনি যে গ্রন্থোদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতেই এই বন্দনা সন্নিবিষ্ট। এই বন্দনা যে কবিকঙ্কণের রচিত, ইহাতে সন্দেহ হয়। প্রথমতঃ কবিত্বে সন্দেহ; দ্বিতীয়তঃ;—"গীতের গুরু বন্দিলাম শ্রীকবি-কঙ্কণ—এ কথার অর্থ কি? এ বন্দনা স্বয়ং কবিকঙ্কণের হইলে, তাঁহার গুরু কবিকঙ্কণটী কে? আরও এক কথা,—শ্রীমন্তের বিদায়-কালে খুল্লনার মুখে এরূপ বন্দনা-আবৃত্তি,—অসঙ্গত। ১৩০২ সালের ৩২শে শ্রাবণের অনুসন্ধানে এই বন্দনা প্রকাশিত হইয়াছে।

"শিশুবোধকে" গঙ্গাবন্দনা কবিকঙ্কণ-রচিত। সরলে মধুরে সে বন্দনা কি সুন্দর,—

"বন্দ মাতা সুরধনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিত পাবনী পুরাতনী।
বিষ্ণুপদে উপাদান, দ্রবময়ী তব নাম, সুরাসুর নরের জননী॥
ব্রহ্মকমণ্ডলে বাস, আছিলা ব্রহ্মার পাশ, পবিত্র করিয়া ব্রহ্মপুরী।
জীবে দেখি দুরাশয়, নাশিবারে ভবভয়, অবনী আইলা সুরেশ্বরী॥
সূর্য্যবংশে ভগীরথ, আগে দেখাইয়া পথ, তোমারে আনিল মহীতলে।
মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, সকায় বৈকুণ্ঠপুরী চলে॥
সগররাজার বংশ, ব্রহ্মশাপে হৈল ধ্বংস, অঙ্গার আছিল অবশেষ।
পরশিয়া তব জলে, সকায় বৈকুণ্ঠে চলে, সবে হয়ে চতুর্ভুজ বেশ॥
নির্ম্মল তোমার জল, ভক্ষণে অশেষ ফল, বিধিবিষ্ণু চিনিতে না পারে।
শিরে ধরি শূলপাণি, আপনারে ধন্য মানি, এ মহিমা কে বর্ণিতে পারে।
তুয়া জলে করি পাক, অন্ন আদি কিবা শাক, দেবতা দুর্ল্লভ করি লয়।
সেই অন্ন সুধাময়, ব্যাসভাষা বেদে কয়, ভুঞ্জিলে যমের নাহি ভয়॥
সাগর সঙ্গম স্থান, কেবল কৈবল্যধাম, দরশনে সর্ব্ব পাপ হরে।
নীচ শূদ্র কি সন্ন্যাসী, মরিলে বৈকুণ্ঠবাসী, মকরেতে যেবা স্নান করে॥
শতেক যোজনে থাকে, যদি গঙ্গা বলে ডাকে, পবিত্র তাহার কলেবর।
নাম উচ্চারণ ফলে, বিষ্ণুর সদনে চলে, নাহি দেখে শমন নগর॥
গতপ্রাণী মৃতকায়া, পিতা মাতা সুত জায়া, শ্মশানে টানিয়া লয়ে ফেলে।
ন্দো সর্ব্বময়াহুত ঘৃণা করে, স্নান করি আসে ঘরে, সেকালে আপনি কর কোলে॥
ন বন্দিনু মুবং উপায় শক্ত, জ্ঞাতি বন্ধু অনুরক্ত, মেলে করে দিন দুই শোক।
াজবল্লভা সব সঙ্কট দিনে, তোমার চরণ বিনে, কেহ নাহি আপনার লোক॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম।

তপ্রাণী মৃতকায়, কাকে বা শৃগালে খায়, ভেসে গিয়া লাগে তব তটে॥
হাতেতে চামর ধরি, শত স্বর্গবিদ্যাধরী, সেবে আসি তাহার নিকটে॥
তোমার নিকটে রই, শরট করট হই, কিবা কৃশ শুনীর তনয়।
গঙ্গাহীন দেশে রয়ে, কোটি হস্তীশ্বর হয়ে, যদি রহে সেহ কিছু নয়॥
কীটাদি পতঙ্গ পক্ষ, নৃপ আদি জীব লক্ষ, সকলি তোমার সমতুল।
মহাপাপী দুরাচারী, পরশে তোমার বারি, অন্তকালে তুমি অনুকূল॥
গঙ্গার মহিমা যত, আমি তাহা কব কত, বিস্তারিত অনেক পুরাণে।
গাইয়া তোমার আগে, গোবিন্দ-ভকতি মাগে, চক্রবর্ত্তী শ্রীকবিকঙ্কণে॥"

পরলোকগত কাউয়েল সাহেব কবিকঙ্কণ চণ্ডীর বড়ই ভক্ত ছিলেন। তিনি ইহার কোন কোন অংশ ইংরেজীতে অনুবাদও করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুবাদের একটু নমুনা দেখুন,—

মূল।

"এমন বিচার সাধু করি মনে মনে। আগে জল দিল চাঁদ বেণের চরণে।
কপালে চন্দন দিয়া মালা দিল গলে। এমন সময়ে শঙ্খদত্ত কিছু বলে॥
বণিক সভায় আমি আগে পাই মান। সম্পদে মাতিয়া নাহি কর অবধান॥
সে কালে বাপের কর্ম্ম কৈল ধূসদত্ত। তাহার সভায় বেণে হৈল ষোল শত॥
ষোল শতের আগে শঙ্খদত্ত পাইল মান। ধূসদত্ত জানে ইহা চন্দ্র মতিমান॥"

অনুবাদ।

'Tis Cand to whom he turns first to greet
And brings the water first to wash his feet.
Then draws the sandal-mark upon his brows
And round his neck, the flower-wreathed garland throws.
But Cankha Datt in sudden wrath outburst
"I in these meetings am by right the first.
Lo ! Dh[illegible]ha Eatt can witness how of late
His father's Cradha he had to celebrate ;
Fnll sixteen hundred merchants one and all
Of stainless credit, gathered in his hall.
Yet I was first of all that company ;
Too much good luck has made you blind I see

মূল।

"ছয় বধূ যার ঘরে নিবসয়ে রাঁড়। ধন হেতু চাঁদ বেণে সভামধ্যে ষাঁড়॥
চাঁদ বলে তোরে জানি নীলাম্বর দাস। তোমার বাপের কিছু শুন ইতিহাস॥
হাটে হাটে তোর বাপ বেচিত আমলা। ক্রন্দন করিয়া তাহা কিনিত অবলা॥
নিরন্তর হাতাহাতি বার-বধূর সনে। নাহি স্নান করি বেটা বসিত ভোজনে॥
কড়ির পুঁটলী সে বাঁধিত তিন ঠাঁই। সভামধ্যে কহ কথা কিছু মনে নাই॥
নীলাম্বর দাস কহে শুন রাম রায়। পসরা করিলে তাহে জাতি নাহি যায়॥
আঁটো ছোপরা খাইলে নহে কুলের খাঁখার। কড়ির পুটলী বাঁধি জাতির ব্যাভার

অনুবাদ।

"Can gold light up a house so desolate?"
"I know you well Nilamber" Chand replies
Your father too,—ther's many a romour flies
He used to sell myrobalans, fame avers
With all city's scum for purchasers.
His cowrie bundles, with a miser's care,
He stowed away, here, there, and everywhere;
He'd stand for hours, and then, the hustling o'er
Go home and dine' with never a bath before.
"Well," says Nilamber, well and why this din?
He plied his lawful trade, was that a sin?
And then Snack which you his dinner call,—
A sop of bread or plantain that was all."

ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন,—

"In fact, Bengal was to our poet what Scotland was to Sir Walter Scott; he drew a direct inspiration from the village-life which he so loved to remember."

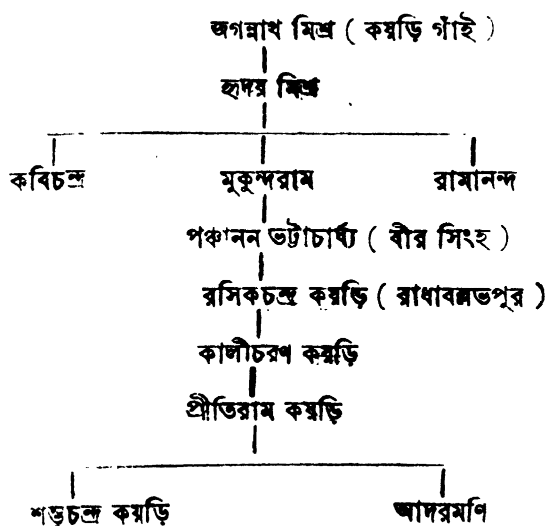
কোন স্থানের অনুবাদে তিনি বিষম গোলও করিয়াছেন;

"ছয় বধূ যার ঘরে নিবসরে রাঁড়।"

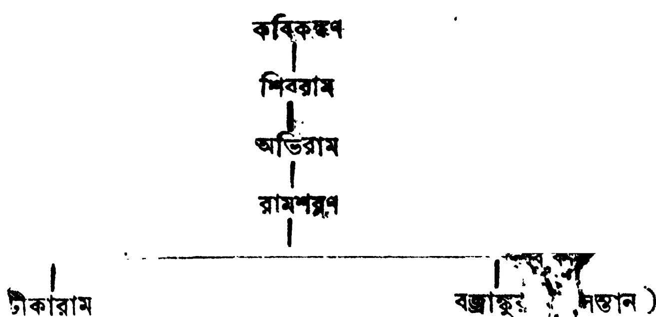
"His six poor childess wives bemoan their fate."

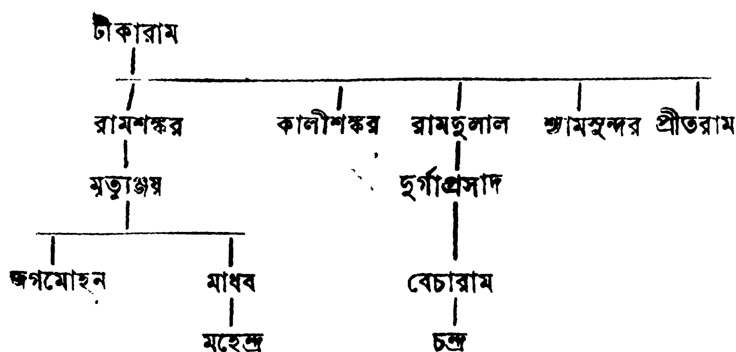
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার Literature of Benga নামক গ্রন্থে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামকে ইংরেজ কবি চসারের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণের বাটীতে অদ্যাপি মহিষমর্দ্দিনী দেবী বিরাজিত। ইনি চতুর্ভুজ ;—হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ;—গলে বনমালা কবিকঙ্কণের বংশাবলী ;—



কবিকঙ্কণের অষ্টগুন পুরুষের বংশতালিকা,—





টীকারামের পুত্র কালীশঙ্কর, শ্যামসুন্দর ও প্রীতরাম বর্দ্ধমান জেলার ছোট বৈনান গ্রামে বাস করেন; ইহাঁদের বংশধরেরা এক্ষণে সেই গ্রামেই বাস করিতেছেন। কবিকঙ্কণের বৃদ্ধপ্রপৌত্র, ভাঙ্গামোড়ার নারায়ণ সিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন. এবং গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহাকে কালীপাড়া ও ঘরগোহাল নামক গ্রামের সভাপণ্ডিতের অধিকার দান করেন। ভাঙ্গামোড়ার ভট্টাচার্য্যেরা অদ্যাবধি এই অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছেন।

কবিকঙ্কণের কাব্যে,—দক্ষের শিবনিন্দা, শিবনিন্দাশ্রবণে সতীর দেহ-ত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গ, হর-পার্ব্বতীর কোন্দল; রতি-বিলাপ প্রভৃতি মৌলিক সৃষ্টি; ভারতচন্দ্রে ইহার রস-মধুর অনুবর্ত্তন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সটীক কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রকাশ করিয়াছিলেন। বঙ্গবাসী আফিস হইতেও ইহার একটী সুষ্ঠু সংস্করণ বাহির হইয়াছে। কিন্তু এই কাব্যে অধুনা-অপ্রচলিত শব্দ সমূহের যেরূপ প্রাচুর্য্য, তাহাতে ইহার সুবিস্তৃত টীকা টিপ্পনীর প্রয়োজন। বিস্তৃত টীকাসংযুক্ত সংস্করণ একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী রচনা করিবার পূর্ব্বে জগন্নাথ-মঙ্গল নামক একখানি গ্রন্থ লেখেন। এই গ্রন্থে জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত। চণ্ডীকাব্যের ন্যায় ইহাঁর জগন্নাথ-মঙ্গল গ্রন্থও গীত হইত। এই গ্রন্থে ইনি ভণিতা দেন,—'[illegible] কোন [illegible]ন্দ কহে বন্দিয়া শ্রীহরি।'

— — —

অযোধ্যারাম।

ইনি সুকবি। শিশুবোধকে ইহাঁর গুরুদক্ষিণা সেকালে যত্নপূর্ব্বক পঠিত হইত। বর্ণনা কেমন প্রাঞ্জল!—

"ধরাতলে ধন্য সান্দীপনি মুনিবর। যমালয়ে ছিল পুত্র দ্বাদশ বৎসর॥
হেলে গুরুপুত্র দান দিল যদুমণি। ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম কভু নাহি শুনি॥
মরা পুত্র আনি দিল গুরুর দক্ষিণা। আর কার শক্তি আছে ভগবান্ বিনা॥
গুরুস্থানে বিদায় মাগেন দুই ভাই। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কান্দে ধরণী লোটাই॥
এতদিনে আমার আশ্রম হৈল শূন্য। রামকৃষ্ণ বিনা যেন অযোধ্যা অরণ্য॥
কি করিবে ধন জন কি করিবে কায়া। দিনকত সংসার সকলি মিছা মায়া॥
এই বর দিয়ে যাও দয়াময় হরি। ঐ পদ ভাবিতে ভাবিতে যেন মরি॥
আজ হৈতে অবন্তীনগর হৈল মুক্ত। অযোধ্যা মথুরা গয়া কাশীকাঞ্চীযুক্ত॥
মুনিরে অভয় দিয়া যান হলপাণি। কৃষ্ণ-দরশনে মুক্ত ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী॥
কৃষ্ণের গমনে কান্দে অবন্তীর লোক। মথুরা যাইতে যেন গোকুলের শোক॥
সিংহাসনে উগ্রসেন বসিয়া সভায়। হেন কালে রামকৃষ্ণ গেলেন তথায়॥
দেখি আনন্দিত হৈল মথুরানিবাসী। হাত বাড়াইয়া যেন পাইলেক শশী॥
মাতামহে বন্দি গেল কৃষ্ণ বলরাম। পিতামাতা-পদে গিয়া করিল প্রণাম॥
দুই মাস পরে হেরি পুত্রের বদন। কোলেতে করিয়া চুম্ব খান ততক্ষণ॥
যমালয় হৈতে মৃতপুত্র দিল দান। বিস্তারিয়া সেই কথা কহেন তখন॥
শুনিয়া বিস্ময় হৈল জনক জননী। তোমরা মনুষ্য নহ অখিলের মণি॥
দুই পুত্র কোলে করি জননী দৈবকী। সর্ব্ব দুঃখ পাসরিলা পরম কৌতুকী॥
চৌদ্দবৎসরের পর কৌশল্যা যেমন। রামচন্দ্র পেয়ে যেন অযোধ্যাভুবন॥
জননীর কোলে নিদ্রা যান দুইজনে। সেই দিন যশোদারে দেখিল স্বপনে॥
করে ননী নন্দরাণী দিতেছেন মুখে। কান্দিয়া উঠেন কৃষ্ণ ধারা বহে বুকে॥
জিজ্ঞাসা করেন দেবী কহ বাছাধন। কি দুঃখ উঠিল মনে কি হেতু রোদন॥
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ গদ গদ বাণী। স্বপনে দেখিনু আজি মাতা নন্দরাণী॥
পালন করিল যত না পারি কহিতে। জনম তাঁহার গেল কান্দিতে কান্দিতে॥
আমা বিনা মা বলিতে কেহ নাহি আর। ভাবিতে বিদরে বুক [illegible]াবার॥
কোথায় রহিল নন্দ ব্রজশিশুগণ। কোথায় রহিল মোর গিরি গো[illegible]
প্রিয় রাধা চন্দ্রাবলী গোপিকা সকল। যমুনা-সলিল সব বিহারে [illegible]

দৈবকী বলিল বাছা অনিত্য সংসার। তোমাতে সকল আছে মায়া বুঝা ভার॥
ব্রহ্মা আদি মোহ হৈল তোমার মায়ায়। জন্মকালে চতুর্ভুজ দেখালে আমায়॥
যমালয় হতে মৃতপুত্র দিলে দান। ইহাতে তোমায় কি মনুষ্য হয় জ্ঞান॥
তুমি বা কাহার পুত্র কেবা মাতা পিতা। আপনি অখিলপতি দেবের দেবতা॥
দৈবকী মায়ের বোল শুনিয়া মাধব। মায়া করি ঘুচাইল জননীর স্তব॥
পুত্র বোধ করি দেবী কৃষ্ণে কৈল কোলে। গৃহকর্ম্মে গেল মন পড়ে গেল ভোলে॥
গুরুদক্ষিণার কথা শুনে যেই জন। রোগ-শোক পাপ-তাপ দুঃখ বিমোচন॥
জন্মিয়া ভারতভূমে বৃথা কাল যায়। যে জন চতুর হয় ভজে কৃষ্ণ-পায়॥
সংসার সকলি মিথ্যা অনিত্য শরীর। টলমল করে যেন পদ্ম-পত্র-নীর॥
কলিঘোরে মায়াডোরে পড়ে কেন থাক। নিজ ঘরে থাকে যেন ভ্রমরের পোক॥
যেন তেন প্রকারেণ মনে কৃষ্ণ রাখ। ভক্তিভাবে মনসুখে পুনঃপুনঃ ডাক॥
গৃহবাস বড় ফাঁস এড়াইবে কিসে। কলেবর জর জর হবে অবশেষে॥
নিরন্তর কাল-চক্র ফিরে পিছে পিছে। বিনা হরিনামে নাহি ভবরূপ ঘুচে॥
শুন শুন সর্ব্বলোক একমন হৈয়া। ভজহ হরির নাম মন মজাইয়া॥
কলিতে হরির নাম বিনা গতি নাই। সংসারের সারবস্তু ভজ ওরে ভাই॥
তার সাক্ষী জগাই মাধাই দুইজন॥ তারে ভজাইল প্রভু রাম নারায়ণ॥
হরি-নামামৃত পান যেই জন করে। আপনি শমন রাজা কি করিতে পারে॥
ভক্তি বিনা হরিপদ কেহ নাহি পায়। সকলের মূল ভক্তি কহিনু সবায়॥
অযোধ্যারামেতে কয় দয়াময় হরি। ঐ পদ ভাবিতে ভাবিতে যেন মরি॥"

কাশীরাম দাস।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীরাম দাসের মহাভারতও বঙ্গ-সাহিত্যের কৌস্তুভ মণি। এ দেশের সাধারণ হিন্দু-সংসারে ন্যায়-ধর্ম্ম এবং নিষ্ঠাচার-শিক্ষার এই মহাভারত অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বস্তুতই,—"যা নাই ভারতে—তা নাই ভারতে।" কি ইহলৌকিক ক্ষেমার্জ[illegible] পারলৌকিক মঙ্গললাভ,—কাশীরামের মহাভারত সর্ব্ব-বিষয়ে [illegible]ষ্টফলপ্রদ,—ইহাই এ দেশের সাধারণ হিন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁহা[illegible] কোন [illegible]রণা এ মহাভারত পাঠে,—

"মবাঞ্ছিত ফল পায় ইথে নাহি আন।
হরিপদে মতি হয় জন্মে দিব্যজ্ঞান।"

মহাভারত চরিত্র-বৈচিত্র্যে রত্নাকর; মহাভারত ছন্দ-লালিত্যে এবং রস-প্রাচুর্য্যে,—পারিজাত-পরিমল।

বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অধীন সিদ্ধিগ্রামে কাশীরাম দাসের জন্ম। কাশীরাম কায়স্থ। অনুমান, বাঙ্গলা ৯৬৫ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর, পিতার নাম কমলাকান্ত। ইনি সম্ভবতঃ বাঙ্গলা ১০০০ সালে মহাভারত রচনা আরম্ভ করেন। শুনা যায়, মেদিনীপুর-আভাসগড়স্থ রাজার আশ্রয়ে কাশীরাম কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।

কাশীরাম সংস্কৃত ভাষায় উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইহাঁর মহাভারতের কোন কোন স্থল,—মূল সংস্কৃত মহাভারতের প্রাঞ্জল অনুবাদ। যথা,—মূল মহাভারতের সম্ভবপর্ব্বে—

"ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥
স তথা বিদুরেণোক্তস্তৈশ্চ সর্ব্বৈর্দ্বিজোত্তমৈঃ।
ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহ সমন্বিতঃ॥"

কাশীরামের অনুবাদ,—

"কুলের কারণ রাজা ত্যজি একজন। কুলত্যাগ করি রাজা গ্রামের কারণ॥
গ্রাম ত্যজি শুন রাজা জনপদ-হিতে। পৃথিবীকে ত্যজি রাজা আপনা রাখিতে॥
হেন নীতি আছে রাজা কহি পূর্ব্বাপর। জ্যেষ্ঠপুত্র মারি বংশ রাখ নৃপবর॥
এতেক বচন যদি বিদুর বলিল। পুত্র-স্নেহে ধৃতরাষ্ট্র শুনি না শুনিল॥"

মূল মহাভারত,—

"ত ঊচু র্ব্রাহ্মণা রাজন্ পাণ্ডবান্ ব্রহ্মচারিণঃ।
ক ভবন্তো গমিষ্যন্তি কুতো বাহভ্যাগতা ইহ॥"

কাশীরামের অনুবাদ,—

"দ্বিজগণ বলে কে তোমরা পঞ্চজন। কোথা হৈতে আইসহ কোথায়

এরূপ দৃষ্টান্ত বহু। কাশীরাম দাসের মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্ব,—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা,

সৌপ্তিক, ঐষীক, নারী, শান্তি, অশ্বমেধ, আশ্রমিক, মুষল এবং স্বর্গারোহণ; ইহা ব্যতীত তিনি আরও কয়েকটী পর্ব্ব রচনা করেন,—যানপর্ব্ব, দাসপর্ব্ব, পাশাপর্ব্ব ও কুসুমপর্ব্ব। কাশীরাম তিন খানি কাব্যেও রচনা করেন,—নলোপাখ্যান, জলপর্ব্ব এবং স্বপ্নপর্ব্ব।

কাশীরাম রূপ-বর্ণনে কিরূপ সুনিপুণ,—তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন,—নারায়ণের মোহিনী বেশ—

"হেনকালে নারায়ণ ধরিয়া স্ত্রীবেশ। ধীরে ধীরে উপনীত হৈলা সেই দেশ॥
রূপে আলো করিলেক চতুর্দ্দশপুর। সুবর্ণে রচিত তাঁর চরণে নূপুর॥
কোকনদ জিনি পদ মনোহর গতি। যে চরণে জন্মিলেন গঙ্গা ভাগীরথী॥
যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ। লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ॥
যুগ্ম উরু রম্ভাতরু চারু দুই হাত। মধ্যদেশ হেরি ক্লেশ পায় মৃগনাথ॥
নাভিপদ্ম বিধিসদ্ম সৃষ্ট যার শ্রেষ্ঠ॥ কণ্ঠকম্বু যুগ শম্ভু বক্ষঃস্থলে ভেট॥
ভুজসম ভুজঙ্গম কি দিব তুলনা। সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর করের কঙ্কণা॥
পল্লবর জিনি কর চম্পক অঙ্গুলি॥ নবরন্দ জিনি ইন্দু-প্রভা গুণশালী॥
কোটি কাম জিনি শ্যাম বদন পঙ্কজ। মনোহর ওষ্ঠাধর গরুড় অগ্রজ॥
নাসিকায় লজ্জা পায় শুক-চঞ্চুখানি। নেত্রদ্বয় শোভা হয় নীলপদ্ম জিনি॥
পুষ্পচাপ হরে দাপ ভ্রূদ্বয়-ভঙ্গিমা। গালে প্রাতঃ দিননাথ দিতে নহে সীমা॥
পীতবাস করে হ্রাস স্থির-সৌদামিনী। দন্তপাঁতি করে দ্যুতি মুক্তার গাঁথনি॥
দীর্ঘকেশে পৃষ্ঠদেশে বেণী নিরমাণ। আচম্বিত উপনীত সভা বিদ্যমান॥"

দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণন,—

"পূর্ণ শরদিন্দু, হেরি জীববন্ধু, বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিল ফুল নাসা, হেরি মুনিমনসুখ।
নেত্র যুগ্ম মীন, দেখিয়া হরিণ, লাজে দুহে গেল বন।
চারু ভ্রূ উন্নত, দেখিয়া মন্মথ, নিন্দে নিজ শরাসন।
সুপর্ণ সোদর, নিন্দিত অধর, পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দূর চাচর জালে।
তড়িত মণ্ডল, দিগন্তে কুন্তল, হিমাংশু মণ্ডল আছে।
দেখি কুচ-কুম্ভ, লজ্জায়ে দাড়িম্ব, হৃদয় কাটিয়া পড়ে।
কণ্ঠ দেখি কম্বু, প্রবেশিল অম্বু, অগাধ অম্বুধি মাঝে।
মাঝে দেখি ক্ষীণ, প্রবেশে বিপিন, কেশরী পড়িল লাজে।
করে কোকনদ, পাইল বিষাদ, দ্বিজরাজ নখ-তেজে।
কনককঙ্কণ, দ্বিভুজে ঝঞ্চন, নূপুর হংস-শবদ।

জঘন সুন্দর, বিহার কন্দর, মার মারণের-সাধা॥
বাম রম্ভা তরু, চারু যুগ্ম উরু, দেখি নিন্দে হাথ হাথী।
উদরাতিকৃশ, মাঝ মৃগ-ঈশ, নিতম্ব অতুল ক্ষিতি॥
নীল সুকমল, শরীর অমল, কমল গঠিত অঙ্গ।
ভারের কারণ, হীন আভরণ, সহজে মোহে অনঙ্গ॥
কমল বদন, কমল নয়ন, কমল-বান্ধব গণ্ড।
দ্বিকর-কমল, আর পদতল, ভুজ কমলের দণ্ড॥
মন্দ মন্দ বায়, যোজনেক যায়, অঙ্গের কমল গন্ধ।
হইয়া উন্মত্ত, ধায় চতুর্ভিত, কমল মধুপ-বৃন্দ॥"

কাশীরাম,—উপমা-বিন্যাসেও সিদ্ধহস্ত ;—

"মুখ তুলি বৃকোদর যেই দিকে চায়। পলায় সকল সৈন্য তুলা যেন বায়॥
সিন্ধুজল মন্থে যেন পর্ব্বত মন্দর। পদ্মবন ভাঙ্গে যেন মত্ত করিবর॥
মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্র-মণ্ডলে। দানবের মধ্যে যেন দেব আখণ্ডলে॥
দণ্ড হাতে যম যেন বজ্র হাতে ইন্দ্র। খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ॥
যেই দিকে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি। দুই দিগে তট যেন মধ্যে হয় নদী॥
যতেক আছিল সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা। খরস্রোতে বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা।"

লক্ষ্যভেদোদ্যত অর্জ্জুন,—

দেখ দ্বিজ, মনসিজ, জিনিয়া মূরতি। পদ্মপত্র, যুগ্মনেত্র, পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম, তনু শ্যাম, নীলোৎপল আভা। মুখরুচি, কত শুচি, করিয়াছে শোভা।
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব, অধর রাতুল। খগরাজ, পায় লাজ, নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু, যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর। গজস্কন্ধ, গতিমন্দ, মত্ত করিকর॥
ভুজযুগে, নিন্দে নাগে, আজানুলম্বিত। করিকর, যুগ্মবর, জানু সুবলিত॥
মুকপাটা, দন্তছটা, জিনিয়া দামিনী। দেখি ইহা, ধৈর্য্য-হিয়া, নহেক কামিনী।
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য, ঢাকিয়াছে মেঘে। অগ্নি-অংশু, যেন পাংশু, আচ্ছাদিত লাগে॥

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কৃত্তিবাসী রামায়ণে যেমন গুণপণার একশেষ দেখাইয়াছেন, কাশীদাসী মহাভারতেও তেমনি। প্রাচীন পুঁথির সহিত বটতলা প্রকাশিত মহাভারতের বিস্তর প্রভেদ। প্রাচীন মহাভারতে প্রথমেই গণেশবন্দনা,—বটতলার মহাভারতে সে অংশ নাই, [illegible]বারেই —'সর্ব্বশাস্ত্রবীজ হরিনাম দ্বি-অক্ষর।' আর পাঠান্তর [illegible]পাঠ-পরিবর্ত্তনের—ত পরিসীমা নাই! দৃষ্টান্ত,—

দ্রৌপদীর রূপ-বর্ণনা,—

প্রাচীন পুথি,—

ভুজসম, ভুজঙ্গম, কি কহিবে ভুল। সুরাসুরে, শোভা হরে, করের অঙ্গুল॥
কোকনদ, মুখপদ, দুষ্ট-ধ্বংসী কর। হিমকর, তেজোহর, কুণ্ডল মকর॥
নাসা তুল, তিল ফুল, শুকচঞ্চু জিনি। পদ্মচক্ষু, যুগ্মপক্ষ, নাটক-নটিনী॥

বটতলার মহাভারত,—

ভুজসম ভুজঙ্গম, মৃণাল জিনিয়া। সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর, যাহারে হেরিয়া॥
পদ্মবর, জিনি কর, চম্পক অঙ্গুলি। নখবৃন্দ, জিনি ইন্দু, প্রভাগুণশালী॥
নাসিকায়, লজ্জা পায়, শুক চঞ্চুখানি। নেত্রদ্বয়, শোভা হয়, নীলপদ্ম জিনি॥

অপরঞ্চ, আদিপর্ব্ব,—

প্রাচীন পুঁথি,—

রাক্ষসমোহব পিতা করিল ভক্ষণ। পিতৃবৈরী নিশাচর করিব নিধন॥
রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে। এত পরাশর মুনি দৃঢ় কৈল চিতে॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে নহিল নিবারণ। রক্ষযজ্ঞ আরম্ভিল শক্তির নন্দন॥

বটতলার পুঁথি,—

রাক্ষস বলিয়া না থুইব পৃথিবীতে। পরাশর মুনি এতে দৃঢ় কৈল চিতে॥
বশিষ্ঠের শক্তিতে না হইল বারণ। রাক্ষস বধের যজ্ঞ কৈল আরম্ভণ॥
ইত্যাদি।

প্রাচীন পুথি,—

"পূর্ণ শরদিন্দু, হীন যেন বিন্দু, বিকচ কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিলফুল নাসা, দেখি মুনি মনসুখ॥
সুপর্ণ সোদর, নিন্দিয়া অধর, পূরব অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, স্থির সৌদামিনী, সিন্দূর চিকুর জলে॥"
একি বিপরীত, পূর্ণিমার সিত, কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অম্বর, যে দিল কিন্নর, বাকল তাহা উপেক্ষি॥

বটতলার পুঁথি,—

"পূর্ণ সুধাকর, হইতে প্রবর, কে বলে কমল মুখ।
গজমতি ভূষা, তিল ফুল নাসা, দেখি মুনিমনসুখ॥
প্রবাল শ্রীধর, বিরাজে অধর, পূর্ব্বীয় অরুণ ভালে।
মধ্যে কাদম্বিনী, ঘন সৌদামিনী সিন্দূর চাঁচর জালে॥"

/-life কোন)

মনে হয় দুঃখ, পূর্ণচন্দ্র মুখ, কি হেতু মলিন দেখি।
অম্লান অম্বর, দিল যে কিন্নর, বাকল তাহা উপেক্ষি॥

ভীষ্মপর্ব্বের প্রারম্ভে,—

প্রাচীন পুথি,—

তবে জন্মেজয় রাজা করিয়া বিনয়। জিজ্ঞাসিল মুনিবরে কহ মহাশয়॥
কিরূপে ভারতযুদ্ধ হৈল আরম্ভণ। কোন্ কোন্ বীর আইল যুদ্ধের কারণ॥
কি মন্ত্রণা কৈল তবে পিতামহগণ। কি কর্ম্ম করিল তবে রাজা দুর্য্যোধন॥
বিশেষিয়া সে সকল কহ মহামুনি। তব মুখে শুনিতে আশ্চর্য্য হেন মানি॥

বটতলার মহাভারত,—

জিজ্ঞাসে জনমেজয় কহ তপোধন। উলূকের মুখে বার্ত্তা করিয়া শ্রবণ॥
কোন্ কর্ম্ম করিলেক দুর্য্যোধন বীর। কিবা কর্ম্ম করিলেন রাজা যুধিষ্ঠির॥
বলেন বৈশম্পায়ন শুন মহাশয়। দূতমুখে বার্ত্তা শুনি ধর্ম্মের তনয়॥
কৃষ্ণেরে কহেন হলো সমর-সময়। বিহিত ইহার যাহা কর মহাশয়॥"

এইরূপ, পরিশোধন, পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন,—সর্ব্বত্র। জয়-গোপাল,—কাশীরামের কি সর্ব্বনাশই করিয়াছেন!

মহাভারতে নীতিধর্ম্মের উপদেশ কেমন নিপুণতার সহিত বিন্যস্ত,—তাহার একটু পরিচয় লউন। বনপর্ব্বে দ্বৈতকাননে যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীর কথা,—

"দ্বৈতবন মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন। ফলমূলাহার জটা বাকল ভূষণ॥
একদিন কৃষ্ণা বসি যুধিষ্ঠির পাশে। কহিতে লাগিল দুঃখ সকরুণ ভাষে॥
এ হেন নির্দ্দয় দুরাচার দুর্য্যোধন। কপট করিয়া তোমা পাঠাইল বন॥
কিছুমাত্র তব দোষ নাহি তার স্থানে। এ হেন দারুণ কর্ম্ম করিল কেমনে॥
কঠিন হৃদয় তার লোহেতে গঠিল। লেশমাত্র তার মনে দয়া না জন্মিল॥
তোমার এ গতি বনে দেখি নরপতি। সহন না যায় মম সন্তাপিত মতি॥
রতনে ভূষিত শয্যা নিদ্রা না আইসে। কথন শয়ন রাজা তীক্ষ্ণধার কুশে॥
কস্তুরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর। এখন হইল তনু ধূলায় ধূসর॥
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে। তপস্বী সহিত থাক তপস্বীর বেশে॥
লক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণপাত্রে ভুঞ্জে। এবে ফল মূল ভক্ষ্য অরণ্যের মাঝে॥
এই তব ভ্রাতৃগণ ইন্দ্রের সমান। ইহা সবা প্রতি নাহি কর অবধান॥
মলিন বদন ক্লিষ্ট দুঃখেতে দুর্ব্বল। হেট মুখে সদা থাকে ভীম মহাবল।

যাহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ। সহনে না যায় দুঃখে ফাটিতেছে বুক॥
ভীম সম পরাক্রম নাহি ত্রিভুবনে। ক্ষণমাত্রে সংহারিতে পারে কুরুগণে॥
সকল তাজিলা রাজা তোমার কারণ। কেমতে রহিছে ইহা দেখিয়া রাজন॥
এই যে অর্জ্জুন কার্ত্তবীর্য্যের সমান। ইহার প্রতাপে সুরাসুর কম্পমান॥
পৃথিবীতে বৈসে যত রাজরাজেশ্বর। রাজসূয়ে খাটাইলে করিয়া কিঙ্কর॥
মলিন বদনে বসি থাকয়ে কেমনে। ইহা দেখি নাহি রাজা তাপ তব মনে॥
সুকুমার মাদ্রীসুত দুঃখী অধোমুখ। ইহা দেখি রাজা তব নাহি জন্মে দুঃখ॥
ধৃষ্টদ্যুম্নভগ্নী আমি দ্রুপদনন্দিনী। তুমি হেন মহারাজ হই আমি রাণী॥
মোর দুঃখ দেখি রাজা তাপ না জন্মিল। ক্রোধে নাহি তব অঙ্গে এবে সে জানিল॥
ক্ষত্র হৈয়া ক্রোধ নাহি নাহি হেন জন। তোমাতে নাহিক রাজা ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
সময়েতে এই বীর তেজ নাহি করে। হীনজন হন রাজা তাহারে প্রহারে॥
এই অর্থে পূর্ব্বে রাজা আছয়ে সম্বাদ। বলি দৈত্যপতি প্রতি বলিল প্রহ্লাদ॥
করযোড়ে তঁহ জিজ্ঞাসিল পিতামহে। ক্ষমা তেজ উভয়ের ভাল কারে কহে॥
সর্ব্বকর্ম্ম জ্ঞাত যে প্রহ্লাদ মহামতি। কহিতে লাগিল শাস্ত্রমত যেই নীতি॥
সদা ক্ষমী না হইবে সদা তেজোবন্ত। সদা ক্ষমা পায় দুঃখ মতিমন্ত॥
শত্রুর আছুক কার্য্য মিত্র নাহি মানে। অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে॥
কার্য্যে অবহেলা করে নাহি করে ভয়। যথাস্থানে সেবা থাকে ক্রমে হয় লয়॥
বলেতে অন্যায় কার্য্য করে ভার্য্যগণ। অতি ক্ষমাশীল দেখি করয়ে হেলন॥
অতি ক্ষমা দেখি ভার্য্যা রমে অন্য জনে। সে কারণে সদা ক্ষমা বর্জ্জে সাধুজনে॥
দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে। মহাক্লেশ পায় যেই সদা ক্ষমা করে॥
যখন করিবে ক্ষমা শুনহ রাজনে। পণ্ডিত না হয় যদি দোষ মূর্খ জনে॥
অজ্ঞান দেখিয়া ক্ষমা করি একবার। দ্বিবার করিলে দোষ দণ্ড দিবে তার॥
দুইবারে ক্ষমা কেহ না করে রাজন। কত দোষ তোমার করিল দুর্য্যোধন॥
কি কারণে ক্ষেম রাজা না বুঝি বিচার। তেজকাল এই তেজ কর নরবর॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম্ম নরপতি। করেন উত্তর তার ধর্ম্ম-শাস্ত্র-নীতি॥
ক্রোধ সম পাপ দেবী নাহিক সংসারে। প্রত্যক্ষ কহিয়ে ক্রোধে যত পাপ ধরে॥
গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে। অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হৈলে বলে॥
আছুক অন্যের কার্য্য আত্মা হয় বৈরী। বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি॥
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে। অক্রোধী লোকে দেখি সর্ব্বলোকে পূজে॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়। ক্রোধে সর্ব্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয়॥
Alfe
তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ। রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল সৃজন॥
কোন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে। ইহলোক পরলোক অবহেলে তরে॥
সময়েতে তেজ দেখাইবে সমুচিত। ক্রোধ মহাপাপ না করিবে কদাচিত।

ক্ষমা সম ধর্ম্ম দেবী অন্য ধর্ম নয়। পূর্ব্বেতে কশ্যপ মুনি করিল নির্ণয়॥
অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাদান ধ্যান। ক্ষমাময় জনের সর্ব্বদা দীপ্তমান॥
পৃথিবী ধর্য়্যাছে দেখ ক্ষমাবন্ত জনে॥ আমা সম জন ক্ষমা ত্যজিবে কেমনে।
তে কারণে দ্রৌপদী ত্যজহ ক্রোধ মন। শত অশ্বমেধ ফল অক্রোধী যে জন॥
দুর্য্যোধন না ক্ষমিব আমি ত ক্ষমিব। এই ক্রোধে কুরুবংশ সকল মজিব॥
কুরুবংশ দেখ দেবী মম পুণ্যভার। মম ক্রোধ হৈলে বংশ হইবে সংহার॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি বুঝাইবে সভে। সভাকার দুর্য্যোধন নিন্দিবেক যবে॥
আপনার দোষে তবে হইবে সংহার। পূর্ব্বে করিয়াছি আমি এমত বিচার॥
কৃষ্ণ বলে সেই বিধাতারে নমস্কার। যেই জন হেন রূপ করিল সংসার॥
সেই যেন মত করে তেন মত হয়। মনুষ্যের শক্তি বলে কিছু সাধ্য নয়॥
যজ্ঞ দান তপ ব্রত বহু আচরিলে। দ্বিজসেবা দেবপূজা কতই করিলে।
ধিক্ ধিক্ বিধাতারে কৈল হেন নীতি। ধর্ম্ম হেতু পঞ্চ ভাই পাইল দুর্গতি।
ধর্ম হেতু সব ত্যজি আইলা বনেতে। চারি ভাই আমা সহ পারহ ত্যজিতে।
তথাপিহ ধর্ম্ম নাহি ত্যজিবা রাজন। কায়ার সহিত যেন ছায়ার গমন॥
যেই জন ধর্ম্ম রাখে তারে ধর্ম্ম রাখে। নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাস-মুখে॥
তোমারে না রাখে ধর্ম্ম কিসের কারণে। এই সে বিস্ময় বড় হয় মোর মনে॥
তোমার যতেক ধর্ম্ম বিখ্যাত সংসার। সর্ব্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার॥
লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ কনকপাত্রে ভুঞ্জে। দশ দশ সেবকী যে এক এক দ্বিজে॥
দ্বিজের সুবর্ণপাত্র দেহ আজ্ঞামাত্রে। এখন বনের ফল ভুঞ্জে বনপত্রে॥
রাজসূয় অশ্বমেধ সুবর্ণ গো সব। আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব॥
সে সব করিতে বুদ্ধি হইল তোমার। সর্ব্বস্ব হারিলা তুমি কপট পাশার॥
যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে। তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে॥
এখন সে ধর্ম্ম তুমি করিবা কেমনে। রাজ্যহীন ধনহীন বসতি কাননে॥
ধিক্ বিধাতারে এই করে হেন কর্ম্ম। দুষ্টাচার দুর্য্যোধন করিল আজন্ম॥
তাহারে নিযুক্ত যেন পৃথিবীর ভোগ। তোমারে করিল বিধি এমন সংযোগ॥
শ্রেষ্ঠ জন হীনজন দেখহ সমান। সহাস্য বদনে সদা কর নানা দান॥
যুধিষ্ঠির কহে কৃষ্ণা উত্তম কহিলে। কি কর্ম্ম করিলে দেবী ধর্ম্মেরে নিন্দিলে॥
আমি যত কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাই। যাহা করি সমর্পিয়ে ঈশ্বরের ঠাঁই॥
কর্ম্ম করি যেই জন ফলাকাঙ্ক্ষী হয়। বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয়॥
ফল লোভে ধর্ম্ম করে লুব্ধ বলি তারে। লোভে পুনঃ পুনঃ পড়ে নরক দুস্তরে॥
এই ত সংসার সিন্ধু ঊর্ম্মি কত তায়। হেলে তবে সাধুজন ধর্ম্মের নৌকায়॥
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি করে। ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে তরে॥
ধর্ম্মফল বাঞ্ছি ধর্ম্ম করি গর্ব্ব করে। ধর্ম্মেরে করিয়া নিন্দা অধর্ম্ম আচরে॥

এই সব জনগণ পশু মধ্যে গণি। বৃথা জন্ম যায় তার পায়্যা নরযোনি॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র বেদ নিন্দা করে যেই জন। তির্য্যকের মধ্যে তারে করয়ে গণন
পুনঃ পুনঃ তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম হয়। নরক হইতে তার কভু পার নয়॥
শিশু হয়ে ধর্ম্ম আচরয়ে যেই জন। বৃদ্ধের ভিতর তারে করয়ে গণন॥
প্রত্যক্ষ দেখহ কৃষ্ণা ধর্ম্ম যাহা কৈল। সপ্ত বৎসরের আয়ু মার্কণ্ডের ছিল॥
ধর্ম্মবলে সপ্তকল্পে জীয়ে মুনিরাজ। আর যত দেখ মনি ঋষির সমাজ॥
মুখে যাহা কহে, তাহা হয় ততক্ষণে। ধর্ম্মবলে ভ্রমিবারে পারে ত্রিভুবনে॥
ইন্দ্র চন্দ্র নক্ষত্র যতেক স্বর্গবাসী। ধর্ম্ম আচরিয়া সবে স্বর্গ মধ্যে বসি॥
তপ জপ যজ্ঞ দান ব্রত শিষ্টাচার। বাঞ্ছা না করিলে নাহি ফল পায় তার॥
আমারে বলিলা তুমি সদা কর ধর্ম্ম। আজন্ম আমার দেবী সহজ এ কর্ম্ম।
পূর্ব্বে সাধুগণ সব গেল যেই পথে। মোর চিত্ত বিচলিত না হয় তাহাতে।
তুমি বল বনে ধর্ম্ম করিবে কেমনে। যথা শক্তি তত আমি করিব কাননে॥
অন্য পাপ কৈলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার। ধর্ম্মনিন্দা কৈলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর
হর্ত্তা কর্ত্তা ধাতা যেই সবার ঈশ্বর। যাহার সৃজন এই যত চরাচর।
আমি কোন্ কীট তারে অমান্য করিতে। ভ্রম নাহি আমার ইহাতে কোন মতে॥

পরলোকগত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাভারতের বিশুদ্ধিসম্পাদনে, মৌলিক অস্তিত্ব সংরক্ষণে,—সবিশেষ যত্নপর হইয়াছিলেন। বহু প্রাচীন পুঁথির সাহায্যে তিনি আদিপর্ব্ব ও সভা পর্ব্বের পাঠ-শোধনও করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার পরই, তাঁহার দেহান্তর হয়। তিনি অভীপ্সিত কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এক্ষণে কলিকাতা বঙ্গবাসী আফিস হইতে কাশীদাসী মহাভারতের একখানি পরিপাটী মহাভারত ৪১ খানি হস্তলিখিত পুঁথি মিলাইয়া ১টী অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বটতলার মহাভারতের সহিত বঙ্গবাসীর কাশীদাসী মহাভারতের বিস্তর প্রভেদ,—অনেক স্থলেই ইহাতে অতিরিক্ত পাঠ সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গবাসীর কাশীদাসী মহাভারত যে সুনির্ম্মল এবং সুবিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ-মাত্র নাই।

কাশীরাম দাস স্বপ্নপর্ব্ব নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, সে গ্রন্থও ভক্তি-রস মধুর। তাহার আরম্ভ এইরূপ,—

...দ আদি ভাগবত পুরাণেতে। অন্ত মধ্যে হরিগুণ সর্ব্বত্র গীয়তে॥
...বেদেতে বটে প্রভেদ বিস্তর। কিন্তু নারায়ণ গুণ সর্ব্বত্র প্রখর॥
সেই সব বিবরিয়া বুঝহ ধীমান। হরিনামের গুণগান যাহাতে বাখান।

সর্ব্বশাস্ত্র জয়ী হরিনাম সুবিস্তার। প্রণমহ পাপহর শ্রীভাগবত সার।
যাঁর নাম শুনিলে নিষ্পাপ হয় নর। প্রকাশ করিল তাহা ব্যাস মুনিবর॥
অমল কোমল নাম ত্রৈলোক্য দুর্লভ। গীত অর্থে কহিল তাহা সুগন্ধ দুর্লভ॥
প্রস্ফুটিত ইন্দীবর সম হরিনাম। সাধুগণ মধুলোভে খুঁজে অবিরাম॥
হরিতে ভকতি সম প্রচণ্ড তপন। ভারত পঙ্কজ ফুটে যার দরশন॥
মোহিত হইয়া সাধু মনোমধুকর। ভারত পঙ্কজ মধু পীয়ে নিরন্তর॥
বিপুল বৈভব ধর্ম্ম ধ্যানেতে প্রকাশ। ভারত শ্রবণে কলি-কলুষ বিনাশ॥
সাটি লক্ষ শ্লোক ব্যাস ভারত রচিল। ত্রিশ লক্ষ শ্লোক তার দেবলোকে গেল।
সুরলোকে শুনিয়া নারদ তপোধন। ইন্দ্র আদি দেবগণে করান শ্রবণ॥
পনপন লক্ষ শ্লোক পশুগণে শুনে। দেবলোকে সুধাভাষা করিল পঠনে।
দেবলোকে পাঠ করে শুনে যক্ষ রক্ষ। মহাভারতের শ্লোক চতুর্দ্দশ লক্ষ
একলক্ষ শ্লোক প্রচারিল মর্ত্যপুরে: সংসার-সাগর পার হইবার নরে॥
এক মন হয়ে সবে দিল অনুমতি। তবে জন্মেজয় রাজা বলে মুনি প্রতি॥
জন্মেজয় রাজা বলে শুন মহামুনি। কি রূপে হইল শ্লোক কহ দেখি শুনি॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন। সংসারের সার দেখ দেব নারায়ণ॥
বৈশম্পায়ন বলে জন্মেজয় শুনে। পরম পবিত্র কথা ব্যাসের রচনে॥
চারি বেদ সর্ব্বশাস্ত্র একত্রিত কৈল। ভারত সহিত মুনি তুলেতে তুলিল॥
ভারেতে অধিক ভারি হইল ভারত। ভারত শ্রবণে হয় তরিবার পথ॥
বিবিধ পুরাণ তন্ত্র হইল প্রচার। ভক্তিমত গীতপূর্ণ হইল সংসার॥
হইল যতেক তন্ত্র পুরাণ হইতে। পদাবলি কৈল কেহ সুচরিতামৃতে॥
সুরাসুর নাগলোক এ তিন ভুবন। সংসারের মধ্যে যত হইল সৃজন॥
ভক্তিশাস্ত্র গ্রন্থ কৈল ভারত ভিতরে। ভারত শ্রবণে নিষ্পাপ হয় নরে॥
সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারত পুরাণ। দেবগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ যেমন ঈশান॥
ত্রিলোচন হৈতে শ্রেষ্ঠ ভূত ভগবান। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ ভারত আখ্যান॥
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নদ নদী যে সাগর। সকল দ্রব্যের কথা ভারত ভিতর॥
বহুকাল তপ করি ব্যাস মুনিবর। রচিল বিচিত্র শাস্ত্র ভারত অক্ষর॥
শ্লোকছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস। পয়ার করিয়া কহে কাশীরাম দাস॥

অন্যত্র,—

বৈশম্পায়ন বলে শুনহ রাজন। ব্যাসের পুরাণ অমৃতের নিকেতন॥
যদি কেহ সেই সুধা করয়ে আহার। মিহির-অঙ্গজ-ভয় নাহি থাকে।
সুধাপানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ হয়। হরিনামামৃতে ক্ষুধা বাড়ে অতিশয়।
দিনান্তরে কৃষ্ণ বলি যদি কেহ ডাকে। অন্তে বিষ্ণুদূতে স্বর্গে লয়ে যায় তাকে॥
ব্রহ্মাণ্ডেতে নাই কৃষ্ণনাম তুল্য ধন। সেই ধনে যেই ধনী সেই মহাজন॥

সর্ব্ব জীবে স্থিতি তিনি হন অনুক্ষণ। তিনিই সংসাররূপ তিনিই স্বপন।
তিনিই লোকের হস উদ্বেগ রহিত। তিনিই ভাবের ভাব তিনিই ভাবিত॥
তিনি মৎস্য কূর্ম্ম অশ্ব তিনি অজগর। স্থাবর জঙ্গম আদি তিনি চরাচর॥
তিনিই পুরুষ হন তিনিই প্রকৃতি। পাপ পুণ্য হন তিনি তিনিই নিকৃতি॥
বাক্য মন অগোচর তিনিই গোচর। ভূচর খেচর আদি তিনি জলচর॥
মুনি-হৃদয়ের ধন সেই চিন্তামণি। লীলা-হেতু কভু মূর্ত্তি ধরেন আপনি॥
সংসার-সাগর যার তরিতে বাসনা। ভজুক তাঁহার পদ কিসের ভাবনা॥
সংসার-সাগর হয় অকূল পাথার। ভয়ঙ্কর জন্তু আছে তাহার ভিতর॥
লোভাবর্ত্তে যেই জন পড়ে স্ব-ইচ্ছায়। আশাঘূর্ণে পড়ে ভ্রম-রসাতলে যায়॥
এ সাগরে কাম-কুম্ভীরেতে ধরে যায়ে। মোহ-গর্ত্তে লয়ে দুরাচারেতে সংহারে।
ক্রোধ-হাঙ্গরের মুখে পড়ে যেই জন। তাহার নিস্তার নাহি হয় কদাচন॥
মাৎসর্য্য-ভুজঙ্গ যারে করয়ে দংশন। মদ নামে কালকূটে নাশয়ে জীবন॥
অবিবেক-স্রোতেতে পড়ে যেই মহাশয়। সাঁতারে অক্ষম হায় হাবুডুবু খায়॥
যদি কোন সুচতুর চতুরালি করে। সংসার-সাগর পার হইবার তরে॥
তব হরিপদ তরি করিয়া সাধন। আশাপাশে ভক্তিপাশ করে উত্তোলন॥
গুরুপদ ভাবি গুরু কাণ্ডারি করিবে। মন-পবনের বেগে ত্বরিতে চলিবে॥
তবে নিত্যধামে সে নির্ব্বাণ পদ পাবে। ইহ পরলোকে দুঃখ অনায়াসে যাবে।
যে ভাবে তাঁহারে জীবে ভাবে নিরন্তর। সেই ভাবে পাই সেই শুন নৃপবর॥
অতএব মনোযোগে শুন স্বপ্নপর্ব্ব। অষ্টাদশ পর্ব্ব মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই পর্ব্ব॥
এ পর্ব্ব শুনিলে মুক্ত হয় জীব সর্ব্ব। কাশী বলে শুন সবে ত্যজে নিজ গর্ব্ব॥

স্বপ্ন-সংবাদ,—

ধর্ম্ম নিন্দা করিলে যাইবে অধোগতি। আর কিছু স্বপ্ন কহি শুন নরপতি॥
ঘৃত মধু তৈল যদি স্বপনে দেখিবে। কাহার হইবে মৃত্যু কে মধু খাইবে॥
স্বপনেতে যে জন শুনয়ে লোক যশঃ। ঘরে পরে কেহ কোথা হয় পরবশ॥
স্বপনেতে দেখিবে যদি পরের কুমারী। কাহার মরিবে স্বামী গলে দিয়া দড়ি॥
স্বপনে দেখিয়ে কার মলিন বদন। ঘরে কিম্বা পরে কার হইবে মরণ॥
এই স্বপন যে দেখিবে মঙ্গল কারণ। পরদিন করাইবে ব্রাহ্মণ ভোজন॥
তবে ত সেই জনের হইবেক শিব। অশিব তাহার ঘুচাইবে সদাশিব॥
কাল পাণি স্বপনেতে দেখয়ে যেই জন। কজ্জল পরিবে কেহ শুন বিবরণ।
কাশী বলে স্বপ্ন কথা না শুনিলে কাণে। যাত্রাকথা মহারাজ শুন সাবধানে॥
[illegible]র কথা শুন যাত্রার নির্ণয়। হস্তিনাতে সাজিয়াছে কুন্তীর তনয়॥
[illegible] করি যথা যাবে দেখি প্রজাপতি। প্রথম যাত্রার ভেট অমৃতের রতি॥
প্রথম যাত্রায় যদি দেখহ মাতঙ্গে। নানা ধেনু বধ পাপ নেড়ে আসি অঙ্গে॥

শুভলগ্নে স্বপ্নেতে দেখেছি নরবর। যাত্রা করি আইসে ভীম হস্তিনানগর॥
গদাবাড়ি মারি তব ভাঙ্গিবেক উরু। ভীমের সাপক্ষ আছে বাঞ্ছা কল্পতরু॥
স্বপনে তোমার যাত্রা দেখি মহাশয়। অমঙ্গল যাত্রা তব যাহাতে মরয়॥
যাত্রাকালে কর্ণে শুনি ক্রন্দনের রোল। সবে অগ্নি দিয়া মুখে বলে হরিবোল॥
এই স্বপ্ন দর্শনে শুনহ ফল তার। ত্বরায় গমন করে ধর্ম্মরাজদ্বার॥
যাত্রাকালে দক্ষিণেতে হেরয়ে ব্রাহ্মণ। সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধ তার বেদের বচন॥
যাত্রাকালে গালাগালি হুড়াহুড়ি পথে। যেই দেখে তার দেখা হয় শত্রুসাথে॥
যাত্রাকালে পঞ্চ বিপ্র দেখে সেই নর। পত্নীলাভ হয় তার শুন নৃপবর॥
যাত্রাকালে যেই জন দেখয়ে শকুনে। পিছমোড়া করি কেহ বান্ধিবে সে জনে।
প্রথমেতে যাত্রাকালে দেখে শব-মাথা। লগ্নধরে গেলে কার্য্য না হয় সর্ব্বথা॥
যাত্রাকালে ডোম চিল উড়য়ে সম্মুখ। নির্ম্মূল গমন হয় তার নাহি সুখ॥
প্রথমেতে যাত্রাকালে দেখ অগ্নিকুণ্ড। দরবারে গেলে সেই হবে লণ্ডভণ্ড॥
যাত্রায় যে জন বন্ধ্যা দেখয়ে সম্মুখে। পথে মৃত্যু হয় তার যায় যম-লোকে॥
হাচি জেঠি পড়ে আর বাধা পড়ে সদা। খালি কুম্ভ কক্ষে দেখা যাত্রাকালে বাধা॥
তব যাত্রা মহারাজ এমন বিধানে। উরু ভাঙ্গি বৃকোদর বধিবেক রণে॥
আর কিছু যাত্রা তব শুনহ রাজন। পরমায়ু শেষ তব যাত্রা অলক্ষণ॥
যাত্রাকালে অমঙ্গল হয় দুষ্টা নারী। শুন শুন মহারাজ কুরু-অধিকারি॥
অমঙ্গল তব যাত্রা স্বপনে দেখিয়া। তোমায় সে সব কহি শুন মন দিয়া॥
শুভযাত্রা করিলেন ধর্ম্ম নরবর। যাত্রা করি আসে বীর হস্তিনানগর॥
পাণ্ডবের যাত্রা তবে শুন মন দিয়া। আসিতেছে পঞ্চভাই সসৈন্যে সাজিয়া॥
পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করি আসিতেছে যুবা। বামেতে শৃগাল আর শব হয় শোভা॥
ব্রাহ্মণ বিষ্ণুরে তাঁরা করিয়া স্মরণ। বিলম্ব না করি কৈল রথ আরোহণ॥
যাত্রাকালে শঙ্খচিল যে পায় দেখিতে। কুবেরের ধন সম পাবে গমনেতে॥
যাত্রাকালে মৃগ চরে যার দক্ষিণেতে। শত্রু সনে জয় তার হয় সমরেতে॥
যাত্রাকালে দেখে যেই প্রসবিছে গাই। অমৃত ভোজন ঘরে পরেতে মিঠাই॥
যাত্রাকালে দধিমস্থ দেখে কারো হাতে। ভাগ্যক্রমে তার দেখা হয় বন্ধু-সাথে॥
যাত্রার লক্ষণ দেখি ধর্ম্ম মহাবল। আসিতেছে যুধিষ্ঠির সাজি সৈন্য দল॥
পাণ্ডবের বলিলাম যাত্রার লক্ষণ। আর কিছু স্বপ্ন বলি শুনহ রাজন॥
স্বপ্নে যদি দেখে স্ত্রী হয় রজঃস্বলা। অবশ্য জানিবে তার মরিবে অবলা॥
স্বপনেতে সেই জন করে স্ত্রী-সঙ্গম। তার পরমায়ু ক্ষয় আসি লয় যম॥
স্বপনেতে অনেক ডাকয়ে যেই জন। শত্রুর হস্তেতে সেই হইবে নিধন॥
স্বপনেতে আশীবিষ খাড়ে যদি কায়। সর্পাঘাত ঘরে কিম্বা পরে হবে॥
স্বপনেতে যেই জন দেখে গুরুমাতা। সেই দিন তাহার ভাগ্যের নাহি কথা॥

কাশীরামের অন্য দুইখানি গ্রন্থ—নলোপাখ্যান ও জলপর্ব্ব,—কিশোর বয়সের লেখা বলিয়াই অনুমিত। রচনা অনেক পরিমাণে কাঁচা।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার।

সংস্কৃত পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার,—কৃত্তিবাসের আদি রামায়ণ এবং কাশীরামের আদি মহাভারত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বহুল সংস্কৃত শব্দ-বিন্যাসে,—নিজের মনোমতরূপে গঠিত করিয়াছিলেন। বহু প্রাচীন গ্রন্থই ইঁহার হস্তে পড়িয়া, রূপান্তরিত হইয়াছে। এই কার্য্যেই ইঁহার সমধিক প্রসিদ্ধি।

যশোহর-কোটচাঁদপুরের নিকট বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে জয়গোপাল জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কেবলরাম তর্ক-পঞ্চানন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইনি হুগলী শ্রীরামপুরের খৃষ্টান পাদরী মার্সমান এবং কেরি সাহেবের পণ্ডিতপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইনি সাহিত্য-অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্তর হইয়াছে।

গদাধর দাস।

জগৎ-মঙ্গল ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। 'জগৎ-মঙ্গলে' সরল ভাষায়,—সরল কবিতায়,—সুন্দর আখ্যানে জগন্নাথদেবের মহিমা পরিকীর্ত্তিত।

গদাধর,—প্রসিদ্ধ মহাভারত-কার কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ সহোদর। পিতা,—কমলাকান্ত,—জন্মভূমি সিঙ্গিগ্রাম ত্যাগ করিয়া, জগন্নাথক্ষেত্র পুরীধামে গিয়া বাস করেন। কনিষ্ঠ পুত্র গদাধরও তাঁহার সমভিব্যাহারী হন। অতঃপর, গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ শুনুন,—

নৃসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥
জগন্নাথ সেবা বিনা নাহি জানে আন। রাজ্যে তৃণবৎ হরিকার্য্যে পণ প্রাণ।

অনেক করিল কর্ম্ম শ্রিয় জগন্নাথ। দুষ্টের দমন তেঁহ দুঃখী জনের তাত॥
পুত্র সম করে সদা প্রজার পালন। জিনিয়া চম্পক পুষ্প অঙ্গের বরণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী সাহ জাহা দিল্লীপতি। ধর্ম্মস্থারে তোষণ করিল বসুমতী॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ। মহান্ প্রতাপী হয় বৈরি জয়-যশ॥
উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর। মাধনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর॥
বিষয়ীর বাড়ী স্থিতি সেই বর স্থান। দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণ॥
শুনিয়া পুরাণ বড় ইংসা হৈল মনে। পাঁচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে॥

বাঙ্গালা ১০৫০ সালে জগৎমঙ্গল গ্রন্থ রচিত হয়। "চতুঃষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চ শত। সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত॥"

গ্রন্থারম্ভে নন্দ-নন্দন-বন্দনা ;—

"সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপ্রাণ, প্রণমহো ভগবান, শ্রীনন্দজ যোগেশ্বরেশ্বর।
অতি আদি পুরাতন, নিন্দি ইন্দু নবঘন, সদা নব যুবা মনোহর॥
তড়িত-নিন্দিত পীত, রবিরথ-সুত জিত, চিরশোভা সঘন চপলা।
প্রফুল্লিত সরসিজ, মুখশোভা কি অব্রিজ, ভালে শত সিন্দুর সকলা॥
দাক্ষায়ণী বংশধ্বংস, পুচ্ছ অংশ অবতংস, গুঞ্জা-মুক্তা-স্তবক রচিত।
সুচাচর কেশ ভাতি, মালতী মল্লিকা জাতি, গুঞ্জে চঞ্চরিক চতুর্ভিত॥
অধরোষ্ঠ বিম্বনিভ, কি তুলনা বন্ধুজীব, পীযুষাব্ধি আকার আশ্রিত।
সুললিত শুন বংশী, রামা কর্ণ-কৃচ্ছ্র-ধ্বংসী, ব্রহ্মাণ্ডের শ্রবণ মোহিত॥
দন্ত দাড়িম্বীজ ছবি, কিবা আড়ে ইন্দুরবি, কুন্দ-আভা তিমির বিধ্বংসী।
তাম্বূল চর্চ্চিত শোভা, আরক্ত জিমূত আভা, বপু তার এ চন্দ্র-বিলাসী॥
শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধাম, ত্রিজগতে অনুপাম, চিন্তামণি সুখদ সুন্দর।
তথিমধ্যে কল্পতরু, শ্রীমণিমণ্ডপ চারু, বিরাজে শ্রীব্রজেন্দ্র কোঙর॥"

নীলগিরি-মাহাত্ম্য-বর্ণন,—

"নীলগিরি প্রভুর বড়ই প্রিয়স্থান। একদিন সে স্থান না ছাড়ে ভগবান্॥
ভোগের কারণে প্রভুর ইচ্ছা হৈল মনে। দারুরূপ এই হেতু হৈলা নারায়ণে॥
যে প্রভু অসুর-ভয়ে করে প্রতিকার। পৃথিবীতে পুনঃপুনঃ করে অবতার॥
দারুমূর্ত্তি ধরি তথা রহিলেন ফিরি। একদণ্ড ছাড়িতে নারেন নীলগিরি॥
সকল ব্রহ্মাণ্ড দেখ প্রভুর নিলয়। নীলগিরিসম প্রিয় অন্য স্থান নয়॥
বৈকুণ্ঠ বলিয়া যারে কহে চারি বেদ। আমিহ ইহার নাহি জানিলাও।
আপনি কহিল হরি এই গুহ্য কথা। নীলগিরি মধ্যে আমি থাকিব সর্ব্বথা।
দেবগণে ইন্দ্র যেন নাগগণে শেষ। মনুষ্যের রাজা যেন রুদ্রেতে মহেশ।
প্রজাপতি মধ্যে ব্রহ্মা, বেদে যেন সাম। অক্ষরে ওঁকার যেন শিল, শালগ্রাম॥

ভৃণমধ্যে দুর্ব্বা যেন বৃক্ষেতে অশ্বত্থ। হয়ে উচ্চৈশ্রবা যেন গজে ঐরাবত॥
আদিত্যেতে বিষ্ণু যেন যক্ষে বৈশ্রবণ। শীতলেতে চন্দ্র যেন, জ্যোতিতে তপন॥
পক্ষীতে গরুড় যেন গাবীতে সুরভী। হ্রদেতে সমুদ্র যেন নদীতে জাহ্নবী॥
কপিমধ্যে হনুমান্ মুনিতে নারদ। রত্নগণ মধ্যে যেন মণি জাম্বুনদ॥
অঙ্গমধ্যে শির যেন পঞ্চাত্মার বাত। অস্ত্রমধ্যে বজ্র যেন ক্ষত্রে ভৃগুনাথ॥
ওষধিতে ধান্য যেন ইন্দ্রি মধ্যে মন। সমুখে ক্ষীরোদ যেন বর্ণেতে ব্রাহ্মণ।
হুতাশনে বায়ু যেন গুণে শ্রেষ্ঠ সত্ত্ব। সতী মধ্যে অরুন্ধতী, খণ্ডেতে ভারত॥
মেরুতে সুমেরু যেন সিদ্ধতে কপিল। সেইরূপ ক্ষেত্রমধ্যে গিরিরাজ নীল॥
নীলগিরি তুলনা নাহিক তিন লোকে। গুপ্তরূপে নারায়ণ সদা তথা থাকে॥
অবসর স্থানে লোক কষ্ট তপ করে। কদাচিৎ দেখিতে না পায় গদাধরে॥
একাদশী চান্দ্রায়ণ আদি যত ব্রত। অশ্বমেধ বাজপেয় পৌণ্ডবাদি যত॥
অনাহার পঞ্চাগ্নি তপস্যা উর্দ্ধ পায়। উর্দ্ধ বাহু সদা মন জপয় সদায়॥
এ সকল কর্ম্মে যেই ফল নাহি লভে। নীলগিরি মধ্যে গিয়া সেই ফল সেবে॥
এ সকল কর্ম্মে লোক যথা নাহি যায়। নীলগিরি গেলে তাহা লভএ হেলায়॥ *

ক্ষমানন্দ ও কেতকা দাস।

মনসার মাহাত্ম্যময়-"মনসার ভাসান" ক্ষমানন্দ দাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থ-প্রণয়নে ক্ষমানন্দ,—কেতকা দাসের সাহায্য গ্রহণ করেন। অদ্যাপি পল্লীগ্রামে ঢক্কাবাদ্য সহকারে এই মনসার ভাসান গীত হইয়া থাকে।

ক্ষমানন্দ দাস সম্ভবতঃ বর্দ্ধমানজেলাবাসী; বর্দ্ধমান জেলার বহু গ্রামের নাম মনসার ভাসানে সন্নিবিষ্ট। ইহার অনেক গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান। সতী বেহুলা—পতি নখিন্দরের শব,—কলার মান্দাসে চাপাইয়া,—গাঙ্গুড়ের জল বাহিয়া প্রথমতঃ এই সকল গ্রাম অতিক্রম করেন: —চাঁপাতলা, ডুবরাজপুর, নবখণ্ড; ইহারই পর বেহুলা বাঁকা দামোদর, বাঁকা নদীতে গিয়া পড়েন;—বাঁকার তীরবর্ত্তী যে সকল গ্রামের কথা মনসার ভাসানে দেখিতে পাই—তাহা এই,—পঝাটি, গোবিন্দপুর বর্দ্ধমান, গঙ্গাপুর (বর্ত্তমান গাংপুর), দেপুর, কেয়ুয়া, আদমপুর,

গোদাঘাট, নারিকেল ডাঙ্গা,—বৈদ্যপুর পিঁড়াতলী, গহরপুর,—অতঃপর ত্রিবেণী। ইহার ভিতর শেষোক্ত কয়েকখানি গ্রাম হুগলী জেলার অন্তর্গত। বৈদ্যপুর অদ্যাপি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম। পিঁড়াতলী হুগলী জেলায় ভাস্তাড়ায় নিকটবর্ত্তী। পিঁড়াতলী গ্রামের দক্ষিণ দিক বহিয়া বাঁকা নদীর ন্যায় একটী ক্ষুদ্র-পরিসর নদী ক্ষীণ ধারে প্রবাহিত রহিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলায় মেমারির নিকট "কেজ্যা" বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। এখনও সে অঞ্চলের লোকে বলিয়া থাকে, বেহুলা,—নখিন্দরকে লইয়া এই স্থানের নিকট দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিলেন। গ্রামের একজন লোক জিজ্ঞাসা করেন,—"কে যায়?" ইহাতেই গ্রামের কেজ্যা নামের উৎপত্তি। বৈদ্যপুর, নারিকেলডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম-তলবাহিনী ক্ষুদ্র নদীটী অদ্যাপি বেহুলা নদী নামে পরিচিত। বর্দ্ধমানের ন্যূনাধিক ষোল ক্রোশ পশ্চিমে চাম্পাই নগর গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রাম সন্নিধানে একটী মৃৎস্তূপ রহিয়াছে। লোকে বলে, এই স্থানেই নখিন্দরের জন্য লোহার বাসর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

শুধু ইহাই নহে, বেহুলা নখিন্দরের বিবাহে যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি এবং স্ত্রী-আচার প্রভৃতি মনসার ভাসানে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বর্দ্ধমান এবং হুগলী জেলাতেই সমাধিক প্রচলিত। দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"বরযাত্র কন্যাযাত্র করে তাড়াতাড়ি। কোন্দল করিয়া পথে নিভায় দেউড়ি।
আমলা ফেলিয়া মারে গুড় ও চাউলি। জামাতা দেখিয়া সায় বেণে কুতূহলী।
যত বণিকের বালা বয়সে নবীন। বেহুলার রূপ বেশ করে সর্ব্বজন॥
হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়। নারায়ণ তৈল দিল বেহুলার মাথায়॥"

অপিচ,—

"বেহুলা নখিন্দরে, সূত্র বাঁধে করে, সঘনে পড়ে জয়ধ্বনি।
বাজে তবলা দণ্ডা, মৃদঙ্গ শঙ্খঘণ্টা, হরিষ শুনিয়া বাজনী॥
বেহুলা সুন্দরী, মঙ্গল হাঁড়ি ভরি, নখাই ডাকে সপ্তবার।
হাজার বাজনা, নাহিক গণনা, আনন্দ হৈল সবাকার॥
মঙ্গল হরষিতে, বরণ করিতে, লইয়া বরণ-ডালা।
সুগন্ধি চন্দন, অনেক আয়োজন, বরণ করিতে গেলা॥
প্রথমে গিয়া তথা, দেখিল জামাতা, পরেতে বরে দিল পান।
চরণে দধি ঢালি, দিলেক অঞ্জলি, মাণিক অঙ্গুরী করে দান॥"

আরও শুনুন,—

ঘটক ঠাকুর,—নখিন্দরের সম্বন্ধ করিবার জন্য নিছনি নগরে সায় বেণের বাড়ী গিয়েছে। তখন ঘটক ঠাকুরকে,—

বসিতে আসন দিল জল আর পিঁড়ি।"

ক্ষেমানন্দ দাস যে বর্দ্ধমান বা হুগলী জেলারই অধিবাসী ছিলেন, ইহাই আমাদের নিঃসংশয় ধারণা।

এ সম্বন্ধে ১২৯৬ সালে ফাল্গুনের "ভারতী ও বালকে" বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন,—

"মনসার ভাসানে গ্রাম্য কথার কিছু প্রাদুর্ভাব। অর্থ বোধ সে জন্য অনেক স্থানে কষ্টসাধ্য। সকল কথা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়াও দায়। অন্যান্য প্রাচীন কাব্যে সে সকল কথা প্রায় দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ভাসানের ভাষা বাঙ্গলা দেশের কোনও বিশেষ অঞ্চল ঘেঁসা। সে কোন্ অঞ্চল, আমরা বলিতে অক্ষম। তবে গ্রন্থের মধ্যে যে সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে ভাসান রচয়িতাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ঠাহরাইয়া থাকেন। আমরাও তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাই না। সুতরাং মনসার ভাসানের গ্রাম্য কথাগুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়।"

কল্পনা ও কবিত্বে "মনসার ভাসান" একান্ত প্রশংসনীয়। সতী বেহুলা,—স্থানবিশেষে সাবিত্রী হইতেও উচ্চাসনের অধিকারিণী। দৃষ্টান্ত দেখুন,—

"গহন কাননে কোন সমাগম নাই। নিঃস্থল গভীর জল কোলেতে নখাই॥
বেহুলা ভাসেন তাহে জপিয়া মনসা। তোমার চরণ মাত্র কেবল ভরসা॥
মড়া মাংস জলে গলে বিপরীত ঘ্রাণ। চকিত চঞ্চল নহে বেহুলার প্রাণ॥
ঘ্রাণেতে দ্বিগুণ প্রেম বেহুলার বাড়ে। মড়া অঙ্গে বৈসে মাছি, ঘন ঘন তাড়ে।
দিবসে দিবসে তাহে কৃমি কীট বাছে। ঘন ঘন বৈসে ঘন মড়া অঙ্গ কাছে॥
বেহুলা খেদাড়ান যত নহে নিবারণ। পুলকে প্রবেশে তাহে মশক-নন্দন॥
গায়ের চর্ম্ম পচে তার কি কহিব কথা। মাচেশ্বর মড়া অঙ্গে পাড়িল মেচেতা॥
বেহুলা ভাঙ্গেন যত পুনরপি হয়। ঠাঁই ঠাঁই মেচেতা সকল অঙ্গময়॥

প্রভুর অঙ্গেতে মাছি করে ডিম বাসা। বেহুলা কান্দেন মনে জপিয়া মনসা॥
গলিয়া পচিয়া গেল সে তনু সুন্দর। আর কি পাইব আমি প্রভু লখিন্দর॥"

অতঃপর কবিত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন। বেহুলার রূপ বর্ণন,—

"ঘটক বলেন সাধু, তোমার পুত্রের বধূ, রূপে যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী।
দেখিনু অনেক ঠাই, তাহার তুলনা নাই, যেন লক্ষ্মী উর্ব্বশী অপ্সরী॥
বদন শারদশশী, তাহে মৃদুমন্দ হাসি, জলদনিন্দিত কেশভার।
লোটন লম্বিত পিঠে, কন্যা পতিব্রতা বটে, তুলনা দিবার নাহি আর।
গজেন্দ্রগামিনী রামা, রূপে যেন তিলোত্তমা, বেহুলা নাচনী তার নাম॥
বারো মাসে বার ব্রত, পুণ্য তীর্থ কার কত, দেব-কার্য্য করে অবিশ্রাম॥"

সুরপুরে দেবসভায় নৃত্য-নিপুণা বেহুলা,—

"ঘন ঘন তাল রাখে, অঞ্চলে বয়ান ঢাকে, হাসি হাসি বদন দেখায়॥
মুখে গায় মিষ্ট বোল, খদির কাষ্ঠের খোল, তাথই তাথই ঘন বায়॥
আগুতে পাছুতে গিয়া, নাচে ঘন পাক দিয়া, চরণেতে বাজিছে ঘুঙ্গর।
নবীন কোকিল যেন, অহরহ ঘন ঘন, মুখে গায় বচন মধুর॥
এক পাশে থাকে নেত, দেখে নৃত্য অবিরত, ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, ক্ষণে রহে উঠে বসি, যেন দেখি ইন্দ্রের নাচনী॥
করে কংস করতাল, বলে ধনী তালে তাল, কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া ইন্দ্রের কাছে, বেহুলা নাচনী নাচে, প্রাণপতি জীয়াবার কাজে॥
থেকে থেকে পদ ফেলে, মরাল গমনে চলে, মুখ যিনি পূর্ণিমার শশী।
খদির কাষ্ঠের খোল, বেহুলার মিষ্ট বোল, মোহ গেল যত স্বর্গবাসী॥"

লক্ষের ব্যজনী,—

"বেহুলা আদেশে, কামিনী হরিষে, লক্ষের ব্যজনী গড়ে।
অতি সুগঠন, কৈল বিচক্ষণ, হেরি শশী ভূমে পড়ে॥
রজত মুকুতা, প্রবালাদি গাথা, পরশ পাথর তায়।
মকরন্দ লোভে, অলিকুল সবে, সদাই গুঞ্জরে গায়॥
ব্যজনী বাতাসে, চন্দ্রিকা প্রকাশে, ত্যজিল শীতল রশ্মি।
সোনার চাটনি, সহজে আটনি, বিশ্বকর্ম্মা গড়ে বসি॥
ভাঙ্গে স্বর্ণবিন্দু, রচে বিন্দু বিন্দু, কনক কুসুম ফুল।
ভানু হেন দেখি, করে ঝিকিমিকি, কিবা দিব সমতুল॥
কনক গুণেতে, তার চারিভিতে, বিশেষ বন্ধনে বান্ধে।
ভানু পৃথিবীতে, ব্যজনী দেখিতে, ভূমে পড়ি যেন কান্দে॥

দিয়া অপরূপ সোনার বিশক, সাজে ব্যজনীর বুকে ॥
তাহে ঝলমল, রতন সকল, ভাল শোভা চারিদিকে ॥"

গোদা জেলে, মাছ ধরিতেছে—

"গলায় শঙ্খের মালা কর্ণে রাম কড়ি। আশে পাশে ফেলিয়াছে বঁড়শীর দড়ি ॥
ঘন ঘন মারে খেঁচ বড় মৎস্য উঠে ॥"

বেহুল্যার মা,—অমলা,—কন্যার নিকট "তত্ত্ব" পাঠাইয়াছে,—

"চিপিটক মুড়কী তাহে উত্তম সন্দেশ। রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ ॥
ডাগর খালের নাড়ু, চিনি-চাপা কলা।"

কবি ক্ষমানন্দের দেশে সেকালে ধক প্রচলিত ছিল। কেননা, ডোমনী বেশধারিণী বেহুলা বলিতেছেন,—

"লক্ষের ধক ঊন হইলে না দিব ব্যজনী।"

আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, মনসার ভাসান কবিত্ব-সম্পদে সমৃদ্ধ। মনসা-মহিমার কল্পনা,—লখিন্দরের পুনরুজ্জীবন কল্পনা—বাস্তবিকই বাঁকা নদীর ন্যায় পল্লীপ্রান্তরবাহিনী; গতিবিভঙ্গিনী; কিন্তু তাহা হইলেও, স্থান-বিশেষে সলিল-প্রাচুর্য্যে একান্ত সুখ-শীতলা।

কবিচন্দ্র।

"শিশুবোধকে" ইহার "দাতাকর্ণ" এবং "কলঙ্ক ভঞ্জন" বিশেষ প্রসিদ্ধ ইহার কবিতা সরস এবং ইরল।

কবিচন্দ্র,—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ সহোদর। ইহাঁর পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দেবকী। নিবাস দামুন্যা।

"দাতাকর্ণ,"—

একদিন বাসুদেব ভাবিলা অন্তরে। কর্ণ কেমন দাতা বুঝিব তাহারে ॥
যে যাহা মাগয়ে কর্ণ তাহা দেয় দান। সবে বলে দাতা নাহি কর্ণের সমান ॥
...বেন যাব আমি কর্ণের নিকটে। বুঝিব কেমন দাতা সেই বীর বটে ॥
...ই কথা মনে মনে ভাবি নারায়ণ। মায়া করি হৈল এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ ॥
অতি বৃদ্ধ রূপ হৈল দুই চক্ষু অন্ধ। কর্ণকে ছলিতে যান আপনি গোবিন্দ ॥

চলিতে শকতি নাই কাঁপে থর থর। কর্ণের নিকটে গেলা প্রভু গদাধর॥
দ্বারীকে ডাকিয়া কন প্রভু চক্রপাণি। মোর সমাচার কর্ণে জানাও আপনি॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরে দেখি ভয় হৈল চিতে। কর্ণকে চলিল দ্বারী সমাচার দিতে॥
প্রণাম করিয়া দ্বারী যোড়হস্তে কয়। দ্বারেতে দাঁড়ায়ে এক বৃদ্ধ মহাশয়॥
মোর সমাচার দেহ বলে দ্বিজবর। কর্ণকে আশীষ করি যাব আমি ঘর॥
হেন বৃদ্ধ নাহি দেখি আপনার গ্রামে। বুঝিয়া করুন কার্য্য যাহা লয় মনে॥
ব্রাহ্মণের নাম শুনি কুন্তীর নন্দন। অতি শীঘ্র আইলেন যথায় ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া কর্ণ পরম সাদরে। গলায় বসন দিয়া দণ্ডবৎ করে॥
বসিতে আসন দিয়া যোড়হস্তে কয়। কোন কার্য্যে আগমন কহ মহাশয়॥
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কর অবধান। লোকমুখে শুনি তুমি বড় পুণ্যবান॥
কলা করিয়াছি আমি ব্রত একাদশী। পারণ করাহ মোরে আছি উপবাসী॥
আর এক আছে মোর মনের বাসনা। মাংস বিনা নাহি হয় ব্রতের পারণা॥
উদর পূরিয়া মাংস করাহ ভোজন। আশীষ করিয়া আমি যাব নিকেতন॥
কর্ণ বলে দ্বিজ তুমি মন স্থির কর। আনিব প্রচুর মাংস যত খেতে পার॥
মৃগ-মাংস পক্ষী-মাংস আনিব প্রচুর। যে মাংস খাইতে পার ব্রাহ্মণ ঠাকুর॥
কবিচন্দ্র বলে কর্ণ হও সাবধান। দাতা বুঝিবারে এল প্রভু ভগবান॥
শুনিয়া হাসিয়া কর্ণে দ্বিজবর কয়। পারণ করাহ কর্ণ বিলম্ব না সয়॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর যেই আজ্ঞা কর। সেই মাংস আনি দিব তোমার গোচর॥
ব্রাহ্মণ বলেন কর্ণ কিবা দিতে পার। তবে যে কহিব আগে অঙ্গীকার কর॥
কর্ণ বলে অঙ্গীকার অন্যথা না হয়। যেই মাংস চাহ তাহা দিব মহাশয়॥
ধন্য ধন্য কর্ণ তুমি বলেন গোসাই। তোমার সমান দাতা ত্রিভুবনে নাই॥
বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন। তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন॥
স্ত্রীপুরুষ দুইজনে কাটিয়া করাতে। রন্ধন করিয়া দেহ আমার সাক্ষাতে॥
হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর। এ যশ থাকিবে তব ভুবন ভিতর॥
কাতরে কাটিয়া দিলে মাংস নাহি খাব। নরকস্থ হবে তুমি আমি ফিরে যাব॥
হেঁটমাথা কৈল কর্ণ এই কথা শুনি। সর্ব্বনাশ হইল বলি মনে মনে গুণি॥
পিতা হয়ে পুত্রে আমি কাটিব কেমনে। কলঙ্ক আমার বড় হবে ত্রিভুবনে॥
মায়া করি ছলিবারে এল কোন জন। এতদিনে বিপাকে ঠেকালে নারায়ণ॥
কর্ণ বলে দ্বিজবর বৈসহ আপনি। রাণীকে জিজ্ঞাসা করি আসিব এখনি
পদ্মাবতী নামে আছে কর্ণের রমণী। তাহার নিকটে কর্ণ গেলেন আপনি
বিরস বদন কেন পদ্মাবতী কহে। মুখে নাহি সরে বাণী চক্ষে ধারা বহে॥
কর্ণ বলে আর কিবা দেখ পদ্মাবতী। এতদিন পরে মোর হইল অখ্যাতি॥
পদ্মাবতী বলে শুনি কারণ ইহার। কি হেতু কলঙ্ক নাথ হইল তোমার॥

কর্ণ বলে পদ্মাবতী প্রাণ নাহি রয়। কহিতে পরাণ ফাটে না কহিলে নয়॥
কোথা হৈতে এল এক বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ। বড় নিদারুণ কথা কহিল সে জন।
কর্ণ বলে সেই কথা মুখে না যুয়ায়। কহিতে দারুণ কথা বুক ফেটে যায়॥
বৃষকেতু নামে আছে তোমার নন্দন। তারে কাটি দেহ মাংস করিব ভোজন।
মাতা পিতা দুইজনে কাটিবে করাতে। রন্ধন করিয়া দিবে আমার সাক্ষাতে॥
হাসিয়া কাটিবে পুত্রে না হবে কাতর। কাতরে কাটিয়া দিলে ফিরে যাব ঘর।
পদ্মাবতী বলে নাথ কি কহিব আর। এ কথা শুনিয়া বুক বিদরে আমার॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু কিছুই না জানে মা হয়ে বাছারে আমি কাটিব কেমনে॥
হস্তী ঘোড়া রথ দিব সহস্র কাঞ্চন। এ চারি ভাণ্ডারে আছে দিব যত ধন॥
আপনার প্রাণ দিব দ্বিজের সাক্ষাতে। বৃষকেতু বাছা মোর না দিব কাটিতে॥
হেন অঙ্গীকার কর কি কব তোমাকে কেমনে করাত ধরে কাটিবে বাছাকে॥
হাসিয়া বাছারে আমি কাটিব কেমনে। আপনি কাটিয়া দেহ আপনার মনে।
এমন দারুণ পণ কেহ নাহি করে। শুনিতে নিষ্ঠুর কথা পরাণ বিদরে॥
কর্ণ বলে এই কর্ম্ম যদি না করিবে। অঙ্গীকার ভঙ্গ হৈলে নরকে পড়িবে॥
কর্ণ বলে একবার দেহ অনুমতি। দাতাকর্ণ বলে নাম রাখ পদ্মাবতী॥
হেনকালে দ্বিজবর ডাক দিয়া কয়। শীঘ্র করি এস কর্ণ বিলম্ব না সয়॥
অঙ্গীকার করিয়াছ শুন কর্ণ ভাই। না পার রাখিতে তাহা ফিরে ঘরে যাই॥
এত শুনি পদ্মাবতী সকাতরে কয়। অঙ্গীকার করিয়াছ না দিলে কি হয়॥
পুত্র কাটি দিব আমি বলহ ব্রাহ্মণে। এ যশ তোমার যেন থাকে ত্রিভুবনে।
অনুমতি পেয়ে কর্ণ হাসে খল খল। দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় গোবিন্দ মঙ্গল॥

"কলঙ্ক-ভঞ্জন,"—

যশোমতী ভূমে পড়ি কান্দে উভরায়। একবার বাছাধন দেখা দেহ মায়॥
যদি নাহি দেখা দিবে ওরে যাদুমণি। তোমার অভাগী মাতা মরিবে এখনি॥
শ্রীদাম সুদাম ডাকে গরু চরাইতে। আর না সঁপিয়া দিব বলারের হাতে॥
ইহা শুনি বলরাম আছাড়িয়া পড়ে। রামরম্ভা পড়ে যেন বৈশাখের ঝড়ে॥
জটিলার ভয়ে রাধা কান্দিতে না পারে। মুখে বাক্য নাহি সরে পরাণ বিদরে॥
রাধা বলে কলঙ্ক লাগিয়া ডরাইনু। এ কূল ও কূল আমি দুকূল হারানু॥
কলঙ্কিনী নাম হবে তাহে না ডরাই। এই দুঃখ বড় মনে ছাড়িল কানাই॥
প্রাণনাথ ছেড়ে গেল গলে পদ দিয়া। কৃষ্ণ সঙ্গে যাক প্রাণ কি কাজ বাঁচিয়া॥
কৃষ্ণধন চেয়ে রাধা করেন রোদন। রাধার ক্রন্দনে ব্যাকুলিত নারায়ণ॥
ঋষি তার শিরোমণি প্রভু গুণধাম। চিকিৎসক মূর্ত্তি হইলেন অনুপাম॥
একমূর্ত্তি যশোদার কোলে বৈসে থাকে। আর এক মূর্ত্তি হয়ে যশোদাকে ডাকে।
কহ কহ যশোমতী কিসের ক্রন্দন। তব পুত্র মোর মিত্র আছয়ে কেমন॥

রাণী বলে কোথা থাক চিনিতে না পারি। বৈদ্য বলে চিন নাই নাম মোর হরি॥
পীড়া শুনি আইলাম তোমার মন্দিরে। চিন্তা নাই তব পুত্র সারিবে অচিরে॥
ইহা শুনি যশোদা আসন দিল আনি। বৈদ্যবেশে আসনে বসিল চক্রপাণি॥
আসনে বসিয়া বলে তব পুত্র আন। রাধিকার কোলে দেহ মোর বাক্য শুন॥
যশোমতী কৃষ্ণ দিল রাধিকার কোলে। রাধা কোলে কৈল কৃষ্ণ কবিচন্দ্র বলে॥
যশোমতী বলে বৈদ্য বল কিবা চাই। কি ঔষধ দিলে মোর বাঁচিবে কানাই॥
বৈদ্য বলে ব্যাধি বড় জানিনু অন্তরে। নূতন কলসী এক আনহ সত্বরে॥
যশোমতী কলসী আনিয়া বৈদ্যে দিল। সহস্রেক ছিদ্র সেই ঘটেতে করিল॥
বৈদ্য বলে মম বাক্য শুন যশোমতী পতিব্রতা নারী এক ডাক শীঘ্রগতি।
যশোদা বলেন সবে মোর মাথা খাও ছিদ্র ঘটে জল আনি গোপালে বাঁচাও॥
সবে বলে পতিব্রতা দুই জন আছে। জটিলা কুটিলা গেলে তব পুত্র বাঁচে।
জটিলার পায়ে ধরি বলে নন্দরাণী। তুমি যদি জল আন বাঁচে নীলমণি॥
জটিলার দয়া হৈল কন্যা পাঠাইল। কুটিলা কলসী লয়ে মুচকি হাসিল॥
এত লোক থাকিতে আমারে সবে বলে। আমার সমান সতী নাহি ভূমণ্ডলে॥
সর্ব্বজনে নিন্দা করি যমুনা যাইল। অহঙ্কারে পূর্ণ হয়ে কুম্ভ ডুবাইল॥
কক্ষেতে করিয়া কুম্ভ অতি বেগে চলে। একপদ না বাড়াতে জল পড়ে জলে॥
পথে যেতে মনে মনে ভাবিতে লাগিল। অজ্ঞান সময়ে মোর দোষ বুঝি ছিল॥
কলসী লইয়া যশোদার ঠাঁই দিল। জল শূন্য দেখি কুম্ভ ভাবিত হইল॥
কেহ বলে ও মাগীকে ভাল জ্ঞান ছিল। কেহ বলে দূর কর বড় দেমাইল॥
কেহ বলে সর্ব্বজন মোর বাক্য ধর। মিছা অসতীরে বলে মুখ নষ্ট কর॥
এত শুনি জটিলা কলসী লয়ে যায়। হরিষে বিষাদ হ'য়ে কলসী ডুবায়॥
আমি সতী বলি বুড়ি কলসী তুলিল। কলসীর জলে তার বসন ভিজিল॥
শূন্য কুম্ভ আনি দিল বৈদ্য দেয় গালি। কলসীটী নয় এই কলঙ্কের ডালি॥
অহঙ্কার চূর্ণ হৈল নাহি সরে বাণী। যশোমতী বলে তবে আমি জল আনি॥"

দুঃখী শ্যাম দাস।



শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলাময়,—নানা-ছন্দ-বিচিত্র "গোবিন্দ মঙ্গল" ইঁহার উত্তম গ্রন্থ। প্রধানতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ সঙ্কলনে গোবিন্দ মঙ্গল বিরচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম, দ্বিতীয়, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধেরও অংশ-বিশেষ ইহাতে গৃহীত। প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ-মঙ্গল লিখিত হইয়াছে।

দুঃখী শ্যামের নিবাস,—বর্ত্তমান মেদিনীপুরের প্রায় আট ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী হরিহরপুর নামক গ্রাম। দুঃখী শ্যাম,—দে-বংশীয় কায়স্থ। ইঁহার পিতার নাম শ্রীমুখ,—মাতার নাম ভবানী। উপাধি অধিকারী। গোবিন্দমঙ্গল গ্রন্থে দুঃখী শ্যাম,—দাস শব্দেই পরিচিত। দুঃখী শ্যাম স্বয়ং এই গ্রন্থ মেদিনীপুরের বহু স্থানে গান করিয়া বেড়াইতেন। ফলে তিনি বহু সম্ভ্রান্ত জমিদারের অনুগ্রহ-ভাজন হন। ইহাতে তিনি কিছু নিষ্কর ভূমিও বৃত্তিস্বরূপ পাইয়াছিলেন। ভক্ত দুঃখী দাস,—গোবিন্দ-মঙ্গল গ্রন্থকে ফুল চন্দন সহকারে পূজা করিতেন। অদ্যাপি তাঁহার বাটীতে এ গ্রন্থে ভক্তি-নিষ্ঠায় পূজিত হইয়া আসিতেছে।

গোবিন্দ-মঙ্গলের বর্ণনা প্রাঞ্জল; কবিত্ব মধুর। দুই এক স্থানের পরিচয় লউন,—শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-বিহার,—

"দিনে দিনে বাড়ে হরি, কোটি কাম নিন্দা করি, দুই ভাই ভুবন পাবন।
ব্রজ শিশু সঙ্গে লৈয়া, নিত্য বৃন্দাবনে গিয়া, ক্রীড়া করে লইয়া গোধন॥
ত্রৈলোক্য বিচিত্র ধাম, ধন্য বৃন্দাবন নাম, সুরতরু সুশীতল ছায়া।
প্রভু পদরেণু আশে, দেবতা মানব বৈসে, জন্মিল সে তরুলতা হৈয়া॥
নানা তরু মিষ্ট ফল, সুগন্ধি শীতল জল, কোকিল কাহল পূরে তান।
মধ্যে নদী কালিন্দিনী, অমৃত অধিক পানী, দুই তট কাঞ্চন নির্ম্মাণ।
ফল ফুল মনোহর, মকরন্দে মধুকর, নানা রূপ দেখি জলচর।
কুহু শব্দময়, মলয়া পবন বয়, জলস্থল দেখিতে সুন্দর।
সেই বৃন্দাবন মাঝে, অখিল ভুবন-রাজে, ধেনু রাখে বালক সংহতি।
কি দিব অঙ্গের শোভা, রমণীর মনোলোভা, কটাক্ষে কাতর রতিপতি।

কেহ ধায় কৃষ্ণ সঙ্গে, কেহ বেণু বায় রঙ্গে, কেহ নাচে কেহ গীত গায়।
কেহ দেয় করতালি, কেহ ডাকে ভালি ভালি, কেহ মল্ল বেশ ধরি ধায়॥
কোকিলের রব শুনি, কোন শিশু তাহা গণি, কেহ তুরঙ্গম রব পূরে।
কেহ দেয় সিংহ রড়ি, কিরায় পাঁচনী বাড়ী, কেহ হংস গতি চলে ধীরে॥"

শ্রীকৃষ্ণের রূপ,—

"একদিন নটবর বেশে বনমালী। নবরঙ্গে ত্রিভঙ্গ কদম্বে অঙ্গ হেলি॥
বামে বিনোদিয়া চূড়া টাননি কপালে। বরহা চন্দ্রিকা শোভা নানা রঙ্গ ফুলে॥
মধুরসে উড়ি পড়ে মত্ত অলিকুল। কস্তূরী তিলক চারু অলকা অমূল॥
ভুরু ফুলধনু জিনি, বঙ্কিম বয়ান। অঞ্জন রঞ্জন আঁখি ঠারে পঞ্চ বাণ॥
নাসাপুটে গজমতি করে ঢল ঢল। কত কলানিধি নিন্দে শ্রীমুখ মণ্ডল॥
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ জিনিয়া বাঁধুলি। অল্প অল্প হাসি যেন পড়িছে বিজুলি॥
কুণ্ডল কেয়ুর হার গলে দোলে মণি। অতসী কুসুম জিনি শ্যাম তনু খানি॥"

শ্রীরাধিকা,—

"রাই মুখ মনোহর দিতে নাই সীমা। বেদ ভেদে বিধি যার না পায় মহিমা॥
কাঁচা সোণা জিনি তনু, পরে নীল বাস। কমল বদন চারু মন্দ মন্দ হাস॥
বিমল বদনী ধনী খঞ্জন নয়নী। মরাল-মন্থর-গতি মাঝা সিংহ জিনি॥

মিলনের ভাবটী কেমন সুন্দর,—

"রাধা কানু আঁখি আঁখি হৈল দরশন। মুখে মৃদু হাসি রাধা ঝাঁপিল বসন॥"

রাধাকৃষ্ণের রাস বিহার,—

"কালিন্দী কিনারে চারু, কদম্ব কল্পতরু, মণিময় মণ্ডপের মাঝে।
দিব্য চিন্তামণি স্থানে, রত্ন রাজসিংহাসনে, কিশোর কিশোরী সঙ্গে সাজে॥
পরিহাস রঙ্গরসে, পিরীতি-সাগরে ভাসে, আরতি প্রেমের ওর নাই।
শ্যাম,—গৌর অঙ্গে মেলি, বিলাসে বিবিধ কেলি, ধন্য ধন্য রাধিকা কানাই॥
নয়নে নয়নে রস, বদনে বিলসে হাস, অভেদে মিলন দুইজনে।
যত সব প্রিয় সখী, শ্যাম সঙ্গে সুকৌতুকী, বিবিধ মঙ্গল গীত গানে॥
কেহ দেয় করতালি, কেহ ডাকে ভালি ভালি, বৃন্দাবনে নাগরী বাজায়।
তারক মণ্ডল মাঝে, পূর্ণ শশধর সাজে, একা কানু প্রাণ সবাকায়॥
রাই-কর ধরি করে, নাচি যায় ধীরে ধীরে, অলসে হেলিয়া দুই অঙ্গে।
চলিতে বিনোদ রায়, সুস্বরে সঙ্গীত গায়, কেহ বীণা যন্ত্র ধরে রঙ্গে॥
শ্যামের সম্পদ রাধা, মরমে মরমে বাঁধা, একা প্রাণ যুগল মুরতি।
মৃদঙ্গ মন্দিরা যন্ত্র, উপাঙ্গ বিবিধ তন্ত্র, শ্রুতি ধরে বরজ যুবতী॥"

"মধুর-রস" বর্ণনে দুঃখীশ্যাম যেমন সিদ্ধহস্ত, করুণ-রস বর্ণনেও তেমনি সুনিপুণ। শ্যামচাঁদ ব্রজ ছাড়িয়াছেন, মথুরায় রাজা হইয়াছেন। বহু দিনের পর ব্রজের শ্রীদাম সুদামের কথা,—নন্দ যশোদার কথা, বিরহিনী শ্রীরাধিকার কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছে। ব্রজের সংবাদ লইবার জন্য ব্রজেশ্বর উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইলেন। বিরহ-বিশীর্ণা রাই,—কাঁদিয়া কাঁদিয়া উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"কি লাগিয়া মোরে মনে করিবে কানাই। আর কে বা বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাই॥
নয়ন নিমিষে কত যুগ বহি যায়। অবিচ্ছেদ পিরীতি এমন দুঃখ তায়।
তার লাগি জাতি কুল দিনু জলাঞ্জলি। এবে প্রভু বিস্মরণ রাধা চন্দ্রাবলী॥
তার লাগি তেয়াগিনু কুল ভয়লাজ। ভাবে বশ হইয়া ভজিনু ব্রজরাজ॥
রাধার বল্লভ কৃষ্ণ ঘোষে জগজনে। আমার জীবন কৃষ্ণ কেবা নাহি জানে:
সারী শুক ডাকে ডালে, সুস্বর কোকিল কুলে, সদাই সুখদ বৃন্দাবনে।
সে সব কৌতুক খেলা, সমাধান দিয়া গেলা, স্মঙরিতে শোক সর্ব্বক্ষণ॥
সে হরি সবার প্রাণ, সখা সে "ভগবান, সাবধি নাহিক শ্যাম বিনে।
স্রোতের শিউলী যেন, সঘনে চঞ্চল মন, সমাধি লাগিল রাত্তি দিনে॥"

শ্রীরাধিকা আরও বলিতেছেন,—

"পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে। পাতিয়া পঙ্কজ পত্র শুতি মহীতলে॥
প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি। প্রতিবোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী।
উদ্ধব পিয়া গুণনিধি। পাইনু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি॥
"মাঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণি-মন্দিরে। মহারঙ্গে রমিব মানস নিরন্তরে॥
মাধবী মল্লিকা লতা কুঞ্জের ভিতরে। মনে না জানিল হরি যাবে মধুপুরে॥
উদ্ধব! মরি হে ঝুরিয়া। মনে করি মরিব মাধব স্মঙরিয়া॥
"ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে। ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে॥
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়। ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গায়॥
উদ্ধব! ফাটিয়া যায় হিয়া। ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া॥
"চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু। চেতন না রহে অঙ্গ, না দেখিয়া বঁধু॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায়। চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব! চিত্ত ছল ছল করে। চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥

পয়ার, দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, একাবলী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে "গোবিন্দ-মঙ্গল" অলঙ্কৃত।

ইনি শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া, মূল শ্রীমদ্ভাগবত অতি সহজ ভাষায় পদ্যানুবাদ করেন। কলিকাতা বঙ্গবাসী অফিসে ১ম ও ২য় স্কন্ধ পদ্য ভাগবত ছাপা হয়। মেদিনীপুর জেলা-নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় ইহার সম্পাদন করেন।

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইহার গ্রন্থ,—দুর্গামঙ্গল। প্রধানতঃ মহাভারতোক্ত নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান লইয়া এই গ্রন্থ বিরচিত।

২৪পরগণার অন্তর্গত হরিনাভি ইহাঁর জন্মস্থান। পিতামহের নাম—গোপাল মুখোপাধ্যায়, পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়। রামধনের চারি পুত্র,—রামচন্দ্রই জ্যেষ্ঠ। রামচন্দ্র আরও কয়েক খানি গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে গৌরীবিলাস এবং মাধব-মালতী প্রধান। ইহাঁর কোন জমিদার শিষ্যের অর্থ-সাহায্যে এই সকল পুস্তক যাত্রাকারে গীত হইত। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে গোবিন্দ মঙ্গল গ্রন্থ রচিত হয়।

স্থানে স্থানে দুর্গা-মঙ্গলের কবিত্ব অতি মধুর। যথা,—

"একদিন সখী সঙ্গে, দময়ন্তী মন-রঙ্গে, পুষ্প বনে করিল প্রবেশ।
স্তবকে স্তবকে ফুল, ভ্রমে গন্ধে অলিকুল, গন্ধবহ গমন বিশেষ॥
পাতিয়া অঞ্চল পাতি, তুলে পুষ্প নানা জাতি, কেহ দিল খোঁপায় চম্পক।
বকুল কুসুমে মালা, গাথে হার কোন বালা, কোন সখী তুলিল অশোক॥
কোন সখী গিয়া তুলে, মল্লিকা মালতী ফুলে, হার গাথি পরিল গলায়।
কোন সখী হার নিল, দময়ন্তী গলে দিল, কোন সখী সখীরে সাজায়॥"

স্বয়ম্বর সভায় নল,—

"সভা মধ্যে আসিয়া বসিল গুণাকর। তারকার মাঝে যেন শোভে শশধর॥
পতঙ্গ উদয়ে যেন পতঙ্গ লুকায়। গরুত্মান মাঝে গরুত্মান শোভা পায়॥
গর্দ্দভ নিকটে যেন তুরঙ্গের শোভা। মক্ষিকা নিকটে যেন গুঞ্জে মধুলোভা॥
চাতারিয়া মাঝে যেন খঞ্জনের নৃত্য। প্রভুর অগ্রেতে যেন শোভা পায় ভৃত্য।
খদ্যোতের তেজ লুপ্ত যেন দিবাভাগে। কুরঙ্গের রঙ্গ ভঙ্গ কুকুরের আগে॥
নলের তেজেতে সব হইল বিবর্ণ। রাঙ্গ মাঝে রূপা যেন পিতলে সুবর্ণ॥

কাচ মাঝে হীরা যেন স্ফটিক মুকুতা। শেকুল কণ্টক মাঝে মালতীর লতা॥
সায়েদের শোভা ক্রৌঞ্চ কুমুদের মাঝে। রাজহংস শোভা পায় কদম্ব সমাজে॥
হেন্তাল কানন মাঝে শোভে নারিকেল। গাবের নিকটে যেন শোভা পায় বেল॥
গ্রহরূপ সভা মাঝে শোভা পায় নল। রামচন্দ্র কহে দুর্গা পদে দেহ স্থল॥"

বিবাহান্তে বাসর ঘরে নল,—

"আপনি রসিক নল তাহে রসকূপ। রসিকা সহিত রসে ভাসে নলভূপ॥
রসিকা রমণী মেলি কেহ ধরে ঝুঁটি। কোন কোন সহচরী দিল কাণলুটি॥
কর্পূর লবঙ্গ সহ তাম্বুল পুরিয়া। কোন সখী নল করে দিলেক তুলিয়া॥
রমণী যুবতী যত রসিকা সাগর। নলরাজা রসে ভাসে বিবাহ বাসর॥

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

গঙ্গা-ভক্তি-তরঙ্গিণী,—ইহাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ। গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। বর্ণনা প্রাঞ্জল।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী উলা গ্রামে ইহাঁর জন্ম। পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায়। প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিস্তর গ্রাম-নগরাদির বিবরণ ইহাতে সন্নিবিষ্ট।

নারীগণের বেশ-বর্ণনাটী কেমন মনোহর,—

"চাসর চিকুর জাল চিরুণে আঁচড়ি। বিনাইয়া বাঙ্কে খোঁপা দিয়া কেশদড়ি
খোঁপায় সোণার ঝাঁপা বেণী কারো দোলে। কেহ বা পরিল সিঁথি মতি তার কোলে॥
কিবা শোভা সিন্দুর চন্দনে অতিশয়। মণিময় টীকা যেন ভানুর উদয়॥
কারো কারো ভুরু যেন কামধনু জিনি। কামের সর্ব্বস্ব ধন রয়েছে কামিনী॥
চক্ষু কারো বুঝি যেন খঞ্জনিয়া পাখী। দ্বন্দ্ব করে নাসা তিল ফুল মধ্যে রাখি॥
চেঁড়িচাপি মাকুড়ি কর্ণেতে কর্ণফুল। কেহ পরে হীরার কমল নাহি তুল॥
নাসিকাতে নথ কারো মুক্ত চুণী ভালো। লবঙ্গ বেসরে কারো মুখ করে আলো॥
কিবা গজমুক্তা কারো নাসিকার কোলে। দোলে সে অপূর্ব্ব ভাব হাসির হিল্লোলে॥
কুন্দ কলিকার মত কারো দন্ত পাতি। দাড়িম্বের বীজ মুক্তা কারো দন্ত পাতি॥
[illegible]ত মাঞ্জনে দন্ত মধ্যে কাল রেখা। মনে লয় মদনের পরিচয় রেখা॥
[illegible]খে শোভা করে কারো মন্দ মন্দ হাসি। সুধার সাগরে ঢেউ হেন মনে বাসি॥
পরিল গলায় কেহ তেনরী সোণার। মুকুতার মালা কণ্ঠমালা চন্দ্রহার॥

ধুকধুকি জড়াও পদক পরে সুখে। সোণার কঙ্কণ কারো শঙ্খের সম্মুখে॥
পতির আয়ত্তি-চিহ্ন সোহাগ যাহাতে। পরণে বাঁধান লোহা সকলের হাতে॥
পাতামল পাশুলি আনট বিছা পায়। গুজরি পঞ্চম আর শোভা কিবা তায়॥
আনন্দে বসিয়া যত রসিকা কামিনী। সুখের বাজার যেন করে বিকীকিনি॥"

"গঙ্গার ষষ্ঠী পূজায় বিধাতার আগমন"—প্রসঙ্গের এক অংশ শুনুন,—

"কপালিনী! কপালরূপিনী তুমি সার। আমি কি লিখিব মাগো কপালে তোমার॥
ব্রহ্মাণ্ড সমান যদি মস্তাধার হয়। কারণ-সলিল যদি হয় কালিময়॥
আকাশের তুল্য পত্রে যিনি চিরজীব। আশারূপ লেখনীতে লিখে সদাশিব॥
তথাপি মহিমা তব লেখা নাহি যায়। আমি কি লিখিব মাগো না দেখি উপায়॥
কোন্ খর্ব ললাটে মা! লিখিব তোমার। বর্ণময়ী তুমি মাগো! আপনি বর্ণাকার॥"

ঘনরাম চক্রবর্ত্তী।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল,—ঘনরামের সুপ্রসিদ্ধ কাব্য গ্রন্থ।

ঘনরামের নিবাস,—বর্দ্ধমান জেলায় খণ্ডঘোষ থানার অধীন কৃষ্ণপুর গ্রাম। ইঁহার প্রপিতামহের নাম পরমানন্দ চক্রবর্ত্তী; পরমানন্দের পুত্র,—ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র,—শঙ্কর ও গৌরীকান্ত। এই গৌরীকান্তই ঘনরামের পিতা;—ইঁহারা পৌষবান্‌গোত্রীয়। যথা ধর্ম্ম-মঙ্গলে,

"ঠাকুর পরমানন্দ পৌষবান বংশে। ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে॥
তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত। তাঁর সুত ঘনরাম গুরু পদাশ্রান্ত॥"

ঘনরামের জননীর নাম,—সীতা;—

"মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী-সীতা।"

ঘনরামের মাতুলালয়—বর্দ্ধমান জেলার রায়না গ্রামে। ইঁহার মাতামহের নাম দ্বিজ গঙ্গাহরি। ইঁহারা কৌকুসারী গোত্রীয়,—কুশধ্বজ-রাজবংশীয়।

১৬০১ শকে ঘনরাম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই ইঁহার বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিশেষ অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয়। ফলে, পিতা গৌরীকান্ত,—ঘনরামকে রামবাটী গ্রামস্থ ভট্টাচার্য্যমহাশয়গণের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে দেন; অধ্যয়নে ঘনরামের যথেষ্ট প্রতিভা পরিলক্ষিত হইল;

এই পাঠাবস্থাতেই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহা দেখিয়া গুরু তাঁহাকে কবিরত্ন উপাধি দেন।

ঘনরাম রামবাটী গ্রামে এইরূপ বিদ্যাভ্যাসে নিরত,—এমন সময়ে ঘনরামের পিতা কৃষ্ণপুরে তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। অবিলম্বে ঘনরামের উদ্বাহ কার্য্য সাধিত হয়। ইহার কিছুদিন পরেই ঘনরামের পিতা গৌরীকান্তের লোকান্তর ঘটে।

সংসার নির্ব্বাহের ভার এক্ষণে ঘনরামের উপরই পড়িল। তিনি চতুষ্পাঠী ছাড়িলেন,—চাকুরীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার জন্য তাঁহাকে আর অধিক দিন উদ্বিগ্ন থাকিতে হইল না। বর্দ্ধমানের তদানীন্তন মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র ঘনরামের কবিত্ব-খ্যাতির কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি ঘনরামকে বর্দ্ধমানে লইয়া গিয়া রাজ-কবি-পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঘনরামের সংসার-নির্ব্বাহ চিন্তা অপনীত হইল। রাজাদেশে তিনি শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনায় মনোযোগী হইলেন। যথা,—

"অখিলে বিখ্যাত কীর্ত্তি, মহারাজ চক্রবর্ত্তী, কীর্ত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, দ্বিজ ঘনরাম রস গান॥

১৬৩১ সাকে ঘনরাম ধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন,—

"শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর। মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
শুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি। যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥"

বর্দ্ধমান অবস্থান কালেই ঘনরাম পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ হইলে ঘনরাম কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রয় ছাড়িয়া স্বগ্রামে আসেন,—এবং ধর্ম্ম-মহিমা কীর্ত্তনে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

ঘনরাম একান্ত বিশুদ্ধ চরিত্র ছিলেন। যিনি একবার তাঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তিনিই তাঁহার সরস-মিষ্ট ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তিনি কথায় কথায় লোককে হাসাইতেন; যমক অনুপ্রাসও তিনি সাধারণ কথায় অনেক সময়েই ব্যবহার করিতেন। ইনি বড়ই মধুর-কণ্ঠ সুগায়ক ছিলেন।

ঘনরামের চারি পুত্র,—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ এবং

রামকৃষ্ণ। ইঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি কৃষ্ণপুরেই বিদ্যমান। ঘনরামের তৃতীয় পুত্র রামগোবিন্দের হস্তলিখিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল পুঁথি এখনও ইঁহাদের নিজ বাটীতে সযত্নে সুরক্ষিত। ঘনরামের চতুর্থপুত্র রামকৃষ্ণ ধর্ম্মমঙ্গল গান করিতেন।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যে বহুস্থলে আদ্যচরণ অপেক্ষা শেষ চরণেই যমক-অনুপ্রাসাদির আড়ম্বর অধিক। এই জন্য প্রবাদ এইরূপ,—রণরাম নামক ঘনরামের একজন অন্তরঙ্গ আদ্যচরণ লিখিতেন,—আর ঘনরাম স্বয়ং শেষ চরণ লিখিয়া, শ্লোক পূর্ণ করিয়া দিতেন। ঘনরাম একদা অনুপস্থিত; রণরাম নিজে দুই ছত্রই লিখিলেন;—

"টোপর মাথায় দিয়ে বসিল দম্পতি। হেনকালে মাহুত যোগায় লয়ে হাতী॥"

ঘনরাম আসিয়া শেষ ছত্র পরিবর্ত্তন করিয়া লিখিলেন,—

"যতনে কৌতুক দেয় যতেক যুবতী।"

প্রবাদ যাহাই হউক, যিনি মনোযোগ পূর্ব্বক ধর্ম্মমঙ্গল পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন,—এ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত—সর্ব্বাংশই—ঘনরামের অক্ষয়-তুলিকা-চিত্রিত।

ঘনরামের ন্যায়,—রূপরাম চক্রবর্ত্তীও ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। ঘনরামের নিবাস,—ঘনরামের জন্মস্থান,—কৃষ্ণপুরেরই নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর। বর্দ্ধমান জেলার দেনুড় গ্রামের নিকটবর্ত্তী কুয়াড়া গ্রামে অদ্যাপি রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল সংরক্ষিত আছে। ইহা চব্বিশ পালায় সম্পূর্ণ। কিন্তু ধর্ম্মমঙ্গল রচনায় ময়ুরভট্টই অগ্রণী;—কেননা, ঘনরাম এবং রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে ময়ুরভট্টের পথানুবর্ত্তিতার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

"ময়ুরভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আদ্য কবি।"

অপিচ,—

"হাকন্দ পুরাণ মতে, ময়ুরভট্টের পথে, জ্ঞান-গম্য শ্রীধর্ম্ম সভায়।"

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলে,—

"শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়। ময়ুর-ভট্ট বন্দি দ্বিজ রূপরাম গায়॥"

ইঁহাদের ধর্ম্মমঙ্গল অপেক্ষা,—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলই কিন্তু সর্ব্বাংশে

বরণীয়। ইহা চব্বিশ পালায় বিভক্ত। বঙ্গের কোন বিলক্ষণ সমালোচক ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতেই সংক্ষেপে এ কাব্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় সন্নিবিষ্ট। এই সমালোচনার একাংশ এইরূপ,—"শ্রীধর্ম্ম মঙ্গলের ন্যায় মৌলিক মহাকাব্য বঙ্গের ভাষা-ভাণ্ডারে আর কি আছে? কাব্যের গল্প উপকথা নহে, আকাশকুসুম নহে, মস্তিষ্কের বিকৃতি নহে,—বাস্তব ঘটনা এ কাব্যের একাংশীভূত। * * বঙ্গদেশ যখন স্বাধীন ছিল,—পালবংশীয় রাজগণ যখন গৌড়ের সিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, যখন বাঙ্গালী বীরের পদভরে বঙ্গভূমি কাঁপিত,—সেই সময়—বঙ্গের সেই শুভ সময়—এ কাব্যের উৎপত্তি-কাল। দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপে গৌড়েশ্বর বঙ্গভূমি শাসন করিতেছেন, যমদূত সদৃশ নবলক্ষসেনা বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে বিভূষিত হইয়া বীরদর্পে হুঙ্কার রবে পৃথিবী কম্পিত করিতেছে; এমন সময়ে অজয়নদ-তীরবর্ত্তী ঢেকুর রাজ্যের অধীশ্বর ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হইল, গৌড়ের ভূপতিকে আর কর দেয় না, তাঁহার হুকুম মানে না। গৌড়েশ্বরের সহিত ইছাই ঘোষের যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু বঙ্গের ভূপতি এ মহাযুদ্ধে পরাজিত হইয়া, গৌড়ে পলায়ন করিলেন,—ইছাইঘোষের জয় জয়কার হইল। কাব্যের প্রারম্ভেই এই দৃশ্য; এ ঘটনাই এই কাব্যের মূলসূত্র। গৌড় নগরের ভূপতির মরমে শেল বিঁধিয়া রহিল,—একজন সামান্য রাজার নিকট গৌড়েশ্বরের পরাজয়, এ অপমান তাঁহার সহ্য হইল না,—কিরূপে ইছাই রাজ উচ্ছিন্ন যায়, ইহাই তিনি ভাবিতে লাগিলেন।

"ইছাই,—মহাশক্তি ভগবতীর সেবক; প্রচণ্ড গোঁয়ার, দুর্দ্ধর্ষ। এমন সময় ধরাধামে ধর্ম্মের অবতার, শান্তমূর্ত্তি, রণনিপুণ, অমিত-সাহসী লাউসেন জন্ম গ্রহণ করিলেন। লাউসেনের,—গৌড়েশ্বরের শ্যালিকাপুত্র লাউসেনের,—ভুজবীর্য্য বুদ্ধি-বিদ্যা দেখিয়া ভূপতি ভাবিলেন, এই বীরবরের দ্বারাই আমার কার্য্যোদ্ধার হইবে—ইহারই হস্তে ইছাইঘোষের বধ সাধন হইবে। লাউসেন, রাজার বড় প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজমন্ত্রী মহাদ, সেনের উপর নৃপতির ভালবাসা দেখিয়া ভাবিল, এই লাউসেনই আমার সর্ব্বনাশ করিবে,—সম্ভবত শেষে মন্ত্রিত্ব কাড়িয়া লইবে; অতএব

কলে, কৌশলে, উপায় মন্ত্রণায়—লাউসেনের বধ-সাধন করিতে হইবে। এক দিকে ভূপতির ভালবাসা, অপর দিকে মন্ত্রী মহম্মদের বধ চেষ্টা; এক দিকে অমৃত কুণ্ড,—অপর দিকে বিষভাণ্ড;—এই সুখ-দুঃখের চক্র মধ্যে পড়িয়া, কাব্যের নায়ক বীরবর লাউসেনের চরিত্র সংগঠিত হইতে লাগিল,—বীর্য্যবহ্নির স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। এইরূপ নায়ক-উপনায়-কের ঘাত প্রতিঘাতে, ললিত গতিতে অথচ ঘোর রবে,—কুসুম-বর্ষণে অথচ তরবারির ঝঞ্ঝাঘাতে এ মহাকার্য্য চলিয়াছে,—হাস্যরসের তরঙ্গ কতবার খেলিয়াছে—তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

"মেদিনীপুরের অন্তর্গত ময়নানগরে নায়কের জন্ম; রাজবাটীর ভগ্ন-প্রাসাদ এখন স্তূপীকৃত; জঙ্গলময়; ময়নাগড়ের অস্তিত্ব এখনও রহিয়াছে। ইছাই ঘোষের রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ এখনও সেই অজয়নদের অনতি-দূরে অবস্থিত, আরাধ্যা দেবী মহামায়ায় মন্দির-চূড়া খসিয়া পড়িয়াছে, প্রস্তরময়ী কালিকা দেবীর লোল রসনা এখনও লহলহ করিতেছে—তবে এখন আর সে স্থলে মানুষ নাই,—শৃগাল, বরাহ, ভল্লুক বিচরণ করিতেছে। পণ্ডিত প্রবর হণ্টার সাহেব,—তাঁহার 'Annals of Rural Bengal' নামক পুস্তকে ইছাই ঘোষের কথা সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। আর সেই পালবংশীয় মহারাজের রত্নসিংহাসন গৌড়নগরের জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত,—আধুনিক মালদহের নিকট এই গৌড়-মহারণ্য অবস্থিত।"

এক সময়ে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল গান শুনিয়া, সহস্র সহস্র লোক পরমানন্দ লাভ করিত। সাহিত্যানুরাগীর নিকট শ্রীধর্ম্মমঙ্গল বড় আদরের সামগ্রী। বর্ণনা কি সুন্দর!—

আখড়া-পালা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি;—

"ইঙ্গিতে অম্বিকা হইল ত্রিলোক-মোহিনী। যেই বেশে মহেশে মোহিলা চক্রপাণি॥
কামরূপ, দেখিয়া কামিনী-রূপছটা। বিগলিত বাঘছাল ভূমে লোটে জটা॥
ধর্ ধর্ বলিতে মোহিনী দিল ধাই। খসিল অক্ষয় তেজ লজ্জিত শিবাই
হৈমবতী হইল হেন মোহিনীর বেশ। দেখে শূন্যে ত্রাসযুক্ত যত ত্রিদিবেশ॥
রতনে রঞ্জিত যত পদাঙ্গুলি সব। রাজহংস জিনি ধ্বনি নূপুরের রব॥
রাম-রম্ভা জিনি উরু গুরু আনিতম্ব। যেরূপ শুনিয়া মতি মজাইল শুম্ভ॥

মৃগরাজ জিনি মাঝ ত্রিবলি-শোভিত। লোম-লতা-বলি-নাভি-বিবরে মণ্ডিত॥
কুচযুগ হেম-গিরি হর-মনোহর। বিচিত্র কাচলি তায় বিধি অগোচর॥
মনোহর কান্তি কিবা কত বর্ণ ভেদে। ওরূপ লাবণ্য তায় অন্ধকার খেদে॥
খঞ্জন-গঞ্জিত আঁখি অঞ্জনে রঞ্জিত। কিঞ্চিৎ কটাক্ষে কোটী কাম বিমোহিত।
সহিত যুগল ভূরু জিনি কামধনু। কপালে সিন্দুর-বিন্দু প্রভাতের ভানু॥
চন্দন-চন্দ্রিমা-কোলে কজ্জলের বিন্দু। শ্রুযুগল উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু॥
বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভে তায় অতি। অলকা-মণ্ডিত মণি মুকুতার পাঁতি।
কবরী মণ্ডিত মালা মল্লিকার ফুল॥ মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥
পৃষ্ঠে দোলে পট্টজাত পুরটের ঝাঁপা। অনুগত কত তায় গন্ধরাজ চাঁপা॥
যাঁহার সহজ রূপে খণ্ডে অন্ধকার। সে দেবী পরেছে কত রত্ন অলঙ্কার॥
গজমতি-হার, পঁতি দোমতি তেমতি। কেয়া-পাতা গলায় গরব করে অতি॥
কর্ণপুর-কিরণে করবী-কান্তি করে। বেড়েছে নাপান বড় নাসায় বেসরে।
কনক-কঙ্কন করে শঙ্খ বাজু-বন্দ। রতন-অঙ্গুরি তায় যতন প্রবন্ধ॥
ভুজে বিরাজিত তাড় ভুবন-উজর। কটিতে কিঙ্কিনী-ধ্বনি শুনি মনোহর॥
কমলা-বিলাস বাস পরি অভিলাষে। কত খান নাপান ভুলাতে ধর্ম্মদাসে॥
সর্ব্ব গায়ে সুগন্ধি চন্দন চারু চুয়া। বসিয়া নাপান করি খান পান গুয়া।
ধর্ম্মপদ ধ্যান করি গান ঘনরাম। প্রভু পুর শ্রীরাম রামের মনস্কাম॥
লালবেশ নাপানে আপন পানে চেয়ে। মনে হলো কটাক্ষে মোহিব মাত্র যেয়ে।
কৌতুকে দেখিল কুচে কাঁচলির ছাঁদা॥ চাহিতে অচল চক্ষু চিত্ত রয় বাঁধা॥
কত চিত্র কৌশলে করেছে কত ঠাঁই। তিন লোকে তার ত তুলনা দিতে নাই॥
বর্ণভেদে বেদব্রহ্ম বুঝি মজে মন। হৈমকান্তি কৃষ্ণলীলা কাঁচলি-লিখন॥
সুদাম শ্রীদাম সঙ্গে যত ব্রজ-বাল। বিহারে বালকবেশে ব্রজের রাখাল॥
সমান বয়স বেশ বেণু লয়ে করে। অধরে অমিয়া হাঁসি শিখি-পুচ্ছ শিরে॥
যশোদা-জীবন-ধন কৃষ্ণ বলরাম। গোপ গোপী বাছুর বালক অনুপম॥
আভীর বালক মাঝে গোপাল বিজয়ী। বংস পুচ্ছ ধরি উচ্চে ডাকে হৈ হৈ।
ঐরূপে গোঠে কত গোবিন্দ বিহরে। কৃষ্ণের কৌশল-লীলা লেখা তার পরে॥
কানাই কদম্বতলে ছলে দান সাধে। বদনে বিনোদ বংশী বলে রাধে রাধে॥
ডানিভাগে নৌকাখণ্ড কানু যায় নেয়ে। বামে বস্ত্র-হরণ হরির মুখ চেয়ে॥
যমুনার জলে গোপী হ'য়ে কৃতাঞ্জলি। কদম্বের ডালে কৃষ্ণ বাজান মুরলি॥
ব্যাকুল বসন মাগে যত ব্রজাঙ্গনা। কৌতুকে কহেন কৃষ্ণ করিয়া কল্পনা॥
কুলেতে কৃতাঞ্জলি তুলি দুটি হাত। বেছে লও বসন বলেন ব্রজনাথ॥
এইরূপ কৌতুক কত কাঁচুলি প্রকাশ। কুচগিরি বেষ্টিত লিখিত পূর্ণরাস॥
কত চিত্র কল্পিত কাঙার কুঞ্জবন। রসময় মন্দির রতন-সিংহাসন॥

ছয়-ঋতু, প্রফুল্ল ফুটেছে নানাফুল। মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল॥
রসবতী রাধিকা রসিক-শিরোমণি। রাস-রসে ঢল ঢল গোবিন্দ গোপিনী॥
শ্রীরাসমণ্ডলে বসি আবেশ হইয়ে। গোপীনাথ নাচেন গোপিনী-মুখ চেয়ে॥
দুপাশে গোপীর কাঁধে দিয়া দুটি হাত। রসের আবেশে মধ্যে নাচে গোপীনাথ॥
ডমরু রবাব বীণা মুরলির তান। দোঁহে আধ-বয়ানে দোঁহার গুণ গান॥
কোকিল উগারে মধু ভ্রমরগুঞ্জরে। ময়ুর ময়ুরী নৃত্য-মহোৎসব করে॥
ডালে বসে ডাকে শুক প্রেমে পুলকিত। ভ্রমর ভ্রমরীগণ গানে বিমোহিত॥
নিকুঞ্জ-কানন-শোভা কার শক্তি বলি। হরি-মহোৎসব হইল লিখন কাঁচলি॥
দেখিতে দেখিতে দেবীর বাড়ে বড় প্রেম। কামিনী করেন কত ক্ষেম॥
চারিভিতে তরুলতা পশুপক্ষিগণ। সমাকুল শতদলে খঞ্জনী খঞ্জন॥
চকোরী চকোর নাচে চাহিয়া চপলা। চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥
রতি-জয় স্মর-ধনু করে নিল মা। গরব গমনে ভূমে নাহি পড়ে পা॥
প্রদোষ পশ্চাৎ করি প্রবেশে রজনী। সেনের শিয়রে বৈসে বিশ্বের জননী॥

রঘুনাথ।

ইঁহার গ্রন্থের নাম অশ্বমেধ পঞ্চালিকা। গ্রন্থ কবিতাময়। ১০৩১ সালের ১৩ই শ্রাবণ এই গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ হয়। কবি রঘুনাথ গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়া, উৎকলপতি মুকুন্দদেবের সভায় তাহা পাঠ করেন। মুকুন্দ-দেবের ইনি স্নেহভাজন ছিলেন বলিয়াই অনুমিত হয়। রঘুনাথ ব্রাহ্মণ ছিলেন,—এইটুকু মাত্র পরিচয় পাইয়াছি; আরও জানিতে পারিতেছি, তিনি উড়িষ্যাদেশেই বাস নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যথা পঞ্চালিকা গ্রন্থে,—উৎকল পতিকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিতেছেন,—

"শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি।"
"আইলুঁ তোমার দেশে গুণ শুনি অতি॥"

গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ,—

"প্রণমহুঁ নারায়ণ অনাদি নিধন। সৃষ্টির পালন মূর্ত্তি পরম কারণ॥
মায়ারূপে জগৎ কলুষ উদ্ধারিল। ব্যক্ত হৈয়া মুনিগণ সমর্পণ কৈল॥
না বুঝে ইঙ্গিত যার দেব প্রজাপতি। পুনঃ পুনঃ সে দেবকে করি এ প্রণতি॥
গণপতি প্রথমহুঁ বিঘ্ন বিনাশন। ভগবতী দেবীর সে বন্দহুঁ চরণ॥

যার অনুভাবে হএ সরস কবিতা। স্মৃতি-স্মৃতি অবিদিত বচন-দক্ষতা॥
আদি কবি বাল্মীকের বন্দহুঁ চরণ। জনক জননী বন্দো আদি গুরুজন॥
সভা সভাপতির করিএ পরিহার। ক্ষেমিহ সকল দোষ কবিতে আক্ষার॥
ক্ষার জল জলধরে বরিষে সুধা করি। সুপণ্ডিতে গুণ এ দোষ পরিহরি॥
ব্রহ্মার সৃজন দোষ গুণে ত জড়িত। স্থাবর জঙ্গম আদি নানা দেশ উপনীত॥
উৎকল পুণ্য দেশে অদ্ভুত কথন। জাত জগন্নাথ রূপে বৈসে নারায়ণ॥"

ইহাঁর কবিতার কোন কোন স্থল পাঠ করিয়া সন্দেহ হয়, ইনি বুঝি বাঙ্গালাভাষাভিজ্ঞ উৎকল ব্রাহ্মণ, যথা,—

"ত্রেতা যুগে ছিলা রাম নরপতি। বিষ্ণু অবতার দশরথের সন্ততি॥
তার পত্নী সীতা যদি রাবণে হরিল। সপুত্র বান্ধব রাম তাকে সংহারিল॥
অনল পরীক্ষা দিয়া আনিলেন্তি সীতা। জনক নন্দিনী সতী অতি সুচরিতা।"

জগৎরাম রায়।

ভাষা-কবিতায় ইনি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। দুর্গাপঞ্চরাত্রিও ইহাঁর অন্য একখানি কবিতা-গ্রন্থ। দুর্গাপঞ্চরাত্রির শেষ অংশ জগৎরাম স্বয়ং লেখেন নাই,—তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদ ইহা সম্পূর্ণ করেন।

বাঁকুড়াজেলার অধীন মহিষাড়া পরগণার ভুলুই নামক গ্রাম—জগৎরামের জন্মভূমি। ইহাঁর পিতার নাম রঘুনাথ; মাতার নাম শোভাবতী। অনুমান, ১৫৬২ শকে ইনি প্রাদুর্ভূত হন।

ইহাঁর রামায়ণের যত টুকু দেখিয়াছি, তাহা প্রসাদ গুণময় এবং সরল মধুর।

শত্রুঘ্ন,—ভরতকে বুঝাইতেছেন,—

"বিমুখ হইল বিধি, এ সব লিখিল যদি, এ কলঙ্ক কেবা খণ্ডাইবে।
কোপ লোপ কর দাদা, ধর্ম্মে পাপ হবে বাধা, ধর্ম্ম গেলে সহায় কে হবে॥
ধর্ম্ম সে অন্তের গতি, ধর্ম্মে বৃদ্ধি সুসন্ততি, ধর্ম্ম করে কলঙ্ক বারণ।
ধর্ম্ম অনাথের বন্ধু, ধর্ম্মে তরে দুঃখ-সিন্ধু, ধর্ম্ম হৈতে বিপাক তারণ॥
ধর্ম্ম যে তরেতে রাখে, পরব্রহ্ম রাখে তাকে, ধর্ম্মের অসাধ্য কর্ম্ম নাই।
ধর্ম্ম যেবা করে নষ্ট, সে পায় বহুত কষ্ট, স্পষ্ট বলি শুন জ্যেষ্ঠ ভাই॥
বিষ খেতে কর সত্য, তাতে হবে আত্মহত্যা, মায়ে বধি মাতৃহত্যা হবে।

যার জন্ম অতি কোপে, করিবারে যাও পাপে, তবু রাম ধন না পাইবে।
এ অযোধ্যা অন্ধকার, দেখে এলে দশা তার, পিতা কোথা আছেন কি মতে।
পিতার না হ'লে গতি, ইথে না গণিলে ক্ষতি, মতি কর দেশান্তরে যেতে।
ভেবে দেখ মনে মনে, ঘনশ্যাম ঘোর বনে, বুঝি সূর্য্যবংশ ধ্বংস হয়।
যুক্তি দিতে নাহি লোক, ত্যাগ কর সব শোক, আর কি বলিব তব দায়॥
আমি সে কিঙ্করাভাস, তোমার দাসের দাস, তোমা বুঝিবারে কিবা ক্ষম।
ধৈর্য্য হ'য়ে কার্য্য কর, মানসে সন্তোষ ধর, বিচারিয়ে কর উপক্রম॥"

কৃষ্ণরাম দাস।

কালিকামঙ্গল,—ইহাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। আর একখানি গ্রন্থ রায়মঙ্গল। প্রবাদ, রায়মঙ্গল,—"দক্ষিণ রায়ঠাকুরে"র প্রত্যাদেশের ফলে লিখিত। এই গ্রন্থ ১৬০৮ শকে রচিত।

২৪ পরগণা বেলঘরিয়ার অর্দ্ধক্রোশ দূরে নিমতা গ্রামে কৃষ্ণরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ভগবতী দাস। জাতি কায়স্থ।

কালিকামঙ্গলে,—কালিকা মাহাত্ম্য লিখিত,—বিদ্যাসুন্দরের গল্পচ্ছলে মহাদেবীর লীলা প্রকটিত। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ইহাতে আছে বটে, কিন্তু বর্দ্ধমানের নাম নাই। কালিকামঙ্গল পাঠ করিলেই বুঝা যায়,—ভারতচন্দ্র ইহাঁর পন্থানুবর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু কৃষ্ণরামের উল্লেখমাত্র নিজ গ্রন্থে করেন নাই। ভারতচন্দ্র না করুন,—প্রাণরাম,—স্ব-প্রণীত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে কৃষ্ণরামের নামোল্লেখ করিয়াছেন। যথা;—

"বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা-মঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥"

এই কয়েক পংক্তি পাঠে জানা যাইতেছে,—বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচনায় কৃষ্ণরামই অগ্রণী;—তাহার পর রামপ্রসাদ, তাহার পর ভারতচন্দ্র, তাহার পর, প্রাণরাম।

কৃষ্ণরামের বংশে এখন আর কেহই জীবিত নাই। বাস্তুভিটা অদ্যাপি বর্ত্তমান।

ভারতচন্দ্র রায়।

হাবড়া-আমতার নিকট পেঁড়ো-বসন্তপুর নামক একখানি গ্রাম আছে এই গ্রাম ইতিহাসে ভূরসুট পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। পেঁড়োর গড় প্রসিদ্ধ। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ইহার জমিদার ছিলেন। ইহার প্রকৃত উপাধি মুখোপাধ্যায় ;—গোত্র,—ভরদ্বাজ।

রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের চারি পুত্র,—প্রথম,—চতুর্ভুজ রায় ; দ্বিতীয়,—অর্জ্জুন রায় ; তৃতীয়,—দয়ারাম রায় ;—চতুর্থ,—ভারতচন্দ্র রায় ভারতচন্দ্র ১১১৯ সনে শুভলগ্নে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্র সর্ব্ব কনিষ্ঠ,—সুতরাং পিতামাতার নিরতিশয় সোহাগে তিনি প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন।

ভারতচন্দ্র যখন অতি শিশু, তখন তাঁহার পিতা—রাজা নরেন্দ্র-নারায়ণের বড়ই গ্রহ-বৈগুণ্য ঘটিল। পেঁড়োগড় সে সময়ে বর্দ্ধমান মহারাজের জমিদারী। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র নাবালক,—মহারাণী বিষ্ণুকুমারীই রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। পেঁড়োগড়ের এক খণ্ড ভূমির সীমা লইয়া, রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সহিত মহারাণীর মত-বিরোধ উপস্থিত হইল। রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ,—মহারাণীকে কিছু দুর্ব্বাক্য বলিলেন। একথা মহারাণীর কর্ণগোচর হইল। মহারাণী,—আলমচাঁদ ও ক্ষেমচাঁদ নামক স্বীয়সেনাপতিদ্বয়কে আদেশ করিলেন,—'অবিলম্বে ভুরসুট পরগণা খাস দখল করিয়া লও।' তাহাই হইল। রাজা নরেন্দ্র নারায়ণ পূর্ব্বেই এ দুঃসংবাদ পাইয়া, সপরিবারে পলায়ন করিলেন। ভারতচন্দ্র মাতুলালয়ে আশ্রয় লইলেন। মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত গাজিপুরের নিকটবর্ত্তী নওয়াপাড়া গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়। মাতুলা-লয়েই তিনি বাস করিতে লাগিলেন। নওয়াপাড়ার নিকট তাজপুর গ্রাম। ভারতচন্দ্রের মাতুল তাঁহাকে তাজপুরের টোলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। ভারতচন্দ্র তাজপুরের টোলে সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ ও অভিধান পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

তাজপুরের নিকট সারদা গ্রাম। এই গ্রামে কেশরকুণী গোত্রীয় নরোত্তম আচার্য্য বাস করিতেন। তাঁহার দুই কন্যা। হুগলীজেলার অন্তর্গত খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ইঁহার এক কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। ভারত-চন্দ্রের সহিত নরোত্তমের আর এক কন্যার বিবাহ হইল। তাজপুরের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালেই ভারতচন্দ্রের বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

সংস্কৃত শিক্ষা যথাসম্ভব সম্পন্ন করিয়া, ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ইতিপূর্ব্বেই রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমান-মহারাণীর অনুগ্রহে পেঁড়োগ্রামে আসিয়া পুনরায় বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র বাটী ফিরিলেন বটে,—কিন্তু গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ভারতচন্দ্রের তিন জন সহোদরই দুইটী কারণে তাঁহার উপর একান্ত বিরক্ত হইলেন। প্রথম কারণ,—ভারতচন্দ্র এতদিন ধরিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃত শিক্ষা করিলেন, পারসীপাঠ তাঁহার কিছুই হয় নাই। শুধু সংস্কৃত শিখিলেই কি দিন যাইবে? সংস্কৃত শিখিলে পুরোহিতের কার্য্য করিতে হয়। রাজার ছেলে—জমিদারের ছেলে—পুরোহিতের কার্য্য করিবে? এ যে বড়ই অসম্ভ্রমের কথা। আর তাঁহাদের যজমানই বা কই? চাকুরী করিতে হইলে, পারশী না শিখিলেই চলিবে না। বিরক্তির দ্বিতীয় কারণ,—ভারতচন্দ্র ভ্রাতৃগণের অমতে,—অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্টকুলে বিবাহ করিয়াছেন। এই দুই কারণে ভারতচন্দ্র ভ্রাতৃগণের নিকট অত্যন্ত তিরস্কৃত হইলেন। অভিমানী ভারতচন্দ্রের বড় মনঃকষ্ট হইল। তিনি গৃহত্যাগ করিলেন।

দেবানন্দপুরের মুন্সীরা তখন অত্যন্ত খ্যাতিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেবানন্দপুর হুগলী জেলায়। বর্ত্তমান ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের অনতিদূরে। ভারতচন্দ্র মুন্সীবাবুদের বাটী আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তখন রামচন্দ্র মুন্সী,—এই মুন্সী-বাড়ীর কর্ত্তা ছিলেন। পারসী-ভাষায় তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ভারতচন্দ্র,—রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রামচন্দ্র অবিলম্বে ভারতচন্দ্রের পারসী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভারতচন্দ্র যত্নাতিশয্যে পারসী শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

মুন্সী মহাশয়েরা কায়স্থ; ভারতচন্দ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান। সুতরাং মুন্সী

মহাশয়দের বাটীতে তাঁহাকে স্বহস্তে রাঁধিতে হইত। তিনি কোন দিন রাঁধিয়া খাইতেন; কোন দিন রাঁধিতেনই না। কোন দিন একবেলা ব্যঞ্জন রাঁধিয়া দুই বেলা খাইতেন। কোন দিন একটা বেগুন পোড়াইয়া তাহার অর্দ্ধেক ভাগ দিনের বেলা ব্যঞ্জনরূপে ব্যবহার করিতেন,—অর্দ্ধেক ভাগ রাত্রে খাইতেন; দিবানিশি অধ্যয়নেই মনোযোগী রহিতেন।

এই সময় হইতেই তাঁহার কবিতারচনা আরম্ভ হয়। তিনি গোপনে কবিতা লিখিতেন,—গোপনে নিজের কবিতা বারবার পড়িতেন,—আর অতি-দরিদ্রের মণি-রত্নবৎ কবিতাগুলিকে অতিযত্নে গোপনে রাখিয়া দিতেন। কিন্তু বহ্নি আর বহুদিন ভস্মাবৃত রহিল না!

একদা মুন্সী মহাশয়দের বাটী সত্যনারায়ণের কথা। ভারতচন্দ্রের উপরই সত্যনারায়ণ কথা কহিবার ভার পড়িল। অন্য এক ব্যক্তির উপর পুঁথি-সংগ্রহে আদেশ হইল। এই আদেশ শুনিয়া, ভারতচন্দ্র বলিলেন,—'পুঁথি-সংগ্রহের প্রয়োজন নাই; আমার নিকট পুঁথি আছে।' এই বলিয়া, সেদিন তিনি স্বরচিত কবিতাবদ্ধ ব্রত-কথা পাঠ করিলেন। এই কবিতার শেষে তাঁহার নিজের নামের ভণিতা ছিল। যখন সকলেই শুনিল, ভারতচন্দ্রই স্বয়ং এ কবিতা রচনা করিয়াছেন, তখন ভারত-চন্দ্রের কবিত্ব দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। কিছুদিন পরে ইহাঁদের বাটীতে আর একবার সত্যনারায়ণের কথা হয়। ভারতচন্দ্র সেদিন আবার নূতন ছন্দে সত্যনারায়ণের নূতন কথা রচনা করিয়া পাঠ করেন। এই ব্রত-কথার শেষে তিনি লেখেন,—'ব্রত কথা সাঙ্গ পায় সনে রৌদ্র চৌগুণা,—অর্থাৎ ভারতচন্দ্র বলিতেছেন,—১১৩৪ সনে আমি এই 'কথা' রচনা সাঙ্গ করিলাম। ইহাতে জানা যাইতেছে, ভারতচন্দ্র পনর বৎসর বয়সে সুন্দর কবিতায় এই ব্রত-কথা লেখেন। এই সত্য নারায়ণের কথায় তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় প্রকাশ করেন,—

"ভরদ্বাজ অবতংশ, ভূপতি রায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত, ভারত ভারতী-যুত,
ফুলের মুখুটি খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি॥

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাতে অধিকারী রায়, রামচন্দ্র মুন্সী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়,
হয়ে মোর কৃপাদায়, পড়াইল পারশী॥"

দেবানন্দপুরে মুন্সী মহাশয়দের বাটীতে ভারতচন্দ্র পাঁচ বৎসর কাল অবস্থান করিলেন; তাহার পর, তিনি পেঁড়ো গ্রামে আপন বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তাঁহার পিতা,—বর্দ্ধমান মহারাজের নিকট হইতে কিছু ভূমি ইজারা লইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম ইহার খাজনা তিনি রীতিমত সরকারে দাখিল করিতেন। কিন্তু ক্রমে বড়ই গোলমাল বাধিল। প্রজারা খাজনা আদায় দিতে গাফিলি করিতে লাগিল; বর্দ্ধমান-রাজসরকারে খাজনা পাঠাইতে তাঁহারও বিলম্ব পড়িল এদিকে রাজসরকারের কর্ম্মচারীরা তাঁহার এই বিলম্বে বড়ই অসন্তুষ্ট হইল। ফলে, তাহারা নরেন্দ্র নারায়ণের ইজারা রহিত করিবার উপক্রম করিল। নরেন্দ্র নারায়ণ,—ভারতচন্দ্রকে বর্দ্ধমানে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন;—অভিপ্রায় এই, বুদ্ধিমান্ ভারতচন্দ্র মহারাজকে সকল অবস্থা ভাল করিয়া জানাইবেন,—তাঁহাকে শান্ত করিবেন। ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমানে প্রেরিত হইলেন।

বর্দ্ধমান গিয়া ভারতচন্দ্র মহারাজকে সকল অবস্থা জানাইলেন। মহারাজ অনেকটা নিরস্ত হইলেন। খাজনাও যথারীতি প্রেরিত হইতে লাগিল। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন রহিল না। আবার খাজনা পাঠাইতে বিলম্ব হইল। মহারাজ, নরেন্দ্র নারায়ণের ইজারা লোপ করিলেন। ভারতচন্দ্র ইহাতে নানারূপ আপত্তির কথা তুলিলেন। মহারাজ ক্রুদ্ধ হইলেন। ফলে, ভারতচন্দ্রের কারাদণ্ড হইল।

কিন্তু কারাবাসে ভারতচন্দ্রকে বেশী দিন থাকিতে হইল না। কারাধ্যক্ষের কৃপায় তিনি মুক্তি পা[illegible] বঙ্গদেশের সীমা ছাড়িয়া, পুরুষোত্তমধামে গমন করিলেন। এই সময় তাঁহার বয়স ৩৯ বৎসর।

পুরুষোত্তমধামে নৃপতি তখন শিবভট্ট। তিনি বড় দয়ালু ছিলেন। ভারতচন্দ্র তাঁহার আশ্রয়-প্রার্থনা করিলেন; আশ্রয় পাইলেন। পরন্তু

তাঁহার বিনাব্যয়ে আহার-সংস্থানও হইল। ভারতচন্দ্র তখন নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবদুপাসনায় মন দিলেন,—সন্ন্যাসী সাজিলেন,—জটা ধরিলেন,—গেরুয়া পরিলেন। রঘুনাথ নামে এক শিষ্য তাঁহার সঙ্গে বর্দ্ধমান হইতে পুরুষোত্তম আসিয়াছিল। রঘুনাথ,—গুরুদেবের সেবা করিতে লাগিল। বহুবৈষ্ণবের সহিত ভারতচন্দ্রের পরিচয় হইল।

কয়েক জন বৈষ্ণব বৃন্দাবন-যাত্রার পরামর্শ করিলেন,—ভারতচন্দ্রও বৃন্দাবন যাইতে প্রস্তুত হইলেন। তাঁহারা বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন। ভারতচন্দ্রের সঙ্গে ভক্ত শিষ্য রঘুনাথও বৃন্দাবন যাত্রা করিল।

ইহাঁরা খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গোপীনাথজীর মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে নিয়ত সংকীর্ত্তন হইত। ভারতচন্দ্র তন্ময়চিত্তে কীর্ত্তন শুনিতেছেন,—এদিকে রঘুনাথ এক কাণ্ড বাধাইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খানাকুল-কৃষ্ণনগরে ভারতচন্দ্রের শ্যালিকার বিবাহ হইয়াছিল। রঘুনাথ গোপনে গোপনে ভারতচন্দ্রের শ্যালিকাপতিকে সমস্ত সংবাদ জানাইল। তিনি আসিয়া ভারতচন্দ্রকে বাড়ী লইয়া গেলেন, তাঁহাকে আশ্রমী সাজাইলেন; কয়েক দিন পরে ভারতচন্দ্রকে তাঁহার শ্বশুর বাড়ী লইয়া গেলেন। পঁচিশ বৎসরের পরে, স্ত্রীর সহিত ভারতচন্দ্রের দেখা হইল।

ভারতচন্দ্র ভাবিলেন,—এখন কর্ত্তব্য,—অর্থার্জ্জন। ফরাসডাঙ্গায় শ্রোত্রীয় পালধিবংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী তখন ফরাসীদের দেওয়ান। ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গা গিয়া তাঁহার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। শ্বশুরকে বলিয়া গেলেন,—"আমার স্ত্রীকে পেঁড়োর বাটীতে আমার ভ্রাতাদের নিকট পাঠাইবেন না। যত দিন না আমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হই, ততদিন আপনার বাটীতেই আমার স্ত্রীকে রাখিবেন।"

ভারতচন্দ্র, ফরাসডাঙ্গা-গোন্দলপাড়ায় রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে থাকিতেন আ[illegible]ত রায়ের [illegible] নিকট কর্ম্মপ্রার্থনায় প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন।

[illegible]মধ্যে একদিন কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় আগমন করেন। ইন্দ্রনারায়ণ তাঁহার নিকট ভারতচন্দ্রের কথা,—

তাঁহার কবিতাশক্তির কথা,—উত্থাপন করিলেন। ফলে, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে কৃষ্ণনগর লইয়া গেলেন; তাঁহার চল্লিশ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন। ক্রমে ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাইয়া, মহারাজ তাঁহাকে গুণাকর উপাধিভূষণেও ভূষিত করিলেন। ভারতচন্দ্র, মহারাজের অন্যতম সভাসদ্ হইলেন এবং তাঁহারই আদেশে অন্নদা-মঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিলেন।

অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর পাঠ করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন;—ভারতচন্দ্রের সাংসারিক সমস্ত অবস্থা জানিতে চাহিলেন। ভারতচন্দ্র সবিস্তর সকল কথাই তাঁহাকে বলিলেন,—স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—"সহোদরগণের সহিত আমার মনের মিল নাই; আমি আর বাড়ীতে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। কৃপা করিয়া আপনার রাজ্যে গঙ্গাতীরে যদি আমার একটু স্থান দেন, তাহা হইলে আমি নিরাপদে বাস করিতে পারি।" মহারাজ বার্ষিক ছয় শত টাকা রাজস্বে মুলাযোড় গ্রাম তাঁহাকে ইজারা দিলেন; বাটী নির্ম্মাণের জন্যও তাঁহাকে এক শত টাকা দান করিলেন। গঙ্গাতীরে বাটী-নির্ম্মাণের স্থান স্থির হইল, ইত্যবসরে তিনি মুলাযোড়ের ঘোষালবাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পত্নীকেও লইয়া আসিলেন,—ঘোষালদের বাটীতেই রাখিলেন। যথা সময়ে তাঁহার নিজবাটী প্রস্তুত হইল। তিনি "গৃহ প্রবেশ" কার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করিয়া, সস্ত্রীক গৃহ প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার রসমঞ্জরী গ্রন্থ প্রণীত হয়।

ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ শুনিলেন, ভারতচন্দ্র মুলাযোড়ে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তিনিও গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিপ্রায়ে মুলাযোড়ে পুত্রের ভবনে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন। এই [illegible] তাঁহার দেহ ত্যাগ হয়। পিতার পরলোকের পর, ভারতচন্দ্র কিছু [illegible] থাকেন। এই সময়ে তিনি নানারূপ পাদপূরণের কবিতা লেখেন।

এই সময়ে বর্গীর হাঙ্গামায় আশঙ্কিত হইয়া, বর্দ্ধমানের মহারাণী মুলাযোড়ের নিকট কাউগাছী আসিয়া বাস করেন। কাউগাছীর

রাজবাটী এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত। এই রাজভবনেই বর্দ্ধমানপতি মহারাজ তিলকচন্দ্র রায়ের বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ফরাসডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই সমারোহে-ব্যাপারের অধ্যক্ষতা করেন। ফরাসডাঙ্গা হইতে পাঁচ শত ফৌজ আসিয়া এই সময় কাউগাছির শান্তি রক্ষা করিয়াছিল।

এই তিলকচন্দ্রের জননী,—মহারাণী,—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে রামদেব নাগের নামে মূলাযোড় পত্তনি লয়েন। ভারতচন্দ্র আপত্তি করিয়াছিলেন,—কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া ক্ষান্ত করেন,—মূলাযোড়ের পরিবর্ত্তে—ভারতচন্দ্রকে গুস্তে গ্রামে এক শত পাঁচ বিঘা এবং মূলাযোড়ে তের বিঘা নিষ্কর জমী প্রদান করেন। ভারতচন্দ্র গুস্তে গ্রামে জমি পাইয়া মূলাযোড় পরিত্যাগ করিয়া এই গুস্তে গ্রামেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছুক হন। মূলাযোড়-বাসিগণ কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িতে চাহেন না। অগত্যা ভারতচন্দ্র মূলাযোড়েই অবস্থিতি করেন।

পত্তনিদার রামদেব নাগ,—এই সময়ে রাজস্ব-আদায়ে বড়ই কঠোরতার পরিচয় দেন; লোকের উপর নানারূপ অত্যাচার হইতে থাকে। ভারতচন্দ্র নাগাষ্টক রচনা করিয়া, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রদান করেন। মহারাজ, নাগাষ্টক-পাঠে ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-কৌশলে প্রীত এবং রামদেবের অত্যাচার-শ্রবণে ব্যথিত হন। তিনি বর্দ্ধমানের মহারাণীর নিকট এই কবিতা পাঠাইয়া দেন। ফলে, নাগের উপদ্রব দমিত হয়।

১৬৮২ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে ভারতচন্দ্র পরলোক গমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র,—প্রথম, পরীক্ষিত রায়; দ্বিতীয়,—রামতনু রায়; কনিষ্ঠ,—ভগবান রায়। প্রথম এবং দ্বিতীয় পুত্রের বংশ নাই; তৃতীয় পুত্র ভগবান্ রায়ের বংশধরগণ অদ্যাপি মূলাযোড়ে অবস্থিত।

ভারতচন্দ্র চণ্ডী নাটক নামে একখানি নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,—কিন্তু রোগের যাতনায় ইচ্ছামত লিখিতে পারিতেন না;—শেষে মৃত্যু তাঁহার সকল আশাই মহাকাশে বিলীন করিয়া দিল।

পরলোকগত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন,—সুন্দরের সুড়ঙ্গ দেখিবার জন্য বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন, এ কথায় কেহ কেহ বিদ্রূপের একটু চাপা হাসি হাসিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা, তথা সুড়ঙ্গের অস্তিত্ব একবারেই কল্পনার ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। পাদরী লং সাহেবের প্রকাশিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন-চরিতেও এই সুড়ঙ্গের উল্লেখ আছে। রাজা মানসিংহ,—ভবানন্দ রায় মজুমদারকে সঙ্গে লইয়া যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। পথে বর্দ্ধমানে তাঁহারা উপনীত। অতঃপর কি হইল শুনুন,—"ভবানন্দ রায়মজুমদারকে সঙ্গে করিয়া মানসিংহ নগর ভ্রমণ করিতে করিতে এক সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ কিসের সুড়ঙ্গ। তাহাতে রায় মজুমদার উত্তর করিলেন, কালে বীর সিংহের বিদ্যা নামে এক কন্যা ছিল, সে সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিতা। * * দক্ষিণ দেশস্থ কাশীপুরের গুণসিন্ধু মহারাজের তনয় সুন্দর নামে অতিশয় রূপবান্ এবং সর্ব্বশাস্ত্রে মহা—মহোপাধ্যায় এক যুবা পুরুষ * * বর্দ্ধমানে আসিলেন। * * এই সুন্দর সুড়ঙ্গ কাটিয়া বিদ্যার নিকটে যাইয়া শাস্ত্র-বিচারে জয়ী হইয়া বিদ্যাকে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ করেন।" মানসিংহ যখন এইরূপ বর্দ্ধমান পরিদর্শন করেন, রাজা বীরসিংহ তখন বর্দ্ধমানের অধিপতি। বীরসিংহ,—মানসিংহকে "নানা দ্রব্য ভেট দিয়া" প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। ভেটের দ্রব্য দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, গুবাক্, শ্রীফল, আতা, ও আর আর নানা জাতীয় ফল এবং অপূর্ব্ব পট্টবস্ত্র, উত্তম উত্তম সূতার বস্ত্র, বনাত, মখমল এবং চুনি, চন্দ্রকান্ত মণি, সূর্য্যকান্ত মণি, নীলকান্ত মণি, অয়স্কান্ত মণি এবং সহস্র সহস্র সুবর্ণ। এই ধীরসিংহ,—বিদ্যার পিতা বীরসিংহের পুত্র।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, [illegible] মানসিংহ প্রভৃতি গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যে অবিনশ্বর। ভারতের কবিত্ব [illegible] ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপ বর্ণনা করিতেছেন,—

"বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়। সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

কি ছার বিছার কামধনু রাগে ফুলে। ভুরুর সমান কোথা ভুরু ভঙ্গে ভুলে॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে। কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে॥
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম॥
কি কাজ সিন্দুরে মাজি মুকুতার হার। ভুলায় তর্কের পাতি দন্তপাঁতি তার॥
দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া। ভয়ে বিধি তার মুখে থুলা লুকাইয়া॥
পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গড়ি ছিল। ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল॥
কুচ হৈতে কত উচ্চ মেরু চূড়া ধরে। শীহরে কদম্ব ফুল দাড়িম্ব বিদরে॥
নাভিকূপে যা(ই)তে কাম কুচশম্ভু বলে। ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে॥
কত সরু ডমরু-কেশরি-মধ্যখান। হরগৌরী-করপদে আছয়ে প্রমাণ॥
কে বলে অনঙ্গ-অঙ্গ দেখা নাহি যায়। দেখুক যে আঁখি ধরে বিদ্যার মাজায়॥
মেদিনী হইল মাটী নিতম্ব দেখিয়া। অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া॥
করিকর রামরম্ভা দেখি তার উরু। সুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু॥
যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন। সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥
জিনিয়া হরিদ্রা চাঁপা সোণার বরণ। অনলে পুড়েছে করি তার দরশন॥
রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িৎ। কি বলিব ভয়ে স্থির নহে কদাচিৎ॥
বসন ভূষণ পরি যদি বেশ করে। রতি সহ কত কোটি কাম ঝুরে মরে॥
ভ্রমর ঝঙ্কার শিখে কঙ্কণঝঙ্কারে। পড়ায় পঞ্চম স্বর ভাষে কোকিলারে।"

রামপ্রসাদ সেন।

রামপ্রসাদের সঙ্গীত সমূহ বঙ্গ-সাহিত্যে পদ্মরাগমণি। ইঁহার বিদ্যা-সুন্দর গ্রন্থও বহু-বিশ্রুত। কলিকাতা বঙ্গবাসী আফিস হইতে ১২৯৩ সালে এ গ্রন্থ সটীক প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেই রামপ্রসাদের জীবনী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

২৪ পরগণা জেলায় প্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট গ্রাম কবিরঞ্জনের জন্মস্থান। এস্থানে পূর্ব্বে রায়ের এক ঘর ধনবান কুম্ভকার বাস করিত বলিয়া [illegible] ইহার নাম কুমারহট্টবা কুমারহাটা হয়। [illegible] সাধনের পঞ্চমুণ্ডী আসনের স্থান অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। আজি পর্য্যন্ত অনেক গায়ক মজুরী করিতে যাইবার পূর্ব্বে এই স্থানে আসিয়া গান করে, ও মাথায় ও জিহ্বায় আসনের স্থানের মাটী ছুঁয়াইয়া

আপনার অভীষ্ট স্থানে যাইয়া থাকে। আজিও এখানকার লোক এই আসনের স্থান পবিত্র বলিয়া, মলমূত্র ত্যাগে অপবিত্র করে না। কবিরঞ্জন স্বয়ং বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার বাসস্থানের পরিচয় দিয়াছেন,—

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম। তার মধ্যে সিদ্ধপীট রামকৃষ্ণ ধাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥

কবিরঞ্জনের জন্মকাল ঠিক নির্ণয় করা সহজ নহে। অনেকে অনুমান করেন, ১৬৪০—১৬৫৫ শকের মধ্যে কবিরঞ্জনের জন্ম হয়। সাধকসঙ্গীত সংগ্রহকার কৈলাসচন্দ্র সিংহ বলিয়াছেন, "বহুযত্নে ইহা জানিতে পারা গিয়াছে যে, কবিরঞ্জন ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলে ১১২৭ সাল (ইং ১৭১৮ খৃীঃ অব্দ) কবিরঞ্জনের জন্মকাল বলিতে হইবে। সে আজ ১৬৭ বৎসর হইল। ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকে (বাঃ ১১১৯ সালে) জন্মিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত কবিরঞ্জন অপেক্ষা আট বৎসরের বড় ছিলেন।

রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। মৃত দয়ালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বহু কষ্টে রামপ্রসাদের বংশাবলীর তালিকা সংগ্রহ করেন, এই তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। ইহা দ্বারা তাঁহার বংশ সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁহার কতকগুলি গানের ভনিতায় "দ্বিজ" শব্দ দেখিয়া অনেকেরই ভ্রম হইতে পারে যে, রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। এ সম্বন্ধে দুইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে। প্রথমতঃ শাস্ত্রমতে শূদ্র ব্যতীত সকলেই দ্বিজ। বৈদ্যগণ শূদ্র নহেন, অন্ততঃ তাঁহারা একথা স্বীকার করেন না—সুতরাং শাস্ত্রমতে তাঁহারা দ্বিজ। কেহ কেহ বলেন, দ্বিজ শব্দ পরবর্ত্তী যোজনা মাত্র। রামপ্রসাদের অনেক গান এইরূপে বিকৃত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, হয় ত দ্বিজ রামপ্রসাদ কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন এবং কালক্রমে ইহাঁর রচিত সং[illegible] কবিরঞ্জনের সংগীতের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। যদি এ কথা [illegible] হইলে এই দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কোনরূপ কথাই জানা যায় না। রাম[illegible]রত্ন মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, নীলু পাটনী নামক কবিওয়ালার দলে রামপ্রসাদ নামক একজন কবি ছিলেন। যথা,

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেমনি নীলুর দলে রামপ্রসাদ একুটিন।"

সুতরাং এ স্থলে এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই রাম প্রসাদই উল্লিখিত দ্বিজ রামপ্রসাদ। অথবা দ্বিজ রামপ্রসাদ অন্য কোন ব্যক্তিও হইতে পারেন। এইরূপ অনুমান করিবার কারণ সম্বন্ধে মৃত দয়ালচাঁদ ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন যে, যে সকল সঙ্গীতে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা আছে, সে সকল অপেক্ষাকৃত অনেক লঘু ভাবাত্মক, তবে রচনা ও স্বরের বিভিন্নতা অল্প, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে প্রকৃত কথা জানিবার কোন উপায় নাই। দয়াল বাবু বলিয়াছেন, "যদিও কবি-রঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালায় সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন,—আমার এ সংস্কার দূর হইল না।"

এক্ষণে সে কথা থাকুক। এ স্থলে তাঁহার বংশাবলী সম্বন্ধে কি জানা যায় দেখা যাউক। কবিরঞ্জন,—"বিদ্যাসুন্দরে"র স্থানে স্থানে নিজ পূর্ব্বপুরুষ ও বংশধরগণের পরিচয় দিয়াছেন। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল ;—

"ধন হেতু মহাকুল, পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল, কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত, শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত, প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত, ধীর সর্ব্ব গুণযুত, ছিলা কত কত মহাশয়।
অবচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর, দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রাম রাম, মহাকবি গুণধাম, সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর, কহে পদে কালীকার, কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া॥"

অন্যত্র,—

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী [illegible] যার পাদপদ্ম আমি রাত্রি দিন সেবি॥
ভগ্নীপ[illegible]লক্ষ্মীনারায়ণ [illegible]। পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
[illegible]গিনের পুত্র জগন্নাথ কৃপারাম। আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণ ধাম॥
সর্ব্বাগ্রজা ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তাঁর দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তাঁরে কৃপা দৃষ্টি কর মাতা জগন্মাতা॥

জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাগো দেহি পদধূলি॥"

আর এক স্থলে আছে,—

"শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ সুতা। শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে কবিতা অদ্ভুতা॥"

ইহা হইতেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, তাঁহার বংশের আদিপুরুষ কৃত্তিবাস। "ধনহেতু মহাকুল" ও "দানশীল দয়াবন্ত" প্রভৃতি হইতে বেশ বুঝা যায় যে, এই বংশ বেশ ঐশ্বর্য্যশালী, দানশীল ও দয়াবন্ত ছিল। তবে রামপ্রসাদ ও তাঁহার পিতা নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়;—নতুবা প্রসাদ অতি অল্প বয়সে লেখা পড়া ছাড়িয়া সামান্য গোমস্তাগিরি করিতে যাইতেন না।

এই রামেশ্বর রামপ্রসাদের পিতামহ এবং রামরাম তাঁহার পিতা ছিলেন। রামরাম সেনের দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক মাত্র পুত্র জন্মে, তাহার নাম নিধিরাম। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে অম্বিকা ও ভবানী নাম্নী দুই কন্যা এবং রামপ্রসাদ ও বিশ্বনাথের জন্ম হয়। সুতরাং রামপ্রসাদ রামরাম সেনের চতুর্থ সন্তান। রামপ্রসাদেরও পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নাম্নী দুই কন্যা, এবং রামদুলাল ও রামমোহন নামে দুই পুত্র হয়। যখন বিদ্যাসুন্দর লিখিত হয়, তখন কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন জন্মায় নাই, এ জন্য তাহার নাম বিদ্যাসুন্দরের কোথাও উল্লিখিত নাই। রামমোহন রামপ্রসাদের বৃদ্ধ বয়সের পুত্র।

রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি এত অল্প বয়সে এরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন বলিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইবার কোন কারণ নাই। এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং সংসারের সমু[illegible]র উপর পড়ে। তিনি কৌলিক চিকিৎসা ব্যবসা শিক্ষা [illegible] তাঁহাকে চাকুরির অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তখন জমীদার [illegible]নের ঘরে ব্যতীত অন্যত্র চাকুরি হইত না। সুতরাং রামপ্রসাদ কলিকা[illegible]র এক মুহুরিগিরি চাকুরি খুঁজিয়া লয়েন। বোধ হয়, তখন তাঁহার বয়স

১৭।১৮ বৎসরের অধিক নহে। কোন্ ধনবানের গৃহে তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহা স্পষ্ট ঠিক করা যায় না। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন যে, কাহারও মতে ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, কাহারও মতে নবরঙ্গকুলাধিপ দুর্গাচরণ মিত্রই তাঁহার প্রভু ছিলেন। রামপ্রসাদ বড় স্বাধীনচেতা ছিলেন; তাই কোথাও ভণিতায় ভারতচন্দ্রের "আজ্ঞা দিল কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর' মত তিনি তাঁহার পালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অথবা এই ধনবান লোকের নাম করেন নাই। কেবল কোন কোন স্থলের ভণিতায় আছে,—

"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

এই রাজকিশোর যে কে, তাহা স্থির করা যায় না। ইনি সম্ভবতঃ তাঁহার প্রভু অথবা তাঁহার কোন বংশধর হইতে পারেন।

প্রাক্তন জন্মের সংস্কার জন্যই হউক, অথবা যে কারণেই হউক, অতি অল্পবয়সেই রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও ঈশ্বরভক্তি মনে বিকসিত হইয়াছিল। শুনা যায় যে, তিনি ষোল বৎসর বয়সের সময়ই অসাধারণ কবিত্ব শক্তি দেখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রও পনর বৎসর মাত্র বয়সে অতি অল্প সময়ে সত্যনারায়ণের কথা রচনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক যিনি প্রকৃত কবি, তাঁহার এই শক্তি অতি অল্প বয়সেই বিকসিত হয়। এইরূপ যাহার ভক্তি প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি গুলি স্বাভাবিক, তাহাও বাল্যকাল হইতে পরিস্ফুট হইতে দেখা যায়। "সাধকেন্দ্র" রামপ্রসাদও বোধ হয়, অতি শিশুকাল হইতেই ধর্ম্মভীরু ও কালীভক্ত ছিলেন। তাই অতি অল্প বয়সেই সেই ভক্তিবৃত্তি তাঁহার মনে অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। অকস্মাৎ পরিবারের ভার তাঁহার উপর পতিত হওয়ায়, তিনি দিগ্‌বিদিক্ বিবেচনা শূন্য হইয়া চাকুরী স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে [illegible] রায়ের [illegible]। তাঁহার মন ঈশ্বরে পরিপূর্ণ ছিল। [illegible] না। তিনি সর্ব্বদা কালীর ভাবে [illegible] হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ইষ্টদেবতার সঙ্গে যেন সর্ব্বদা [illegible]থা-বার্ত্তা হইত। তাঁহার মনের ভাব স্বতঃই সুমধুর সঙ্গীতে ব্যক্ত হইত। সে সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না, সুতরাং হিসাবের

পাকা খাতার কথাও তাঁহার মনে থাকিত না—তাহারই পার্শ্বে অজ্ঞাতসারে সেই গানগুলি লিখিয়া ফেলিতেন। তিনি উল্লিখিত ব্যবসাদার ধনীর তহবিলদারী ও মুহুরিগিরি পাইয়াছিলেন বটে—কিন্তু তিনি সে সকল বাহ্যকথা ভুলিয়া গিয়া কালীর তহবিলদার হইয়া পড়িতেন।

এইরূপে কিছু দিন তাঁহার মুহুরিগিরি চলিল। একদিন দৈববলে, উপরিতন কর্ম্মচারী এই সকল খাতা দেখিয়া ফেলিলেন। দেখিলেন যে, রামপ্রসাদ পাকা খাতা কাঁচাইয়া বসিয়াছে; তাহার চারিদিকে মক্‌স করিয়া কি হিজি-বিজি লিখিয়া রাখিয়াছে। এই কর্ম্মচারী নিতান্ত ব্যবসাদার—সুতরাং স্থূলদৃষ্টি-সম্পন্ন। সে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, রাম প্রসাদের এই কর্ম্মের কথা তাহার প্রভুকে গিয়া জানাইল।

বাঙ্গালার শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে যে, রামপ্রসাদের প্রভু ধীর, গুণগ্রাহী ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। ইহার মধ্যে "আমায় দে মা তবিলদারী" এই প্রথম গীতটী তাঁহাকে একেবারে মুগ্ধ করিল। তিনি বুঝিলেন, বালক রামপ্রসাদ সামান্য নহে।—তাঁহার উপযুক্ত নহে। তিনি তখনি রামপ্রসাদকে নিকটে ডাকিলেন এবং অনর্থক সংসারচিন্তা হইতে বিরত হইয়া এই মহত্তর কার্য্যে দীক্ষিত হইতে তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। শুধু তাহাই নহে—তিনি রামপ্রসাদের মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই ঘটনা হইতেই প্রসাদের ভাবী জীবনের পথ পরিষ্কৃত হইল। তিনি এই বৃত্তি পাইয়া সংসারের ভার হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার সংসার-বন্ধন ঘুচিল—মন স্বাধীন হইল। তিনি নিজ ইষ্টদেবতার সাধনায় মনোযোগ করিলেন এবং তাহার পরেই নিজ বাটী গিয়া তথায় পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুত করিয়া [illegible] তান্ত্রিকী কালী-সাধনায় নিযুক্ত হইলেন।

[illegible]

রামপ্রসাদ কোন্ সময়ে বিবাহ করেন, [illegible] যায় না। ভণিতার কোন স্থানে তাঁহার শ্বশুরকুলের নামোল্লেখ নাই। কেহ কেহ বলেন, অনুমান বাইস বৎসর বয়সে রামপ্রসাদ বিবাহ করেন। তাহা

হইলে এই ঘটনার পরে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিতে হইবে। রামপ্রসাদের ধারণা ছিল যে, তিনি পূর্ব্বজন্মে কালীভক্ত ছিলেন, কিন্তু এজন্মে তাহা অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রী অধিকতর সৌভাগ্যবতী। কেন না, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, স্বপ্নযোগে কালী তাঁহার স্ত্রীকে দেখা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকট কখনও প্রকাশিত হন নাই। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন,

"ধন্যাদারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে। আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব। কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥"

সে যাহা হউক, তিনি সাধনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মনোমত সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই।—

"শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশ পুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা। ক্ষীণ পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা॥"

কালী সাধনায় সিদ্ধ হইলে কালী আসিয়া সাধকের নিকট প্রত্যক্ষ হন। বোধ হয়, প্রসাদের ততদূর হয় নাই, তাই তাঁহার এত আক্ষেপ। বিদ্যাসুন্দর পাঠে বুঝা যায় যে, তিনি শব-সাধনা প্রভৃতি কঠিন সাধনার গূঢ় রহস্য জানিতেন, গুরূপদেশে কোনরূপ গুহ্যসাধনই তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না; বোধ হয়, তিনি এই সমস্ত সাধনই করিয়াছিলেন। তিনি শব-সাধনার বর্ণনায় বলিয়াছেন,

"জ্ঞাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা। বিষম বিষয় কাল সর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই। ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই॥"

এই সাধনা সম্বন্ধে রামপ্রসাদের গুরু কে ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। একথা প্রসাদ কোথাও ব্যক্ত করেন নাই। কারণ,—

"গুরু মন্ত্র ইষ্ট মন্ত্র পরমায়ু ধর্ম্ম। ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥"

তবে এক স্থলে তাঁহার ভণিতায় আছে,—

"কৃপানাথ উপদেশ, প্রসাদ ভক্তের শেষ [illegible] দিয়া লৈতে চায়।"

[illegible] রায়ের [illegible]

ইহাতে কেহ [illegible] যে, কৃপানাথ তাঁহার গুরুর নামও হইতে পা[illegible]

[illegible]সে যাহা হউক, সঙ্গীতও তাঁহার সাধনা ও উপাসনার প্রধান অঙ্গ ছিল। যথাস্থানে আমরা তাহার বিষয় উল্লেখ করিব।

রামপ্রসাদের বাসস্থান কুমারহট্ট গ্রাম মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারি-ভুক্ত ছিল। এই স্থান গঙ্গার নিকটস্থ বলিয়া মহারাজা এস্থানে এক ধর্ম্মাধিকরণ ও বায়ুসেবনালয় নির্ম্মাণ করেন। অবসর ক্রমে তিনি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বিশ্রাম করিতেন। সকলেই জানেন, তৎকালে তাঁহার ন্যায় গুণজ্ঞ, বিদ্যার উৎসাহদাতা এদেশে আর কেহই ছিলনা। এদেশের প্রায় সকল প্রধান পণ্ডিতই তাঁহার সভাসদ ছিলেন। সকলেরই উপযুক্তমত বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। হরিরাম, গোপাল, বীরেশ্বর, রামেশ্বর, শিবরাম, বলরাম, শঙ্কর, দেবল, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি অনেক বিদ্যাবিশারদগণ তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তাঁহার সভায় মুক্তারাম, গোপাল ভাঁড় প্রভৃতি রসিক ও পরিহাসজ্ঞ লোকও ছিলেন। গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার কবিতাপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়া আজিও বাঙ্গালাকে আমোদিত করিতেছে। সুতরাং এরূপ গুণগ্রাহী লোকের নিকট যে রামপ্রসাদ অধিক দিন অপরিচিত থাকিবেন, তাহা সম্ভব নহে।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যখন কুমারহট্টে বাস করিতেন, তখন মহারাজা, রামপ্রসাদকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া পরমানন্দিত হইতেন। এ সময়ে ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পরিচিত হন নাই। সেই জন্য তিনি রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্বশক্তি ও পরমার্থিক ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সভাসদ করিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ সম্পূর্ণ সংসারবিরাগী ও বাসনাশূন্য ছিলেন। তিনি জানিতেন, "ক্ষিপ্ত যে স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে"। "আমি তাই অভিমান করি, আমায় করেছ গো মা সংসারী" প্রভৃতি গীতই তাহার পরিচয়। সুতরাং তিনি এই সুবিধা-জনক রাজপ্রসাদ গ্রহণ ক[illegible] না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাতে কোনরূপ বিরক্ত না হইয়া [illegible] বিঘা নিষ্কর ভূমি, ও 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করিলেন। শুধু স[illegible] কবিত্ব দেখিয়া যে মহারাজ তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন, তাহা [illegible]আ-দের বোধ হয় না। তিনি অবশ্য রামপ্রসাদের কবিত্ব-শক্তি কাব্যের দ্বারা

পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে কাব্য এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার বিদ্যা সুন্দর এই ঘটনার পরে লিখিত হয়;—কারণ ভণিতাতেই তাহা প্রকাশ আছে।। তবে এই বিদ্যাসুন্দরের শেষে অষ্টমঙ্গলা পাঠে বোধ হয় যে, তাঁহার অন্য কাব্যও ছিল।

কবিরঞ্জনের জীবনের সহিত কুমারহট্টনিবাসী অচ্যুত গোস্বামীর (কেহ কেহ বলেন, অযোধ্যারাম গোস্বামী) সহিত কতকটা সম্বন্ধ আছে। ইহার চলিত নাম আজু গোঁসাই। ইনি বৈষ্ণব ছিলেন—সুতরাং কালী ভক্ত রামপ্রসাদের সহিত ইহাঁর বিবাদ ছিল। রামপ্রসাদ যে গান করিতেন,—অনেক সময় ইনি তাহার পালটা স্বরূপ গান বাঁধিতেন। অনেকে ইহাঁকে পাগল বলিত। কিন্তু ইনিও এক জন কবি, ভক্ত ও ভাবুক ছিলেন, সন্দেহ নাই। কুমারহট্টে অবস্থিতি কালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া তাঁহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব লাগাইয়া দিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন। মহারাজ বৈষ্ণবদিগের উপর তত শ্রদ্ধাবান ছিলেন না বলিয়াই হউক, অথবা আজু গোঁসাইয়ের কবিত্বশক্তি উৎসাহের উপযুক্ত ছিল না বলিয়াই হউক,—তিনি তাঁহাকে রীতিমত উৎসাহ দেন নাই।

সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক না হইলেও এস্থলে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইয়ের উত্তর-প্রত্যুত্তর দুই একটী উদ্ধৃত হইল।

রামপ্রসাদের গান।—

"এ সংসার ধোকার টাটি। ওরে ভাই খাই দাই মজা লুটি॥"

আজু গোঁসাই,—

এ সংসার সুখের কুটি।
ওরে খাই দাই ম[illegible]।
যার যেমন [illegible] ও রাঁয়ের [illegible]পারপাট।
[illegible] কেবল মোটামুটি॥
[illegible] ওরে ভাই বন্ধু দা[illegible]সুত পিড়ি পেতে দেয় দুধের বাটী।"

রামপ্রসাদের গান,—

"মুক্ত কর মায়া-জালে।"

আজু গোঁসাই,—

"বন্ধ কর মা খেপলা জালে।
গাতে চুণ পুটী এড়বেনা, মজা মারব খোলে ঝালে॥

রামপ্রসাদ আজু গোঁসাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাট আর পাগলের ছাট মলেও যায় না॥"

আজু গোঁসাই উত্তর দিয়াছিলেন,—

"কর্ম্ম-চোর স্বভাব-চোর আর মদের ঘোর মলেও যায় না॥"

রামপ্রসাদের স্ত্রী বৃদ্ধ বয়সে গর্ভবতী হন—আজু গোঁসাই বিদ্রূপ করিয়া বলেন,—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকা ঘুটী॥"

এই কয়টী সামান্য ঘটনা ব্যতীত রামপ্রসাদের জীবনের আর ঘটনা জানা যায় না। বাস্তবিক যাঁহাদের জীবন কর্ম্মময়—ঘটনাই যাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, তাঁহাদের জীবনেই ঘটনাবৈচিত্র্য আছে। বীর-দিগের ঐতিহাসিক জীবনই ঘটনাময়। নতুবা যাঁহাদের ভাবময় জীবন, যাঁহারা সংসারের কোলাহল হইতে দূরে থাকিয়া, নির্লিপ্ত ভাবে নির্ব্বি-বাদে জীবন অতিবাহিত করেন, তাঁহাদের জীবনে বৈচিত্র্য কোথায়? তাঁহাদের জীবনে বহুল ঘটনার সমাবেশ কোথায়? এই জন্যই অধিকাংশ কবিদিগের জীবনচরিত পাওয়া যায় না। বাস্তবিক তাঁহাদের কৃত কাব্যের সহিত তাঁহাদিগের জীবন একীভূত হইয়া যায়—সুতরাং কাব্য ব্যতীত তাঁহাদের জীবনের স্বতন্ত্র সত্বা থাকেনা। ভাববৈচিত্র্যেই রাম প্রসাদের জীবনের বৈচিত্র্য—কাব্য ও সংগীতে তাঁহার সেই ভাব পূর্ণ-স্ফুর্ত্তি পাইয়াছে। সুতরাং সেই কাব্য ও সঙ্গীত ব্যতীত তাঁহার জীবনের আর কিছু আমাদের জানিতে যাওয়া অন্যায় অথবা অনর্থক। যদি শক্তিবিশেষের সমাবেশই আমাদের জীবন হয়, আর যদি সেই শক্তির ক্রিয়ার দ্বারা মানুষের মনুষ্য[illegible] হয়, [illegible] সাধনা ও সঙ্গীতে সেই শক্তির পূর্ণ বি[illegible]য়াছিল বলিয়া, সেই সকল সঙ্গীত ব্যতীত রামপ্রসাদের জীবনে আর কিছু [illegible]তব্য থাকিতে পারে না।

বাস্তবিক রামপ্রসাদ কোন্ সময়ে কত বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন,

তাহা পর্য্যন্তও জানা যায় না। তবে শাস্ত্রনিষ্ঠ সাধুপুরুষের প্রায়ই দীর্ঘ জীবন হয়;—রামপ্রসাদের তাহাই হইয়াছিল সম্ভব। বিশেষতঃ তাঁহার "লাখ উকীল" অথবা লক্ষ সঙ্গীত রচনা করা যদি সত্য হয়, তবে অবশ্য তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন, নতুবা এত গীত রচনা করা সম্ভবে না। আর এক কথা—তাঁহার শেষ পুত্র হইলে বৃদ্ধ বয়সের পুত্র বলিয়া আজু গোঁসাই রহস্য করিয়া "তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা" প্রভৃতি যাহা বলিয়াছিল, তাহা হইতেও বোধ হয় যে, রামপ্রসাদ বৃদ্ধ বয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সজ্ঞান মৃত্যুর গল্পেও সেই কথা প্রমাণিত হয়—নিম্নে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

সাধক রামপ্রসাদের জীবন সম্বন্ধে কতকগুলি অলৌকিক উপাখ্যান আছে। অদ্যাপি অনেকে তাহা বিশ্বাস করেন। নিম্নে তাহার কয়েকটী উদ্ধৃত হইল।

১। এক দিন রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে গান করিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন। জগদীশ্বরী কার্য্যান্তরে হঠাৎ সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু রামপ্রসাদ তাহা দেখেন নাই। কিন্তু দড়ী পূর্ব্বমত বেড়ার অপর পার্শ্ব হইতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছিল। জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া বেড়া বাঁধা অনেক হইয়াছে দেখিয়া,—কে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিল জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন রামপ্রসাদ বলিলেন,—"কেন মা! তুমিই ত এতক্ষণ দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলে।" তখন রামপ্রসাদ সকল কথা জানিলেন—বুঝিলেন যে, স্বয়ং দেবী তাঁহার কন্যারূপে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলেন।

২। আর একদিন রামপ্রসাদ গঙ্গা স্নান করিয়া বাটী আসিলে তাঁহার মাতা বলিলেন, রামপ্রসাদ! [illegible]পায়পাটী। স্ত্রীলোক তোর গান শুনিতে আসিয়াছিল, তো[illegible] কেবল মোটা[illegible] চণ্ডীমণ্ডপে কি লিখিয়া গিয়াছে? রামপ্র[illegible] দেখিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা [illegible]হার গান শুনিতে আসিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ তখনই আর্দ্র-বস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া "মন চল রে বারাণসী" ইত্যাদি গান করিতে

করিতে কাশী যাত্রা করিলেন—এবং ত্রিবেণীর নিকটস্থ কোন গ্রামে গিয়া সে রাত্রি অবস্থান করিলেন। সেই রাত্রিতে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে কাশী না গিয়া সেই খানেই গান শুনাইতে বলেন। রামপ্রসাদ "কাজ কি আমার কাশী" "কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী" প্রভৃতি গান করিয়া সেবার বাটী ফিরিয়া আসেন।

৩। শিবা,—শিবারূপ ধারণ করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

৪। তিনি গাব গাছ হইতে পদ্ম নাবাইয়া কালীপূজা করিয়াছিলেন

এই সকল অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে প্রসাদপ্রসঙ্গকার লিখিয়াছেন, "এই সকল ঘটনা সাংসারিক ভাবে অলৌকিক ও অসম্ভব ,কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে নিতান্ত সঙ্গত।"

৫। রামপ্রসাদের মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পূর্ব্বেই আপনার মৃত্যুর কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে কালীপূজা করেন। পরদিন বিসর্জ্জনের সময়, আপন পরিবারদিগকে নিজ আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া, সকলের সহিত গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং গঙ্গায় কালী বিসর্জ্জন দিয়া অর্দ্ধনাভি গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, চারিটি গান করেন। "কালী গুণ গেয়ে বগল বাজায়ে" "বল দেখি ভাই কি হয় মলে," "নিতান্ত যাবে দিন"—এই তিনটী গান গাহিয়া পরে "তারা, তোমার আর কি আছে মনে" এই গানের "মাগো ওমা আমার দফা হল রফা দক্ষিণান্ত হয়েছে" এই শেষ অংশটুকু গাহিবামাত্র, ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। "তাঁহার মৃত্যু রোগে হয় নাই—ভাবে মৃত্যু।" বাস্তবিক যেমন কাচময় গৃহে আবদ্ধ থাকিলে—বাহিরের সমস্ত বস্তুই নখদর্পণে দেখা যায় [illegible] যাওয়া যায় না—সেইরূপ সিদ্ধ পুরুষগণও এই দেহ মধ্যে [illegible] অতীন্দ্রিয় বিষয়ই নখদর্পণে দেখিতে পান। প্রসাদ নিজ মৃত্যু-সম [illegible] ইহা আশ্চর্য্য কি? এখনও মধ্যে মধ্যে কোন কোন লোকের এইর [illegible] আশ্চর্য্য-মৃত্যুর কথা শুনা গিয়াছে।

রামপ্রসাদ তান্ত্রিক মতাবলম্বী সাধক ছিলেন, সুতরাং তিনি উপাসনার অঙ্গবোধে কিঞ্চিৎ সুরাপান করিতেন। ইহাতে অনেকে তাঁহাকে মাতাল বলিত,—কিন্তু তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ হইতেন না। শুনা যায়, এক-তথাকার প্রসিদ্ধ অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়া বিদ্রূপ করায়, তিনি তাহার উত্তরে গাহিয়াছিলেন—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই রে কুতূহলে।
আমার মন-মাতালে মেতেছে আজ, মদ-মাতালে মাতাল বলে॥"

এক্ষণে কবিরঞ্জনের গ্রন্থের কথা বলা যাউক। "তাঁহার গ্রন্থমধ্যে কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরই বৃহৎ ও প্রধান।" ইহা ব্যতীত কালীকীর্ত্তনই রামপ্রসাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্য। ইহাতেই তাঁহার রচনা-শক্তির বিশেষ বিকাশ দেখা যায়। যিনি সমস্ত জীবন কালী-সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কালীতে আহার, কালীতে বিহার, কালীতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কালী-কীর্ত্তন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তনের রচনা মহাকাব্যের মত সুশৃঙ্খল-নিবদ্ধ নহে,—উহার অধিকাংশই কেবল গানময়। ঐ সকল গীতে যে অতি উৎকৃষ্ট রচনা আছে, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।"

এই দুই খানি কাব্য ব্যতীত রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্ত্তন ও শিবকীর্ত্তন নামক আরও দুইখানি কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই দুই খানি পুস্তকই এখন পাওয়া যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াও উহার কয়েকটী শ্লোক বই বাহির করিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক, কবিরঞ্জনের পদাবলীই তাঁহার অতুলকীর্ত্তি। সঙ্গীত-সাধনই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। বাল্যকাল হইতে যখনই তাঁহার মনে ভক্তির উদয় হইত, [illegible] পারিপাট্যে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতেন। [illegible] ভক্তিময় ছিল, সুতরাং তাঁহার মনে সর্ব্ব[illegible] ভক্তিরই উচ্ছ্বাস হইত। এ কারণ তাঁহার গীত রচনায় [illegible]লাকাল, স্থান অস্থান ছিল না, প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার মুখ হইতে স্বতঃই সঙ্গীত নির্গত হইত। আমরা অনেক সাধকের কথা শুনিয়াছি,

তাঁহারা নিজ ইষ্টদেবতার পূজার পরে প্রত্যহ তাঁহার মহিমাব্যঞ্জক সঙ্গীত রচনা করিয়া প্রথমে তাহা গান করিয়া তবে আসন হইতে উঠিতেন। কবিরঞ্জন যে শুধু পূজার পর এরূপ গীত রচনা করিতেন, তাহা নহে,—যখনই তাঁহার মনে ভক্তির উচ্ছ্বাস হইত, তখনি সঙ্গীতে তিনি তাহা ব্যক্ত করিতেন।"

রামপ্রসাদ এইরূপ মুখে মুখে অবলীলাক্রমে গান রচনা করিতে পারিতেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিত। সঙ্গীত রচনা করিতে তাঁহাকে তিলার্দ্ধও ভাবিতে হইত না। তিনি কখনও পরকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে, বা যশস্বী হইবেন বলিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন না। তিনি যে অবলীলাক্রমে সঙ্গীত রচনা করিতে পারিতেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ দুই একটি ঘটনা উদ্ধৃত হইল।

কোন সময়ে রথ যাত্রা উপলক্ষে রাজা নবকৃষ্ণ রামপ্রসাদের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহাকে রথ সম্বন্ধে গান শুনাইতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ তখনি গাইলেন,—

"কালী কালী বল রসনারে। ঐ ষটচক্র রথমধ্যে শ্যামা মা মোর বিরাজ করে।"

আর একদিন মহারাজা নবকৃষ্ণ দোলযাত্রা উপলক্ষে 'প্রসাদকে গান করিতে বলিলেন। প্রসাদ গাইলেন,—

"হৃদ্-কমল-মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা। মন-পবনে দোলাইছে দিবস রজনী ওমা॥"

কোন সময়ে রামপ্রসাদ চড়ক দেখিতে গিয়া ভাবে বিভোর হইয়া গাহিলেন,—

ওরে মন-চড়কী চড়ক কর এ ঘোর সংসারে॥

একদা রামপ্রসাদ কাশী গিয়াছিলেন। তিনি তথায় সমুদায় দেবতা দেখিলেন,—কিন্তু বেণীমাধব [illegible] ই। তখন অন্নপূর্ণা বেণীমাধবরূপে স্বপ্নে রামপ্রসাদকে দেখা [illegible] লেই রামপ্রসাদ গাহিলেন,—

"কালী হলি মা রাসবিহারী। নটবর বেশে বৃন্দাবনে॥"

দেবী অন্নপূর্ণার আদেশে তাঁহাকে গান শুনাইতে কাশী যাইতে যাইতে, পথিমধ্যে স্বপ্নে অন্নপূর্ণাকে গান শুনাইবার আদেশ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তিনি যে গান গাইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

ইহা হইতেই স্পষ্টই দেখা যায় যে, রামপ্রসাদ অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি কখন স্বরচিত সঙ্গীত কাগজে কলমে লিখিয়া রাখিতেন না,—আর তখন বোধ হয় সেরূপ রীতিও ছিল না। বিশেষ তিনি বোধ হয়, এক সঙ্গীত কখন দুইবার গাহিতেন না। কারণ, তিনি শক্তিসাধনার জন্য প্রত্যহ নূতন সঙ্গীত রচনা করিতেন। রচিত সঙ্গীত কেমন হইল, তাহা তাঁহার ভাবিয়া দেখিবারও অবসর ছিল না। যে সকল সঙ্গীত অন্য লোকে তাঁহার নিকট শুনিয়া ভাল বোধে অভ্যাস করিত, তাহাই ক্রমে লোক পরম্পরায় প্রচলিত হইয়াছে। বাকী সমস্ত সঙ্গীতই আর পাইবার উপায় নাই। বোধ হয় যে, তাঁহার সঙ্গীতের এক সহস্রাংশও এখনও পাওয়া দুষ্কর; আবার যাহা পাওয়া যায়, তাহারও পাঠে অনেক ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছে।

প্রসাদের একটী গানে "লাক উকীল করেছি খাড়া" এই কথার উল্লেখ আছে। ইহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে, তিনি লক্ষ গীত রচনা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তিনি যেরূপ শিশুকাল হইতেই সাধনা ও সঙ্গীত রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন ও যেরূপ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন বোধ হয়, তাহাতে যে তিনি যে লক্ষ সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে।

কবিরঞ্জন সঙ্গীতে বড়ই ভক্ত ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরে যে স্থলে শবসাধনার বর্ণনা করেন, সেস্থলে তিনি আপনার ভাবে আপনি মুগ্ধ হইয়া নিজের সঙ্গীত-প্রিয়তার প[illegible] [illegible]পারপাটী [illegible]

[illegible] কেবল মোটা[illegible]
[illegible] বস্তু [illegible]ত পিড়ি [illegible] গানে হব মত্ত।"

শুধু [illegible] সঙ্গীত রচনা করিতেন, তাহা নহে। তিনি রচিত সঙ্গীতগুলি অতি সুন্দর করিয়া গাহিতেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর তত মিষ্ট ছিল না সত্য, কিন্তু রচিত গান গুলি গাহিয়া তিনি পাষাণকেও দ্রব করিতে

পারিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার "প্রসাদী সুর" এত সহজ ও এত হৃদয়ভেদী যে, তাহাতে লোকে সহজেই মোহিত হয়, অথচ যে আদৌ সঙ্গীত জানে না, সেও তাহা গাহিতে পারে। অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদ এই সুর সৃষ্টি করিয়াছিছেন। ইহার দ্বারাই তাঁহার ভাবুকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ যে বলিয়াছিলেন,—

"ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা"

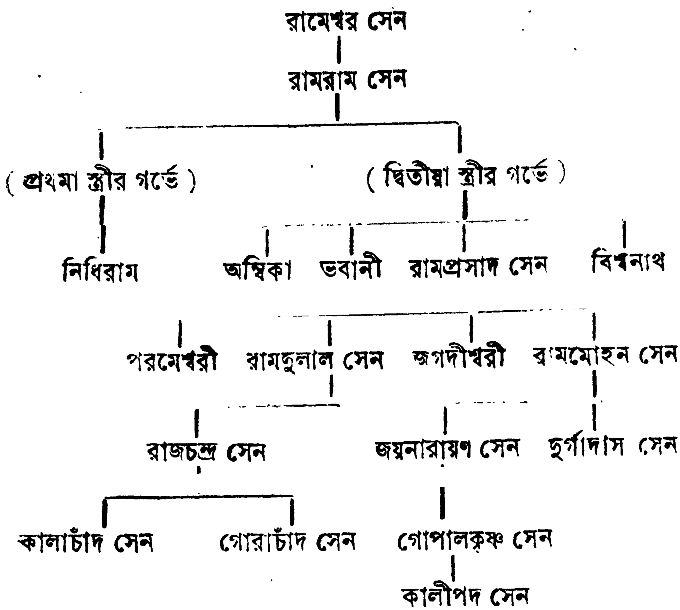
তাহা যথার্থ বটে। তাঁহার নিকট কাব্যও সঙ্গীত অপেকৃষ্টনাক্ষ এই জন্যই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সঙ্গীত এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে। কবিরঞ্জনের গানের মোহিনীশক্তি সম্বন্ধে এইরূপ গল্প আছে যে, তিনি একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মুরশিবাদে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি নৌকায় গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিতে করিতে এক মনে গান গাহিতে ছিলেন। ঘটনাক্রমে নবাব সিরাজ সেই সময়ে জলবিহারে বহির্গত হইয়াছিলেন। তিনি রামপ্রসাদের গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইলেন; এবং তাঁহাকে নিজ নৌকায় ডাকাইয়া আনিয়া গান করিতে বলেন।

রামপ্রসাদ প্রথমে হিন্দী গান গাহিলেন। নবাব তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, "না ও গান নয়, ঐ নৌকায় যে গান গাহিতেছিলে, সেই গান গাও।" তখন রামপ্রসাদ প্রসাদী সুরে গান ধরিলেন। সিরাজের মন একেবারে বিগলিত হইয়া গেল।"

রামপ্রসাদ কৃত বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরীদর্শনে নাগরীগণের কথা,—

'কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর বিবেচনা কর কি তরুতলে
শিখরী অচল, এ দেখি সচল, সপক্ষ সমল সকলে বলে॥
কেহ কেহ হাসি, মনে হেন বাসি, সৌদামিনীরাশি এমনি হবে।
আর জন কহে, যে [illegible] সৌদামিনী রহে স্থিরতা কবে॥
কি রূপ-লাবণ্য, এ পুরুষ ধন্য, [illegible] বটে।
কহে এক সতী, সেই ভাগ্যবতী, সুন্দর [illegible]
হৃদয়মাঝারে, রাখিয়ে ইহারে, নয়নদুয়ারে কুলুপ দিয়া।
রূপ নহে কালো, নিরখিতে আলো, দেখ সখি আলো আঁখি মুদিয়া॥

রামপ্রসাদ সেনের বংশ তালিকা



রামপ্রসাদের দুইটী গান,—

এবার আমি বুঝ্‌বো হরে।
মায়ের ধর্‌বো চরণ লব জোরে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বল্‌বো এবার যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে॥
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বল্‌বো তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কেমন করে॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন্ বিচারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গা[illegible]পরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় [illegible]পাপী [illegible]দের জোরে।

[illegible] কেবল মোটা[illegible] –

[illegible] বস্তু [illegible] পিড়ি [illegible] ভাবনা কিবে।
[illegible] মোহ-ময়ী রাত্রি গতা, সংপ্রতি প্রকাশে দিবে।
অরুণ উদয় কাল, ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল, প্রকাশ করেছে শিবে॥

বেদে দিলে চক্ষে ধূলা, ষড় দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা, খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবে॥
যেখানে আনন্দ হাট, গুরু শিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তারি নাট, তত্ত্বে তত্ত্ব কে পাইবে॥
যে রসিক ভক্ত শূর, সেই প্রবেশে সেই পুর।
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলো ভুর, আগুন বেঁধে কে রাখিবে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

সাধক কমলাকান্ত ১২১৬ সালে অম্বিকা কালনা হইতে বর্দ্ধমান আসেন। বর্দ্ধমানের মহারাজ তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত করেন। ক্রমে কমলাকান্ত,—মহারাজের গুরুপদে বরিত হন। মহারাজ বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কোটালহাট গ্রামে গুরুদেবের বসত-বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই ভবনে কমলাকান্ত প্রতিবৎসর সমারোহে শ্যামাপূজা করিতেন। এই সময়ে কমলাকান্তের সঙ্গীতপীযুষ-ধারায় বর্দ্ধমান-বঙ্গ ডুবু ডুবু হইয়া উঠে।

ভক্ত কমলাকান্ত একবার ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গায় দস্যুহস্তে পতিত হন। দস্যুগণ তাঁহাকে প্রাণে মারিবার চেষ্টা পায়। নির্ভীক সাধু উচ্চৈঃস্বরে মায়ের নাম আরম্ভ করিলেন,—

"আর কিছু নাই শ্যামা! কেবল তোমার দুটী চরণ রাঙ্গা॥

এই গান শুনিয়াই দস্যুগণ বৈরবুদ্ধি ত্যাগ করিল,—ভক্তের চরণে লুটাইয়া পড়িল। কমলাকান্তের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে,—চিতানলে শব ধূ ধূ পুড়িতেছে,—চিরসংসারবিরাগী কমলাকান্ত, ইহা দেখিয়া, নৃত্য করিতে করিতে গান আর[illegible],—

'কালি [illegible] পরিহি[illegible]

প্রবাদ আছে,—কমলাকান্তের মৃত্যুর [illegible] তেজশ্চন্দ্র তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হন। তাহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার [illegible] বহু চেষ্টা পান। মুমূর্ষু কমলাকান্ত বলেন,—

কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব।
"আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে, বিমাতার কি শরণ লব।"

কুমার প্রতাপচাঁদ কমলাকান্তের শিষ্য হন। কমলাকান্তের একটী গান তুলিয়া দিলাম,

রামকেলি—একতাল।

জান নারে মন, পরম কারণ, শ্যামা কভু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়া ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
কভু বাঁধে ধড়া, কভু বাঁধে চূড়া, ময়ূরপুচ্ছ শোভিত তায়।
কখন পার্ব্বতী, কখন শ্রীমতী, কখন রামের জানকী হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লয়ে অসি, দানবচয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ, করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপন মায়ায়, আপনি বাঁধা, আপন মহিমা আপনি গায়।
যে রূপে যেজন, করয়ে ভজন, সেইরূপে তার মানসে রয়।
কমলাকান্তের, হৃদি-সরোবরে, কমলমাঝারে হয় উদয়॥

রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভাষা-কবিতায় ইনি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাঁর নিবাস, নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটেরি গ্রামে। পিতার নাম বলরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৭৬০ শকে ইনি রামায়ণ রচনা সম্পূর্ণ করেন। ইহাঁর রামায়ণ ভক্তিরস প্রচুর। একটু পরিচয় লউন।

মাল্যবান-পর্ব্বতে রামলক্ষ্মণ বর্ষাকাল যাপিত করেন। তখনকার একটু বর্ণনা এইরূপ,—

"কুটীরে করেন বাস কমল লোচন। সীতার [illegible] সদা ঝোরে দুনয়ন॥
সান্ত্বনা করেন সদা [illegible] কেবল মোটা [illegible] রাঘবের দেহে রহে প্রাণ॥
আষাঢ়ে [illegible] পিড়ি [illegible] যেমত সুন্দর শ্যাম রামের বরণ।
[illegible] গর্জ্জে অতি অসহ্য। যেমন রামের ধনু টঙ্কারের রব॥
[illegible] রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে। যেমন রামের রূপ সাধকের মনে॥
ময়ূর করয়ে নৃত্য সব মেঘ দেখি। রাম দেখি সজ্জন যেমত হয় সুখী॥

সদা জলধারা পড়ে ধরণী উপরে। সীতা লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে॥
সরসিজ শোভাকর হৈল সরোবরে। যেমত শোভিত রাম সেবক-অন্তরে॥
মধু আশে পদ্মে অলি বাস করে মোদে। যেমত মুনির মন রাঘবের পদে॥
জলপানে চাতকের তৃষ্ণা দূরে যায়। রাম পেলে যেমত বাসনা ক্ষয় পায়॥
পুলকিত হয়ে মেঘ ডাকে ঘনে ঘন। যেমত রামেরে ডাকে নাম-পরায়ণ॥
নদ নদী অতি বেগে সমুদ্রে মিশায়। যেমত রামের অঙ্গে জীব লয় পায়॥
অগাধ-সলিলে মীন হইল নির্ভয়। রাম পেয়ে যেমত নির্ভয়ে জীব রয়॥
অবিরত বৃষ্টিতে পৃথ্বীর তাপ যায়। যেমত তাপিত রাম নামেতে জুড়ায়॥"

হনুমানের মুখে রামরূপের বর্ণনা,—

"কুটিল কুন্তলে শিরে শোভে জটাভার। বিশাল সুন্দর অতি কপাল তাঁহার॥
কামের কামান জিনি চারু ভ্রূযুগল। আকর্ণ নয়ন তাঁর জিনিয়া কমল॥
তিল ফুল নহে তুল রামের নাসার। ওষ্ঠাধর মনোহর তুলা নাহি তার॥
মুখশশী রূপরাশি সুচারু দশন। হাস্য কালে দ্যুতি খেলে তড়িৎ যেমন॥
সুন্দর চিবুক গজস্কন্ধ চিত্তহর। আজানুলম্বিত বাহু জিনি করিকর॥
চারু বক্ষ চারু কক্ষ নাভি সরোবর। সিংহ জিনি কটি খানি জঘন সুন্দর॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ আদি চিহ্ন পদতলে। বিপ্রপদ চিহ্ন এক আছে বক্ষঃস্থলে॥
নব জলধর কিবা ইন্দ্রনীল মণি। তরুণ তমাল কিবা অঙ্গের বরণি॥
কোটি শশধর জিনি নখরের আভা। কোটি দিবাকর জিনি রাঘবের প্রভা॥
সুধারূপ শান্তরূপ বর্ণিতে কে পারে। রামে দেখি কেহ আঁখি ফিরাইতে নারে॥
কোটি কাম জিনি রাম পরম সুন্দর। মিষ্টভাষী দুষ্টদ্বেষী শিষ্ট হিতকর॥
চরণ অর্পণ যদি করেন শিলায়। পাষাণ গলিয়া পদ-চিহ্ন পড়ে তায়॥
পরম দয়াল রাম সম সর্ব্ব প্রতি। মহাদানী মহাগুণী মহাশুদ্ধ মতি॥
সত্যসন্ধ রামচন্দ্র প্রণতপালক। শরণ পালক দ্বিজ কুলের রক্ষক॥
সিন্ধু সম সুগম্ভীর ধরাসম ক্ষমা। ত্রিজগতে নাহি দিতে রামের উপমা॥"

অসিতার রূপ-বর্ণনা,—

"অজিতা অমিতা অসিতা সতী। নিগমে না জানে তাঁহার গতি॥
অতি ভয়ানক তনু অপরূপ। কেমনে বর্ণিতে পারি সেরূপ॥
বারিদ বরণী বিমলা বরা। [illegible] পরাইয়া॥
মণির মুকুট শোভে মস্তকে। তার অগ্রে [illegible]
চিকণ চিকুর পড়ে ভূতলে। সিন্দূরের [illegible]বিন্দু ভালে॥
রাতুল বিশাল নয়ন রয়। দৃষ্টিপাতে যম মূর্চ্ছিত হয়।
কোটি রবি জিনি অঙ্গের প্রভা। কোটি শশী জিনি নখের আভা॥

গলে দোলে গজমতির মালা। জলধরে যেন স্থির চপলা॥
কর্ণে কর্ণপুর শোভিছে ভাল। বিকট দশন বক্ষ বিশাল॥
চারি করে চারি কৃপাণ সাজে। কটি দেশে কোটি ঘণ্টিকা বাজে॥
চরণে নূপুর সুরব-কারী। বিবসনা রণে রামের নারী॥
কোপেতে নয়ন কপালে চড়ে। যোজন অন্তর চরণ পড়ে।
অট্ট অট্ট হাস করেন সতী। দেখিয়া ভয়েতে কাঁপে ভূপতি॥"

কবি রামমোহন একান্ত রাম-ভক্ত ছিলেন; স্বগৃহে তিনি সীতারাম-বিগ্রহ স্থাপিত করেন।

কৃষ্ণদাস।

কৃষ্ণদাস,—বৈষ্ণবগ্রন্থ-রচয়িতা। ইহাঁর "চমৎকার চন্দ্রিকার" পদ্যানুবাদ লালিত্য-রস-পরিপূর্ণ। চমৎকার চন্দ্রিকা,—বিখ্যাত টীকা-কার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস,—সেই গ্রন্থেরই অনুবাদ করিয়াছেন। ইহাঁর জীবন-পরিচয় দুষ্প্রাপ্য। তবে, পদ্য চমৎকার-চন্দ্রিকা পাঠে জানিতেছি,—ইনি বৃন্দাবনে-রাধাকুণ্ডে বাস করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নাম-স্মরণই ইহাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। ইনি অকপট বৈষ্ণব।

চারিটি "কুতুহলে" চমৎকার-চন্দ্রিকা গ্রথিত। মধুর রসের সহিত হাস্য রসের সংমিশ্রণে এ গ্রন্থ একান্ত প্রীতিপ্রদ। কবিতা সরস এবং প্রাঞ্জল;—

"এতেক শুনিয়া তবে কুটিলা বচন। ভ্রমি ভ্রমি কালীহ্রদে করিল গমন॥
তথায় যাইয়া দেখে কুঞ্জের ভিতরে। কেশী তীর্থ পাশে পুষ্পোদ্যান মনোহরে॥
সকল কানন পূর্ণ পরিমলময়। সখী সঙ্গে রাই [illegible] দেখিবারে পায়॥
কীর্ত্তিদার কীর্ত্তি বলি রাইভয় [illegible] দেখিয়া কহেন কিছু বাণী॥
"শুনহ কুটি[illegible] কেবল এখানে আইলা কিবা কহিবা আমারে॥"
কু[illegible] কহেন,—আমি স্নানে নাহি আসি। কি কার্য্যে আইলা তবে, রাই কহে হাসি
[illegible]লা কহেন,—এই তোমা সভাকার। চরিত্র দেখিতে হৈল গমন আমার॥
কটিল্লা কহেন তবে ললিতার প্রতি। নিশ্চয় জানিল আমি তো-সভার রীতি॥

কি কারণে এই স্থানে হরিগন্ধ পাই। বিদিত হইল কর্ম্ম,—ছলে কার্য্য নাই॥
হরি শব্দে কৃষ্ণ আর সিংহকে কহয়। অর্থ ফিরাইয়া তাহা ললিতা কহয়॥
শুনহ কুটিলা যদি সিংহ এথা আছে। তবে বল আমরা লুকাব কার কাছে?
যুক্তি সব মুগ্ধ বড় ভয় হইল মনে। পলাইয়া যাই শীঘ্র আপন ভবনে॥
বড় ভাল হৈল তবে শুনহ কুটিলা। যাতে স্নেহ করি তুমি এথায় আইলা॥"

ত্রিলোচন চক্রবর্ত্তী।

ইনি সরল সুমধুর কবিতায় বেদব্যাস-প্রণীত মূল মহাভারতের সরল অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার জন্ম-সময় বা বাসস্থানাদির পরিচয় কিছুই পাই নাই।

তবে বুঝিয়াছি, ইনি কবি,—সূক্ষ্মদর্শী স্বভাব-কবি। গ্রন্থারম্ভে ব্যাসের বন্দনা এইরূপ,—

"ব্যাসের চরণাম্বুজে মোর নমস্কার।
কৃপাবান হও মোরে দেহ শক্তিদান। তোমার রচিত মহাভারতের গান॥
গাইব সতত আমি বাঞ্ছা করি মনে। তোমার দাসের দাস দ্বিজ ত্রিলোচনে॥
রচিল ভারত গ্রন্থ রচিত তোমার। হরিপদে সদা চিত্ত রহুক আমার।"

শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা,—

"সুশোভন শ্রীচরণে, দেখিয়ে নখের কোণে, লোমকূপে চতুর্দ্দশ পুরী।
মহিমা-লাবণ্য বেশ, নিরূপণ করি শেষ, কার শক্তি কহিবারে পারি॥
নবঘন শ্যাম তনু, গজকর সম জানু, শ্যামল সুন্দর কলেবর।
পীতাম্বর পরিধান, মকরন্দ করে পান, পাদপদ্মে ভকত ভ্রমর॥
আজানুলম্বিত কর, শঙ্খচক্র গদাধর, সুশোভিত শোভে শতদলে।
সে চাঁদ অধরে সাজে, বিনোদ মুরলী বাজে, বনমালা বিরাজিত গলে॥
অগৌর চন্দন অঙ্গে, শোভে গোরোচনা সঙ্গে, তিলক-চন্দন শোভে ভালে।
মস্তকে মুকুট-মণি, সহস্রতপন জিনি, [illegible]॥
জয় প্রভু জগৎপতি, মোরে কর অবগতি, মোরে [illegible]
তোমার চরণ পদ্ম, হৃদয়ে করিয়া সদা, চক্রবর্ত্তী ত্রিলোচন গান॥"

সংস্কৃত শ্লোকের ইনি কিরূপ সরল পদ্যানুবাদ করিতে পারিতেন, দেখুন,—সংস্কৃত,—

"তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতোদার-কথা-প্রসঙ্গঃ॥

অনুবাদ,—

'জাহ্নবী যমুনা গোদাবরী সরস্বতী। প্রভৃতি যতেক তীর্থ ধরণীতে স্থিতি॥
অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গ যথায়। সকল তীর্থের গম্য জানিহ তথায়॥"

ত্রিলোচনের শ্রীগুরু বন্দনা,—

"সর্ব্ব আগে বন্দিলাম শ্রীগুরু চরণ। যার কৃপালেশে খণ্ডে ভবাব্ধি-বন্ধন।
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা নাহি ভিন্ন ভেদ। অজ শিব জানে ইহা জানে চারিবেদ॥
গুরু কৃষ্ণ এক আত্মা ভিন্ন বপু হয়। স্বরূপ বচন ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
গুরুরূপে কৃষ্ণচন্দ্র ক্ষিতিতে প্রকটে। শ্রীগুরু করুণা হইলে কর্ম্ম-সূত্র কাটে॥
আগম-নিগম শাস্ত্র যতেক পুরাণ। যজ্ঞ, হোম মহোৎসব কর্ম্ম ক্রিয়া দান॥
পর্য্যটন দরশন যতেক তীর্থাদি। প্রয়াগ-পুষ্কর সুরধুনী সুরনদী॥
গুরুসম তুল্যময় বেদবিধি বলে। সর্ব্বতীর্থ ফল পাই শ্রীগুরু সেবিলে॥"

ত্রিলোচন,—কিশোর বয়সে ভারত-রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন যথা,—

"আমি অতি শিশুমতি কিশোর বয়েস। অপার মহিমা তব নাজানি বিশেষ॥

১৩০৩ সালের বৈশাখের "নব্য ভারতে" শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়,—ত্রিলোচনের রচিত মহাভারতের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ই দিয়াছেন। ত্রিলোচনের ভারত,—বঙ্গ সাহিত্যে বস্তুতই আদরের সামগ্রী।

উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

ইহাঁর গ্রন্থ,—দণ্ডীপর্ব্ব। বৃহৎ কূর্ম্মপুরাণ হইতে এই গ্রন্থ সংগৃহীত। গ্রন্থে,—শুকদেব বক্তা,—পরীক্ষিৎ শ্রোতা।

'বন্দ নারা[illegible] কমলা কল্যাণী কান্তি।
[illegible]লনী, সরোজবাসিনী শান্তি॥
মহালক্ষ্মী মাতা, বাসব-বিধাতা, সেবা করে নিরন্তর।
কে জানে তোমারে, এ তিন সংসারে, শশী তব সহোদর॥
কেবা তব সমা, তুমি সার রমা, অমর কৈলে দেবগণে॥

ক্ষীরোদ-মন্থন, সুধা-উৎপাদন, জননি! তব কারণে॥
আর নানা ধন, কৌস্তুভ রতন, উঠিল উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
হৈলে তব দৃষ্টি, তবে রহে সৃষ্টি, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রয়॥
তুমি জন্ম নিলে, সমুদ্র-সলিলে, তেই রত্নাকর সিন্ধু।
তোমারে ধারণ, করি নারায়ণ, মান্য জগতের বন্ধু॥"

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইনি সরল মধুর পদ্যানুবাদক; সংক্ষেপে সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদ করিতে সিদ্ধহস্ত। দৃষ্টান্ত দেখুন,—

বাসাংসি জীর্ণাণি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

পুরাতন বস্ত্র ছাড়ি নবীন বসন। যেমন সকল লোক কয়য়ে গ্রহণ।
সেইরূপ আত্মা জীর্ণ শরীর ছাড়িয়া। নূতন শরীর লয় স্বভাবে থাকিয়া॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥

এ আত্মাকে অস্ত্রগণে কাটিতে না পারে। দাহ করিবার শক্তি নাহি বৈশ্বানরে॥
আত্মাকে না পারে জল করিতে কোমল। শুষ্ক না করিতে পারে পবন প্রবল॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥

ছেদযোগ্য দাহযোগ্য আত্মা নাহি হন। শোষের অযোগ্য তাতে না হয় শোষণ।
যে হেতুক এই আত্মা নিত্য সর্ব্বব্যাপী। স্থিরতর সনাতন না চলে কদাপি॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি॥

চক্ষুরাদি-গম্য নন মনের বাহির। হস্তাদির গ্রাহ্য নন এই করি স্থির॥
অতএব এ আত্মাকে জান এই মতে। তোমা[illegible] পরিতাপ করিতে॥

দ্বিজ নিত্যানন্দ।

শীতলা-মঙ্গল ইহাঁর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শীতলার জন্ম, শীতলাপূজা, শীতলা-বন্দনা প্রভৃতি কবিতায় সন্নিবিষ্ট।

শীতলার জন্ম,—

"করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন। কত মুনি-ঋষি আইল কে করে গণন।
নির্ব্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি। হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ শান্তমতি॥
যজ্ঞপূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল। তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল॥
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা। দেখি প্রজাপতি তাঁরে যত্নে সুধাইলা॥
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী। কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী॥
দেবী কন অগ্নিকুণ্ডে মম জন্ম হৈল। কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল॥
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন। যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম॥
সে হেতু শীতলা নাম তোমার হইল। মম বাক্যে যাহ তুমি শীঘ্র ভূমণ্ডল॥
তথায় পাইবে পূজা নানা উপহারে। শীতলা বলিয়া নাম ঘুষিবে সংসারে॥
মটর মুসরী বুট লয়ে এই সব। কর গিয়া মর্ত্ত্যপুরে তুমি মহোৎসব॥
শীতলা বলেন দেব করুন শ্রবণ। একা আমি মর্ত্ত্যপুরে করিলে গমন।
দেবতা বলিয়া কেহ পূজা না করিবে। সে কারণে অগ্রে পূজা এইখানে দিবে॥
আর কথা শুন বলি হয়ে একমন। একা না যাইব আমি অবনীভুবন॥
অনুচর সঙ্গে মম দিন এক জন। তারে লয়ে যাব আমি মরতভুবন॥"

কৃষ্ণদাস পণ্ডিত।

"নারদ-সংবাদ"—ইহাঁর গ্রন্থ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দশ অবতারে যে সকল লীলা করিয়াছিলেন, এ গ্রন্থে তাহাই সরস কবিতায় সংক্ষেপে বর্ণিত। বক্তা,—শ্রীকৃষ্ণ; শ্রোতা,—নারদ-ঋষি।

ভগবানের শ্রী[illegible] এখানে [illegible] লীলা উদ্ধৃত হইল ;—

সত্যধামেতে পক্ষ বিনতা-সন্তান। কশ্যপ-ঔরসে জন্ম মহাবলবান্॥
জন্মমাত্র ক্ষুধা তার হইল বিস্তর। আহার মাগিতে গেল মুনির গোচর।
গজ-কচ্ছপেরে দেখাইয়া দিল মুনি। নখেতে বিন্ধিয়া পক্ষী লইল তখনি।

সম্মুখে দেখিল এক দীর্ঘ তরুবর। আহার করিতে বৈসে তাহার উপর॥
ভরেতে ভাঙ্গিল ডাল দেখি পক্ষিরাজ। বৃক্ষের তলেতে আছে মুনির সমাজ।
বাল্যখিল্যমুনি আদি অনেক আছিল। ডাল-ভরে মরে পাছে গরুড় চিন্তিল॥
নখেতে লইল গজ-কচ্ছপ বিন্ধিয়া। ঠোঁটেতে করিয়া ডাল চলিল উড়িয়া॥
বসিবার স্থান তাহে দেখয়ে গরুড়। সুমেরু শিখরে আসি হইল আরূঢ়॥
মনোহর স্থান দেখি বিনতানন্দন। হরষিতে গজকূর্ম্ম করিল ভক্ষণ॥
রক্ত-মাংস একাকার পর্ব্বত-উপর। দেখিয়া করিল ক্রোধ দেব পুরন্দর॥
ঝন ঝনা চিকুর শিলা ঘন বজ্রাঘাত। গরুড়-উপরে ইন্দ্র হানয়ে নির্ঘাত॥
পাখা আচ্ছাদিয়া হরষিতে মাংস খায়। বারেক ইন্দ্রের প্রতি ফিরিয়া না চায়॥
পরম আনন্দে মাংস করিল ভোজন। পাকশাঠ দিয়া পক্ষা উড়িল তখন॥
পাকশাঠ দিয়া তখন গরুড় উড়িল। সুমেরুর শৃঙ্গ ভাঙ্গি সমুদ্রে পড়িল॥
স্বর্ণদ্বীপ হৈল তাতে সমুদ্রের মাঝে। লঙ্কাপুরী বলি নাম রাখেন দেবরাজে॥
মুনির ঔরসে জন্ম রাক্ষসী-উদরে। দেবতা-গন্ধর্ব্ব-আদি সবে ভয় করে॥ * *
কত দিনান্তরে তথা রাজা দশানন। বসতি করিল আসি ভাই তিনজন॥
শ্রীরাম রাখিল নাম করিয়া যতন। ভরত রাখিল নাম কৈকেয়ীনন্দন॥
সুমিত্রার গর্ভে হৈল পুত্র দুইজন। রাখিল তাহার নাম লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
হেনমতে চারি অংশে জন্মিলাম আপনি। বড়ই দুঃখের কথা শুন মহামুনি॥
পঞ্চম বৎসরে বধ করি তাড়কারে। হরধনু ভাঙ্গি বিভা করিলাম সীতারে॥
একদিন দেখি দশরথ নরপতি। মন্ত্রণা করিল মোরে করিতে ভূপতি॥
আয়োজন করি রাজা হরষিত মন। দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না হয় খণ্ডন॥
কৈকেয়ী নামেতে যিনি ভরতজননী। রাজার নিকটে তিনি আইল আপনি॥
কহিতে লাগিল মাতা শুনে নৃপবর। পূর্ব্বে সত্য করিয়া দিবে দুটী বর॥
রাজা বলে কোন্ দ্রব্য চাহ পাটরাণী। যাহা ইচ্ছা চাহ শীঘ্র দিব ত এখনি
মাতা বলে এই চাই শুনহ রাজন্। ভরতেরে রাজ্য দিয়া রামে দেহ বন।
চৌদ্দ বৎসর রাম থাকিবেন বনে। এই বর চাহি আমি তোমার সদনে॥
শ্রুতমাত্রে ভূমিতলে পড়িল রাজন। শ্রীরাম বলিয়া রাজা হন অচেতন॥
শুনিয়া গেলাম আমি পিতার গোচর। অনেক ডাকিনু আমি না পাই উত্তর॥
পিতৃসত্য পালিবারে যাই আমি বন। সঙ্গে চলিলেন সীতা অনুজ লক্ষ্মণ॥
অঙ্গ হৈতে আভরণ কাড়িয়া লইল। জটা বাকল পরাইয়া বিদায় করিল॥
রহিলাম চিত্রকূট পর্ব্বত যথায়। তিন দিনান্তরে [illegible]
মাতুলের গৃহ হৈতে আসি দুই জন। জননীর মুখেতে শুনিল [illegible]
রাম-বনবাস শুনি ভরত মহাকায়। ক্রোধেতে আপন মায়ে কাটিবারে যায়।
নিবারণ কৈল তারে কৌশল্যা জননী। মাতৃবধ কৈলে বাপু কি হবে তা শুনি॥

মায়ের বচনেতে ভরত সাম্য হৈল। গর্জ্জিয়া আপন মায়ে কহিতে লাগিল ॥
আরে আরে পাপীয়সি কি তোর জীবন। কেমন পরাণ ধরে দিলি রামে বনে ॥
উচিত না হয় তার মুখ দেখিবারে। এতেক বলিয়া ভরত আইল বাহিরে ॥
রাজার নিকটে আসি করিয়া রোদন। মম শোকে নরপতি ত্যজিল জীবন ॥
তপ্ততৈলমাঝে রাখি রাজ-কলেবর। ভরত আইল তবে রামের গোচর ॥
সপরিবার যত অযোধ্যানিবাসী। আমার নিকটে সবে উত্তরিল আসি ॥
অনেক কহিল মোরে বিনয় বচনে। তুমি অযোধ্যায় আইস আমি যাই বনে ॥
রাজা আজ্ঞা না করিল আসিতে কাননে। তুমি কেন আইলে প্রভু পাপিনীবচনে।
আমি কহিলাম তুমি রাজা হও গিয়ে। প্রজার পালন কর পিতাসম হয়ে ॥
অনেক প্রকারে বুঝাইয়া ভরতেরে। অযোধ্যায় পাঠাইয়া দিলাম তাহারে ॥
রাজসিংহাসনে রাখি পাদুকা আমার। হেনমতে ভরত পালেন রাজ্যভার ॥
হেথা চিত্রকূট ধামে থাকি তিনজন। মৃগয়া করেন নিত্য অনুজ লক্ষ্মণ ॥
হেনমতে তৃতীয় বৎসর তিনমাস। পরম কৌতুকে আমি তথা করি বাস ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন। তথা হৈতে গেলেন মোরা পঞ্চবটি বন।
সূর্পণখা নামে তথা আসে নিশাচরী। রাবণের ভগ্নী সেই নিকষা-কুমারী ॥
দীর্ঘ নাসা দীর্ঘ দন্ত দীর্ঘনখকেশী। এইমতে চলে যাট হাজার রাক্ষসী ॥
একদিন মায়া করি আইল সূর্পণখা। লক্ষ্মণের নিকটে আসিয়া দিল দেখা ॥
মায়া করি নিশাচরী লাগিল কহিতে। বড় ইচ্ছা হয় মম তোমারে ভজিতে ॥
এত শুনি লক্ষ্মণ ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ। স্ত্রীবধ না করিয়া কাটিল নাককাণ।
অপমান পায়ে সেই লক্ষ্মণের হাতে। নিবেদিল সব কথা রাবণসাক্ষাতে ॥
ভগ্নীর দুর্গতি দেখি ক্রোধিত রাবণ। মারীচ-সহিত আসি পঞ্চবটী বন ॥
মারীচ হইল মায়ামৃগ-কলেবর। সম্মুখেতে নৃত্য করে দেখিতে সুন্দর।
দেখিতে দেখিতে মৃগ গেল বনান্তরে। আমিও গেলেন সেই বনের ভিতরে ॥
এক বাণে বধিলাম মৃগের জীবন। প্রাণত্যাগকালে কৈল ভাই রে লক্ষ্মণ ॥
শুনিয়া লক্ষ্মণ আইল মম অন্বেষণে। শূন্য গৃহ পেয়ে সীতা হরিল রাবণে ॥
মৃগ মারি আইলাম ভাই দুইজন। সীতার দেখিয়া দোহা করিয়ে রোদন ॥
বনে বনে অন্বেষণ করিয়া বেড়াই। সন্ধান পাইনু পক্ষী জটায়ুর ঠাঁই ॥
রাবণ হরিয়া সীতা গেল লঙ্কাপুরে। শুনিয়া ব্যাকুলচিত্ত দুই সহোদরে ॥
বনে বনে ভ্রমি দোঁহে করিয়া রোদন। পঞ্চকপি-সঙ্গে তথা হইল মিলন ॥
[illegible] হনুমান্ জাম্ববান। এই পঞ্চজন তথা বানরপ্রধান ॥
সীতার বারতা আমি কহিলাম তারে। শুনিয়া সুগ্রীব তবে কহিল আমারে ॥
বালীরাজা আছে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর। তার ভয়ে সশঙ্কিত থাকি নিরন্তর ॥
তুমি যদি পার তারে করিতে সংহার। সত্য করিলাম সীতা করিব উদ্ধার ॥

এত শুনি দুই ভায়ে হরষিত হয়ে। বালীকে করিনু বধ প্রকার করিয়ে॥
অঙ্গদ নামেতে তার এক পুত্র ছিল। আমাকে নিন্দিয়া সেই অনেক কহিল॥
কহ প্রভু এ কেমন বিচার তোমার। বিনা দোষে বধ কৈলে জনক আমার॥
কোন্ অপরাধ পিতা কৈল তব ঠাঁই। এ কর্ম্ম উচিত তব না হয় গোসাঞি॥
শুনিয়া তাহার বাক্য হইনু লজ্জিত। কহিলাম অঙ্গদ বর মাগো মনোনীত॥
ক্রোধমনে অঙ্গদ কহেন পুনর্ব্বার। বর যদি দিবে শুন বচন আমার॥
বিনা দোষে তুমি মম বধিলে পিতারে। তোমারে বধিব আমি তেমতি প্রকারে॥
শুনিয়া তথাস্তবাক্য কহিলাম তারে। কৃষ্ণ অবতারে তুমি বধিবে আমারে॥
ব্যাধের কুলেতে জন্ম তোমার হইবে। মৃগ অনুসারে বধ আমারে করিবে॥
বর পেয়ে হরষিত অঙ্গদ হইল। সীতার বারতা আনি তাহারে কহিল॥
শুনিয়া সে সব কথা বালীর নন্দন। বানর কটক ঠাট আনে ততক্ষণ॥
সীতাঅন্বেষণ হেতু গেল হনুমান্। লঙ্কাদগ্ধ করে বীর পবনসন্তান॥
সীতার সংবাদ আনি দিল মম ঠাঁঞি। শুনি হরষ হইলাম আমরা দুইভাই॥
বিভীষণ নামে রাবণের ভাই ছিল। মৈত্র বলি মম স্থানে আসিয়া মিলিল॥
পাষাণে জলধিজল করিয়া বন্ধন। লঙ্কায় প্রবেশ করি করি ঘোর রণ॥
একলক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সওয়ালক্ষ। সংহার করিলাম কত রথী সে বিপক্ষ॥
অবশেষে রাবণেরে করিনু সংহার। হরষিতে করিলাম সীতার উদ্ধার।
বিভীষণে নরপতি করিয়া লঙ্কায়। চতুর্দ্দশবৎসরান্তে আসি অযোধ্যায়॥
শুনহ নারদ এই পুরাণের সার। রাবণ বিনাশ হেতু রাম অবতার॥
নারদ সংবাদ-কথা অমৃত সমান। কৃষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান্'

বীরভদ্র গোস্বামী।

বৃহৎ পাষণ্ড-দলন ইহাঁর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে,—"অন্যান্য যুগাম্মহাগ্রগণ্য সুধন্য কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং পূর্ণব্রহ্ম সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সুরধুনীসন্নিধ নবদ্বীপে প্রচ্ছন্নাবির্ভূত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও শ্রীমদ্ভক্তমাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত।" শ্রীমদ্ভাগবত, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি বহু পুরাণ এবং তন্ত্রাদি হইতে এই গ্রন্থে শ্লোকসমূহ উদ্ধৃত ... অনুবাদ কবিতাময়। ফল কথা, গোস্বামী মহাশয়ের প্রভূত পা... এই গ্রন্থে দেখিতে পাই। ইহাঁর কবিতা কিরূপ সরল দেখুন ;—

নিত্যানন্দ বলেন শুনহ দ্বিজমণি। সাধুসঙ্গে কত সুখ কহ দেখি শুনি।
চৈতন্য বলেন শুন অবধূতরায়। সাধুসঙ্গে যত সুখ কহনে না যায়॥
সুধাময় সাধুসঙ্গ রসের কমল। গোবিন্দচরণপদ্মে কল্পলতা-ফল॥
তাহার দর্শন মাত্রে আনন্দ হৃদয়ে। প্রসঙ্গ করিতে মাত্র হরি কথোদয়ে।
সে কথা শুনিতে মাত্র প্রভুর স্মরণে। শ্রদ্ধা-ভক্তিভাব তার বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
অল্প যদি করিলেক সাধুর ভজনে। তবু ভক্তি হঞা যায় প্রভুর চরণে॥
সেই সে উত্তম পথ বৈষ্ণব যে ভজে। সেই জন হয় মুক্ত সংসারের মাঝে।
বৈষ্ণব দেখিয়া যায় আনন্দ অন্তর। সেই জনে কৃষ্ণকৃপা হইবে সত্বর॥
তুলনা করিব কত সতের সঙ্গম। স্বর্গসুখ মুক্তিসুখ নহে তার সম॥
সাধুসঙ্গে নিরবধি প্রেমরস কথা। মুক্তি সুখের ভক্তি সুখের হয় ভক্তিলতা॥
গঙ্গা-আদি সর্ব্বতীর্থস্নানে যত ফল। তাহার উত্তম হন বৈষ্ণব কেবল।
বৈষ্ণবের নাম যদি করয়ে শ্রবণ। সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় শুদ্ধ হয় মন॥
বৈকুণ্ঠগমনপথ ভাগবতভজন। অভাগিয়া লোকের ভক্তিতে নাহি মন॥
কত কত জন্ম যদি পুণ্য করি থাকে। তবে সাধুপূজা করে আসি ইহলোকে।
তীর্থসেবা শ্রীমূর্ত্তিসেবা করিতে করিতে। অনেক দিবসে মন পারে সে শোধিতে॥
বৈষ্ণবদর্শন মাত্রে অবিলম্ব কালে। মনের বৈকল্য সর্ব্ব থাকিতে না পারে॥
বৈষ্ণবসেবা ছাড়ি তীর্থে করয়ে গমন। বলদ গর্দ্দভ তারে করয়ে গণন॥
দেবতার ভজন লোক করে মহাদুঃখে। বৈষ্ণবের সেবা কর রসময় সুখে।
দেবতার ভজনেতে বড় অন্তরায়। বৈষ্ণবভজন কৈলে বড় সুখ পায়॥"

নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য।

শুকবিলাস ইহার কবিতাময় গ্রন্থ। এই গ্রন্থে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নানা কাহিনী সঙ্কলিত। এক সময়ে শুক-বিলাস বড় আদরের গ্রন্থ ছিল।

"বিক্রম আদিত্য রায়, রাজা অবতার প্রায়, তার কীর্ত্তি অতি অসম্ভব।
জন্মাবধি শেষে আর, যে যে কর্ম্ম কৈল তার, কেবা পারে বর্ণিতে সে সব॥
[illegible] সংগ্রহণ, করিয়াছে কত জন, আমি করিলাম কিছু তার।
শুন সব মহাশয়, কিবা আর পরিচয়, সুজন করহ অঙ্গীকার॥
প্রথমে আছে বর্ণনে, শনি লক্ষ্মী দুইজনে, বিবাদ হইল অতিশয়।
ছোট বড় দুজনার, রাজা করিল বিচার, তাহাতে শনির দৃষ্টি হয়॥

রাজ্য ছাড়ি গেলা বন, বিক্রমাদিত্য রাজন, মহারাষ্ট্র কন্যা কৈল বিয়া।
শানতে হইয়া মুক্ত, হইল লাবণ্য মুক্ত, রাজা হৈল স্বরাজ্যে আসিয়া॥
দ্বিতীয়ের মৃগয়ায়, বনে শুক পক্ষী পায়, নিকেতনে আইলা রাজন।
তৃতীয়াতে নিশাচরী, সমস্যা জিজ্ঞাসা করি, শুক তাহা করিল পূরণ॥
চতুর্থেতে নরপতি, গিয়া ভোজের বসতি, তিলোত্তমায় বিবাহ করিল।
পঞ্চম কথার তত্ত্ব, শুন ভূপতি মহত্ত্ব, হিতকারী শুকে বিনাশিল॥
ষষ্ঠে শারিকার শাপ, রাজা পায় মনস্তাপ, কমলিনী উদ্দেশে চলিল।
কষ্ট পেয়ে অতিশয়, বিক্রমেশ মহাশয়, কমলিনী বিবাহ করিল॥
নানা প্রভুত্ব করিয়ে, কমলিনী সঙ্গে লয়ে, আইলা পুরায়ে মনস্কাম।
কামিনীয়ে রাখি বনে, ভূপতি হরিষ মনে, প্রবেশ করিল নিজধাম॥
গ্রন্থের সূচনা সার, চমৎকার আছে ভার, পাবে রস গ্রন্থের শ্রবণে।
রচিল করিয়া যত্ন, দ্বিজ নন্দ কবিরত্ন, সঁপি মন সারদা চরণে॥

শনি কহে,—

মোরে ছোট কৈলি আর, থাক বেটা দুরাচার, আমি শনি দিব এর শোধ।
বাক্য নাহি কহে রায়, শনৈশ্চর উড়ে যায়, অদৃশ্য ভূপের কাছে রয়।
কবিরত্ন ভণে সার, কথা অতি চমৎকার, সদা ভূপতির মনে ভয়॥"

দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা।

মুক্তালতাবলী ইহাঁর গ্রন্থ। কল্কিপুরাণ হইতে এইগ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ সংগৃহীত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা, শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট। অনেক দার্শনিক তত্ত্ব বিচারও দেখিতে পাই। দুর্গাপ্রসাদ কবি পরন্তু পণ্ডিত। তাহার বর্ণনা বিশদ এবং মধুর। পরিচয় লউন। যশোদা,—শ্রীকৃষ্ণকে গোষ্ঠে যাইতে নিষেধ করিতেছেন,—

"শুনি বালকের বাণী, ব্যাকুল হইয়া রাণী, কোলে তুলি লইল তনয়।
চাঁদমুখে চুম্ব দিয়া, মুখঘর্ম্ম মুছাইয়া, ঝাড়িল অঙ্গের ধূলাচয়॥
আটিয়া ধরিল কোলে, কৃষ্ণেরে চাহিয়া বলে, আজ যেতে নাহি দিব
পুনঃ শ্রীদামেরে চেয়ে, বলে রাণী ব্যগ্র হয়ে, মৃদু মৃদু মধুর বচনে॥
বাপ সব শুন ওরে, আজিকার মত ঘরে, রাখি যাও মোর নীলমণি।
এই যে নীলরতন, সবে ঘরে এই ধন, প্রাণধন নয়নের মণি॥

অবলা অন্ধের নড়ি, দরিদ্রের ধন কড়ি, হাপুত্রি-পুত নন্দলাল।
কত জন্ম জন্ম ধরি, হরগৌরী পূজা করি, পেয়েছিরে এহেন দুলাল॥
পাঠায়ে নয়ন-তারা, একেবারে হয়ে সারা, কেমনে রহিব এই ঘরে।
জননীর মাথা খাও, আজিকার মত যাও, নীলমণি ভিক্ষা দিয়া মোরে॥
দেখিয়া মায়ের স্নেহ, কৃষ্ণের বাড়িল মোহ, সখীগণ কহেন তখন।
মায়েরে কান্দায়ে ভাই, যাইতে নাহিক চাই, আজি যাও তোমা সবে বন॥
শ্রীদুর্গাপ্রসাদ কয়, দেখিব হে দয়াময়, ভকত বৎসল ধর নাম।
শিশু সবে তোমা বিনে, নাহি জানে অন্যজনে, ছাড়িতে নারিবে প্রভু শ্যাম॥"

কবি কৃষ্ণদাস।

ইহাঁর "দূতী সংবাদ" পাঁচালী ছন্দে রচিত; অধিকন্তু সঙ্গীতে সমুজ্জ্বল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণলীলা ইহাতে বর্ণিত। একটু শুনুন,—

"বৃন্দা বলে শ্যামসখা, আমাদের শ্যাম সখা, আমাদের করেছেন মনে।
ভাল ভাল তবু ভাল, ভালবাসা জানা গেল, এতদিনে পড়েছে কি মনে॥
তার সঙ্গে কি সম্পর্ক, তিনি গোপীর বিপক্ষ, আমরা জেনেছি বিধিমতে।
সুখে রই সেই ভাল, শুনিলে থাকিব ভাল, যেমন থাকি তাঁর কিবা তাতে॥
তিনি এবে যার স্বামী, যার প্রেমে নব প্রেমী, বিক্রীত আছেন বংশীধারী।
ভাল করে তার মন, যোগান যেন অনুক্ষণ, সুখে যেন থাকে সে সুন্দরী॥
তার কি প্রবৃত্তি মরি, শুনে হাসি পায় হরি, ওহে শ্যাম সখা যদি দেখি।
সোনা ফেলে দিয়ে নীরে, পিতল যতন করে, রাখাল হইবে নিজে নাকি॥
গোড়া কাটি শিরে জল, দিলে কি হে ফলে ফল, এ লীলতায় কিবা প্রয়োজন।
যেমন আছে রাই কিশোরী, তা জানতে পাঠান হরি, দেখ ব্রজে সে আছে কেমন।
দেখ সেই কৃষ্ণ বিনে, হেন নব বৃন্দাবনে, বৃক্ষোপরে পক্ষ নাহি বসে।
নাহি করে কলরব, হয়ে রয়েছে নীরব, দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসে॥
তরুতে নাহি পল্লব, নাহি কুসুমে সৌরভ, লতাগণ শুকাইয়ে গেছে।
মধুপ্রতি মধু বিনে, অলিগণ দিনে দিনে, সুধা বিনে কৃশাঙ্গ হতেছে॥"

দ্বিজ কালিদাস।



ইনি কালীবিলাস গ্রন্থের প্রণেতা। কালীবিলাসে,—সপ্তশতী-চণ্ডীর উপাখ্যান-ভাগ এবং দক্ষযজ্ঞ-বৃত্তান্ত কবিতা-ছন্দে লিখিত।

চণ্ডমুণ্ড-বধ ;—

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়া।

আমার এই অভিলাষ কালি!
যেন মৃত্যুকালে, হৃদ্‌কমলে, দেখা দিও ওগো মুণ্ডমালি।
এইতো শুনি বেদেতে, কালের ফাঁস বিনাশিতে,
নাম ধরেছ করালী ॥ ধুয়া ॥

ক্রোধেতে অচিন্তাময়ী চিন্তিয়া তখন। ভালে হৈতে শিখা এক করিলা সৃজন।
মহা ভয়ঙ্কর রূপা করালবদনা। চতুর্ভুজা মুক্তকেশী বিলোল রসনা।
কটিতটে নরকর কিঙ্কিণী বেষ্টিত। করেতে শোণিত অসি খট্টাঙ্গ শোভিত॥
ছিন্নমুণ্ড অসিপাশ খট্টাঙ্গধারিণী। ত্রিলোচনী নরমুণ্ডমালা-বিভূষিণী॥
দ্বীপচর্ম্ম পরিধান রুধির লোচন। হুহুঙ্কারে ত্রিলোকের লোক অচেতন॥
শ্রুতিমূলে শব-শিশু কুণ্ডল আকার। ঝলমল করে অঙ্গ রত্ন অলঙ্কার॥
বিকট আকার হৈলা দেখিতে দেখিতে। মস্তক ঠেকিল গিয়া গগনোপরেতে॥
তর্জ্জন গর্জ্জন জিনি ঝঞ্ঝনার শব্দ। কালরূপী কালী দেখে দৈত্যগণ স্তব্ধ॥

কালীবিলাসের প্রায় প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভেই এক একটী সঙ্গীত, —সে সঙ্গীত ভাবময় ;—

বেহাগ—আড়া।

মন! কালে কালে কাল গেল কাল কবে আসিবে।
কালী ব'লে না ডাকিলে কাল কিসে জিনিবে॥
মন তুমি হয়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল,
আইলে দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

কালী বার বার এইবার কর করুণা। তোমার অপত্য হয়ে আপত্তি সহে না॥
কি কহিব পরিচয়, হইয়া তব তনয়, প্রাণ হয়েছে সংশয়, সহে না গো যাতনা॥

জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়।

"রাধাকৃষ্ণ-বিলাস" নামক গ্রন্থের ইনি প্রণেতা। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রী কৃষ্ণরাধিকার মধুর ব্রজলীলা গ্রথিত। এই গ্রন্থ কবিতাময়।

"চল চল চল সখী! কৃষ্ণ দরশনে। তুলসী চন্দন আয়োজন কর যতনে॥
দেখিলে সে বনমালী, ঘুচিবে মনের কালী, জুড়াইবে প্রাণ, চরণ-কমল সুধা পানে॥
পরে কুটিলের ভয়ে রাধা ভীত মনে। দিন কত নাহি যান কৃষ্ণ দরশনে॥
কৃষ্ণপ্রেমে মন প্রাণ মজিয়াছে যার। কৃষ্ণ ছাড়া হয়ে প্রাণ বাঁচে কি তাহার॥
এক দিন বিরলেতে রাধা রসময়ী। বৃন্দারে ডাকিয়া বলে কি হবে গো সই॥
বিবাদী ননদী মোর হয়েছে প্রহরী। কেমনেতে পাব হরি মরি মরি মরি॥
না দেখে সে কালো রূপ এ কি জ্বালা আর। আমার এ দেহ যেন নহে গো আমার॥
যে দিগেতে প্রাণসই ফিরাই নয়ন। অন্তরে দেখিলে দেখি শ্যামের বদন॥
কুটিলার ডরে যেতে সাহস না হয়। কিন্তু কৃষ্ণ দরশনে না গেলেও নয়॥

'রাধাকৃষ্ণ-বিলাসের' প্রত্যেক অধ্যায়-প্রারম্ভে ভাব-মধুর 'ধূয়া', দেখিতে পাই। দুইটীর পরিচয় লউন,—

(১)

ভবের হাটে এসে মন! করিলে ভাল ব্যাপার।
কি কর তোমার কাজ, লাভে মূলেতে বাজ,
অনায়াসে পুঁজি পাটা, খোয়াইলে আপনার॥
ছয় জন কুসঙ্গি-সঙ্গে, সদা থাক রসরঙ্গে,
ত্যজে গুরুদত্ত ধন,—কিসে হবি রে নিস্তার॥
কি বলিব ওরে মন! মিত্রতা মিলে মহাজন,
আপনার দোষে পথ খোয়ালি আপনার॥

২

সখীরে সব দেখ্ সে।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চূড়া-বাঁধা মিন্‌সে॥

জয়গোবিন্দ দাস।

জয়গোবিন্দ দাস,—সনাতন গোস্বামী প্রণীত সংস্কৃত বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থের বাঙ্গলা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছেন। কলিকাতা-সিমুলিয়া নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদকতায় সম্প্রতি এই পদ্যানুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

জয়গোবিন্দ কায়স্থ। উপাধি বসু চৌধুরী। পিতার নাম গোকুল চন্দ্র। নিবাস বেণাপুর। ১৭৬৪ শকের ২রা চৈত্র জয়গোবিন্দ এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন করেন।

ইহাঁর অন্যপরিচয় এতদিন সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। পদ্য বৃহদ্ভাগবতামৃত-সম্পাদক গোস্বামী মহাশয় বহু অনুসন্ধানে জয়গোবিন্দ দাসের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন, ইহা পরম আনন্দের কথা। গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদিত গ্রন্থ হইতেই গ্রন্থকার জয়গোবিন্দ দাসের পরিচয়-বিবরণ তুলিয়া দিতেছি,—

"বেণাপুর গ্রাম বর্দ্ধমান জেলায়, পোষ্ট আফিস কুলীন গ্রাম, ইষ্ট-ইণ্ডিয়ারেলওয়ের দেবীপুর ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম। কুলীন গ্রাম হইতে ইহার ব্যবধান অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র।

"শ্রীশ্যাম-সুন্দরের শ্রী বিগ্রহ এই বেণাপুরে অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছেন। জয়গোবিন্দের পিতামহ রামরাম প্রচুর দেবোত্তর সম্পত্তি সমর্পণ পূর্ব্বক এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেবায়ৎ মহোদয়গণের আগ্রহ-অনুরাগে সেবা-কার্য্য সুচারু রূপেই সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সেবায়েৎ মহাশয়ের নাম—শ্রীযুক্ত রামতারণ চট্টোপাধ্যায়।

"রাম রামের পিতার নাম—রসিক রাম। জয়গোবিন্দের তিন পুত্র,—রাধিকাকিশোর, মোহিনীকিশোর ও পুলিনকিশোর। ইহাঁদের কেহই ইহলোকে নাই। রাধিকাকিশোরের দুই পুত্র বর্ত্তমান,—শ্রীবনয়ারি লাল ও শ্রীহারাধন। মোহিনীকিশোরের একটী পু[illegible] আছেন,—নাম শ্রীনবচৈতন্য। বনওয়ারি লালের দুই পুত্র,—শ্রীই[illegible] শ্রীচন্দ্র-ভূষণ।

"জয়গোবিন্দ ও তাঁহার পুত্র ত্রয়, বিশেষত রাধাকিশোর নানা ভাষায়, সর্ব্বাপেক্ষা পারস্যভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রেও জয়গোবিন্দের অসাধারণ অধিকার ছিল। ভগবদ্‌ভজনে অকপট অনুরাগ এ বংশের নিত্য সিদ্ধ।"

প্রভুপাদ গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমাদের বিশ্বাস, শ্রীবৈষ্ণব-ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিবার, সাধন-ভজনের সুগম-সোপান অবলম্বন করিবার,—বিবিধ লোক ও বিবিধ অবতারের তত্ত্ব অবগত হইবার,—শ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম পাইবার যদি কোন চূড়ান্ত গ্রন্থ থাকে, তাহা এই শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত।" জয়গোবিন্দ এ হেন গ্রন্থের পদানুবাদ করিয়া সাধারণের বড়ই উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহাঁর অনুবাদের একটু পরিচয় লউন :—

"জন্মের গ্রহণ যেই কালে জীব করে। দেব-ঋষি পিতৃঋণে বদ্ধ হয় নরে॥
যজ্ঞে দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, অধ্যয়নে। মুক্ত হয় পিতৃ-ঋণে পুত্র উৎপাদনে॥
যদি এই তিন ঋণে নির্ম্মুক্ত না হয়। এ কারণ বেদ-মার্গ অতিক্রান্ত রয়॥
হরি-পাদপদ্ম ভক্তি-বলে ত নিশ্চয়। ঋণত্রয় আদি হৈতে সে অকুতোভয়॥
এমতে ভক্তের কর্ম্মে নহে অধিকার। পাপাদির অভাবেতে ভয় নাহি তার॥
বিষ্ণু সারূপ্যাদি কিছু বাঞ্ছা নাহি করে। তাঁর ভক্তি রসেতে লম্পট যেই নরে॥
ব্রহ্মলোক-আদি যেই বিষয়ের ভোগ। নির্ব্বাণের সুখ আদি মনোহর যোগ॥
স্বর্গ-মুক্তি নরকেতে দেখয়ে সমান। তাঁরা মোর বড় প্রিয়—যেন ভগবান॥
সেই সব ভক্ত সহ আমার মিলন। পরম প্রার্থনা আমি করি সর্ব্বক্ষণ॥
সেই সব ভক্তের হয় যেই স্থানে স্থিতি। সে-ই সে বৈকুণ্ঠ লোক নিঃসংশয় ইতি॥

মাধবাচার্য্য।

ইহাঁর গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল। প্রেমবিলাস গ্রন্থে ইহাঁর পরিচয় এইরূপ,—

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্বগুণের আকর। বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর॥
[illegible] পত্নীর হয় শ্রীবিজয়া নাম। প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস। পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আবাস॥
সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া। এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥

আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম। শ্রীযাদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান॥
কালিদাস মিশ্রপত্নী বিধুমুখী নাম। প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্ব গুণধাম॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি। অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি॥
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল। নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল॥
নানাশাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত। আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত॥"

অর্থাৎ নবদ্বীপ বাসী দুর্গাদাস মিশ্রের দুই পুত্র,—সনাতন আর কালিদাস। কালিদাসের পুত্র মাধব মাধব অল্পবয়সেই পিতৃহীন হন; নানা শাস্ত্র পাঠ করিয়া তিনি আচার্য্য উপাধি লাভ করেন। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে ইহাঁর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা। যথা প্রেমবিলাসে,—

"শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশম স্কন্ধ। গীত বর্ণনাতে তিঁহো করি নানা ছন্দ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল।"

কলিকাতা বঙ্গবাসী আফিস হইতে সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সম্পাদক "প্রেম-বিলাসে"র বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। তিনি 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রের প্রবন্ধ তুলিয়া দেখাইতেছেন, "চৈতন্যদেবের শ্বশুর সনাতন মিশ্র মিথিলা হইতে নবদ্বীপে উপবিষ্ট হন; এই বিখ্যাত বংশে পণ্ডিত শিরোমণি জগদীশ তর্কলঙ্কারের জন্ম হয়। এই বংশের মাধব এবং প্রেমরত্নাকর ও কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা মাধবের সহ 'ত্যাগী' মাধবের কোন সংস্রব নাই। মাধবাচার্য্য পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া চৈতন্যের কৃপালাভ করেন। সেখানেই তাঁহার একখানি বৈষ্ণব স্মৃতি রচনা করিবার অভিলাষ হয়। * * হরি ভক্তি বিলাস প্রকাণ্ড গ্রন্থ, মাধব সংক্ষেপে একখানি স্মৃতির রচনা করেন। এই মাধবাচার্য্যই কৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা। * * কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবের বংশীয় গোস্বামিগণ অদ্যাপি ময়মনসিংহ জেলায় বাস করিতেছেন। ময়মনসিংহ, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি জেলায় তাঁহাদের বহু সংখ্যক শিষ্য আছে।"

মাধবাচার্য্যের রচনা প্রসাদ গুণময়। একটু পরিচয় লউন

কামোদ রাগ।

সকল শুভ হেতু, জন্মিল ষড় ঋতু, রঙ্গে খীনহী কলঙ্কী।
চিন্তিয়া গুণময়, গোকুলে চন্দ্রোদয়, রাহু ঘনে রহি লুকি॥

দুন্দুভি শঙ্খধ্বনি, নাচে তারা উর্দ্ধপাণি, হরিষে দেবাদেবীগণ।
আজু অবনী অবতারী, হইলা শ্রীহরি, ধরণীর উল্লাসিত মন॥
ফলে দলে তরু বিবিধ অতি চারু, কুসুম বিকসে অধিকে।
আমোদে ভরে মন, গমন সমীরণ, সুরভি লই দশ দিকে॥
কোকিল মধুকর, চাতক শিশুবর, মধুর মঙ্গল গায়।
জলদ জলনিধি, মিলিলা শুভ বিধি, মধুর নাদে বাদ্য বায়॥
রাজহংস কুল, কেলি কুতূহল, গগন মধি রহি ধায় রে।
ধরণী ভার হরি, হইবে অবতারী, বাত কহে যো সভায় রে॥
ঈষত ঘনে ঘন, অমিয়া বরিষণ, কিরণ ধূলি নাশন।
রাজ রাজেশ্বর, বিজয়ী সুরেশ্বর, করন্তি মহিমার্জ্জন॥
উঠে ফেরুগণ, বিরবে ঘনে ঘন, পড়িছে জয় হুলাহুলি।
মাধব কহে সার, মিলিলা শ্রীনিবাস, ত্রিজগত রহে কুতুহলী॥

মহারাট্রি রাগ।

সর্ব্ব শুভকর কাল পরম শোভন। প্রসন্ন শুভ রাশি গ্রহ তারাগণ॥
নদনদী সরোবর সলিল নির্ম্মল। প্রসন্ন সকল দিগ প্রসন্ন আনল॥
জয় জয় যদুবীর করিলা প্রকাশ। কোটি কোটি চন্দ্র যেন উদয় আকাশ॥
মাসিভাদ্রপদে রাশি মহেশবাহন। অসিত অষ্টমী রোহিণী শুভক্ষণ॥
দ্বিতীয় প্রহর নিশি অতি ঘোর চর। গম্ভীর নিনাদ ঘন পয়োদ-উদর॥
কংস বংশ বীণা বেণী ঝাঝরি মুহুরি। মৃদঙ্গ পণব কপিনাস সুমাধুরী॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাদ্য পরম হরিষে। উল্লসিত সুরকুল কুসুম বরিষে॥
হরল সকল তাপ এ মহীমণ্ডল। প্রেমে আমোদ করে পুণ্য পরিমল॥
কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার। দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাহার॥

কবি আনন্দময়ী।

বৈদ্যকুল সম্ভূত বেদ গর্ভ সেন পিতৃভূমি যশোরজেলার ইটনাগ্রাম ত্যাগ করিয়া ঢাকা-বিক্রমপুরে আসিয়া বাস-স্থাপন করেন। ইনি বিলদা[illegible]িয়া, জপসা প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রামের ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়া-[illegible]লেন। ইঁহারই বংশে গোপী রমণ সেন জন্ম গ্রহণ করেন। গোপী-রমণের পুত্র কৃষ্ণরাম। কৃষ্ণ রামের পুত্র রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পুত্র

রামগতি। আনন্দময়ী এই রামগতি সেনেরই কন্যা। আনন্দময়ীর মাতার নাম কাত্যায়নী। রামগতি সাধক ও সুকবি ছিলেন; আনন্দময়ীও সুশিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী। ইঁহাদিগেরই শিক্ষাগুণে আনন্দময়ী আজ বিদূষী গ্রন্থকর্ত্রী নামে পরিচিতা। ১৭৫২ অব্দে জপসা গ্রামে আনন্দময়ী জন্ম গ্রহণ করেন।

১৭৬১ শকে নবম বৎসর বয়সে আনন্দময়ী পরিণীতা হন। ইঁহার স্বামীর নাম,—অযোধ্যারাম কবীন্দ্র। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন; কিন্তু তাঁহার পত্নী ততোধিক শিক্ষিতা। ১৩১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের নবপ্রভায় লিখিত হইয়াছে,—

"আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা সম্বন্ধে এই প্রকার কথিত আছে;—রাজনগরনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরি বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে সংস্কৃত শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দেন, কিন্তু তাহার মাঝে মাঝে অশুদ্ধি দৃষ্ট হওয়াতে তিনি বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া মিষ্ট ভৎর্সনা করিতে ত্রুটী করেন নাই।

রাজবল্লভ অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, কিন্তু সেই সময়ে রামগতি পুরশ্চরণে ব্যাপৃত থাকায় নিজে পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে অসমর্থ ছিলেন। আনন্দময়ীর পারদর্শিতা সম্বন্ধে তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল, সুতরাং আনন্দময়ীকেই উক্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন। যথা সময়ে আনন্দময়ী সমুদয় প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। পরে রাজসভায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন, কারণ আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তা কাহারো অবিদিত ছিল না, বিশেষতঃ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।"

"বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ও এইরূপ কথা লিখিয়াছেন।

আনন্দময়ীর খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেন হরিলীলা, চণ্ডিকা-মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই হরিলীলা গ্রন্থ-প্রণয়নে ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী,—খুল্লতাত জয়নারায়ণের বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃঃ অব্দে এই গ্রন্থ রচিত হয়। হরিলীলা গ্রন্থে আনন্দময়ীর রচনা,—

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥
কত প্রৌঢারূপা ওরূপে মজন্তি। হসন্তি, খলন্তি দ্রবন্তি, পতন্তি ॥

কত চারুবক্ত্রা, সুবেশা, সুকেশা। সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা॥
কত ক্ষীণমধ্যা, সুভাগ্যা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা॥
দেখি চন্দ্রভানে, কত চিত্তহারা। নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা॥
করে দৌড়াদৌড়ি, মদমত্ত প্রৌঢ়া। অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ডঘৃষ্টা। প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা॥
অনঙ্গাস্ত্রভিন্না, কত স্বর্ণবর্ণা। বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা॥
কারো ব্যস্ত বেণী নহি বাস বক্ষো কারো হার কূর্পা, পরিভ্রস্ত কক্ষে॥"

রঘুনন্দন গোস্বামী।

বর্দ্ধমান জেলার মাড়ো গ্রামে ১১৯৩ সালে রঘুনন্দন গোস্বামী জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কিশোরীমোহন। স্বপ্রণীত রাম-রসায়ন গ্রন্থে তিনি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন,—

"দেখিয়া কলির রীতি, শিখাইতে কৃষ্ণ প্রীতি, কৃপাময় প্রভু বলরাম।
অবতার করি লোকে, নিস্তারিলা সব লোকে, ধরি নিজে নিত্যানন্দ নাম॥
বীরভদ্র তাঁর সুত, তাঁর পুত্র গুণযুত, গোপী জন বল্লভ বিদ্বান।
তাঁর পুত্র গুণধাম, শ্রীরাম গোবিন্দ নাম, তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভরাখ্যান॥
রামেশ্বর তাঁর সুত, নৃসিংহ তাঁহার পুত, তাঁর পুত্র বলদেব নাম।
তিন পুত্র হন তাঁর, সর্ব্ব গুণ ভাণ্ডাগার, জগৎ মাঝারে অনুপাম॥
শ্রীলালমোহন আর, শ্রীবংশীমোহন তাঁর, কণিষ্ঠ শ্রীকিশোরী মোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায়, কৃপা করি মো-সবায়, কর‍্যাছেন মন্ত্র সমর্পণ॥
কণিষ্ঠ সদ্‌গুণধাম, ভুবন বিখ্যাত নাম, বেদ-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মতে, করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত॥
সেই প্রভু মোর পিতা, ঊষা নাম মোর মাতা, বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।
মোর জ্যেষ্ঠ তিন জন, বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ, শ্রীমধুসূদন মহামতি॥
চারি ভ্রাতা বৈমাত্রেয়, শ্রীরামমোহন প্রিয়, নারায়ণ গোবিন্দ আখ্যান।
সকলের কণীয়ান, বীরচন্দ্র অভিধান, তিন ভগ্নী সদ্‌গুণ নিধান॥
সহোদর ভগ্নীপতি, দীপচন্দ্র মহামতি, চট্টরাজ বংশ অগ্রগণ্য।
শ্রীল[illegible] গোবিন্দ প্রাজ্ঞ, শ্রীদোল গোবিন্দ বিজ্ঞ, বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি ধন্য॥
[illegible]রাশি অনুসারে, আর এক নাম মোরে, ভাগবত বলিয়া অর্পিলা।
কৃপা-কণ প্রকাশিয়া, নানাশাস্ত্র পড়াইয়া, যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইলা॥

বর্দ্ধমান সন্নিধান, গ্রাম মাড়ো অভিধান, তাহাতেই আমার নিবাস।
সন্তোষিত বন্ধুজন, এই গ্রন্থ বিরচণ, করিলাম পাইয়া প্রয়াস॥"

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পৌত্র গোপীজনবল্লভ শ্রীপাট নোতায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রপৌত্র রামেশ্বর গোস্বামী শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধাম গমন করেন ও তথা হইতে আসিয়া আর নোতায় গমন করেন না,—ইচ্ছাপুর গ্রামে বাস করেন। নোতা ও ইচ্ছাপুর,—দুই গ্রামই বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। রামেশ্বর গোস্বামীর পুত্র,—নৃসিংহদেব গোস্বামী ইচ্ছাপুরের বাস ত্যাগ করিয়া, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত খড়ি নদীর উৎপত্তি স্থান মাড়ো গ্রামে বাস করেন। এই গ্রাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশন মানকরের নিকটবর্ত্তী। নৃসিংহদেবের পুত্র বলদেব। বলদেবের তিন পুত্র,—লালমোহন, বংশীমোহন এবং কিশোরীমোহন। কিশোরীমোহনের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ হয় মাড়োয়ার তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এরাল-বাহাদুরপুরে এবং দ্বিতীয় বিবাহ হয় নলসারুল গ্রামে' এই দুই স্ত্রীর নয় সন্তান হয়। রঘুনন্দন,—কিশোরীমোহনের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত।

রঘুনন্দন পঞ্চম বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালে গুরু মহাশয়ের নিকট প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। অনন্তর,—এরালবাহাদুরপুরে গণেশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কারের নিকট তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়েন। ইহার পর, তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ; তাঁহার পিতাই তাঁহাকে ভাগবত পড়ান। সতর বৎসর বয়সেই রঘুনন্দন ভাগবত এবং অন্যান্য উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব গ্রন্থ পাঠ শেষ করেন। আঠার বৎসর বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ রামরসায়ন গ্রন্থ,—তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সে রচিত। রামরসায়ন ভক্তিরসের প্রস্রবণ। ইহাঁর এই রামরসায়নই মন্দিরা-ধ্বনি সংযোগে গীত হইয়া থাকে। এই গানই "রামায়ণ গান।" সে গান কি অপূর্ব্ব! কি করুণ-রস-মধুর! বাস্তবিকই রামরসায়ন করুণ-রসের মহাসমুদ্র। বাস্তবিকই,—

"রামায়ণ ক্ষীর-অব্ধি, মন্থন করিতে বুদ্ধি, মন্দর ভূধর মগ্ন করি।
রাম রসায়ন নাম, কল্পতরু অভিরাম, কৃপা করি মিলাইলা হরি।

হইয়াছে সপ্তকাণ্ড, যার শাখা সুপ্রকাণ্ড, ক্ষুদ্র শাখা পরিচ্ছেদ চয়।
অলঙ্কারে ঝলমল, শ্লোক সব যার দল, অর্থ সব যার পুষ্প হয়॥
সেই পুষ্পে মধুসার, শান্ত দাস্য সখ্য আর, বাৎসল্য শৃঙ্গার মুখ্য রস।
বীর রৌদ্র অদ্ভুত, করুণ বীভৎস যুত, ভয় হাস এই ত দ্বাদশ॥
'সেই রস-মকরন্দে, আস্বাদয়ে সদানন্দে, রসিক ভকত মধুকর।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মুক্তি, শ্রীরাম চরণ ভক্তি, ফল ধরে যাহে মনোহর॥"

রঘুনন্দনের রামরসায়নে উপমা-প্রাচুর্য্য যেমনি, ছন্দ-বাহুল্য যেমনি, কবিত্ব-মাধুর্য্যও তেমনি। নবপরিণীতা সীতার নব সম্মিলন-বর্ণনা কি সুন্দর,—

"আছে লজ্জা, আছে ভয় আছে প্রীতিচিতে। যাইতে না পারে দেবী, না পারে থাকিতে॥
যাইতে বাসনা হয় না হয় সাহস। দৃদিগের আকর্ষণে চঞ্চল মানস॥
যেন দেখি দিব্য মণি তরঙ্গিণী-পারে। যাতো ইচ্ছা হয় কিন্তু শঙ্কায় না পারে॥"

উপমা-সমাবেশ কেমন মনোহর,—

"নব জলধরগণে ঢাকিল অম্বর। তমোগুণে যেন পাপী জনার অন্তর॥
তড়িৎ প্রকাশ পায় কভু জলধরে। শ্মশান-বৈরাগ্য যেন বিষয়ি-অন্তরে॥
বনের অনল জলে করিল নির্ব্বাণ। ভবতাপ নাশে যেন ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞান॥
কূটজ কেতকী মাতী হইল প্রকাশ। ভাবাবেশে যেন ভক্ত-বদনেতে হাস॥"

রঘুনন্দন,—স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ কবি তুলসী দাসের হিন্দী-রামায়ণ হইতে কোন কোন আখ্যান-ভাগ গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপাদেয় গ্রন্থ কলিকাতা বঙ্গবাসী আফিসে পরিপাটীরূপে,—গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি দৃষ্টে,—মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহাঁর আর একখানি গ্রন্থ গীতমালা। ইহা ত্রিশটী গ্রন্থনে বিভূষিত। এক একটী গ্রন্থনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক একটী লীলা বর্ণিত। এ গ্রন্থও বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। এ খানিও গোস্বামী মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত পুঁথি দৃষ্টে মুদ্রিত।

ইহাঁর অপর গ্রন্থ শ্রীশ্রীরাধামাধবোদয়। এ গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবর্ণনা প্রকটিত। মল্লঝাঁপ, বৃত্ত্যনুপ্রাস, একাবলী, ত্রিপদী, ললিতা, ষোড়শাক্ষরী, দীর্ঘচ্ছন্দ, তোটক, লঘুত্রিপদী, পজ্ঝটিকা, ছেকানুপ্রাস, যমক, তূণক মাত্রাবৃত্তি-চতুষ্পদী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে এই গ্রন্থ অতিমাত্র বৈচিত্র্যশালী। মাত্রাবৃত্তি চতুষ্পদী ছন্দে বর্ণনা,—

"গলিত কনক নিন্দি বরণ, নৃত্য করত নটিনীগণ,
দলিতাঞ্জন রুচি-নিরুণ, নটবর করি মাজে।
জনু নবঘন ঘেরি ঘেরি, চমকে চপলা বেড়ি বেড়ি,
নব-তমাল বিটপী বেড়ি, কনক লতিকা সাজে॥"

গীতিচ্ছন্দে শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা,—

সুন্দরি শুন, দেখহ পুন, নিজ জীবন নাথং।
বান্ধবগণ, নীল বসন, সুন্দর বটু সাথং॥
বারিদ মদ, হারি সুখদ, কান্তি মধুর ধামং।
শারদ শশি, রাশি বিকাশি, তুণ্ডবিজিত কামং॥
মন্মথ ধনু, চামর জনু, সূক্ষ্ম কুটিল কেশং।
চন্দ্রক কুল,—চম্পক-ফুল,—কল্পিত কচ বেশং॥
দীর্ঘ নয়ন, চারু ধুটন, মোহিত মধু জালং।
দিব্য গঠন, বক্ষসিদান, দোলিত বন মালং॥
কুঞ্জর কর, দঞ্জন কর, বাহু যুগল খেলং।
সিংহ রুচির, মধ্য গভীর, নাভি কনক বেলং॥"

গোস্বামী মহাশয় ২৪ পরগণা পাণিহাটী গ্রামে এই গ্রন্থ রচনা সমাপ্ত করেন। যথা,—

"শ্রীরাধা মাধবয়োঃ প্রীতয়ে ভবতু শাকেহব্দে ক্ষমা সপ্ত সপ্ত ক্ষামিতে।
বৃষ সংক্রমে গঙ্গাতীরে পাণিহাটি গ্রামেয়ং পূর্ণতামগতে॥"

বাঙ্গলা পুস্তক ব্যতীত,—রঘুনন্দন গোস্বামী ত্রিশখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থও লিখিয়াছিলেন।

ইহাঁর আট সন্তান,—১ মাধবানন্দ; ২ কন্যা; ৩ রামগোপাল; ৪ কন্যা; ৫ ব্রজগোপাল; ৬ জয়গোপাল; ৭ শৈশবে মৃতপুত্র; ৮ মদনগোপাল গোস্বামী। কিছুদিন হইল, মদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পরলোক হইয়াছে।

রঘুনন্দন গোস্বামী,—রামকমল সেনের সহিত দেখা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন; পরলোকগত রাজনারায়ণ বসু প্রণীত 'এ কাল আর সে কাল' গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামমোহন রায়।

হুগলী জেলার অধীন রাধানগর গ্রামে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়; পিতামহের নাম ব্রজবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রপিতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের মাতার নাম তারিণী দেবী। রামমোহন শাণ্ডিল্য গোত্র-সম্ভূত।

গুরু মহাশয়ের পাঠশালেই ইহাঁর প্রথম বাঙ্গলা শিক্ষা। অনন্তর ইনি পারশী পড়িতে আরম্ভ করেন। সুতীক্ষ্ণ মেধা বলে, অল্পকালেই ইনি পারশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। নয় বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি পাটনায় গমন করেন; সেই স্থানেই ইহাঁর আরবী শিক্ষা হয়। বার বৎসর বয়সে রামমোহন কাশীধামে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন।

বাল্যে রামমোহন হিন্দু-ধর্ম্ম—হিন্দু দেব-দেবীর উপর বড়ই ভক্তিমান ছিলেন। ক্রমে তাঁহার মত-পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। ফলে, তিনি পিতা কর্ত্তৃক গৃহবহির্ভূত হন। রামমোহন এই সময় ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে তিব্বত দেশে উপনীত হন।

চারি বৎসরের পর তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। পিতাপুত্রে আবার সদ্ভাব হইল। পিতা তাঁহার বিবাহ দিলেন। রামমোহন কিন্তু ধর্ম্মে তখন স্থিরবুদ্ধি হইতে পারেন নাই। পিতা আবার তাঁহাকে গৃহ হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। এই সময়ে রামমোহন ইংরেজী ভাষায় উত্তম রূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১২১৭ সালে রামমোহন ইংরেজ গবরমেণ্টের অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন। ...র কাল তিনি রংপুর ও ভাগলপুরে সেরেস্তাদারের কার্য্য করিয়া- ইহাতে তাঁহার বিস্তর অর্থ উপার্জ্জিত হয়। তিনি জমিদারী

ক্রয় করেন। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের সুপারিসে ১২৩০ সালে দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন।

কর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। তখন তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর। লোয়ার সারকিউলার রোডে তাঁহার বাস নির্দ্দেশ হয়। এই সময়ে তিনি অস্তরূপ নানাবিধ কর্ম্মে ব্যাপৃত হন; তুমুল ধর্ম্মান্দোলন করিতে থাকেন। ফলে রামমোহনের উদ্যোগে—দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, কালীনাথ রায় প্রভৃতির সাহায্যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে ব্রাহ্মসভা সংস্থাপিত হয়।

দিল্লী-সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ ১২৩৮ সালে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন। তিনি এই সময়ে ইউরোপের বহুস্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন; ফ্রান্সে প্যারিস সহরে দুই মাস কাল থাকেন; ১২৪১ সালে প্যারিস হইতে ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে আগমন করেন। এই ব্রিষ্টল সহরেই নিদারুণ জ্বররোগে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দুইটা পাঁচিশ মিনিটের সময় ইনি দেহ ত্যাগ করেন। ব্রিষ্টল নগরে অদ্যাপি তাঁহারা সমাধিস্তম্ভ বর্ত্তমান।

ইনি ভারতে সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিয়াছিলেন। ফলে, সহমরণ-প্রথা উঠিয়া যায়। ইনি বহুভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

ইহাঁর তিন বিবাহ। প্রথমা পত্নী অল্পবয়সেই দেহ ত্যাগ করেন। বর্দ্ধমানের কুড়মুন-পলাশী গ্রামে ইহাঁর দ্বিতীয় বিবাহ। অতঃপর কলিকাতা-ভবানীপুরে ইহাঁর তৃতীয় বার বিবাহ হয়। ইহাঁর দুই পুত্র,—রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ।

ইহার রচিত সম্পাদিত ও প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—(১) তোহফতুল মোহদীন (পারস্য ও আরবী), (২) বেদান্ত গ্রন্থ—(১৮১৫ খৃষ্টাব্দে), (৩) উপনিষৎ—ইংরাজী ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদসহ প্রকাশিত। (৪) ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৮১৭ খৃষ্টাব্দে) (৫) —বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব "গোস্বামীর সহিত বিচার" (১৮১৮ অব্দ)—(৬) গায়ত্রীর অর্থ (১৮১৮), (৭) সহমরণ-বিষয়ক দ্বিতীয়

প্রস্তাব (১৮১৮), (৮) কবিতাকাব্যের সহিত বিচার—১৮২০ (৯) সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার,—১৮২০ খৃঃ অব্দে (১০) পাদ্রী ও শিষ্য সংবাদ—(১৮২১) (১১) ব্রাহ্মণ সেবধি (১৮২১) (১২) চারি প্রশ্নের উত্তর—সংবাদ কৌমুদী—(১৮২৬) (১৩) প্রার্থনা পত্র—(১৮২৩) (১৪) পথ্য প্রদান (১৮১৩) (১৫) ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ (১৮২৬) (১৬) কায়স্থের সহিত বিচার (১৮২৬), (১৭) গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানম্—(১৮) বজ্রসূচী (জাতিবিচার বিষয়ক) (১৮২৭), (১৯) ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্মসঙ্গীত (১৮২৮) (২০) অনুষ্ঠান (১৮২৯) (২১) সহমরণ-বিষয়ক প্রস্তাব (১৮৩০), (২২) গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩০) (২৩) কুলার্ণবস্থ তন্ত্র (পঞ্চম খণ্ড, প্রথম উল্লাস) (২০) আত্মানাত্মবিবেক সানুবাদ)

রাজা রামমোহন রায়ের দুইটী সঙ্গীত।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর॥
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া, তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান, বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

রামকেলী—আড়াঠেকা।

এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ। তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ॥
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ, ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।
যত্নে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত, দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ।

রামমোহন রায়ের গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত,—

"আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া, এ প্রত্যুত্তরের সমাপ্তি করিতেছি। প্রথম, কোনব্যক্তি আচারের দ্বারায় ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারীর নিন্দা করেন, অথচ যাহাকে স্নেহ করেন তাহার গুরু এবং নিয়ত গৃহবাসী হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন; আর অন্য এক ব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন

করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারি দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে তাহা অস্বীকার করে। দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বকধূর্ত্ত-আখ্যান কাহাকে শোভা পায়। এ প্রশ্নের কারণ এই যে, ভট্টাচার্য্য আমাদিগকে বক ধূর্ত্ত করিয়া বেদান্ত চন্দ্রিকাতে কহিয়াছেন।”

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব—রাগ-সাগর।

‘রাগ কল্পদ্রুম,—ইহাঁর বিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, ইনি স্বয়ং সঙ্গীত শাস্ত্রে সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে ইনি বিভিন্ন রাগরাগিণী সম্বলিত বিভিন্ন দেশীয় সঙ্গীত মালা সংগ্রহ করিয়া একখানি সঙ্গীতাভিধান প্রকাশ করিবার ইচ্ছা করেন। তাহারই ফল,—তাঁহার রাগকল্পদ্রুম। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে বাঙ্গলা, হিন্দী, কর্ণাটী, মারাটী, গুজরাটী, উড়িয়া, আরবী, পারশী এবং ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষার সঙ্গীতাদি সংকলিত। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেবের নিকট ইনি বিশিষ্ট সম্মান পাইতেন। রাজ-বাটীতে প্রসিদ্ধ গায়কগণের সঙ্গীত-সমর উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণানন্দই মধ্যস্থ হইতেন।

হরপ্রসাদ কর।

ইনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রগণের জন্য “পুরুষ-পরীক্ষা” নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। পুরুষ-পরীক্ষা,—কবি বিদ্যাপতি প্রণীত সংস্কৃত পুরুষ-পরীক্ষা গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। রচনার নমুনা,—

“জয়ন্তী নগরীতে ধীরবিক্রম নামে এক রাজা ছিলেন। যোগ্যতাতে ধন উপার্জ্জন করিয়া, নির্ভীক ও বহু পুত্রযুক্ত হইয়া কাল যাপন করেন। এক রাত্রিতে রাজা খট্টাতে শয়ন করিতেছেন, এমন

সময়ে কোন স্ত্রীর রোদনের শব্দ শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া, ঐ শব্দানুসারে অনুসন্ধান করিতে করিতে নগরপ্রান্তে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নব যুবতী, নানাভরণ ভূষিতা আর উত্তমবস্ত্র পরিধানা এমন এক স্ত্রীকে দেখিলেন।”

চণ্ডীচরণ মুন্সী।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর তোতা ইতিহাস প্রকাশিত হয়। ১৮২৫ অব্দে ইহা লণ্ডন নগরে পুনর্ম্মুদ্রিত হয়। ইহার রচনা এইরূপ,—

“পূর্ব্বকালের ধনবানেদের মধ্যে আমদ্ সুলতান নামে এক জন ছিলেন তাহার প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য এবং বিস্তর সৈন্য সামন্ত ছিল এক সহস্র অশ্ব পঞ্চশত হাতী নবশত উষ্ট্র ভারের সহিত তাহার দ্বারে হাজীর থাকিত কিন্তু তাহার সন্তান সন্ততি ছিল না। এই কারণ তিনি দিবারাত্রি ও প্রাতে ও সন্ধ্যাতে ঈশ্বর পূজকেরদের নিকটে গমন করিয়া সেবার দ্বারা সন্তানের বর প্রার্থনা করিতেন। কতক দিবস পরে ভগবান স্থষ্টিকর্ত্তা সূর্য্যের ন্যায় বদন চন্দ্রের ন্যায় কপাল অতি সুন্দর এক পুত্র তাহাকে দিলেন। আমদ সুলতান ঐ সন্তান পাইয়া বড়প্রফুল্লচিত্ত পুষ্পবৎ বিকশিত হইয়া সেই নগরস্থ প্রধান লোক আর মন্ত্রী ও পণ্ডিত এবং শিক্ষাগুরু আর ফকিরেরদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া বহুমূল্য খেলাৎ বস্ত্রাদি দিলেন যখন সেই বালকের সপ্তমবৎসর বয়ঃক্রম হইল তখন আমদ্ সুলতান একজন বিদ্বান লোকের স্থানে পড়িবার জন্য সেই পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। কতক দিবসেতে সেই বালক আরবী ও পারস্য শাস্ত্রের সমুদায় পুস্তক পড়িয়া সমাপ্ত করিয়া রাজসভার ধারামত কথোপকথন আর বসন উঠন শিক্ষা করিলেন। তার পর রাজার আর সভাস্থ লোকেরদের পসন্দেতে উত্তম হইলেন।”

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত নামক একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮১১ অব্দে ইহা লণ্ডন নগরে পুনর্মুদ্রিত হয়! লণ্ডনে প্রকাশিত গ্রন্থের টাইটেল পেজে লিখিত আছে,—"লন্দন মহা-নগরে চাপা হইল ১৮১১।"

এই গ্রন্থের রচনা-প্রণালী এইরূপ —

"পরে কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজা হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মত প্রজাপালন করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজ্যের লোকেদিগের কোন ব্যামোহ নাই ভৃত্যবর্গেরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রাধান্য করিয়া কাল ক্ষেপণ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সুখ্যাতির সীমা নাই। তখন রাজধানী মুরসিদাবাদে নবাব সাহেবের নিকট মহারাজের অত্যন্ত সংভ্রম সর্ব্ব-প্রকারে মহারাজ চক্র-বর্ত্তির ন্যায় ব্যবহার।

"এক দিবস মহারাজ পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে পূর্ব্বে এ বংশে যে সকল রাজগণ হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে পাত্র নিবেদন করিল মহারাজ আমরা পুরুষানুক্রমে এ রাজ্যের পাত্র কিন্তু যে সকল মহারাজারা গিয়াছেন, আর ২ প্রকার সুখ্যাতি করিয়াছেন কিন্তু যজ্ঞ কেহ করেন নাই। মহারাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্রকে কহিলেন, আমি অতি বৃহদ্ যজ্ঞ করিব তুমি আয়োজন কর। পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ প্রধানপ্রধান পণ্ডিতের দিগকে আহ্বান করিয়া কি যজ্ঞ করিবেন, তাহা স্থির করুন পশ্চাৎ যেমন যেমন আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। পাত্রের বাক্যে রাজা সর্ব্বাগ্রে লিপি প্রেরিত করিলেন।"

রামরাম বসু।

১৮০১খৃষ্টাব্দে ইনি প্রতাপাদিত্য চরিত্র এবং ১৮০২ অব্দে লিপিমালা রচনা করেন।

প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা এইরূপ,—

"ইহা ছাড়াইলে পুরির আরম্ভ। পুরে সিংহদ্বার পুরির তিনভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালান তাহাতে পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট তাহাদের সাতে সাতে আর আর অনেক অনেক পশুগন।

এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পুরি। তার চারিদিকে প্রস্তরে রচিত দেয়াল, পুবের দিগে সিংহদ্বার তাহার বাহির ভাগে—পেট কাটা দরজা। শোভা কর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক স্থান তাহার নাম নওবৎখানা তাহাতে অনেক প্রকার যন্ত্রে দিবারাত্রি যন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

নওবৎখানায় উপরে ঘড়ি ঘর। সে স্থানে ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহারদের ঝাঁজের উপর মুদ্গার মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।"

ডব্লিউ ওব্রাএন স্মিথ।

সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত উইলসন, উইলফোর্ড, কোল ব্রুক প্রভৃতি বিরচিত গ্রন্থ এবং প্রসিদ্ধ শব্দকল্পদ্রুম সাহায্যে ইনি পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে পৌরাণিক দেবতা, অসুর, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষ, তথা বিভিন্ন দেশ, জাতি, পর্ব্বত প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অকারাদিক্রমে সংকলিত। ইহার প্রথম খণ্ড মাত্র আমরা দেখিয়াছি। ইহা ১২৭৭ সালে মুদ্রিত। এই গ্রন্থ হইতে রচনার একটু দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি;—

"অজামিল। কান্যকুব্জ দেশে অতি পাষণ্ড একজন অধম ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে চোর ও দস্যু ছিল। পৃথিবীতে এমন অকার্য্য ছিল না যাহা অজামিল করে নাই। বৃদ্ধ পিতা মাতা ও সতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদোন্মত্ত এবং দুষ্ক্রিয়ের সক্ত হওত আপনার তুল্য প্রকৃতি একটী ইতর জাতীয়া দাসীতে আসক্ত হয়, ইহারা অষ্টাশী বৎসর যাপন করে। ঐ দাসী গর্ভে তাহার আটটী সন্তান জন্মে, তন্মধ্যে সে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম নারায়ণ রাখিয়াছিল; অজামিল মৃত্যুকালে রোগের যাতনায় ঐ কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণকে নারায়ণ বলিয়া যেমন ডাকিল, অদৃষ্টাধীন তৎপরক্ষণেই তাহার মৃত্যু হইল। মরণ সময় নারায়ণ নাম উচ্চারণ করাতে লিখিত আছে অজামিলের প্রচুর পুণ্য উদয় হইল, সেই পুণ্যে সে যমযাতনা এড়াইয়া স্বর্গে যাত্রা করিল।—ভাগবত।"

হাণ্টার সাহেব।

ইনি কলিকাতার ফোর্টউইলিয়ম কলেজে বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮০৪ "অব্দে বাঙ্গলার জাতিভেদ" সম্বন্ধে ইনি একটী প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধের একাংশ এইরূপ,—

"অন্য শাস্ত্র যদি ভাষাতে তর্জ্জমা করে তবে সংস্কৃত শাস্ত্রের গৌরব হানি প্রযুক্ত তাহার অখ্যাতি হয় যেমন মহাভারতের তর্জ্জমা ভাষাতে কাশীদাস নামে এক শূদ্র করিয়াছিল সেই দোষেতে ব্রাহ্মণেরা তাহাকে শাপ দিয়াছিল, সেই ভয়েতে অন্য কেহ এখন সে কর্ম্ম করে না।

"হিন্দুলোকেরা যদি ও আপন শাস্ত্রের নিশ্চয়েতে থাকে তবে অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার যদি ভালও হয় তবু তাহা গ্রহণ করিতে পারে না যদি অন্য দেশের বিদ্যা ও ব্যবহার দেখে কিম্বা শুনে তথাপি তুচ্ছ করিয়া আদর করে না অতএব অন্য লোকের ব্যবহারেতে তাহাদের জ্ঞান লাভ হইতে পারিবে না।

"অন্য দেশের গমন ও অন্যদেশের ব্যবহার দর্শন ও অন্য বিদ্যাভ্যাসেতে লোকের বুদ্ধিবৃদ্ধি হয় হিন্দুলোকেরদের শাস্ত্রের

পশ্চিমে আটক নদী পার হইলে জাতি যায় উত্তরে ভোটান্তর এবং ম্লেচ্ছ-দেশে ও সেই মত এবং ব্রহ্মপুত্র পার হইলে পূর্ব্বধর্ম্ম নষ্ট হয়, দক্ষিণে সমুদ্রপথে জাহাজে থাকিয়া ভোজন পান করিলে জাতি যায়, হিন্দু শাস্ত্রের মতে গোখাদকের সংসর্গ করিলেও দোষ; হিন্দু ছাড়া যত লোক সকলেই গোমাংস খায় অতএব হিন্দুরা তাহাদের সহিত সহবাস করিতে পারে না এবং যেমন নির্জ্জন উপদ্বীপে কোন ব্যক্তি একাকী থাকে সেই মত এই একাসাড়িয়া রীতিতে তাহারদের বুদ্ধিপ্রতিভা জড়িভূতা হইয়াছে এবং তাহাদের উদ্যোগ শিথিল হইয়া অবিনীততা স্তব্ধতা হইয়াছে; এই ইউরোপীয়দের মধ্যে দস্যু প্রভৃতি অধম লোক হইতেও অধম; কেননা ইহারা স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সুক্রিয়ান্বিত হইলে তাহাদের সুখ্যাতি পুনর্ব্বার হইতে পারে কিন্তু ইহারদের কখন ভাল হইতে পারে না। হিন্দুরা শাস্ত্র ব্যবস্থা কিম্বা মান্য লোকেরা যাদৃচ্ছিক আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেই অপার দুঃখ সাগরে পড়ে।"

রেবরেণ্ড লং সাহেব।

হুগলী-শ্রীরামপুরের রেবরেণ্ড লং সাহেবের উদ্যোগে বহু বাঙ্গলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "রাজা কৃষ্ণ চন্দ্ররায়ের জীবন চরিত" ইহার অন্যতম। শ্রীরামপুরের প্রকাশের পর, ১৭৭৮ ও ৭৯ শকে আর এম বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা বেঙ্গল সুপিরিয়র যন্ত্রে ও তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রে আর দুইবার ইহা মুদ্রিত হয়। আমরা যে সংস্করণ দেখিয়াছি, তাহা গোপীনাথ চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং দ্বারা প্রকাশিত,—১৭৭৯ শকের ২৮শে আষাঢ় তারিখযুক্ত। রচনার নমুনা,—

মানসিংহ রায় মজুমদারকে কহিলেন রায় মজুমদার! এ স্থানের নাম কি? তাহাতে রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ! এ স্থানের নাম বালুচর; গঙ্গার চরেতে গ্রাম পত্তন হইয়াছে। রাজা মানসিংহ কহিলেন অপূর্ব্ব স্থান; এই স্থানে রাজধানী হইলে উত্তম হয়। এই কথোপকথনের পর আজ্ঞা করিলেন আমি কিঞ্চিৎ

কাল এখানে বিশ্রাম করিব। * * এক দিবসের পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাজা মানসিংহ রায় মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কোন্ স্থান ? রায় মজুমদার নিবেদন করিলেন মহারাজ! এস্থানের নাম বর্দ্ধমান। * * * পশ্চাৎ রাজা মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ভবানন্দ রায় মজুমদারের বাটী দেখিয়া যাইব। রাজা মানসিংহ বাগুয়ান পরগণায় উপস্থিত হইয়া ভবানন্দ রায়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। * * ইতিমধ্যে অতিশয় ঝড়বৃষ্টি উপস্থিত হইল, রাজা মানসিংহের সঙ্গে নয় লক্ষ সৈন্য, খাদ্য সামগ্রীর কারণ মহা ব্যস্ত। রায় মজুমদার যাবতীয় সৈন্যের আহার পরগণা হইতে এবং নিজালয় হইতে দিলেন। সপ্তাহ এই প্রকার ঝড়বৃষ্টি হইল, কিন্তু ভবানন্দের আশ্রয়ে হাতী ঘোটক পদাতিক প্রভৃতি কাহারই কিছু ক্লেশ হইল না; ইহাতে রাজা মানসিংহ ভবানন্দ রায় মজুমদারের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যদি ঈশ্বর আমাকে জয়ী করিয়া আনেন, তবে তোমার এ উপকারের প্রত্যুপকার করিব। পশ্চাৎ যশোহরে গমন করিয়া রাজা প্রতাপাদিত্যকে শাসিত করিয়া কিছু দিন পরে ঢাকায় প্রস্থান করিলেন। ভবানন্দ রায় মজুমদারও মানসিংহের সহিত চলিলেন।"

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ইঁহার 'রাজাবলী' এবং ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা প্রকাশিত হয়। রাজাবলীর ভাষা এইরূপ,—

"রাজার ইন্দ্রব্রত, সূর্য্যব্রত, বায়ুব্রত, যমব্রত, বরুণব্রত, চন্দ্রব্রত ও পৃথিবীব্রত এই সপ্তব্রত অবশ্য কর্ত্তব্য, সে সপ্তব্রত এই।

যেমন ইন্দ্র চারিমাস জলেতে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ করেন তেমনি ধনেতে ভাণ্ডার সম্পূর্ণ করিবেন এই ইন্দ্রব্রত। যেমন সূর্য্য আট পৃথিব্যাশ্রিতে বৃক্ষাদি যাহাতে নষ্ট না হয় এমন করিয়া পৃথিবী হইতে

রসের আকর্ষণ করেন, তেমনি রাজা প্রজাশ্রিত পরিজনাদির বাধা যাহাতে না হয় তেমন করিয়া প্রজা হইতে কর গ্রহণ করিবেন এই সূর্য্য-ব্রত। যেমন বায়ু সকল ভূতের বাহ্য ও আভ্যন্তর ব্যাপিয়া থাকেন তেমনি তাহার চর দ্বারা সকল লোকের বাহ্যাভ্যন্তর ব্যবহার জানিয়া থাকিবেন এই বায়ুব্রত। যেমন যম নিয়মিত মৃত্যুকাল পাইয়া এ আমার প্রিয় ও এ আমার অপ্রিয় বিবেচনা কিছুই করেন না সকলকেই নষ্ট করেন তেমনি রাজা ন্যায্য দণ্ডকাল পাইয়া প্রিয়া প্রিয় কিছুই বিবেচনা করিবেন না ন্যায্যদণ্ড অবশ্য দিবেন এই যমব্রত। যেমন বরুণপাশেতে বদ্ধ করেন তেমনি রাজা দস্যুচোর প্রভৃতি দুষ্ট লোকদিগকে কারাগারেতে বদ্ধ করিবেন এই বরুণব্রত। যেমন চন্দ্র ষোড়শ কলাতে সম্পূর্ণ হইয়া আত্মকিরণ বিতরণ করিয়া সকল লোকের মন আহ্লাদিত করেন ও সকলকে স্নিগ্ধ করেন তেমনি রাজা নানা ধনেতে সমৃদ্ধ হইয়া দানমানাদিতে সকলকে পরিতুষ্ট করিবেন ও সকলের দুঃখ সন্তাপ রহিত করিবেন এই চন্দ্রব্রত। যেমন পৃথিবী সকলকে সমভাবে ধারণ করেন ও সকলের সকলি সহেন তেমনি রাজা সকল প্রজা-দিগকে সমভাবে আপন মনে ধারণ করিবেন. ও সকলের উপযুক্ত মত সকলি সহিবেন এই পৃথিবী ব্রত। হে মহারাজ এই সপ্তব্রতের নিত্য অনুষ্ঠান যে রাজা করেন সে রাজা ইহলোকে পরম সুখে থাকেন। রাজা স্ত্রৈণ হইলে সর্ব্বলোক কর্তৃক তুচ্ছকৃত হন অতএব হে মহারাজ আপনি সাবধান হউন রক্ত মাংস অস্থি বিষ্ঠা মূত্র পূয ক্লেদ লালা ইত্যাদি দুর্গন্ধ ও অপবিত্র পদার্থময় এ শরীরের চর্ম্মমাত্রাচ্ছাদানে যে সৌন্দর্য্য সে কি? এবং তাহাতে যে উপাদেয়তাগ্রহ সেই বা কি ইহার অনু-সন্ধান করুন ইতর লোকদের মত কেবল বাহ্যদর্শী না হইয়া অন্তস্তত্ত্বদর্শী হউন। আমি আপনাকে এ সকল শিক্ষার্থে কহি না কিন্তু স্মরণার্থে কহি ইহাতে আপনি যাহা ভাল বুঝেন তাহা করুন।"

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ইনি কলিকাতার অন্যতম বিখ্যাত জমিদার-বংশোদ্ভূত। কিন্তু ইঁহার আদি নিবাস হাবড়ার নিকটবর্ত্তী পৈতাল গ্রাম। পিতার নাম শিবপ্রসাদ ঘোষ। শিবপ্রসাদের দুই পত্নী।

১২১৭ সালের ২২শে শ্রাবণ শনিবার কলিকাতা খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্ব্বাধিকারীর বাটীতে কাশীপ্রসাদ অকালে—সপ্তম মাসে ভূমিষ্ট হন। বাল্যকালে ইনি প্রায়ই মাতুলালয়ে থাকিতেন। ১২বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ইঁহার অক্ষর পরিচয় মাত্রই হইয়াছিল। অবশেষে কাশী-প্রসাদের মাতামহ রামনারায়ণ,—স্বীয় জামাতাকে অনুরোধ করিয়া, হিন্দু কলেজে একবারে তিন শত টাকা জমা দেওয়ান। ইহাতে কাশী-প্রসাদ অবৈতনিক ছাত্ররূপে ১৮২১ অব্দে ৮ই অক্টোবর হিন্দু কলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। প্রগাঢ় পরিশ্রমে কাশীপ্রসাদ অধ্যয়নে মনোযোগী হইলেন। ফলে, তিন বৎসরের মধ্যেই কাশীপ্রসাদ ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। প্রতি বৎসরই তিনি সসম্মানে পুরস্কার পাইতেন। এই সময় হইতেই কাশীপ্রসাদ ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার এই ছাত্রকালের রচিত একটী ইংরোজী সমালোচনা-প্রবন্ধ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও অতঃপর এসিয়াটিক জর্ণালে প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ সালের ১২ই জানুয়ারী তিনি কলেজ হইতে চরম প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন; এই খানেই তাঁহার কলেজে অধ্যয়ন শেষ।

কাশীপ্রসাদ ইংরাজী ভাষায়-অপরিসীম ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কলেজ ত্যাগের পর, তিনি অধিকতর মনোনিবেশ সহকারে ইংরেজী ভাষায় নানারূপ কবিতাদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার "দি সায়েব" "দি মিনি ষ্ট্রেল"—এই সময়েই রচিত। ইঁহারও আর চারিখানি ইংরাজী গ্রন্থ দেখিতে পাই। তন্মধ্যে,—'On Bengali works and wr[illegible] একখানি। এই গ্রন্থে ভারতচন্দ্র নিধুবাবু প্রভৃতির কবিত্ব-সমালো[illegible]

সন্নিবিষ্ট। এই গ্রন্থে তিনি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-তরঙ্গ-প্রণেতা রাধামোহন সেনের কয়েকটী সঙ্গীতের যে সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার অদ্ভুত শক্তির পরিচায়ক। রাধামোহনের একটী গান,—

"বিরহ-অনলে তনু হ'লো ত ভস্মের রাশি।
তাই আরাধনা রূপে সমীরণে সম্ভাসি॥
যদি বায়ু সখা হয়্যা, এ ভস্ম কিঞ্চিৎ লয়্যা,
দেয় শ্যামের শরীরে এই মনে অভিলাষী।"

A heap of ashes soon will be,
    my frame by love's cremation,
Wherefore upon the gale I call,
    by way of invocation.
That may it prove a frieud to me
    and some of the ashes bearing
Scatter it o'er my loved-one's form.
This wish my heart's declaring.

বাঙ্গালা ভাষায় নিধুবাবুর ধরণে ইনি প্রায় তিন শত সঙ্গীত রচনা করেন। এই সকল সঙ্গীত রসে ঢল-ঢল,—ভাবে ভোরপুর।

কালীপ্রসাদ লোকহিতকর অনেক সাধারণ কার্য্যেও সংস্রব রাখিতেন। ১২৮০ সালের ২৭শে কার্ত্তিক ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

ইহাঁর বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গীত ;—

কালেংড়া—কাওয়ালী।

"সনি! পীরিতের কি হয় রীতি এমন। আপনি জ্বলে না, পরে করে জ্বালাতন॥
যেমন দীপেরোপরে, পতঙ্গ পুড়িয়ে মরে, সে দীপ তাহার তরে, ত্যজেনা জীবন॥"

কালেংড়া—যৎ।

আসি বলে গেল, সে যে ফিরে না এলো, হলো নিশি অবসান।
রজনী জাগিয়ে, সজনী কাঁদিয়ে, নয়ন অরুণ হলো সমান॥

———

কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ইনি কলিকাতা যোড়াসাঁকোর বিখ্যাত জমিদার বংশ সম্ভূত। ইঁহার প্রপিতামহের নাম শান্তিরাম সিংহ। ইনি সার টমাস রমবোলড ও মিঃ মিডলটনের নিকট মুরশিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানী কর্ম্ম করিতেন। ইঁহার দুই পুত্র,—প্রাণকৃষ্ণ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ্ণের এক পুত্র নন্দলাল। এই নন্দলালই কালীপ্রসন্ন সিংহের পিতা।

কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরেজী তিনভাষাতেই বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বিপুল ব্যয়ে বহু পণ্ডিত সাহায্যে ইনি মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। এই অনুবাদ-মহাভারত বিনা-মূল্যে বিতরিত হয়।

১৭৮০ শকে সিংহ মহাশয় মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি অনুবাদ-কার্য্যে নিযুক্ত হন। অনুবাদের "উপ-সংহারে" সিংহ মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমি বহুযত্নে আসিয়াটিক সোসাইটীর মুদ্রিত এবং সভাবাজারের রাজবাটীর, মৃত বাবু আশুতোষ দেবের ও শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের * পুস্তকালয় স্থিত, তথা আমার প্রপিতামহ দেওয়ান ৺ শান্তিরাম সিংহ বাহাদুরের কাশী হইতে সংগৃহীত হস্ত লিখিত পুস্তক সমুদায় একত্রিত করিয়া বহুস্থলের বিরুদ্ধ ভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক অনুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরের সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি মহাশয় আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। * অবকাশানুসারে (বিদ্যাসাগর মহাশয়) আমার অনুবাদ দেখিয়া দিয়াছেন ও সময়ে সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যখন আমি কলিকাতায় অনুপস্থিত থাকিতাম, তখন তিনি স্বয়ং আসিয়া আমার মুদ্রাযন্ত্রের ও ভারতানুবাদের তত্ত্বাবধারণ করিয়াছেন;

"এতদ্ভিন্ন প্রিয়চিকীর্ষু বান্ধবেরা ও কলিকাতার অদ্বিতীয় পৌরাণিক শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত বাবু

* এক্ষণে সার মহারাজা।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সোমপ্রকাশ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গলা-সাহিত্যাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীল-দর্পণ নাটক প্রভৃতির লেখক শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও ভাস্কর সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি মহাত্মারা অনুবাদ সময়ে সৎপরামর্শ ও সদভিপ্রায় দ্বারা আমারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত অনুবাদিত ভাগ হইতে উৎকৃষ্ট প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমারে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

"যে সকল মহাত্মারা সময়ে সময়ে আমার সদস্য পদে ব্রতী হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যা-মন্দিরের ব্যাকরণের অধ্যাপক ও সংস্কৃত রঘুবংশের বাঙ্গলা অনুবাদক ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণ, ৺ কালীপ্রসন্ন তর্করত্ন, ৺ ভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরমাত্মীয় ৺ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও ৺ অযোধ্যানাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি দশ জন অনুবাদ শেষের পুর্ব্বেই অসময়ে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

"এক্ষণকার বর্ত্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন বিদ্যারত্ন, শ্রীযুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি সদস্যদিগকে মনের সহিত সকৃতজ্ঞ চিত্তে বার বার নমস্কার করিতেছি। * * হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত যন্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অন্যতর যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ও দরজিপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাভারত মুদ্রাঙ্কণ সময়ে কেহ পুরাণ-সংগ্রহ যন্ত্রের তত্ত্বাবধায়ক, কেহ প্রুফ-দর্শক ও কেহ কাপি-পাঠক ছিলেন। হুগলীর গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন এদিন ভারতানুবাদের পরিদর্শকতা ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ পুরাণান্তরের উপদেশ প্রদান করিয়া আমারে যথেষ্ট উপকৃত করিয়াছেন। ব্রাহ্ম-সমাজের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এবং ঐ

সমাজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার তথা বর্ত্তমান সহকারী সম্পাদক ও উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ প্রভৃতি মহাত্মারাও মুদ্রাঙ্কণ ও পুরাণ সংগ্রহ যন্ত্রস্থাপনবিষয়ে আমারে সম্যক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন।

"হিন্দু সমাজের শিরোভূষণ স্বরূপ সুবিখ্যাত শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থকার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর * * প্রতিদিন সায়ংকালে আমার অনুবাদিত গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক পাঠ শ্রবণ করিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে অনুবাদ বিষয়ক বিবিধ সংপরামর্শ দ্বারা আমারে কৃতার্থ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দু-দলপতিরা আমার নির্দ্দিষ্ট পাঠক ছিলেন।"

১৭৮৮ শকে এই অনুবাদ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনুবাদে আট বৎসর লাগিয়াছিল।

এই বঙ্গানুবাদিত মহাভারত কালীপ্রসন্ন সিংহের অতুলকীর্ত্তি। যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার এ কীর্ত্তি চিরোজ্জ্বল রহিবে।

ইহাঁর হুতোম পেঁচার নক্সা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের উৎসর্গ এইরূপ;—

"হে সজ্জন! স্বভাবের সুনির্ম্মল পটে,
রহস্য-রসে রঙ্গে, চিত্রিনু চরিত্র—
দেবী সরস্বতীর বরে। কৃপা-চক্ষে হের
একবার, শেষে বিবেচনা মতে যার
যা অধিক আছে, তিরস্কার কিম্বা
পুরস্কার, দিও তাহা মোরে, বহুমানে
লব শির পাতি।"

এই কয়েক পংক্তিতেই প্রকাশ,—অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তক,—বস্তুত কালীপ্রসন্ন,—পরিপোষ্টা মাইকেল। হুতোম প্যাঁচার নক্সা তদাতন কলিকাতার নিখুঁৎ চিত্র।

মহারাজ মহাতাব চান্দ।

সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ,—মহারাজ মহাতাবচন্দ্র বাহাদুরের অক্ষয় কীর্ত্তি। ইনি বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃ

১৭৪৮ শকে দত্তক পুত্ররূপে গৃহীত হন। কিছু কাল পরে, তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর পরলোক গমন করেন। এই সময়ে মহারাজ-মহিষী মাতা কমল কুমারী দেওয়ান বাবু প্রাণচন্দ্র কপুরের সাহায্যে রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। ১৭৬৫ শকে মহারাজ মহাতাব চান্দ ত্রয়োবিংশতি বর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইহাঁর শাসন-গুণে, বর্দ্ধমান-রাজ্যের নানাবিষয়িনী উন্নতি সাধিত হয়।

কাশীরাম দাসের মহাভারত পাঠে মহারাজ মহাতাবচান্দ পরিতৃপ্ত হন না; সভাসদ পণ্ডিত তারকনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়কে ইনি সংস্কৃত মহাভারতের ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করেন; তাঁহার মুখে এই ব্যাখ্যা শুনিয়া মহারাজ বাহাদুর সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশে অভিলাষী হন। তত্ত্ব-রত্নমহাশয়ের উপর এ কার্য্যের তত্ত্বাবধানভার অর্পিত হয়। তিনি অবিলম্বে ইহার জন্য পণ্ডিত মণ্ডলী নিযুক্ত করেন। ১২৬৫ সালের বৈশাখ মাসে অনুবাদ কার্য্য আরব্ধ হয়।

কলিকাতা এসিয়াটিক-সোসাটীইর মুদ্রিত মহাভারত অনুসারেই প্রথমতঃ বঙ্গানুবাদ হইতে থাকে; কিন্তু এই মুদ্রিত মহাভারতের সহিত এতদ্দেশ-প্রচলিত হস্ত-লিখিত প্রাচীন মহাভারতের পাঠৈক্য হয় না। তখন হস্তলিখিত পাঁচ খানি পুঁথি সংগৃহীত হয়। রাজসভাসদ রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় এই সকল পুঁথির পাঠ সংশোধন করিতে থাকেন। অতঃপর এই সংশোধিত মূলমহাভারত দৃষ্টেই অনুবাদ কার্য্য হইতে থাকে। এসিয়াটিক-সোসাইটীর মহাভারত দৃষ্টে যে অনুবাদ হইয়াছিল, তাহা পরিত্যক্ত হয়। বলা বাহুল্য, ইহাতে বহু টাকা অনর্থক ব্যয়িত হইল; কিন্তু মহারাজ মহাতাবচান্দ বাহাদুর তাহাতে সংকল্প-ভ্রষ্ট হইলেন না।

বহু প্রথিতনামা পণ্ডিত এই অনুবাদ-কার্য্যে নিয়োজিত হন। এ সম্বন্ধে বঙ্গানুবাদ মহাভারতের ভূমিকায় পণ্ডিত অঘোরনাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"বিষ্ণুপুরাণ ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতির অনুবাদক শ্রীজগন্মোহন তর্কালঙ্কার এই মহাভারতের আদি পর্ব্বে অনুবাদ ...াছিলেন, কিন্তু তাহা সোসাইটীর মুদ্রিত পুস্তক অনুসারে

অনুবাদিত হওয়ায়, তদানীন্তন রাজ-সভাসদ বেদান্তবিশুদ্ধ-বুদ্ধি পণ্ডিত ৺পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন মহাশয় উহা সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। কিয়ৎকাল পরে তিনি উৎকট রোগে আক্রান্ত হওয়ায় রাজ সভাসদ পণ্ডিত ৺শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ দ্বারা তাহার শেষ পর্য্যন্ত শোধিত হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার দ্বারা সভাপর্ব্ব অনুবাদিত হয়। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের সুপ্রতিষ্ঠ ছাত্র ৺সারদা প্রসাদ জ্ঞাননিধি উহা শোধিত মূলের সহিত ঐক্য করিয়া সংশোধন করেন। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞান-মিহিরোদয় পত্রের পূর্ব্বতন সম্পাদক ৺শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি বনপর্ব্ব অনুবাদ করেন। শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ ও সারদা প্রসাদ জ্ঞাননিধি দ্বারা উহা সংশোধিত হয়। বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব্ব উক্ত জ্ঞাননিধি কৃত অনুবাদ এবং ভীষ্ম ও দ্রোণ পর্ব্ব শ্যামাচরণ তর্কবাগীশ অনুবাদ করিয়াছিলেন, পরন্তু তর্কবাগীশ কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হওয়ায়, দ্রোণ-পর্ব্বের অধিকাংশ কেদার নাথ বিদ্যা-বাচস্পতি দ্বারা অনুবাদিত হইয়াছে। কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক ও স্ত্রীপর্ব্ব মদনুবাদিত। শান্তি-পর্ব্বের রাজ ধর্ম্মের কিয়দংশ কেদার নাথ বিদ্যা বাচস্পতি, কিঞ্চিৎ শ্রীব্রজেন্দ্র কুমার বিদ্যারত্ব অবশিষ্ট ভাগ এবং আপদ্ ও মোক্ষ ধর্ম্ম মদনুবাদিত; অনুশাসন ও স্বর্গারোহণ আমিই অনুবাদ করিয়াছিলাম। অশ্বমেধ পর্ব্ব উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন অনুবাদ করেন। মোষল ও মহা-প্রস্থান শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন অনুবাদ করিয়াছেন।"

গভীর পরিতাপের বিষয় এই,—মহাতাব চান্দ বাহাদুর তাঁহার এই বিরাট সদনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; ১৮০১ শকে ৫৭ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার দেহান্তর হইবার পর, আফতাব চান্দ মহাতাব বাহাদুরের আদেশে সুবিচক্ষণ রাজমন্ত্রী,—বর্ত্তমান মহারাজ বিজয় চান্দ মহাতাব বাহাদুরের পিতা লালা বনবিহারী কপূর মহোদয় এই মহৎ কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন। ১৭০৬ শক বা বঙ্গাব্দ ১২৯১ সালের ২৭শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার এই শুভকার্য্য সুসম্পন্ন হয়। বর্দ্ধমান রাজবাটী হইতে কেবল মাত্র মহাভারত নহে, হরি

এবং রামায়ণের বঙ্গানুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে। বর্দ্ধমান রাজবাটীর এই কীর্ত্তি এদেশে চির-প্রতিষ্ঠিত রহিবে।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে ১২২২ সালে মদনমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়।

বাল্যে মদনমোহন স্বগ্রামেই শিক্ষারম্ভ করেন। অনন্তর তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসেন। সংস্কৃত-কালেজে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। কিন্তু তিনি শীঘ্রই উদরাময়ে আক্রান্ত হইয়া পড়েন; বাটী ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। দেশে—চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য পড়িতে থাকেন। অতঃপর, মদনমোহন পুনরায় কলিকাতায় আসিয়া ১২৩৬ সালে সংস্কৃত-কালেজে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে ঈশ্বর বিদ্যাসাগরও কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। উভয়ে বড়ই সৌহার্দ্দ্য জন্মে।

মদনমোহন অচিরেই সাহিত্য-অলঙ্কারে বুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময়েই তিনি সংস্কৃতরস-তরঙ্গিনী গ্রন্থের পদ্যানুবাদ করেন। অধ্যাপকগণ তঁহাকে কাব্যরত্নাকর উপাধি দেন। ইহার পর ইনি, জ্যোতিষ দর্শন ও স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করেন। স্মৃতি পড়িবার কালেই ইনি বাসবদত্তার পদ্যানুবাদ রচনা করেন। ১৭৫৮ শকে এই গ্রন্থ রচিত। এই সময়ে ইঁহার বয়স একুশ বৎসর মাত্র। ১২৫০ সালে ইঁহার কলেজে শিক্ষা শেষ।

প্রথমে ইনি কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট পাঠশালায় মাসিক পনর টাকায় পণ্ডিতের কার্য্য করিতে থাকেন। পরে বারাসতে গবর্ণমেণ্ট টেবর বিদ্যালয়ে ইনি প্রধান পণ্ডিতের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই পদের মাহিনা পঁচিশ টাকা। এখানে ইনি এক বৎসর মাত্র কর্ম্ম করেন। তাহার পর ইনি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। মাহিনা চল্লিশ টাকা। এই সময়ে কৃষ্ণনগর-কলেজ স্থাপিত হয়। ইনি

এই কলেজে পঞ্চাশ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করেন। এক বৎসর মাত্র তিনি এই কর্ম্ম করেন। অতঃপর কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ৯০ টাকা বেতনে তিনি সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু কলিকাতার জল বায়ু ক্রমেই তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠে। এই সময়ে তিনি মুরসিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বেতন দেড়শত টাকা। ছয় বৎসর তিনি এই কর্ম্ম করেন। তাহার পর তিনি ডেপুটী মাজিষ্টরের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন।

১২৬৪ সালে ২৭শে ফাল্গুন মুরশিদাবাদ-কান্দিতে বিসূচিকা রোগে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

ইহাঁর শিশুশিক্ষা বহুজন-পরিচিত। ১২৫৭ সালে এই শিশুশিক্ষা গ্রন্থত্রয় রচিত। সর্ব্ব শুভঙ্করী নাম্নী একখানি সংবাদ পত্রিকাও ইহাঁরই যত্নে প্রচারিত হইয়াছিল।

ইহাঁর রচনা কেমন মাধুর্য্যময়ী,—

"কালিয় মর্দ্দন, কংস-নিসূদন, কেশী মথন কংসারে।
খগপতি বাহন, খেচর পালন, খিন্নখলবলহারে॥
নূতন নীরদ, নীল কলেবর, নন্দ-নন্দন নরাকারে।
পতিত পাবন, পরম কারণ, পীত-পটু-পট ধারে॥
বল্লব--বালক, বিপিন বিহারক, বংশীবটতট তীরে।
ভুবন-ভূষণ, ভকতি ভাজন, ভীরু-ভব-ভয়-তারে॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

১৭৩৩ শকের বা বাঙ্গালা ১২১৮ সালে ২৫শে ফাল্গুন শুক্রবার ইনি ২৪পরগণার অধীন কাচড়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই কলিকাতার যোড়াসাঁকোয় মাতামহাশ্রমেই বাস করিতেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম যখন দশ বৎসর, তখন ইহাঁর পিতার মৃত্যু হয়।

বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগী ছিলেন না। তবে, এ সময়েও তিনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। পাঠশালার ছাত্রেরা পারস্য ভাষার অর্থ করিয়া পাঠ করিত, আর ঈশ্বরচন্দ্র তাহা শুনিয়া শুনিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিতেন। সাত বৎসর বয়সেই ঈশ্বরচন্দ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই ঈশ্বরচন্দ্র প্রখর স্মৃতিশক্তিশালী; একবার যাহা শুনিতেন, তাহা আর ভুলিতেন না। দুর্ব্বোধ-সংস্কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যাও তিনি একবার মাত্র শুনিয়া, তাহা বাঙ্গালা কবিতায় রচনা করিতে পারিতেন।

১২ বৎসর বয়স হইতেই ইনি গান রচনা আরম্ভ করেন। সখের কবির দলে, ওস্তাদী কবির দলে—তিনি বহুসংখ্যক গান বাঁধিয়া দেন।

কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ৺নন্দকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র-মোহন ঠাকুরের সাহায্যে ও উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘ হইতে "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের লোকান্তরের সহিত "সংবাদ প্রভাকর"ও তিরোহিত হয়।

১২৩৯ সালে ১০ই শ্রাবণ হাবড়া-আন্দুলের জমিদার জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক "সংবাদ রত্নমালা" প্রকাশিত করেন। ঈশ্বরচন্দ্র ইহার সম্পাদক হন। কিন্তু বেশী দিন তিনি এ কার্য্য করেন নাই। এ কার্য্য ছাড়িয়া তিনি তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন।

১২৪৩ সালের ২৭শে শ্রাবণ ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় 'প্রভাকর' প্রকাশ করেন। এবার "প্রভাকর" সপ্তাহে তিনবার প্রকাশিত হইত। ১২৪৬ সালের ১লা আষাঢ় "প্রভাকর" প্রাত্যহিক হয়। বঙ্গদেশের অধিকাংশ সম্ভ্রান্ত এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তি "প্রভাকরে"র গ্রাহক ছিলেন।

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "পাষণ্ড-পীড়ন" নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। এই "পাষণ্ড-পীড়নে" ও ৺গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের "রসরাজে" তুমুল বাগ্ যুদ্ধ চলিত। ১২৫৪ সালে এইরূপ বাগ্ বিবাদ আরম্ভ হয়।

অতঃপর "পাষণ্ড-পীড়ন" উঠিয়া যায়। ১২৫৪ সালের ভাদ্রমাসে ঈশ্বরচন্দ্র 'সাধুরঞ্জন' নামে আর একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ

করেন। এই সময়ে তিনি কবির দলে ও হাফআখড়াইয়ের দলে গান বাঁধিয়াও দিতেন।

১২৬০ সালে ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি মাসের ১লা তারিখে স্থূলাকারে "প্রভাকর" বাহির করিতে লাগিলেন।

ইনিই সর্ব্বাগ্রে প্রাচীন কবিদের জীবনীসহ গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হন,—কতকটা কৃতকার্য্যও হন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয়,—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন,—

"প্রাচীন কবিদিগের অপ্রকাশিত লুপ্তপ্রায় কবিতাবলী, গীত, পদাবলী এবং তৎসহ তাঁহাদিগের জীবনী প্রকাশ করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশ বর্ষকাল নানাস্থান পর্য্যটন এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া, শেষ সে বিষয়ে সফলতা লাভ করেন। বাঙ্গালা জাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী। সর্ব্বাদৌ ১২৬০ সালের ১লা পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জীবনী ও তৎপ্রণীত "কালীকীর্ত্তন" ও 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন' প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভাকরে রামনিধি সেন, (নিধুবাবু), হরুঠাকুর, রামবসু, নিতাইদাস বৈরাগী, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও নৃসিংহ এবং আরও কয়েকজন প্রাচীন খ্যাতনামা কবির জীবনচরিত, গীত এবং পদাবলী প্রকাশ করেন। সে গুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

"মৃত কবি ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী এবং তৎপ্রণীত অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা এবং পদাবলী বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়া, সন ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠের প্রভাকরে প্রকাশ করেন। সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন ইহাই ঈশ্বরচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশ।"

রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইনি গদ্য পদ্য বিস্তর লিখিয়াছিলেন। শ্লেষ-ব্যঙ্গময়ী কবিতা রচনায় ইনি সিদ্ধ-হস্ত ছিলেন। ইঁহার "প্রবোধ-প্রভাকর" ১৭৭৯ শকে এবং "হিত প্রভাকর" ১৭৮২ শকে মুদ্রিত হয়। "বোধেন্দু-বিকাশ" এবং "কলিনাটকও" ইহার আর দুই খানি গ্রন্থ। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ইঁহার পরলোক ঘটে।

গুপ্ত মহাশয় ভক্তি-রস-মোহিনী কবিতাও বিস্তর লিখিয়াছেন। তাঁহার "নিবৃত্তি কানন" নামক কবিতার আরম্ভ এইরূপ;—

"উঠ উঠ উঠ জীব চড় জ্ঞান-রথে। ভ্রমণ করিতে চল নিবৃত্তির পথে॥
নিত্য-সুধাময়ময় বন আছে যথা। 'বিবেক'-বসন্ত ঋতু বিরাজিত তথা॥
সে বনে অপর ঋতু না হয় উদয়। সদাকাল সুখময় সুরভি সদয়॥
ঈশ্বর সাধন-কাম করিছে বিহার। শ্রীমতী 'সুমতি রতি' সতী প্রিয়া তার॥
এখনি দেখিতে পাবে বিজ্ঞান-নয়নে। ইন্দ্রিয়-শাখির শোভা দেহ-উপবনে॥
অপরূপ বৃত্তিরূপ শাখা শত শত। অনুরাগ-নব পত্র শোভে তায় কত॥
মধুর মাধুরী কিবা আহা মরি মরি। মাঝে মাঝে ঝুলিতেছে ভক্তির মুঞ্জরী॥
বিবেক-বসন্ত-বনে বাড়িছে বিলাস। ফুটেছে কুসুম কত ছুটেছে সুবাস॥
সন্তোষ-মলয়-বায়ু প্রবাহিত হ'য়ে। করিতেছে পুলকিত, গন্ধ তার ল'য়ে॥
দয়া জুতী, ক্ষমা জাতি, শান্তির সেউতি। অহিংসা অপরাজিতা, করুণা মালতী॥
মুকুলিত হইয়াছে যত তরু লতা। লজ্জা লজ্জাবতীফুল, মাধবী শীলতা॥
সত্যরূপ চম্পক, সৌরভ কত তা'তে। প্রমোদিত করিয়াছে প্রেম পারিজাতে॥
এ বনে বিহঙ্গ কত করি বিচরণ। শ্রবণ-বিবরে করে সুধা বরিষণ॥
মরি কিবা 'শ্রুতি-শুক' শ্রুতি-সুখকর। 'গীতা' শারিকার সহ ডাকে নিরন্তর॥
মনোহর দ্বিজবর নিজ স্বর ধ'রে। সুরাগ সুরাগে লয়, প্রাণ মন হরে॥
সুললিত সুমধুর রবে ধরি তান। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" করে এই গান॥"

ইহাঁর একটী সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

কেরে বামা, ষোড়শী রূপসী, সুরেশী, এ যে, নহে মানুষী,
ভালে শিশু শশী, করে শোভে অসি, রূপমসী চারু ভাস।
দেখ, বাজিছে ঝম্প, দিতেছে ঝম্প, মারিছে লম্ফ, হ'তেছে কম্প,
গেলরে পৃথ্বী, করে কি কীর্ত্তি, চরণে কৃত্তিবাস॥
কেরে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী, কাহার স্বামিনী, ভুবনভামিনী,
রূপেতে প্রভাত, করেছে যামিনী, দামিনীজড়িত হাস।
কেরে, যোগিনী সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে, রণতরঙ্গে, নাচে ত্রিভঙ্গে,
কুটিলাপাঙ্গে, তিমির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ।
আহা, যে দেখি পর্ব্ব, যে ছিল গর্ব্ব, হইল খর্ব্ব, গেলরে সর্ব্ব,
চরণসরোজে, পড়িয়ে সর্ব্ব, করিছে সর্ব্বনাশ।
দেখি, নিকট মরণ, কররে স্মরণ, মরণহরণ, অভয় চরণ,
নিবিড় নবীন নীরদবরণ, মানসে কর প্রকাশ।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্ব সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—

'ঈশ্বরগুপ্ত কবি। কিন্তু কি রকম কবি? * * * যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্য্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময়। অন্যে তাহাতে বড় রস পান না। তোমরা পৌষপার্ব্বণে পিটাপুলি খাইয়া অজীর্ণে দুঃখ পাও, তিনি তাহার কাব্যরসটুকু সংগ্রহ করেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ গিলিয়া, গাঁদাফুল সাজাইয়া\কষ্ট পায়, ঈশ্বর গুপ্ত মক্ষিকাবৎ তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ করেন, অন্যকেও উপহার দেন। দুর্ভিক্ষের দিন, তোমরা মাতা বা শিশুর চক্ষে অশ্রুবিন্দুশ্রেণী সাজাইয়া মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা দাও, তিনি চালের দরটী কসিয়া দেখিয়া তাহার ভিতর একটু রস পান।

মনের চেলে মন ভেঙ্গেচে
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাকো।

তোমরা সুন্দরিগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন গোড়ায় বসাইয়া শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাটী কাব্যরস বাহির করেন;—

বধূর মধুর খনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছলছল॥

ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যচালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধূঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনায়সে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপসেমাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বী ভাব দেখেন। পাঁটার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, "তোমাদের এ দেশ, এ সমাজ বড় রঙ্গ ভরা। তোমরা মাথা কুটাকুটী করিয়া দুর্গোৎসব কর, আমি কেবল তোমাদের রঙ্গ দেখি। তোমরা এ ওকে ফাঁকি দিতেছ, এ ওর কাছে মেকি চালাইতেছ, এখানে কাষ্ঠ হাসি হাস, ওখানে মিছা কাঁন্না কাঁদ, আমি তা বসিয়া বসিয়া দেখিয়া হাসি। তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দরী, বড় মনোমোহিনী, প্রেমের আধার, প্রাণের সুসার, ধর্ম্মের ভাণ্ডার,—তা হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমি দেখি উহারা বড় রঙ্গের জিনিষ। মানুষে যেমন রঙ্গী বাঁদর পোষে, আমি বলি পুরুষে তেমনি মেয়ে মানুষ পোষে, উভয়কে মুখ ভেঙানতেই সুখ।" স্ত্রীলোকের রূপ আছে—তাহা তোমার আমার মত ঈশ্বর গুপ্তও জানিতেন, কিন্তু তিনি বলেন, উহা দেখিয়া মুগ্ধ হইবার কথা

নহে—উহা দেখিয়া হাসিবার কথা। তিনি স্ত্রীলোকের রূপের কথা পড়িলে হাসিয় লুটাইয়া পড়েন। মাঘ মাসের প্রাতঃস্নানের সময় যেখানে অন্য কবি রূপ দেখিবার জন্য, যুবতিগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেখানে তাহাদের নাকাল দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল স্বচ্ছসলিলধৌত কবিতকান্তি লইয়া আদর্শ গড়িবে, তিনি বলিলেন, দেখ দেখি, কেমন তামাসা! যে জাতি স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমরা তাদের পাইয়া এত বাড়াবাড়ি কর।" তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্ম্মে আস্থা ও যত্ন দেখিয়া বলিবে, "ধন্য স্বামীপুত্রসেবাব্রত। ধন্য স্ত্রীলোকের স্নেহ ও ধৈর্য্য।" ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হাঁড়িশালে গিয়া দেখিলেন, ব্যঞ্জনের চাল চর্ব্বনেই গেল, পিটুলির জন্য কোন্দল বাধিয়া গেল, স্বামী ভোজন করাইবার সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্ব ভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন হইল। স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।"

প্যারিচাঁদ মিত্র।

(টেকচাঁদ ঠাকুর।)

কলিকাতা-নিমতলার মিত্রবংশে ১২২১ সালের ৮ই শ্রাবণ প্যারীচাঁদ মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁদের আদিবাস হুগলী-জেলার পাণি-সেহালা গ্রামে। প্যারিচাঁদের পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। রামনারায়ণ,—রাজা রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে রামনারায়ণের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাঁরই যত্নাতিশয্যে ইহাঁরই উদ্যোগ-পরিশ্রমে, কলিকাতা-কাঁসারিপাড়ার সঙ্গীত-রসিক রাধামোহন সেন মহাশয় সঙ্গীত-তরঙ্গ নামক উৎকৃষ্ট সঙ্গীত-বিজ্ঞান গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত সুমধুর কবিতায় রচিত। কলিকাতা বঙ্গবাসী আফিস হইতে এই গ্রন্থ পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

বাল্যে প্যারীচাঁদ গুরু মহাশয়ের নিকট শিক্ষালাভ করেন। বাঙ্গালা ভাষায় প্যারীচাঁদের কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি হইল, তখন তাঁহার পিতা,—পুত্রের জন্য পারশী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্যারীচাঁদকে পড়াইবার

জন্য একজন মুন্সী নিযুক্ত হইলেন। বাঙ্গলা ও পারশী ভাষায় প্যারীচাঁদের অভিজ্ঞতা জন্মিল; তখন প্যারীচাঁদ ১৮২৯ সালের ৭ই জুলাই হিন্দু-কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। এ সময়ে তিনি ইংরেজী শব্দ যথারীতি উচ্চারণ করিতে পারিতেন না; তাঁহার কদর্য্য উচ্চারণ শুনিয়া সহপাঠী ছাত্রগণ হো-হো হাসিয়া উঠিত;—প্যারীচাঁদের মুখে ইংরেজী বুলি শুনিয়া, আমোদ করিবার জন্য, অনেকে নানারূপ প্রয়াস পাইত।

কিন্তু এ ভাবটী বেশী দিন রহিল না। মেধাবী প্যারীচাঁদ,—অতি অল্পদিনেই ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইলেন; ফলে; অন্যান্য বালকগণ যে সময়ে কলেজের সমগ্র পাঠ শেষ করেন, তাহারও অল্প সময়ে প্যারীচাঁদ কলেজে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ করিলেন। তিনি গণিতপ্রিয় ছিলেন না,—সাহিত্যেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ ছিল। সুপ্রিমকোর্টের জজ গ্রাণ্ট সাহেব একবার একটী প্রবন্ধ লিখিতে দেন। প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার নির্দ্দেশ থাকে। প্যারীচাঁদ এই প্রবন্ধ লেখেন; রাজা দিগম্বর মিত্রও প্রবন্ধ লেখেন। কিন্তু প্যারীচাঁদ জয় লাভ করেন,—পুরস্কার পান। প্যারীচাঁদ গণিতে অনুরাগী ছিলেন না বটে; কিন্তু ইহার জন্য কলেজের গণিতাধ্যাপক টাইটলার সাহেব তাঁহার উপর কখন বিরক্ত হন নাই;—বরং তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। প্যারীচাঁদ বড়ই চিন্তাশীল ছিলেন,—এই জন্য টাইটলার সাহেব তাঁহাকে 'দার্শনিক' বলিয়া ডাকিতেন। ইহা বাৎসল্যের সম্বোধন।

কলেজ-ত্যাগের পর প্যারীচাঁদ ১৮৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা পাবলিকলাইব্রেরীর ডেপুটিলাইব্রেরিয়নপদে নিযুক্ত হইলেন। পাঠানুরাগী প্যারীচাঁদের বড়ই সুবিধা হইল। আফিসের কাজ কর্ম্ম সারিয়া, তিনি প্রাণ পুরিয়া লাইব্রেরীর নানারূপ গ্রন্থ পড়িতে থাকিলেন। তাঁহার কার্য্যে অতি মাত্র পরিতুষ্ট হইয়া, লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে সেক্রেটারী এবং লাইব্রেরীয়ানের পদে উন্নীত করিলেন। ইহা ১৮৬৭ সালের কথা। কিন্তু এ কর্ম্ম ইনি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিলেন; চাকুরী করা তাঁহার এই স্থানেই শেষ হইল। ইতিপূর্ব্বেই প্যারীচাঁদ—

কালাচাঁদ শেঠ এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর সহিত অংশীদাররূপে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলেন। চাকুরী ছাড়িয়া, এইবার তিনি ব্যবসায়ে অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। ফলে, তাঁহার প্রভূত আয় হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি স্বয়ং পৃথক্ ব্যবসায় খুলিলেন; কালাচাঁদ এবং তারাচাঁদের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন। অবিলম্বেই তাঁহার ভাণ্ডার রজত-কাঞ্চনে পূরিয়া উঠিল।

ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যশোরাশিও চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। প্যারীচাঁদ একাধিক চা-কোম্পানী এবং যৌথ-কোম্পানির ডিরেক্টর হইলেন। লর্ড ড্যালহৌসি তখন এ দেশের বড় লাট। পুলীশ-সংস্কার উদ্দেশে তিনি এক কমিশন বসান। কলভিন এবং ডামপির নামক দুই জন সাহেব কমিশনের কার্য্য করেন। অনেক সুভ্রান্ত ইউরোপীয় এবং এ দেশীয় লোকে এই কমিশনে সাক্ষ্য দেন। প্যারীচাঁদকেও সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। তিনি কমিশনের নিকট পুলীশের নানারূপ দোষের কথা-নির্ভীক-চিত্তে খ্যাপন করেন। ফলে, পুলীশের অনেক অপরাধী কর্ম্মচারীর কর্ম্ম যায়। কলিকাতায় তৎকালে যত বড় বড় সামাজিক সভা-সমিতি ছিল, প্যারীচাঁদের সহিত ইহাঁর প্রায় সকল সভারই সম্পর্ক থাকিত। প্যারীচাঁদ বেথুন-সোসাইটীর সেক্রেটারী,—প্যারীচাঁদ জীব-নিষ্ঠুরতা-নিবারণী সভার সদস্য, প্যারীচাঁদ বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স এসোসিয়েশনের অবৈতনিক সেক্রেটরী; প্যারীচাঁদ কৃষি-সভার সেক্রেটারী; প্যারীচাঁদ ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশনের আদি সদস্য। পূর্ব্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ছিল না, ছিল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটী। মিঃ জর্জ্জ টমসন ছিলেন ইহার প্রেসিডেণ্ট এবং প্যারীচাঁদ সেক্রেটারী। প্যারীচাঁদ হেয়ার প্রাইজ-ফণ্ড কমিটির সেক্রেটারী, প্যারীচাঁদ ডিষ্ট্রীক্ট চেরিটেবল সোসাইটীর এবং কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর সদস্য। ১৮৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি হইতে ১৮৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত প্যারীচাঁদ বেঙ্গল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। এই সময়ে তিনি এই ব্যবস্থাপক সভায় জীব-নিষ্ঠুরতা-নিবারণ উদ্দেশে দুইখানি বিল পেশ করেন। ইহা এক্ষণে ১৮৬৮ সালের প্রথম এবং তৃতীয় আইন নামে

অভিহিত। প্যারীচাঁদ অনরবি ম্যাজিষ্ট্রর; প্যারীচাঁদ জষ্টিস অব্ দি পিস;—প্যারীচাঁদ কলিকাতা সিনেটের সদস্য।

যেমন সমাজে তাঁহার প্রতিষ্ঠা, তেমনি ইংরেজী সাহিত্যে। প্যারীচাঁদ কলিকাতা "রিভিউ" নামক ইংরেজী পত্রে জমিদার এবং প্রজা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লেখেন। বিলাতে এই প্রবন্ধ লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। পার্লামেণ্টের কমন্স সভাতেও এই প্রবন্ধের কথা উঠে। কলিকাতা রিভিউ পত্রে তিনি অন্যান্য বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার সকল প্রবন্ধই গবেষণা মূলক এবং সবিশেষ চিন্তাশীলতার পরিচায়ক।

ইংরেজী সাহিত্যে প্যারীচাঁদের প্রতিষ্ঠা যে পরিমাণ, বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক। প্যারীচাঁদই বাঙ্গালা ভাষার সুচিক্কণ রং ফলাইয়াছেন; প্যারীচাঁদই বাঙ্গলা ভাষার সজীবতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা' নাম্নী মাসিক পত্রিকায় সে সাধনার আরম্ভ; তাঁহার গ্রন্থাবলীতে তাঁহার পরিণতি। তাঁহার অভেদী— তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ—তাঁহার আধ্যাত্মিকা,—তাঁহার রামা রঞ্জিকা —তাহার ভাষা-সৌন্দর্য্যের কমলকানন। তাঁহার 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়,' এবং গীতাঙ্কুর,—আজ বহুজন পরিচিত এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা, 'বামাতোষিনী' ও কৃষিবোধ ইঁহার আর কয়েকখানি গ্রন্থ।' রস্তমজী কাওয়াসজীর জীবনচরিত" ও অন্যান্য কয়েক খানি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রত্ন,—আলালের ঘরের দুলাল। ভাবুকতা এবং রসিকতা, তাঁহার গ্রন্থে ভরপুর। পড়িতে পড়িতে হাসিয়া ঢলিয়া পড়িবে, কিন্তু বুঝিতে পারিলে মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যাইবে। পাদরী লং সাহেব নীল কমিশনের রিপোর্টে প্যারীচাঁদের বিশেষণ দিয়াছিলেন,—'বঙ্গের ডিকেন্স।'

সাহিত্যে যেমন, চরিত্রেও তেমনি। প্যারীচাঁদ যেমন রসিক, তেমনি ভাবুক। তিনি হাসিতেন, হাসাইতেন; ভাবিতেন, ভাবাইতেন। শক্তি বস্তুতই অপরিমেয়। সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ খুবই ছিল।

২৪পরগণা-খড়দহ নিবাসী বিখ্যাত প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের কন্যার সহিত প্যারীচাঁদের বিবাহ হয়। প্রাণকৃষ্ণ ভক্ত-তান্ত্রিক ছিলেন; ইনি অনেক

তন্ত্র-গ্রন্থের সঙ্কলন করেন। ইনিই সত্তর সহস্র শালগ্রামের সংগ্রাহক। প্যারীচাঁদের পত্নী বামাকালীও সুশিক্ষিতা ছিলেন; পড়া শুনা করিতে বড় ভাল বাসিতেন। প্রকাশ তাঁহারই যত্নে প্যারীচাঁদ "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করেন। ১৮৫৮ সালে প্যারীচাঁদের পত্নীবিয়োগ ঘটে। প্যারীচাঁদ বড় ব্যথা পান। তিনি প্রেততত্ত্ব-আলোচনায় মনোনিবেশ করেন; ইংলণ্ড এবং আমেরিকার সংবাদপত্রে প্রেতবাদ সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ লেখেন; আমেরিকার বোষ্টনসহরস্থ থিওসফিকসোসাইটীর সদস্য হন। প্রেততত্ত্বে মন দিয়া, তিনি পত্নীশোকে অনেক সান্ত্বনা পাইলেন।

কিন্তু ভাঙ্গা বুক,—কালের ভর আর বেশী সহিতে পারিল না,—১৮৮৩ সালের ২৩শে নবেম্বর রাত্রি সাড়ে দশটার সময় তাঁহার নশ্বর দেহের বিনাশ হইল।

প্যারীচাঁদের পৌত্র নীরেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় ১৩০৮ সালের ভাদ্র মাসের "প্রবাসী"তে লিখিয়াছেন,—

"প্যারীচাঁদের মাতৃভক্তি আদর্শ স্থল। তিনি প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া মার পাদোদক পান করিয়া অন্যান্য কর্ম্ম করিতেন। আহারকালে মা উপস্থিত না থাকিলে আহার তৃপ্তির সহিত হইতই না। তিনি মাকে সেকালে কাশী, বৃন্দাবন, পুষ্কর, জ্বালামুখী, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ করাইয়াছিলেন। ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত কুমুরপুকুর গ্রামে মার দ্বারা একটী প্রকাণ্ড দীঘি প্রতিষ্ঠা করাইয়া তুলট আদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। মার গঙ্গাতীরস্থ থাকিবার সময় তিন দিবস প্যারীচাঁদের আহার নিদ্রা ছিল না। অন্তর্জ্জলীর সময় মার মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া, 'মা! কোথায় ফেলিয়া গেলে, বলিয়া ৬০ বৎসর বয়স্ক বিব্রত প্যারীচাঁদ রোদন করিয়াছিলেন।"

আলালের ভাষা কেমন সরলে সুন্দর!—

"কিয়ৎক্ষণ পরে বর মণিরামপুরে গিয়া উত্তীর্ণ হইল—বর দেখতে রাস্তার দোধারি লোক ভেঙ্গে পড়িল—স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলী কবৃতে লাগিল—ছেলেটীর শ্রী আছে বটে—কিন্ত নাকটী একটু টেকাল হ'লে ভাল হইত—কেহ বলিতে লাগিল—রংটী কিছু ফিকে একটু মাজা হলে আরও খুলতো। বিবাহ ভারি লগ্নে হবে কিন্তু রাত্রি দশটা না বাজতে বাজতে মাধব বাবু দরওয়ান ও লণ্ঠান সঙ্গে করিয়া বরযাত্রীদিগের

আগবাড়ান লইতে আইলেন—রাস্তায় বৈবাহিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা শিষ্টাচারেতেই গেল—ইনি বলেন,—"মহাশয় আগে চলুন" উনি বলেন,—"মহাশয় আগে চলুন" বালির বেণীবাবু এগিয়া আসিয়া বলিলেন,—"আপনারা দুইজনের মধ্যে যিনি হউন একজন এগিয়ে পড়ুন আর রাস্তায় দাঁড়াইয়া হিম খাইতে পারি না। এইরূপ মীমাংসা হওয়াতে সকলে কন্যাকৰ্ত্তার বাটীর নিকট আসিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ও বর যাইয়া মজলিসে বসিল। ভাট—রেও ও বারওয়ারীওয়ালা চারিদিকে ঘেড়িয়া দাঁড়াইল—গ্রামভাটি ও নানাপ্রকার বাঘের কথা উপস্থিত হইতে লাগিল—ঠকচাচা দাঁড়াইয়া রক্ষা করিতেছেন—অনেক দমসম দেন—কিন্তু ফলের দফায় নামমাত্র—চেয়োদিগের মধ্যে একটা সণ্ডা তেড়ে এসে বলিল—এ বেটা কেরে? বেরো বেটা এখান থেকে—হিন্দুর কৰ্ম্মে মোছলমান কেন? ঠকচাচার অমনি রাগ উপস্থিত হইল। তিনি দাড়ি নেড়ে, চোক রাঙ্গিয়ে গালি দিতে লাগিলেন। হলধর—গদাধর ও অন্যান্য নব বাবুরা একে চায় আরে পায়। তাহারা দেখিল যে প্রকার মেঘ করিয়া আসিয়াছে, ঝড় হইতে পারে—অতএব কেহ ফরসা ছেঁড়ে—কেহ সেজ নেবার—কেহ ঝাড়ে ঝাড়ে টক্কর লাগাইয়া দেয়, কেহ ওর এর মাথার উপর ফেলিয়া দেয়,—কন্যাকর্ত্তার তরফের দুইজন লোক এই সকল গোলযোগ দেখিয়া দুই একটা শক্ত কথা বলাতে হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল,—মতিলাল বিবাদ দেখিয়া মনে মনে ভাবে বুঝি আমার কপালে বিয়ে নাই— হয় তো সুতা হাতে সার হইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে হইবে।"

আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে পরলোকগত রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর লিখিয়াছেন,—

"যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ-প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন। এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষে অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বঙ্গভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না, সন্দেহ।

"উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গলা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয় এবং যে সর্ব্বজন-হৃদয় গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ।"

"আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে;—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গলাদেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি—"আলালের ঘরের দুলাল।" প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্ত্তি। অতএব বাঙ্গলা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ।"

বঙ্গের তদানীন্তন কমিশনর জন্ বিমস্ সাহেব আলালের ঘরের দুলাল সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"Babu Peary Chand Mittra, who writes under the nom-de-plume of Teck Chand Thakur, has produced the best novel in the language, Allaler Ghorer Dulal, or "The spoilt Child of the House of Allal." He has had many imitators, and certainly claim to be ranked with some of the best comic novels in our own language, for wit, spirit, and clever touches of nature. He puts into the month of each of his characters the appropriate method of talking, and thus exhibits to the full the extensive range of vulgar idioms which his language possesses.—John Beames, Modern Aryan languages of India.

নোয়াখালির ভূতপূর্ব্ব সেসন জজ অধুনা রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার এ পি পেনেল সাহেব একটী খুনী মোকদ্দমার বিচারকালে বলিয়াছিলেন,—

"Every Bengalee will remember the ঠকচাচা of Allaler Ghorer Dulal."

অক্ষয়কুমার দত্ত।

নবদ্বীপের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী চুপী নামক গ্রামে ১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণ শনিবার শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম পীতাম্বর দত্ত; মাতার নাম দয়াময়ী। ইহাঁর পিতা-মাতা উভয়েই বিবিধ সদ্‌গুণের আধার ছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে—১২৩২ সালে অক্ষয়কুমারের "হাতে খড়ি' হয়। চুপী গ্রামে তখন কোন গুরু মহাশয় ছিল না। কাজেই ইহাঁর হাতে-খড়ি হইল বটে, কিন্তু বিদ্যারম্ভ হইল না। দুই বৎসর পরে গ্রামের এক গুরু মহাশয়ের নিকট ইনি লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। তিন বৎসর কাল তিনি এই পাঠশালায় বাঙ্গলা পড়েন; সঙ্গে সঙ্গে পার্শী পড়িতে থাকেন। "পৃথিবী কত বড়? পৃথিবীর সীমা কোথায়? আকাশ কত দূর?" ইত্যাদি বিষয় জানিবার কৌতুহল এই সময় হইতেই ইহাঁর মনে জাগিয়া উঠে।

দশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার কলিকাতা-খিদিরপুরে আনীত হন। ইহাঁর পিতা এবং কয়েকটী পিতৃব্য-পুত্র খিদিরপুরেই থাকিতেন। এই সময়ে অক্ষয় বাবু ইংরাজী পড়িবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন। অক্ষয় কুমারের পিতৃব্যপুত্র হরমোহন দত্ত,—তখন তাঁহাকে জয়কৃষ্ণ সরকার বা 'জয় মাষ্টার' নামক এক ব্যক্তির নিকট ইংরেজী পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। জয়মাষ্টারের অধ্যাপনায় অক্ষয়কুমার অধিক দিন পরিতৃপ্ত রহিতে পারিলেন না। তিনি কোন ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন,—হরমোহন দত্তকে সে কথা বলিলেন।

এই সময়ে খিদিরপুরে খৃষ্টান মিশনরীদিগের একটী অবৈতনিক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়কুমার স্বেচ্ছায় ইহাতে ভর্ত্তি হন। কিন্তু পাদরীর স্কুলে পড়িলেই হিন্দুর ছেলে বিগড়াইয়া যাইবে, তখন প্রত্যেক হিন্দুর মনেই এই ধারণা বলবতী ছিল। অক্ষয়কুমার সুতরাং হরমোহনের নিকট এরূপ কার্য্যের জন্য ধমক খাইলেন। অক্ষয়কুমার বিনীত ভাবে আপন

মনোভাব জানাইলেন। শেষে স্থির হইল, যদি ইংরাজীস্কুলে গিয়া ইংরেজী পড়িতেই হয়, তবে কলিকাতায় গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টাল সেমিনিরিতে অক্ষয়কুমারকে পড়ানই ঠিক।

তাহাই হইল। অক্ষয়কুমার ষোলবৎসর বয়সে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দেখিয়া স্কুল-স্বামী অতীব প্রীতিলাভ করিলেন। মোট আড়াই বৎসর কাল,—দ্বিতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার এই বিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন। ইহার পর কাশীধামে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল, স্কুলে এক বৎসরের মাহিনা অনাদায় পড়িয়া গেল; সংসার নির্ব্বাহের ভার অক্ষয়কুমারের উপরই পড়িল। অগত্যা, নানা প্রতিবন্ধকে একান্ত অনিচ্ছাস্বত্বেও অক্ষয়কুমার স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

অক্ষয়কুমার স্কুল পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু একদিনের জন্যও পাঠে বিরত হইলেন না। গণিত, ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থাবলী তিনি একান্ত মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিতে লাগিলেন। তদানীন্তন বহু সম্ভ্রান্ত পণ্ডিত লোক এ পক্ষে অক্ষয়কুমারের নানারূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সময়েই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত অক্ষয় কুমারের পরিচয় হয়। "প্রভাকরে"ই অক্ষয়কুমারের সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালা রচনা।

১৭৬২ শকে কলিকাতায় তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। অক্ষয়-কুমার এই পাঠশালায় ভূগোল ও পদার্থ বিদ্যার শিক্ষক পদে ব্রতী হন। মাহিনা প্রথম আট টাকা—পরে চৌদ্দ টাকা ধার্য্য হয়। এই সময়ে ইনি একখানি ভূগোল গ্রন্থ রচনা করেন।

১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয়। অক্ষয় কুমার ইহার সম্পাদক-ব্রতে ব্রতী হন। ১৭৭৭ শক পর্য্যন্ত বার বৎসর কাল ইনি অক্লান্তপরিশ্রমে তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকতা করেন। বিবিধ বিষয়ক সরস-প্রবন্ধমালা পত্রিকায় প্রচারিত হইতে থাকে। মাহিনা হয় ষাট টাকা।

১৭৭৭ শকে কলিকাতায় নর্ম্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হয়। তখন, বিদ্যা-

সাগর মহ' শয়ের প্রযত্নে অক্ষয়কুমার তাহার প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। অবস্থা-গতিকে,—অনেকটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাঁহাকে এ কর্ম্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কর্ম্মান্তরে ব্যাপৃত হইলেও, তত্ত্ববোধিনীর উপর অনুরাগ-প্রকাশে ইনি এক দিনের জন্যও বিরত হন নাই।

১৭৭৭ শকের আষাঢ় মাসে একদিন অক্ষয়কুমার ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা কালে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ইহাই তাঁহার নিদারুণ শিরোরোগের সূত্রপাত। শিরঃপীড়ায় তিনি অমিত-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, শেষ বয়সে হুগলা জেলায় উত্তর পাড়ার নিকট বালিগ্রামে বাস স্থাপন করেন।

১২৯৩ সালের ১৪ই জ্যেষ্ঠ ৬৬ বৎসর বয়সে ইহাঁর পরলোক হইয়াছে।

অক্ষয়কুমার ফরাসী জর্ম্মান প্রভৃতি নানা ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। জ্ঞানান্বেষণ-স্পৃহা আমরা তাঁহার অবিচল! নানা রূপে তিনি বিপন্নের আনুকুল্য করিতেন।

১৭৭৩ শকের মাঘ মাসে ইহাঁর বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচারের প্রথম ভাগ, ১৭৭৪ শকের মাঘ মাসে ইহার দ্বিতীয় ভাগ; ১৭৭৪ শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠ প্রথম ভাগ, ১৭৭৬ শকের শ্রাবণ মাসে চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ইহারই পর চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, ১৭৭৮ শকের শ্রাবণমাসে পদার্থবিদ্যা, ১৭৯৭ শকের মাঘ মাসে ধর্ম্মনীতি, ১৭৯২ শকে ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগ এবং ১৮০৪ শকের চৈত্র মাসে ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ যখন রচিত হয়, তখন অক্ষয় কুমারের শারীরিক অবস্থা অতীব শোচনীয়,—রোগ-যন্ত্রণায় তিনি অতীব আকুল। তাই দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় তিনি কাতর-স্বরে লিখিয়াছেন,—

"কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান বিশেষের বিশেষরূপ অনুশীলনপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানুসন্ধান চেষ্টা, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরি-ভাগ সন্দর্শন-বাসনায় এক একবারে বহুবিধ বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন যাদবকীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদি-বিশিষ্ট বিস্তৃত-ভূখণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমুন্নতি সাধন ব্রতেব্রতী

"স্বদেশীয় সম্প্রদায়-বিশেষ প্রবর্তনের অভিলাষ এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থপ্রণয়ন ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান কামনা রহিল। সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল। সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল। অচিরেই আঘাত ঘটিল।"

রাজেন্দ্রলাল মিত্র।



রাজেন্দ্রলাল প্রথিতনামা মহাপুরুষ। প্রত্ন-তত্বে ইহাঁর প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা। বাঙ্গলা সংস্কৃত এবং ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় ইনি মোট এক শত আটাশ খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন;—এই সকল পুস্তক প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠা পরিমিত হইবে। ইহার মধ্যে তেরখানি পুস্তক সংস্কৃত এবং দশখানি পুস্তক বাঙ্গলা। বাঙ্গলায় ইহাঁর 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ,' 'প্রকৃতি ভূগোল' 'ব্যাকরণ প্রবেশ' 'পত্র কৌমুদী,' 'রহস্য সন্দর্ভ,' 'শিবজীর জীবনী,' 'মিবারের ইতিহাস' এবং 'শিল্পিকা-দর্শন' বিখ্যাত। ইংরেজীভাষায় ইহাঁর "উড়িষ্যা" এবং "বুদ্ধ গয়া" বহু জন বিখ্যাত।

রাজেন্দ্রলালের নিবাস কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শুঁড়ায়। ইহাঁর জন্ম-ক্ষণ,—১৭৪৩ শকের ৫ই ফাল্গুন শনিবার ৬ দণ্ড ৫২ পল ৩০ বিপল। পিতার নাম জন্মেজয় মিত্র। রাজেন্দ্রলাল,—পিতার তৃতীয় পুত্র। ইনি সমৃদ্ধ বংশসম্ভূত।

পঞ্চম বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলালের যথাশাস্ত্র হাতে খড়ি হয়। ইনি পারস্য শিক্ষা আরম্ভ করেন। একাদশ বর্ষ বয়সে ইনি ইংরেজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। ম্যালেরিয়া রোগে জর্জ্জরিত হইয়া, রাজেন্দ্রলাল অতঃপর ডাক্তারী পড়িতে ইচ্ছা করেন। ফলে, ১৮৩৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর তিনি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হন। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর ডাক্তারী পড়াইবার জন্য তাঁহাকে বিলাত লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। রাজেন্দ্রলালের পিতা এ প্রস্তাবে অসম্মত হন। ফলে, রাজেন্দ্রলালের ডাক্তারীপড়া বন্ধ হইল,—তিনি আইন পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

আইনের পরীক্ষাও দিলেন,—কিন্তু তাঁহার উত্তরের কাগজ পত্রগুলি চুরী হইল। তিনি পাশ করিতে পারিলেন না। ডাক্তারও হইলেন না,—উকীলও হইলেন না;

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে তিনি আসিয়াটিকসোসাইটীর আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারি এবং লাইব্রেরীয়ানের পদ পাইলেন। বিবিধ পুস্তক পাঠে তাঁহার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি সাধপুরাইয়া, নানা গ্রন্থ পড়িতে লাগিলেন। ১৮৫৬ সালের মার্চ্চ মাসে রাজেন্দ্রলাল গবর্ণমেণ্ট-ওয়ার্ডের ডিরেক্টার হইলেন। এই সময় তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে ইংরেজী ভাষায় গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধসমূহ লিখিতে থাকেন। ১৮৮৫ সালে ইনি এসিয়াটিকসোসাইটীর প্রেসিডেণ্ট হন। কলিকাতার মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইনি তাহার সদস্য-পদ লাভ করেন। ১৮৫৭ সালের ৬ই এপ্রেল টাউনহলে রাজেন্দ্রলাল ব্লাকএ্যাক্ট সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই অগ্নিবর্ষিণী। এই বক্তৃতার ফলে, কোন কোন সাহেব ক্ষেপিয়া উঠিয়া, রাজেন্দ্রলালকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশন" এবং "হিন্দু পেটরিয়েটের" ইনি অসীমবল সহায় স্বরূপ ছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের সম্মান কোথায় ছিল না? পাশ্চাত্য বহুপ্রদেশের বড় বড় পণ্ডিত মণ্ডলী, তাঁহাত সহিত পত্রালাপ করিয়া পরম সুখবোধ করিতেন। ১৮৭৫ সালে ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা হইতে অগাধ পাণ্ডিত্যের সম্মান-নিদর্শনস্বরূপ "ডাক্তার-অব-ল" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি যেমন সমাজিক ছিলেন, তেমনই শিষ্টালাপী।

রাজেন্দ্রলালের দুই বিবাহ। প্রথম বিবাহ কলিকাতা-নিমতলার দত্ত বংশে,—ধর্ম্মদাস দত্তের তৃতীয়া কন্যা সৌদামিনী ইঁহার প্রথমা পত্নী। প্রথমা পত্নীর পরলোকান্তে ইঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। দ্বিতীয়া পত্নী,—কলিকাতা ভবানীপুরের কালীধন সরকারের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনী।

রাজেন্দ্রলাল পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দী, সংস্কৃত, ইংরেজী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, এবং জর্ম্মাণ ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষায় ত কথাই নাই। বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত তাঁহার গ্রন্থাবলীই এ পক্ষে উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলালের "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৮৪৯ সালে তিনি "কামন্দকীয় নীতিসার" এবং এসিয়াটিকসোসাইটির পুস্তকসমূহের বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেন।

১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ রবিবার রাত্রি নয়টার সময় ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে। রাজেন্দ্রলালের স্থান আবার কবে পূর্ণ হইবে, কে জানে!

ইহাঁর সম্পাদিত "বিবিধার্থ-সংগ্রহ" হইতে ইহাঁর রচনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি। মাইকেল মধুসূদন প্রণীত "তিলোত্তমা কাব্য" সম্বন্ধে মিত্র মহাশয় লিখিতেছেন,—

"পয়ারছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের মধ্যে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পনা-শক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বলভাব খর্ব্ব হয়, কার্য্যের গৌরবের লাঘব হয় এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা একবাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন; যে স্থানে ইচ্ছা সেই স্থানেই বাক্যশেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত ছন্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয় তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন, কদাপি পাদপূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়। তাহার পরিত্যাগে কবিতা কামাবরব হইতে পারেন।

"তিলোত্তমার যে কোন স্থানে নয়ন নিক্ষেপ্ করা যায়, তাহাতেই প্রকৃত কবির লক্ষণ বিলক্ষণ প্রতীত হয়, সর্ব্বত্রই সুচারু রসাত্মক ভাব অতি প্রোজ্জ্বল বাক্যে বিভূষিত হইয়াছে।"

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় পণ্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম ভগবতী দেবী।

পঞ্চম বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালে ঈশ্বর চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ঈশ্বরচন্দ্র অবিলম্বেই পাঠশালার পাঠ সমাপন করিলেন। ১২৩৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর দাস,—পুত্র ঈশ্বর চন্দ্রকে কলিকাতায় আনিলেন। উদ্দেশ্য,—পুত্রকে তিনি সংস্কৃত-কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিবেন। ১২৩৬ সালের ২০শে জ্যৈষ্ঠ ঈশ্বর চন্দ্র সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। এই ব্যাকরণ পাঠের সময় ১২৩৭ সালে তিনি কলেজের ইংরেজী শ্রেণীতেও প্রবেশ করেন। এই সময় তিনি শ্রমশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। পিতা ঠাকুরদাসের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ঈশ্বর চন্দ্র দিনের বেলা কলেজে যাইতেন; পাঠ লইতেন; রাত্রিতে রাঁধিয়া খাইবার পর বহু রাত্রি পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করিতেন।এমনও হইয়াছে,—ঈশ্বর চন্দ্র একদিন রাঁধিয়া দুই দিন খাইয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের বিখ্যাত জীবনীলেখক শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—'তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্নান করিয়া বাজার যাইতেন এবং বাজার হইতে অবস্থানুসারে আলু, পটোল প্রভৃতি তরিতরকারি ও মৎস্যাদি ক্রয় করিয়া লইয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। তৎপরে তিনি নিজেই ঝাল হলুদ শিলে বাটিয়া লইতেন। তখন পাথুরে কয়লার প্রচলন হয় নাই। তিনি স্বহস্তে কাট চালা করিতেন এবং উনুন ধরাইতেন। বাসায় চারিটী লোক খাইতেন। চারি জনের জন্য ভাত, ডাল, মাছের ঝোল রাঁধিয়া তিনি সকলকেই আহার করাইতেন। আহারান্তে সকলের উচ্ছিষ্ট মুক্ত করিতেন ও বাসনাদি ধুইতেন। হলুদ বাটিয়া, কাট চিরিয়া বাসন মাজিয়া সত্য সত্যই তাঁহার অঙ্গুলি ও নখক্ষয় হইয়া গিয়াছিল।" এতাধিক পরিশ্রমের ফল বস্তুতই অপূর্ব্ব। ঈশ্বরচন্দ্র ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি, অলঙ্কার প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীতেই সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন,—উচ্চবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কুড়িবৎসর বয়ঃক্রম কালে বিদ্যাসাগর কলেজের পাঠ সমাপন করেন। কলেজ হইতে তিনি বিদ্যাসাগর উপাধি প্রাপ্ত হন।

পাঠ সমাপন হইলে, বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ে পঞ্চাশ

টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি উড়িয়া, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায়, উত্তমরূপে শিক্ষিত হন। বিদ্যাসাগর যখন এই পদে নিযুক্ত, তখন ফোর্ট উইলিয়ম বিদ্যালয়ের হেড রাইটারের পদ শূন্য হয়। তিনি উক্ত পদের জন্য আবেদন করেন; কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই পদে তাঁহার বেতন আশী টাকা হইল। কিছুকাল পরে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরকেই এই পদে নিযুক্ত করেন। বিদ্যাসাগরের তখন মাহিনা হইল,—নব্বুই টাকা। ১২৫৭ সালের ২৫শে অগ্রহায়ণ তিনি এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন। এই সময় সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষেরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রিপোর্ট লিখিতে বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এক অতি সুন্দর রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন। এই রিপোর্টে অধিকাংশ সংস্কৃতগ্রন্থের একরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনা হইয়াছিল। কিরূপ সহজপ্রণালীতে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা-কার্য্য পরিচালিত হইতে পারে, বিদ্যাসাগর মহাশয় এই রিপোর্টে তাহা অতি বিশদরূপেই বুঝাইয়াছিলেন। তাঁহার এই রিপোর্ট পড়িয়া, কর্তৃপক্ষেরা এতাদৃশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হইলে, তাঁহারা বিদ্যাসাগর মহাশয়কেই ঐ পদ প্রদান করেন। বেতন হইল দেড় শত টাকা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাহা একরূপ তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি-ভূমি। শ্রীযুক্ত বিহারি লাল সরকার মহাশয়ের প্রণীত বিদ্যাসাগর গ্রন্থে এই রিপোর্ট বাঙ্গালা ভাষায় আদ্যোপান্ত অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১২৬০ সালের পৌষ মাসে তাঁহার বেতন আরও বৃদ্ধি হইল। মোট বেতন হইল তিন শত টাকা। ১২৬২ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় মফস্বলে বাঙ্গালা ও ইংরাজী বিদ্যালয় সমূহের আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেটারের পদেও নিযুক্ত হন। এই পদের বেতন দুই শত টাকা। এক্ষণে এই উভয়বিধ কর্ম্মে তিনি মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। তিন বৎসর মাত্র তিনি এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে পবলিক ইনষ্টিটিউসনের প্রতিষ্ঠা হয়।

বর্ত্তমান ডিরেক্টরের পদ-সৃষ্টিও এই সময়ে। সিবিলিয়ান গর্ডন ইয়ং হইলেন প্রথম ডিরেক্টর। গর্ডন ইয়ং সংস্কৃত-কলেজের ছাত্রগণের বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে সম্মত হন না। ফলে, মনোবিবাদ। এই সূত্রেই বিদ্যাসাগর ১২৬৫ সালের ১৯শে কার্ত্তিক পাঁচশত টাকার চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী এবং গ্রন্থাবলী হইতে অর্থাগম ভালই হইতেছিল। অতঃপর আর তিনি বেতনভোগী হিসাবে সরকারী কর্ম্মে কখন নিযুক্ত হন নাই। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর বিখ্যাত কলেজ মেট্রপালিটানের প্রতিষ্ঠা।

বিধবা-বিবাহের আইন,—বিদ্যাসাগরের এক বিখ্যাত কীর্ত্তি। ১২৬২ সালের ১৯শে আশ্বিন বিধবা-বিবাহ-আইনের জন্য একখানি আবেদন পত্র ব্যবস্থাপক সভায় পেশ হয়। ইহাতে এক সহস্র লোকের স্বাক্ষর ছিল। বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়ই এ উদ্যোগের মূলাধার। ১২৬২ সালের ২রা অগ্রহায়ণ ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য গ্রাণ্ট সাহেব,—ব্যবস্থাপক সভায় বিধবা-বিবাহ-আইনের একখানি পাণ্ডু লিপি পেশ করেন। ১২৬২ সালের ৭ই মাঘ ব্যবস্থাপক সভায় পাণ্ডুলিপি দ্বিতীয়বার-পঠিত হয়। এই দিনই পাণ্ডুলিপি সিলেট কমিটীর হস্তে পড়ে। ১২৬২ সালের ৫ই চৈত্র রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ ছত্রিশ সহস্র সাত শত তেষট্টি জন লোকে আইনের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেন। কিন্তু প্রতিবাদে ফল ফলিল না। ১২৬৩ সালের ১২ই শ্রাবণ আইন পাশ হইল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই স্বয়ং লিখিয়াছেন,—ষাটটি বিধবা বিবাহের জন্য তিনি বিরাশী হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বহু ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে তিনি ঋণ মুক্ত করিয়াছেন;—কন্যাদায়গ্রস্তকে তিনি কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তিনি অকাতরে—স্বয়ং ঋণ করিয়া দশ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। জন্মভূমি বীরসিংহ, ফরাসডাঙ্গা, বর্দ্ধমান, কারমাটাড় প্রভৃতি যখন যেখানে তিনি যাইতেন, তখনই দরিদ্রকে

যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন বস্ত্রাদি বিতরণ করিতেন; দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন সত্র বসাইয়া শত শত আতুরের জন্য অন্নদানের ব্যবস্থা করিতেন। স্বগ্রাম বীরসিংহে স্কুল, ডিস্পেন্সারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যাসাগরের সদাশয়তা পরোপকারিতার বুঝি তুলনা সম্ভবে না। সমগ্র বঙ্গের কি ভদ্র কি সাধারণ,—সকল লোকেই বিদ্যাসাগরের নামোচ্চারণে এখনও ভাব-গদগদ হইয়া উঠে। সর্ব্বত্রই বিদ্যাসাগরের অতুল প্রতিষ্ঠা।

১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রি ২টা ১৮ মিনিটের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন।

বঙ্গভাষা,—বিদ্যাসাগরের নিকট চিরঋণী। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিশুদ্ধ এবং প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করেন।

১৭৭০ শকের ফাল্গুন মাসে বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মহাভারতের বাঙ্গলা অনুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ইহারই পর কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের অনুবাদ প্রকাশে উদ্যোগী হন। স্ব-প্রকাশিত মহাভারতে তিনি লিখিয়াছেন,—"আমার অদ্বিতীয় সহায় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং মহাভারতের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু আমি মহাভারতের অনুবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছি বলিয়া, তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া, সরল হৃদয়ে মহাভারতানুবাদে ক্ষান্ত হন।" বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবিষ্ট হইবার পর, "বাসুদেব চরিত" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বনে রচিত। ১২৫৪ সালে ইনি হিন্দী "বৈতাল পঁচিশি" গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদ করেন,—এই অনুবাদিত গ্রন্থের নাম,—বেতাল পঞ্চবিংশতি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ তিন শত টাকা মূল্যে উহার এক শত খণ্ড ক্রয় করেন। ১২৫৬ সালে ইহাঁর বঙ্গদেশের ইতিহাস নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহা মার্শমান সাহেবের লিখিত হিষ্টরি-অব-বেঙ্গল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ১৮৫১ সালে ৬ই এপ্রিল বা ১২৫৭ সালের ২৫শে চৈত্র ইনি বোধোদয় নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা চেম্বর সাহেবের রুডিমেণ্টস-অব-নলেজ নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ১২৫৮ সালে ১লা অগ্রহায়ণ ইহাঁর উপক্রমণিকা

ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রায় এই সময়েই ইনি ঋজুপাঠ প্রথম ভাগ,—১২৫৯ সালের ১২ই চৈত্র ঋজুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ঋজুপাঠ তৃতীয়ভাগ প্রকাশ করেন। এই খৃষ্টাব্দেই ইহাঁর প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ ব্যাকরণ কৌমুদী প্রকাশিত। হয় পর বৎসর বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার তৃতীয়ভাগ প্রকাশ করেন। ১২৪৭ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ শকুন্তলা, ১২৫৬ সালের ২৬শে ভাদ্র জীবনচরিত, ১২৬০ সালের ১৬ই মাঘ বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, ১২৬১ সালের কার্ত্তিক মাসে ইহার দ্বিতীয় পুস্তক, ১২৬২ সালের ১লা বৈশাখ বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ, ১২৬২ সালের ১লা আষাঢ় বর্ণপরিচয় দ্বিতীয়ভাগ, ১২৬৩ সালের মাঘ মাসে চরিতাবলী, ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রেল সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, ১২৬৭ সালে ১লা মাঘ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, ১২৬৮ সালের ১লা বৈশাখ সীতার বনবাস, (বিদ্যাসাগর মহাশয় চারি দিনে এই গ্রন্থ লেখেন।) ১২৬৯ সালে ব্যাকরণ কৌমুদী চতুর্থভাগ, ১৮৬৪ সালে (প্রথম ভাগ আখ্যানমঞ্জরী এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২য় ও ৩য় ভাগ আখ্যানমঞ্জরী, ১২৭৮ সালের শ্রাবণ মাসে "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না" বিচারের প্রথম পুস্তক, ১২৭৯ সালের চৈত্র মাসে ইহার দ্বিতীয় পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইহা ভিন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয় "বিদ্যাসাগর-চরিত" নামক স্বকীয় জীবনী লিখিতে আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইবার কথা পর্য্যন্ত লিখিত আছে। একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

'প্রথমবার কলিকাতায় আসিবার সময়, সিয়াখালায় সালিখার বাঁধা রাস্তায় উঠিয়া, বাটনাবাটা শিলের মত একখানি প্রস্তর রাস্তার ধারে পোতা দেখিতে পাইলাম। কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া, পিতৃদেবকে জিজ্ঞাসিলাম, বাবা, রাস্তার ধারে শিলপোতা আছে কেন? তিনি, আমার জিজ্ঞাসা শুনিয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, ও শিল নয়. উহার নাম মাইল ষ্টোন। আমি বলিলাম, বাবা, মাইলষ্টোন কি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তখন তিনি বলিলেন, এটা ইঙ্গরেজী কথা, মাইল শব্দের অর্থ আধ ক্রোশ; ষ্টোন শব্দের অর্থ পাথর; এই রাস্তার আধ আধ ক্রোশ অন্তরে, এক একটা পাথর পোতা আছে। উহাতে এক, দুই, তিন প্রভৃতি অঙ্ক খোদা রহিয়াছে; এই পাথরের অঙ্ক উনিশ; ইহা দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে, এখান হইতে কলিকাতা উনিশ মাইল অর্থাৎ

সাড়ে নয় ক্রোশ। এই বলিয়া, তিনি আমাকে ঐ পাথরের নিকট লইয়া গেলেন আমি অঙ্কগুলি দেখিতে ও চিনিতে আরম্ভ করিলাম। মনবেড় চটীতে দশম মাইল ষ্টোন দেখিয়া, পিতৃদেবকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলাম, বাবা আমার ইঙ্গরেজী অঙ্ক চিনা হইল।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

মধুসূদন বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ শনিবার বা ইংরাজী ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি যশোহর জেলার অধীন সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রামের তিন দিক দিয়া "রজত-সলিলা কপোতাক্ষ নদ" প্রবাহিত। সাগরদাঁড়ী,—যশোহর হইতে চৌদ্দ ক্রোশ দক্ষিণ-দিকবর্ত্তী।

মধুসূদনের পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত; পিতামহের নাম রামনিধি দত্ত; প্রপিতামহের নাম রামকিশোর দত্ত। রামকিশোর,—খুলনা জেলার তালা গ্রামে বাস করিতেন। পিতৃবিয়োগের পর রামনিধি তালা ত্যাগ করিয়া সাগরদাঁড়ি গ্রামে বাস নির্দ্দেশ করেন। তদবধি সাগর-দাঁড়িই,—"দত্তপরিবারের" অবস্থান-ভূমি। বদান্যতা, আতিথেয়তা, শিষ্টা-চার প্রভৃতি গুণে দত্ত-পরিবার সবিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। মধুসূদনের পিতৃব্য রাধামোহন,—পুত্রের মঙ্গল-কামনায় ১০৮ কালী পূজা করিয়া ছিলেন। ইহাতে ১০৮টি মহিষ, ১০৮টি মেষ এবং ১০৮টি ছাগ বলি প্রদত্ত হয়; ১০৮টি সুবর্ণ-জবা এই পূজায় অঞ্জলি স্বরূপ অর্পিত হইয়া-ছিল।

মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ,—পিতা রামনিধির সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন; সুতরাং বড় আদরের। বোধ হয়, আদরের ছেলে বলিয়াই, রাজনারায়ণ ক্রমে অমিতব্যয়ী এবং ইন্দ্রিয়বশ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধুসূদনে এই পিতৃদোষ সংক্রামিত হইয়াছিল। মধুসূদনের মাতার নাম জাহ্নবী দাসী। ইনি বড়ই সরলহৃদয়া এবং পরোপকার-নিরতা

ছিলেন। মধুসূদনের বিমাতা তিনজন,—শিবসুন্দরী, প্রমথময়ী এবং হরকামিনী। মধুসূদনের পিতা রাজনারায়ণ কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল ছিলেন।

প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালেই মধুসূদনের শিক্ষালাভ। মধুসূদনের মাতা জাহ্নবী শিক্ষিতা। তিনি অবসরকালে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিতেন। মধুসূদনও মায়ের নিকট নানারূপ পৌরাণিক উপন্যাস শুনিতেন। মধুসূদনের বয়স যখন আট দশ বৎসর, তখন তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পাঠ করিয়া মাকে শুনাইতেন; মায়ের মত রামায়ণ মহাভারতের অনেক অংশ তিনি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। মধুসূদন এই সময়ে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি বড়ই ভক্তিমান ছিলেন। সঙ্গীতানুরাগ তাঁহার আশৈশব প্রবল ছিল।

১২।১৩ বৎসর বয়সকালে মধুসূদন কলিকাতায় আনীত হন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পিতা রাজনারায়ণ পুত্রকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। এই কলেজে সিনিয়র ক্ল্যাস পর্য্যন্ত তিনি পড়িয়াছিলেন। এই সময়ের শিক্ষা-বিপর্য্যয়ে তিনি বিজাতীয় আচার ব্যবহারের একান্ত অনুরাগী হইয়া উঠেন। এই পাঠ্যাবস্থাতেই মধুসূদন ইংরেজী ও বাঙ্গালায় নানারূপ কবিতা লিখিয়া, বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট সবিশেষ যশোভাগী হইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই ইহাঁর ইংলণ্ড-গমনের আকাঙ্ক্ষা একান্ত বলবতী হইয়া উঠে।

মধুসূদনের পিতা মাতা মধুসূদনের বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মধুসূদন মাতাকে বার বার বলিলেন,—'আমি এখন বিবাহ করিব না।' বস্তুগত্যা এদেশীয় কোন বালিকাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। মাতা,—পুত্রকে অনেক বুঝাইলেন; সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান হইল। মধুসূদন বেগতিক বুঝিয়া, একদিন অকস্মাৎ পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি ওল্ড মিশন চার্চ্চ মন্দিরে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হিন্দু কলেজে,—খৃষ্টান ছাত্রের পাঠাধিকার ছিল না। কাজেই, মধুসূদনকে

হিন্দু কলেজ ত্যাগ করিতে হইল। শিবপুরের বিশপ্‌স্ কলেজে তিনি প্রবিষ্ট হইলেন। পিতা মাতা তাঁহাকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মধুসূদন গ্রীক ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। লাটিন ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ, ইতালিয়ন্, সংস্কৃত, পারসীক, হিব্রু, তেলেগু, তামিল এবং হিন্দুস্থানী ভাষাতেও মধুসূদন অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন মান্দ্রাজ গমন করেন। সেখানে অনেক চেষ্টায় একটী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা লাভ করিলেন,—ইংরেজী পত্রে প্রবন্ধাদিও লিখিতে লাগিলেন। এই মান্দ্রাজে ক্যাপটিব লেডি নামক তাঁহার ইংরেজী কবিতা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মান্দ্রাজেই তাঁহার বিবাহ। মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির কোন নীলকর-দুহিতাকে তিনি প্রথম বিবাহ করেন। কয়েক বৎসর পরে এই পত্নীর সহিত মধুসূদনের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অতঃপর মধুসূদন মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সি কলেজের তাৎকালীন অধ্যক্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনিই ইহাঁর জীবন-সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। আট বৎসরকাল মধুসূদন মান্দ্রাজে অবস্থান করেন। এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় কথা কহা,—চিঠিলেখা পর্য্যন্ত তিনি একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আট বৎসরের পর মধুসূদন কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতির উদ্যোগে বেলগেছিয়ায় এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। মধুসূদন,—মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির ইচ্ছায় "রত্নাবলী" নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই ইহা বেলগেছিয়ায় অভিনীত হয়। মধুসূদন অনুবাদের জন্য পাঁচশত টাকা পারিতোষিক পান।

এই নাট্যশালার জন্যই মধুসূদন শর্ম্মিষ্ঠা নাটক রচনা করেন। ইহা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রকাশিত হয়। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন শর্ম্মিষ্ঠার জন্য কয়েকটী গীত রচনা করিয়া দেন। শেষাঙ্কের শিব-স্তোত্রটী তাঁহারই প্রণীত। ইহার অভিনয়ে চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া যায়। মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকও এই সময়ে রচিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য প্রকাশিত হয়। ইহার পর মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া'; নামক দুইখানি

প্রহসন রচনা করেন। দুইখানিই বেলগেছিয়ায় অভিনয়ের জন্য। শেষোক্ত প্রহসন খানির নাম,—রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের কল্পিত।

১৮৬১ সালে মেঘনাদ বধ কাব্য রচিত হয়। ইহার পর, কৃষ্ণ-কুমারী নাটক, ব্রজাঙ্গনা কাব্য এবং বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়। তাঁহার কবিত্বসৌরভে দিগদিগন্ত পূর্ণ হইয়া উঠে।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন মধুসূদন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাঁকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন; ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ, এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও মধুসূদনকে নানারূপ আনুকূল্য করেন। প্রবাসেই তাঁহার চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী রচিত। কুইন সীতা নামক ইংরাজী কাব্য, এবং সুভদ্রাহরণ নামক বাঙ্গলা কাব্যের এই সময়ে রচনা আরম্ভ; কিন্তু শেষ হয় নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে মধুসূদন ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ে তিনি তেমন কৃত-কার্য্য হইতে পারিলেন না,—ক্রমে ঋণসাগরে ডুবিয়া পড়িলেন। সংসারের কষ্ট এবং মনের অশান্তি চরমে উঠিল। তিনি অকাতরে মদ্য পান করিয়া, জ্বালা নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই দারুণ মনঃকষ্টের কালেও, মধুসূদন অর্থাগমের আশায় হেক্টর বধ, মায়াকানন এবং শিশুপাঠ্য কবিতাবলী রচনা করেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার অশান্তি ঘুচিল না। তিনি মানভূম-পঞ্চকোট রাজের কার্য্যাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু সেখানেও তিষ্ঠিতে পারিলেন না। মধুসূদন এই সময় কিছুদিনের জন্য উত্তর-পাড়ায় গিয়া অবস্থান করেন। এই সময় তাঁহার কি যন্ত্রণা,—তাঁহার জীবনী-লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু, বি-এ মহাশয়ের গ্রন্থ হইতেই তাহা শুনুন,—

"মধুসূদনের উত্তরপাড়ায় অবস্থান কালে, গৌরদাস বাবু সর্ব্বদাই তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। একদিন তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখেন যে, একটী মলিন শয্যার উপর শয়ন করিয়া, মধুসূদন মুহুর্মুহু রক্ত বমন করিতেছেন। তাঁহার পত্নী হেনরিয়েটা,

নিম্নে গৃহতলে পতিত হইয়া, রোগের যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছেন। গৌরদাস বাবু হেন্‌রিয়েটাকে মুর্চ্ছিতাপ্রায় দেখিয়া, তৎকালোচিত সাহায্যদানের জন্য, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিজের যন্ত্রণার অপেক্ষা স্বামীর অবস্থাই তখন হেন্‌রিয়েটার পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। তিনি অতি কাতর স্বরে গৌরদাস বাবুকে বলিলেন ;—'আমার জন্য চিন্তা নাই। আমি মরিতে ভয় করি না ; যদি পারেন, আমার স্বামীর প্রাণরক্ষা করুন।' গৃহের এক দিকে এই দৃশ্য! অপর দিকে একটী পাত্রে কতকগুলি পর্য্যুষিত অন্ন-ব্যঞ্জন রহিয়াছিল। মধুসূদনের ক্ষুধাতুর শিশু দুইটী কিয়ংক্ষণ পূর্ব্বে সেই পর্য্যুষিত অন্নে উদর পুর্ত্তি করিয়াছিল, এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্নের দুর্গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া, অসংখ্য মক্ষিকা রোগীদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। হায়! এই কি মেঘনাদ বধের কবির উপযুক্ত অবস্থা!"

মধুসূদন উত্তরপাড়া হইতে কলিকাতায় আসেন। তাঁহার নিজের এবং পত্নীর উভয়েরই পীড়া ক্রমে গুরুতর আকার ধারণ করে। মধুসূদনের বন্ধু-বান্ধবগণ মধুসূদনের পত্নীকে তাঁহার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার আলয়ে আর মধুসূদনকে আলিপুর দাতব্যচিকিৎসালয়ে রাখিবার ব্যবস্থা করেন। এই দাতব্যচিকিৎসালয়ে রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াই, মধুসূদন পত্নীবিয়োগ সংবাদ শুনিতে পান ; কিন্তু তাঁহাকেও আর অধিক দিন এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুন রবিবার বেলা দুইটার সময় তিনি পরলোকগমন করিলেন।

"সিংহলবিজয়' এবং 'বিষনা ধনুর্গুণ'-নামক আরও দুই খানি গ্রন্থ মধুসূদন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াছিলেন, "বীরাঙ্গনা কাব্য" একুশ সর্গে সমাপ্ত করিবেন ; কিন্তু এগার সর্গের অধিক লিখিতে পারেন নাই ; আরও পাঁচ সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। একখানি পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

"নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী।

"আর কত দিন সৌরি জলধির গৃহে,
কাঁদিবে অধিনী রমা কহ তা রমারে।
না পশে এদেশে নাথ, রবিকর রাশি
না শোভেন সুধানিধি সুধাংশু বিতরি,
স্থিরপ্রভা ভাবে নিত্য ক্ষণপ্রভারূপী,
বিভা, জন্মি রত্ন জালে উজলয়ে পুরী;
তবুও উপেন্দ্র, আজ ইন্দীরা দুঃখিনী।
বাম দামোদর; তুমি লয়েছ হে কাড়ি
নয়নের মণি তার পাদপদ্ম তব।
ধরি এ দাসীর কর ও কর-কমলে
কহিলে দাসীরে যবে হে মধুরভাষী,
"যাও প্রিয়ে বৈনতেয়, কৃতাঞ্জলিপুটে
দেখ দাঁড়াইয়া ওই। বসি পৃষ্ঠাসনে
যাও সিন্ধু তীরে আজি, "হায় না জানিনু
হইনু বৈকুণ্ঠচ্যুত দুর্ব্বাসার রোষে।"

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু বিএ মহাশয় লিখিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত গ্রন্থ হইতেই এই অংশ উদ্ধৃত। যাঁহারা মধুসূদনের জীবনী-বিবরণ সবিস্তার জানিতে চাহেন, তাঁহারা বসু মহাশয়ের এই গ্রন্থ পাঠ করুন। বাঙ্গলা ভাষায় ইহা একখানি অত্যুত্তম জীবনী-গ্রন্থ।

প্যারীচরণ সরকার।

১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ কলিকাতা চোরবাগানে মাতামহালয়ে প্যারীচরণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর মাতামহের নাম ভৈরবচন্দ্র সরকার; মাতার নাম দ্রবময়ী। ভৈরবচন্দ্র সরকার জাহাজে রসদ-সরবরাহের কার্য্য করিতেন; পূজা-পার্ব্বণ, দান-ধ্যানে ইহাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। দ্রবময়ী যেমন রূপবতী, তেমনি গুণবতী ছিলেন।

১৮৩৮ শকে ৬১ বৎসর বয়সে ভৈরবচন্দ্র সরকার পরলোক গমন করেন। তখন তাঁহার চারিটি পুত্র, তিনটি কন্যা, শত বৎসরের অধিক বয়স্কা জননী, এবং পত্নী দ্রবময়ী জীবিত। ভৈরবচন্দ্রের জননী ধনমণি ১১৫ বৎসর বয়সে কাশীলাভ করেন। প্যারীচরণ,—ভৈরবচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র। প্যারীচরণের জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম পার্ব্বতীচরণ। পার্ব্বতীচরণ ইংরেজী বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন; ঢাকা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন।

বাল্যে প্যারীচরণ কলিকাতায় হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। এই পাঠশালা তখন কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের উপরিস্থ দেবী সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের নিকট বিরাজিত ছিল। এগার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি এই স্কুলেই শিক্ষালাভ করেন; এগার বৎসর বয়সে ঢাকায় পার্ব্বতীচরণের নিকট যান; তথায় ইনি প্রায় এক বৎসরকাল থাকেন; ফিরিয়া আসিয়া, কলিকাতার হেয়ার সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই স্কুল প্রথমতঃ স্কুল সোসাইটির স্কুল বলিয়া অভিহিত হইত। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ইহার নাম হয় কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল; ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে প্যারীচরণের যত্নেই ইহা হেয়ার স্কুল অভিধানে পরিণত হইয়াছে। হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্যারীচরণ তিন বৎসর শিক্ষা লাভ করেন। এই স্কুলের ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন। হেয়ার সাহেব ইহাঁকে খুবই ভাল বাসিতেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্যারীচরণ হেয়ার স্কুলে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় পাশ হন;—মাসিক আট টাকা বৃত্তি পান; হিন্দু কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হন। এই কলেজে ইহাঁর সহপাঠী ছিলেন,—জ্ঞানেন্দ্র-মোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ লাহা, গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। কলেজে প্যারীচরণ যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া উঠেন; নানারূপ বৃত্তি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ক্রমাগত তিন বৎসর কাল ইনি তদানীন্তন সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চল্লিশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সাংসারিক বিভ্রাটহেতু তিনি ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৮৪৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্যারীচরণ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বেতন হয় আশী টাকা। ১৮৪৫

খৃষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর তিনি ২৪পরগণার বারাসত গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে হেড মাষ্টারের পদে অধিষ্ঠিত হন। বেতন হয় দেড় শত টাকা। ক্রমাগত কয়েক বৎসর কাল তিনি বারাশতে এই কর্ম্মেই নিযুক্ত রহেন। এই সময়ে বারাসতে ইঁহারই উদ্যোগে কৃষিবিদ্যালয়, শ্রমজীবী বিদ্যালয় এবং বালিকা বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পক্ষে বারাশতের পরলোকগত কালীকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় ইঁহার পরম সহায় ছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট প্যারীচরণ কলিকাতা হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। নয় বৎসর কাল তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন; এই সময়ে তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত নানারূপ সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। আধুনিক হিন্দু হোষ্টেলের সূত্রপাতে প্যারীচরণই মূলাধার। সুরাপান নিবারণের জন্য ইনি নানারূপে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন। সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ইহার সভ্য হন। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার উদ্দেশে,— প্যারীচরণ ওয়েল-উইসার নামক ইংরেজী পত্র এবং হিতসাধক নামক বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বা বাঙ্গলা ১২৭৩ সালে উড়িষ্যা ও বাঙ্গলার স্থানে স্থানে বিষম দুর্ভিক্ষ হয়। অন্নকষ্টপীড়িত বিস্তর লোক কলিকাতা আসিয়া পড়ে। প্যারীচরণ একটী অন্ন সত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যহ বিস্তর লোক এই সত্রে অন্ন পাইতে থাকে।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দ ৪ঠা জুলাই এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হয়। এডুকেশন গেজেট সরকারী সংবাদপত্র। ১৮৬৬ সালের ৩রা মার্চ্চ প্যারীচরণ এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইঁহার অমিত উদ্যোগে গেজেটের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। প্যারীচরণ গবরমেণ্টের নিকট সম্পাদকের বেতন হিসাবে মাসিক তিন শত টাকা পাইতে থাকেন।

১৮৬৮ সালের মে মাসে পূর্ব্ববঙ্গ রেলে শ্যামনগরের নিকট একটী রেলওয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। অনেক লোক ইহাতে হতাহত হয়। ১২৭৫

সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের এডুকেশন গেজেটে প্যারীচরণ "ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের দুর্ঘটনা" নামক এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ 'বিনা অনুসন্ধান লিখিত হইয়াছে, ইহা ভ্রমপূর্ণ ভয়প্রদ' ইত্যাদি বিবেচনায় তদানীন্তন ছোট লাট গ্রে সাহেব দুঃখ প্রকাশ করেন। ফলে, প্যারীচরণ স্বেচ্ছায় এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা ত্যাগ করেন। প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের প্যারীচরণ প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন; ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি কিন্তু হেয়ার স্কুলে ২।১ ঘণ্টা করিয়া অধ্যাপনা করিতেন।

বহুমূত্রজনিত বিস্ফোটক রোগে ১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন প্যারীচরণের পরলোক হইয়াছে।

প্যারীচরণের ফার্ষ্ট বুক, সেকেণ্ড বুক প্রভৃতি ইংরেজী পাঠ্যপুস্তক প্রসিদ্ধ। হিতসাধক এবং এডুকেশন গেজেটে ইনি বাঙ্গলা ভাষায়ও বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্যারীচরণ ইংরেজী ভাষায় যেমন কৃতবিদ্য, বাঙ্গলা ভাষায় তেমনি অনুরাগী। হিতসাধক পত্রে সুরা পান নিবারণের উদ্দেশে তিনি বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে লেখা প্রাঞ্জল এবং যুক্তিপূর্ণ। একটু শুনাইতেছি;—

"অপরিমিত পানের অনিষ্টকারিতা এমন স্পষ্ট রূপে নয়ন গোচর হয় যে, কেহই তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু পরিমিত পানে অপকারের সম্ভাবনা না থাকিয়া বরং উপকারই হয় এই বলিয়াই অনেকে সুরাপানের অনুমোদন করেন। বাস্তবিক উহা তাঁহাদের ভয়ানক ভ্রম। সুরা প্রভৃতি বিষবং বস্তুসম্বন্ধে পরিমিত শব্দই অব্যবহার্য্য, এবংপ্রকার বস্তুর বিন্দু মাত্র গ্রহণই অপরিমিতাচরণ; সম্পূর্ণ পরিত্যাগই মিতাচরণ। * * যথার্থ বিবেচনা করিতে গেলে পরিমিত পান বাক্য-টাই অসঙ্গত বলিলে হয়। যদিও কোন প্রকারে সঙ্গত মনে করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও উহা বাক্য মাত্র। কার্য্যে পরিমিত পান প্রায়ই দেখা যায় না। কেহ সময় বিশেষে, কেহ এক মাস, কেহ এক বৎসর, কেহ পাঁচ বৎসর পরিমিত পায়ী থাকিয়া অপরিমিত পায়ী হইয়া পড়ে। * * পরিমিততাই অপরিমিততার পূর্ব্ব অবস্থা এবং প্রথম হইতে দ্বিতীয়ে পদার্পণ করা এত সহজ যে, সহস্রের মধ্যে ৯৯৯ জন কখন

না কখন দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি ধন ঐশ্বর্য্য ভোম মান সকল গুণে বিভূষিত, তাঁহাদেরই অধিকাংশ যখন লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না, তখন অপর ব্যক্তিরা যে যাবজ্জীবন পরিমিত পায়ী থাকিবে তাহার সম্ভাবনা কি ?"

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।



১৮৩১ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস, আই, বাহাদুর, কলিকাতার পাথুরিয়াঘাটায় আপন পৈতৃক প্রাসাদে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইঁহার পিতার নাম,—হরকুমার ঠাকুর। হরকুমার পরম পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত-ভাষায় তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় এমনই ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, সহজ স্বাভাবিক বাঙ্গলা ভাষার ন্যায় সংস্কৃতে অনর্গল কথা কহিতে পারিতেন। যিনি নিজে পণ্ডিত, যিনি নিজে বিদ্বান, যিনি নিজে বিদ্যোৎসাহী, যিনি নিজে বিদ্যানুরাগী, তাঁহার পুত্র পণ্ডিত হন, এ কামনা ত তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ। তাই হরকুমার,—পুত্রের শিক্ষা-সাধন-সম্বন্ধে কোন ত্রুটি রাখেন নাই। পিতার যত্নও সফল হইয়াছিল। পুত্রও পাণ্ডিত্যে পিতারই অনুরূপ হইয়াছেন।

শৈশবেই যতীন্দ্রমোহন প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। গৃহে, পাঠশালে, স্কুলে, কলেজে,—সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রতিভার পূর্ণ পরিচয়। সৌন্দর্য্যের শশাঙ্ক-শোভায় প্রতিভার প্রফুল্ল কৌমুদীর বিকচ-বিকাশ, কি অপূর্ব্ব মোহন দৃশ্য! পঞ্চমবৎসর বয়সে যতীন্দ্রমোহন, আপন প্রাসাদেই পিতৃদেব-নিয়োজিত গুরুমহাশয়ের নিকট রীতিমত পড়াশুনা করিয়াছিলেন। অতুল ধনপতির পুত্র সুকুমার যতীন্দ্রমোহন কঠোর-পরিশ্রমে, প্রগাঢ় মনোনিবেশে, ভূমিতে খড়ি পাতিয়া ক, খ লিখিয়াছিলেন, তালপাতে দাগা বুলাইয়াছিলেন, কলাপাতে হাত দোরস্ত করিয়াছিলেন, কাগজে হাত পাকাইয়াছিলেন। কড়ানিয়া, শতকিয়া

প্রভৃতির "ডাক" যতীন্দ্রমোহনের কণ্ঠস্থ ছিল। গুরুমহাশয় অবাক হইতেন।

যতীন্দ্রমোহনের বয়স যখন সাত বৎসর, তখন তাঁহার আশৈশব পালক-কিঙ্কর কৃষ্ণদাস তাঁহার সেই কৈশোরকোমল চিত্তে রাম-রাবণের চরিত্রচিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যার পর যতীন্দ্রমোহন আহার-তৃষ্ণা ভুলিয়া, কৃষ্ণদাসের মুখে গল্প শুনিতেন। কৃষ্ণদাসের গল্প বালকের কর্ণকুহরে যেন সুধাবর্ষণ করিত। কৃষ্ণদাস অনর্গল গল্প বলিত, আর বালক যতীন্দ্রমোহন কৌতুহলোদ্দীপিত চিত্তে নির্নিমেষ-নয়নে কৃষ্ণদাসের মুখচন্দ্র পানে চাহিয়া সে গল্প-সুধা পান করিতেন। যতীন্দ্রমোহন যেন মনে করিতেন, কৃষ্ণদাস গল্পের কল্পতরু। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর পিতা মাতাকে ভুলিয়া, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণদাসের কোলে শুইয়া, নূতন নূতন গল্প শুনিতে চাহিতেন। ক্রমে কৃষ্ণদাসের গল্পের পুঁজি ফুরাইয়া গেল; কিন্তু বালক ত ছাড়িবার পাত্র নহে। নিত্য নূতন কৌতুহল,—নিত্য নূতন গল্প শুনিবার উৎকট আকাঙ্ক্ষা। কৃষ্ণদাস বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। সে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ক্রমে রামায়ণ হইতে আজ "রামের বনবাস," কাল "সীতাহরণ"—এইরূপ একটী একটী বিষয় লইয়া গল্প বলিতে লাগিল ক্রমে রামায়ণের গল্প ফুরাইয়া গেলে, কৃষ্ণদাস মহাভারত হইতে এক একটী বিষয় লইয়া গল্প আরম্ভ করিল। বালক এই সব নবরস-পূর্ণ গল্প শুনিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িত। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বলেন,— "এই কৃষ্ণদাসের কল্যাণে আমার হৃদয়ে রামায়ণ-মহাভারতের জ্ঞান জন্মে।" মহারাজ প্রভু হইলেও ভৃত্য কৃষ্ণদাসের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এই কৃষ্ণদাসই যতীন্দ্রমোহনকে একবার চারি বৎসর বয়সের সময় মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল। এক দিন চারি বৎসরের শিশু যতীন্দ্রমোহন ভাঙ্গা বারান্দা দিয়া বারান্দার আলিসার উপর গিয়া উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে কৃষ্ণদাস নীচে ছিল। যতীন্দ্রমোহন আলিসা হইতে কৃষ্ণদাসকে দেখিয়া, কচি হাত দুইটী তুলিয়া, কোমল কুন্দদন্ত বিকাশিয়া, আধ-আধ স্বরে বলিলেন,—"কেষ্টোদি, আমি তোর

কাছে যা'বো।" কৃষ্ণদাস উপর দিকে চাহিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ! এখনই ছেলে উপর হইতে পড়িয়া মারা যাইবে! কৃষ্ণদাস তখন চেঁচামেচি না করিয়া, আস্তে আস্তে পিছু হটিয়া, দৌড়িয়া গিয়া উপরে উঠিল এবং তখনই পশ্চাৎ হইতে শিশুকে জাপটাইয়া ধরিয়া বারান্দার আলিসা হইতে তুলিয়া লইল। কৃষ্ণদাস সে যাত্রা যতীন্দ্রমোহনকে বাঁচাইল ছেলেকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া, পিতা হরকুমার, কৃষ্ণ দাসকে প্রচুর পুরস্কার দিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস নাই; কিন্তু আজিও কৃষ্ণদাসের নামে; কথায় কথায় যতীন্দ্রমোহনের মুখে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতার উল্লাস-উচ্ছ্বাস ফুটিয়া উঠে।

ছয় সাত বৎসর বয়সে যতীন্দ্রমোহন কলিকাতার যোড়াসাঁকো অঞ্চলে পার্কিণ সাহেবের " ন্ফাণ্ট" স্কুলে ছোট ছোট ইংরেজী ক্রীড়া-গাথা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে শিখেন। বাঙ্গালায় যেমন "আগডুম্ বাগডুম" "ইকৃড়ি মিকৃড়ি" প্রভৃতি ছেলেদের ক্রীড়া-গাথা শুনিতে পাও, ইংরেজিতেও এইরূপ গাথা আছে। এই সব গাথা যতীন্দ্রমোহন অতি সুন্দর রূপেই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। একবার তাৎকালিক বড় লাট বাহাদুর অকলাণ্ড সাহেব তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়া মুগ্ধচিত্তে বাৎসল্য-ভরে প্রশংসাবাদে তাঁহার পিট চাপড়াইয়াছিলেন।

ইনফাণ্ট স্কুলে অন্য কোন শিক্ষা হয় নাই। এখানে অল্প দিন কয়া যতীন্দ্রমোহন হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। ন্দু কলেজে তিনি দশ বার বৎসর পড়িয়াছিলেন। এখানে যতীন্দ্রমোহনের প্রতিভা প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তিনি হিন্দু কলেজে বৃত্তি পাইয়াছিলেন। কলেজে পড়িবার সময়, বাঙ্গলা ও ইংরেজী রচনায় তাঁহার অনুরাগ জন্মে। তিনি মধ্যে মধ্যে "প্রভাকরে" বাঙ্গালা ও "লিটাররী গেজেটে" ও অন্যান্য ইংরেজি কাগজে ইংরেজি রচনা লিখিয়া পাঠাইতেন। প্রভাকর-সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যতীন্দ্রমোহনের রচনায় বিমোহিত হইতেন। ঈশ্বরচন্দ্র, যতীন্দ্রমোহনকে প্রকৃতই প্রতিভান্বিত মনে করিয়া, সতত তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। যতীন্দ্রমোহন যখন কলেজের পড়া সাঙ্গ করেন, তখন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয় নাই। কলেজে অধ্যয়ন-

কালে ১০।১২ বৎসর বয়সে যতীন্দ্রমোহনের বিবাহ হয়। তিনি যখন কলেজে পড়িতেন, তখন হারমান জাফরি সাহেব তাঁহাকে বাড়ীতে পড়াইতেন। যতীন্দ্রমোহন কলেজ ছাড়িয়া দিবার পর বাড়ীতে কবি-পণ্ডিত রিচার্ডসন সাহেব, পাদরী ডাক্তার নাস্ এবং অন্যান্য কৃতবিদ্য ইংরেজ শিক্ষকের নিকট ইংরেজি পড়িতেন। এতদ্ব্যতীত পিতা হরকুমার পণ্ডিত রাখিয়া যতীন্দ্রমোহনকে সংস্কৃত শিখাইতেন। ইংরেজি, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত,—এই তিন ভাষারই রচনায় যতীন্দ্রমোহন সিদ্ধহস্ত। যতীন্দ্রমোহন ইংরেজি লিখিতে ও কহিতে পারেন, এ কথা অনেকেই জানেন; কিন্তু যতীন্দ্রমোহন যে বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষায় ভূরি ভূরি কবিতা লিখিয়াছেন, বাঙ্গলায় বিবিধ গদ্যপদ্য রচনা করিয়াছেন,—ইহা কয়জন জানেন? তাঁহার কবিতায়, তাঁহার গাথায়, তাঁহার রচনায়, তাঁহার ভাষায়, নিত্য নব-রস-রঙ্গ তরঙ্গে তরঙ্গে উথলিয়া ছুটে,—ভাবের প্রবাহে কত কুন্দ-কদম্ব ফুটিয়া উঠে। কোন কোন গ্রন্থে তাঁহার দুই একখানা বাঙ্গালা গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু যতীন্দ্রমোহন যে সংস্কৃত ভাষায় সুমধুর সুধাস্রাবী শ্লোকাবলী রচনা করিয়াছেন, এ কথার উল্লেখ কোন গ্রন্থেই নাই। তাঁহার কৃত শান্তরসময় সংস্কৃত শ্লোকাবলীর ছন্দে ছন্দে ছত্রে ছত্রে যে ভক্তিভাবের পূর্ণ উৎস উৎসারিত হয়, তাহা কয়জন জানেন? তাঁহার আদিরসের শ্লোকে রসের ফোয়ারা। ভক্তের প্রাণে ভক্তির মন্দাকিনী। ভাবুকের ভাবে গদ গদ গোদাবরী।

জানেন কি পাঠক! এই যতীন্দ্রমোহন যৌবনের প্রহসনে শ্লেষের কষাঘাতে সমাজের সয়তানকে কেমন শাসাইয়া রাখিয়াছেন? যতীন্দ্রমোহনের কত গান লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাই; কিন্তু জানিতাম কি, সেই সব গান যতীন্দ্রমোহনের রচিত? বল দেখি,—

"এখন কি হে নাগর তোমার, আমার প্রতি সে ভাব আছে।"

এই যে নৈরাশ্যের অবসাদ-ভরা, আকুলতার হিমানী মাখা গানখানি যেখানে সেখানে, বৈঠকে মজলিসে, ঘাটে মাঠে, যার তার মুখে শুনিতে পাও, এ গানের রচয়িতা কে? জানেন কি,—যতীন্দ্রমোহনই ইহার রচয়িতা?

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

যতীন্দ্রমোহন কলেজে পড়িবার সময় বিবিধ সংবাদপত্রে গদ্য পদ্য রচনা লিখিয়া পাঠাইতেন; পরন্তু সংসার-ক্ষেত্রে কার্য্যময় জীবনেও তিনি সংবাদপত্রে লিখিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যৌবনে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ,—"বিদ্যাসুন্দর নাটক" "চক্ষু-দান," "উভয়-সঙ্কট," "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।" আধুনিক সখের ও পেশাদারী থিয়েটারে এই কয়খানি নাটক-প্রহসনের অভিনয় হইয়াছে এবং হইয়া থাকে। কয়খানিরই প্রশংসা যথাতথা, কিন্তু জানিতে কি, যতীন্দ্রমোহন ইহাদের রচয়িতা?

আপন বাড়ীতে অভিনয় করাইবার জন্যে যতীন্দ্রমোহন প্রথম "বিদ্যা-সুন্দর নাটক" রচনা করেন। এ বিদ্যাসুন্দরে গোপাল উড়ের সে মালিনী মাসী নাই,—মালিনী মাসীর সে বঙ্কিমবিনোদ নর্ত্তন-কুর্দ্দন নাই,—সে করতালি কটাক্ষভঙ্গিময়ী রসিকার রস-টপ্পা নাই। এ বিদ্যাসুন্দরের মালিনী রসময়ী, পরন্তু ভাবময়ী; অথচ যেন একটু ধীরা, একটু স্থিরা, একটু গম্ভীরাও বটে; যেন হেমন্তের প্রভাতে শিশিরস্নাতা সেফালিকা। গানে রসিকতা আছে,—অশ্লীলতা নাই। ভাব আছে,—ভান নাই। বিদ্যাসুন্দরের ভাষা সহজ, সরল, পরিস্ফুত ও পরিমার্জ্জিত। বিদ্যাসুন্দরের গানে যতীন্দ্রমোহনের রস-রচনার পূর্ণ পরিচয়। একটু পরিচয় লউন,—

(১)

(রাগিণী বারোঁয়া—তাল খেমটা।

কায় কব দুঃখের কথা, মনের ব্যথা মনই জানে।
অবলা কুলের বালা, কত জ্বালা সয়গো প্রাণে॥
বিষম প্রতিজ্ঞা করি, অন্তরে গুমরে মরি,
লাজে প্রকাশিতে নারি, দিবানিশি যায় রোদনে॥
যৌবনের দুঃখ ভার, সহিতে না পারি আর,
না জানি বা বিধাতার, কত আর আছে মনে॥

(২)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেমটা।

নাগর মনের মত মিলিল ভালো। রূপে জুড়ায় আঁখি ভুবন আলো।
কমল-মধুকণা, অলি পেলে না, ভাগ্যগুণে বুঝি ভেকের হোলো॥

যতীন্দ্রমোহন ধনী,—যতীন্দ্রমোহন বিদ্বান; কিন্তু যতীন্দ্রমোহন ফল-ভারাবনত তরুসম চির-বিনয়ী,—বিদ্যাসুন্দরের ভূমিকা হইতে তাহার পরিচয় লউন;—

"কথিত আছে যে, কোন ধনবানের নিকটে একজন ভাঁড় নিযুক্ত ছিল। ঐ ব্যক্তি প্রত্যহ অভিনব কৌতুক প্রস্তুত করিতে আদিষ্ট হওয়াতে এক দিন নূতন কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, এক জন মুটের ঝাঁকাতে বসিয়া প্রফুল্লবদনে প্রভুর নিকটে উপনীত হইল। ধনী এই অদ্ভুত ব্যাপারে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। 'একি!' ভাড় করযোড় করিয়া উত্তর করিল 'মহাশয়, আজকের এই নূতন।'—আমার এই গ্রন্থ প্রস্তুত করাও প্রায় সেইরূপ হইয়াছে; অর্থাৎ সকলের আবাল্য পরিজ্ঞাত ভারতচন্দ্র রচিত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যান, ইতস্ততঃ ঈষৎপরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নাটকের পরিচ্ছদে "আজকের এই নূতন" বলিয়া পাঠকগণের সমীপে সমর্পণ করিতেছি। ইহাতে আমার অধিক অনুনয়-বাক্যের প্রয়োজন করে না, কারণ বান্ধববর্গের অনুরোধক্রমে এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম এবং কেবল বান্ধববর্গের ব্যবহারার্থ ইহা মুদ্রাঙ্কিত হইল। যেমন কোন অপটু পাচককে রন্ধন করিতে অনুরোধ করিলে নিতান্ত অপকৃষ্ট পাক হইলেও তাহাকে দোষী করা যাইতে পারে না, সেইরূপ আমার প্রতিও এই রচনা বিষয়ে বিশেষ দোষারোপ হওয়ার সম্ভব নাই। কিন্তু যদ্যপি এই ক্ষুদ্র নাটক দ্বারা বান্ধবদিগের অর্দ্ধ দণ্ডের নিমিত্তেও সুখ-সম্পাদন হয়, তবে একান্ত চরিতার্থ হইয়া আপনার সৌভাগ্যকে যথেষ্ট ধন্যবাদ করিতে থাকিব; কিমধিকমিতি।"

সোজা কথায়, সহজ ভাষায় কেমন বিনয়ের মোহকারিতা বল দেখি? প্রহসনের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। "উভয়সঙ্কট" "চক্ষুদান" "যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল"—এই তিনখানি প্রহসনের অভিনয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কোন কোন সাময়িক ঘটনা বা অবস্থা অস্থায়ী। সেই সব ঘটনা বা অবস্থার চিত্রাঙ্কণে প্রহসনের কষাঘাত চিরস্থায়ী হয় না; সুতরাং অভিনয়ের ভাবনা-ধারণা অচিরে মুছিয়া যায়। যতীন্দ্রমোহনের প্রহসনে যে

ঘটনা বা অবস্থার চিত্রাঙ্কন হইয়াছে, তাহা সর্ব্ব সময়েই স্থায়ী; সুতরাং সর্ব্ব সময়েই শ্রবণীয় ও দর্শনীয়; কাজেই শিক্ষণীয়।

যতীন্দ্রমোহনের ইংরেজি পদ্যরচনায় যেমন কৃতিত্ব, সংস্কৃতেও তেমনি। ইঁহার সংস্কৃত রচনা অনেক পড়িয়াছি। যেটী দেখি, যেটী পড়ি, সেইটী মধুর, সেইটী মনোহর। একটীর নমুনা দিই,—

শৃণুরে মানস শৃণু হিতবাণীম্। ত্যজ নিজ চঞ্চলভাবমিদানীম্॥
পরিহর সত্বরমহমিতি গর্ব্বং। কালগ্রাসে নিবসতি সর্ব্বম্॥
মৃগতৃষ্ণাসম ভব বিভবাশা। শান্তা না ভবতি ভোগপিপাসা॥
ইহ সংসারে নহি সুখলেশঃ। প্রভবতি নিত্য দুঃখবিশেষঃ॥

এইরূপ একটী একটী করিয়া যতীন্দ্রমোহন শান্ত ও আদিরসে অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন। একখানি ক্ষুদ্র খাতায় কবিতাগুলি লিখিত আছে। কোন্ বৎসর কোন তারিখে কোন্ কবিতাটী লিখিত হইয়াছে, তাহা এই খাতায় প্রত্যেক শ্লোকের নীচে লিখিয়া রাখা হইয়াছে।

যতীন্দ্রমোহন কবিতা লিখিয়াছেন, নাটক লিখিয়াছেন, প্রহসন লিখিয়াছেন। সাহিত্যে যতীন্দ্রমোহনের সর্ব্বতোমুখী শক্তি। যতীন্দ্রমোহন এই শক্তির সখ্য-সংকর্ষণে তদানীন্তন অনেক শক্তিশালী সাহিত্যসেবীর প্রতিভায় বহ্নির স্ফুলিঙ্গরাগ নিষ্কাশিত করিয়াছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের উৎসাহ-প্রণোদনে বাঙ্গালার অমিত্রাক্ষর ছন্দ পৃথিবীর আলোক দর্শন করিয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের সহিত মাইকেলের কি শুভক্ষণে শুভ-সৌহৃদ্য হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহনের উৎসাহের দীপকরাগে উদ্দীপ্ত হইয়া মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দে "তিলোত্তমা কাব্য" রচনা করেন।

যতীন্দ্রমোহনের উদ্যোগে উৎসাহে বঙ্গদেশে প্রথম ইংরেজী প্রথা অনুসারে থিয়েটরের সূত্রপাত হইয়াছিল। ভ্রাতা শৌরীন্দ্রমোহনকে লইয়া যতীন্দ্রমোহন থিয়েটারে একতানবাদনের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। আমাদের মনে হয়, অভিনয়ের অবসর-বিশ্রামে শ্রোতার চিত্ত-বিনোদনে একতানবাদনে যে বেহাগ, খাম্বাজ, টোরী, গৌরী রাগের ঝঙ্কার উঠে, তাহা যতীন্দ্রমোহনের কৃতিত্বের ঘোষণা-রাগ মাত্র।

বঙ্গদেশের একতানবাদনের প্রতিষ্ঠা-কল্পে যতীন্দ্রমোহনেরই উদ্ভাবনী প্রতিভা প্রকটিত। কেবল অর্থে, কেবল বিদ্যায় ইহার সাধনসিদ্ধি হয় না।

এইবার সংক্ষেপে যতীন্দ্রমোহনের কার্য্যময় জীবনের কিঞ্চিৎ পরিচয় লউন।

কলেজ-পরিত্যাগ করিবার দু-তিন বৎসর পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্র মোহনের পিতৃবিয়োগ হয়। অতঃপর যতীন্দ্রমোহন খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকটে জমিদারীর কার্য্যাদি শিক্ষা করেন। পাইকপাড়ার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর যতীন্দ্রমোহন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।

১৮৭০ সালে তাৎকালিক ছোটলাট সার উইলিয়ম গ্রে তাঁহাকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে নিযুক্ত করেন। সদস্যের কাজে তিনি সরকার বাহাদুরের নিকট এরূপ সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন যে, ছোট লাট সার জর্জ্জ কাম্বেল পর বৎসর তাঁহাকে আবার এই পদে মনোনীত করেন। এই বৎসর ছোট লাট বাহাদুর তাঁহার অশেষ গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রের কথাটা বড় সহজ নহে,—"আপনি কেবল সম্প্রদায় বিশেষের নহে, সমস্ত ভারতবাসীর মঙ্গলপ্রয়াসী।"

১৮৭১ সালে ৭ই মার্চ্চ বড় লাট লর্ড মেও যতীন্দ্রমোহনকে "রাজা" উপাধি প্রদান করেন। যতীন্দ্রমোহনের স্বভাব ভাল, যতীন্দ্রমোহন দেশের হিতৈষী, যতীন্দ্রমোহন ব্যবস্থাপক-সভার হিতৈষী সদস্য, যতীন্দ্রমোহন ধনশালী, যতীন্দ্রমোহন স্কুল, রাস্তা প্রভৃতি কার্য্যে মুক্তহস্ত, যতীন্দ্রমোহন বিদ্যোৎসাহী, ইত্যাদি ইত্যাদি কথার উল্লেখ করিয়া স্বয়ং সার উইলিয়ম গ্রে সাহেব যতীন্দ্রমোহনকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

আমাদের কথা নহে, স্বয়ং সার উইলিয়ম গ্রে বলিয়াছিলেন,—"যতীন্দ্রমোহন "১৬টী ছাত্র প্রতিপালন করেন। ১২৬৬ সালে দুর্ভিক্ষের সময় যতীন্দ্রমোহন প্রজাদের খাজনা রেহাই দিয়াছিলেন। প্রত্যহ আড়াই শত দীনদুঃখী যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে আহার পাইত। এইরূপে

তাহারা তিন মাস কাল আহার পাইয়াছিল।" যতীন্দ্রমোহনের সহৃদয়তার পরিচয় নহে কি ?

সার জর্জ্জ কাম্বেলও বলিয়াছিলেন,—"আপনার সহিত আমার মত-ভেদ থাকিতে পারে ; কিন্তু যেখানে মত মিলিয়াছে, সেখানে আপনি আমার শক্তিশালী সহায় হইয়াছেন। আপনার বিরুদ্ধ মতেও রাজভক্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিষ্টাচারের পরিচয় পাইয়াছি।" বিচক্ষণতা ও বাক্‌পটু-তার পরিচয় নহে কি ?

১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর দরবারে মহারাণী বিক্টোরিয়ার "রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাৎকালিক বড় লাট লর্ড লিটন যতীন্দ্রমোহনকে "মহারাজ" উপাধি প্রদান করেন।

১৮৭৭ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী যতীন্দ্রমোহন বড় লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপকসভার সদস্য ও ১৮৭৯ সালে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালে যতীন্দ্রমোহন দ্বিতীয়বার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। সার আর্থার হবহাউস বলিয়া-ছিলেন,—"যতীন্দ্রমোহন যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, আমি তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারি না ; তাঁহার মতে মত দিতে হইতেছে। এমন কি, তিনি যে পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতেই আমি রাজি।"

১৮৭৯ সালের ২৮শে জুলাই যতীন্দ্রমোহন সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন পুরুষানুক্রমিক মহারাজা উপাধি লাভ হন।

যতীন্দ্রমোহনের কার্য্যময় জীবনের কার্য্য-কৃতিত্বের কথা আর অধিক বলিব না। তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনের গুটিকতক গুণের কথা উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণের অভিপ্রায়ে যতীন্দ্রমোহন এক লক্ষ টাকার একটী ফণ্ড করিয়াছেন। তিনি পাথুরিয়াঘাটার হাসপাতালের জন্য জমী ও দশ সহস্র টাকা দিয়াছিলেন। তিনি কত দিকে কত দান করিয়াছেন, তাহার পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করা দুষ্কর। সংক্ষেপে গুটিকতকের তালিকা দিলাম। গোপনে দান ৫০ সহস্র টাকা ; মেও হাঁসপাতালের জন্য ১০

হাজার ১ শত ১৭ টাকা; দাতব্য সভায় আট সহস্র। এমন দান অনেক।

যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীতে নিত্য অতিথি সেবা হয়। অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যতীন্দ্রমোহন আহার করেন না। প্রাতে সন্ধ্যা আদি না করিয়া যতীন্দ্রমোহন বাহিরে আসেন না। মাতার প্রতি যতীন্দ্র মোহনের অচলা ভক্তি ছিল। যতীন্দ্রমোহন কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে অনেক দীনজনকে অর্থদান করেন। জমীদারিতে স্কুল ও দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যবস্থা করা আছে। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে যিনি একবার আলাপ করেন, তিনি তাঁহার হাস্যানন ও সদালাপ কখন ভুলিতে পারেন না।

দীনবন্ধু মিত্র।

নদীয়া-কাঁচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১২৩৬ সালে দীনবন্ধু মিত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র।

দীনবন্ধু অল্প বয়সেই কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হন। হেয়ার স্কুল হইতে তিনি হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। হিন্দুস্কুলে দীনবন্ধু বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১৮৫৫ সালে তিনি কলেজে পাঠ সমাপ্ত করিয়া, দেড় শত টাকা বেতনে পাটনার পোষ্ট মাষ্টারের কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্ম তিনি ছয় মাস করিয়াছিলেন। ইহার পর, তাঁহার পদ বৃদ্ধি হয়; তিনি উড়িষ্যা বিভাগের ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার হয়েন। পদ বৃদ্ধি হইল বটে; কিন্তু সে সময়ে বেতন-বৃদ্ধি হইল না; পরে বেতন বাড়িয়াছিল।

এই কার্য্যে সারা বৎসরই তাঁহাকে মফস্বলের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিতে হইত। তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া আসিল। তিনি উড়িষ্যা হইতে নদীয়া বিভাগে এবং নদীয়া বিভাগ হইতে ঢাকা বিভাগে প্রেরিত

হইলেন। এই সময়ে নীল-হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানাস্থানে পরিভ্রমণ হেতু নীলকর-তত্ত্ব বহু পরিমাণে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার ফল,—তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটক,—"নীলদর্পণ।" নীলদর্পণ প্রকাশের পর চারিদিকে বিষম হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই নাটক ইংরেজীতে অনুবাদিত হয়। লং সাহেব ইহা প্রচারের জন্য সুপ্রিমকোর্টের বিচারে কারারুদ্ধ হন। সীটনকার সাহেব অপদস্থ হন। নীলদর্পণ ইউরোপের বহু ভাষায় অনুবাদিত হয়।

ঢাকা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু পুনরায় নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হন। নদীয়া বিভাগেই তিনি বহু দিন কার্য্য করেন; পুনরায় ঢাকায় বদলি হন। এইবার ঢাকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি "নবীন তপস্বিনী" রচনা করেন। কৃষ্ণনগরে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। এই প্রেস দীনবন্ধু প্রভৃতির যত্নেই স্থাপিত।

১৮৬৯ সালের শেষ ভাগেই হউক বা ১৮৭০ সালের প্রথমেই হউক, দীনবন্ধু কলিকাতায় সুপারনিউমারি ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টার পদে নিযুক্ত হইলেন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরেলের সাহায্য করাই এই পদের কার্য্য। ১৮৭১ সালে ইনি যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্তের জন্য কাছাড় গমন করেন।

কাছাড় হইতে অল্পদিন পরেই দীনবন্ধু কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে গবরমেণ্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। দীনবন্ধুর কার্য্যশৃঙ্খলায় কর্তৃপক্ষ যে সবিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, উপাধি দানেই তাহার পরিচয়। কিন্তু গুণের পুরস্কার, কেবল উপাধিতেই শেষ!

অদৃষ্ট অপ্রসন্ন। পোষ্টমাষ্টার জেনেরল ও ডিরেক্টার জেনেরালে কোন বিষয়-সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হইল। দীনবন্ধু,—পোষ্টমাষ্টার জেনেরলের সাহায্য করিলেন। ফলে, তাঁহাকে পোষ্টবিভাগ ছাড়িয়া, কার্য্যান্তরে নিক্ত হইতে হইল।

বড় শ্রমে দীনবন্ধুর ভগ্ন শরীর আরও ভাঙ্গিল। তিনি অল্প মাত্রায় অহিফেন সেবন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বহুমূত্র রোগ দেখা দিল।

আমি তপস্বিনীর বেশে ধর্ম্মা পড়িছি; সময়ে মনের ভাব অব্যক্ত নাই; অধীনের বাসনানুসারে আপনার কর্ম্ম কত্তে হবে না; দাসীর মতামত কি? প্রভুর সুখেই সুখী, প্রভুর দুঃখেই দুঃখী; আপনি যখন তপস্বী, আমি তখন তপস্বিনী, আপনি যখন সন্ন্যাসী, আমি তখন সন্ন্যাসিনী, আপনি যখন গৃহী, আমি তখন গৃহিনী; আপনি যখন রাজা, আমি তখন রাণী।"

রামনারায়ণ তর্করত্ন।

২৪পরগণা-হরিনাভি গ্রামে ১৭৪৫ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম,—রামধন শিরোমণি।

প্রথমে ইনি চতুষ্পাঠীতে শিক্ষালাভ করেন; পরে সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। শিক্ষান্তে সংস্কৃত কলেজেই তিনি অন্যতম শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যথাসময়ে পেন্সন গ্রহণ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ইহার পরলোক হইয়াছে।

ইনি ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে পতিব্রতোপাখ্যান এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক রচনা করেন। এই দুই খানিই পারিতোষিক গ্রন্থ। রঙ্গপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন,—"যিনি পতিব্রতোপাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তিনি পঞ্চাশ টাকা হিসাবে পারিতোষিক পাইবেন।" তর্করত্ন মহাশয় এই দুইটীর জন্যই পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ,— রত্নমালা, বেণীসংহার, শকুন্তলা, নব-নাটক, মালতীমাধব এবং রুক্মিণীহরণ। এই ছয় খানিই নাটক। ইহা ছাড়া তিনি আরও দুই খানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইনি বহু নাটক রচনা করেন বলিয়া, "নাটুকে রামনারায়ণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। পরলোকগত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"বোধ হইতেছে, কুলীনকুলসর্ব্বস্বের পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কোন নাটক রচিত হয় নাই; ইহাই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গলা নাটক।"

নব-নাটক,—কলিকাতা যোড়াসাঁকো-নাট্যশালা কমিটীর আদেশে রচিত। বাল্য-বিবাহের দোষ প্রদর্শনই এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য। ইহাঁর কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব গ্রন্থ হইতে একটু তুলিয়া দিতেছি।

কন্যা বিক্রয়ের কথায় পুরোহিত ধর্ম্মশীলের উক্তি,—

(কর্ণে হাত দিয়া) আঁ একি শুনি! রাম, রাম, রাম! নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ! কন্যা বিক্রয়! যাহা শ্রবণেও পাপ স্পর্শে, এতাদৃশ ব্যাপারেও প্রাণিদিগের অভিরুচি। হা ভগবান্, এ কি! পদ্মপুরাণে কথিত আছে, "কন্যাবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ।" যে ব্যক্তি কন্যা বিক্রয় করে, নরক হইতে তাহার নিস্তার নাই, সে চিরকাল নিরয়গামী হইয়া থাকে এবং ক্রিয়াযোগসারে কথিত আছে, "যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ। স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকং"। যে ব্যক্তি নিতান্ত ধনগৃধ্নতা প্রযুক্ত অযুক্ত কন্যাবিক্রয়রূপ দুঃসহ পাতক স্বীকার করে, তাহাকে বিষ্ঠাহ্রদ নরকে গমন করিতে হয় এবং "কন্যাবিক্রয়িণঃ পুংসো মুখং পশ্যেন্ন শাস্ত্রবিৎ। পশ্যেদজ্ঞানতো বাপি কুর্য্যাস্তাস্করদর্শনং।" যে ব্যক্তি অজ্ঞানত কন্যাবিক্রয়ীর মুখাবলোকন করে, সেও সূর্য্যদর্শনস্বরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেক। "যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম কন্যাবিক্রয়িণঃ পুনঃ। শুভং শুভং সকলং বিপ্র গচ্ছেদ্বিফলতাং প্রতি"। কন্যাবিক্রেতা যদি কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহাও তাহার বিফল হয়। আর অধিক কি বলিব, "তদ্দেশং পতিতং মন্যে যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী।" কন্যাপুত্রবিক্রেতা যে স্থানে বাস করে, সে দেশ পর্য্যন্ত পতিত হয়। অপর কুলসর্ব্বস্ব গ্রন্থে লিখিত আছে, "ন কুর্য্যাদর্থসম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচন"। কন্যাদাতা কন্যাগ্রহীতার সহিত কদাচ অর্থসম্বন্ধ করিবে না, করিলে কন্যা-বিক্রয় দোষে লিপ্ত হয়, এই শাস্ত্রানুসারে অদ্যাবধি সজ্জনগণ কদাচ বরপক্ষের দ্রব্য-সামগ্রীও গ্রহণ করেন না এবং দৌহিত্রমুখ নিরীক্ষণের পূর্ব্বে জামাতৃগৃহে অভ্যব-হারেও বিমুখ থাকেন। শাস্ত্রে এইরূপ শুক্রবিক্রয়ীর অশেষ প্রকার নরক লেখে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, পামরপ্রকৃতি প্রাণিগণ সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ পাপপুঞ্জ স্বীকারে বসুমতীকে দূষিত করিতেছে!"

অভব্যচন্দ্রের আত্মপরিচয়,—

"ব্যাকরণে মোর বিদ্যা বুঝিবে কি পরে। ভবতি পচন্তি পেটে গজ গজ করে॥
যত্নে নাই স্বত্ব মোর গত্বতে অনত্ব। আস্ত আস্ত সিদ্ধিফলা কেবা করে তত্ত্ব॥
যে করে বিচার তার বুদ্ধি লোপ করি। খ্যাত আছি শব্দ-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন কেশরী॥
কাব্যেতে'অভব্য নাম দেখ মোর আছে। শ্লোক পড়ি হাড়ি মুচি চণ্ডালের কাছে।
অলঙ্কার শাস্ত্রে বিদ্যা বলিব কি বল। আমি নাই ছুঁই পরে ব্রাহ্মণী সকল॥
কবিতা করিতে শক্তি অতি অনুপম। বাবা কেন না রাখিল কালিদাস নাম॥

কবিতাতে যদি নাহি মিলে চতুষ্পদ। মিলাইয়া দিই তাহে আমি চতুষ্পদ॥
পাষণ্ড পণ্ডিত আমি নানাশাস্ত্র জানি। স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই দেখ অনুমানি॥
গোবধে ছপণ কড়ি ব্যবস্থা আমার। অবিচারে কেবা পারে হেন শক্তি কার॥
জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে মোর বিদ্যা আছে ভারি। এক হাতে দশ অঙ্ক গুণে দিতে পারি॥
অনায়াসে দেখে বলি গর্ভবতী হাত। হয় ছেলে, নয় মেয়ে, নয় গর্ভপাত॥
ন্যায়েতে অন্যায় বিদ্যা বিদ্যমান আছে। ঘটত্ব পটত্ব ভয়ে নাহি এসে কাছে॥
গর্ব্বেতে পর্ব্বত ধূমে কয় অনুমান। কপালে আগুণ মোর আছে বিদ্যমান॥"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামনিধি গুপ্ত।

(নিধু বাবু)।

নিধু বাবু,—১১৪৮ সালে হুগলী জেলার ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী চাপতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পূর্ণ নাম রামনিধি গুপ্ত। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইহাঁদের আদি বাস কলিকাতা-কুমারটুলী। বর্গীর ভয়ে ভীত হইয়া, হরিনারায়ণ চাপতাগ্রামে মাতুলালয়ে বাস স্থাপন করেন।

৪।৫ বৎসর বয়সে রামনিধি গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি হন। পাঠশালায় নামতা, শুভঙ্করী প্রভৃতি বাঙ্গালা শিক্ষা এক প্রকার সমাপ্ত হইল। রামনারায়ণ দেখিলেন,—পুত্রকে এখন ইংরেজী পড়ানই প্রয়োজন, অথচ চাপতায় কোনরূপ ইংরেজী স্কুল নাই;—কাজেই তিনি মাতুলের সহিত পরামর্শ করিয়া, পুনরায় সপরিবারে কলিকাতায় আসিলেন,—এক পাদরী সাহেবের হাতে পুত্রের ইংরেজী শিক্ষার ভারার্পণ করিলেন। রামনিধি আবাল্য সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। এ দিকে শিক্ষা যত হউক বা না হউক, তিনি সঙ্গীত চর্চ্চাতেই অধিক সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

রামতনু পালিত,—হরিনারায়ণ কবিরাজের প্রতিবেশী। রামতনু ছাপরায় কালেক্টরী আফিসে কার্য্য করিতেন। এই রামতনুর চেষ্টায় রামনিধি,—শিক্ষা সমাপনান্তে ছাপরায় এই কলেক্টরী আফিসেই কেরাণী গিরির কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

নিধুবাবু চাকুরিতে নিযুক্ত হইলেন বটে কিন্তু সঙ্গীত-শিক্ষাতেই তিনি অধিকতর মনোযোগী হইলেন। ছাপরায় অনেকগুলি হিন্দুস্থানী গায়কের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। সবিশেষ যত্নে ইহাঁদের নিকট তিনি খেয়াল, টপ্পা, গজল প্রভৃতি নানারূপ কালোয়াতী সুর শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ফল কথা, এই সময়ে সঙ্গীত বিষয়ে তাঁহার বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

নিধু বাবু নির্দ্দিষ্টকাল পর্য্যন্ত ছাপরায় চাকরী করেন; অতঃপর পেন্সন লইয়া কলিকাতায় আসেন। জীবনের অবশিষ্টকাল তিনি সঙ্গীত আলোচনাতেই অতিবাহিত করিয়াছেন।

রামনিধির তিন বিবাহ। প্রথম বিবাহ শুকচর গ্রামে ১১৬৮ সালে,— ২০ বৎসর বয়সে। এই স্ত্রীর গর্ভে ১১৭৫ সালে ইহাঁর একটী পুত্র সন্তান হয়; অল্পবয়সেই এই পুত্রের মৃত্যু হয়; মাতাও ইহার অল্প দিন পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। নিধুবাবুর দ্বিতীয় বিবাহ,—কলিকাতা যোড়াসাঁকোয়;—১১৭৮ সালে,—৩০ বৎসর বয়সে। এ স্ত্রীও অল্পদিন পরেই পরলোকগত হন। অতঃপর তৃতীয় বিবাহ,—হাবড়ার অধীন বরিজহাটী গ্রামে,—১২০১ সালে,—৫৩ বৎসর বয়সে। এই স্ত্রীর গর্ভে নিধু বাবুর চারি পুত্র ও দুই কন্যা জন্মগ্রহণ করে।

১২৩৮ সালের ২১শে চৈত্র ৮৭ বৎসর বয়সে নিধু বাবুর দেহান্তর হইয়াছে।

নিধু বাবুর টপ্পা দেশ বিখ্যাত। সরল ভাষায় ভোরপুর ভাব। সে ভাব কি মর্ম্মস্পর্শী!

(১)

"না হতে পতন তরু, দাহন হইল আগে। আমার এ অনুতাপ, তাহাকে ত নাহি লাগে॥
চিতে চিত সাজাইয়ে, তাহে দুঃখ তৃণ দিয়ে, আপনি হইব দগ্ধ, আপনারি অনুতাপে।"

(২)

"তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ, এ মহীমণ্ডলে। আকাশের পূর্ণশশী, সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে॥
সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে, আপনি আপন সম্ভবে, যেমন গঙ্গা পূজা গঙ্গাজলে"

(৩)

"প্রাণ তুমি বুঝিলে না আমার বাসনা। ঐ খেদে মরি আমি তুমি তা বুঝ না॥
হৃদয় সরোজে থাক, মোর দুঃখ নাহি দেখ, প্রাণ গেলে সদয়েতে, কি গুণ বল না।"

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

বর্দ্ধমান-কাল্‌নার নিকটবর্ত্তী চুপি গ্রামে ১১৫৭ সালে রঘুনাথ রায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ব্রজকিশোর রায়। ব্রজকিশোর, বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। চুপির রায় বংশ দীর্ঘকাল যাবৎ বর্দ্ধমান-মহারাজ সংসারে দেওয়ানীর কার্য্য করিয়াছেন।

দেওয়ান ব্রজকিশোরের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের তিন পুত্র,—রঘুনাথ রায় মধ্যম। রঘুনাথ বর্দ্ধমানে পিতার নিকট থাকিয়া, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রায় দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র বর্দ্ধমানের অধিপতি। ইহাঁরই অভিপ্রায় অনুসারে দেওয়ান রঘুনাথ দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নিবাসী কালোয়াৎগণের নিকট সঙ্গীত শাস্ত্র উত্তম রূপ শিক্ষা করেন।

বিষয়-বিতৃষ্ণ রঘুনাথ পরমার্থ চিন্তাতেই অনেক সময় ক্ষেপণ করিতেন। দেওয়ানী কাজ ইনি অধিকদিন করেন নাই। ইনি বিস্তর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ,—রঘুনাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে কালীবিষয়ক একটী এবং অপরাহ্ণে কৃষ্ণবিষয়ক একটী সঙ্গীত রচনা করিতেন। ইহাঁর সঙ্গীত 'অকিঞ্চন' ভণিতাযুক্ত।

১২৪৩ সালের ১৯শে ভাদ্র দেওয়ান রঘুনাথের দেহান্তর হইয়াছে। ইহাঁর একটী গান তুলিয়া দিলাম ;—

আলেয়া একতালা।

কে শবোপরে, রূপসী বিহরে, মুখমণ্ডলে, জগৎ আলো করে,
কালী কি করালী, রাধা চন্দ্রাবলী, অনুমান নাহি হইল রে।
অলক্ত ঝলকে, চপলা চমকে, নাসা-নলকে, মরিগো ঠমকে,—
মরাল থমকে, গতির ঠমকে, কটি হেরি হরি ভুলিল রে॥

কুবলয় ভয় নিন্দি নয়ন, গৃধিনী গঞ্জিত যুগল শ্রবণ,
বদন দাড়িম্ব-দন্ত-দমন, হাসি ছলে সুধা ঢালিল রে॥
অকিঞ্চন ভাবে দিয়ে জলাঞ্জলি, ও চরণ হৃদয়ে দেরে জলাঞ্জলি।
শিবত্ব পাইবি,—মন! তোরে বলি, (যে পদ) ভব ভেবে পাগল রে॥

দেওয়ান রামদুলাল নন্দী।

ত্রিপুরা জেলার অধীন কালীকচ্ছ গ্রামে প্রসিদ্ধ মৌলিক কায়স্থ বংশে ১১৯২ সালে দেওয়ান রামদুলাল জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত এবং পারসী ভাষা উত্তমরূপ শিখিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি ত্রিপুরার কালেক্টরী আফিসে মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। সেই হইতেই ইহাঁর নাম রামদুলাল মুন্সী। অতঃপর ইনি নোয়াখালির কালেক্টরের অধীনে সেরেস্তাদারের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট হেলিডে সাহেব তখন নোয়াখালির কলেক্টর ছিলেন। ইহার পর ইনি শ্রীহট্ট জজ আদালতের সেরেস্তাদারের কর্ম্মে নিযুক্ত হন; শেষ চাকুরী,—ত্রিপুরা মহারাজের জমিদারী চাকলে রোসনাবাদের দেওয়ানী। ১২৫৮ সালের ২৪শে অগ্রহায়ণ ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

ইনি বিস্তর দেহতত্ত্ব সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন; একটী শুনাইতেছি;—

গায়া—আড়াঠেকা।

মন! কি ভুলে ভুলিয়াছ, ভুলে কি ভুলিতে নারো।
ভুলে কূল হারাবে পাছে, কূলেরই সন্ধান করো॥
ভাই বন্ধু দারাসুত, পরিজন আছে মত, যাকে অতি ভাল বাস, সেরূপ ভাব মায়েরো॥
নিত্য বস্তু পরমাণু, যার চয়ে হয় তনু, সংযোগ হইলে ধ্বংস, ভেবে দেখ কেবা কারো
শ্রীরামদুলালে রটে, সদা ফির মাঠে ঘাটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে, ভাব তুমি সেই সার॥

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।

রসসাগর ইহাঁর প্রসিদ্ধ উপাধি। "পাদ-পূরণে" ইহাঁর প্রচুর শক্তি। ইনি কৃষ্ণনগর পতি মহারাজ গিরিশচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন।

নদীয়া জেলার অধীন বাগোয়ানের নিকটবর্ত্তী বাড়েবাঁকা গ্রামে ১১৯৮ সালে ইহাঁর জন্ম। সংস্কৃত, পারসী, উর্দ্দূ এবং হিন্দী ভাষায় রসসাগরের অভিজ্ঞতা ছিল। কৃষ্ণনগরে ইহাঁর বিবাহ হয়। শান্তিপুরে ইনি কন্যার বিবাহ দেন। শেষ বয়সে শান্তিপুরেই ইনি বাস করেন। ১২৫১ সালে শান্তিপুরে ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

রসসাগর-কৃত পাদ-পূরাণের দৃষ্টান্ত,—

প্রশ্ন।—বড় দুঃখে সুখ।

উত্তর।—চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে। নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা কহে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক। বিধি হতে ব্যাধ ভাল,—বড় দুঃখে সুখ॥

প্রশ্ন।—শমন ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী।

উত্তর।—শক্তিশেলে লক্ষ্মণ পড়িলে রণভূমি। কান্দেন ব্যাকুল হয়ে জগতের স্বামী॥
শিক্ষা দীক্ষা বিবাহ সবার আগে আমি। শমন ভবনে কেন তুমি অগ্রগামী॥

প্রশ্ন।—গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্কা ফেলে দিল।

উত্তর।—হেন উপকার আর না করিবে কেহ। বিরহিণী বলেন কল্যাণে থাক রাহু॥
যদি বল শশী খেয়ে মন্দানল হলো। গ্রহণ সময়ে ধনী লঙ্কা ফেলে দিল॥

প্রশ্ন।—হাটের নেড়া হুজুক চায়।

উত্তর।—উকীল খোজে মোকদ্দমা, কোকিল বসন্ত চায়।
অগ্রদানী নিত্য গণে, কোন্ দিনে কে গঙ্গা পায়॥
সাধু খোজে পরমার্থ, লম্পট খোজে বেশ্যালয়॥
গোলমালেতে রেস্ত মেলে, হাটের নেড়া হুজুক চায়॥

প্রশ্ন।—তলব হয়েছে শ্যামচাঁদের দরবারে।

উত্তর।—করি, হরি, হরিণী, মরাল সুধাকর। পিক আদি তোর নামে ফিরিঙ্গী বিস্তর
এই কথা দূতী গে জানায় শ্রীরাধারে। তলব হয়েছে শ্যাম চাঁদের দরবারে॥

প্রশ্ন।—রমণীর গর্ব্বে পতি ভয়ে লুকাইল।

উত্তর।—লক্ষ্মীনারায়ণ এক চক্র পাত্রে থুয়ে। তাড়ন করয়ে লোক হুতাশন দিয়ে॥
তৃণকাষ্ঠে পেয়ে অগ্নি প্রবল জ্বলিল। রমণীর গর্ব্বে পতি ভয়ে লুকাইল॥

প্রশ্ন।—অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।
উত্তর।—হায়রে বিধি নিদারুণ কত খেলা খেল।
সংসারের যন্ত্রণা যত হাভাতের ঘাড়ে ফেল॥
খেতো রোগী কেঁদে বলে কোন্ দিন খা ভাল। অমাবস্যা গেল আবার পৌর্ণমাসী এল।

প্রশ্ন।—গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।
উত্তর।—মহারাজ রাজধানী নগর বাহির। বাবইয়ারি মা কেটে হলেন চৌচির॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ী হইল বাহির। গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর॥

প্রশ্ন।—নিশিতে প্রকাশ পদ্ম, কুমুদিনী দিনে।
উত্তর।—জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা পড়ো মনে। চক্রান্ত করিল চক্রী চক্র আচ্ছাদনে॥
আকাশেতে কালনিশি উভয়ে না জানে নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥

পরলোকগত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্র শ্যামাধব রায় মহাশয় রসসাগরের জীবন বৃত্তসম্বলিত "পাদ-পূরণের" একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল "পাদ-পূরণের" বিস্তৃত সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়।

প্রবাদ, ডেপুটী কালেক্টর প্লাউডেন সাহেব একবার রাজা গিরিশচন্দ্রের সমুদয় সম্পত্তি আটক করেন। ইহাতে রাজসংসারের কিছু অসচ্ছল অবস্থা উপস্থিত হয়। রাজকর্ম্মচারী রামমোহন মজুমদার সকলকেই অহেতুক আশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়া রাখিতেন,—একদিন রসসাগরকেও তিনি ধৈর্য্য ধরিতে বলেন। রসসাগর হতাশ্বাস হইয়া বলেন,—"আর মেনে পারিনে।" রাজা গিরিশচন্দ্রও এই উক্তিতে সায় দিয়া বলেন,—"রসসাগর আর মেনে পারিনে।" রসসাগর অমনি রচনা করিলেন,—

দাড়ী ফেলে শ্রী কেঁদে, শুধু হাড়ী পাত বেঁধে,রেখেছি বচনে ছেঁদে, আশা ভঙ্গ করিনে।
সবে বলে মজুমদার, দয়া ধর্ম্ম কি তোমার, নিরাকার পুরস্কার, তৃণবোধ করিনে॥
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, না মিলে রজত খণ্ড, কোনরূপে কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়াপণ্ড করিনে।
কোম্পানি কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য্য উদয়, প্লৌডনের পূর্ণোদয়, বাঁচিওনে মরিওনে॥
সকলি দুঃখের পাড়া, এ রস সাগরে চড়া, শ্রীচরণ ছায়া ছাড়া, কার ধার ধারিনে।
তিন দিগে তেতম্বা, কি হইবে অপরম্বা, কুল দাও মা জগদম্বা, আর মেনে পারিনে॥

ঠাকুরদাস দত্ত।

ইনি অন্যতম প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার;—বহুযাত্রাসম্প্রদায়ের নানাবিধ পালা-রচয়িতা।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত ব্যাঁটরা গ্রামে ১২০৮ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামমোহন। ইঁহারা দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ।

পিতা রামমোহন কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মে কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার সংসারিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল।

ঠাকুরদাস বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় সুশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তথাকার প্রথানুসারে একজন "মাষ্টার মহাশয়ের" নিকট তাঁহার বাল্য-শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

ঠাকুরদাসের পিতা রামমোহন, পুত্র ঠাকুরদাসকে ফোর্ট উইলিয়মে একটী চাকুরী করিয়া দেন। ঠাকুরদাসের কিন্তু চাকুরী ভাল লাগিল না। আবাল্য সঙ্গীত আলোচনাতেই তাঁহার সমধিক অনুরাগ; বয়োবৃদ্ধির সহিত তাঁহার সে অনুরাগও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অমুক জায়গায় পাঁচালী হইতেছে শুনিলেই, ঠাকুরদাস সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও পাঁচালী শুনিতে যাইতেন,—পাঁচালী শুনিবার জন্য তিনি প্রায়ই আফিস কামাই করিতেন। একদিন তাঁহার পিতা,—ঠাকুরদাসের এইরূপ ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হন,—এবং ঠাকুরদাসকে খড়মের দ্বারা প্রহার করেন। খড়মের আঘাতে ঠাকুরদাসের দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। ঠাকুরদাস সেদিন পিতাকে স্পষ্ট করিয়াই বলেন, "চাকরী আমি আর করিব না,—পরাধীন হইয়া চাকরী করিতে আমি পারিব না।" ইহার পরই ঠাকুর-দাস চাকরী হারাইলেন; কিছুদিন পরে, তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইল।

প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাস এক সখের যাত্রার দল করেন। এই দলে বিদ্যাসুন্দরের পালা অভিনীত হইত। ব্যাঁটরার উমাচরণ মুখোপাধ্যায় এই দলের মালিনী সাজিতেন। বিদ্যাসুন্দর ব্যতীত ঠাকুর-দাসের স্বরচিত লক্ষ্মণবর্জ্জন ও অন্যান্য পালাও গীত হইত। প্রায় তিন বৎসর এই দল চলে।

নিজের দল ভাঙ্গিয়া গেল, ঠাকুরদাস তখন অপরাপর সখের দলে পালা রচনা করিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। সখের দলের জন্য তিনি নিম্ন লিখিত পালাগুলি রচনা করেন,—গজার ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের জন্য বিদ্যা-সুন্দর, টাকীর জমিদার বৈকুণ্ঠনাথ রায় চৌধুরীর সখের দলের জন্য *বিদ্যাসুন্দর; এই দুইটী পালাই পৃথক্*,—বিশেষতঃ টাকীর পালার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে অশ্লীলতাবর্জ্জিত গান বাঁধিয়া দিতে আদিষ্ট হন, এবং তাহাই করেন। হাবড়া-কোণার জমিদার দীননাথ চৌধুরীর সখের দলের জন্য হরিচন্দ্রের পালা। উলুবেড়িয়া—ফুলেশ্বর নিবাসী আশুতোষ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দলের জন্য লক্ষ্মণবর্জ্জন; হাবড়া-শিবপুর নিবাসী উমাচরণ বসু মহাশয়ের সখের দলের জন্য শ্রীবৎসচিন্তা। পেশাদারী দলের জন্য তিনি নিম্নলিখিত পালা সমূহ রচনা করেন,—কলিকাতা-হাড়কাটার বিখ্যাত যাত্রাকর দুর্গাচরণ ঘড়িয়ালের দলের জন্য নলদময়ন্তী, কলঙ্কভঞ্জন ও শ্রীমন্তের মশান। এই দুর্গাচরণের দলেই লোকনাথ দাস ও কালী-নাথ হালদার নামক দুইজন মধুরকণ্ঠ গায়ক ছিল। দুর্গাচরণের পরে ইঁহারা দুইজনেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যাত্রার দল করেন। লোকাধোপা ও কালীহালদারের যাত্রার নাম দিগন্ত-বিস্তৃত। ইঁহারা উভয়েই প্রথমোক্ত তিনটী পালাই গাহিতেন,—শেষে কালীনাথ,—ঠাকুর দাসের নিকট হইতে রাবণ বধ নামক আর একটী পালা লিখাইয়া লন। হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী রিষড়ার কৈলাসচন্দ্র রায়ের জন্য ঠাকুরদাস এক বিদ্যাসুন্দরের পালা রচনা করিয়া দেন। হাবড়া-মাকড়দহের বেণীমাধব পাত্রের জন্য অক্রুর আগমন ও দুর্গামঙ্গল। সাধু ও বোকোর দলের জন্য লবকুশের পালা, কোণার গোপীনাথ দাসের জন্য রামচন্দ্রের দেশাগমন, কলিকাতা-বাগবাজারের ঋড়ু অধিকারীর জন্য অক্রুর আগমন ও রাবণ-বধ পৃথক্ রচিত হয়।

অতঃপর ঠাকুরদাস স্বয়ং এক পাঁচালীর দল করেন। অতি অল্প-দিনেই এই পাঁচালীর দলের সুখ্যাতি বহু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বহু সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে, সাতক্ষীরা, উলা, বড়িসা, গজা, মালঞ্চ, কলিকাতা-পাইক-পাড়া, নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, হালিসহর, বাঁশবেড়িয়া, তারকেশ্বর

প্রভৃতি বহু স্থানে এই পাঁচালীর গাহনা হয়। কবি ঠাকুরদাস সর্ব্বত্রই অশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, রামের দেশাগমন, অক্রুর আগমন, শিব বিবাহ, দান, মাথুর, মান, পারিজাতহরণ, ধ্রুবচরিত্র এবং প্রেম—বিরহাদি নানা বিষয়ক বহু পালা রচনা করেন। গান অসংখ্য।

১২৮৩ সালের ২১শে বৈশাখ ঠাকুরদাসের দেহান্তর হইয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র, এক কন্যা।

ঠাকুরদাসের রচিত, পালা আমরা দেখি নাই, তবে তাঁহার অনেক গুলি সঙ্গীত অদ্যাপি অনেকেই বিদিত। দুর্গাচরণ বড়িয়াল, লোকনাথ দাস ও কালী হালদারের যাত্রাদলের সেই,—"এই যে ছিল কোথায় গেল, কমলদল বাসিনী" গানটী কাহার জানেন? সেটি এই ঠাকুর-দাসেরই রচিত। এই গানটী আজ একবার শুনুন,—

ললিত-বিভাস-আড়াঠেকা।

"এই যে ছিল, কোথায় গেল, কমলদল বাসিনী।
লোক-লাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশি-বদনী॥
কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথায় লুকালো সে করী,
এ মায়া বুঝিতে নারি, সে নারী কার রমণী॥
যে দেখেছি কালীদয়ে, জাগিছে রূপ হৃদয়ে, অপরূপ এমনি মেয়ে দেখেনি কোথায়।
এখন সে কালীদয়, হেরি সব শূন্যময়, কেবল জলে জলময়, কোথায় সে করীধারিণী॥

সুপ্রসিদ্ধ যাত্রাকর লোকনাথ দাস (লোকাধোপা) যখন স্বয়ং এই গানটী গাহিতেন, তখন শ্রোতৃগণের শরীর রোমাঞ্চিত হইত!

এ গানটিও ঠাকুরদাসের,—

বিভাস আড়খেমটা।

তোর রাজার কি রাজ্য, করিস্ তার কি মাৎসর্য্য, আমার মায়ের ঐশ্বর্য্য কি তা জান না।
জান না রাজ্যখণ্ড, শুন রে পাষণ্ড, ব্রহ্মাণ্ড আমার মায়ের বদনে,
বিধি যার আজ্ঞাকারী, কুবের যার ভাণ্ডারী, ত্রিপুরারি করেন মায়ের সাধনা॥
চরণে দিলে বল, ধরা যায় রসাতল, মহাপ্রলয় হয় কেহ বাঁচে না॥

দাশরথি রায়।

দাশরথি রায়ের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার আড়াই ক্রোশ দক্ষিণ বাঁধমুড়া গ্রামে। সন ১২১২ সালের মাঘ মাসে দাশরথি রায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দেবীপ্রসাদ রায়, পিতামহের নাম জগন্নাথ রায়, মাতার নাম শ্রীমতী দেবী। দেবীপ্রসাদের চারি পুত্র; প্রথম ভগবানচন্দ্র, দ্বিতীয় দাশরথি, তৃতীয় তিনকড়ি, চতুর্থ রামধন। রামধন বাল্যকালেই গতাসু হয়েন। তিনকড়ি,—দাশরথির নিকট বাস করিতেন।

শৈশবকালে দাশরথি বাঁধমুড়া গ্রামে ধূলাখেলায় অতিবাহিত করেন। পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের সময় তিনি মাতুলালয়ে যান এবং মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তীর যত্নে পালিত হয়েন। তাঁহার মাতুলালয় বর্দ্ধমানই জেলারই অন্তর্গত পীলাগ্রামে। কবি এ বিষয়ে স্বয়ং পরিচয় দিয়াছেন যথা,—

"গ্রাম-নাম বাঁধমুড়া, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ চূড়া, দেবীপ্রসাদ দেবশর্ম্মা নাম।
অহংদীন তত্তনয়, পীলায় মাতুলালয়, ইদানী মাতুল-ধামে ধাম॥"

দাশরথির প্রথম বিদ্যাশিক্ষা পীলার পাঠশালায়। ঐ গ্রামের নীল-কুঠির কর্ম্মচারীবর্গের নিকট ও বহরা গ্রামের হরকিশোর ভট্টাচার্য্যের নিকট তিনি কিছু ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সময় হইতেই তাঁহার প্রতিভা অন্যদিকে ধাবিত হয়। তিনি ঐ সময় হইতেই কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই একখানি গীত রচনা করিয়া দিতে আরম্ভ করেন। কিছুদিবস পরে পীলাগ্রাম নিবাসিনী অক্ষয়া পাটনীর কবির দলে তিনি গান ও ছড়া বলিয়া দিতে থাকেন। মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তী দাশরথির এই ব্যবহারে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রতি-নিবৃত্ত হইবার জন্য বিশেষরূপ শাসন করেন, কিন্তু তিনি দাশরথির কিছুতেই মনের গতি ফিরাইতে পারিলেন না, অবশেষে তিনি অনন্তপুর-

নীলকুঠিতে দাশরথিকে একটী তিন টাকা মাহিনার কেরাণীগিরী চাকরীতে নিযুক্ত করিয়া দেন। এ সম্বন্ধে আরও বিবরণ এইরূপ,—

"দাশরথি প্রথমে কবির দলের মুহুরী ছিলেন। বিজনগরা গ্রামে (কাটোয়ার ২ ক্রোশ দক্ষিণে) একবার তিনি কবির দল লইয়া গান করিতে যান। প্রতিপক্ষ করজগ্রাম নিবাসী রামপ্রসাদ স্বর্ণকার সভামধ্যে দাশরথিকে কটু কথায় গালি দেয়। দাশরথি যদিও যথাকালে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন বটে, কিন্তু গান শেষ হইলে দাশরথি রায়ের পুরোহিত ৺কেদারনন ভট্টাচার্য্য (বিজনগরা নিবাসী) দাশরথিকে ডাকিয়া বলেন যে,—"তুমি ব্রাহ্মণ-সন্তান, তোমার এ কাজ কেন? তুমি যে পরের কাছে অকথায় কুকথায় গালি খাও, তাহা শুনিতে আমাদের বড় কষ্ট হয়। তুমি গলায় দড়ি দিয়া মরগে, ইত্যাদি"। দাশরথি বড় লজ্জিত হইলেন; সেইখানেই তিনি কবির ছড়া-বহি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—তিনি এ কাজ আর করিবেন না। মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তী এ সকল কথা শুনিয়া দাশরথিকে পীলা মোকামে লইয়া যান। রামজীবন তখন কাষ্ঠশালী, দমদমা প্রভৃতি কুঠীর দেওয়ান। রামজীবন দাশরথিকে কাষ্ঠশালী কুঠিতে একটী সামান্ত কর্ম্মে মাসিক ৩৲ বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন।"

দাশরথি নীলকুঠিতে ঢুকিয়া সর্ব্বদাই ভুল করিতে লাগিলেন; তিনি সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া থাকিতেন; তাহা দেখিয়া কুঠির ম্যানেজার তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া বিদায় দিলেন। দাশরথি আহ্লাদের সহিত এই বিদায়কে পুরস্কার জ্ঞানে পুনরায় অক্ষয়ার দলে প্রবিষ্ট হইলেন। দাশরথি কবির গানে এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন কেন, তাহার কারণ নিম্নে লিখিতেছি।

তাঁহার মাতুলালয় পীলাগ্রামে নীলকণ্ঠ হালদার নামক জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যৎসামান্য অনুপ্রাস যোজনা করিয়া অশ্লীল শব্দে ও ভাবে গান রচনা করিতেন এবং ইহাতেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইতেন।

এই সময় দাশরথি, টপ্পা ও কবি এবং কতকগুলি কালী কৃষ্ণ বিষয়ক গীত রচনায় অনুপ্রাসের অনুসন্ধানে এই সময় ক্রমে ক্রমে নীলকণ্ঠ হালদারের প্রতিযোগী ও প্রতিষ্ঠার অংশী হইয়া উঠিলেন, তখন দাশরথির মনে মনে আহ্লাদের সীমা রহিল না।

তখনও দাশরথি মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তীর সম্পূর্ণ অধীন। দাশরথি

যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ঐ ব্যবসায় সমাজে অতিশয় নিন্দনীয় ছিল; এইজন্য রামজীবন চক্রবর্ত্তী দাশরথিকে বিশেষ শাসনে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দাশরথিকে নীলকুঠিতে চাকুরি দেওয়ার কারণ ইহাই এবং এই চাকুরি দেওয়ায় পর হইতে তিনি একরূপ ঐ চিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। ভাবিতেন, দাশরথির এইবার সুমতি হইবে;—দাশরথি আর কবিগান করিতে যাইবেন না; কিন্তু দাশরথির মনে কবির গানের চিন্তাই বলবতী। তাহারই ফলে কুঠির চাকরীর সময়ে অক্কয়ার দলের যখন বায়না হইত, তখন অক্কয়া গোপনে গিয়া দাশরথিকে লইয়া আসিত; দাশরথি রাত্রিতে গান করিয়া প্রাতে কুঠিতে গিয়া উপস্থিত হইতেন। ক্রমে রামজীবন এই সংবাদ জানিয়া কুঠির ম্যানে-জারকে দাশরথিকে বিশেষ শাসনে রাখিতে পত্র লিখিয়াছিলেন। ম্যানেজার সেইজন্য বিশেষ শাসন করিয়া যখন নিতান্তই বশে আনিতে পারিলেন না তখন তাঁহাকে, বিদায় দিলেন। রামজীবন এই বিদায় দেওয়ার সংবাদ প্রায় পনর দিবস পরে জানিতে পারিয়া, দাশরথির অনু-সন্ধান করিয়া জানিলেন, পীলার নিকট কোন একখানি ক্ষুদ্রগ্রামে দাশরথি একখানি ভাড়াটিয়া ঘরে থাকেন ও সেই স্থান হইতেই গান গাইতে গমন করেন। রামজীবন কয়েক জন লোকসহ তথায় গিয়া দাশরথির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহাকে বাটী লইয়া আসেন এবং ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট তাঁহাকে গিয়া কবির দল ছাড়িয়া দিবার জন্য যথেষ্ট উপদেশ দেন। ভৈরব-চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশে সে কজন গণ্যমান্য বিদ্বান লোক ছিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে, দাশরথি তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, তখন তিনি বলিলেন,—"যাও, অদ্য হইতে তোমার মুখ দেখিব না।" দাশ: রথিও "এ মুখ দেখাইবার নয়" বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেই সময় হইতে প্রকাশ্যভাবেই কবির দলে গান করিতে যাইতে লাগিলেন এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামেও কবি গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রতিপক্ষে পুরুষোত্তম বৈরাগ্য (ইহার নিবাস কাজিকাপুর) এবং

জামড়ানিবাসী নিধিরাম সাহা (শুড়ী) ছিলেন। ইহাদের দুই জনের দুইটী কবির দল ছিল। অনেক সময় দাশরথি ইহাদের সহিত প্রতিবাদী হইয়া কবি গান গাইতেন। পুরুষোত্তম,—দাশরথিকে এক দিবস এইরূপ ছড়ার দ্বারা বিদ্রূপ করিয়াছিলেন,—

"আমার গানের গুরু, কল্পতরু, গুরুর তুল্য গণি।
হাঁরে পাগল হয়েছিস, ছাগল মধ্যে, আসরে নাম্‌বেন তিনি ॥"

ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন ;—

"তিন পোনের বেনে বেটে পুরো কল্পতরু।
তিন কড়া যার মূল্য তার তুল্য করিস হরু ॥"
পুরোর নিজের মুরাদ তিন কড়া, শিষ্য দিয়ে বগান ছড়া,
যেমন কানার ঠেঙ্গা ধরা, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে।
বড় কর্ম্ম মহাশয়, ঢাকির একজন ঢাক বয়,
লাঙ্গলের একজন জোতালে যায় মাঠে ॥
বুনো কুলীতে হাউজ গাঁজে, তার একজন তামাক সাজে,
শুনে লাজ পাই। * * * * * *
ও কুড়ানীর বেটা নিড়ানী হাতে, ভুয়ে ছাড়ে হুড়ো" ইত্যাদি।

জামড়া নিবাসী নিধিরাম সাহার সহিত অনেক স্থানে দাশরথির কবির গানের উত্তর প্রত্যুত্তর হইত। একদা এইরূপ ভাবে উভয়ের ছড়ার জবাব হইয়াছিল ;—

দাশরথির দলের মুহুরি গুরুদাস ঘটককে সম্বোধন করিয়া নিধিরাম বলিয়াছিল ;—

"গুরুদাস তুমি দলের জাসু, তোমার দাশু দাদা কই
* * * এই যে দলের মহারথী, মহামান্য দাশরথি,
হাঁ হে দাশু! আমরাই বটি তুল্য পশু।
তুমি ব্রাহ্মণের ছেলে, সন্ধ্যা আহ্নিক কর্‌বে,

ভাগবত ভারত পড়বে, নিমন্ত্রণে যাবে, লুচি মণ্ডা খাবে,
খড়া খড়ি বিদায় পাবে, অথবা চাকরি করবে। * * *
তোর পনের বিঘা জমি, তার পনের বছর নাই খাজনা।
হাঁরে দেশো, তোর কোন্ পুরুষে দেখেছে জগঝম্প বাজনা।" ইত্যাদি

ইহাতেও দাশরথি কবি গান ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

এক দিবস পুরুষোত্তম দাশরথিকে এইরূপ ছড়ায় বিদ্রূপ করেন ;—

"ধন্যরে গৌরাঙ্গ ভাই শচী পিসীর ছেলে। তুমি হাড়ি মুচি বৈদ্যবামুন একত্র মিশালে।
তুমি দিলে হরিনাম, জীবের হয় মোক্ষধাম, অনায়াসে তরে ভবনদী।
এখন কোন বৈরাগির হরিনামের কোমড়া কুমুড়ি, সার রয়েছে ধোমড়া ধুমড়ি,
ছত্রিশ জেতে মালশা ভোগ খায় চিড়া দধি ইত্যাদি।

বৈরাগীদের নিন্দার উত্তরে পুরুষোত্তম বলিয়াছিলেন ;—

ইনি কুলের গরব করে নিত্যি, শুনে গলে যায় পিত্তি,
মামা যার চক্রবর্ত্তীর—পিতা যার রায়।
তিনি আবার দিয়ে বেড়ান্ বৈকুণ্ঠের দায়" ইত্যাদি।

উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন ;—

"ডালে বসে হনুমান, ক'রে বলেন অনুমান—দাশরথি গৌরাঙ্গ-দ্বেষী।
আমি নহি অচৈতন্য, ধরামান্য শ্রীচৈতন্য, সদা তার পদ অভিলাষী॥
সদাশিব গুণমণি, বৈষ্ণবের, শিরোমণি, বৈষ্ণব ভবানী যার ঘরে।
বৈষ্ণব নারদ শুক-শুনে গুণ জন্মে সুখ, বৈষ্ণবের নিন্দা কেবা করে"॥ ইত্যাদি।

যাহা হউক, এইরূপ কবি গান করিতে গিয়া দাশরথি প্রায়ই প্রতি-পক্ষের নিকট মন্দ ভাষায় গালি খাইতেন। তাঁহার মাতুল এবং পিতা শুনিয়া যারপর নাই দুঃখিত হইয়া, একদা উভয়ে একত্র বসিয়া দাশরথিকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা বলিলেন ;—

"বৎস দাশরথি! আমি তোমার ধনবান্ পিতা নহি সত্য, কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুত্র সমীপে কি দরিদ্র পিতার হিতকথা গ্রাহ্য হয় না? তুমি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাহা বিশুদ্ধ বংশ ; এ বংশে কোন ব্যক্তি কখন অসৎকর্ম্ম বা অসৎ ব্যবসায় করে নাই। তুমি বংশের পুরাবৃত্ত অবশ্যই জ্ঞাত আছ, অতএব এ কার্য্য ত্যাগ কর। তোমার মাতা শ্রীমতী

দেবী পুণ্যবতী ছিলেন, সে তোমার এই সমস্ত মন্দ কাজ শুনিবার অগ্রেই স্বর্গে গিয়াছেন।" মাতার কথা শুনিয়া, জানি না কেন, আজ দাশরথি হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং পিতাও মাতুলের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি আর কবির দলে যাইবেন না। এত দিবস পরে দাশরথির ভবিষ্যতে কবি দাশরথি রায় বলিয়া ভারতে বিখ্যাত হইবার সময় আসিল। তিনি আর কবিগানের নাম পর্য্যন্ত করিতেন না।

ইহার পর ১২৪২ সালে ৩০ বৎসর বয়সে দাশরথি পাঁচালী রচনা ও পাঁচালী গান গাহিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিনি যে সকল গান রচনা করিতেন, তাহা প্রায় যৎ তালে লিখিত, এইজন্য লোকে তাঁহাকে "যতো দাশু" বলিত। দাশরথি পরিণত অবস্থায় যে গানগুলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উচ্চ অঙ্গের এবং কবিত্বপূর্ণ, তাঁহার পাঁচালীই ইহার প্রমাণ দিতেছে। এই সময় হইতেই দাশরথির পাঁচালী দলের প্রতি রাত্রির বায়না পাঁচ ছয় টাকা হইতে লাগিল। তিনি মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া, ঐ গ্রামে একটী পৃথক বাটী প্রস্তুত করিলেন।

১২৪৪ সালে ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম প্রসন্নময়ী। ইনি মঙ্গলকোটের নিকট সিঙ্গতু গ্রাম নিবাসী ৺ হরিপ্রসাদ রায়ের কন্যা। কথিত আছে, বিবাহ রাত্রিতে পাত্রের সহগামী ব্যক্তিগণ দুই দল হইয়া কবি ও পাঁচালী গান গাহিয়া, সমস্ত রাত্রি আমোদে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। রজনীকালে কন্যাপক্ষীয় কতিপয় লোক কবিবর দাশরথিকে একটি নূতন ছড়া রচনা করিতে অনুরোধ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ একটী ছড়া রচনা করিয়া বলেন। আক্ষেপের বিষয়, আমরা উহার সকল অংশ পাই নাই। যে অংশ মাত্র পাইয়াছি, তাহাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম ;—

"অতি ছার রাঢ় দেশ, কি কহিব সবিশেষ, বলতে লজ্জা মানসে উদয়।
ধর্ম্মহীন কদাচার, যে সব দেখিনু তার, বর্ণনে বিবর্ণ বর্ণ হয়॥
গ্রাম মধ্যে যত যেবা, বাড়ি পাছু তত ডোবা, কঞ্চি পোতা কলমির বন।
গ্রামেতে মণ্ডপ ঘর, ছাটুনী কেবল সর, নাড়া ছাওয়া নেয়াজী বন্ধন॥
ফলাহারের কিছু কই, জলবৎ তরল দৈ, ওখড়া আর বোখড়া ধানের চিড়ে।

খেয়ে বলে বেশ বেশ, দিয়েছিল সন্দেশ, পানের খিলি কলার পাত্তায় মুড়ে।
রোহিত মৎস্য পেলে পরে, তেতুলের অম্বলে ছাড়ে, উপকরণ হয় জে দা ভাতে।
তৈল করে অনুপান, করেন মুড়ি জলপান, কুলবধূ হলুদ মাখেন গা'তে॥"

দাশরথি রায় মহাশয়ের পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী অতিশয় গুণবতী ছিলেন। তাঁহার পতিভক্তি অতুলনীয় ছিল।

এই সময় হইতে দাশরথির পাঁচালী গানে অর্থার্জ্জন অধিক পরিমাণে হইতে আরম্ভ হইল; তাঁহার যশের কথা শ্রীনবদ্বীপ ধামের পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট প্রচারিত হইল। দাশুরায় তাঁহাদের নিকট আহুত হইলেন। তথায় গান করিয়া দাশু নবদ্বীপবাসীদের চিত্তাকর্ষণ করিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে তথায় আহুত হইতে থাকিলেন। ক্রমে দাশরথির যশ-বার্ত্তা বঙ্গদেশের সকল স্থানেই প্রচারিত হইল, বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিল; দাশরথির অর্থোপায়ও বিলক্ষণ হইতে লাগিল। এই সময়ে কাশীমবাজারের রাজভবনে অনেকসময় পাঁচালী গান হইত। মুর্শিদাবাদ জেলায় দাশরথি বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। প্রতিবৎসর রাসের সময় ইনি শ্রীধাম নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের অনুরোধ রক্ষা করিতেন। এমন শুনা যায়, রাসের পূর্ব্বে দাশরথির শারীরিক সুস্থতার জন্য পণ্ডিতগণ দেবার্চ্চনা করিতেন, এবং গান শুনিয়া প্রচুর পরিমাণে অর্থাদি দ্বারা কবিকে পরিতুষ্ট করিতেন। তাঁহারা দাশরথির বড়ই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি গাইতেছিলেন;—

"দোষ কারু নয় গো মা, আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি গো শ্যামা।
ষড়রিপু হল কোদণ্ড স্বরূপ, পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ॥" ইত্যাদি।

কবি এখানে "কোদণ্ড" কোদালি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু উহার অর্থ ধনুক। একব্যক্তি ঐ সম্বন্ধে দোষারোপ করিয়াছিলেন শুনিয়া, মহামহোপাধ্যায় শ্রীরাম শিরোমণি বলিয়াছিলেন," উহা যখন দাশরথির মুখে বাহির হইয়াছে তখন উহা কোদালি অর্থেই ধরিয়া লইতে হইবে। বঙ্গভাষার এখনও অনেক অভাব আছে, উহা এখনও একটী সম্পন্ন-ভাষা হয় নাই, কবিপ্রযুক্ত শব্দ দ্বারা উহার পুষ্টি সাধিত হইয়া ক্রমে উহা সম্পন্নতা লাভ করিবে। অদ্য হইতে বাঙ্গলা অভিধানে "কোদণ্ড" অর্থে 'কোদাইল' দাশরথি রায়ের প্রয়োগ বলিয়া লিখিত

হউক।" ইহা সাধারণ সৌভাগ্যের কথা নহে! দাশরথি সেই জন্য এই ভ্রমটী সংশোধন না করিয়া ঐরূপই রাখিয়াছেন।

রাবণবধ পাঁচালীতে তিনি নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের নাম কৌশলে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যথা;—

"আমার নাম জানে বিশ্ব শ্রীরামশিরোমণির শিষ্য,
লক্ষীকান্ত ন্যায়ভূষণের ছাত্র।" ইত্যাদি

দাশরথির পাঁচালীগানের ব্যবসায়ের সময়েও, অনেক অধ্যাপক পণ্ডিত নবদ্বীপের অঙ্কে বিরাজিত ছিলেন এবং সেই জন্য ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাঙ্গালা-দেশের অনেক স্থান হইতে অনেক বিদ্যার্থী বিদ্যা শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আগমন করিত। বিদ্যার্থিগণ যখন নিজ নিজ বাসস্থানে গমন করিতেন, তখন তাঁহারা আপন আপন গ্রামে দাশরথির পাঁচালীসঙ্গীতের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতেন এবং সেই সেই স্থানের ভদ্র মহোদয়গণও, দাশরথির পাঁচালীসংগীতের দল বায়না করিতেন। সেই জন্য বর্দ্ধমান ও কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থানে দাশরথির গান হইতে লাগিল। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বাহাদুর এবং কলিকাতার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার গান শুনিয়াছিলেন; দুই স্থানেই দাশুরায় বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া আশার অতীত পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে দাশরথি শিবিকায় গমনাগমন আরম্ভ করেন। পীলায় তাঁহার মাটীর ঘর ছিল; তাহার স্থানে তিনি ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করেন, শ্রীশ্রীবিষ্ণু ও শ্রীশ্রীশিব প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সময় দাশু-রায় প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি কোন কোন বৎসর শ্রীশ্রীদুর্গা ও শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা করিতেন; যে বৎসর তাঁহার ভাগ্যে সেরূপ সৌভাগ্য ঘটিত, সে বৎসর শরৎকালে নিজে গান গাহিতে না গিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়িকে পাঠাইয়া দিতেন।

দাশরথিরায় চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তিনি নিজে ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দরিদ্রগণকে দাতব্য চিকিৎসা করিতেন ও সুপথ্য কর দ্রব্য নিজে দিতেন। এইটী তাঁহার মহানুভাবতার একটী বিশেষ পরিচয় স্থল।

দাশরথির পুত্র সন্তান হয় নাই, একটীমাত্র কন্যা হইয়াছিল। কন্যার

নাম কালিকাসুন্দরী, কন্যাটি কৃষ্ণবর্ণা বটে কিন্তু লাবণ্যময়ী। শুনিয়াছি, তাঁহার বর্ণানুরূপ কালিকাসুন্দরী নাম রাখা হইয়াছিল। কন্যার নবদ্বীপে বিবাহ হইয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—দাশরথির সঙ্গীতের ব্যবসায়ের জন্য পীলার ভৈরবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সাতিশয় অসন্তুষ্ট ছিলেন। একদা দাশরথি, চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাবুদের বাটীর যুবকগণের উৎসাহে শ্রীরামচন্দ্র ঠাকুর জীউয়ের বাটীতে পাঁচালী গান আরম্ভ করেন। ঐ দিবস প্রথমে শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন পাঁচালীর গান হয়, প্রথমে ভৈরব বাবু অন্তরাল হইতে শুনিয়া আর গোপনে থাকিতে পারিলেন না। তিনি আসিয়া সঙ্গীত-সভায় উপবেশন করিলেন, এবং গীত শ্রবণে মোহিত হইয়া দাশরথিকে আলিঙ্গন করিয়া "নিজের গাত্র হইতে মূল্যবান শাল জোড়াটী দাশরথির গাত্রে দিয়া বলিলেন, আর "আমি তোমার ব্যবসায়ের প্রতিবাদী নহি, তোমা হইতে আমাদের গ্রামের নাম সকল স্থানেই পরিচিত হইবে এবং তুমি একজন মহাকবি বলিয়া বঙ্গের সকলের নিকট আদরণীয় হইবে।"

দাশরথি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলেন,—"অদ্য আমি ধন্য হইলাম।"

এক বৎসর আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে দাশরথি প্রবল জ্বর-বিকারে জীবনে হতাশ হয়েন এবং নিম্নলিখিত গানটী রচনা করেন;—

রাগিনী বাগেশ্রী—তাল একতালা।

"একি বিকার শঙ্করি! তরি—পেলে কৃপা ধন্বন্তরি।
অনিত্য গৌরব সদা অঙ্গে দাহ, আমার কি ঘটিল মোহ!
ধন-জন-তৃষ্ণা না হয় বিরহ, কিসে জীবন ধরি॥
ওমা! অনিত্য আলাপ, কি পাপ প্রলাপ, সতত গো সর্ব্বমঙ্গলে!
মায়ারূপ কাক-নিদ্রা সদা দাশরথির নয়ন যুগলে,—
হিংসা-রূপ হ'ল সেই উদরে ক্রিমি, মিছে কাজে ভ্রমি, সেই হল ভ্রমি,
এ রোগে কি বাঁচি, তন্নামে অরুচি, দিবস-শর্ব্বরী॥"

এই পীড়ায় দাদুপুর নিবাসী অন্ধ কালীদাস কবিরাজ চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তাঁহার চিকিৎসায় দাশরথির এ যাত্রা জীবন রক্ষা হইয়াছিল।

এই কবিরাজ মহাশয় দাশরথির সর্ব্বাঙ্গে হস্ত-মার্জ্জনা ও নাড়ী-পরীক্ষা করিয়া রহস্যপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,—"এক্ষণ পর্য্যন্ত দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের শ্রবণ-সুখ বিষয়ে দুর্ভাগ্য ঘটে নাই, দাশরথি এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন, আমি অন্ধ এবং চক্ষুহীন চিকিৎসক; দাশরথির বিকারও দন্তহীন-বৃদ্ধ, অস্থি চর্ব্বণ করিতে অক্ষম, মেদ মাংস হইলে তাহার সুখভোজ্য হইত।" কবিরাজের এ কথার অর্থ এই যে, দাশরথি অতি।ক্ষীণদেহ ধারণ করিয়াছিলেন; মাংসল বা হৃষ্টপুষ্ট ছিলেন না। হৃষ্টপুষ্ট হইলে বোধ হয়, সে। যাত্রা তিনি রক্ষা পাইতেন না।

দাশরথি রোগমুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু ভ্রাতা তিনকড়ি সামান্য কারণে তাঁহার মনে কষ্ট দিতে লাগিলেন। দাশরথির সহিত তিনকড়ির মনো-বিরাগ ক্রমেই বাড়িল; দাশুরায় পৃথক্ বাটী নির্ম্মাণ করেন, ইহা দেখিয়া একজন লোক দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"এ বাড়ীটী কেন হইতেছে?" তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—এটী "বাড়াবাড়ি"।

শুনিয়া লোকটী বলিয়াছিল, 'ইহার অর্থ কি?' তদুত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন, "আমার ভাই তিনকড়ি, তার সকল কাজেই বাড়াবাড়ি, তাই হল একটা বাড়া বাড়ী।" এই সময়ে তিনকড়িও ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দাদার এই কথায় বলিয়াছিলেন, "আমি আর পৃথক্ হইব না।" দাশরথির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভগবানচন্দ্র রায় বাঁধমুড়াগ্রামে পিতৃভবনে বাস করিতেন। তাঁহার রামতারণ ও ভবতারণ নামে দুইটী পুত্র ছিল। দাশরথির মাতা—পূর্ব্বে অর্থাৎ দাশরথি যখন নীলকুঠীতে চাকরি করিতেন সেই সময়েই—ইহধাম ত্যাগ করেন। মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তী এবং পিতা দেবীপ্রসাদ রায়, বহু দিবস জীবিত ছিলেন। সন ১২৮৯ সালে দাশরথির মাতুল রামজীবন চক্রবর্ত্তীর মৃত্যু হয়। তাঁহার চারি পুত্র।

অমানুষিক পরিশ্রমে দাশরথির স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। সহজেই তাঁহার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট ছিল না; তাহার উপর, তাঁহার কাশরোগ ছিল; তাহাতেই অনেক সময় কাতর থাকিতেন। বিশেষতঃ এই জ্বর-বিকারের পর হইতে তাঁহার একটা নূতন রোগ প্রকাশ পাইয়াছিল। প্রবল বায়ু

বহিলেই তাঁহার গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠিত; কম্প উপস্থিত হইত। দাশরথির পাঁচালীর যখন পূর্ণ বিকাশ, সেই সময়ে বঙ্গদেশে কয়েকটী বিষয় সাধারণের বিশেষ আন্দোলনের বস্তু হইয়াছিল; দাশরথি রায়ও উহার আন্দোলন করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না।

১। বিধবার বিবাহ,—পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই বিধির প্রথম প্রবর্ত্তক। কবিবর দাশরথি রায় ঐ সময়ের চিত্রটী পাঁচালীতে অঙ্কিত করিয়া, সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই পাঁচালী ছাপা হয়; দুই একটী গান বাদ পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ঈশ্বর গুপ্তকে লক্ষ্য করিয়া দাশরথি যে গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা প্রশংসাচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর দোষ এবং গুপ্ত কবিকে তিরস্কার-চ্ছলে প্রশংসা করিয়াছিলেন। গানটী ছাপা আছে বলিয়া, কেবল ঐ দুই অংশ মাত্র এখানে দেওয়া হইল,—

'বিধবার দিতে নাগর, গুণের সাগর,
বিদ্যাসাগর গুণ ধরেছেন গুণনিধি।" ইত্যাদি।

"মরুক দেশের অধার্ম্মিকে, বিপক্ষ বিধবা দিকে, জুটেছে এই কথায়,
কলিকাতায় আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত অজেয়ে, নারীর রোগ বুঝে না বৈদ্য হয়ে,
যেমন হাতুড়ে বৈদ্য বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি।" ইত্যাদি।

ইহা ব্যতীত আর একটী গান পাইয়াছি; উহা পুস্তকে ছাপা নাই। গানটী এই;—

"দিলে দুঃখ রাধাকান্ত, কাঁদ্‌ত না তা'তে অবলা।
যদি ভাই না থাকিত, রাধাকান্ত-সুতের জ্বালা॥
তিনি ত গুণের সদন, তাঁর যে পুত্র মদন,
তার জ্বালায় জ্বালাতন,—হয়ে কুল রাখতে নারে কুলবালা।"

২। একবার জনরব উঠিয়াছিল, নবদ্বীপে গোপাল অবতার হইয়াছেন। তিনি অনুমতি করিয়াছেন, কার্ত্তিক মাসের ১৫ই তারিখে মরা মানুষ ফিরিয়া আসিবে। দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, অনেক পুত্রহারা জননী, অনেক বিধবা তাহাদের পুত্র পতি ফিরিয়া পাইবে বলিয়া, ১৫ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করিতে লাগিল। অনেক স্ত্রীলোক

নবদ্বীপে গোপাল-দর্শন ও গোপালের নিকট অর্থ দিয়া পূজা মানসিক করিয়া আসিয়াছিলেন! ক্রমে ১৫ই কার্ত্তিক কাটিয়া গেল, লোকের মোহ-নিদ্রা ভাঙ্গিল। দাশরথি এই সময় এই বিষয়-ঘটিত একটী উৎকৃষ্ট গান রচনা করিয়াছিলেন।

"দিদি! দিন পাব—শুভ দিন হবে—ভেব না।
মরামানুষ আসবে ফিরে, গোল শুনে তাই বলছি তোরে,
গোল হাতে আর কাল কাটাতে হবেনা॥
অনঙ্গ কল্লে কি রঙ্গ * * * *
এ ছুটোমাল যে দুর্গতি, কার্ত্তিক মাসে আসবে পতি,
গোপালের এই অনুমতি, ঘুচবে তোদের একাদশী ধনী লো।"

৩। তাহার পর কিছুদিন গত হইল, বিল্বগ্রামের নিকট আলুনে-কড়কড়ে গ্রামে গঙ্গা উত্তরবাহিনী এবং ত্রিধারা হয়েন। ঐরূপ হইলে বহুতর লোক ঐ স্থানে গঙ্গাস্নান করিতে গমন করেন। বোধ হয়, যে সময়ে এ ঘটনা হয়, তখন চৈত্র মাস; দাশরথি এই ত্রিধারার গান রচনা করেন। গানটী তড়িত বেগে দেশ মধ্যে প্রচারিত হয়। ইহার কতক অংশ এইরূপ,—

"আয় গো কে যাবি সুরধুনীতে,—এ অবনীতে হরবনিতে,—
হলেন উত্তরবাহিনী গঙ্গা পাতকী নিস্তারিতে॥
দ্রবময়ীর কিবা ধারা, ত্রিধারা হয়েছেন তারা,
এমন ধারা দেখি নাই অবনীতে।
আছেন উত্তরবাহিনী নামে, মুক্তিক্ষেত্র কাশীধামে,
শুনিয়াছি বেদ আর পুরাণেতে॥
সে ধাম ত্যাগ করে, এলেন কড়-কড়ে,
তোরা আয়গো দৌড়ে হুপ রে প'ড়ে,—
বালি খুঁড়ে ডুব দিতে॥
কোথায় দেখনহাসি,—আর মনের কথা,
বকুল ফুল আর অন্তরের ব্যথা,
এস মন ঠাণ্ডা করি ত্বরিতে;—
হেদেলো অন্তরের বালি, অন্তরের দুখ তোরে বলি,
মেখে বালি মনের কালী ঘুচাতে॥

ভেবে প্রাণাকুল, আয়লো বেগুনফুল,
চল গঙ্গাজল গঙ্গাজলে অঙ্গ-জ্বালা জুড়াতে॥"

দাশরথি মিষ্টভাষী, সদালাপী, ও মিতব্যয়ী ছিলেন, কখনও কাহারও সহিত বিবাদ করেন নাই। ইহাঁর শারীরিক গঠন নাতিস্থূল নাতিখর্ব্ব ছিল, দেখিতে শ্রীযুক্ত ছিলেন। ইনি শেষ অবস্থায় আহারের পক্ষে সাতিশয় সাবধান হইয়াছিলেন; গুরুপাক দ্রব্য প্রায়ই আহার করিতেন না; বিশেষতঃ হাঁপের পীড়ায় সর্ব্বদা কাতর থাকিতেন। কিন্তু এমন উৎকট পীড় থাকিতেও সদাই তাঁহাকে হাস্যবদন দেখা যাইত; কথায় কথায় রসিকতা প্রকাশ পাইত। দাশরথির রসিকতা কাব্যরসে সিক্ত, তাই উহা এত মধুর। দাশরথির গর্ব্ব ছিল না, হিংসা ছিল না, তিনি পরশ্রী-কাতর ছিলেন না। দাশরথির সমসাময়িক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রসিকচন্দ্র রায় ও ব্রজনাথ রায়; ইহাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। অধিক কি, স্বভাব-কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় এক সময় পীড়িতাবস্থায় জলপথে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতে করিতে পীলায় উপস্থিত হন। তথায় তিনি দাশরথির সহিত রহস্য আলাপে এক দিবস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গুপ্ত মহাশয় দাশরথির সহিত কবিতার উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া বলিয়াছিলেন,—"রায় মহাশয়ের শক্তি আমার হিংসার বস্তু।" ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাটী দাশরথির হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা ছিল।

এইবার আমরা দাশরথির রহস্যপ্রিয়তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি;—

১। ২৪পরগণা গোবরডাঙ্গায় একবার পাঁচালী গান হয়। অপর দলকে ভাল বাসা দেওয়া হইয়াছিল; কিন্তু দাশরথিকে একটী আট-চালা ঘর দেওয়া হইয়াছিল। উপরে অনেক স্থানে ছিদ্র ছিল। তাহাতে তিনকড়ি দাশরথিকে বলিয়াছিলেন,—"এই বাসা কি আমাদের উপযুক্ত?" স্থানীয় লোকে দাশরথির নিকট রহস্য শুনিবার জন্য এইরূপ করিয়াছিল। তাহার পর স্থানীয় লোক বলিয়াছিল, "চলুন আপনার জন্য দালানে ভাল বাসা দেওয়া হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া দাশরথি তৎক্ষণাৎ বলিয়াছিলেন, "এখন প্রকৃতই ভালবাসা হইল।"

২। একদা কোন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা হইতেছিল। কথকগণ সততই রহস্য-

প্রিয় এবং শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। ঐ দিনের আলোচ্য বিষয়ে বানর সম্বন্ধের কোন প্রস্তাব ছিল। দাশরথি কয়েকজন বন্ধুর সহিত কথা শুনিতে আসিতেছিলেন। কথক দেখিয়া বলিলেন "এ যে সব বানর।" দাশরথি উত্তর করিলেন, "সব বানর নয়, কতক বানর"। লিখিতে গেলে কতক লিখিতে হয়, কিন্তু বলিতে হইলে কতক বা কথক দুইই বুঝায়।

৩। এক সময়ে একজন দাশরথির গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনি একজন বক্তা।" উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন, আমি কম বক্তা"। বক্তা অর্থে বাচাল ও ভাগ্যবান পুরুষ। কমবক্তা অর্থে ভাগ্যহীন; যে কোন কাজেরই নহে, অপরার্থে বক্তা যে বেশী বকে অর্থাৎ বাজিল; কম বক্তা অন্য অর্থে যে কম কথা কয়, অর্থাৎ বাচাল নহে।

৪। একদা নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ গান শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—দাশরথি তুমি "সিদ্ধ"। উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন, "আমার এ যাত্রা সিদ্ধতেই গেল, আতপ দেখলাম না।"

৫। একদিন বৰ্দ্ধমানে গোবিন্দ অধিকারীর গান হইতেছিল। দাশরথি গান শুনিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। গোবিন্দ বলিয়াছিলেন, আজ গলাটা ভাঙ্গায় বড় সুবিধা হইল. না। উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন,—আপনার ভাঙ্গা, অপরের নৈকষ্য।

৬। একজন দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করেন,—"নিবাস?" দাশরথি বলেন "শিমুলে"। লোকটী হাসিয়া বলেন,—বাস কোথায়? উত্তরে দাশরথি বলেন,—"পদ্মবেলে।" লোকটী আবার জিজ্ঞাসিল, আপনার বাড়ী কোথায়? দাশরথি বলিলেন,—"রোগের ওঁছায়"। 'রোগের ওঁছায়' কিনা,—পীলায়।

৭। বৰ্দ্ধমান-দেন্হুড় গ্রামের এক পোয়া দূরে বিঘা নামক গ্রামে দাশরথি একবার গান গাইতেছিলেন। ঐ সময়ে এক ব্রাহ্মণ স্থানাভাবপ্রযুক্ত চারিদিকে লোক ঠেলিয়া প্রবেশের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া বেড়াইতেছেন। ইহা দেখিয়া দাশরথি বলিয়াছিলেন, "মহাশয়! আপনি ওরূপ করিয়া কেন গোলমাল করিতেছেন।" তাহাতে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেলেন, একটু স্থান পাইবার জন্য। ইহা শুনিয়া রসিক কবি বলিয়াছিলেন, আপনি যদি "বিঘায়" স্থান না পান, আমি কাঠায় থেকে কি করি বলুন দেখি?" বিঘার মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বাটীতে তাঁহার গান হইতেছিল।

৮। এক সময়ে "জয়দিয়ায়" নিকট দাশুয়ার কোন স্থানে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানসমাধা হইলে এক ব্যক্তি বলিতেছিল, "জয়দিয়ার" মহাশয়েরা কোথায় গেলেন। দাশরথি বলিলেন, "তাঁহারা অনেকক্ষণ জয়দিয়া গিয়াছেন;, অর্থাৎ গান শুনিয়া, জয় দিয়া অর্থাৎ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, আর এক অর্থে জয়-দিয়াগ্রামে গিয়াছেন।

৯। এক স্থানে একজন কথক দক্ষযজ্ঞের কথা কহিতেছিলেন। ঐ স্থানে দাশরথি

যেমন আগমন করেন, কথক রহস্যচ্ছলে দাশরথিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এস বাপু ভূত এস!" সভাস্থ সকলে এই কথা শুনিয়া হাস্য করেন। দাশরথি সভাস্থগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,—"আপনারা একটা ভূতের কথাতে যে হেসে পাগল হলেন; আর দুটো পাঁচটা জুটলে কি হইত, বলিতে পারি না।" কথক শুনিয়া অধোবদন হইলেন।

১০। এক সময়ে দাশরথি গোয়াড়িতে গান গাইতেছিলেন। এমন সময়ে কয়েক জন যুবক আসিয়া বলিল,—"বিরহ গান করিতে হইবে।" দাশরথি বলিয়াছিলেন,—"শেষে হইবে।" তাহাতে তাহারা গান বন্ধ করিয়া দেওয়ায় দাশরথি দুঃখিত হইয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময় কয়েক জন প্রবীণ লোক আসিয়া বলিয়াছিলেন, "রায় মহাশয়! বিমুখ কেন?" দাশরথি বলিলেন,—"মুখ পাই না বলে!" আবার প্রশ্ন—"কেন মুখ পান নাই," উত্তর,—"গোয়াড়ীতে পড়েছি বলে অর্থাৎ গোয়াড়ী ভাল স্থান ব'লে। অন্য অর্থে গো-আড়ি, গরুর আড়িতে পড়েছি ব'লে।

১১। এক দিবস তিনি শ্বশুর বাটী যাইতেছেন; পথিমধ্যে কয়েকজন লোক যুক্তি করিল, "দাশরথি আসিতেছেন, উহাঁর নিকট দুটা রহস্য শুনা যাউক। উহাঁকে বসাইয়া বারম্বার তামাক সাজ—আর হাতে রাখ; দেওয়া হইবে না; তাহা হইলেই একটা যাহউক শুনা যাইবে।" এরূপ স্থির করিয়া তাঁহারা তাহাকে অভ্যার্থনা করিয়া বসাইল; যুক্তিমত কার্য্য চলিতে লাগিল। দাশরথি অবাক্। কিছুক্ষণ পরে একটা গাছের দিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যেন কি ভাবিতে লাগিলেন। লোক গুলি ক্রমে রহস্য শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া বলিল, "রায় মহাশয়! গাছে কি দেখিতেছেন?" রায় মহাশয় অমনি বলিলেন "আর কিছু দেখি নাই, আপনাদের সব কয়টা এইখানেই আছেন কি গাছে দুই একটা আছেন, তাই দেখিতেছি।"

১২। একবার মুকন্দীম পাড়া গ্রামে গানের জন্য তাঁহাকে বায়না করিতে গেলে তিনি বলিয়াছিলেন—"তাই শুনেই মুকন্দীম পায়া হয়ে যাচ্ছে।"

১৩। কথক ধরণীধর দাশরথিকে বলেন, "আপনিও একজন কথক।" দাশরথি বলেন, "আপনি পূর্ণ, আমি কতক।"

১৪। একদিন নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয় বলিয়াছিলেন, "দাশরথি, সঙ্গীতে তুমি শিব তুল্য। উত্তরে দাশরথি বলিয়াছিলেন, "তুল্য কেন, আমি শিবই হ'য়েছি।" তাহাতে শিরোমণি ক্রোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ যে বড় অহঙ্কার। দাশরথি বলিয়াছিলেন, "শিব ত্রিলোচন, আমিও ত্রিলোচন, যদি তাই না হব; তবে শিরোমণি দেখব কেমন করে। মানবের যে দুই চক্ষু আছে, তাহাতে তাঁহার মাথার বস্তু সে দেখতে পায় না, আমি যখন শিরোমণি দেখতে পাচ্ছি, তাঁহার দ্বারা আমার আর একটি চক্ষু থাকা প্রমাণ হচ্ছে। কাজে কাজেই আমার তিন চক্ষু আছে।" এই কথা শুনিয়া শিরোমণি মহাশয় দাশরথিকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন।

১৫। একদিন তাঁহার বাটীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষে দাশরথি বলিয়াছিলেন, "এমন দিন কখন পান নাই; এমন কখন খান নাই।" এ কথা দুটি দুই ভাবেই বুঝায়। এখানে দীন বা দিন দুইই বুঝায়। এমন খাওয়া—ভালও বুঝায়, মন্দও বুঝায়।

১৬। একদা দাশরথি হুড়কডাঙ্গায় গান গাইতে গিয়াছিলেন। গ্রামের লোক গানের মর্ম্ম বুঝিতে পারে নাই। সেই জন্ম তাঁহার গান বন্ধ করিয়া দিয়া তাহারা অনেকে গানে অনভিমত প্রকাশ করে,—ইহা শুনিয়া দাশরথি তৎক্ষণাৎ একটী কথা বলেন, উহার একটু অংশ মাত্র পাইয়াছি,—

"যে ভাগীরথ গঙ্গা আন্‌লেন ত্রিভুবন ধন্তে।
তা ৺আবার খেদ রইলো পুকুর-প্রতিষ্ঠার জন্যে।
যার বিয়েতে কুলো ধল্লেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি।
তার বিয়েতে এয়ো হলোনা আকালে হাড়ীর মাসি॥
নদে শান্তিপুরে যার জয় রব।
হুড়কডাঙ্গায় হার হল তার হরির ইচ্ছা সব॥"

১৭। কোন সময়ে দাশরথি ও কয়েক জন লোক বসিয়া আছেন, এরূপ সময় একটি লোক তথায় উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়ের নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, আমার নিবাস কুলে শুশুনী। তৎপরে সেই লোকটী প্রশ্ন কারীকে জিজ্ঞাসা করায় দাশরথি উত্তর করিলেন, ইহার নিবাস তেঁতুলে কলমী। কুলেশুশুনী একটী গ্রামের নাম এবং কুল ও শুশুনী শাক বুঝায় ঐরূপ তেঁতুলে কলমী একটী গ্রামের নাম এবং তেঁতুল ও কলমী শাক বুঝায়। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার নিবাস তেতুলে কলমী নহে; কুলে শুশুনীর নাম শুনিয়া দাশরথি ঐরূপ রহস্য পূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন।

দাশরথির জীবনকালে পাটুলীগ্রামে ও উহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে কর্ত্তাভজা দলের কিছু আধিক্য হইয়াছিল। কবি তাহাদের কীর্ত্তির সম্বন্ধে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।

১২৬৪ সালের আশ্বিন মাসে দাশুরায় কাশীমবাজারে শ্রীশ্রীদুর্গা-পূজায় গান করিতে যান। তথা হইতে তিনি জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া পীলায় আগমন করেন। শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার পূর্ব্ব দিবস চতুর্দ্দশী তিথির প্রভাতে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পীড়া বৃদ্ধির অবস্থায় আসন্ন-কাল বুঝিতে পারিয়া দাশরথি নিজেই গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করেন।

দাশরথির মৃত্যু-সময় গঙ্গাতীরে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একজন গায়ক তাঁহারই রচিত একটী গান গাহিয়াছিলেন।

দাশরথি গান শুনিতে শুনিতে গঙ্গা দেখিতে লাগিলেন; ক্রমে কণ্ঠ জড়তা প্রাপ্ত হইল; মৃত্যুর শেষ লক্ষণ দেখা দিল; ঈশানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বঙ্গের উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিল। দাশরথি ১২৬৪ সালে ২রা কার্ত্তিক কৃষ্ণপক্ষ চতুর্দ্দশী তিথিতে ইহলোক ত্যাগ করেন।

দাশুরায়ের কবিত্ব সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ভট্টপল্লী নিবাসী মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন,—"৺ দাশরথি রায়ের কবিত্বে আমি চিরমুগ্ধ। আমি ত অতি সামান্য ব্যক্তি, নবদ্বীপের তাৎকালিক সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ৺শ্রীরাম শিরোমণি ৺ মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, ভাটপাড়ার বৃহস্পতি তুল্য ৺ হলধর তর্কচূড়ামণি, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ নৈয়ায়িক প্রবর ৺ যদুরাম সার্ব্বভৌম, কাব্যালঙ্কার পুরাণাদিতে বিশেষ অভিজ্ঞ কবিকুলতিলক ৺আনন্দচন্দ্র শিরোমণি, অলঙ্কার সাহিত্যে অদ্বিতীয় ৺ জয়রাম ন্যায়ভূষণ, ত্রিবেণীর পণ্ডিত প্রধান ৺রামদাস তর্ক বাচস্পতি প্রভৃতি জগন্মান্য প্রাচীন যত অধ্যাপক তৎকালে ছিলেন, সকলেই দাশরথির গুণে তদ্গত ও মুগ্ধ ছিলেন। * আমি বহুবার সভা-ক্ষেত্রে মুগ্ধ হইয়া ৺ দাশরথির সহিত কোলাকুলি করিয়াছি। নবদ্বীপের স্বর্গীয় ৺ ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন বহুবার ঐরূপ করিয়াছেন। দাশরথির রচনায় বারম্বার লোমহর্ষণ ও অশ্রুপাত হইয়াছে। দাশরথির রচনা বিষয়ে যে লোকাতীত শক্তি ছিল, কাব্যরসে রসিক সহৃদয় পুরুষগণই তাহা অনুভব করিতে পারেন। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিষয়ে অনেক ব্যক্তিই সামান্য মানবের ন্যায় নায়ক নায়িকার ভাবের বর্ণনা করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইয়াছেন; কিন্তু প্রতি রচনায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্ম ভাব মিশ্রিত নায়ক-নায়িকা ভাবের অপূর্ব্ব বর্ণনা দ্বারা দাশরথি রায় ভক্তি-প্রীতিরসে ভাবুকমাত্রকেই মোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" ইহাঁর পত্রে দাশুরায়ের আরও গুণকাহিনী বর্ণিত আছে। কলিকাতা বঙ্গবাসী আফিস হইতে দাশুরায়ের পাঁচালীর যে সংস্করণ বাহির হইয়াছে,

তাহাতেই এই পত্র সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন বঙ্গবাসী-সংস্করণে দাশুরায়ের ষাটটী পালা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

দাশুরায়ের পাঁচালী গাহিবার প্রণালী অতি সুন্দর ছিল। চারি পাঁচ সহস্র কি দশ সহস্র লোক দাশুরায়কে বেষ্টন করিয়া পাঁচালী শুনিবার জন্য সোৎসুকচিত্তে অবস্থিত, মধ্যস্থলে গায়ক দাশুরায় দণ্ডায়মান। পাঁচালীর প্রত্যেক পদ তিনি তিন বার করিয়া উচ্চারণ করিতেন, তাঁহার সম্মুখস্থিত শ্রোতৃগণের দিকে চাহিয়া একবার এবং দুই পার্শ্বে কোণাকোণি চাহিয়া দুইবার। ইহাতে সকল দিকের সকল লোকই উত্তমরূপ শুনিতে পাইতেন। আসরে গাহিতে বসিয়া দাশুরায় সময়-বিশেষে পাঁচালীর পরিবর্ত্তন করিয়া লইতেন। একই বিষয়ের পালাও তিনি ছোট বড় মাঝারি—একাধিক তৈয়ার করিয়া রাখিতেন। মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, ঢাকা, যশোহর—সর্ব্বত্রই দাশুরায়ের সুযশ-সৌরভ বিস্তারিত হইয়াছিল। অনেক জমিদার-ভবনেই তিনি নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক বৃত্তি পাইতেন।

শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, রাধাতন্ত্র, হরিবংশ, বাল্মীকিরামায়ণ, বেদব্যাস-বিরচিত মহাভারত, মনু, পরাশর প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র এবং চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে দাশুরায়ের অভিজ্ঞতা ছিল। দাশুরায় সমাজের সর্ব্বদিগদর্শী এবং সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। দাশুরায় ভাষা-রাজ্যের অধীশ্বর। সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন,—"যিনি বাঙ্গলা ভাষায় সম্যকরূপ ব্যুৎপন্ন হইতে চাহেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।" যিনিই দাশুরায়ের সমগ্র পাঁচালী যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তিনিই বলিবেন,—বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, দাশরথির কন্যা কালিকা সুন্দরীর নবদ্বীপে বিবাহ হইয়াছিল। কালিকা সুন্দরী নবদ্বীপের মাধবচন্দ্র বিদ্যারত্নের পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহার স্বামীর নাম স্বর্গীয় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন। ১২৬৫ সালের ১৪ই কার্ত্তিক কালিকা সুন্দরীর মৃত্যু হয়।

তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরেই তাঁহার স্বামীও স্বর্গলাভ করেন। ১২৮২ সালে দাশরথির মাতুল রামজীবনের পরলোক ঘটে।

দাশরথির পিতার কখন্ মৃত্যু হয়, অনুসন্ধানে জানিতে পারি নাই। দাশরথির মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা তিনকড়ি রায়, অন্য ভ্রাতা ভগবানচন্দ্র রায়ের পুত্র ভবতারণ এবং শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী হরিপুর-ব্রহ্মশাসন গ্রামনিবাসী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণের সহিত কিছুদিন পাঁচালীর দল চালাইয়াছিলেন। কিন্তু দাশরথির মৃত্যুর ৮।১০ বৎসর পরেই তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পরলোক গমন করেন। তখন হরিপুর-ব্রহ্মশাসন নিবাসী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এবং কৃষ্ণনগর-নিবাসী বাণীকণ্ঠ বসু নামক দুই ব্যক্তি দুইটী দল করিয়া, দাশরথির পাঁচালীর নাম রক্ষা করিয়াছিলেন।

সন ১৩০৬ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ দাশরথির পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী পরলোক গমন করিয়াছেন।

দাশরথি স্বয়ং কয়েকটী পালা পীলাগ্রামের নিকটবর্ত্তী বহরা গ্রামের হরিহর মিত্র নামক জনৈক কায়স্থের মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন।

দাশুরায়ের পাঁচালীর দলে অনেকগুলি লোক ছিল। পীলার শচী বিশ্বাস, নীলু বিশ্বাস—(ইনি বেহালাদার ; রাগিণী দিতেন, গানও করিতেন) অদ্বৈত বৈরাগী, ভগবান বৈরাগী ; আখ্ড়া-বিষ্ণুপুরের মদন সেন, রাধামোহন সেন, সিঙ্গীর যাদু আচার্য্য। অগ্রদ্বীপের দীনু পোদ্দার বাজাইত। পরে পীলার শ্যাম বাগচি বাজাইতেন। দাশরথি ছড়া বলিতেন ;—তিনকড়ি গাইতেন। তিনকড়ির স্বর বড় মধুর ছিল। তিনকড়ি যন্ত্র বাঁধিতে এবং বাজাইতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। প্রথমে দাশরথি পীলা, নারায়ণপুর, পাটুলী প্রভৃতি স্থানে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া গান করিতেন ; পরে ৩৲ ৪৲ ১০৲ ১২৲ টাকাতেও গাহিতেন, অতঃপর দর বৃদ্ধি হয়। কিছুদিন একত্রেই দুই ভ্রাতায় দল চালান। জনরব, তিনুকে দাশরথি উপার্জ্জিত টাকায় অতি অল্প অংশই দিতেন। তিনুর তাহাতে চলিত না। তিনু শেষে ভাইর সঙ্গে টাকার জন্য বচসা করিয়া, নিজের দল করেন।

তিনুর দলে ফরিদপুর-বাকুলসার রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায়, পাটুলীর তারাচরণ চট্টোপাধ্যায় (তারা মুশো), সজ্জে-করুয়ে নিবাসী ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় বাঁধমুড়ার দুর্গাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিকাপুরের দিনু মদক, বাঁধমুড়ার গিরিশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপুর-ব্রহ্মশাসনের গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। ধাইগাঁর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাদ্যকর ছিলেন। পোষ্ট গ্রামের রামযাদু চট্টোপাধ্যায়ও ঐ দলে ছিলেন। পাল্সনার সীতানাথ উগ্রক্ষত্রিয় বেহেলাদার ছিলেন। তিনকড়ি পদ্মাপারে কোথায় গান করিতে যান; সেখানে পীড়া হয়; বাড়ী আসিয়া মারা পড়েন। ৪৫।৪৬ বৎসর বয়সে তিনুর মৃত্যু হয়। তিনুর স্ত্রীর নাম হরসুন্দরী। নদীয়া জেলার সেনপুরে ইহাঁর পিত্রালয়। ইহাঁর একটী মাত্র পুত্র হয়, অকালেই সে পুত্র মারা পড়ে। পুত্রের জন্মগ্রহণ উপলক্ষে তিনকড়ি অনেক খরচ-পত্র করেন। তিনকড়ি,—দাশরথি অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি ছিলেন। কণ্ঠদেশ কিছু স্থূল দিল। চুল কোঁকড়ান, চক্ষু দুটী বিশাল এবং বিস্ফারিত ছিল; বর্ণ কাল ছিল।

দাশরথি উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ। ইনি দীর্ঘাকৃতি ও কৃশ ছিলেন। ইহাঁর চুল কোঁকড়া, নাক একটু লম্বা এবং চক্ষু দুটী বিশাল এবং বিস্ফারিত ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহবাস করিতে ভাল বাসিতেন; সর্ব্বদাই কোন না কোন বিষয়ের চিন্তা করিতেন; বসিয়া থাকিতে থাকিতে সর্ব্বদাই ঘাড় নাড়িতেন। যেন কোন বিষয়ের চিন্তায় নিমগ্ন। সর্ব্বদাই মুখে হাসি লাগিয়া থাকিত; কখন কাহার কথায় ইনি রাগ করিতেন না।

দাশুরায়ের তিনটী গান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

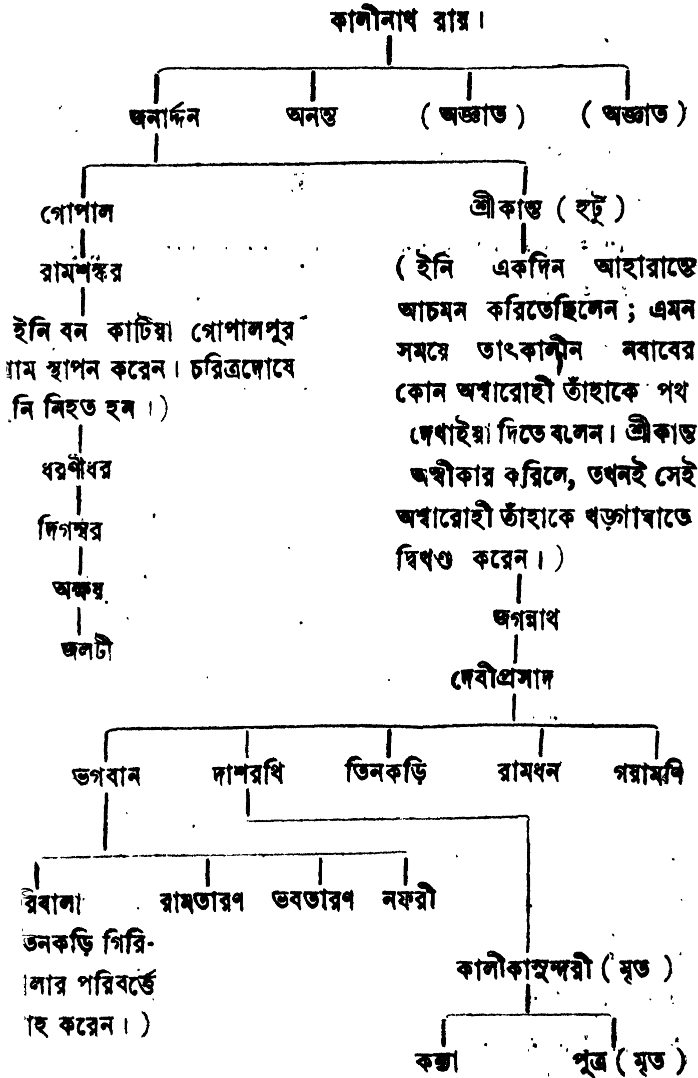
দুঃখ বর্ণিতে নারি, ওহে হরি! দুখ-বহ্নিতে দহে যেরূপ জীবন।
কৃপা-রূপ বারি, দাওহে দানবারি! বিপদ বারি হে বারিদ-বরণ॥
জলে গেলে জ্বালা না হয় নির্ব্বাণ, দুখানল দিনে দিনে বলবান,
কেমনেতে পাব পাবকেতে ত্রাণ, ও ভয় নাশিতে অভয় চরণ॥
পাপরূপ কাষ্ঠ করি আয়োজন, অনল উজল করিছে দুজন,

না দেয় নিভাতে, নিরন্তর তাতে, অনুগত আশা-পবন।
অবিচ্ছেদ ব্রতী হইয়ে কুমতি, দিতেছে তাহে অধর্ম্ম-আহুতি
দুখানলে দগ্ধ হ'ল দাশরথি, স্মরণ-দোষে হে শমন-দমন।

তোরা আয়না দিদি! তুল কিন্তে যাবিনে।
এবার সন্তাদরে বিকায়ে যায় ফুরাইলে আর পাবিনে॥
সে মহাজনের নাম সাধু বেণে, সে ধর্ম্ম-তুলে করে ওজন,—
কমি-কমতা শুনিনে।
অবিশ্রান্ত রাত্রি দিনে, কারায় টানা পঞ্চজনে,
দুজন কুজন পাপ মাকুতে ছিঁড়ছে টানা পারেনে।
দিদি কাঁদিস্‌নে, চরকা ছাড়িস্‌নে, কাট ভক্তি-সূত নন্দসুত পড়বে বন্ধনে।
আশী লক্ষ বার হেঁটে, কিনে তুল ভবের হাটে,
নিজকর্ম্ম-সূত কেটে, পড়্‌ল দাশরথি মায়াবন্ধনে॥

পিরীতি-গ্রাবু খেলা হল সই!
কিসে কর্‌বি জোর, এখন গোলাম-চোর, আর বিবি-ধরা কেউ খেলেনা—
কার কাছে বাঁধা রই॥
দুখের কথা কারে জানাই, স্বর্ণ-কান্তি বিন্তি নাই,
চটক পঞ্চাশ নাই তাতে লো; জ্বালা কত সই,—দেখে হত হই।
এখন তুরুকের জোর নাইক হাতে তাতে আবার ফেরাই কৈ॥
পড়্‌তা ভাল ছিল যখন, কি হাতে হন্দর তখন,
মেরে তাস করতাম আমি হাতে লো,
নাই রং হাতে, নাই রং তাতে—
আগে আনত গোলাম—হয়ে গোলাম
এখন আমি গোলাম হই;—
শেষে পেয়ে আঁচ, নিলে হাতের পাঁচ,
হচ্ছে বারে বারে ছক্কা পঞ্জা, ব্যোম হতে আর বাকি নাই।

দাশুরায়ের বংশ তালিকা।


কালীনাথ রায়।
জনার্দ্দন
অনন্ত
(অজ্ঞাত)
(অজ্ঞাত)
গোপাল
রামশঙ্কর
ইনি বন কাটিয়া গোপালপুর
গ্রাম স্থাপন করেন। চরিত্রদোষে
নি নিহত হন।)
ধরণীধর
দিগম্বর
অক্ষয়
জলটী
শ্রীকান্ত (হটু)
(ইনি একদিন আহারান্তে
আচমন করিতেছিলেন ; এমন
সময়ে তাৎকালীন নবাবের
কোন অশ্বারোহী তাঁহাকে পথ
দেখাইয়া দিতে বলেন। শ্রীকান্ত
অস্বীকার করিলে, তখনই সেই
অশ্বারোহী তাঁহাকে খড়্গাঘাতে
দ্বিখণ্ড করেন।)
জগন্নাথ
দেবীপ্রসাদ
ভগবান
দাশরথি
তিনকড়ি
রামধন
গয়ামণি
রবালা
তনকড়ি গিরি-
লার পরিবর্ত্তে
াহ করেন।)
রামতারণ
ভবতারণ
নফরী
কালীকাসুন্দরী (মৃত)
কন্যা
পুত্র (মৃত)

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।



ইহাঁর প্রণীত,—স্বপ্নবিলাস" "দিব্যোন্মাদ বা রাই উন্মাদিনী" এবং "বিচিত্র-বিলাস"—গ্রন্থ একান্ত সমাদরের সামগ্রী। ইহাঁর সুমধুর শ্রীমদ্ভাগবত-কথকতায় এককালে পূর্ব্ববঙ্গে রস-তরঙ্গের বন্যা ছুটিত; সহস্র সহস্র লোকে ইহাঁর কথকতা শুনিয়া, ভাবাবেগে বিহ্বল হইয়া উঠিত। ইনি একবার "নিমাই-সন্ন্যাস" পালা রচনা করেন। নিমাই-সন্ন্যাস অভিনীত হয়। কৃষ্ণকমল স্বয়ং নিমাইয়ের অংশ অভিনয় করেন। সে অভিনয় শুনিয়া, শ্রোতৃমণ্ডলীর চক্ষু বহিয়া দর-দর ধারে অশ্রুপ্রবাহ বহিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে ইনি বড় গোঁসাই নামে বিখ্যাত।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অধীন ভাজনঘাটে ইহাঁর জন্ম; কৃষ্ণকমল,—বৈষ্ণব-গ্রন্থ প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীকালুঠাকুরের বংশাবতংস। কৃষ্ণ-কমলের পিতার নাম মুরলীধর গোস্বামী। পিতা "বৈরাগ্য" ব্রতাবলম্বী ছিলেন;— যো-গ-বিশেষের অনুষ্ঠানে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। মুরলী-ধরের দুই বিবাহ। দ্বিতীয় স্ত্রী,—যমুনা দেবী। এই যমুনা দেবীই,—কৃষ্ণকমলের জননী। ১২১৭ সালে আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন কৃষ্ণকমল ভূমিষ্ঠ হন।

সাত বৎসর বয়সে কৃষ্ণকমল, পিতৃদেবের। সহিত, শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবনেই কৃষ্ণকমলের বিদ্যারম্ভ। সেখানেই তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বৃন্দাবনে বেশী দিন তাঁহার থাকা চলিল না। বৃন্দাবনের সমৃদ্ধ শেঠ-পরিবারের মধ্যে কোন অপুত্রক শেঠ, মুরলীধরের নিকট কৃষ্ণকমলকে প্রার্থনা করেন। পিতা বেগতিক বুঝিয়া, পুত্রকে লইয়া গোপনে ভাজনঘাটে পলাইয়া আসেন।

অতঃপর, কৃষ্ণকমল নবদ্বীপের কোন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অচিরেই তাঁহার কাব্যপাঠ সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এই কাব্য-পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া, তাঁহার শিক্ষা লাভেরও অবসান হইল। পিতা বিরাগী; সংসারে অসচ্ছলতা আত্যন্তিক; তিনি অর্থা-

র্জনে কৃতমনোরথ হইলেন। এই উদ্দেশে কৃষ্ণকমল অবিলম্বে ঢাকা যাত্রা করিলেন।

ঢাকায় গিয়া কৃষ্ণকমল বিষম উদরাময় পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। পিতৃদেবের যত্নে তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু পরেই পিতৃদেবের পরলোক ঘটিল। কৃষ্ণকমল ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন,—কলিকাতায় আসিলেন। কলিকাতাও তাঁহার সহ্য হইল না। পুনরায় তিনি ঢাকায় গমন করিলেন। এই বার ঢাকা সহরই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইল। ঢাকা সহরে অবস্থান কালেই কৃষ্ণকমল স্বপ্নবিলাস দিব্যোন্মাদ এবং বিচিত্রবিলাস রচনা করেন। তাঁহার আরও কয়েক-খানি গ্রন্থ,—"ভরতমিলন," "নন্দহরণ," "সুবল-সংবাদ" প্রভৃতি। অচিরেই তিনি অর্থসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠেন

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী সোমড়া-বাঁকিপুর গ্রামে কৃষ্ণকমলের বিবাহ হয়। কৃষ্ণকমলের ছয় পুত্র এবং চারি কন্যা। ১২৯৪ সালের ১২ই মাঘ চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে কৃষ্ণকমলের দেহান্তর হইয়াছে।

কৃষ্ণকল প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন;—"হা রাধে বৃন্দা-বনেশ্বরী,—" এই মধুর ধ্বনি সর্ব্বদাই তাঁহার মুখ-কমল হইতে বিনির্গত হইত। তাঁহার দৃঢ়ভক্তি ও বিশ্বাস এইরূপ ছিল,—

"যত জ্ঞানী ধ্যানী যোগধারী, তাদের ধার নাহি ধার,
যা্রধারি তা ধারি আমি, শ্রীরাধারি ধারই ধারি ॥"

ভক্তি-করুণার সুকোমল তানে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী নিয়তই প্রতিধ্বনিত হইত। কৃষ্ণকমল মধুর রসের মধুর অবতার। তাঁহার রচনা, মধুর-কোমলে মাখামাখি।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে রাধিকা যেন উন্মাদিনী,—সখীগণ প্রবোধ-বচনে তাঁহাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিতেছেন,—

"সখি! প্রবল হ'য়ে দাবানলে, যখন কানন জ্বলে
হিম-জলে নিবা'তে কি পারে?
যার,—ত্রিদোষ-ক্ষেত্র বিকারে, কণ্ঠা কৈল অধিকারে,
মুষ্টিযোগ রক্ষা করে কারে?

যখন,—উঠে সিন্ধু উথলিয়ে, বালির আলি বাঁধিয়ে,
সে বেগ কি পারে গো রাখিতে।
যখন,—বজ্র পড়ে শিরোপরে, তখন যদি ছত্র ধরে,
সে বজ্র কি পারে নিবারিতে।
আমার,—বিচ্ছেদ-ব্যাধি বলবানে, ওষ্ঠাগত কৈল প্রাণে,
আর কি মানে আশ্বাস-বচন।
যেমন,—সন্নিপাত-তৃষ্ণাতুরে, চাহে বারি তৃষ্ণা পূরে,
আশা দিলে না রহে বারণ॥"

বিরহ-বিধুরা রাধিকা, দিগ্‌বিদিক্—পথ-অপথ জ্ঞান নাই,—ঊর্দ্ধশ্বাসে কৃষ্ণোদ্দেশে নিকুঞ্জ-কানন অভিমুখে ছুটিয়াছেন,—ললিতা বলিলেনঃ—
"রাই! ধীরে ধীরে চল গজগামিনি!

অমন ক'রে যাস্‌নে গো!
কত কণ্টক আছে গো বনে,—
ফুটিবে দুটী চরণে গো!
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে, গহন-কানন মাঝে,
কমল-পদে দংশে পাছে গো!
হল,—নয়ন ধারায় পিছল পথ,—
যাস্‌নে রাধে এত দ্রুত গো!"

রাধিকা বলিলেন,—

"সখি! যখন নব অনুরাগে, হৃদয়ে লাগিল দাগে,
বিচারিলাম আগে, পাছের কাজে।
প্রেম ক'রে রাখালের সনে, ফিরতে হ'বে বনে বনে,
ভুজঙ্গ-কণ্টক পথ মাঝে॥
অঙ্গনে ঢালিয়ে জল, করিয়ে অতি পিছল,
চলাচল তাহাতে করিতেম।
হইলে আঁধার রাতি, পথ মাঝে কাঁটা পাতি,
গতাগতি করিয়ে শিখিতেম॥
এনে বিষ-বৈদ্যগণে, বসিয়ে নির্জ্জন বনে,
তন্ত্র-মন্ত্র শিখেছিলেম কত।
বঁধুর লাগি কৈলেম যত, এক মুখে কব কত,
হত বিধি সব কল্লে হত॥"

ইহাঁর কোন কোন সঙ্গীতে গোবিন্দ অধিকারীর ঢং দেখিতে পাই।

শ্রীরাধিকার উক্তি—

"বল কে কে যাবে, চলগো যে যাবে,
শশিমুখে বাঁশী কতই বাজাবে?
গেলে কুল যাবে, ব'লে—যে না যাবে,
না যাবে না যাবে, আমার কি যাবে?
কে যাবে না যাবে, ক'রে—সময় যাবে,
বিলম্ব দেখিয়ে, সে রসময় যাবে,
যে যাবে সে যাবে, থাক্—যে না যাবে,
এখন, না গেলে আমারি পরাণ যাবে॥"

গগনে নবজলধর বায়ুভরে দ্রুত ছুটিতেছে; কৃষ্ণপাগলিনী শ্রীরাধিকা মনে করিলেন,—আমার নবজলধর-রূপই বুঝি আমায় দেখিয়া পলাইতেছেন,—তিনি শশব্যস্তে সখীগণকে বলিতেছেন,—

"সখি! ধর ঝট পীতপট, নিপট কপট শঠ,
লম্পট শিরোমণি যার।
আসিয়ে নিকট, কোথা ঘুচাইবে সঙ্কট,
বিকট-বিরহ যে ঘটায়॥
ঠেকে যে শঠের পাঠে, ব্রজের অবলা ঠাটে,
গোঠে মাঠে ঘাটে বাটে, কাঁদিয়ে বেড়াই গো!
সে যে,—হঠাৎ আসিয়ে হাটে দেখা দিয়ে পথে ঘাটে;
বাটে বাটে বাটপাড়ি করিয়ে পলায়।
জাননা কি চোর ধাঁটি, দেখা দিয়ে পরিপাটি,
ক'রে কত সাটী বাটী, বেড়াইত বাটী বাটী,
উহার বাঁশীটী না সিঁদকাটী, নারী-বুকে সিঁদ কাটি,
মরমের গাঁটি কাটি, নিয়েছে মন লুটি পুটী,
কাটাইয়ে কুটি নাটি, ক'রে মোদের কুলমাটী।
ত্যজিয়ে গোকুল মাটী, যাইবে কোথায় গো!
সখি,—কটিতটে আঁটি সাটি, সবে মিলে কালসাঁটী,
আটি সাঁটি দ্রুত হাঁটি, চল না তথায়॥"

ফল কথা,—বৈষ্ণবপদকর্ত্তা চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি, প্রসিদ্ধ-যাত্রাকর গোবিন্দ অধিকারী এবং রাম বসু, হরুঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালাগণের

অনুবর্ত্তন কৃষ্ণকমল-কবিত্বে স্পষ্টীভূত। কিন্তু তাহা হইলেও কৃষ্ণকমলের কীর্ত্তন-সঙ্গীত মাধুর্য্যরসে একান্ত মনোহর।

রূপচাঁদ পক্ষী।

রূপচাঁদ দাস বা রূপচাঁদ পক্ষীর পূর্ব্বপুরুষগণ দক্ষিণ দেশবাসী ছিলেন। উড়িষ্যা প্রদেশে চিল্‌কা হ্রদের সন্নিকটে ইহাঁদের বাসস্থান ছিল। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের বংশ লোপ পাইলে, গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেব রাজ-গদি প্রাপ্ত হন। হরেকৃষ্ণ দাস মহাপাত্র গৌড়েশ্বর ষড়ঙ্গদেবের বংশসম্ভূত। হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র,—গৌর হরিদাস মহাপাত্র। গৌরহরি, রাজা হরিহর ভক্তের আমমোক্তার ছিলেন। ইহাঁকে কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতা গড়-গোবিন্দপুরে থাকিতে হইত। এই গৌরহরি দাসই রূপচাঁদ দাসের পিতা। রূপচাঁদ দাস, ১২২১ সালের মাঘ মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতাতেই ইনি অবস্থান করিতেন। আবাল্য সঙ্গীত-বিদ্যায় ইহাঁর সাতিশয় অনুরাগ ছিল। কলিকাতার তদানীন্তন বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। ইনি বিস্তর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর শান্ত রসাত্মক সঙ্গীতসমূহ যেমন অতিমাত্র মনোহর, ইহাঁর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক সঙ্গীতও তেমনি একান্ত মনোমদ। ইহাঁর রচিত সকল সঙ্গীতেই পক্ষী বা খগরাজ প্রভৃতি ভণিতাযুক্ত। ইহাঁর এক প্রকার গাড়ী ছিল,—কতকটা ।চার মত। ইনি অনেক সময়ে সেই গাড়ীতে চড়িয়াই বেড়াইতেন। ইনি বড়ই রসিক পুরুষ ছিলেন। প্রকাশ, 'চিরদিন কখনও সমান না যায়,'—এই সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইহাঁরই রচিত। বাল্যে বহু সঙ্গীত-প্রিয় ব্যক্তির নিকটই একটী গান শুনিতাম,—"বারে বারে তুমি ভেবো না কমলিনি!" সে গান ইহাঁরই। বহুদিন হইল, ইহাঁর পরলোক হইয়াছে,—আজিও লোকে সাদরে ইহাঁর সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। বাউল সঙ্গীতও ইনি বিস্তর রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর অনেক গান,—বাঙ্গলা-ইংরেজী শব্দে মেশামেশি,—

"আমারে ফড্ করে কালিয়া ড্যাম! তুই কোথায় গেলি।
আই য়্যাম ফর ইউ ভেরি সরি, গোল্‌ডেন বডি হল কালি॥
হো মাই ডিয়র ডিয়রেষ্ট, মধুপুর তুই গেলি কৃষ্ণ!
ও মাই ডিয়র! হাউ টু রেষ্ট, হিয়র ডিয়র বনমালি॥
পুওর ক্রিচর মিল্ক-গেরূল, তাদের ব্রেষ্টে মারুলি শেল,
নসেন্স তোর নাইকো আক্কেল, ব্রিচ-অব-কণ্টাক্ট করলি॥

রাধামোহন সেন।

সঙ্গীত-তরঙ্গ ইহাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা মধুর কবিতায় গ্রথিত ঙ্গীত-বিজ্ঞানের যাবতীয় তত্ত্ব ইহাতে নিহিত। বহুসংখ্যক সুভাব-নোহর সঙ্গীতও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাঁর আর দুই খানি ন্থ,—"অন্নপূর্ণা মঙ্গল" এবং "রসসার সঙ্গীত"। "অন্নপূর্ণা মঙ্গল,"—ভারত প্রকৃত "অন্নদা মঙ্গল," "বিদ্যাসুন্দর" "মানসিংহ" প্রভৃতি গ্রন্থের একটী টীক সংস্করণ। অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থের যে যে স্থান রাধামোহন াত্মক বা দোষপূর্ণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, টীকাকারে সেই সেই স্থলে নি স্বীয় অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা ১২৪৫ সালে মুদ্রিত । সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ ১২২৫ সালে প্রথম প্রকাশিত। অধুনা লিকাতা—বঙ্গবাসী-আফিস হইতে এই সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত ইয়াছে।

রাধামোহন,—কলিকাতা—কাঁসারিপাড়ায় কায়স্থ কুলে জন্মগ্রহণ রন। শুনিতে পাই, সঙ্গীত-তরঙ্গ-গ্রন্থ-প্রণয়নে, ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের তা রামনারায়ণ ঠাকুর রাধামোহনকে অনেক সাহায্য করেন। সুপ্রসিদ্ধ ীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় রাধামোহনের কবিত্ব বড়ই ভাল বাসিতেন। ই রাধামোহনের অনেকগুলি সঙ্গীত ইংরেজীতে সুন্দররূপ অনুবাদ রন।

রাধামোহনের দুইটী গান তুলিয়া দিলাম ;—

১। পুরবী—একতালা।

হৃদয়-কাননে শ্যাম! ভ্রমে কেমনে—সই! সুধায়ো মাধবে সখি! অতি গোপনে॥
তাতে মন শিলাময়, বিরহ কণ্টকচয়, লাগে নাহি কি সজনি! শ্যাম চরণে॥
যে ছিল নয়ন-বাসে, সে গেল বন-নিবাসে, আসিবে হৃদয় ত্যজি কবে ময়মে॥

২।—কাফি।

শশীকে রবি যেন মুকুতার হার। হেরি চকোরের হৃদি হতেছে বিদার॥
ম্লান তপন-চন্দ্রতাপে, কোষ্ঠ-হুতাশন তাপে, বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে বদন তোমার॥

শ্রীধর কথক।

১২২৩ সালে হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়া গ্রামে শ্রীধর কথক জন্মগ্রহণ করেন. পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শ্রীধর পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। এক মাসের মধ্যেই বালক শ্রীধর ধারাপাত সাঙ্গ করেন; এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সেই ব্যাকরণ, কাব্য এবং ভাগবতে শ্রীধর অলৌকিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। হুগলী জেলায় গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামের ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, শ্রীধরের ভাগবত শিক্ষা ও মন্ত্রদীক্ষার গুরু।

বাল্যে সঙ্গীতে ও কবিত্বে শ্রীধর প্রকৃতই অলৌকিক। সহাধ্যায়ি-গণের সঙ্গে পাঠ করিতে করিতে শ্রীধর সর্ব্বাগ্রে পাঠ সাঙ্গ করিয়া, কোন একটী সহাধ্যায়ীর নামে গান রচনা করিতেন এবং গাহিয়া সকলকে শুনাইতেন। তপ্তকাঞ্চননিভ সুন্দর সুপুরুষ শ্রীধরের সু-কণ্ঠে সেই গান শুনিয়া, সহাধ্যায়ীরা আত্মবিস্মৃত হইত।

যৌবনে কবিত্বশক্তির পূর্ণ বিকাশ। যৌবনে তিনি সঙ্গীদের সহিত পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। ইহা শ্রীধরের গুরুজনের প্রীতিপদ হয় নাই। জ্যেষ্ঠতাত ৺জীবনকৃষ্ণ শিরোমণি এজন্য তাঁহাকে ভৎর্সনা করেন। মনের দুঃখে শ্রীধর একটী বন্ধুর সহিত মুরশিদাবাদ গিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু ভাগবৎ-বিশারদ স্বভাবকবি, সুকণ্ঠ গায়কের রসতরঙ্গ ভঙ্গময় কাব্যোচ্ছাসে ব্যবসায়ের কূটপ্রবৃত্তি

কোথায় ভাসিয়া গেল! শ্রীধর ব্যবসায় ছাড়িলেন। বহরমপুরে গিয়া তিনি কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করিলেন। তথায় আত্মসাধনায় কথকতার চরমোৎকর্ষ হইয়াছিল। কথকতা, নাট্য-ভাবরসাদির অভিব্যক্তি। কোন্ অবস্থায় মানুষের কি ভাব হইয়া থাকে, কথকতায় অঙ্গ-ভঙ্গে বা বাক্যরঙ্গে তাহার বিকাশ করিতে হয়। কথকতাশিক্ষার কালে শ্রীধর কখন কোন বালকের হাতে সন্দেশ দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতেন, আর দুইটী বিশাল চক্ষুর অন্তর্দৃষ্টিতে বালকেরও তখনকার সে ভাব তুলিয়া লইতেন; আবার কখন বা বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের কথার ভাব—গ্রহণের জন্য কোন বৃদ্ধের সঙ্গে কথা কহিয়া, নির্নি-মেষে তাঁহার রসনার গতিপ্রকৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যালোচনা করিতেন। সর্ব্ববিধ ভাবাভিব্যক্তির বিকাশ-শিক্ষায় তাঁহার এমনই সাধনা ছিল। তাই তিনি আদর্শ-কথক হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ কথক ৺লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ তাঁহার পিতামহ। কথকতায় শ্রীধর পিতামহের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ৺রতনকৃষ্ণ শিরোমণি তাঁহার পিতা। ইনি পণ্ডিত। পাণ্ডিত্যে শ্রীধর পিতার গৌরব-পতাকা আরও উচ্চে তুলিয়া ছিলেন; কবিত্বে তিনি কুলতিলক। পাঠক! শ্রীধর যে সু-কথক ছিলেন, ইহা বোধ হয় জানেন; তিনি সু-কণ্ঠ সুপুরুষ ছিলেন, ইহাও বোধ হয় শুনিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিরূপ কবি,—তাঁহার কবিত্বই বা কিরূপ, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত নহেন। তিনি বঙ্গের দ্বিতীয় সরিমিঞা। তাঁহার রসময় ভাবময় টপ্পা, অনেকের মুখে শুনা যায়; কিন্তু অনেকেই জানেন না, এই সব টপ্পার রচয়িতা কে? যিনি গাহিতে জানেন, তাঁহার মুখে শ্রীধরের টপ্পা শুনি। আর যিনি না জানেন, তাঁহারও মুখে শুনি। যিনি গাহিতে জানেন, তিনি ভাবে সুরে বিভোর হইয়া গান; যিনি গাহিতে না জানেন, তিনি ভাবে বিভোর, আপন স্বভাব-সুখে গাহিয়া কেবল ভাবের উচ্ছ্বাসে উন্মত্ত হন। শ্রীধর কথকের যে টপ্পা আছে, কেহ কেহ তাহা জানিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তিনি যে শ্যামাবিষয়ে ও কৃষ্ণবিষয়ে অপূর্ব্ব ভাবময় গানের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা খুব কম লোকেই জানেন।

অনেকগুলি শ্রীধরের গান, নিধুবাবুর নামে ইদানীং চলিয়াছে। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু) টপ্পা-সঙ্গীতের রাজা। কালবশে শ্রীধরের নাম বঙ্গের "শিক্ষিত-সাহিত্যসমাজে" একরকম লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়া-। নাম লুপ্তপ্রায় হউক,—কিন্তু তাঁহার ভাল ভাল গানগুলি লুপ্ত হয় নাই। তাহা যে লুপ্ত হইবার নহে। সঙ্গীতাত্মা যে চির দিন অবিনশ্বর। অবিনশ্বর বলিয়াই শ্রীধরের গানগুলি বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে সদা গীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এসকল গান কাহার বিরচিত, তাহা লোকে বুঝিতে না পারিয়া, নিধুবাবুকেই এই গানের রচয়িতা বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন। অনেকে ভাবতেন, এমন সুন্দর, সুকবিত্ব-পূর্ণ, সুমধুর টপ্পা এক নিধুবাবু ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই অনেকেই স্থির করিয়াছিলেন,—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে!
আমার স্বভাব এই, তোমাবই আর জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি,—দেখিতে বড় ভালবাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে॥"

—এই গানটী নিধুবাবু কর্ত্তৃক বিরচিত। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। আমরা বহুদিন পূর্ব্বে হুগলীজেলাস্থ প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, এ গান নিধুবাবুর নহে,—শ্রীধর কথকের। আমরা শুনিয়াছিলাম, স্বয়ং শ্রীধর তদীয় সঙ্গীত-সমূহ এক খানি খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্রীধরের স্বহস্ত লিখিত সেই খাতা খানিতেই, ঐ—

"ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে!

গানটী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু খাতায় লিখিত গানের সহিত প্রচলিত গানের পার্থক্য আছে। শ্রীধরের খাতায় লিখিত গানটী এইরূপ;—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে!
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে!
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখিলে সুখেতে ভাসি,
তাই,—আমি দেখিতে আসি,—দেখা দিতে আসিনে!"

শ্রীধরের নিম্নলিখিত কয়েকটী গানও এতদিন নিধুবাবুর বলিয়া চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অদ্য আমাদের সে ভ্রম দূর হইল। দুই একটী গান এ স্থানে তুলিয়া দিলাম,—

১ম গান।

"ঐ যায়!—যায়! চায় ফিরে—সজল নয়নে!
ফিরাও গো! ফিরাও গো! ওরে অমিয়-বচনে!
হেরি ও-র অভিমান, দূরে গেল মোর মান!—
অস্থির হতেছে প্রাণ,—প্রতি পদার্পণে!"

২য় গান।

"তবে কি সুখ হত!
মন যারে ভালবাসে—সে যদি ভাল বাসিত!
কিংশুক শোভিতঘ্রাণে!—কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল হইতে চন্দনে!—ইক্ষুতে ফল ফলিত!
প্রেম-সাগরেরি জল, হতো যদি সুশীতল!—
বিচ্ছেদ-বাড়বানল,—তাহে যদি না থাকিত!"

নিম্নলিখিত এই গানটীও অন্য একজনের নামে এতদিন চলিয়া আসিতেছিল, এখন শ্রীধরের বলিয়া চলিল;—

"সখি আমায় ধর ধর!
উরু নিতম্ব-হৃদি পয়োধর-ভারে,—ভূমেতে ঢলিয়া পড়ি!
ছিলাম অন্য মনে, বেণু-রব শুনে,—কেন বা ধাইয়ে আইলাম কাননে!
উহু মরি মরি!—বাজিছে চরণে,—নব নব কুশাঙ্কুর!
ঘোর তিমিরা রজনী সজনি! কোথায় না জানি শ্যাম-গুণমণি!
পৃষ্ঠে দুলিছে লম্বিত বেণী,—কাল হইল মোর;—
চাতকিনী যেমন ধায় বারি-পানে, তেমতি আমি ফিরি বনে বনে,
নবজলধরে না হেরে নয়নে,—প্রাণ হতেছে অস্থির! ইত্যাদি!"

শ্রীধরের কৃষ্ণ-বিষয়ক সঙ্গীত এবং কালীবিষয়ক সঙ্গীত যেন সুধার প্রস্রবণ! তাঁহার টপ্পা ভাল, না দেব-দেবী-বিষয়ক সঙ্গীত ভাল, একথা লইয়া সুধীগণ মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বাদানুবাদও হইয়া থাকে। আমরা বলি, তাঁহার সবই ভাল।

তাঁহার টপপা-গানও বেদ-বেদান্ত-ভাব মাখা। যে প্রেমে বিরহ নাই, বিচ্ছেদ নাই, কলঙ্ক ভয় নাই, সেই প্রেমই জীবের আদর্শ প্রেম হওয়া উচিত। তাই শ্রীধর সিন্ধুভৈরবীতে আলাপ করিতেছেন,—

"পর-সনে প্রেম করা, ঘটে কেমনে?
ছিল না,—রবে না,—প্রেম! পরে বিচ্ছেদ—কারণে!
পীরিতের রীতিক্রম, অভ্যাস কর প্রথম,
আপনাতে হলে প্রেম,—কি কাজ করে দুজনে?
আপনি যে প্রেমময়, ইহা কি নিশ্চয় নয়?
বারংবার শ্রুতি কয়,—জনশ্রুতিতেও জানে।
নিজ সহ প্রেম হলে, কেউ তারে কিছু না বলে,
ভাসে না কলঙ্ক জলে, পোড়ে না মন আগুণে।"

শ্রীধরের একশত উনসত্তরটি গান সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রেম-বিষয়ক একশত একুশ, কৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত পঁয়ত্রিশ, শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত চারি, গৌরীবিষয়ক সঙ্গীত নয়টী। ইহা ব্যতীত তাঁহার বহুসংখ্যক পদাবলী আছে

ইহাঁর রচিত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক একটী গান শুনাইতেছি,—

খাম্বাজ মধ্যমান।

কি অপরূপ হেরিলাম, যমুনারি কূলে।
র'য়েছে রাখালের বেশে তবু নিরুপম বলে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম বাঁকা, তবু মনোরম,
কালো অঙ্গ ধরে তবু, আলো করে ভূমণ্ডলে॥
কিশোর-বয়স তবু যুবতী-মোহন,
ধূলা মাখা অঙ্গ তবু বিচিত্র ভূষণ,
স্বভাবে রয়েছে তবু দাঁড়ায়েছে বামে হেলে॥
ব্রজের রাখাল তবু অন্য দেশের
বারে বারে হেরিলে তবু নূতন বোধ হয়,
মদন-মোহন, তবু সহজে অবলা ভোলে॥

মধুসূদন কিন্নর।

(মধুকান)

যশোহর জেলায় বনগ্রাম। বনগ্রাম মহকুমায় কাগজপুর থানা এই থানায় উলুশিয়া গ্রাম অবস্থিত। এই উলুশিয়াই মধুকানের জন্মভূমি। ১২২৫ সালে মধুকান জন্মগ্রহণ করেন।

ইহাঁর পিতার নাম তিলকচন্দ্র কিন্নর। তিলকের চারি পুত্র,—মধুসূদন, যাদবচন্দ্র, শশিভূষণ এবং তারকনাথ।

মধুসূদন বাল্যকালে পিতার অযত্নপ্রযুক্ত বিদ্যাধ্যয়ন করিতে পারেন নাই; কিছু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে নিজের উদ্যোগে কেবলমাত্র বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, লিখিতে পারিতেন না;—ইহাই প্রসিদ্ধি। কিন্তু তিনি যে সকল গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল গীতের শব্দ-বিন্যাস দেখিলে বিদ্বান লোকের রচনা বলিয়াই প্রতীতি হয়। তিনি যে কেবলমাত্র সংস্কৃতমূলক শব্দবিন্যাস করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, তাহা নহে, স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট উপমায় পুঞ্জ পুঞ্জ অনুপ্রাস-যমকে ঠমকে ভূয়সী ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মধুসূদন নিজগ্রামে দুইটী বিবাহ করেন; অনুসন্ধানে জানিয়াছি, ইহাঁর শ্বশুরের নাম নারায়ণ কিন্নর। মধুসূদনের দুই স্ত্রীই নারায়ণের কন্যা,—কি একটী তাঁহার এবং অপরটী অন্যের, তাহা বিশেষরূপে জানিবার উপায় নাই। মধুসূদনের এক পুত্র দুই কন্যা হইয়াছিল; এক্ষণে সকলেই গতাসু হইয়াছে।

বাল্যকাল হইতেই মধুসূদনের গীত রচনার ক্ষমতা ছিল। প্রায় বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমে পদার্পণ করিয়া, তিনি প্রকাশ্য ভাবে গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি গীত বলিয়া যাইতেন, একজন লেখক লিখিয়া লইতেন; কেননা, আগেই বলিয়াছি, তিনি লিখিতে জানিতেন; প্রথমতঃ ইনি কালওয়াতি গানই রচনা করিতেন; কিন্তু তাহাতে বিশেষ যশোলাভ করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন ঢাকা নগরীতে ছোট খাঁ বড় খাঁর নিকট রাগ-রাগিণী ও খেয়াল এবং রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ-গান শিক্ষা করিয়াছিলেন। রাধামোহন বাউলের বাস বাগখাদিয়া, এই গ্রাম যশোর জেলায়। মধুসূদন গীত-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া উপর্য্যুপরি মান, মাথুর, কুরুক্ষেত্র, অক্রুর-সংবাদ ইত্যাদি পালা রচনা করিয়াছেন। এই সকল রচনা ভক্তিরস,-যমক, অনুপ্রাসাদি বিবিধ অলঙ্কারই পূর্ণ। ইহাতে তাঁহার কবিত্ব-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর সুর কাহারও অনুকৃত নহে; তাঁহার নিজেরই আবিষ্কৃত। মধুকানের সুর প্রসিদ্ধ। ইহাঁর সঙ্গীত সমূহে "সূদন" বলিয়া ভনিতা আছে।

সন ১২৭৫ সালে মধুসূদন কৃষ্ণনগরে গান করিতে যান। এই স্থানেই তাহার যকৃতে ও বুকে-পেটে বেদনা হয়। এই রোগেই ৫৫ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। শুনিতে পাই, কৃষ্ণনগরের কোন মহাত্মা তাঁহার ফটো রাখিয়াছেন।

মৃত্যুর পর ইহাঁর ভগিনীগণ দল চালাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত অনেকে তাঁহার রচিত ঢপ গান করেন। বৈষ্ণবেরা খঞ্জনী লইয়া দ্বারে দ্বারে তাঁহার রচিত গান গাহিয়া, তাঁহার নাম সজীব রাখিয়াছে।

কলিকাতা ৫৪।১ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ১২৯৮ সালে প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয় মধু কানের চারিটি পালা গ্রন্থকারে প্রকাশ করেন, (১) "অক্রুর সংবাদ," (২) "কলঙ্ক ভঞ্জন," (৩) "মাথুর" এবং (৪) "প্রভাস।" জীর্ণ খাতা দৃষ্টে মহিমচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় এই পালা কয়েকটীর সম্পাদন করিয়াছেন। মধু কানের পালা সমূহের বহু প্রচার বাঞ্ছনীয়।

মধু সূদনের দুইটী সঙ্গীত তুলিয়া দিলাম,—

(১)

পরজ—মধ্যমান।

ওমা! রথ রাখ রথ রাখ থাক, বারেক ফিরিয়ে দেখ।
আর হবে না দেখাদেখি, দেখি দেখি দেখ দেখ॥
ত্যজ্য করে মনোরথ, আরোহিলে মুনি-রথ,
আমরা কেবল অবিরত, কাঁদতে রত চেয়ে দেখ।

একবার মনে করেছিলাম হয় গিয়ে হয় ধরি, হেরিয়ে তুরঙ্গ-রঙ্গ আতঙ্গেতে মরি ;—
একবার ভাবি ধরি চক্র, ঘুচাই অক্রুর মুনির চক্র,
এখন দেখি চক্রীর চক্র, তুমি এত চক্র রাখ ॥
আবার ভাবি মরি গিয়ে মিছে কেন ভাবি, পরে ভাবি সে ভাবে না আমরা কেন ভাবি,
কি করি বুঝে না যে মন, মন তোমার পাষাণ কেমন,
সূদন কয় কথা কেমন, ব'লেছিলে যাব নাক ॥

(২)

দেখ্‌লাম্ আজি বৃন্দাবনে।
সেই যমুনা-পুলিনে,
পঙ্কে পড়ে পঙ্কজ মুখী র'য়েছে পঙ্কজ-বনে।
লয়ে বারি পদ্ম-পত্রে, কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে,
তথাপি নামেলে নেত্রে বারিবহে দুনয়নে
কেউ বলে রাই মরে মরে, উহু মরি মারে মারে,
কি বলবে হরি আমারে, বাঁচাতে নারিলাম যারে,
কেউ বলে আর কেন জ্বলি, এস করি অন্তর্জলী,
শেষে হয়ে গলাগলি মরি গিয়ে জীবনে ॥
বিসমখা বলে বিসখা অনেকেত হয়ে থাকে, এমনতো দেখি নাই নারী,
প্রেমের জন্ম প্রাণ ত্যজে,—
কোথায় বা তোর প্রাণের সখা, কার জন্যে বা মরিস একা,
সূদন বলে ও বিসখা, যে বি-সখা সেই জানে ॥

ইনি গানে সূদন বলিয়া ভণিতা দিতেন, কোন ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"মধু ! তুমি "মধু" নাম ত্যাগ করিয়া কেন "সূদন" বলিয়া ভণিতা দাও ? মধু বলিয়াছিলেন, "মধু" পাছে "বিষ" হয়, এই ভয়ে মধুনাম দিতে সাহসী হই না।

রসিকচন্দ্র রায়।

দেশপ্রসিদ্ধ দাশু রায়ের পর ইনিই শ্রেষ্ঠ পাঁচালীকার। ইঁহার একাদশ খণ্ড পাঁচালী প্রচলিত। পাঁচালী ব্যতীত ইঁহার আরও কতক-গুলি গ্রন্থ আছে; যথা,—হরিভক্তি চন্দ্রিকা, কৃষ্ণ-প্রেমাঙ্কুর, বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলা-বিহার, দশমহাবিদ্যাসাধন, বৈষ্ণব মনোরঞ্জন, নবরসাঙ্কুর, কুলীন-কুলাচার, শ্যামাসঙ্গীত, পদ্যসূত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন ইনি কবিওয়ালা, যাত্রাওয়ালা, কীর্ত্তন-ওয়ালা, তর্জ্জাওয়ালা, বাউল প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায়ের জন্য বহুসংখ্যক সরস সুন্দর সঙ্গীত বাঁধিয়া দিয়াছেন। "বিদ্যাসাগরের জীবনী" লেখক শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয় "বিদ্যাসাগরে" লিখিয়াছেন,—"রসিক চন্দ্রের কোন কোন কবিতা পুস্তক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে পাঠ্যপুস্তক-রূপে পরিণত হইয়াছিল।" আঠার বৎসর বয়সে রসিক চন্দ্র জীবনতারা নামক একখানি কবিতাত্মক আখ্যান গ্রন্থ রচনা করেন। অশ্লীল দোষ দুষ্ট বলিয়া, গবর্ণমেণ্ট এ গ্রন্থের মুদ্রণ বন্ধ করিয়া দেন।

সন ১২২৭ সালে বৈশাখ মাসে পুর্ণিমা তিথিতে বেলা দুই প্রহরের পর রসিকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলালয় পালাড়া গ্রামে ইহার জন্ম। পালাড়া,—হুগলী জেলার অন্তর্গত,—ভদ্রেশ্বরের পশ্চিম। ইনি কায়স্থ কুলোদ্ভব হরিপালের প্রসিদ্ধ রায় বংশ সম্ভূত। পিতার নাম,—রাম কমল রায়। রামকমল,—মাতামহ সম্পত্তির এক জমিদারী লাভ করিয়া, হুগলী—শ্রীরামপুরের নিকটবর্ত্তী বড়া গ্রামে আসিয়া বাস করেন। রসিক চন্দ্রের এই বড়া গ্রামেই অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। আবাল্য লেখা-পড়ায় ইহার একান্ত অনুরাগ ছিল। দশ বৎসর বয়সেই ইনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন।

বড়াগ্রামে রসিকচন্দ্রের বাস-ভবনের সন্নিকটে এক মনোহর পুষ্পোদ্যান। এই উদ্যান-বাটিতে তিনি সদাই একাকী বাস করিতে ভাল বাসিতেন। দাশরথি রায় বহুবার তথায় রসিক চন্দ্রকে দেখিতে আসিয়া-

ছিলেন। এই নিভৃত-পুষ্পোদ্যানে উভয় বন্ধুর সৌহার্দ্য সম্ভাষণ হইত। ১৩০০ সালে রসিকচন্দ্র পরলোক গমন করিয়াছেন।

রসিকচন্দ্রের খাম্বাজ রাগিণীর এই গান,—শত শত ব্যক্তির কণ্ঠ-মণি,—

'তোমায় ভুলব না,—গিরি কন্যে! ভোলা,—ভোলা যাঁর, তার কি ভোলা যায়,
ভোলা যায় পেয়েছে পরম পুণ্যে ॥"

রসিকচন্দ্র মূলতান রাগিণীতে গাহিতেছেন,—

"আয় মা সাধন সমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে ॥
আরোহণ করিয়ে কালি! সাধন রথে, তপ জপ ছুটা অশ্ব জুড়ে তাতে,
দিয়ে জ্ঞান-ধনুকে টান, ভক্তি-ব্রহ্মবাণ, বসে আছি ধরে ॥
দেখবো মা! তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে, ডঙ্কা মেরে লব মুক্তি ধন।
তা'তে রসনা ঝঙ্কারে, কালী-নাম-হুঙ্কারে, কার সাধ্য আমার রণে রন্ ॥
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী, এইবার আমার রণে এস ব্রহ্মময়ী!
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা! তোমারি বলে, জিনবো তোমারে ॥"

রসিকচন্দ্রের গারা-ভৈরবীর একটী সঙ্গীত শুনুন,—

"কেরে নবীন নীরদ বরণী! কার ঘরণী।
জ্যোতির ঝলকে, চপলা চমকে, পলকে পলকে তিমির-নাশিনী॥
দিনকর-কর-নিকর চরণে, সুধাকর-কর নখর বরণে,
নিবিড়-নিতম্বে, নিন্দে নীলস্তম্ভে, শিখর-কদম্বে তরাস-দায়িনী॥
পীনোন্নত কিবা যুগ্ম পয়োধর, করি-কর-গুরু উরু মনোহর,
কটিতট করি-অরি নিন্দাকর, তাহে নর-কর-কিঙ্কিণী,—
নরশিরোমালা শোভে ভয়ঙ্কর, চিবুকে রুধির দর দর দর,
গভীর হুঙ্কারে গর গর গর, থর থর থর কাঁপায় মেদিনী।
অর্ক-কোটী তেজে যেন, তেজঃপুঞ্জ, ধক ধক জ্বলে রক্তবর্ণ লঞ্জ,
লক লক জিহ্বা এলায়িত কঞ্জ, বুঝি শক্ত মোহিনী,—
সিংহ নিনাদিনী বিবাদিনী কেরে, ধর ধরাধর ধর এ বামারে,
রসিক বলে ধর, ধরিয়া সত্বর, কর এ হৃদয় বাসিনী ॥"

নব রসাঙ্কুর হইতে 'অদ্ভুত রসের' বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি,—

একি একি অপরূপ হের রে কাণ্ডারি! কালীদহ-কমলে কমলে কার নারী ॥
কে কোথা দেখেছ বল আশ্চর্য্য এমন। পুনঃ পুনঃ গ্রাসে আর উদ্গারে বারণ ॥
হাসে আর গ্রাসে গজ, ত্রাসে মরে নাই। এমন আশ্চর্য্য কভু চক্ষে দেখি নাই ॥
এই ত আশ্চর্য্য এক নারী গ্রাসে গজ। আবার আশ্চর্য্য কালী-দহেতে পঙ্কজ ॥

পঙ্কজে পঙ্কজমুখী কে বামা এমন। পলকে পলকে রূপে ঝলকে কিরণ॥
কেশরি-নিন্দিত কটি কত শোভা পায়। একে চারুচন্দ্রাননা বিম্বাধরা তায়॥
হের দেখ চিকণ বরণে কত জ্যোতি। এ যেন কনকপাত্রে শশাঙ্কের ভাতি॥
কমলে কমলপদ শোভে কি তরুণ। শ্বেতাভ্র-শিখরে যেন উদিছে অরুণ॥
জলে দেহ প্রতিবিম্ব উজলে কি হায়। নীরদের কোলে যেন বিদ্যুৎ খেলায়॥
কনক-মৃণাল-কর পদ্ম করতল। জ্যোতিতে মলিন হয় জলের কমল॥
রাম-রম্ভাতরু নয় উরুসমতুল। বরণ কনক-সঙ্গে মিশ্রিত হিঙ্গুল॥
ভুরুভঙ্গি দেখিয়া এমন অনুমানি। ভয়েতে বাঁকিয়া গেল কামধনু খানি॥
কে এ বামা মনোরমা কিন্তু ভয়ঙ্করী। অনিবার ঐ যে দেখ গ্রাসে স্বয়ং করী॥

রসিক রায় মহাশয় রচিত "ভগবতী বাগ্‌দিনীর বেশ ও শঙ্খ পরা" পাঁচালী হইতে এইটুকু তুলিয়া দিলাম;—

পদ্মা বলে তারিণী গো করহ শ্রবণ। আমি জানি শঙ্করের সব বিবরণ॥
কুচনীপাড়ায় থাকেন ভূতের ঈশ্বর। করেছেন ধান্য চাষ সেই গঙ্গাধর॥
ক্ষেত্রখানি চারি ক্রোশ জানে পরস্পরে। ফলেছে উত্তম ধান্য ক্ষেত্রের ভিতরে॥
ভগবান পূজার জন্যে শিব করেন ধান। কহিলাম জননী গো এই ত সন্ধান॥
কেন আর রোদন কর ভাবিয়ে অশেষ। ত্বরায় ধরহ তুমি বাগ্‌দিনীর বেশ॥
মৎস্যধরা জাল আর বাড়ি লয়ে করে। চল গো অচল সুতা ক্ষেত্রের উপরে॥
বাগ্‌দিনীর সাজে চল অতি কুতূহলে। ভাঙ্গিয়া ফেলহ ধান্য মৎস্য ধরা ছলে॥
অবশ্য সংবাদ পায়ে আসিবেন হর। সেই খানে দেখা মাগো হবে পরস্পর॥
শুনিয়া পদ্মার বাণী আনন্দের শেষ। ধরিলেন ভগবতী বাগদিনীর বেশ॥
পীতলের নং নাকে আলু থালু চুল। কর্ণেতে শোভিত ঝুটা পাথরের দুল॥
হাতে মার ভাঙ্গা চুড়ি গলে কাষ্ঠমালা। চঞ্চল চরণে চলেন অচলের বালা॥
সিঁতায় সিন্দুর ভাল হরিতে হর মন। তারিণী পিতল সাজে সাজিল কেমন।

যেমন,—

সুধাকূপে পানা, স্বর্গপথে থানা, গোলোক ধামে ভূত, সাধুর কাছে যমদূত।
পায়সের উপর কলা, সোণার গায়ে মলা, সিংহাসনে ঘুটে, ঠাকুর ঘরে কুটে॥
সমুদ্রে ঘুনি, সোণার ডাড়ে টুনটুনি।
পদ্মের উপর গুবুরে পোকা, পদ্মিনীর কোলে বাঁদুরে খোকা॥
ক্ষীরের উপর বালি, বাসি পোসাকে কালি॥
হরিণের দলে মেষ, তেমি ধারা তারিণীর গায় বাগদিনীর বেশ॥

হরু ঠাকুর।



হরুঠাকুরের পূর্ণ নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী বা দীর্ঘাড়ী। কলিকাতা শিমুলিয়া ইহাঁর জন্মস্থান। ১১৪৫ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালীচন্দ্র। বাল্যকাল হইতেই হরু ঠাকুর কবিতা এবং সঙ্গীত-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বৰ্দ্ধমান-রাজসভায়, কৃষ্ণনগর-রাজসভায় এবং কলিকাতা-শোভাবাজার-রাজবাড়ীতে ইহাঁর সবিশেষ প্রতিপত্তি হইয়াছিল। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ইহাঁকে বড়ই ভালবাসিতেন। একদা মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় বহু পণ্ডিতের সমাবেশ। মহারাজ পণ্ডিতমণ্ডলীকে বলিলেন,—"আপনারা আমার এই সমস্যাটীর পূরণ করিয়া দিউন,—"বঁড়শী গিলেছে যেন চাঁদে।" পণ্ডিতগণ ভাবিতে লাগিলেন,—কেহই উত্তর করিতে পারিলেন না। বিলম্ব দেখিয়া মহারাজ হরুঠাকুরকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হরুঠাকুর তখন গামছা কাঁধে ফেলিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন। সেই অবস্থাতেই তিনি রাজবাটীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সমস্যা পূরণ করিয়া দিতে বলিলেন। হরুঠাকুর কাগজ কলম লইয়া সমস্যা পূরণ করিতে বসিলেন; তাঁহাকে আর অধিকক্ষণ চিন্তা করিতে হইল না। তিনি সমস্যার পূরণ করিয়া দিলেন,—

একদিন শ্রীহরি, মৃত্তিকা ভোজন করি, ধূলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শী বিঁধিল যেন চাঁদে॥

উত্তর শুনিয়া মহারাজ অতীব প্রসন্ন হইলেন; হরুঠাকুরকে হাজার টাকা বকৃশিস করিলেন; হরুঠাকুর গামছার খুঁটে সেই টাকা বাঁধিয়া লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলেন। এমন সমস্যা-পূরণ তিনি প্রায়ই করিয়া দিতেন। প্রথমে ইনি সখের কবির দল করেন। পরে দল পেশাদারী হয়। ১২১৫ সালে ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে।

হরু ঠাকুরের সখী-সংবাদ সঙ্গীত অতীব মনোহর। প্রেম-চিত্র-অঙ্কনে তিনি কিরূপ সুদক্ষ, একটী গানেই তাহার পরিচয় লউন,—

"তোমার ভাব দেখে করি অনুভব, ভাব বুঝি ফুরাল, দিন দিন রসহীন হলে প্রাণ,
তুমি আছ সেই,—তোমার প্রেম লুকাল॥
একি ভাব!—গেছে পূর্ব্বের সে ভাব, অভাব ভাব মিশাল॥
তোমার লোকে কয় রসময়—মিথ্যা নয়,সে রস পরের কাছে, ঘরে এলে মুখ যেন যে মুখনয়
তোমার আমার আছে ভ্রান্তি—হয় শিরে সংক্রান্তি, যেন শান্তিশতকেতে পাঠ এগুলো
সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়, তবে প্রাণ হলে রসের অনুষ্ঠান!
বিরস বদন কেন হয়, পেলেন ব্যাভারে পরীক্ষে, তোমার অযাচক ভিক্ষে,
চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া-চক্ষে,
তোমার সদাই বদন বাঁকা, হয় যখন দেখা, সে সব শশিমুখের হাসি কমনে গেল
যে মনে ভুলালে এ মন, তোমার কোথা সে মন, কেমন কেমন দেখতে পাই।
বল না কোন খানে মন হারালেরে প্রাণ! না হয় আমিও সেই পথে যাই॥
নাই এখন তোমার সে সুদৃশ্য সুহাস্য সুবচন,—
কোথা হয় যেন কে কারে কি কয়, এমনি অন্য মন, তুমি রসিক নও—তা নয় প্রাণ।
রাথ স্থান—বিশেষে মান, কোন রাজ্যে বান, কোন রাজ্যে ধান,
আমি হাজা প্রজা বলে, জ্বলে প্রাণ, আমার সুখের সময় তোমার রস শুকাল॥"

হরুঠাকুরের এই প্রসিদ্ধ পদটি আজ পর্য্যন্ত শত শত হিন্দুর কণ্ঠস্থ,—

"হরিনাম লইতে অলস করোনা রসনা, যা হবার তাই হবে।
ভবের তরঙ্গ বেড়েছে ব'লে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে॥"

এই গান সম্বন্ধে ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় প্রভাকর পত্রে লিখিয়াছেন, কি মনোহর! কি মোহকর! কি মোহকর! শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন মাত্রেই অশ্রুপতন ও রোমাঞ্চ হইতে থাকে। অতি মূঢ় পাষণ্ড ব্যক্তিরও হৃদয় আর্দ্র হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতামাত্রেই মুগ্ধ হইতে থাকেন। সকলেরই অন্তঃকরণে প্রেমের উদয় হয়, সকলেই চমকিত হইয়া মরণ স্মরণ করে; মনের সমুদায় মোহ বিকার হরণ পূর্ব্বক ভাব-ভক্তি-জ্ঞানের প্রভাবে মরণ-হরণ-চরণ স্মরণ করিতে থাকে। যেখানে যে বাঙ্গালী মহাশয় বিরাজ করিতেছেন, তিনি সেই স্থানেই বিশেষ বিবেকের অবস্থায় ঐ নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ঐ নাম কত ভিক্ষুকের উপজীব্য হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয়না। কি ইতর কি ভদ্র তাবতেই এতৎ গানে প্রেমিক হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কি এক মধুরত্ব আছে, তাহা আমি বচনে প্রকাশ করণে অশক্ত হইলাম।"

হরু ঠাকুরের আরও দুইটী গান শুনাইতেছি,—

পিরীতের কি ধার ধারো তুমি প্রাণ।

এতো নবীনা নারীরো কর্ম্ম নয়, ইথে প্রবীণতা অতিশয়,

কখন রাজা কখন প্রজা, কখন বা যোগী হতে হয়।

সখি আঁখি মনঃপ্রাণ, সদা সাবধান, ধ্যান,—শব-সাধনের প্রায়,—

আগে মাথায় লইয়ে কলঙ্কের ডালি, কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়॥

মান অপমান সইয়ে ইথে নাহি থাকে লোক লাজ ভয়,

দীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো পতন, দাহন করিতে নিজ কায়॥

আর নারীরে করিনে প্রত্যয়। নারীর নাইক কিছু ধর্ম্ম ভয়॥

নারী মিতে যেমন, ভুলতে তেমন, দুই দিকে তৎপর,

মজিয়ে পরে চায় না ফিরে আপনি হয় অন্তর।

উত্তমেরে ত্যজ্য করে অধমে যতন, নারী বারি-দুজনারি নীচ-পথে গমন,

তার প্রমাণ বলি প্রাণ,—নলিনী তপনে ত্যজিয়ে,

বনের পতঙ্গ সে ভৃঙ্গ,—তারে মধু বিতরণ॥

শেষ বয়সে হরু ঠাকুর দল ছাড়িয়া দিয়া, মহারাজ নবকৃষ্ণের সভাসদ হন, সেই সময়ে রাজবাটীতে যে সকল কবি গাহনা হইত, হরুঠাকুর প্রায়ই সে সকলে মধ্যস্থতা করিতেন। একবার তিনি রামবসুর দলের পরাজয় সাব্যস্ত করেন। রামবসু উত্তরে গাহেন,—

"ঠাকুর! বাঁচবেন না আর বিস্তর দিন।

তোমার চক্রে ধরেছে পোকা, স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ॥"

শুনিতে পাই,—হরুঠাকুর ইহাতে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হন,—রাম বসুকে যথেষ্ট গালি দিয়া আসর হইতে উঠিয়া যান।

নিতাই দাস।

নিতাই দাস একজন বিখ্যাত কবি। ইহাঁর আসল নাম নিত্যানন্দ। জাতি—বৈষ্ণব; ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। শিশুকাল হইতেই গান বাজনায় ইহাঁর ভারী অনুরাগ হয়। ইনি যেমনই

বাঁধনদার, তেমনই বাজনদার। ইহাঁর দলে ঢোল বাজাইত,—ফরাস-ডাঙ্গার বিখ্যাত ঢুলি,—মোহন; কিন্তু নিতাই যখন কবি গাহিতে গাহিতে মাতিয়া উঠিতেন, তখন মোহনের কাঁধ হইতে খোল লইয়া, নিজেই বাজাইতে আরম্ভ করিতেন। নিতাইয়ের আড়ি, পরম আর তেহাই,—যে শুনিত,—সেই—ই গলিয়া যাইত। নিতাইয়ের দলের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল,—ভবানী বেণের দল। এই দুই দলের লড়াইকে লোকে বাঘে-মহিষের লড়াই বলিত। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর দলের গান,—অধিকাংশই পুরুষোক্তি।

এই গানের ভাবটী কেমন মনোহর ;—

"ফিরে ফিরে চায়,—ফিরে যায় ঐ শ্যামধন।
পিয়ারী খানিক বই, বলবে কৃষ্ণ কই কই!
তখন কোথা যাব কোথা পাব শ্যামের অন্বেষণ॥
অভিমানে রয়েছেন মানিনী রতন,
মানের অধীন হয়ে কোন দিন,
কি ঘটিবে মনে,—
মান যাবে; প্রাণ যাবে, মাধব যাবে,
না মরিব দেখিব তখন,—
পিয়ারী কেমন না হেরে কাল বরণ॥
যা করে তা করুক রাই সই তাহে ক্ষতি নাই,
কেন্দে কৃষ্ণ যায় ফিরে, চাইতে চাহিতে রাধারে,
যখন যাই রাই—যাই রাই মাধব বলে,
অমনি বয়ান ভাসে শ্যামের নয়ন-জলে,
ক্ষণেক কুঞ্জের বাহিরে যায়,
ক্ষণেক দাঁড়ায়,—চলিতে না চলে চরণ॥

আর একটী শুনুন,—

বঁধুর (শ্যামের) বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে।
সই! কেন অঙ্গ, অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে॥
বৃক্ষ-ডালে বসি পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন্ কারণে।
যমুনারি জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনা পবনে॥
একি একি সখি, একি গো নিরখি, দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন হীন-চেতনে॥

হায় কিসের লাগিয়ে, বিদরিয়ে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি, প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে॥
আর একদিন, শ্যামের ঐ বাঁশী বেজেছিল কুঞ্জবনে।
কুল লাজ ভয়, হরিল তাহাতে, মরিতেছি গুরু-গঞ্জনে॥

নিতাই দাস সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় "প্রভাকরে" লিখিয়াছিলেন,—

"ধনী লোক মাত্রেই কোন পর্ব্বাহ উপলক্ষে কবিতা শুনিবার ইচ্ছা হইলে অগ্রে নিতাই দাসকে বায়না দিতেন, ইহাঁর সহিত ভবানী বেণের সাক্ষাৎ-যুদ্ধ ভাল হইত। যথা—প্রচলিত কথা—'নিতে বৈষ্ণবের লড়াই।' এক দিবস ও দুই দিবসের পথ হইতেও লোক সকল "নিতে ভবানে"র লড়াই শুনিতে আসিত। যাঁহার বাটীতে গাহনা হইত, তাঁহার গৃহ লোকারণ্য হইত, ভিড়ের মধ্য ভেদ করিয়া প্রবেশ করিতে হইলে প্রাণান্ত হইত, তৎকালে যদিও অন্যান্য দল ছিল, কিন্তু হরুঠাকুর, নিতাই দাস, এবং ভবানী বণিক এই তিন জনের দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধানরূপে গণ্য ছিল। এই নিত্যানন্দের গোঁড়া কত ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কুমার হট্ট, ভাটপাড়া, ত্রিবেণী, বালী, ফরাসডাঙ্গা, চুঁচুঁড়া প্রভৃতি নিকটস্থ ও দূরস্থ সমস্ত গ্রামের সমস্ত ভদ্র ও অভদ্র লোক নিতায়ের নামে ও ভাবে গদ্‌গদ হইতেন। নিতাই দাস জয়লাভ করিলে ইহাঁরা যেন ইন্দ্রত্ব পাইতেন। পরাজয় হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না; যেন হৃত সর্ব্বস্ব হইবেন,—এমনি জ্ঞান করিতেন। অনেকের আহার—নিদ্রা রহিত হইত। কত স্থানে কতবার গোঁড়ায় গোঁড়ায় লাঠালাঠি কাটাকাটি হইয়া গিয়াছে। অন্যে পরে কা কথা, ভাটপাড়ার ঠাকুর মহাশয়েরা নিত্যানন্দকে নিত্যানন্দ প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাঁরা গাহনার প্রাক্কালে "প্রভু উঠেছেন" বলিয়াই গোঁড়ারা ঢল-ঢল হইত। নিতায়ের এই এক প্রধান গুণ ছিল যে ভদ্রাভদ্র তাবল্লোককেই সমভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিতেন।"

রাম বসু।

ইহার প্রকৃত নাম রামচন্দ্র বসু। হাবড়ার নিকটবর্ত্তী শালিখা ইহাঁর জন্মভূমি। ১১৯৪ সালে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় রামবসু কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় পিশা মহাশয়ের বাটীতে থাকিতেন। এই খানেই ইহাঁর লেখাপড়া শিক্ষা। বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর সঙ্গীত রচনায় অনুরাগ,—পাঠশালে বসিয়া বসিয়া কলাপাতে গান লিখিতেন,—আর ফেলিয়া দিতেন। একদিন কবিওয়ালা ভবানী এইরূপ কয়েকটী গান কুড়াইয়া পান,—গান পড়িয়া রামবসুর কবিত্ব-শক্তি বুঝিতে পারেন। সেই সময় হইতেই রামবসু, ভবানী বেণের দলে গান বাঁধিয়া দিতে আরম্ভ করেন। নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার প্রভৃতির দলেও ইনি বিস্তর গান বাঁধিয়া দেন;—শেষে নিজেই কবির দল করেন। প্রথমে দল হয় সখের, পরে পেশাদারীরূপে পরিণত হয়। ইনি মুর্শিদাদাদ কাশীম-বাজারের রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুরের বাটীতে দুর্গাপূজার সময় কবি গাহিতে যাইতেন;—একবাব সেখানে পীড়াক্রান্ত হন এবং সেই পীড়াতেই ১২৩৬ সালে—৪২ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

পরলোকগত রাজ নারায়ণ বসু মহাশয় "সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন "কবি, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতি সে কালের প্রধান আমোদ ছিল। তাহার মধ্যে কবি প্রধান। হরু ঠাকুর, নিতে বৈষ্ণব, রাসু, নসিং, রামবসু, ভবানী বেণে ইহাঁদিগের কবিতা সর্ব্বত্র বড় আদরের বস্তু ছিল।" তবে রাম বসুই "বিরহে"র রাজা ছিলেন। বিরহের সর্ব্বাঙ্গীন সুপরিপাটী ভাব-বর্ণনায় রাম বসুই অনেকের মতে অদ্বিতীয়। ইহাঁর সেই,—'যৌবন জনমের মত যায়!"—গান, রসে-ভরা রসকরা। ইহাঁর সেই,—

"তুমি হও মহাজন অবলার!
বাঁধা রেখে মন, লব প্রেমধন,
আমার যৌবন—হবে জামিনদার॥"

—যেন কৃষ্ণনগরের সর-ভাজা! ফল কথা, রসিক রাম বসু বিরহের "আগড়ুম-বাগড়ুম" হইতে দাণ্ডাগুলি, বিস্তি-গ্রাবু প্রভৃতি সকল খেলাতেই পাকা হাতের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

"লহর"-রচনাতেও রামবসু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। একবার দুর্গোৎসবের সময় কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণের ভবনে কবি হইতেছে। এক পক্ষে রাম বসু—রাম বসুর তখন পেশাদারী দল,—অপর পক্ষে রামপ্রসাদ ঠাকুর। নীলু ঠাকুরের মৃত্যুর পর ইনিই তখন দলপতি। রামপ্রসাদ ঠাকুর রাম বসুকে গালি দিয়া বলিলেন,—

"নাইক রামবোসের এখন সেকেলে পৌরষ।
এখন দল করে হয়েছেন রামবোস—রামকামারের * * ॥

রাম বসু উত্তর দিলেন,—

"তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটীন।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে, বাজে নাক একটি দিন ॥
যেমন রাতভিখারীর ধামাবওয়া থাকে এক এক জন,
হরিনাম বলে না মুখে পেছু থেকে চাল কুড়ুতে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, এ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
মন কাজের কাজী ঠাটের বাজী,—(ভাইরে।)
ঠিক যেন ধোপার বিশকর্ম্মা—
যেমন বিদ্যেশূন্য বিদ্যেভূষণ সিদ্ধিরস্তবস্তুহীন ॥
নীলমণি মলে, নীলমণির দলে, ঢুক্‌লো শিংভাঙ্গা এড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব মলে নবাব হল উজীরালি আড়াই দিন।
যেমন * * কাছে পেগের বড়াই ঘরে করেন জাক,
দুনিয়ার কর্ম্মেতে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে,—বচনে পুড়িয়ে করেন খাক,
তেমনি শ্রীছাদ, এই পেটকো মুলুক চাঁদ, ধরে কৃষ্ণপ্রসাদ, ভয়েন রামপ্রসাদ,
যেমন জন্মে কভু হাত পোরেনা,—দোলে লবেদার আস্তীন ॥"

ইহাঁর কবিত্ব-শক্তি দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে আরও কয়েকটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

ওহে এ কালো উজ্জলো বরণো তুমি কোথা পেলে,
বিরলে বিধি কি নির্ম্মিলে ॥
যে বলে সে বলুক কালো, আমার নয়নে লেগেছে ভালো,
বামা হলে শ্যামা বল্‌তাম তোমায় পুজিতাম জবা-বিল্বদলে ॥

আরো তো আছে হে অনেক কালো,
এ কালো নহে তেমন, জগতের মনোরঞ্জন।
না মেনে গোকুলে কুলেরই বাধা,
সাধে কি শরণো লয়েছে রাধা,
জনমের মত ঐ কালো চরণে, বিকায়েছি বিনিমূলে॥
ওহে শ্যাম! কাল শব্দে কহে কুৎসিতো—আমার এই ত জ্ঞান ছিল।
সে কালোর কালোত্ব গেল হে কৃষ্ণ! তোমারে হেরে কালো॥
এখন বুঝিলাম কালোরো বাড়া সুন্দর নাহিক আর,
কালোরূপ জগতের সার॥
ত্রিলোকে এমন আর নাহিক হেরি॥
ও রূপে তুলনা কি দিব হরি!
কালোরূপে আলো করেছে সদা,
মোহিতো হয়েছে সকলে॥
এক কালো জানি কোকিলো, আরো ভ্রমরার কালো বরণ,
আর কালো আছে জলো কালিন্দীর কালো তো তমাল বন।
আর কালো দেখো নবীন নীরদ ছিল হে দৃষ্টান্ত স্থল, কালো তো নীল কমল॥
সে কালোর কালোত্ব দেখেছে সবে, প্রেমোদয় অশ্রু হয় কারে বা ভেবে,
তোমারো মতনো চিকণ কালো না দেখি ভুবন-মণ্ডলে॥

মনে রইল সই! মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি বলা হল না॥
মরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে, নির্লজ্জ রমণী বলে হাসিত লোকে,
সখি ধিক্ ধিক্ আমারে, ধিক সে বিধাতারে, নারী জনম যেন আর করে না।
একে আমার এ যৌবন কাল, তাহে কাল বসন্ত এলো,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেলো॥
হাসি হাসি যখন সে আসি বলে, সে হাসি শুনিয়া ভাসি নয়ন জলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ফিরাইতে, লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁইও না।
তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদলাম সজনি॥
অনায়াসে প্রবাসে গেল সে গুণমণি!
একি সখি হলো বিপরীত, মদন দহিছে এখন এ অবলার প্রাণে॥
প্রাণের জ্বালায় এখন প্রাণ বাঁচানো ভার।

লজ্জা পেয়ে লজ্জা বুঝি না রহে আমায়,—
কারে এ দুঃখ কব সই, কত আর প্রাণে সই, হল গো একি সখি যন্ত্রণা ॥

যৌবন জনমের মত যায়, সে ত আশা—পথ নাহি চায়।
কি দিয়ে গো প্রাণ সখি রাখিব উহায় ॥
জীবন-যৌবন গেলে আর, ফিরে নাহি আসে পুনর্ব্বার,
বাঁচিত বসন্ত পাব, কান্ত পাব পুনরায়।
গেল গেল এ বসন্ত-কাল, আসিবে তৎকাল।
কালে হল কাল আমার এ যৌবন কাল ॥
কাল পূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধ প্রবোধ মানে না,
আমি যেন রহিলাম তার আসার আশায়।
হায় ষোল-কলা পূর্ণ হল যৌবনে আমার,
দিনের দিন ক্ষয় হল সই ফল কি পাব তার,
কৃষ্ণপক্ষ প্রতিপদে হয় শশি-কলা ক্ষয়, শুক্লপক্ষে হয় পুন পূর্ণোদয়,
যুবতীর যৌবন হলে ক্ষয়, কোটি কল্পে পুনঃ নাহি হয়,
যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্য গমন প্রায় ॥

আণ্টুনি।

কবিগানে আণ্টুনিও খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি পর্ত্তুগীজ; ব্যবসায়-কর্ম্ম উপলক্ষে বঙ্গদেশে আগমন করেন,—ফরাস-ডাঙ্গায় ইঁহার প্রথম অধিবাস। এই স্থানেই ইনি এক ব্রাহ্মণ-যুবতীর প্রেমে পড়েন। শেষে যুবতীকে লইয়া গরীটির নিকট গিয়া বাস করেন। তাঁহার বিস্তৃত বাগান-বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি তথায় দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

আমার কোন আত্মীয় বলেন,—"আণ্টুনি সাহেবের বাটীর ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি আমার স্মৃতিপথে বিলক্ষণ জাগরূক আছে। উহা ফরাসডাঙ্গার নিকট গরীটির বাগানে ছিল। রেলরোড্ হইবার পূর্ব্বে বাটী যাইবার

সময়ে আমাদিগের নৌকা সর্ব্বদাই গরীটির বাগানের নীচে দিয়া যাইত। সুতরাং আণ্টুনি সাহেবের ভগ্নবাটী সর্ব্বদা আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত। কিছু দিন পরে গরীটির বাগান ভয়ানক অরণ্যে পরিণত হইয়া দস্যুদলের আশ্রয় স্থান হইয়া উঠিয়াছিল।"

আণ্টুনি যৌবনকালে ফরাসডাঙ্গার কয়েকটী দুষ্ট লোকের সংসর্গে পড়িয়া নষ্ট-চরিত্র হন। ইনি প্রথমে একজন হিন্দু-কবিওয়ালার দলে প্রবিষ্ট হন;—পরে নিজেই দল করেন।

ইহাঁর প্রেমিকা ব্রাহ্মণকন্যা ম্লেচ্ছ-পত্নী হইলেও হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবতী ছিলেন;—দুর্গোৎসবাদি করিতেন। পূজায় তাঁহার বাটীতে কবি হইত। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণকন্যার সম্পর্কে থাকিয়া, সাহেব উত্তমরূপ বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন,—কবির গান বেশ বুঝিতে পারিতেন। ক্রমে তাঁহার কবির নেশা জমিয়া গেল; তিনি সখের দল করিলেন। প্রেমে পড়িয়া ইতিপূর্ব্বে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন; এক্ষণে যা কিছু সঞ্চিত বিত্ত ছিল, সখের কবির দলে তাহাও নিঃশেষ করিলেন। কাজেই তখন সখের দলকে পেশাদারী করিতে হইল। দলের পসার বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল,—অর্জ্জিত অর্থে তাঁহার সচ্ছন্দে সংসার চলিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাঁর দলে গান বাঁধিয়া দিতেন,—শেষে ইনি নিজেই উত্তম উত্তম গীত রচনা করিতে লাগিলেন। একবার ঠাকুরদাস সিংহের দলে রাম বসু,—এণ্টনিকে বলেন,—

"কও হে এণ্টুনি!
আমি এইটি শুন্‌তে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে,
তোমার গায়ে কেন কুর্ত্তি নাই॥

আণ্টুনি উত্তর দিলেন,—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাকুরো সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তিটুপী ছেড়েছি।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে,—সাহেব, সাহেবী বেশ—কোর্ত্তা, টুপি পরিতেন না,—তৎকালীন বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি চাদরই ব্যবহার করিতেন।

আর একবার নিজের দলে থাকিয়া‚ রাম বসু আণ্টনি সাহেবকে বলেন,—

'সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি॥
ও তোর পাদরি সাহেব শুন্‌তে পেলে গালে দিবে চুণ কালি॥"

আণ্টুনি জবাব দিলেন;—

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু, প্রভেদ নাইরে ভাই!
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা, যে, হিন্দুর হরি সে—ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,—
আমার মানব জনম সফল হবে,—যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥

একবার দুর্গোৎসবের সময় চুঁচুঁড়ার কোন ধনবান লোকের বাড়ী আণ্টুনির দলের বায়না হইয়াছে। গোরক্ষনাথ ঠাকুর তখন সাহেবের দলের বাঁধনদার। গোরক্ষনাথ আণ্টুনিকে বলিলেন,—"আমার সংবৎসরের মাহিনা এই পূজার আগে শেষ করিয়া দিতেই হইবে,—না দিলে,—আমি নূতন আগমনী বাঁধিয়া দিব না।" সাহেব,—এবার বড়ই রাগিয়া উঠিলেন। তিনি আর গোরক্ষনাথের তোয়াক্কা রাখিলেন না,—নিজেই আগমনীর নূতন গান বাঁধিয়া লইলেন। এই গানের দুইছত্র এইরূপ;—

"আমি ভজন সাধন জানিনে মা! নিজেতে ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া করে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥

একটী বিপক্ষ দল আণ্টুনি সাহেবকে বলেন,—

আণ্টনি ফিরিঙ্গী কফন্ চোর। ভাঙ্গে রাত হলে সব গৌত গোর॥
টাটকা গোরে শুটকা ভূতের রব,—একি অসম্ভব,—
এ হুমকি দিয়ে বস্তু লোটে সব,—এর ঠায় ঠিকানা গেল জানা;
মানুষ হলো তিন সহর॥"

রাসু নৃসিংহ।



ফরাস ডাঙ্গার গোন্দলপাড়া পল্লী রাসু-নৃসিংহের জন্মভূমি। বাঙ্গলা দ্বাদশ শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—রাসু ও নৃসিংহ,—দুই সহোদর। ইহাঁদের এই একটি গানেরই মূল্য বুঝি লক্ষ টাকা,—

"ইহাই ভাবিহে গোবিন্দ! সঘনে। আঁখি ভাসে পরাণো পোড়ে আগুনে॥
কি দোষ বুঝিলে রাধারে ত্যজিলে, কু'জীরে পুজিলে কি গুণে॥
জগত সংসারো, ভুলাইতে পারো, তোমারো বঙ্কিম নয়নে।
ওহে কুব্জী অবহেলে, বসিয়ে বিরলে, তোমারে ভুলালে কি গুণে॥
শ্যাম! রূপে গুণে পূর্ণ, সকলি সুধন্য, অতুল্য লাবণ্য রাধারো।
ইহাই ভেবে মরি, কুব্জা বিহারী, কি সুখে হয়েছ নাগরো॥
শ্যাম! রূপেরো বিচারো, যদি মনে করো, মজেছ যাহার কারণে।
ওহে, লক্ষ কুব্জারো, রূপেরো ভাণ্ডারো, শ্রীমতী রাধারো চরণে॥
শ্যাম! গুণেরো গরিমে, কি কহিব সীমে, আগমে যাহারো প্রমাণে॥
যার গুণ গেয়ে, মুরলী বাজায়ে, নাম ধরো বংশীবদনে॥
শ্যাম! যার গুণাগুণ, করিতে সাধন, সনাতন গেল কাননে।
ওহে, একড় বেদন, ত্যজিয়ে সে ধন, অধমে রেখেছ যতনে।
শ্যাম! আপনার অঙ্গ, যেমন ত্রিভঙ্গ, কালীয় ভুজঙ্গ কুটিলে।
কুব্জার অঙ্গ, রসের তরঙ্গ, তাহাতে শ্রীঅঙ্গ ডুবালে॥
শ্যাম! এই ভূমণ্ডলে, আধ গঙ্গাজলে, রাধা কৃষ্ণ বলে নিদানে।
এখন কু জি-কৃষ্ণ ব'লে, ডাকিবে সকলে, ভুবন তরাবে দুজনে॥
শ্যাম! ত্যজিলে শ্রীমতী, তাহাতে কি ক্ষতি, যুবতী সকলি সহিল।
ভুজঙ্গ-মানিক, হ'য়ে নিল ভেক, মরমে এ দুখ রহিল॥
শ্যাম! প্রদীপের আলো, প্রকাশ পাইল, চন্দ্রমা লুকাল গগনে।
ওহে, গো-খুরের জল, জগৎ ব্যাপিল, সাগর শুকাল তপনে॥



সাতুরায়।

সাতুরায়ও একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইহাঁর নিবাস—বৈঁচি; হুগলী জেলার বৈঁচি নহে,—নদীয়া-শান্তিপুরের নিকট বৈঁচি। ইনি জীবনে কখন কবির দল করেন নাই,—কোন দলের বেতনভুক বাঁধনদারও ছিলেন না, বরাবর চাকরী করিতেন;—ইহাঁর শেষ চাকরী,—রাণাঘাটের পাল চৌধুরীদের তরফে বারাসতে,—মোক্তারী। শান্তিপুরের জমিদারগণ ইহাঁর একান্ত কবিত্বপ্রিয় ছিলেন। প্রথম বয়সে ব্রাহ্মণ সাতু রায় ইহাঁদের বাটিতেই থাকিতেন। শিবচন্দ্রের সখের দলে ইনি অনেক গান বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। সাতু রায় আশৈশব কবি। ইহাঁর একটি গান শুনুন,

"অপরূপ একি রূপ কৃষ্ণরূপ লিখেছ গো রাই:
লিখলে সব শ্যামের অবয়ব গতি নাই যে চরণ বই, সে চরণ গো কৈ!
ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই॥
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে খেদে কিশোরী, কৃষ্ণরূপ করিয়ে মনন,
নির্জ্জনে শ্যামধনে দেখবার হল আকিঞ্চন
ভুলে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ করে লিখন, মথুরায় পাছে যায় সেই ভয়ে লিখলেন না যুগল চরণ.
এরূপ করিয়া দরশন, জিজ্ঞাসেন সখীগণ, রাই রাই গো বল রঙ্গময়ি—একি রঙ্গ দেখি।
একি ভাব সুধাংশুমুখি! তোয় সুধাই; কও কি ভাবে এ ভাবের হল উদয় কিশোরি,
শ্যাম শরীর লিখলে লিখিলে সমুদয়,
আমরা যে চরণ শরণ লয়েছি সর্ব্বজন রাই রাই গো॥
আজ কি সে চরণ লিখতে তোমার স্মরণ নাই!
এই বিনয় করি, লেখ গো কিশোরি, শ্রীহরির শ্রীচরণ অঙ্কলে আর ঝাঁপিসনে রাই!
অঙ্গহীন মাধুরী কর্ত্তে নাই দরশন, যে চরণ সাধন জন্য সদাশিব যোগধর্ম্ম করেন আশ্রয়,
ত্রিভঙ্গের সর্ব্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয়, যদি সেই চরণ লিখতে হলি বিস্মরণ!
দুঃসহ বিরহ কিশোরি, কিসে করবি নিবারণ, বিচ্ছেদ যন্ত্রণা পারাবার যা হতে হবে পার
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুললে তাই।"

এই গানের উত্তর,—

"নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই এই আশঙ্কায়।
শ্রীমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি শ্রীপদ লিখে শ্রীমতী খেদে কয়॥

বলবো কি ও সখি! বলতে বিদরে হৃদয়, লিখে শ্রীকান্তে লি খি নাই সই!—শ্রীচরণ,
কি কারণ বিবরণ বলি শোন, লয়ে গেল শ্যাম কংসালয়,—
আনুলে না নন্দালয়,—সই সই সই গো! রইল দুরাশয় নিঠুর হয়ে মথুরায়।
সই! সময় যখন মন্দ হয়, চিত্র ময়ূরে গেলে হার, বিচিত্র কি চিত্র-শ্যাম যদি মধুপুরে যায়"

রঘুনাথ দাস।

কেহ বলেন, রঘুনাথ সৎশূদ্র, কেহ বলেন কর্ম্মকার। কেহ বলেন, কলিকাতায়, কেহ বলেন,—সালিখায়,—কেহ বলেন গুপ্তিপাড়ায় রঘুর বাস ছিল। রঘু প্রকৃত পক্ষে দাঁড়া কবির সৃষ্টিকর্ত্তা। রঘুর নিকটই রাসু নৃসিংহের "কবি" শিক্ষা। রঘুর একটী গান এইরূপ,—

"ধিক ধিক ধিক তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন, সে চাহে না, আমি তার যোগাই মন॥
যেখানেতে না রহিল মানী জনার মান, সে কেমন অজ্ঞান তারে সঁপে প্রাণ,
সেধেকেঁদে হয়ে গেছে কলঙ্ক ভাজন।
একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন, কেহ সুখে থাকে কেহ দুঃখে জ্বালাতন।
শয়নে স্বপনে মনে যে যারে ধেয়ায়, সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ॥
সখি পিরীতি পরম ধন জগতের সার, সুজনে কুজনে হলে হয় ছারখার,
সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই! কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই,
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছনা।
যারে ভাবিব আপন সই তার এ বোধ নাই, এমন প্রেমের মুখে তারো মুখে ছাই,
হেন অরণ্য রোদনে ফল আছে কি, এ হতে সুখী একা যে থাকি,
ধরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন॥
যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ, আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ,
অতিদৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন, এজন-মিলন না দেখি কখন,
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন॥

মোহনদাস বৈরাগী।

ইহাঁর নিবাস ছিল যশোর—বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী গোপালনগর। ইহাঁর "ছুট"—সঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পুত্র যদুবর দাস। ইনি পিতৃরচিত পদ সমূহ নিজের দলে গান করিতেন। ইনি উত্তম-রূপ মৃদঙ্গ বাজাইতে পারিতেন। ইহাঁর একটি গান এই—

বাগেশ্রী—ঢিমা তেতালা।

দেখো কৃষ্ণ যাই জলে, তব কষ্টে প্রাণ জ্বলে, লজ্জা যদি পাই হে জলে,
ঝাঁপ দিব যমুনার জলে॥
গোকুল ভাসে মোর ডুবেবে, কিসে দাসীর কুল রবে, জলাধারে জল কি রবে,
জলধর প্রতিকূলে॥
দাসী দোষী এ গোকুলে, কলঙ্কিনী সবাই বলে,
ছিদ্র কুম্ভে আনতে বারি, যাইহে হরি! তোমায় ব'লে॥
যেদিন হ'লে প্রতিকূল, সেদিন হারিয়েছি দুকূল, এখন পাইবে একুল ওকুল,
মনে রেখো যমুনার কুলে॥"

লালু নন্দলাল।

লালু নন্দলাল,—রামু নৃসিংহের সমকালীন লোক। ইহাঁর সঙ্গীত এক্ষণে একান্ত দুষ্প্রাপ্য। একটী মাত্র পাইয়াছি।

"হ'ল এ সুখ-লাভ পীরিতে চিরদিন গেল কাঁদিতে॥
হয়েছে না হবে কলঙ্ক, আমায় গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কত দূর,
শেষে এই হল, কাণ্ডারী পালাল,—তরণী লাগিল ভাসিতে॥
ধন প্রাণ মন যৌবন দিয়ে, শরণ লইলাম যার,
তবু তার মন পাইনা সখি—হল আমার দায়
না পূরিল সাধ, উদয়ে বিচ্ছেদ, মিছে পরিবাদ জগতে॥

ভবানী বেনে।

ভবানী—জাতিতে গন্ধবণিক। কলিকাতা—বরাহনগরে ইহাঁর জন্মস্থান। কেহ কেহ বলেন,—বর্দ্ধমান জেলার অম্বিকা কালনার নিকট সাতগেছে গ্রামই ইহাঁর জন্মভূমি। তবে ইনি কলিকাতা-বরাহনগরে থাকিতেন। ইহাঁর একটী গান এইরূপ ;—

"একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ বলে ডাক্‌রে কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে, তাপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে,
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল-ডালে॥
জুড়াবে গোকুল বাসী গোপী সকলে,
শুনাও মধুমাখা মধুস্বর, ওরে পিকবর,—রাধার কর্ণ-কুহরে।
সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্ব্বাণ হয়,
কৃষ্ণ-প্রেমের জ্বালা যাবে কৃষ্ণ নাম নিলে॥
বসন্ত সময় ব্রজে হল না বসন্তের অভ্যুদয়,
দূতী কৃষ্ণ বিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কয়,
সেই বৃন্দাবন চন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই,
দুঃখের কি দিব সংখ্যে, কৃষ্ণপদ—পঙ্কে, অঙ্গ ঢেলে আছে রাই,—
জুড়ায় কমলিনীর জীবন, ব্যথার ব্যথী এমন কে—
ওরে পক্ষ, হও সাপক্ষ, দুখিনী বলে॥
আমরা দুখিনী গোপী বিরহিণী কৃষ্ণ-বিরহে,
দেখরে বিহঙ্গ, বিনে ত্রিভঙ্গ, অনঙ্গে অঙ্গ দহে,
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কলেবর, শোন্‌রে ওরে পিকবর,
সে পায় জীবন এখন ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে॥"

ভোলা ময়রা।

ইনি কলিকাতা সিমুলিয়া বাসী। ইহাঁর কবির দলেরও বেশ প্রসিদ্ধি ছিল। ইনি ৭৩ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইহাঁর একটী গানের একাংশ এইরূপ,—

"চিন্তা নাই চিন্তামণির বিরহ ঘুচিল এত দিনের পর।
অন্তর জুড়ালো ওগো কিশোরি! হেরে অন্তরে বাঁকা বংশীধর॥
যে শ্যাম বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর,—
সেই চিকণ কালো, হৃদে উদয় হ'ল এখন সুশীতল কর গো অন্তর॥

গোবিন্দ অধিকারী।

হুগলী জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকট জাঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগী-কুলে গোবিন্দচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার প্রকৃত সন তারিখ জানা নাই; তবে তিনি যে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পক্ষে সন্দেহ অতি অল্পই। কারণ খৃঃ ১৮৭০ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে আমাদের কোন বন্ধু গোবিন্দচন্দ্রের নিজের মুখে শুনিয়াছেন যে, গোবিন্দের বয়স তখন সত্তরের দুই এক বৎসর কম কি বেশী। গোবিন্দ "নাম ডাকা" বৈষ্ণবের পুত্র ছিলেন; বাল্যকালে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিক্ষা হইয়াছিল মাত্র;—অন্য হইলে বয়সকালে তাহার কিছুই স্মরণ থাকিত না, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের প্রতিভা এই অল্প শিক্ষাকেই মাজিয়া ঘসিয়া বেশ কার্য্যোপযোগিনী করিয়া তুলিয়াছিল। গোবিন্দ বাল্যকালে হাবড়া জেলায় আমতার নিকটবর্ত্তী ধুরখালী গ্রামের গোলোক দাস অধিকারীর নিকট কীর্ত্তন শিক্ষা করেন। গোলোক তৎকালে সেদেশে একজন সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনকর ছিলেন। গোবিন্দ তাঁহারই কীর্ত্তন সম্প্রদায়ে দোহারী করিতে করিতে মহাজন প্রণীত পদাবলী অভ্যাস করিতে থাকেন; অল্প দিন মধ্যে গোলোকের হাব ভাব তাঁহার সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তা হয়। ক্রমে গোবিন্দ আপনি একটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায় গঠন করিয়া স্থানে স্থানে কীর্ত্তন গাইয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ অর্থাগমের উপায় না দেখিয়া তিনি "কালীয়দমন" যাত্রার সম্প্রদায় গঠন করেন; অল্পদিন মধ্যেই এ যাত্রার প্রতিষ্ঠা হয়। তখন আর জাঙ্গিপাড়া-কৃষ্ণনগরে থাকিয়া গোবিন্দের তৃপ্তিলাভ হইল না। তিনি আপনার সম্প্রদায়

লইয়া কলিকাতার সমীপবর্ত্তী সালিখায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দের প্রতিভার বিকাশ পাইতে লাগিল। গোবিন্দ কৃষ্ণবিষয়ক ভাল ভাল ভক্তিপূর্ণ গীত বাঁধিয়া গাইতে লাগিলেন, গোবিন্দের অনুপ্রাসের ছটায় সকলেরই মন ভুলিয়া গেল; চারিদিকে হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার নাম শুনিলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উন্মত্তের ন্যায় একগ্রাম হইতে বহুদূরবর্ত্তী গ্রামান্তরে যাইতে কাতর হইত না। যাত্রার আসরে লোক ধরিত না,—তিল ফেলিবার স্থান কুলাইত না। গোবিন্দ আসরে আসিবেন; এই আশায় সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিত, আসরে অবতীর্ণ হইলে ঘন ঘন হরিধ্বনি হইত, গান ধরিলে,—দূতীগিরি আরম্ভ করিলে তো কথাই ছিল না,—হাজার হাজার লোকের জনতাপূর্ণ স্থান নীরব নিস্তব্ধ হইত। এইরূপে যাত্রা করিয়া গোবিন্দ জমিদার হইয়াছিলেন, প্রভূত ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল বঙ্গীয় শ্রোতৃবৃন্দের শ্রুতি পবিত্র করিয়া গোবিন্দ সালিখার গঙ্গাতীরে নশ্বর নরদেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

গোবিন্দ যখন স্বয়ং 'সারী শুকের বিবাদ' গাহিতেন, তখন মনে হইত, ঠিক যেন বৃন্দাবনের সেই মধুর লীলা শ্রোতৃ-চক্ষে প্রতিভাত হইতেছে। নূপুরের এ উক্তি কি মর্ম্মস্পর্শিনী!

"নূপুর শোনরে শোন, বিনে সুজন, সুজনের বেদন জানে না।
অবোধ যদি উচ্চ ভাষে, সুবোধ বুঝায় মৃদুভাষে,
ভাবের আভাসে ভাসে, কভু ডুবে না॥
বড়র বড় দায়, তাতে কি বড়ত্ব যায়, পেলে একদিন বড়ই পায়।
বড় ঝড় বড় গাছ বই লাগে না॥"

৺ব্রজমোহন রায়।

৺ ব্রজমোহন রায়ের জন্মস্থান জিরাট-বলাগড়, জেলা হুগলী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। তিনি বাল্যকালে বাঙ্গালা পাঠশালায় বাঙ্গলা এবং ইংরেজী স্কুলে কিছু ইংরেজী শিক্ষা করিয়া, অল্প দিন কোন আপিষে

কাজও করিয়াছিলেন, পরে যাত্রার সম্প্রদায় গঠনে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। প্রায় ৪০।৪৫ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহান্তর হইয়াছে।

ইঁহার যাত্রা সবিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইনি নিজে পালা রচনা করিতেন।

রূপচাঁদ অধিকারী।

ঢপ-কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনে ইনি সমধিক প্রসিদ্ধ। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, —"ইদানীন্তন কালের মধ্যে কত কত মহাশয় যে, নানাবিষয়ক রচনা করিয়া, বাঙ্গলাভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর, তন্মধ্যে * * * রূপচাঁদ অধিকারীর ঢপ অন্যতম।—দুঃখের বিষয়, বহু অনুসন্ধানেও রূপের ঢপ-সঙ্গীত আমরা একটীও সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় রূপচাঁদের নিবাস ছিল। ইঁহার পিতার নাম প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। শুনিতে পাই, ইনি আশী বৎসর জীবিত ছিলেন। রূপচাঁদ প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা করিতেন, পরে এক সন্ন্যাসীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া, ঢপ-কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। সন্ন্যাসী ইঁহাকে এক ডুবকী উপহার দেন। ঢপ-কীর্ত্তনে ইনি বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করেন। ইহার কীর্ত্তনে মুগ্ধ হইয়া, বেলডাঙ্গার জমিদার জগৎ শেঠ ইঁহাকে কয়েক বিঘা নিষ্কর জমি দেন, একটী বাটীও তৈয়ার করাইয়া দেন। বেলডাঙ্গার সেই বাটীর ভগ্নাংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান। রূপের ঢপ যে শুনিত, সেই মুগ্ধ হইত; এখনও বেলডাঙ্গা-অঞ্চলের লোকে বলিয়া থাকে;—

"বাজলো রূপ অধিকারীর খোল। মাগীরা সব চরকা তোল॥

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ।

বৰ্দ্ধমান জেলার রায়না থানার অধীন শাকনাড়া গ্রামে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ২রা বৈশাখ শনিবার পূর্ণিমারাত্রিতে প্রেমচাঁদ ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। ইঁহাদের বংশ পণ্ডিতের বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। অবসথী সর্ব্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, সাহিত্যদর্পণের টীকা-রচয়িতা রামচরণ বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিত মণ্ডলী এই বংশেই জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রেমচাঁদ প্রথমতঃ নৃসিংহ তর্ক-পঞ্চাননের নিকট সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করেন। তর্কপঞ্চানন মহাশয়,—প্রেমচাঁদের পিতামহের কনিষ্ঠ সহোদর। ইঁহার নিকট সংক্ষিপ্তসার পাঠ আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু সমাপ্ত হইল না। তর্ক-পঞ্চাননের দেহত্যাগ হইল। তখন প্রেমচাঁদ স্বীয় গ্রামেই মাতুলালয়ে অবস্থান করিয়া, সীতারাম ন্যায়-বাগীশের নিকট ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করেন। কিন্তু দৈব-বিড়ম্বনা এমনই,—মাতুলালয়ে বহুদিন অবস্থান তাঁহার পক্ষে নানা কারণে অসম্ভব হইয়া উঠিল; তিনি মাতুলালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

তথাপি ব্যাকরণ পাঠ তিনি কোনরূপে সমাপ্ত করিলেন; ইহার পর, তাঁহার কাব্য ও অলঙ্কার পাঠের ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পিতাকে এ কথা জানাইলেন। পিতা, মনোমত অধ্যাপক অনুসন্ধান করিতে উদ্যোগী হইলেন। এদিকে প্রেমচাঁদ কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে মন ঢালিলেন। এ সময়ে তাঁহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। কবিতা লিখিতে এবং গান বাঁধিতেও তিনি এই সময় হইতেই অভ্যস্ত হন।

অধ্যাপক মিলিল। শাকনাড়ার পাঁচ ক্রোশ দূরবর্ত্তী দুয়াড় গ্রামে জয়গোপাল তর্কভূষণের চতুষ্পাঠীতে তিনি পাঠাভ্যাসে নিরত হইলেন; আর দুয়াড় গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের দুইটী বালককে পড়াইয়া, স্বীয় উদর-পোষণের ব্যবস্থা করিলেন। গুরুগৃহেও তাঁহাকে নানারূপ কাজ কর্ম্ম করিতে হইত। ফল কথা, এ সময়ে তাঁহাকে বহুবিধ শারীরিক ক্লেশ সহ্য করিতে হইত।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কুড়ি বৎসর বয়সে প্রেমচাঁদ অধ্যয়নার্থ কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। হোরেসে হিম্যান উইলসন সাহেব তখন সংস্কৃতকলেজের সেক্রেটারী। তিনি প্রেমচাঁদের প্রতি বড়ই প্রসন্ন হই লেন। এখানে ছয় বৎসর মধ্যে তাঁহার শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইল।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে সংস্কৃতকলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত নাথুরাম শাস্ত্রী ছয় মাসের অবকাশ লয়েন। প্রেমচাঁদ তাঁহার পদে অধ্যাপক হইলেন। অনন্তর শাস্ত্রী মহাশয়ের মৃত্যু হইল। প্রেম-চাঁদ তখন এই পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত হইলেন। অধ্যাপক হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অধ্যয়ন স্থগিত হইল না। তিনি অতীব যত্নের সহিত ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত প্রভৃতি পড়িতে লাগিলেন। এই সময়ে এডুকেশন কমিটি তাহাকে "তর্কবাগীশ"-উপাধি—ভূষণে ভূষিত করেন।

ঈশ্বর গুপ্ত-প্রবর্ত্তিত সুবিখ্যাত "সংবাদ প্রভাকরে" প্রেমচাঁদ নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখেন। প্রভাকরের শিরোভাগ ন্যস্ত সংস্কৃতশ্লোক প্রেম-চাঁদেরই রচিত। ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত প্রেমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা খুবই হইয়াছিল।

বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা ছাড়িয়া, এইবার তিনি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়নে মন দিলেন। তিনি এগার খানি গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন,—যথা, (১) রঘুবংশের শেষ কয়েক সর্গ; (২) পূর্ব্ব নৈষধ; (৩) রাঘব পাণ্ডবীয়; (৪) কুমারসম্ভবের ৮ম সর্গ; (৫) চাটুপুষ্পাঞ্জলি; (৬) মুকুন্দ মুক্তাবলী; (৭) সপ্তমতী; (৮) অভিজ্ঞান-শকুন্তল; (৯) অনর্ঘ রাঘব; (১০) উত্তর-রামচরিত এবং (১১) কাব্যাদর্শ। তিনি তিনখানি গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন;

কস্ত শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; যথা,—বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহন চরিত; নানার্থ সংগ্রহ অভিধান এবং একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ। ইহাঁর নৈষধের টীকা দেখিয়া, বহুবিদ্যাভিমানী পণ্ডিতও ইহাঁর পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হন। পার্শী ভাষাতেও প্রেমচাঁদ বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন।

পেন্‌সন্ লইয়া প্রেমচাঁদ কাশীবাস করেন। কাশীধামেই ১২৭৩ সালের ১০ই চৈত্র শনিবার বিসূচিকা পীড়া হয়। ১২ই চৈত্র সোমবার এই রোগেই তিনি যোগ্যধামে গমন করেন।

প্রেমচাঁদের হৃদয় বড়ই কোমল ছিল। জীবের ক্লেশ তিনি দেখিতে পারিতেন না। কাঙ্গাল গরীবের দুঃখমোচনে তিনি যথাসাধ্য আন্তরিক চেষ্টা করিতেন। তর্কবাগীশ মহাশয়ের একখানি জীবনী গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রায় শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনকৃষ্ণের সাংসারিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না।

কৃষ্ণমোহন প্রথমে পিতার নিকট লেখা পড়া শিক্ষা আরম্ভ করেন, পরে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইহাঁর পুস্তকাদি কিনিবার অর্থ-সামর্থ্য ছিল না, হেয়ার সাহেব ইহাঁকে ইহার জন্য অর্থ সাহায্য করিতেন।

ডিরোজিও তখন হিন্দুকলেজের প্রখ্যাত নামা অধ্যাপক। ইনি ছাত্রগণকে প্রায়ই শিক্ষা দিতেন,—হিন্দুধর্ম্ম কুসংস্কার মূলক। ফলে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

কৃষ্ণমোহন হিন্দু কলেজের নিকটবর্ত্তী স্থানে গির্জ্জা স্থাপনে উদ্যোগী হন। বিস্তর হিন্দু ইহাতে আপত্তি করিয়া তদানীন্তন বরলাট অকলাণ্ডের

নিকট দরখাস্ত করেন। কৃষ্ণমোহন ব্যর্থ-মনোরথ হন। সিমলায় হেড়ুয়া-পুষ্করিণীর নিকট তাহার গির্জ্জা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এই সময়ে নানাবিধ প্রবন্ধাদি রচনা ও প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণমোহন কলিকাতা বোর্ড পরীক্ষা বিদ্যালয়ে তিন ভাষার পরীক্ষক ছিলেন। মাহিনা পাইতেন মাসিক তিন শত টাকা। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা সমূহেও তিনি সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষক হইয়া ছিলেন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি-এল উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণমোহন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের, কলিকাতা মিউনি-সিপালিটির, আসিয়াটিক সোসাইটীর ও বেঙ্গল সোসাইটীর সদস্য হইয়াছিলেন।

সংস্কৃত, লাটীন, হিন্দী, হিব্রু, উর্দ্দু, উড়িয়া, তামিলী, গুজরাটী এবং পারসী প্রভৃতি বহু ভাষায় কৃষ্ণমোহন ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নির্ভীক চিত্তে খৃষ্ট-ধর্ম্মের প্রচার করিতেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৭২ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহান্তর হইয়াছে। হাওড়া-শিবপুরে তাঁহার সমাধি হয়। কলিকাতা-টাউনহলে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণমোহন বিদ্যাকল্পদ্রুম প্রচার করেন। ইহা তাৎকালীন গবর্ণর জেনেরল লর্ড হার্ডিঞ্জের নামে উৎসর্গীকৃত। "মঙ্গলা-চরণ" নামক সেই উৎসর্গ পত্রের অংশ বিশেষ এইরূপ,—"বঙ্গভূমির মধ্যে সাধারণের মতিভ্রম নিবারণার্থে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় পুরাবৃত্ত ও পদার্থ বিদ্যার অনুবাদ এক উত্তম উপায়বোধ হইতেছে; কেন না অবিদ্যা ও ভ্রান্তির যে দুষ্ট শক্তি দেশ ব্যাপিয়া প্রবল আছে,তাহা হইতে সাধারণের মন এ উপায়ে মুক্তি পাইতে পারে; কিন্তু এই প্রকারে গৌড়ীয় ভাষাতে ইউরোপীয় বিদ্যার অনুবাদ যত বাঞ্ছনীয় তত সহজ নহে অতএব অসাধ্য জ্ঞান করিয়া আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত এ চেষ্টাতে বিরত ছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমীপে উৎসাহ পাইয়া উক্ত অনুবাদের প্রতি-জ্ঞাতে পুনশ্চ প্রবৃত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রসাদে নির্ভর রাখিয়া ইউরোপীয়

পুরাবৃত্ত পদার্থবিদ্যাক্ষেত্র পরিমাণ জ্যোতিষাদি সকল শাস্ত্র স্বদেশীয় ভাষাতে বিস্তার পূর্ব্বক পশ্চিম খণ্ডের জ্ঞান পূর্ব্ব খণ্ডে স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছি।"

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।

বিখ্যাত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গ-সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠ। নীতিসার, রোমের ইতিহাস, গ্রীসদেশের ইতিহাস প্রভৃতি ইঁহার গ্রন্থ।

কলিকাতার পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণবর্ত্তী চাঙ্গড়ীপোতা নামক গ্রামে ১৭৪২ শকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। হরচন্দ্র কলিকাতার বাঙ্গলা পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন; ব্রাহ্মণপণ্ডিত-বৃত্তিদ্বারাও ইঁহার যৎকিঞ্চিৎ অর্থোপার্জ্জিত হইত। তাহাতেই একরূপে সংসার-যাত্রা চলিয়া যাইত।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজে শিক্ষালাভ করেন। পাঠ সমাপ্তির পর প্রথমতঃ তিনি ফোর্ট উইলিয়ম্ কলেজে শিক্ষকের পদে, তৎপরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের সহকারী পদে নিযুক্ত হন; অনন্তর বহুদিন যাবৎ সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত শ্রমশীল, কর্ত্তব্য-পরায়ণ এবং পরোপকারী ছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের "সখা" নামক মাসিক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছেন,—"ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া, তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইয়াছিলেন।"

ধনীদিগের নিকট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যে বৃত্তি পান, তাহা লওয়া তাঁহার পক্ষে অন্যায় বলিয়া মনে হইত। এই জন্য সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদিগের নামে যে সকল বৃত্তি আসিত,তাহাতে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের যে অংশ থাকিত, তাহা তিনি লইতেন না। এরূপ শুনিয়াছি, একবার বর্দ্ধমানের রাজবাড়ী হইতে কিম্বা অন্য কোন মহাবিভবশালী ব্যক্তির বাড়ী হইতে অনেক-

গুলি মূল্যবান্ দ্রব্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তিরূপে তাঁহার নামে প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার পরিবারবর্গ সকলে সেই সমুদায় মূল্যবান্ বস্তু রাখিতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, তিনি কোন মতেই রাখিতে দিলেন না, সেই সমুদায় দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল। মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভূতপূর্ব্ব কার্য্যাধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অনেকবার অনেক প্রকারে বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বৃত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু দ্বারকানাথ কিছুতেই সম্মত হয়েন নাই। কেবলমাত্র সোমপ্রকাশের উন্নতির নিমিত্ত কয়েক সহস্র মুদ্রা লইয়াছিলেন। সোমপ্রকাশ ইহাঁর অক্ষয়কীর্ত্তি। সুরুচিসঙ্গত প্রণালীতে সংবাদপত্র লেখার ইনিই প্রবর্ত্তক। সোমপ্রকাশে রাজনীতির আলোচনা হইত।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৮ই ভাদ্র সোমবার বিস্ফোটক রোগে ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

ভূদেব দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সন্তান। পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। খানাকুল কৃষ্ণনগরে তাঁহার আদিবাস ছিল। বিশ্বনাথ খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে পৈতৃক ধাম উঠাইয়া, কলিকাতা হরিতকীবাগানে আসিয়া বাস করেন। ১২৩২ সালে ২রা ফাল্গুন কলিকাতা মহানগরীতে ভূদেব জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনাথের সংসার কষ্টে চলিত।

বিশ্বনাথ,—পুত্রকে আপন চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন। ভূদেবের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত অধ্যাপক বিশ্বনাথের চতুষ্পাঠীতে আগমন করেন। বিশ্বনাথও একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। উভয় পণ্ডিতে অনেকক্ষণ শাস্ত্রালাপ হইল। উভয়েই উভয়ের গুণে প্রীতি লাভ করিলেন। আহারান্তে নবাগত পণ্ডিত

কহিলেন,—"দেখি, তোমার ছেলে কিরূপ পণ্ডিত হইতেছে! বালকের যেরূপ রূপলাবণ্য এবং সুলক্ষণ সমূহ দেখিতেছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, কালে তোমার পুত্র একজন অসাধারণ লোক হইবে।"

নবাগত পণ্ডিত দশম বর্ষীয় বালক ভূদেবকে ব্যাকরণের কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূদেব তাহার একটীরও উত্তর দিতে পারিলেন না। পণ্ডিত রঘুবংশের প্রথম শ্লোক ভূদেবকে আবৃত্তি করিতে বলিলেন;—ভূদেব তাহাতেও সমর্থ হইলেন না। পণ্ডিত একটী চাণক্য-শ্লোকের অর্থ জিজ্ঞাসিলেন, তাহাতেও ভূদেব অকৃতকার্য্য হইলেন। নবাগত অধ্যাপক বিষম লজ্জিত; পিতা বিশ্বনাথ বিশেষ বিষণ্ণ হইলেন।

অধ্যাপক স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। ওদিকে বিশ্বনাথ ক্রোধযুক্ত হইয়া, পুত্রকে কহিলেন,—"তুই ত কুলের কুলাঙ্গার হইলি, আমি এত পরিশ্রম করিয়া তোকে পড়াই, কিন্তু তুই বিশেষ কিছুই শিখিতে পারিলি না! ধিক্ তোকে: আজ আমার মাথা হেঁট হইল। নাম ডুবিল।" এই কথা বলিয়া, বিশ্বনাথ পুত্রকে গুরুতর প্রহার করিলেন। এমন কি, ভূদেবের পিঠ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইল। ভূদেব কাঁদিলেন বটে, কিন্তু বিনা প্রতিবাদে সমস্ত সহ্য করিলেন।

পরদিন প্রাতে পিতা, পুত্রকে আবার ডাকিলেন। পুত্র কাছে আসিলেন। পিতা,—পাঠের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। পুত্র নীরব; কোন কথা কহিলেন না; কোন পাঠ পড়িলেন না। পিতা অনেক বুঝাইলেন, ভূদেব কোন কথা না শুনিয়া, কেবল নীরব হইয়া, রহিলেন। অবশেষে পিতা ক্ষান্ত হইয়া অপর ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। এবার পিতার হার হইল,—ভূদেবের জয় হইল!

বৈকালে আবার পিতা,—পুত্রকে পড়িতে বলিলেন। পুত্র পূর্ব্ববৎ নীরব। কেবল চ'খের জল ফেলিতে লাগিলেন। পিতা জিজ্ঞাসিলেন,—তুই কাঁদিস কেন?—সংস্কৃত পড়িস্ না কেন?"

এবার বালক ভূদেব উত্তর দিল,—"যে শাস্ত্র পাঠ করিলে, বাপকে এত নিষ্ঠুর করে, সে শাস্ত্র আমি কিছুতেই পড়িব না।" বিশ্বনাথের আবার হার হইল: ভূদেবের আবার জয় হইল।

পুত্রের ভাবগতিক দেখিয়া, বিশ্বনাথ ভূদেবকে ইংরাজী শিখাইতে বাধ্য হন। এইরূপে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, ইংরাজী-স্কুলে ভর্ত্তি হইল। তৎকালে একাজ বড়ই গর্হিত এবং নিন্দনীয় ছিল।

তখন কলিকাতার হিন্দুকলেজ প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু তথায় মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। বিশ্বনাথ মাসে মাসে পাঁচ টাকা দিতে কোথা পাইবেন? প্রথম দুই বৎসরকাল পাড়ার ছোট ছোট ইংরেজী স্কুলে পড়িয়া, ভূদেবের মন উঠিল না। হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি হইবার বাসনা, তাঁহার সদাই বলবতী ছিল। ক্রমে বিশ্বনাথ অন্যের সাহায্যে মাসিক পাঁচ টাকার যোগাড় করিয়া, পুত্রকে হিন্দুকলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পুত্র দ্বিগুণ উৎসাহে পড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি যে শ্রেণীতে পড়িতেন, সেই শ্রেণীর শীর্ষ স্থানে সদা অবস্থিতি করিতেন। এই সময় তিনি মেঘনাদবধকাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তকে সহপাঠীরূপে প্রাপ্ত হন।

যে সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া, বিশ্বনাথ পুত্রকে হিন্দু-কলেজে ভর্ত্তি করিয়াছিলেন, সে সাহায্য ক্রমশঃ বন্ধ হইল। ভূদেবের ষোল মাসের বেতন কলেজে বাকী পড়িল। ৮০৲ টাকা তাঁহাকে কে দিবে? ভূদেব বহুস্থানে টাকা কর্জ্জের চেষ্টা করিয়াও, কোথাও কৃতকার্য্য হইলেন না। অধ্যাপক সাহেবগণ ভূদেবকে যার পর নাই ভাল বাসিতেন বলিয়াই, ভূদেব এতকাল মাহিনা না দিয়া, ধারে পড়িতে পাইয়াছিলেন। কিন্তু আর চলে না। একদিন একজন অধ্যাপক ভূদেবকে স্পষ্ট বলিলেন, "ভূদেব! এ মাসে সমস্ত টাকা এককালে না দিলে, তোমার নাম কাটা যাইবে। আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী এইরূপ আদেশ করিয়াছেন।" অধ্যাপক উঠিয়া গেলে, ভূদেব এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া, কেবল চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই অবস্থায় ভূদেবকে গিয়া ধরিলেন; বলিলেন,—"ভূদেব! তুমি কাঁদিতেছ কেন? ভূদেব বলিলেন, "টাকার অভাবে হিন্দু-কলেজে আমার পড়া বন্ধ হইবে বলিয়া কাঁদিতেছি।" মাইকেল মধুসূদন টাকা সরবরাহ করিতে চাহিলেন; কিন্তু ভূদেব কহিলেন,—"তোমার টাকা লইতে আমি কুণ্ঠিত নহি। কিন্তু

আমার ইচ্ছা, নিজ চেষ্টাকৃত অর্থের দ্বারা আমার নিজের ব্যয় সংকুলান করিব। সাহেবেরা যদি আমাকে আরও দুই তিন মাস কলেজে থাকিতে দেন, তাহা হইলে আমি পরীক্ষা দিয়া জুনিয়র বৃত্তি পাইতে পারি। মাসিক ৪০৲ বৃত্তি পাইলে, আমার পিতার যথেষ্ট সাহায্য হইবে, আমার পড়াও উত্তম রূপে চলিবে।"

সুপারিশে সাহেবগণ ভূদেবকে পরীক্ষা-প্রদানের কাল পর্য্যন্ত কলেজে রাখিলেন। ভূদেব পঞ্চম শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণকে অতিক্রম করিয়া, বৃত্তিলাভ করিলেন এবং একবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলেন। বৃত্তি পাইয়া, ভূদেবের পঠদ্দশার দুঃখ ঘুচিল।

এক্ষণ হইতে যতদিন ভূদেব কলেজে পড়িয়া ছিলেন, ততদিন তাঁহার সুখে স্বচ্ছন্দে কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। কলেজের পাঠ শেষ হইলে, আবার দুঃখের দশা পড়িল। আর তিনি বৃত্তি পান না,—কাজেই আবার নিদারুণ অন্ন-কষ্ট উপস্থিত হইল। তাঁহার সে কালের ডিপুটী মাজিষ্টর হইবার সাধ ছিল। তাঁহার মুরুব্বি রিচার্ডসন সাহেবও তাঁহাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলেন। কিন্তু হঠাৎ রিচার্ডসন, কলেজের কাজ ত্যাগ করিলেন, অন্য একজন নূতন ইংরেজ অধ্যাপক বিলাত হইতে আসিলেন। তাঁহার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি,—ভয়ঙ্কর ভাব। ভূদেব তাঁহাকেই একদিন আপনার চাকুরীর কথা বলেন। তিনি উত্তর দেন,—"আমি চাকুরী কোথা পাইব? আমি তোমাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছি। তুমি সিনিয়র স্কলার হইয়াছ। তোমার দুই চক্ষু, দুই হাত পা আছে, তুমি নিজে চাকুরী খুঁজিয়া লও। আমার কাছে তোমার চাকুরীর কথা উত্থাপন করিবার কালে তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল।"

ভূদেব কোন উত্তর না দিয়া, বিষণ্ণ বদনে ঘরে ফিরিলেন। ঘরে গিয়াও সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। কারণ, পিতা বিশ্বনাথ তাঁহাকে চাকুরী করিবার জন্য সদাই উত্যক্ত করেন।

পিতা বলিলেন—"এ যে আরও দু'বছর কলেজে পড়া তোর পক্ষে ভাল ছিল। কলেজে উত্তীর্ণ হইয়া, তুই যে সব মাটি করিলি দেখিতেছি।

দেখ বাছা, যেখানে পাস্, একটা চাকরী দেখ্, সংসার যে আর চলে না।"

ভূদেব কলিকাতার কোন সওদাগরী আফিসে চাকরীর উমেদার হইয়া গমন করিলেন। বড় সাহেব ভূদেবের মূর্ত্তি দেখিয়া সদয় হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন,—"তুমি সওদাগরের ঘরের কোন কাজ জানো কি?" ভূদেব কহিলেন,—"না, আমি সিনিয়ার-স্কলার; নূতন পাস হইয়াছি।" সাহেব দুঃখিত অন্তঃকরণে বলিলেন,—"না, বাবু! এখানে তোমার চাকরী হইবে না। আমাদের কাজে সিনিয়র স্কলারের কোন আবশ্যকতা নাই। তোমাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা। দোকানদারী কাজ তোমাদের মত লোকের দ্বারা হইবে না। অতএব তুমি অন্যত্র চাকুরীর চেষ্টা দেখ।"

ভূদেব ভগ্নমনে ঘরে ফিরিলেন। পরদিন আবার অন্য এক সওদাগরি আফিসে গেলেন। সেখানে বড় সাহেব ভূদেবকে তিন মাসকাল বিনা বেতনে এপ্রেণ্টিস থাকিতে বলেন। ভূদেব, সাহেবকে সেলাম করিয়া, সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

গ্রহগণ যখন বিগুণ থাকে, তখন মানুষ সহস্র-চেষ্টাতেও আশানুরূপ ফল পায় না। ভূদেব,—সিনিয়র স্কলার ভূদেব—কলেজের শ্রেষ্ঠ ছাত্র ভূদেব,—অধ্যাপকগণের পরম প্রিয় পাত্র ভূদেব,—এইরূপ একমাস কাল কলিকাতা সহরে ঘুরিলেন; কিন্তু চাকুরী কোথাও যুটিল না। এই সময়,—অর্থাৎ কলেজে উত্তীর্ণ হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে—ভূদেবের বিবাহ হইয়াছিল। একে পিতামাতার সংসার অর্থাভাবে অচল, তাহার উপর বিবাহ-বন্ধন, কাজেই ভূদেব বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

একদিন সন্ধ্যাকালে ভূদেব সমস্ত কলিকাতা সহরটি চাকুরীর চেষ্টায় ঘুরিয়া ফিরিয়া, একহাঁটু ধূলার সহিত, শুষ্ক-মুখে, পিপাশা এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া, ঘরে ফিরিলেন। ঘরের নিকট গিয়া শুনিলেন, পিতা মাতার কিঞ্চিৎ কলহ উপস্থিত হইয়াছে। ঘরে আর ভূদেব ঢুকিলেন না। দ্বারদেশেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাতা বলিতেছেন,—"বৌকে একবার আনিতে হইবে।" পিতা বলিতেছেন,—"ঘরে আমাদের এক

সের চাল নাই। আমি আধ-পেটা খাই, তুমিও আধ-পেটা খাও। এ স্থলে বৌ আনিয়া ফল কি?" মা বলিতেছেন,—"তথাচ বৌ আনিতে হইবে। সে ও আমাদের সঙ্গে আধ-পেটা খাইয়া থাকিবে।" বাপ বলিতেছেন,—"তোমাদের স্ত্রীবুদ্ধি; তোমরা সংসার ভাল বুঝ না; এই ভূদেবের একটী চাকুরী হইলেই, আমি বৌ ঘরে আনিব। এখন ক্ষান্ত হও।" মাতা বলিলেন; আমি ক্ষান্ত হইব না; আমি যেমন করিয়া হউক,—আমি নিজে না খাইয়া বৌকে খাওয়াইব।" পিতা এই সময় বলিলেন,—"ছেলেটা যে কি হইয়া উঠিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। উহার মুখ চাহিয়া আমরা আছি। কিন্তু এই হতভাগ্য লোকের হতভাগ্য ছেলের আজিও পয়সা আনিবার শক্তি হইল না।"

ভূদেবের বুকে পিতার বাক্য-বাণ বাজিল। ভূদেব ঘরে না ঢুকিয়া, অমনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। হাতে একটীও পয়সা নাই। তিনি পায়ে হাঁটিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে চুঁচুড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন।

ভূদেবের তখন মনে মনে সংকল্প,—"এজীবন আর রাখিব না। মাতার কষ্ট, পিতার কষ্ট, স্ত্রীর কষ্ট,—এ কষ্ট মোচনের কোন উপায় নাই। সুতরাং এ প্রাণ রাখিয়া আর ফল কি? এ সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল, এ সংসারে যে ব্যক্তি উদর পূর্ণ করিয়া, বিবিধ সামগ্রী খাইতে পায়, উত্তম উত্তম পরিধেয় বসন পায়, নিদ্রার জন্য সুরম্য অট্টালিকা পায়, তাহারই বাঁচিয়া থাকা কর্ত্তব্য। দরিদ্রের—অর্দ্ধভুক্ত ব্যক্তির—ছিন্ন বস্ত্র পরিধানকারীর—কুঁড়ে ঘর বাসীর—মৃত্যুই মঙ্গল। যে ব্যক্তি অকৃতি, অধম,—পিতা-মাতা-স্ত্রীর ভরণ পোষণে অসমর্থ, তাহার মৃত্যুই মঙ্গল। অতএব আমি মরিব। আমি আত্মহত্যা করিব।" চুঁচুড়ায় আসিয়া তিনি এইরূপ ভাবেন,—আর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। কিন্তু আত্মহত্যার সুযোগ-সুবিধা পাইলেন না। গলায় দড়ি দিব কি? কিন্তু দাড় কোথায়? সঙ্গে এমন একটীও পয়সা নাই যে, দড়ি কিনিয়া গলায় দিতে পারেন। আফিন্ খাওয়া সহজ, কিন্তু আফিন্ কিনিবার পয়সা কৈ? কাপড় এবং চাদর এরূপ জীর্ণ এবং ছিন্ন যে, তাহা পাছে টাঙ্গাইয়া গলায় ফাঁস দিলে, কাপড় চাদর ছিঁড়িয়া যাইবে, আর আমার মরা হইবে

না। জলে ঝাঁপ দিব কি ? তাই ত সহজ। বেলা প্রায় দুইটার সময় তিনি গঙ্গাজলে গিয়া পড়িলেন। ভূদেব এক গলা জলে গিয়া ডুব দিলেন, গঙ্গামাতার এমনি মাহাত্ম্য যে, শরীর শীতল হইল। আবার উঠিলেন,—আবার ডুব দিলেন ;—ভূদেবের মরা হইল না। ভূদেব গঙ্গাতীরে উঠিয়া চাদর দ্বারা মাথা মুছিলেন।

ভূদেব বাল্যকাল হইতেই দার্শনিক ; বাল্যকাল হইতেই কার্য্যতঃ নৈয়ায়িক। ভূদেব ভাবিলেন, এত গোলযোগ করিয়া মরিতে গেলাম কেন ? মরিবার ত অতি সহজ উপায় রহিয়াছে। অনাহারে থাকিলে ত আমি আপনা আপনি নিশ্চয় মরিব। এরূপ মৃত্যুতে কোন গোল নাই,—বালাই নাই,—উপসর্গ নাই। অতএব অনাহারে প্রাণত্যাগ স্থির।

সন্ধ্যার প্রাক্কাল। ভূদেব আপন মনে চুঁচুড়ায় পথে পথে ফিরিতেছেন। কোন চুঁচুড়াবাসী তাঁহাকে চিনে না। তিনিও তত্রত্য কোন অধিবাসীকে চিনেন না। প্রায় বার ঘণ্টার অধিক কাল তিনি চুঁচুড়ায় আসিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত ভূদেবকে একবার ডাকিয়াও কেহ বলে নাই, "তুমি কে ? কোথায় যাইবে ? কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন ? কি নিমিত্ত এরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?" অপরিপক্কবুদ্ধি-যুবক ভূদেব প্রায় ৩৬ ঘণ্টাকাল অনাহারে আছেন। এক হালুইকর ব্রাহ্মণের দোকানে লুচিভাজা হইতেছে। যে স্থানে গরম গরম লুচি ভাজা হয়, সে স্থান হইতে অপূর্ব্ব সৌরভ উঠে; ক্ষুধার্ত্ত ভাবুক ভিন্ন সে ভাব বুঝিতে আর কেহ সমর্থ নহেন। ভূদেব তীব্র দৃষ্টিতে লুচিভাজার স্থানের দিকে চাহিলেন,—লুচির প্রতি চাহিলেন,—হালুইকরের প্রতি চাহিলেন,—গরম গরম লুচি দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত ভূদেবের মন মজিয়া গেল। পাছে ব্রত ভঙ্গ হয়, এই ভয়ে ভূদেব কিন্তু সে স্থানে অধিকক্ষণ রহিলেন না। সে প্রলোভনের স্থান—সে পাপ ক্ষেত্র—পরিত্যাগ করিয়া, ভূদেব অন্যত্র চলিলেন।

জঠর-জ্বালা বড় জ্বালা। ভূদেবের উদর জ্বলিয়া উঠিল। আর সহ্য হয় না, ভূদেবের তখন মনে হইতে লাগিল,—"আহা অন্ন কি উপাদেয়

সামগ্রী! আমি অন্ন খাইব! অন্ন খাইব! আর যে দাঁড়াইতে পারি না। অন্ন কৈ? কোথা গেলে অন্ন পাই?"

ভূদেব দেখিলেন,—সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটী ভাবিয়া, ভূদেব তাহাতে প্রবেশ করিলেন। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ; গলায় যজ্ঞোপবীত। ভূদেব ম্লান-মুখে নীরবে তাঁহার নিকট দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন,—"কে তুমি বাপু? কি চাও? তোমার মুখ এমন শুক্‌নো কেন?"

ভূদেব। আজ দেড় দিন কাল আমার আহার হয় নাই। আমি চাট্টি ভাত খা'ব।

বৃদ্ধ। এসো, ব'স; ঝারিতে জল আছে; হাত-পা ধোও; মুখ ধোও।

ভূদেবের পায়ে জুতা ছিল না। এক পা ধূলা। ভূদেব হাত-পা-মুখ ধুইয়া, বৃদ্ধের নিকট গিয়া বসিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন,—তুমি অতি সুপুরুষ। তোমার শরীরের চিহ্ন সমূহ অতীব সুলক্ষণযুক্ত। তোমাকে বিশেষ বুদ্ধিমান যুবক বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি খাইতে পাও না কেন? বাটী হইতে কি ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছ?

ভূদেব।—না।

বৃদ্ধ —তোমার নাম কি?

ভূদেব। আমার নাম শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ। আচ্ছা, পরে তোমার পরিচয় লইব। এক্ষণে কথা এই, হঠাৎ তোমার (দেড় দিনের পর) অন্নাহার করিয়া কাজ নাই; আগে তুমি সরবৎ পান কর; কিঞ্চিৎ সুস্থ হও; তার পর, অন্ন আহার করিও?

ভূদেবের জন্য অবিলম্বে চিনির সরবৎ এবং বেলের সরবৎ আনীত হইল। স্বতন্ত্র আসনে বসিয়া, ভূদেব তাহা পান করিলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে অন্ন প্রস্তুত হইল। রাত্রি প্রায় ৮টা বাজিয়াছে। বৃদ্ধ আপন সন্তানগণের সহিত ভূদেবকে আদরে লইয়া গেলেন। কুমার কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপ বিশিষ্ট একটী ব্রাহ্মণ-সন্তান আজ দেড়দিন কাল

অনাহারে আছেন, অদ্য আহার করিবেন,—ইহা শুনিয়া, ভূদেবকে দেখিবার জন্য অনেক বৌ-ঝি একত্র হইলেন। গৃহকর্ত্রী যতদূর সম্ভব, আজ স্বয়ং উত্তমরূপে রন্ধন করিলেন। রূপার থালে অন্ন, দুগ্ধ, ক্ষীর ঘৃত, পায়স, সন্দেশ—কিছুরই অভাব ছিল না। ব্যঞ্জন আট রকমের কম নহে। আদেশমত ভূদেব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কিন্তু অন্নাহার করিবেন কি, চোখের জলে ভূদেবের মুখ-বুক ভাসিয়া গেল। বস্ত্রের দ্বারা ভূদেব যতই চক্ষু মুছেন, ততই চক্ষু দিয়া অবিরামধারে অশ্রু নির্গত হয়। ভূদেব ভাতে হাত দিতে পারিলেন না। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসিলেন,— "ভূদেব তুমি কাঁদিতেছ কেন? তুমি খাও। কান্না কিসের?"

ভূদেব কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিলেন,—"আমার মা খাইতে পান না;—বাবা খাইতে পান না,—স্ত্রী খাইতে পান না,—আমি এ রাজভোগ —বিবিধ বিচিত্র সামগ্রী কেমন করিয়া উদরস্থ করিব? আমাকে মোটা চালের ভাত, শাক এবং লবণ দিন,—আমি তাহা খাইয়াই প্রাণ ধারণ করিব।"

বৃদ্ধ,—ভূদেবকে অনেক বুঝাইলেন। ভূদেব অন্নাহার করিলেন। কিন্তু বেশী খাইতে পারিলেন না। আট ভাগের এক ভাগ সামগ্রী,— ভূদেবের উদরস্থ হইল কিনা সন্দেহ। এই বৃদ্ধের ভবনে, ভূদেব,— বৃদ্ধের সন্তান ও নাতিগণের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এখানে খাইতে-পরিতে পাইতেন এবং মাসিক আট টাকা করিয়া বেতন পাইতেন। তখনকার আট টাকা এখনকার ৩২ টাকার সঙ্গে সমান। মাসে মাসে ভূদেব ঐ আট টাকা পিতার নিকট পাঠাইতেন। আট টাকাতেই পিতার সচ্ছন্দে সংসার চলিত।

ঐ বৃদ্ধের সাহায্যে শীঘ্র চন্দননগরে একটী স্কুল স্থাপিত হয়। ভূদেব তথায় ষোল টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। সুতরাং ভূদেবের এখন মাসিক আয় হইল ২৪৲ টাকা। সুখে সংসার চলিতে লাগিল। *

* ভূদেব বাবু,—মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুকে তাঁহার জীবনের এ ঘটনাটি স্বয়ং বলিয়াছিলেন।

ভূদেব যখন চুঁচুড়ায় থাকেন, তখন অর্থের দিকে তাঁহার তাদৃশ প্রবৃত্তি ছিল না। মাসিক ২৪ টাকাতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ ইহাতেই তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ উত্তমরূপে চলিত। বড় চাকুরী করিব,—বড় লোক হইব,—এ বড় সাধে তখন তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার অন্তরের ইচ্ছা ছিল,—"দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, শিক্ষা বিস্তার করিব।" লোকসাধারণ-মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হউক, ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র ছিল। এ সম্বন্ধে পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন,—

"তিনি মিশনরীদিগের ন্যায় নানা স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, দেশের সর্ব্বত্র বিদ্যা প্রচার করিবেন, এই এক নূতন আমোদে মত্ত হইলেন এবং তদনুসারে কয়েক জন বান্ধবের সহিত শেয়াখালা, চন্দন-নগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া, স্বয়ং সেই সকল স্কুলের অধ্যাপকতা কার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু যেরূপ অর্থবলে ও লোকবলে মিশনরীরা স্কুল-স্থাপনাদি কার্য্যে কৃতকার্য্য হন, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণের সে সকল কিছুই ছিল না। কেবল মন ছিল। কিন্তু সংসারে শুদ্ধ এক মনের বলেই সকল কার্য্য সাধিত হয় না। সুতরাং কয়েক বৎসর পরেই তাঁহাকে সে আমোদ ত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য উপায়ান্তরের চেষ্টা দেখিতে হইল; তিনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের ইংরেজী দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা মাদ্রাসায় থাকিয়া, ভূদেব বাবু উর্দ্দু শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই মাদ্রাসার পরিদর্শক একজন কর্ণেল সাহেবের অনুকম্পায় তিনি হাবড়া স্কুলের দেড় শত টাকা মাহিয়ানায় প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত হইলেন।

১৮৫৬ অব্দে হুগলীতে বাঙ্গলা নর্ম্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ভূদেব মাসিক তিন শত টাকা বেতনে এই নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। ভূদেব বাবুর কর্ত্তৃত্বে নর্ম্মাল স্কুল উন্নতির চরম সীমায় উন্নীত হয়। এই সময়ে ছাত্রদের পাঠের নিমিত্ত বাঙ্গলা ভাষায় অধিক পুস্তক ছিল না।

ভূদেব বাবু ঐ বিদ্যালয়ের কার্য্য-সম্পাদন-প্রসঙ্গেই অনেকগুলি বাঙ্গলা পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবৃত্তসার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ইউক্লিডের জ্যামিতি ৩য় অধ্যায় মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসও ঐ সময়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছিল।

মেডলিকার্ট সাহেব একজন সৈনিক বিভাগের কর্ম্মচারী ছিলেন। যুদ্ধে ইঁহার দক্ষিণ বাহু উড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে মেডালকার্ট সাহেব বঙ্গ দেশের প্রতিনিধি স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হন। এই ইন্‌স্পক্টেরের সহকারী হইলেন ভূদেব বাবু। তাঁহার বেতন হইল চারিশত টাকা। ভূদেবকে দক্ষিণ হস্ত স্বরূপে পাইয়া, মেডলিকার্ট সাহেব উত্তমরূপে কার্য্য চালাইতে লাগিলেন।

৺রামগতি ন্যায়রত্ন লিখিয়াছেন,—"মেডলিকার্ট সাহেব কয়েক মাসমাত্র ভূদেব বাবুর সহিত কর্ম্ম করিয়া, এরূপ প্রীত হইলেন যে, কিসে তাঁহাকে উন্নত করিয়া তুলিবেন, স্বতঃপরতঃ তিনি সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে লেফটেনাণ্ট গবরণর গ্রাণ্ট সাহেব প্রজা সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য বার্ষিক ত্রিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত সে টাকা ব্যয়িত হয় নাই। এক্ষণে মেডলিকার্ট সাহেব ভূদেব বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া যথোচিতরূপে সেই টাকার বিনিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক্ষণে যে সকল গুরু ট্রেনিং-স্কুল ও তদধীন গ্রাম্য পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে, ঐ টাকা হইতেই প্রথমে তাহার সূত্রপাত হইল। ভূদেব বাবুই উহার এক প্রকার সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য ঐ নূতন প্রণালী বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, যশোহর,—এই তিন জেলায় প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী কর্তৃপক্ষীয়েরা ভূদেব বাবুকেই এডিসনাল ইন্‌স্পেক্টর নামক নূতন পদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নিযুক্ত করিলেন।"

অবশেষে কাল পূর্ণ হইল। মেডলিকার্ট সাহেব বিলাত গেলেন। ভূদেব বাবু পুরা ইন্‌স্পেক্টর হইলেন। বাঙ্গালার পক্ষে এ পদ এই নূতন। বিভাগীয় ইনস্পেক্টরী পদে থাকিয়া, ভূদেবের পনর শত টাকা পর্য্যন্ত

বেতন হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি পেন্‌সন গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গবর্‌মেণ্ট তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধি দেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

ভূদেব তাঁহার আত্মীয়-স্বজনকে প্রত্যহ কিছু-না-কিছু দান করিবার জন্য উপদেশ দিতেন; কিন্তু অপাত্রে দান, অযথা দান, ক্ষমতার বহির্ভূত দান,—এ সকলের উপর তিনি বড়ই বিরক্ত ছিলেন।

৺কাশীধামে গিয়া, ভূদেব কিছুদিন বেদান্ত পাঠ করেন। ভূদেবের অক্ষয় কীর্ত্তি,—দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের রক্ষা-কল্পে,—সংস্কৃত ভাষার উন্নতিকল্পে,—দেড় লক্ষ টাকা দান। সুবিস্তৃত উইল-পত্রে তিনি ইহার দান বিধান বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ভূদেব বাবু এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ইনি "শিক্ষাদর্পণ" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইহাঁর অন্যান্য গ্রন্থ—শিক্ষা-বিধায়ক প্রস্তাব, অঙ্গুরীয় বিনিময়, পুষ্পাঞ্জলি, পারিবারিক প্রবন্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, বাঙ্গলার ইতিহাস, প্রভৃতি। ইহাঁর পারিবারিক প্রবন্ধ ও আচার প্রবন্ধ,—সূক্ষ্ম দৃষ্টিবত্তা এবং সবিশেষ চিন্তা-শীলতার পরিচায়ক। ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট সার চার্লস ইলিয়ট ইহাঁর সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। আচার প্রবন্ধে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন,—

"এখনকার দিনে দেশীয় শাস্ত্রাচারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করায় কিছুমাত্র সাহসিকতার প্রমাণ হয় না। সাহস অর্থে নির্ভীকতা। ভয়ের পাত্র কে? যাহার ইষ্টানিষ্ট করিবার শক্তি আছে, সেই ভয়ের পাত্র। এখন আমাদের সমাজ কাহারও তেমন কোন ইষ্টানিষ্ট করিতে পারেন না। এখন ইষ্টানিষ্টের শক্তি অধিকাংশই ইংরেজের হস্তগত হইয়াছে। অতএব সমাজ আর তেমন ভয়ের পাত্র নাই, ইংরেজই এখন ভয়ের পাত্র হইয়াছেন। সুতরাং সমাজকে অপমানিত করায় পুত্রবৎসল পিতাকে অপমানিত করার ন্যায় পাপেরই প্রমাণ হয়,—উহা সাহসের প্রমাণ হইতে পারে না। এখন ইংরাজের অনুকরণে সাহস নাই—

উহাতে প্রবলের তোষামোদ হয় মাত্র। মুসলমানের আমলে দেশের যে সকল হিন্দু সন্তান মুসলমান হইয়া গিয়াছিল, তুরস্ক সুলতানের অধীনে চাকুরী করিতে গিয়া যে সকল ইউরোপীয় লোকে খৃষ্ট-ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করে, এবং চীন-সাম্রাজ্যের সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া যে মার্কিণ এবং ইউরোপীয় পুরুষেরা আপনাদের নাম এবং পরিচ্ছদ চিনীয় লোকের অনুরূপ করিয়া লয়, তাহাদেরও যেমন "নৈতিক সাহস" প্রদর্শিত হয় না, তেমনি ইংরেজরাজের অধিকার কালে যে ভারত-বাসী দেশাচার পরিহার করিয়া ইংরেজী আচার গ্রহণ করে, তাহারও নির্ভীকতা প্রমাণিত হয় না। নৈতিক সাহসিকতার লক্ষণ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরাধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

"নিজের ধর্ম্ম যদি বিগুণও হও, তথাপি সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বহু মঙ্গল জনক। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও শ্রেয়; পরধর্ম্ম ভয়ের হেতুভূত। এস্থলে ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যে আচার, তাহা প্রকরণ দ্বারা সিদ্ধ। তাহা বিশেষ করিয়া বলিবার অপেক্ষা নাই। কিন্তু ইহার একটী কথা বড়ই গুরুতর। মৃত্যুর অপেক্ষাও অধিকতর ভয়ের বস্তু কি? জীবের সকল ভয়ের এক মাত্র মূল মৃত্যুভয়। কিন্তু এস্থলে সেই মৃত্যুকেও শ্রেয় বলা হইয়াছে। সেটী পাপের ভয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র, মৃত্যু অপেক্ষাও পাপকে অধিক ভয় করিতে বলিলেন। এমন নৈতিক সাহস কি আর কোথাও শিক্ষিত হইয়াছে? নবীন ইংরাজী শিক্ষিতেরা দেখুন যে, তাঁহাদিগের দেশের পুর্ব্ব শিক্ষাদাতৃগণের অপেক্ষা কেহই অধিকতর নির্ভীক হইতে পারেন না। তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অণুকরণেচ্ছা সাহসিকতার লক্ষণ নয়, অজ্ঞতা এবং "নৈতিক ভীরুতারই" পরিচায়ক মাত্র।"

১৩০১ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ সোমবার রাত্রি প্রায় একটার সময় বহুমূত্র রোগে তাহার দেহান্তর হইয়াছে।

মাইকেল মধুসূদনের সহিত ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের সৌহার্দ্দ খুবই ছিল। এ সম্বন্ধে মধুসূদনের জীবনী লেখক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র নাথ বসু মহাশয়কে

ভূদেব বাবু যে পত্র লেখেন, সেই পত্রেও ইহার স্পষ্ট নিদর্শন নিহিত। শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্র বাবুর গ্রন্থ হইতে এই চিঠির কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। ভূদেবের বাল্যজীবনের অনেক কথাও ইহাতে লিখিত আছে।

মধুসূদনের সহিত আমার প্রথম আলাপ হিন্দু কলেজে। সংস্কৃত কলেজ ছাড়িয়া আমি যখন হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে আসিয়া ভর্ত্তি হই, তখন মধুও ঐ শ্রেণীতে পড়িত। মধুর তখন যৌবনের প্রাক্‌কাল, কৈশোর অবস্থা অতিক্রম প্রায় হইয়াছে।

"রামচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক শিক্ষক আমাদের পড়াইতেন। আমি যে দিন প্রথম ভর্ত্তি হইলাম, সেই দিন রামচন্দ্র বাবু ভূগোল পড়াইবার সময় পৃথিবীর গোলত্বের বিষয় আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন। ইংরাজীওয়ালা মাত্রেই, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষকেরা, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও স্বদেশীয় শাস্ত্রের প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করিতে বড় ভাল বাসেন। আমার পিতা যে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন, রামচন্দ্র বাবু তাহা জানিতেন এবং সেই কারণেই পড়াইতে পড়াইতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মত গোল, কিন্তু, ভূদেব, তোমার বাবা একথা স্বীকার করবেন না।" আমি কোন কথা কহিলাম না, চুপ করিয়া রহিলাম। স্কুলের ছুটীর পর বাড়ী আসিলাম। কাপড়চোপড় ছাড়িতে দেরী সহিল না; একেবারে বাবার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! পৃথিবীর আকার কি রকম?" তিনি বলিলেন, "কেন, বাবা, পৃথিবীর আকার গোল" এই কথা বলিয়াই আমাকে একখানি পুথি দেখাইয়া দিলেন, বলিলেন, "ঐ গোলাধ্যায় পুথিখানির অমুক স্থানটী দেখ দেখি।" আমি সেই স্থানটী বাহির করিয়া দেখিলাম, তথায় লেখা রহিয়াছে—"করতল-কলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলং।" বচনটি পাঠ করিয়া মনে একটু বলের সঞ্চার হইল। একখানি কাগজে ঐটী টুকিয়া লইলাম। পরদিন স্কুলে আসিয়া রামচন্দ্র বাবুকে বলিলাম, "আপনি বলিয়াছেন, আমার বাবা পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার করিবেন না। কেন, বাবা তো পৃথিবী গোলই বলিয়াছেন; এই দেখুন তিনি বরং এই শ্লোকটীও আমাকে পুথিমধ্যে দেখাইয়া দিয়াছেন।" রামচন্দ্র বাবু সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া

বলিলেন, "কথাটা বলায় আমার একটু দোষ হইয়াছিল ; তা তোমার বাবা বল্‌বেন বৈ কি ; তবে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ।" রামচন্দ্র বাবুতে ও আমাতে যখন এই সকল কথা হয়, তখন ক্ল্যাশের একটী ছেলের চক্ষু আমাতে বিশেষরূপ আকৃষ্ট দেখিতে পাইলাম। বর্ণ কাল হইলেও ছেলেটি দেখিতে বেশ সুশ্রী, শরীর সতেজ, ললাট প্রশস্ত, চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং অতিশয় উজ্জ্বল ; দেখিলে অতি বুদ্ধিমান ও অধ্যবসায়শীল বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ স্কুলে ছিলাম, ততক্ষণই মধ্যে মধ্যে অতি তীব্রদৃষ্টিতে সে আমার দিকে চাহিতেছিল। ছুটীর পর একেবারে আমার নিকটে আসিয়া সেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ভাই তোমার নাম কি, কোথায় বাড়ী তোমার," ইত্যাদি। আমি তাহার এইরূপ অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণ এবং সৌজন্যে বিশেষ আপ্যায়িত হইয়া একে একে তৎকৃত সকল প্রশ্নগুলির উত্তর দিলাম।

"ইনিই মধু। এই দিন হইতেই ইহাঁর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই উভয়ে বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিল। মধু মধ্যে মধ্যেই প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসিতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সমপাঠীদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আমাদের বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। আমার মা সকলকেই অতিশয় যত্ন করিতেন। আমাদের সকলকেই খাবার খাইতে দিতেন, গায়ে মাথায় ধুলা লাগিলে, চুল আঁচড়াইয়া ও গা ঝাড়িয়া দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিতেন। সেই হইতেই আমার মায়ের উপর মধুর যথেষ্ট শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। মধু আমাদের বাড়ীতে আসিত, কিন্তু আমি কোন দিন মধুর বাড়ীতে যাই নাই ; মধু আমায় তজ্জন্য কোন দিন অনুরোধ করে নাই। বোধ হয়, আমাদের বাড়ীর ধরণ ও মধুর বাবার বাসা-বাড়ীর ধরণ স্বতন্ত্র ছিল ; সুতরাং তথায় লইয়া যাইলে পাছে আমার প্রীতি না হয়, এই জন্যই সম্ভবতঃ মধু আমাকে ওরূপ অনুরোধ কোন দিন করে নাই। ক্ল্যাসে মধু ও আমি এক সঙ্গে বসিতাম। মধু যে পুস্তকখানি পড়িত, সেখানি আমায় না পড়াইলে তাহার তৃপ্তি হইত না। ফল কথা, উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব খুবই প্রগাঢ় হইয়া উঠিয়াছিল।

"আমরা উভয়ে যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময়ে একবার আমার স্কুলে ১৬ মাসের বেতন বাকি পড়ে। মাসিক ৫৲ টাকার হিসাবে বেতন ধরিয়া ১৬ মাসে ৮০৲ টাকা হয়। আমার পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন; সুতরাং এত টাকা পরিশোধের পর আবার মাসিক ৫৲ টাকা বেতন দিয়া আমাকে হিন্দু কলেজে পড়ান তাঁহার পক্ষে বড় সুসাধ্য ছিল না; অগত্যা আমার হিন্দু কলেজে পড়া বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিল। মধু সেই কথা শুনিয়া বলিল, "তুমি নাকি হিন্দুকলেজে পড়া বন্ধ করিবে?" আমি বলিলাম, "হাঁ, আমাদের অবস্থা ত বুঝিতেছ; ৫৲ টাকা করিয়া মাসিক বেতন দেওয়া বাবার পক্ষে কষ্টকর, কাজেই আমাকে পড়া বন্ধ করিতে হইবে।" এই কথায় মধু বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "কেন ভাই, টাকার জন্য তোমার পড়া বন্ধ হইবে, আমি ত আমার মায়ের কাছ থেকে অনেক টাকা জলপানি পাই, আমার টাকা হইতে তোমার স্কুলের বেতন দেওয়া চলিতে পারিবে।" ঐ বৎসর ৫ম শ্রেণীতে আমরা জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম, সুতরাং অল্পদিন মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাওয়ায় আমাকে মধুর অর্থসাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। কিন্তু একথা বলিয়া রাখি যে, মধুর টাকা গ্রহণ করিতে যে আমি কুণ্ঠিত হইতাম, তাহা নহে; আমি মধুকে এতই আপনার বলিয়া মনে করিতাম।

"৫ম শ্রেণীতে জুনিয়র বৃত্তি পাইয়া আমি, মধু ও আমাদের আর কয়েক জন সমপাঠী আমরা একেবারে ২য় শ্রেণীতে উন্নীত হইলাম মধুর সহিত আমার সৌহার্দ্দ পূর্ব্বের ন্যায় তখনও অক্ষুন্ন। ইংরাজী কবিতা মধু যাহা লিখিত বা নূতন পড়িত, আমাকে জেদ করিয়া শুনাইত কিন্তু আচার ব্যবহারের বিষয়ে আমার সহিত তাহার কোন কথা বার্ত্তা হইত না, সে সকল বিষয় সে আমার নিকটে সযত্নেই গোপন রাখিত, কখন কথা উঠিলে হাঁসিয়া উড়াইয়া দিত। একদিন কলেজে আসিয়া মধু আপন মাথা আমাকে দেখাইয়া বলিল, "দেখ দেখি, কেমন চুল কাটিয়াছি। ইহার জন্য আমার এক মোহর ব্যয় হইয়াছে।" মধু সেদিন ফিরিঙ্গীর মত চুল কাটিয়া আসিয়াছিল—সম্মুখে চুলগুলা বড়, ঘাড়ের চুলগুলা ছোট।

আমি বলিলাম, "একি করিয়াছ, তোমার পক্ষে এ ঠিক হয় নাই। তুমি একজন জিনিয়াস (genius) ; জিনিয়াস্ যারা, তারা নূতন নূতন বিষয় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। তুমি যদি পাঁচচূড়া, কি সাত চূড়া, কি নচূড়া কাটিয়া আস্‌তে, তা হোলে যা হোক একটা নূতন রকম কিছু হ'তো ; তা না ক'রে ফিরিঙ্গীর মতন চুল কেটে এসেছ! এরূপ নীচ অনুকরণ প্রবৃত্তিটা ভাল নয়।" আমার কথায় মধু যেন কিছু বিরক্ত হইল বলিয়া বোধহইল। সে দিন আর আমার কাছে ঘেঁসিয়া বসিল না, একটু তফাতে বসিল। আমার মনে কিছু কষ্ট হইল। মনে হইল, কথাটা বলা ভাল হয় নাই, মধু অন্তরে ব্যথা পাইয়াছে। যাহা হউক, আমি মধুর কাছে সরিয়া বসিলাম এবং তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলাম। তাহার পরদিন মধু আর কলেজে আসিল না। অনুসন্ধানে জানিলাম, মধু খৃষ্টান হইতে গিয়াছে ; শুনিয়া বড়ই বিস্ময়াপন্ন হইলাম। বিস্ময়াপন্ন হইলাম এই জন্য যে, মধুর সঙ্গে আমার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। মধু খৃষ্টান হইবে, খৃষ্টান হইবার দিকে তাহার মন গিয়াছে, এ সকল কথা ঘুণাক্ষরেও আমায় কোন দিন বলে নাই ; তাহার ভাবগতিক দেখিয়াও আমি ইহার অণুমাত্র বুঝিতে পারি নাই। একবার মনে হইল, কথা সত্য নহে : আবার মনে হইল, যদি সত্য হয়, তবে আমার উপর মধুর বিশেষ ভাল-বাসা কই জন্মিয়াছিল, তাহা হইলে ত মধু আমাকে এবিষয় একটুও জানাইত। যাহা হউক, আমরা কয়েক জন মিলিয়া কলেজের ছুটীর পর মধুকে দেখিতে গেলাম। গিয়া শুনিলাম, তাহাকে ফোর্ট উইলিয়মে রাখিয়াছে। সেখানে আমি ও আমাদের সমপাঠী গৌর একত্রে গেলাম, কিন্তু দেখা হইল না। পরে মধু যেদিন খৃষ্টান হইল, সেদিন আমরা তাহাকে দেখিতে পাইলাম। তাহার পর মধু স্মিথ সাহেবের তত্ত্বাবধানে কিছুদিন থাকিয়া বিসপ্স কলেজে গমন করে। তখনও আমি মধুকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে গিয়াছি। মধুও আমার সহিত বন্ধুভাবে সম্ভাষণাদি করিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে মুখের ভাব, সে চক্ষের জ্যোতিঃ কোথায়? মধুর পূর্ব্ব আকারের অনেকটা বিকৃতি ঘটিয়াছিল।

* * *

"মধু আপনার বিদ্যাবুদ্ধি খুবই বেশী বলিয়া মনে করিত। এমন কি, সে মধ্যে মধ্যে আমাদের বলিত, "তোমরা আমার জীবন চরিত লিখিও, আমি পৃথিবীর সকল কবি অপেক্ষা বড় কবি হইব।" আমি মধুর এই কথায় হাস্য করিতাম, কিন্তু সে যে একজন অতি প্রতিভা সম্পন্ন যুবা, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্যূন ২০ লক্ষ ছাত্রের সংস্রবে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু মধুর ন্যায় প্রতিভা আর কাহাতেও কখন দেখিতে পাই নাই। দুঃখের বিষয় হেয় অনুকরণ প্রবৃত্তি এবং বিজাতীয় পথ অবলম্বন হেতু মধুর সেই প্রতিভা ক্ষূর্ত্তি পাইয়া সর্ব্বজনগ্রাহ্য বিষয়ে বিকসিত হইতে পায় নাই; ফলতঃ অন্য পথে না যাইয়া দেশীয় পবিত্র নীতিমার্গের অনুসরণ করিয়া চলিলে মধু স্বীয় প্রতিভা ও উদ্যোগিতাবলে স্বদেশের মহদুপকার সাধন করিতে পারিত এবং সর্ব্বতোভাবে আমার হৃদয়গ্রাহী হইত।

"বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া মধু একবার আমার সহিত চুঁচুড়ার বাটীতে দেখা করিতে আসিয়াছিল। তখন তাহার পূর্ব্বের মত চেহারা ছিল না। চক্ষু আর সেরূপ সমুজ্জ্বল ছিল না, পূর্ব্বের সেই অতি সুমিষ্ট স্বর এক্ষণে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছিল, ঠোঁট পুরু এবং শরীরও স্থূল হইয়াছিল। মধুর পোষাক সাহেবী, কিন্তু আমার বাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তার পর কিরূপ মনের ভাব উপস্থিত হওয়ায় মধু কাপড় চাহিল, বলিল, "আমাকে কাপড় দেও, আমি কাপড় পরিয়া পিঁড়ি-পাতিয়া বসিয়া খাবার খাইব।" ঐ সময়ে মধুর মনে কি ভাব উপস্থিত হইয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয় আমার মনে তখন যাহা হইয়াছিল তাহার মনেও তাহাই হইয়া থাকিবে। আমার মার কথা মধুর স্মরণ হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমি সে সময়ে মুখ ফুটিয়া তাহার নিকট আমার মার নাম আনিতে পারিলাম না, কারণ এ মধু আর সে মধু ছিল না। সে মধু প্রকৃতির হস্ত-বিনির্ম্মিত প্রোজ্জ্বল প্রতিভা-সম্পন্ন এবং যশোলিপ্সু পবিত্র মানবরত্ন ছিল, কিন্তু এ মধু এক্ষণে বিজাতীয় শিক্ষা ও সংসর্গে বিকৃত, অনুকরণাধিক্যে মলিনীকৃত এবং কবির চক্ষে নমেদস্তের আদর্শীভূত।" * * *

রাজনারায়ণ বসু।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দের ৭ ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার দক্ষিণ দিগবর্ত্তী বোড়াল গ্রামে রাজনারায়ণ বসু জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম নন্দকিশোর বসু।

রাজনারায়ণ আশৈশব বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ইনি বৃথা আমোদ-কৌতুক ভাল বাসিতেন না। ষোড়শ বর্ষ বয়সে ইনি কলিকাতা হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাটীতে মুন্সীর নিকট পারস্য ভাষাও ইনি উত্তম রূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিদ্যানুরাগের সহিত ধর্ম্মানুরাগও ইহাঁর আবাল্য বলবৎ ছিল। একবার তিনি ট্র্যাভেলস্ অব সাইরাস নামক এক খানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। এই গ্রন্থের একস্থানে লিখিত আছে,—মিসর দেশীয় দেবদেবীর আখ্যান সকল রূপক মাত্র। ইহাঁরও ধারণা হইল, হিন্দুর দেবদেবীর কল্পনাও এইরূপ রূপক মাত্র। অতঃপর, তিনি ব্রাহ্ম সমাজ ভুক্ত হন।

ব্রাহ্ম হইয়া রাজনারায়ণ বাবু ঈশা কেন প্রভৃতি পাঁচখানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই সময়ে তিনি বাঙ্গলা ভাষাতে ও প্রবন্ধ লিখিতে যত্নশীল হন। তাঁহার প্রবন্ধ,—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পাঠ করিয়া, অত্যন্ত সুখ্যাতি করেন।

তদানীন্তন ছোট লাট হেলিডে সাহেব রাজনারায়ণ বাবুকে ডেপুটী মাজিষ্টরের কর্ম্ম দিতে চাহেন,—তিনি তাহা গ্রহণ করেন না; স্কুল মাষ্টার হইতেই তাঁহার মন হইল। তিনি ১৮৫১ সালে মেদিনাপুর গবরমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার হইলেন।

তাঁহার আন্তরিক উদ্যমে মেদিনীপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম-স্থাপনে বিশেষ রূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহারই চেষ্টায় তথায় একটী ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়; ব্রাহ্ম-উপাসনা অধিকতর রূপে প্রচলিত হয়। দূর পল্লীগ্রামেও গিয়া অবসরমত তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিতে লাগিলেন। অনেকে তাঁহার শিষ্য হইল। মেদিনীপুরে স্ত্রী-শিক্ষার জন্য তিনি

একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহার উদ্যোগে তথায় একটী সুরাপান নিবারণী সভা হইল; একটী ব্যায়ামশালাও বসিল। ইহা ভিন্ন, অন্যান্য নানারূপ সভার অধিবেশন হইতে থাকিল। ১৮৫১ সাল হইতে ১৮৬৬ সাল পর্য্যন্ত ইনি মেদিনীপুরেই অবস্থান করেন।

শারীরিক অসুস্থতার জন্য ১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ কর্ম্ম ত্যাগ করেন; এই সময় তিনি পশ্চিম দেশের নানা স্থানে বেড়ান, তাহার পর কলিকাতা আসেন; কলিকাতাতে বহুদিন অবস্থান করেন; ১৮৭৯ সালে দেওঘরে যান। যত দিন তিনি জীবিত ছিলেন, তত দিন এই দেওঘরেই তিনি বাস করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি অনেকেই রাজনারায়ণ বাবুর গুণানুরাগী ছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর হৃদয় কোমল ছিল। বাড়ীর কুকুর, বিড়ালকেও তিনি যত্ন করিতেন; সঙ্গীত বড় ভালবাসিতেন। প্রিয়জন-বিয়োগে কাতর হইতেন না।

১৯০০ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০টা ১০ মিনিটের সময় পক্ষাঘাত রোগে ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

ইহার প্রণীত গ্রন্থ, (১) ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য়ভাগ। (২) ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা দুই ভাগ। (৩) ব্রহ্মসাধন। (৪) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা। (৫) প্রকৃতপক্ষে অসম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে? (৬) ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈদ্য আদর্শ। (৭) আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। (৮) হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত। (৯) সে কাল আর এ কাল। ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা আডিশনকে আদর্শ করিয়া লিখিত।

"সেকাল আর একাল" নামক গ্রন্থে বসু মহাশয় লিখিয়াছেন,"—

চরিত্র বিষয়ে আমাদের সমাজ ক্রমে অবনতি প্রাপ্ত হইতেছে। আমরা আমাদের পুরাতন প্রাণগুলি হারাইতেছি, অথচ ইংরাজদিগের সদ্গুণ সকল অনুকরণ করিতেছি না। বিলাতের অনেক ভদ্র ইংরেজেরা চরিত্র বিষয়ে আমাদিগের অনুকরণ-স্থল হইতে পারেন। এমন শুনা গিয়াছে, তাঁহারা ব্রাণ্ডি পান করেন না, তাঁহারা ব্রাণ্ডির নাম পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের

নিকট উচ্চারণ করা অশিষ্টাচার জ্ঞান করেন। তাঁহাদের স্বার্থপরতা অল্প, আতিথেয়তা বিলক্ষণ আছে, কৃতজ্ঞতাও বিলক্ষণ আছে। কৈ, বিলাতের ভদ্রইংরাজদিগের এই সকল ভদ্রগুণত আমরা অনুকরণ করি না। কৈ সাধারণ ইংরেজবর্গের সাহস, অধ্যবসায়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও শ্রমশীলতা ত আমরা অনুকরণ করি না? তাঁহাদের যত মন্দ গুণ, তাই অনুকরণ করি।"

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭৪৮ শকে বর্দ্ধমান-কালনার নিকট বাকুলিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মিশনরি স্কুলে ইহাঁর প্রথম শিক্ষা। তাহার পর ইনি হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু পীড়া হেতু বিদ্যালয়ে অধিককাল অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই; তবে বিদ্যালয়-ত্যাগ করিয়াও ইনি কখনও পাঠে বিরত হন নাই। ফলে, ইংরেজী কাব্য-শাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। কবিতা-রচনায় ইহাঁর আবাল্য অনুরাগ।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে এডুকেশনগেজেট প্রচারিত হয়। সম্পাদক হন ওব্রাইন্ স্মিথ সাহেব। রঙ্গলাল ইহাঁর সহকারী হইয়াছিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি এই কাজ করেন। ইহাতে রঙ্গলালের গদ্য পদ্য উভয় বিধ রচনাই প্রকাশিত হইত।

কয়েক বৎসর পরে ইনি ইনকম টেক্সের এসেসর নিযুক্ত হন। ইহার পরেই, গবরমেণ্ট ইহাঁকে ডেপুটী মাজিষ্টরের কর্ম্ম প্রদান করেন। অনেক দিন তিনি এই কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে রঙ্গলালের দেহান্তর হইয়াছে।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইনি পদ্মিনী উপাখ্যান, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মদেবী এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে শূরসুন্দরী রচনা করেন। ইহাঁর আরও দুই খানি গ্রন্থ,—বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ এবং শরীরসাধনী বিদ্যার গুণকীর্ত্তন। ইনি সংস্কৃত "কুমার সম্ভবের"ও পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

পদ্মিনী উপাখ্যানে অগ্নি-প্রবেশ কালে সহচরীদিগের প্রতি পদ্মিনীর উৎসাহ বাক্য কি মর্ম্মস্পর্শী ;—

"এসো এসো সহচরীগণ, এসো সহচরীগণ। হুতাশন গ্রাসে করি জীবন অর্পণ।
ধরে সবে মনোহর বেশ, বাঁধ বিনাইয়া কেশ। চলহ অমরাবতী করিবে প্রবেশ॥
ওরে সখি! আজরে সুদিন, ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন। শুধিব জীবন দানে পতিপ্রেম ঋণ॥
আজ অতি সুখের দিবস, পাব সুখ মোক্ষ যশ। বিবাহের দিন নহে এরূপ সরস।"

রামগতি ন্যায়রত্ন।

হুগলী জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়ার সন্নিকট ইলছোবা মোণ্ডলাই গ্রামে ১২৩৮ সালের ২১শে আষাঢ় রামগতি ন্যায়রত্ন জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। চূড়ামণি মহাশয় পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু ধনী ছিলেন না। অতি কষ্টেই তাঁহার দিনপাত হইত। রামগতি,—পিতার একমাত্র পুত্র।

দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত রামগতির গ্রাম্য পাঠশালেই শিক্ষা হয়। উপনয়নের পর ইনি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইনি সংস্কৃত-কলেজের ব্যাকরণ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ক্রমে সংস্কৃত কলেজে ইনি সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, সাঙ্খ্য ন্যায় প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই পাঠ করেন। এ সময়ে তাঁহাকে স্বয়ং স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতে হইত; গৃহস্থালীর অন্যান্য কার্য্যেও তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত।

সংস্কৃত কলেজের সকল পরীক্ষাতেই তিনি পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইতেন এবং বৃত্তি পাইতেন। ১৮৫০—৫১ অব্দে সিনিয়র ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া ইনি কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। পরীক্ষক কাপ্তেন মার্শেল ইঁহার বুদ্ধি-প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অতীব প্রীতি প্রকাশ করেন।

সাংসারিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন তাঁহাকে অকালে সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিতে হয়। ১৮৫৬ সালের ২৫শে আগষ্ট ইনি হুগলীর বাঙ্গালা

নর্ম্মাল স্কুলে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়েই সংস্কৃত-কলেজ হইতে তিনি ন্যায়রত্ন উপাধি পান। কয়েক বৎসর তাঁহার হুগলীতেই কাটিয়া যায়।

১৮৬২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ইনি বর্দ্ধমান যান। বর্দ্ধমানে গুরু-টেনিং স্কুলে তিনি প্রথম শিক্ষকের কর্ম্ম পান। ১৮৬৫ সালে বর্দ্ধমান হইতে বহরমপুর গমন করেন। এই সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি বহরমপুর কলেজে তাঁহার চাকরী হয়। মাহিনা হয় মাসিক দেড় শত টাকা।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁকে বড়ই ভাল বাসিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে আরও কিছুকাল অধ্যায়ন করেন,—ইংরেজী একটু ভাল করিয়া পড়েন, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনেক সময় অনেক বিষয়ে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন,—১৮৫৮ অব্দে কাপ্তেন রিচার্ডসন প্রণীত "হিষ্টরী অব দি ব্লাকহোল" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ—'অন্ধকূপ হত্যার ইতিহাস।" ১৮৫৮ সালের শেষে বস্তুবিচার। ১৮৫৯ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুরোধে "বাঙ্গালা ইতিহাসের" প্রথম ভাগ। ১৮৬২ অব্দে রোমাবতী উপাখ্যান; বাঙ্গলা ব্যাকরণ। ১৮৬৬ সালে ঋজুব্যাখা। ১৮৬৯ অব্দে দময়ন্তী। ১৮৭২ অব্দে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুবাদ। ১৮৭৩ অব্দে বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। ১৮৭৪ অব্দে ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং গোষ্ঠী কথা। ইহাঁর শেষ পুস্তক রামচরিত।

"বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" গ্রন্থ তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থ-প্রণয়নের জন্য তিনি পরিশ্রম বা অর্থব্যয়ে কিঞ্চিৎ মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস হইতে ইদানীন্তন বহু বাঙ্গালা গ্রন্থ লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং গ্রন্থ সমালোচনা,—এই পুস্তকে অতি সুশৃঙ্খলা এবং বিচক্ষণতার সহিত বিন্যস্ত; ভাষা সংযত এবং মার্জ্জিত। গ্রন্থের কোন স্থলেই উচ্ছৃঙ্খল ভাবের এবং অসংযত ভাষার স্পর্শ মাত্র নাই।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি পেনসন গ্রহণ করেন ; সাড়ে তিন বৎসর কাল মাত্র পেনসন ভোগ করিয়াছিলেন। ১৩০১ সালে বিজয়া দশমীর দিন,—প্রতিমা বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু মহাকাশে প্রস্থিত হয়। অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে, তাঁহার নিদারুণ শিরঃপীড়া জন্মে মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই শিরঃপীড়ায় কাতর ছিলেন।

ইহাঁর স্মৃতি-শক্তি অতীব প্রখরা ছিল বোপদেবের কবিকল্পদ্রুম ইনি আদ্যোপান্ত মুখস্থ বলিতে পারিতেন. পাছে ভুলিয়া যান, এই আশঙ্কায় ইনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া আসিবার সময় পথে এই গ্রন্থের সমগ্র অংশ আবৃত্তি করিতেন।

ইনি স্বগ্রামে বিদ্যালয়, ডাক্তার খানা এবং পোষ্টাফিস সংস্থাপিত করেন। ইহাঁর দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে, ইনি তাঁহার শোকে বড়ই অধীর হইয়া পড়েন। এই পত্নীর নাম ছিল মহামায়া। তিনি পত্নীর স্মরণার্থ "মায়া ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠা করেন। "মায়া ভাণ্ডার" একটী ক্ষুদ্র পেটক। ইহাতে প্রত্যহ কিছু কিছু অর্থ সংরক্ষিত হইত। এই অর্থ ন্যায়রত্ন মহাশয় অতি সংগোপনে বিতরণ করিতেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে ভাষা [illegible] ছেন,—"ভাষাতত্ত্বের প্রকৃতি ভূতত্ত্ব শাস্ত্রের প্রকৃতির ন্যায়;—উভয়েরই মূল ভাগ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যেরূপ বিৎতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা বলিতে পারেন না যে, কোন্ কালে অমুক ভূভাগের প্রথম স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে—কোন্ কালে ও কিরূপ ক্রমে উহার দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি স্তর সকল উহাতে বিন্যস্ত হইয়াছে এবং কোন কালেই বা ঐ সকল স্তর বিসারিত, বিপ্লুত বা বিপর্য্যস্ত হইয়া ঐ ভূভাগকে বর্ত্তমান অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছে, সেইরূপ ভাষা তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও কোন ভাষার প্রারম্ভ বিষয়ে অথবা সেই ভাষার পূর্ব্বপূর্ব্বে অসংখ্যরূপ সে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে কালের ক্রম কিছুই বলিতে পারেন না।"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।



১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাঁটালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চারি পুত্র। প্রথম শ্যামাচরণ, দ্বিতীয় সঞ্জীবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র, চতুর্থ পূর্ণচন্দ্র। শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিম বাবুর পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

বাল্যেই বঙ্কিমের প্রতিভা পরিচয়। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে এক দিনেই তাঁহার বর্ণজ্ঞান হইয়াছিল। কাঁটালপাড়ার পাঠশালে পাঠ সাঙ্গ হয়। ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ মেদিনীপুরে। বঙ্কিমের বয়স যখন আট বৎসর, তখন তাঁহার পিতা যাদবচন্দ্র মেদিনীপুরে ডেপুটীকলেক্টর ছিলেন। মেদিনীপুরের ইংরেজী স্কুলে বঙ্কিমচন্দ্র যেরূপ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলেও অবাক হইতে হয়। প্রতি বৎসর দুইবার শ্রেণী পরিবর্ত্তন করিয়া, তিনি পরীক্ষায় সময় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিতেন।

১৮৫১ সালে যাদবচন্দ্র ২৪ পরগণায় বদলি হইয়া আসেন। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজেও বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। স্বকীয় পাঠ্যে তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা মিটিত না। কলেজের পুস্তকালয়ে বসিয়া, তিনি পাঠ্য-বহির্ভূত অনেক পুস্তক পাঠ করিতেন। অথচ পরীক্ষার সময় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, পুরস্কার প্রাপ্ত হইতেন। হুগলী কলেজ হইতে তিনি সিনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি কোন চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকের নিকট চারি বৎসরকাল সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১১ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল। ৮।৯ বৎসরের পর তাঁহার স্ত্রীর পরলোক হয়। ১৯।২০ বৎসর বয়সে তিনি আবার দারপরিগ্রহ করেন।

হুগলী কলেজের পাঠ সমাপ্ত হইলে, বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময় ১৮৫৮ সালে বি, এ, পরীক্ষার প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন ২৮ বৎসর মাত্র। তিনি আইন পড়িতে পড়িতে বি এ, পরীক্ষার দুই মাসকাল পূর্ব্বে পরীক্ষার্থ প্রস্তুত হইয়া, বিএ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি বঙ্গের প্রথম বিএ। কলেজে পাঠকালে তাঁহার প্রতিভা-পরিচয় চারিদিকে প্রচারিত হইয়াছিল। কেবল সাহিত্যে কেন, অঙ্ক শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের অঙ্কশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া, তাঁহার অধ্যাপকেরা তাঁহার শতমুখে প্রশংসা করিতেন। কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্রের অধ্যয়নকালে একদিন কলেজের কোন অধ্যাপক ছাত্রদিগকে জ্যামিতির কোন প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে দেন। কোন ছাত্র তাহা পূরণ করিতে পারে না। অধ্যাপক দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"হায়! *বঙ্কিমচন্দ্র থাকিলে, প্রতিজ্ঞা নিশ্চিত পূরণ করিতেন।*"

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া, তাৎকালীন ছোট লাট হালিডে সাহেব তাঁহাকে ডিপুটী মাজিষ্টর পদে নিযুক্ত করেন। আইনের আর পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। ২৯ বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটী হন।

ডেপুটীপদে নিযুক্ত হইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধনে মনোনিবেশ করেন। ১৮৬১ সালে দুর্গেশনন্দিনী লিখিত ও পর বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে তিনি Indian Field নামক পত্রিকায় Ragmohon wife নামক উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ উপন্যাস সম্পূর্ণ হয় নাই। কেন না, পত্রিকাখানি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজীতে বঙ্কিমের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। জেনেরল এসেম্বলির ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল হেষ্টীং সাহেবের সঙ্গে ষ্টেটসম্যান কাগজে তাঁহার যে মসীযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, অদ্যাপি অনেকের স্মরণ আছে। সেই সময় ইংরেজী ভাষায় পাণ্ডিত্যাভিমানী হেষ্টিং সাহেব বলিয়াছিলেন,—"এত দিন পরে বাঙ্গালায় আমি একজন উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছি।" দুর্গেশনন্দিনী প্রচারে বঙ্কিমচন্দ্রের যশোগৌরব দিগন্ত বিস্তৃত হয়। ইহার পর, ১৮৬৭ সালে কপালকুণ্ডলা ও

১৮৭০ সালে মৃণালিনী প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব। নিম্নলিখিত সনে বঙ্গদর্শনে নিম্নলিখিত পুস্তক প্রকাশিত হয় ;—

১২৭৯ সালে বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা ; ১২৮০ সালে চন্দ্রশেখর ও যুগলাঙ্গুরীয় ; ১২৮১ সালে রজনী ; ১২৮০।৮১।৮২ সালে কমলাকান্তের দপ্তর, ১২৮. সালে কৃষ্ণকান্তের উইল ; ১২৮৫ সালে রাজসিংহ ; ১২৮৭।৮৮। ৮৯ সালে আনন্দমঠ ; ১২৮৭ সালে মুচীরাম গুড়ের জীবন চরিত ; ১২৮৮ সালে দেবীচৌধুরাণী। দেবীচৌধুরাণীর কিয়দংশমাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বঙ্গদর্শন উঠিয়া যাইবার পর নবজীবন ও প্রচার পত্রে দুই তিনখানি পুস্তকের উপক্রমণিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৮৬ সালে কৃষ্ণচরিত্রের প্রথমাংশ প্রচারিত হইয়া, পুনর্মুদ্রিত হয়। সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত্র ১৮৮৯ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালে নবজীবনে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। ১৮৮৮ সালে সীতারাম প্রকাশিত হয়। প্রচারে গীতামর্ম্ম ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হইয়াছিল।

এতদ্ব্যতীত বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ নিচয় সংগ্রহে, বিবিধ প্রবন্ধ নামে দুই ভাগ পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত লোক-রহস্যও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

ডেপুটীর কার্য্যে রাজসরকারে তাঁহার সবিশেষ সুখ্যাতি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র যথাকালে পেনসন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ইনি সরকার হইতে রায় বাহাদুর ও সি·আই-ই উপাধি পাইয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে বঙ্কিমচন্দ্র "মানস ও ললিত" নামে কবিতা লেখেন। প্রভাকরে তাঁহার কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রভাকর-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিনি প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

বঙ্কিম বাবুর পুত্র হয় নাই। তাঁহার দুইটী মাত্র কন্যা। ১৩০০ সালের ২৬শে চৈত্র অপরাহ্ণ ৩টা ২৩ মিনিটের সময় বহুমূত্র জনিত জ্বর ও মূত্র নালীর বিষম বিস্ফোটক রোগে বঙ্কিমচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার দেহে বহুমূত্র রোগের সঞ্চার হয়।

জন্ম পত্রিকা।

শকাব্দ ১৭৬০।২।১২।৩১।৩০।

গ্রহ স্ফুট ১৮।১৫।১১।২৬।

১৭৬০ ।২।১২।

৫৫।৯।১৪ বয়সে মৃত্যু।

বঙ্কিম বাবু কবিতা লিখিতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি বর্ষার মান-ভঞ্জন নামক একটী কবিতা লেখেন। ইহার একাংশ এই রূপ,——

বিধুমুখি করে মান, কিরূপ দেখালে প্রাণ
হেরিতেছি অপরূপ ভাব
বরষায় আবির্ভাবে, প্রফুল্ল সরস ভাবে
রহিয়াছে সকল স্বভাব।
বন উপবন চয়, রসময় সমুদয়
রসপূর্ণ যত জীবগণ।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য কব, এ সবার মাঝে তব
কেন প্রিয়ে বিরস বদন।
বুঝেছি কারণ তার, দোষ দিব কি তোমার
বরষাকালেতে সব করে;
সুধাকর এই কালে, জড়িত জলদ জালে
স্বভাবে মলিন ভাব ধরে।
গগনের শশধরে, যদি এই ভাব ধরে।
শোভাহীন হয়ে সদা রয়;
তব মুখচন্দ্র তবে, কেন বল নাহি হবে
সেরূপ বিরূপ অতিশয়।

জগদীশ্বর গুপ্ত।

কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামীর সটীক চৈতন্যচরিতামৃত, লীলাশুক এবং চৈতন্যলীলামৃত এই কয়খানি বিশিষ্ট গ্রন্থের ইনি সঙ্কলয়িতাও প্রণেতা। ইতিভিন্ন, ইনি বিবিধ মাসিক পত্রে বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

১২৫২ সালের ভাদ্র মাসে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী মেহেরপুরে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোপীকৃষ্ণ গুপ্ত। গোপীকৃষ্ণ,—শ্রীখণ্ডের বিখ্যাত বৈদ্যকুলাবতংস। জগদীশ্বরের মাতার নাম,—রাধাসুন্দরী। রাধাসুন্দরী মেহেরপুরের বিখ্যাত মল্লিকবংশ-সম্ভূতা। ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জগদীশ্বর পাঠশালাতেই পাঠ সমাপন করেন। ১২৬৩ সালে কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। ১১ বৎসর বয়সে ইঁহার জননী রাধাসুন্দরী দেবী বিশূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। কাটোয়ার গঙ্গাতীরে মাতৃসৎকার সম্পন্ন হয়। এই সময় হইতেই জগদীশ্বরের প্রাণে বৈরাগ্যের রেখা প্রতিভাত হইয়া উঠে।

কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে ইনি যথাক্রমে এণ্ট্রেন্স, এফ-এ, বি-এ, এবং বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি চৌদ্দ টাকা এবং এল এ পরীক্ষায় ২৫ টাকা বৃত্তি পান। ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য হেতু ইনি এ সময় পিতার যথাবশ্যক সহানুভূতি সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

বি-এল পরীক্ষা দিয়া ইনি দিনাজপুরে ওকালতী আরম্ভ করেন। দিনাজপুরেই ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, যকৃৎ রোগ দেখা দেয়। অতঃপর ইনি মেদিনীপুর গিয়া ওকালতী করিতে থাকেন। কিন্তু ওকালতীতে ইঁহার স্পৃহা একান্ত ক্ষীণা হইয়া আসে। ইনি মুন্সেফের কার্য্য গ্রহণ করেন। মেদিনীপুর, কাঁথি, বাঁকুড়া, জাজপুর প্রভৃতি নানা স্থানে মুন্সেফী কার্য্যোব্রতী হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর ইনি ২০০৲ বেতনে নীলফামারির মুন্সেফের কার্য্য গ্রহণ করেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর কাঁথির, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই জাজপুরের, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারি কাটোয়ার, ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন যশোহরের, ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রেল কুষ্টিয়ার মুন্সেফ হন। কুষ্টিয়া হইতে নোয়াখালি বদলি হন; নোয়াখালি হইতে এক বৎসরের জন্য কলিকাতায় আসেন; এই সময় ইনি ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করেন, পর্য্যটনান্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন; কলিকাতায় আসিয়াই উপর্য্যুপরি যকৃৎযুক্ত জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। এই রোগেই ইনি ১৮৯২ সালের ৮ই জুলাই দেহত্যাগ

করিয়াছেন। মুন্সেফের কার্য্যে ইঁহার তিন শত টাকা পর্য্যন্ত বেতন হইয়াছিল।

বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে গুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন:—

"বৈষ্ণবীয় ধর্ম্মে শক্তি ও ভাবের অবতরণ সমর্থিত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ পাত্রে, বিশেষ বিশেষ ভাব ও শক্তি অবতীর্ণ হইয়া ভগবল্লীলার সহায়তা করে, এ সত্য কে না স্বীকার করিবে? যেমন সনকাদিতে শান্ত-ভাব, ধ্রুব-প্রহ্লাদে দাস্যভাব, রুক্মিণী-সত্যভামায় প্রেমভাব অবতীর্ণ; তেমনি আবার সনকাদির শান্তভাব শাক্যসিংহ প্রভৃতিতে, প্রহ্লাদের দাস্যভাব যবন হরিদাসে ও রুক্মিণী, সত্যভামার ভাব গদাধর পণ্ডিত ও জগদানন্দ পণ্ডিতে অবতীর্ণ। পরন্তু রুক্মিণী সত্যভামা উভয়েরই প্রেম-ভাব হইলেও, উভয়ের প্রেমের প্রকৃতিগত তারতম্য অনেক। সত্যভামার প্রেম বাল্যস্বভাব, কুটিল; তাহা প্রণয়-কলহে ও খট্‌মটি কোন্দলে পরি-স্ফুট। জগদানন্দ এই ভাবের লোক। শ্রীচৈতন্যের সহিত তিনি অনুদিন প্রেমের ঝগড়া করিয়া থাকেন। কিন্তু রুক্মিণীর প্রেম অন্য ধরণের। তাহা বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ়। দাক্ষিণ্যে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ও সহিষ্ণুতায় তাহার প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণ উপহাস করিয়া ছাড়িয়া যাইব বলিলে, রুক্মিণীর ত্রাসের সীমা ছিল না। গৌড়ে গদাধরের প্রেম সেই প্রকারের।"

রামদাস সেন।

১২৫২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ বুধবার মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর সহরে বঙ্গজ কায়স্থকুলে রামদাস সেন জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম লাল-মোহন সেন। মাতার নাম লক্ষ্মীমণি। রামদাস, জমিদারের সন্তান,—জমিদার।

রামদাসের যখন তিন বৎসর বয়ঃক্রম, তখন তাঁহার আট চল্লিশ বৎ-সর বয়স্ক পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর, তিনি জননী প্রভৃতির যত্নেই লালিত পালিত হইতে থাকেন

কিছুকাল যাবৎ বাড়ীতেই রামদাসের শিক্ষালাভ হয়। বাড়ীতে তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী—দুই-ই কিছু কিছু শিক্ষা করেন। অতঃপর তিনি বহরমপুর কলেজে ভর্ত্তি হন। শিক্ষাঅধ্যয়নে তাঁহার অতি মাত্র যত্নশীলতা দৃষ্টি হইত। ভূগোল, ইতিহাস এবং কবিতা পড়িতেই তাঁহার ভাল লাগিত; গণিতে তিনি বড় মনোযোগী হইতে পারিতেন না। বাল্যকাল হইতেই রামদাস ফুলগাছ রোপণ করিতে আর ঠাকুর পূজার খেলা করিতে বড় ভাল বাসিতেন।

তের চৌদ্দ বৎসর বয়সেই রামদাসের কবিতা লেখা আরম্ভ। 'প্রভাকর" সংবাদ পত্রে তিনি এই সময়ে ফুল সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা লেখেন। তাঁহার "কুসুম মালা" নামক গ্রন্থে পরে এই কবিতা সকল সন্নিবিষ্ট হয়। এই সময়ে তিনি কতকগুলি পরমার্থ সঙ্গীতও রচনা এবং প্রকাশ করেন। তাঁহার এই সঙ্গীত-পুস্তকের নাম,—"তত্ত্ব সঙ্গীত লহরী।"

পনর বৎসর বয়সে রামদাসের প্রথম বিবাহ। টাকী নিবাসী জানকীনাথ রায় চৌধুরীর কন্যা দুর্গাতারিণীর সহিত তিনি পরিণয়-সূত্রে সম্বদ্ধ হয়েন। বিবাহে যথোচিত সমারোহই হইয়াছিল। দুর্গাতারিণী এক মাত্র শিশুকন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। পত্নী শোকে ব্যথিত রামদাস "বিলাপ তরঙ্গ" নামক কবিতা-গ্রন্থ রচনা করেন। সেই কবিতা-পুস্তকের ছত্রে ছত্রে নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হয়। তিনি "চতুর্দ্দশ পদী কবিতাবলী" ও "কবিতা লহরী" নামক আরও দুইখানি কবিতা গ্রন্থ প্রকাশ করেন। টাকীতেই তাঁহার দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। এবার তিনি টাকীর ভারতচন্দ্র রায় চৌধুরীর কন্যা বিদ্যুল্লতা দাসীকে বিবাহ করেন।

বাল্যকাল হইতেই রামদাস অত্যন্ত পুস্তকপাঠ প্রিয়। বাঙ্গলা ও ইংরাজী—সকল পুস্তকই তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন,—এবং কোন নূতন পুস্তক বাহির হইলেই তাহা সর্ব্বাগ্রে খরিদ করিয়া স্বকীয় পুস্তকাগারে সাজাইয়া রাখিতেন। ইহার ফলেই তাঁহার সেই বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগারের প্রতিষ্ঠা।

কলেজে পাঠ শেষ হইল, কিন্তু তাঁহার পুস্তকাদি পাঠ এক দিনের জন্যও নিবৃত্তি হইল না। বরং এখন হইতে তিনি অধিকতর আগ্রহের সহিত নানা বিষয় সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতবর্ষের পুরা তত্ত্বই তাঁহার অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহার পরিণামে,— তাঁহার "ঐতিহাসিক রহস্য" রত্নরহস্য "প্রভৃতি গ্রন্থ নিচয়। তিনি বঙ্গদর্শন নবজীবন, নব্যভারত, চারুবার্ত্তা এবং "এণ্টিকোয়ারি" নামক মাসিক পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এণ্টিকোয়ারিতে লিখিত রামদাসের প্রবন্ধপাঠ করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলের তাঁহারই শত মুখে সুখ্যাতি করেন।

সৌম্যদর্শন চারুকান্তি রামদাস এক দণ্ডের জন্যও অলস থাকিতে পারিতে। না,—সর্ব্বদাই কোন না কোন রূপ কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিতেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার অতীব আস্থা ছিল। গরীব কাঙ্গালের প্রতি দৃষ্টি ছিল। সঙ্গীত শাস্ত্রে তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। গবরমেণ্টের নিকট তাঁহার সম্মানের অবধি ছিল না। বহু সভার তিনি সভ্য ছিলেন।

তাঁহার "ঐতিহাসিক রহস্য" গ্রন্থে ভারতবর্ষের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধমালা প্রকটিত। "ভারত রহস্যে" প্রাচীন আর্য্য-জাতির সমর-প্রণালী, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি সমালোচিত। "রত্ন রহস্যে" নানাবিধ মণিরত্নের রহস্য সমুদ্ঘাটিত। সকল প্রবন্ধই গভীর গবেষণামূলক,—সবিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। অতঃপর তিনি ইটালী হইতে "ডাক্তার" উপাধি পান। "বুদ্ধদেব" নামক আরও একখানি গ্রন্থ তিনি ছাপাইতে আরম্ভ করেন; কিন্তু শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন মহাশয় তাহা প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ বুদ্ধদেব চরিত নামে প্রসিদ্ধ।

নদীয়া-হাট বোয়ালিয়া গ্রামে জমিদারী দেখিতে গিয়া, তিনি সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হন। ইহাই তাঁহার মৃত্যু-ব্যাধি। ১২৯৪ সালের ৩রা ভাদ্র শুক্রবার তিনি পরলোক গমন করেন। চাকদহের গঙ্গাতীরে তাঁহার শবদেহের সৎকার হয়। বহরমপুর কলেজের সন্নিকটে তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে রামদাস লিখিয়াছেন ;—

"রূপক ও উপরূপক লক্ষণ পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন। সংস্কৃত ভাষায় হিন্দুদিগের ইয়ুরোপীয়গণের ন্যায় সকল প্রকার দৃশ্য কাব্য বর্ত্তমান ছিল। সেক্ষপীয়র, করণীল মলিএর, ভলটেয়ার প্রভৃতি কবিগণের ন্যায় ভারত বর্ষীয় কবিনিকর যদিও বহুসংখ্যক নাটক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, তথাপি কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণ যে সকল নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান কবির নাটকের ন্যায় উৎকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকর্ত্তব্য। দশরূপ, সাহিত্যদর্পণ, সাহিত্যসার কুবলয়ানন্দ প্রভৃতি অলঙ্কার গ্রন্থে যে সকল নাটকের উদাহরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতায় সংস্কৃত-কালেজ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ সংস্কৃত নাটকের তাদৃক্ আদর করিতেন না। এমন কি, স্যর উইলিয়ম জোনসকে কেহই নাটকের প্রকৃত বিবরণ উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত করিতে পারেন নাই ; তৎপরে অনেক কষ্টে রাধাকান্ত নামক জনৈক ভূস্বর তাঁহাকে, নাটক যে ইংরাজী "প্লের" সদৃশ, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। বঙ্গদেশীয়গণ পূর্ব্বে অন্যান্য নাটকাপেক্ষা "প্রবোধচন্দ্রোদয়" মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করিতেন। তৎপরে বঙ্গীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়গণ ভক্তি-রসপ্রধান "চৈতন্যচন্দ্রোদয়," "জগন্নাথবল্লভ" বিদগ্ধ মাধব" "দানকেলিকৌমুদী" প্রভৃতি নাটক আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, কিন্তু প্রকৃত কবিত্বশক্তিসম্পন্ন মহাকবি কালিদাস ভবভূতি শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রধান কবিগণের দৃশ্য কাব্যের অধ্যাপনায় এক কালে পরাঙ্মুখ ছিলেন।"



রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

ইঁহার "বাঙ্গলার ইতিহাস" প্রসিদ্ধ। "মিত্রবিলাপ" ইঁহার কবিতা পুস্তক। বঙ্গদর্শনের ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ লেখক।

১৮৪৬ সালে নদীয়াজেলার অন্তঃপাতী গোস্বামী-দুর্গাপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অন্নদাচরণ মুখোপাধ্যায়। অল্পবয়সেই ইঁহার পিতৃ বিয়োগ হয়। জ্যেষ্ঠ রায় রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাহাদুরই ইঁহাকে প্রতিপালন করেন। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমতঃ কৃষ্ণনগর কলেজে তৎপরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন; ১৮৬৭ সালে এম-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষাসমাপ্তির পর ইনি কলিকাতার জেনারল এসেম্ব্লিজ কলেজে, প্রেসিডেন্সি কলেজে, কটক কলেজে, বহরমপুর কলেজে এবং অন্যান্য কলেজে অধ্যাপনা কার্য্য করেন; অনন্তর বাঙ্গলা গবরমেন্টের বাঙ্গলা অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে ইনি সাত শত টাকা বেতন পাইতেন। ইনি ফরাসী, উর্দ্দু, উড়িষ্যা, সংস্কৃত, জার্ম্মান, পারসী, লাটিন ও পালি প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। ইনি বড়ই বিনয়ী এবং সদালাপী ছিলেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পূজার পূর্ব্বে ৪১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রজনীকান্ত গুপ্ত।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে, সন ১২৫৬ সালের ভাদ্র মাসের ২৯শে তারিখে বৈদ্যবংশে রজনীকান্ত জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম—কমলাকান্ত গুপ্ত। কমলাকান্তের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। রজনীকান্ত সর্ব্বকনিষ্ঠ।

রজনীকান্তের বাল্যশিক্ষা দেশেই হইয়াছিল। তেওতায় আংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলেই তিনি পাঠ করিতেন। ক্লাশের তিনি উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। সাত আট বৎসর বয়সে তিনি কঠিন-জ্বররোগাক্রান্ত হন। তাহাতে জীবনের আশা ছিল না। যাই হউক, ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি রোগ-মুক্ত হইলেন বটে; কিন্তু তাঁহার শ্রবণ-শক্তি জন্মের মত দুর্ব্বল হইয়া গেল। এই অবস্থাতেও তিনি যথাকালে ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইলেন; চারি টাকা হিসাবে চারি বৎসরের জন্য একটী বৃত্তিও পাইলেন। এই বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতা আসিলেন; সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হইলেন।

কলিকাতায় হিন্দুহোষ্টেলে থাকিয়া তিনি সংস্কৃত কলেজে পাঠ করিতে থাকেন। তখন হইতেই তিনি প্রগাঢ়অধ্যবসায়ে ও পরিশ্রমে কর্ত্তব্য-পথে চলিতে আরম্ভ করেন। সেই হিন্দুহোষ্টেলে অবস্থানকালে তাঁহার সর্ব্ব-প্রথম গ্রন্থ "জয়দেবচরিত" প্রকাশিত হয়। পুস্তক-বিক্রেতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন হইতেই তাঁহার গ্রন্থপ্রচারের সহায় হন।

রজনীকান্তের অভিভাকদের ইচ্ছা ছিল যে, তিনি কবিরাজী শিক্ষা করেন; কিন্তু আজীবন সাহিত্যানুরাগী রজনীকান্ত সে পথে যান নাই।

সুপ্রসিদ্ধ "সিপাহি-যুদ্ধের ইতিহাস" রজনীকান্তের প্রধানকীর্ত্তি। বড় সুখের বিষয়, এই মহাগ্রন্থ রজনীকান্ত শেষ করিয়া যাইতে পারিয়াছেন।

'সিপাহিযুদ্ধ' ও 'আর্য্যকীর্ত্তি' ব্যতীত, আরও বহু গ্রন্থে, রজনীকান্ত বাঙ্গলা ভাষা অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নবভারত, ভারতপ্রসঙ্গ, বীরমহিমা, প্রতিভা, ভীষ্মচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত এবং ঐ সকল গ্রন্থ সাহিত্যের গৌরব।

স্কুলপাঠ্য-গ্রন্থ প্রণয়নে রজনীকান্ত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার "বোধ-বিকাশ", "রচনা" প্রভৃতি গ্রন্থ তাহার পরিচয়-স্থল।

"বঙ্গবাসীর" সহিত গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। বঙ্গবাসীর প্রথম অবস্থায়, তিনি বঙ্গবাসীর একজন বিশিষ্ট লেখক ও পৃষ্ঠপোষক বন্ধু ছিলেন। তাঁহার বহুপ্রবন্ধ তখন বঙ্গবাসীর অঙ্গ

শোভিত করিয়াছিল। সেই সমস্ত প্রবন্ধ একত্র করিয়া তিনি তাঁহার "আর্য্যকীর্ত্তি" গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

১৩০৭ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রি ১টা ২৭ মিনিটের সময় বহুমূত্র জনিত দুষ্টব্রণ রোগে একান্ন বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক হইয়াছে।

কেবলমাত্র সাহিত্যের উপর নির্ভর করিয়া, গুপ্ত মহাশয়, বিলক্ষণ সম্মান সহকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছেন।

রজনীকান্তের ভাষা বিশুদ্ধ ও গম্ভীর। ভারতবর্ষে হিন্দু রাজ্যের উত্থান ও পতন সম্বন্ধে ইনি লিখিয়াছেন,—

"ভারতে হিন্দু অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসের একটী সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। এই অধিকারে সভ্যতার উৎকর্ষ হয়, বাণিজ্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়, এবং বিদ্যার বহুল প্রচার হইয়া উঠে। গ্রীক পণ্ডিত আরিস্ততল যাহাতে পরাস্ত হইয়াছেন, পিথাগোরস যাহাতে বিমুখ হইয়াছেন, জিনদোতস যাহাতে পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, বহুপূর্ব্বে হিন্দুদিগের প্রতিভা-বলে তাহা পরিষ্কৃত ও সুবোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বাষ্পরাশি যেমন আপনা হইতেই শূন্যে প্রসারিত হয়, জলস্রোত যেমন আপনা হইতেই নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয়, বহ্নিশিখা যেমন আপনা হইতেই আকাশের দিকে সমুত্থিত হয়, হিন্দুদিগের মন তেমনি আপনা হইতেই শাস্ত্রাধ্যয়ন, শাস্ত্রালোচনা, ও শাস্ত্রাভ্যাসে আসক্ত হইয়া উঠে। এই আদিম সভ্যতার স্রোতে নীয়মান হইয়া হিন্দুগণ জলদ গম্ভীর মধুর স্বরে বেদ গান করিয়াছেন, উপনিষদের গূঢ় অর্থ বিবৃত করিয়া পবিত্র ঐশ্বরিক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, রামায়ণ ও মহাভারতের চিত্ত-বিমোহিনী কবিত্ব-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন, এবং গণিতের অদ্ভুত সঙ্কেত প্রচার করিয়া পৃথিবীর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুদিগের এই অভিজ্ঞতা অন্যান্য দেশের উন্নতির প্রসূন।"

হরিনাথ মজুমদার।



(কাঙ্গাল হরিনাথ)

১২৩০ সালে নদীয়া জেলার কুমারখালিগ্রামে কাঙ্গাল হরিনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। একবৎসর পরেই হরিনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। তিনি তাঁহার পিতৃব্য-পত্নীর নিকট পালিত হইতে থাকেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতারও পরলোক ঘটে। শৈশবেই হরিনাথ,—মাতা ও পিতা উভয়কেই হারাইলেন।

ইহার পর হরিনাথের জীবনে যাহা ঘটিল, তাহা তাঁহারই হস্ত-লিখিত-বিবরণী হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

"যখন আমার বয়স এক বৎসর অতিক্রম করে নাই, তখন মাতৃদেবী ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আমি মাতৃহীন হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় যে কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? খুল্লপিতামহী আমাকে প্রতিপালন করেন। আমার পিতা পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন নাই। কিন্তু বোধ হয় তন্নিমিত্তই সংসারে উদাসীন ছিলেন ; তিনি বিষয়কার্য্যে তাদৃশ মনোযোগ বিধান না করায়, পৈত্রিক সম্পত্তি যাহা ছিল, তৎসমুদয়ই নষ্ট হয় ; সুতরাং মাতৃবিয়োগ হইতেই সংসারিক দুঃখ যে আমার সহচর হইয়াছে, সে কথা বলা বাহুল্য। বাল্যখেলার সময় অন্য বালকেরা ক্রীড়োপযোগী বস্তু পিতামাতার নিকটে সহজে পাইয়া আমোদ করিয়াছে, আমি তন্নিমিত্ত ক্রন্দন করিয়া মাটী ভিজাইয়াছি। এই অবস্থায় কতক দিন গত হয়। পরে বিদ্যাভ্যাসের সময় উপস্থিত হইল। এই সময় কুমারখালি বাসী শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয় একটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহতে প্রবেশ করিলাম। খুল্লতাত শ্রীযুক্ত নীলকমল মজুমদার মহাশয় পুস্তকাদির ব্যয় ও স্কুলের বেতন সাহায্য করিতে লাগিলেন, দুর্ভাগ্য-বশতঃ তাঁহার কর্ম্ম গেল, অর্থাভাবে আমারও লেখা-পড়া বন্ধ হইল। স্কুলের হেডমাষ্টার কৃষ্ণধন বাবু বিনা বেতনে কতক দিন শিক্ষা দিয়া

ছিলেন; কিন্তু অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ও পুস্তকাদির অসদ্ভাব আমাকে অধিক দিন বিদ্যালয়ে তিষ্ঠিয়া থাকিতে দিল না।”

ইহার পর, হরিনাথ এক নীলকুঠিতে কার্য্য গ্রহণ করেন। কিন্তু চাকুরী তাঁহার অধিকদিন সহ্য হইল না; অল্পদিন পরেই তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দিলেন। ঘরে বসিয়া নানাবিধ বাঙ্গলা গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার অর্থক্লেশ খুবই হইয়াছিল। কোন ধনবান ব্যক্তির একখানি বই একরাত্রিতে নকল করিয়া দিয়া তিনি পারিশ্রমিক স্বরূপ একখানি বস্ত্র গ্রহণে বাধ্য হন।

অতঃপর কবি ঈশ্বর গুপ্তের সহিত কাঙ্গাল হরিনাথের পরিচয়। হরিনাথ সংবাদ প্রভাকরে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ঈশ্বরগুপ্ত হরিনাথকে প্রবন্ধ রচনার উপদেশ দিতেন; প্রবন্ধ সংশোধন করিয়া দিতেন, আর সংবাদ প্রভাকরে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। হরিনাথ, —পল্লীগ্রামের নানারূপ অভাব-অনুযোগের কথা লিখিতে লাগিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তিনি কুমারখালি গ্রামে একটী বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত করেন। এই পাঠশালা এখনও বর্ত্তমান।

১২৭০ সালের ১লা বৈশাখ তিনি গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা নামে এক-খানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। প্রথমে এই পত্র কলিকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইত। তাহার পর কুমারখালিতেই একটী প্রেস স্থাপিত হয়, কুমারখালি হইতেই তখন গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হইতে থাকে। প্রথমে ইহা ছিল মাসিক, পরে হয় পাক্ষিক,—তাহার পর হয় সাপ্তাহিক। বাইশ বৎসর কাল এই সংবাদপত্র চলিয়াছিল। অনেক প্রয়োজনীয় কথা ইহাতে আলোচিত হইত।

হরিনাথের বিজয়-বসন্ত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা ভিন্ন, ইঁহার “পরমার্থ-গাথা” কবিকল্প, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রুর সংবাদ, ভাবোচ্ছ্বাস, মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি রচনা করেন। তিনি বিস্তর বাউল-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল সঙ্গীত একান্ত হৃদয়স্পর্শী।

১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে হরিনাথের দেহান্তর হইয়াছে।

কাঙ্গাল হরিনাথের—বা ফিকিরচাঁদের একটী বাউল-সঙ্গীতের কতকাংশ তুলিয়া দিলাম ;—

"ভাব মন অধম তারণ সত্যশরণ, যার নামেতে পাষাণ গলে।
যিনি এই গগন-তপন, পাতাল ভুবন, পূর্ণ পবন স্থলে জলে॥
কিবা আশ্চর্য্য কথন, নাই তাঁর চরণ, সমভাবে বেড়ান চলে।
যিনি এই গাছগাছড়ায়, দালান কোটায়, পত্র-কুটীর ঘরের চালে॥
তিনি তোর দলের মাঝে, বসে আছে, ভাল মন্দ কথা বলে।
যিনি সেই চীন তাতারে, রুম সহরে, বর্ম্মা কাশ্মীর ঝিল নেপালে॥
তিনি তোর ভাতের গ্রাসে, খাটের পাশে, নাচিয়ে বেড়ান লয়ে কোলে।
যিনি তোর উপবীতে, চাপ-দাড়ীতে, বেদপুরাণ কোরাণ বাইবেলে॥
তিনি তোর খোলখমকে, ঢোলে ঢাকে, আলখেল্লায় ফুরফুরি খোলে।
যিনি সেই মস্‌জিদ গির্জ্জায়, ব্রাহ্মসভায়, শ্মশানে কি গাছের তলে॥
তিনি মোহান্ত আখড়ায়, তুলসী তলায়, সর্ব্বস্থানে ভূমণ্ডলে।
যিনি সেই ব্রহ্মপুত্রে, পেঁড় ক্ষেত্রে, ঘোষপাড়া কি বিন্ধ্যাচলে॥
তিনি শ্রীবৃন্দাবনে, কাশীধামে, মক্কা মদিনা চিখুলে।
যিনি সেই জাতি-হিংসায়, বিবাদ ঘটায়, দুষ্ট বাধায় সন্ধি-স্থলে;
তিনি যে অধীনতা, স্বাধীনতা, যা বল, তা সবার মূলে॥

ফিকির চাঁদ বলে তোরে, করে ধ'রে, মূল হারালি ভুলের মূলে।
খুয়ে ধন চালের বাতায়, জল যে হাতড়ায়, তাকেই লোকে পাগল বলে॥

হরচন্দ্র ঘোষ।



ইংরাজী ১৮১৭ সালে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি হুগলীর ঘোলঘাটের ঘোষ বংশজাত। ইহাঁর পিতার নাম হলধর ঘোষ। হলধর বাবু হুগলী কালেক্টরীর হেড্ক্লার্ক ছিলেন। তখনকার কালে তিনি একজন ভাল ইংরাজী ভাষাজ্ঞ ছিলেন। ইহাঁদের আদি নিবাস খানাকুল-কৃষ্ণনগর; ইহাঁরা মুখ্য কুলীন বংশধর। বিদ্যা ও অর্থলাভের জন্য হলধ... [illegible]

মহাশয়ের পিতা খানাকুল কৃষ্ণনগর হইতে হুগলীতে আসিয়া বাস করেন। পরে ঘোলঘাট পল্লীর বাড়ীতে স্থান সঙ্কীর্ণ হওয়ায় হলধর বাবু তন্নগরীস্থ বাবুগঞ্জ নামক পল্লীতে আসিয়া বাড়ী করিলেন। হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার চতুর্থ ও গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার পঞ্চম পুত্র ছিলেন। গিরীশ বাবু কলিকাতায় ছোট আদালতের একজন জজ ছিলেন; তৎপরে গয়ার আডিশনাল জজ্ পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু হঠাৎ পীড়াক্রান্ত হওয়াতে সে স্থানে গমন করিতে পারেন নাই, এমন কি পেনশন লইতে হইল। ইহাঁরা দুই ভ্রাতাই হুগলী কলেজে দুই জন লব্ধ প্রতিষ্ঠ ছাত্র ছিলেন।

সে সময় ইংরাজের রাজ্য নতন—ইংরাজী ভাষার তত আদর হয় নাই। পারস্য ভাষারই বেশি চলন ছিল। সুতরাং উভয় ভ্রাতাই প্রথমে পারসী ও আরবীতে বিদ্যালাভ করিতেন। এমন কি ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উভয়েই ঐ দুই ভাষার জ্ঞানার্থী ছিলেন। তৎপরে হুগলী কলেজ অর্থাৎ মহম্মদ মশিনের কলেজ স্থাপিত হইলে উহাঁরা এ কলেজে ভর্ত্তি হইলেন। পারশ্য ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি থাকায় ইংরাজী ভাষা শিখিতে ইহাঁদের বিশেষ কষ্ট হইল না। অল্পদিনের মধ্যেই ইংরাজী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন। হরচন্দ্র ঘোষ এ কলেজের একজন সুবিখ্যাত ছাত্র। সে সময়ে ভাষাজ্ঞানে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না, বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি ২টা বিলাতী মেকের ঘড়ী পুরস্কার পান। একটা সোনার ও আর একটা রূপার। ইহা ব্যতীত বিস্তর পুস্তক প্রাইজ পান। কিজন্য ঘড়ী পুরস্কার পান তাহা ঐ ঘড়ীর ভিতরে অতীব সুন্দররূপে খোদিত আছে। তাহার নিম্নে ভূতপূর্ব্ব বড়লাট আরল অব অকলণ্ডের নাম স্বাক্ষর স্বরূপ অঙ্কিত হইয়াছে। এই ঘড়ী এক্ষণে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষের নিকট আছে। রূপার ঘড়ী হরচন্দ্র বাবু তাঁহার পঞ্চম ভ্রাতা ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দেন; উহা এক্ষণে তাঁহার পুত্রগণের নিকট আছে।

১৮৪২ সালে হরচন্দ্র বাবু এ ঘড়ী পান। তিনি এই পুরস্কার লাভ করিলে ৺ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মহাশয় হুগলীতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে

আসেন ও তাঁহার সম্পাদিত বিখ্যাত "প্রভাকর" পত্রিকায় হরচন্দ্রকে লিখিতে অনুরোধ করেন, সেই অনুরোধ মত তিনি "প্রভাকরে" সময়ে সময়ে প্রবন্ধ লিখিতেন।

পরে অর্থ ও চাকরীর প্রয়োজন হইল। তাঁহার বন্ধু ৺রমাপ্রসাদ রায় সে সময়ে চাকরী পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রিম কোর্টের উকীল হইয়াছিলেন ও বিলক্ষণ রোজগার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রমাপ্রসাদ বাবু তাঁহাকে উকীল হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন এবং তিনিও একরকম সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু তখন হাকিমের বড়ই মান্য ছিল; এবং গৃহেও অর্থের আশু প্রয়োজন। হরচন্দ্রবাবু পাঁচ সাত ভাবিয়া হাকিম হইবেন,—স্থির করিলেন। স্যর্ ফ্রেডরিক হেলিডে তখন বঙ্গের ছোটলাট, ইনি ঘোষ মহাশয়ের মুরব্বী ছিলেন। তিনি হরচন্দ্রবাবুকে আবকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত করিয়া, রামপুর-বোয়ালিয়াতে পাঠাইলেন। তখন এ পদের বেতন ১৫০্ টাকা ছিল। রামপুর বোয়ালিয়া হইতে কিছু দিন পরে মালদহ মোকামে বদলী হইলেন। এই স্থানে তিনি আন্দাজ ৮ বৎসর ছিলেন। আবকারী বিভাগে তাঁহার আরও উন্নতির আশা ছিল, কিন্তু তাঁহার মুরব্বী অ্যাথারটন সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সে আশা নির্ম্মূল হইল। তিনি চেষ্টাপূর্ব্বক থাকবস্ত বিভাগের ডেপুটী কালেক্টার হইলেন। বহরমপুরে তাঁহার প্রধান কার্য্য স্থান হইল। বহরমপুরে তখন আরও দুইজন ঐপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। কলিকাতা ঝামাপুকুরের ৺ তারকচন্দ্র ঘোষ ও খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতা ৺ ঈশানচন্দ্র দত্ত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। উহা সাঁওতাল-লড়াইয়ের বৎসর। বহরমপুর হইতে হরচন্দ্র বাবু রংপুরে বদলী হন। রংপুর জেলাস্থ সুবৃহৎ বাহারবন্দ পরগণা ইনি জরিফ করেন। উহা চিরস্মরণীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর জমিদারী। রংপুর হইতে তিনি দিনাজপুরে প্রেরিত হন। মফঃস্বলে হস্তী হইতে পড়িয়া তাঁহার উৎকট পীড়া হয়। ব্যাধিযুক্ত হইয়া এবং তৎস্থানস্থ জলবায়ু নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া, তিনি থাকবস্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্টরের পদলাভ পূর্ব্বক বর্দ্ধমান সহরে বদলী হইয়া আসিলেন।

এই কার্য্যোপলক্ষে নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া অবশেষে উড়িষ্যার অন্তর্গত কেন্দ্রপাড়া মহকুমা হইতে পেন্‌শন লইয়া ১৮৭২ সালে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাহার পর তিনি হুগলী মিউনিসিপালিটির ভাইসচেয়ারম্যান হন।

তিনি প্রায় ১২ বৎসর পেনশন ভোগ করিয়া ১৮৮৪ সালের ২৫শে নভেম্বর তারিখে লোকান্তর গমন করেন। হরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত পুস্তকসকল সরকারী কার্য্যের অবসরে লিখিয়াছিলেন,—

১। "ভানুমতী চিত্তবিলাস" নাটক
২। "কৌরববিয়োগ নাটক" নাটক
৩। "চারুমুখ চিত্তহরা" নাটক
৪। "সপত্নী সরো" উপন্যাস
৫। "রজতগিরি নন্দিনী" নাটক
৬। "রাজ তপস্বিনী" গদ্যকাব্য
৭। "বারুণী বারণ"

ইহা ব্যতীত তাঁহার একখানি অপ্রকাশিত ইংরাজী নভেল ছিল।

তিনি সেক্‌সপিয়ার খুব ভাল জানিতেন। সেক্‌সপিয়ারের মার্চ্চেণ্ট অব্ ভিনিস্ অবলম্বন করিয়া তিনি ভানুমতি চিত্তবিলাস লেখেন ও রোমিও জুলিয়েট অবলম্বন করিয়া "চারুমুখ চিত্তহর" নামক নাটক রচনা করেন। তখন কি বঙ্গে কি ইংলণ্ডে, সকল দেশেই পদ্যে নাটক রচিত হইত।

হরচন্দ্র বাবুর যথেষ্ট কবিত্ব ছিল: নাটকে "ভানুমতি-চিত্তবিলাস তৎকালে খুবই আদরের গ্রন্থ হয়। ইহার পূর্ব্বে ভদ্রার্জ্জুন নামক আর একখানি নাটক মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে আমরা 'ভানুমতী হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম। অপর গ্রন্থ সকল দুষ্প্রাপ্য।

এই সরোবর, কিবা মনোহর, দেখিতে সুন্দর জলের খেলা।
নাগর নাগরী,—রসের সাগরী; লইয়া গাগরী করিছে মেলা।
মনোহর ঘাট, সুবর্ণের পাট, তাহে করে নাট কতেক নারী
যেন নয় মন, যেন বৃন্দাবন,—এই কুঞ্জবন তুলনা তারি॥

তমালের বন, কিবা সুদর্শন, মুগ্ধ করে মন কোকিল-স্বরে।
মল্লিকা মালতী, যাতি যুথি ততি, হেরিয়া সেবতী বিদ্ধিছে শরে॥
কমলের দল করে টল টল, দেখিয়া বিকল কন্নীর মন।
মলয় সমীর, নাহি দেখি স্থির, করিছে অস্থির কমল বন॥
কন্নীরা বিহরে পদ্মিনী শিহরে, ভ্রমর ঝঙ্কারে দূরেতে থাকি।
শিহরে কুমুদ—কাঁপে ষটপদ, ভয়ে কোকনদ মুদয়ে আঁখি॥

দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়।

ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ,—ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিত। ইহা,—কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস। দেওয়ান মহাশয় "গীত-মঞ্জরী" নামক একখানি সঙ্গীত গ্রন্থও প্রকাশ করেন। ইনি নদীয়া জেলার অধীন কৃষ্ণনগরের অধিবাসী।

১২২৭ সালের কার্ত্তিক মাসের সংক্রান্তির রাত্রিতে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত রায়। ইঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজসংসারের দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ। বংশের অনেকেই সুখ্যাতির সহিত কৃষ্ণনগর রাজ-সংসারে দেওয়ানীর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম বৎসর বয়সে কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের বিদ্যারম্ভ হয়। প্রথমে পিতা-ঠাকুরের নিকটই তিনি শিক্ষারম্ভ করেন। অষ্টম বৎসর বয়সে ইঁহার পারশী শিক্ষারম্ভ। পারশ্যভাষায় লিখিত বহু গ্রন্থ ইনি পাঠ করেন। প্রথমতঃ পারশী ভাষায় অভিজ্ঞ ওস্তাদের নিকট ইঁহার পারসী শিক্ষা হয়; পরে ত্রয়োদশ বর্ষে ইঁহার মাতুল ইঁহাকে পারসী পড়াইতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইঁহার বিবাহ হয়।

বিবাহের দুই এক বৎসর পরে কার্ত্তিকেয়চন্দ্র কৃষ্ণনগর জজ আদালতে রিটরণ নবিশের সেরেস্তায় লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে গবর্ণমেণ্ট গেজেটে প্রচারিত হয় যে, আদালতের কার্য্য দেশী ভাষায় হইবে,—পারসী ভাষায় নহে। সঙ্গে সঙ্গে এখন ইংরাজী

শিক্ষারও আদর বাড়িল। কার্ত্তিকেয়চন্দ্র ইংরেজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

কিছুদিন পরে ইনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িবার জন্য প্রবিষ্ট হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হন। রাজা শ্রীশচন্দ্র ইহাঁকে "খাস সেক্রেটরী" পদে নিযুক্ত করিলেন। তেইশ বৎসর বয়সে ইনি কুমার সতীশচন্দ্রের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে গবরণর জেনেরল হার্ডিঞ্জের অনুগ্রহে কৃষ্ণনগরে কলেজ স্থাপিত হয়। কুমার সতীশচন্দ্র এই কলেজে প্রবিষ্ট হন। কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের উপর তখন রাজষ্টেট সংক্রান্ত মোকদ্দমা তদ্বিরের ভার পড়ে। অতঃপর শ্রীশচন্দ্র গবরমেণ্টের নিকট হইতে মহারাজ উপাধি পাইলেন; কার্ত্তিকেয়চন্দ্রও তাঁহার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। মাহিয়ানা হইল—মাসিক পঞ্চাশ টাকা। অসীম কার্য্যদক্ষতাগুণে ইহাঁর বেতন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ১২৮১ সালে শ্রাবণ মাসে মাহিয়ানা হয়—২৫০ শত টাকা; পরিশেষে তিন শত টাকা মাহিনা হইয়াছিল। আমরণ ইনি অতীব সুখ্যাতির সহিত দেওয়ানীর কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে ইহাঁর যেমনই প্রভূত সম্মান ছিল, গবরমেণ্টের নিকটও তেমনি। ছোটলাট টমসন,—দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য একবার দেওয়ানের নিজ বাটীতে গমন করিয়াছিলেন।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২ অক্টোবর শুক্রবার অপরাহ্ন চারিটার সময় ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

কার্ত্তিকেয়চন্দ্র নানাগুণের আধার ছিলেন,—কার্ত্তিকেয়চন্দ্র,—মিষ্টভাষী, সদালাপী, সত্য-নিষ্ঠ এবং পরোপকারী; কার্ত্তিকেয়চন্দ্র যেমন চারু-দর্শন সুপুরুষ,—তেমনি মধুরকণ্ঠ সুগায়ক। কোনরূপ প্রলোভনেই পদেকমাত্রও ইহাঁকে টলাইতে পারে নাই। তৎকালীন বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত কার্ত্তিকেয়চন্দ্র সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন।

তিনি যে আত্ম-জীবনচরিত গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তদানীন্তন

শীলতা ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত। এই গ্রন্থ সম্প্রতি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ইনি অকপটে আত্ম-কথা লিখিয়া গিয়াছেন। 'ধর্ম্মে রাজশক্তি' সম্বন্ধে ইনি এই আত্মজীবনচরিত গ্রন্থে লিখিতেছেন,—

"ফলতঃ এ দেশীয় লোকের মনে বেদের সহিত পৌত্তলিকতার কল্পিত সংশ্রব যেরূপ বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে বেদকে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া দেশে রাখিব, অথচ পৌত্তলিকতাকে নির্ব্বাসিত করিব, এ অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবার নহে। তবে যদি মগধ রাজা অজাতশত্রুর ন্যায়, আমাদের রাজা ও শাক্য সিংহের ন্যায় বৈদিকধর্ম্মের প্রচারক অবতীর্ণ হন, তবেই এ মহৎ কল্পনা সিদ্ধ হইতে পারে। যেমন উপযুক্ত চিকিৎসক ও উপযুক্ত ঔষধ ব্যতীত কোন রোগের প্রতিকার হয় না, তেমনি উপযুক্ত রাজা ও উপযুক্ত প্রচারক ব্যতীত ধর্ম্মের সংশয় হইয়া উঠে না। এক সময়ে যে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহা রাজার প্রভাবে ও প্রচারকগণের যত্নে সম্পন্ন হইয়াছিল। তৎকালীন নৃপতিগণ ঐ ধর্ম্মাবলম্বী না হইলে, এ ধর্ম্মের এত অধিক বিস্তার হইত না। আবার যখন শঙ্করাচার্য্য অবতীর্ণ হইয়া ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুদ্দীপনের যত্ন করিতে লাগিলেন; এবং সেই সাময়িক রাজা সেই ধর্ম্মের সহায় হইলেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের পরাজয় হইয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের জয় হইল। প্রচারকের যত্ন থাকিলেও রাজার সহায়তা ব্যতীত এই উভয় ধর্ম্মই প্রবল হইত না।"

ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

২৪ পরগণার অন্তর্গত বশীরহাট মহকুমার টাকীর নিকট দণ্ডীরহাটি গ্রামে ১৮৩৬ সালে ক্ষেত্রনাথের জন্ম হয়।

ক্ষেত্রনাথের বাড়ীর নিকটে একটি টোল ছিল। শৈশবে তিনি তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতেন; এবং ব্যাকরণ পড়া শুনিতেন। এই করিয়া ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র মুখস্থ করিয়াছিলেন। ১৮৭১।৭২ সালে তিনি "এডুকেশন গেজেট" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকতা করিতেন। তৎকালের

তাঁহার বাঙ্গালা রচনা দেখিয়া বুঝা যায় যে, তিনি কিছু কিছু সংস্কৃতও পড়িয়াছিলেন।

কলিকাতার দক্ষিণ রাজপুরে তাঁহার মামার বাড়ী ছিল। তথায় একটি ইংরাজী স্কুলে তিনি সামান্তরূপ ইংরাজী পড়িয়া হাওড়া সরকারী স্কুলে প্রবেশ করেন। হাওড়ায় ছোট মামার বাসায় থাকিয়া তিনি লেখা-পড়া করিতেন। তাহাতে বেশী ঘর ছিল না এবং বাহিরে বসিবার ঘর খানিতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাস-পাশা খেলা এবং গান-বাজনা চলিত। ক্ষেত্রনাথকে এই ঘরের এক পাশে বসিয়া লেখাপড়া শুনা করিতে হইত। যে খেলিতে জানে, সে কাণাকড়িতে খেলে। এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যে বসিয়া ক্ষেত্রনাথ নিবিষ্ট মনে লেখাপড়া করিতেন : কে কোথায় কি করিতেছে—তাহার কোন খবরই রাখিতেন না; তাঁহার মন থাকিত পড়ায়, গান-বাজনার শব্দ তাঁহার কাণে প্রবেশ করিবে কেন?

যে সময় ক্ষেত্রনাথ হাওড়া স্কুলে পড়িতেন, তখন ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি, আই, ই, তথাকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। অল্পকাল মধ্যে ক্ষেত্রনাথ ভূদেব বাবুর লক্ষ্যের মধ্যে পড়িলেন। রতনেই রতন চেনে,—বাঁচিয়া থাকিলে এবং ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখিলে ক্ষেত্রনাথ একজন প্রসিদ্ধ লোক হইবেন, এটি বুঝিতে ভূদেব বাবুর মত মনীষী শিরোমণির বেশী বিলম্ব হইল না। এই জন্যই ক্ষেত্রনাথকে সবিশেষ যত্ন সহ ভূদেব পড়াইতে লাগিলেন। ভূদেব বাবু বলিতেন,—"আমি শত সহস্র ছেলে পড়াইয়াছি; প্রায় লক্ষাধিক ছেলে দেখিয়াছি, কিন্তু ক্ষেত্রের মত ছেলে আমার চক্ষে পড়ে নাই।"

১৮৫৪ সালে ক্ষেত্রনাথ হাওড়া স্কুল হইতে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষা দেন। জুনিয়ার বৃত্তি পাইয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে কলিকাতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজে দুই বৎসর পড়িয়া ১৮৫৯ সালের মার্চ্চ মাসে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পাশ হইয়া অল্পকাল মধ্যে তিনি হিজলীকাঁথির আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হন। ইহার পরে ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে

ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গণিতের অধ্যাপক হইলেন। ইহার পর আর কয়েকটী স্থানে কাজ করিয়া, ১৮৬৯ সালে প্রথম শ্রেণীর আসিষ্টাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার হইয়া, বরিশালে গমন করেন। এই স্থানের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময়, তথাকার সিভিল-সার্জ্জনসহ একটু মন-কসাকসি হয়। সিভিলসার্জ্জন তাঁহার বিরুদ্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন, এবং সরকার বাহাদুর "আপনি একটু সতর্কতা সহ কাজ করিবেন" এই কয়েকটি কথা লিখিত এক খানি পত্র তাঁহাকে লিখেন। মহামনা অদ্ভুত-তেজস্বী সত্যব্রত, দৃঢ়কর্ম্ম ক্ষেত্রনাথের চক্ষে এ কথা কয়েকটি সহ্য না হওয়ায় তিনি সরকারী কর্ম্মে ইস্তাফা দেন। এই সময় তাঁহার বেতন ৪০০৲ টাকা ছিল।

হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল ৺ দুর্গামোহন দাস এবং সুযোগ্য ডেঃ মাঃ ৺ মহেন্দ্রনাথ বসু এই সময়ে ক্ষেত্র নাথের পরম সুহৃদ ছিলেন। এক মাত্র মহেন্দ্র বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষেত্র-নাথ কর্ম্মে ইস্তাফা দেন, তজ্জন্য মহেন্দ্র বাবুকে ক্ষেত্রনাথের অনেক বন্ধু বান্ধব অনুযোগ করেন। বসু মহাশয় তাহাঁদিগকে বলেন, "আমি কি করিব, আমি নাচার। ক্ষেত্র বাবু আমাকে বলিলেন,—অপমান যন্ত্রণা আমার সহ্য হইতেছে না। আমি গরিব ভট্টচার্য্যি বামুনের ছেলে। কাঁচকলা ভাতে-ভাত খাইতে পারি, চাকরী গেলে আমার কি দুঃখ। এই সব কথায় তাঁহার মনে বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া আমি তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হই।" কর্ম্ম ছাড়িয়া দেওয়ার পর ক্ষেত্রনাথ কখন কখন বলিতেন "আমার কর্ম্ম যায় নাই, যে সকল আত্মীয় স্বজনকে আমার ৪০০৲ টাকা বেতন হইতে মাসিক কিছু কিছু দিতাম, তাহাদের কর্ম্ম গিয়াছে।" কর্ম্মে ইস্তফা না দিলে হয় ত ইঞ্জিনিয়ার হইয়া ক্ষেত্র নাথ খুব বেশী বেতন পাইতে পারিতেন। কিন্তু "মান অপেক্ষা প্রাণের মূল্য অল্প" এইটি মনে করিয়াই তিনি এইরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৭০ সালের বৈশাখ মাসে ক্ষেত্রনাথ বরিশাল হইতে চুঁচুড়ায় আসেন। ভূদেব বাবু তাঁহাকে বরাবরই ভাল বাসিতেন। তিনি

তাঁহাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতন-ধার্য্যে "এডুকেশন গেজেটের" সহকারী সম্পাদকের কার্য্য করিয়া দেন এই সময়ে এডুকেশন গেজেটের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। অনেক অভিনব বিষয়ও এই সময় এডুকেশন গেজেট লিখিত হইত।

"হতাশের বিলাপ" হইতে আরম্ভ করিয়া ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনেক ক্ষুদ্র কবিতা ক্ষেত্রনাথ এডুকেশন গেজেটে প্রকাশ করেন। ক্ষেত্রনাথের জন্যই বঙ্গবাসী হেম বাবুর "ভারত সংগীত" প্রথম শুনিতে পাইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথই তাহা "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশ করেন, সে সময়ে কতিপয় প্রসিদ্ধ কবির কবিতা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে ক্ষেত্রনাথের নিকট প্রেরিত হইত। ক্ষেত্রনাথ সে সকল কবিতা দেখিয়া দিতেন।

কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত কাব্য, বাঙ্গলা কীর্ত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বিদ্যাপতি প্রভৃতির পুস্তক ক্ষেত্রনাথ পাঠ করিতেন, । এভিন্ন, সেকসপিয়ার, মিল্‌টান্ এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ বলাতী কবির কাব্য, নাটক ইহাঁর বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল। সাহিত্য সমালোচনায় ইনি বিশেষ পটু ছিলেন। "সধবার একাদশীর" সুবিস্তৃত সমালোচনা, বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারে যত্নে রক্ষিত হইবার জিনিস্। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ভ্রান্তি বিলাসের সমালোচনা"ও সাধারণের আদৃত হইবার যোগ্য। এক সময়ে কোন এক ব্যক্তি এডুকেশন গেজেটে সমালোচিত হইবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র কাব্য ক্ষেত্র নাথের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি তাহার সমালোচনা করিতে সম্মত হন না। সমালোচনা করিবার জন্য কবি তাঁহাকে বারম্বার পত্র লেখায় তিনি কাব্য খানির সংক্ষেপে এইরূপ সমালোচনা করেন, "এই কাব্যে ষড়রসের প্রায় সকল রসই আছে। ছিল না কেবল অদ্ভুত রস; কিন্তু কাব্যখানি প্রকাশ করিয়া তাহার অবতারণা করা হইয়াছে।"

ক্ষেত্র বাবুর সাহিত্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল; নানা কারণে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি ছেলেদের পড়িবার বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক লিখিতে হয়।

তন্মধ্যে অনেকগুলি ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা স্কুলে পঠিত হইবার জন্য, টেক্স্‌ট্‌ বুক কমিটি দ্বারা মনোনীত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি পরপর নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি লিখেন :—

১। জরিপ ও পরিমিতি ১৭৭৩ সালে।

২। নব শিশুবোধ ১৮৭৪ সালে।

৩। কবিতা সংগ্রহ ——১৮৭৬ সালে।

৪। শুভঙ্করী——১৮৭৮ ঐ।

৫। লঘু পরিমিতি——১৮৮৬ ঐ।

গণিতে ক্ষেত্র নাথ দক্ষ ছিলেন সেই জন্য তাঁহার লিখিত গণিত পুস্তক সমস্ত অতি সহজ সাদাসিদা বাঙ্গালায় লিখিত। ইংরাজী গণিতের নিয়মাদি এমন বিশদ বাঙ্গালায় লিখিত যে, তাহা বালক পাঠকের বুঝিবার পক্ষে কোনও কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

১৮৭৩।৭৪ সালে ক্ষেত্রনাথ চুঁচুড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তাহার পর কুমিল্লা গমন করেন; তথায় সেই জেলার ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। পরে বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি কাশ্মীরে যাইয়া কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কয়েকটি এটর্ণির সাহায্যে তিনি পার্টিসানের কাজ সুরু করেন। বেল্‌ চেম্বারস্‌ সাহেব সবিশেষ সজ্জন জানিয়া স্বীয় আপিসের অনেক পার্টিসানের কাজ তাঁহাকে দিতেন। এই কাজ করিয়া তিনি বেশ টাকা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় কয়েকখানি বড় বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন। ভাড়ার টাকায় তাঁহার পুত্রদের বিনাকষ্টে এক রূপে দিনপাত হইতেছে।

১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দেহান্তর হইয়াছে।

কেশবচন্দ্র সেন।



১৮৩৮ খৃঃ অব্দের ১৯শে নবেম্বর কলিকাতা-কলুটোলায় সুবিখ্যাত বৈদ্য বংশে কেশবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম প্যারী-মোহন। প্যারীমোহনের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল এবং তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। অবস্থার উন্নতির সহিত ধর্ম্মগত প্রাণ প্যারীমোহন হিন্দু ধর্ম্মের যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ বরাবর সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন করিতেন। কেশবচন্দ্রের জননীও ইষ্টানিষ্ঠা সম্পন্না ছিলেন। এই সব কারণে কেশবচন্দ্রের প্রাথমিক জীবনেই মনোমধ্যে ধর্ম্মভাব অঙ্কুরিত হয় এবং তাহারই ফলে কালে তিনি একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠেন।

বাল্যেই কেশবচন্দ্রের প্রতিভার আভা বিলক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বালক কালে তিনি টাউন হল প্রভৃতি স্থানে যে সকল তামাসা বা ভোজ-বাজী দেখিয়া আসিতেন, বাড়ীতে আসিয়া ঠিক তাহার অনুকরণ করি-তেন, সকলে তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইত। প্রকৃত পক্ষে মনের ভাব সম্যকরূপে ব্যক্ত করিতে ঐ সময়েই তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিতেছিল।

এখন যেখানে "আলবার্ট হল" স্থাপিত রহিয়াছে, আগে সেখানে একটি "পাঠশালা" মাত্র ছিল। এই পাঠশালেই কেশবচন্দ্রের প্রথম বিদ্যারম্ভ। ইহার পর তিনি হিন্দু কলেজে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সেকেণ্ড সিনিয়ার শ্রেণী পর্য্যন্ত এই কলেজে অধ্যয়ন করা হওয়ার পর তিনি মেট্রোপলিটন কলেজে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু এই কলেজটি দিন কতক পরেই উঠিয়া যাওয়ায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তী হন। এখানে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর গণিত শাস্ত্রে বড় ব্যুৎপত্তি ছিল না, সেই জন্য শিক্ষাকালে বিশেষ গৌরব লাভও ঘটে নাই। কিন্তু তাহা না ঘটিলেও কাব্য-দর্শনাদি ইহাঁর বিশেষ আদরের সামগ্রী ছিল, এতদ্ভিন্ন ইতিহাস, ন্যায় এবং বিজ্ঞানে ও কেশব

চন্দ্রের যথেষ্ট অধিকার ছিল। তিনি বিশেষ মনোযোগ সহ বহুদিন ধরিয়া এ গুলির অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দের ২৭শে এপ্রেল বালী গ্রামের ৺চন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের কন্যার সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর স্ত্রীর নাম গোলাপ সুন্দরী। গোলাপ সুন্দরী বিলক্ষণ সুন্দরী ও সর্ব্ব সুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে! কেশবচন্দ্র সেই সময়ে ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্ম চিন্তায় তদ্গদ চিত্ত। ধর্ম্মালোচনার চিন্তায় গোলাপ সুন্দরীর সৌন্দর্য্য কেশবচন্দ্রের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইল না। পত্নী কেন, বন্ধুবর্গের সহিতও কেশবচন্দ্র সেন সময়ে ভাল করিয়া সাক্ষাৎ আদি করিতেন না। অনেক সময়েই নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে অহঙ্কারী আখ্যায়ও অভিহিত করিত। ফলে তাঁহার অহঙ্কার না থাকিলেও, লৌকিক শিষ্টাচারের ধার তিনি বড় একটা ধারিতেন না, নির্জ্জনে ধর্ম্ম চিন্তাই সে সময়ে তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল।

নানারূপ ধর্ম্ম গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া, এই সময় তিনি পাদরী বারন্ সাহেবের নিকট বাইবেল পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার আত্মীয় বৈষ্ণব পরিবার বর্গ ইহা দেখিয়া বিশেষ আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, পাছে তিনি ইহারই ফলে খৃষ্টান হইয়া পড়েন—ইহাই তাঁহাদের ভয় হইল। ফলে, ইউরোপীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের নিকট ধর্ম্মমত শিক্ষা করিয়া তাহার সহিত দেশীয় ধর্ম্মের সংমিলন করাই কেশবচন্দ্রের উদ্দেশ্য, তিনি সেই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বর্ত্তমান অবস্থান্তর ইহারই ফল। শৈশব-জীবনে, নয় দশ বৎসর বয়সের সময় বৈষ্ণব পরিবারে লালিত পালিত কেশবচন্দ্র গরদের যোড় পড়িয়া, সর্ব্বাঙ্গে চন্দনের ছাপ দিয়া, মৃদঙ্গের সঙ্গে হরি সংকীর্ত্তন করিতেন। এক্ষনে নানা ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠে কেশবচন্দ্রের সে ধর্ম্মে অনুরাগ লোপ পাইল। তিনি সম্পূর্ণ নিরাকারও একেশ্বর বাদী হইয়া পড়িলেন, ফলে, ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

কেশবচন্দ্রের এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণের প্রধান সাহায্যকারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি অনেক সময় ব্রাহ্ম-সমাজে গমন

করিতেন, তাহাতেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয়। ফলে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ কালে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে নানারূপে সাহায্য করেন। কিন্তু তাহা করিলেও, কালে দেবেন্দ্রনাথের সহিত ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কোন্ ভাবে চালিত হইবে—ইহা লইয়া মতদ্বৈধ ঘটে। তাহারই ফলে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেন। ১৮৬৫ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

এই সময় তাঁহার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কারণ ইহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ১৮৬২খৃঃ অব্দের ১৩ইএপ্রেল তিনি "ব্রহ্মানন্দ" উপাধি লাভ করিয়া, কলিকাতা আদি ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্যের পদে বরিত হয়েন। যে দিন তাঁহার এই অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেই দিন প্রাতঃকালে সপরিবারে দেবেন্দ্রনাথের বাড়ীতে গমন করেন। ইহাতে তাঁহার আত্মীয় বর্গ তাঁহার উপর অত্যন্ত চটিয়া গিয়া তাঁহাকে গৃহ-বহিস্কৃত করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর হইতে ১৮৬১ খৃঃ অব্দের ১লা জুলাই পর্য্যন্ত আত্মীয়গণের চেষ্টায় তিনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। এই কর্ম্মে তিনি প্রথমতঃ ত্রিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া পঞ্চাশ টাকার পদে উন্নীত হন। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্যই এই কর্ম্ম স্বীকার করাইয়া ছিলেন। কেশবচন্দ্র আপন ইচ্ছায় এই কর্ম্ম পরিত্যাগ করি-লেন। এই সময় বেঙ্গলব্যাঙ্কের ডিক্‌সন সাহেব কেশবচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন,—"তুমি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না, আমি শীঘ্রই তোমার একশত টাকা বেতন করিয়া দিব।" কেশবচন্দ্র তাহার উত্তরে বলেন, "পাঁচ শত টাকা বেতন দিলেও আর চাকরি করিব না।" কিন্তু তিনি এরূপ বলিলেও আত্মীয়গণের চেষ্টায় তাঁহাকে আর একবার চাকরি করিতে হইয়াছিল। সে চাকরি—টাকশালের দেওয়ানী। আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার এক বৎসর পরে ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার সে চাকরি লাভ ঘটে।

কেশবচন্দ্র বাল্য কালাবধি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক প্রকাশ ও অনেক স্থানে অনেক গুলি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

বয়ঃ-বিকাশের সহিত তাঁহার সেই সমস্ত গুণরাশি সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপিয়া পড়ে। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় কেশবচন্দ্র কর্তৃক কলুটোলার নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি সেখানে দরিদ্র বালক ও শ্রমজীবিদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ১৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি তাঁহার পৈতৃক পূর্ব্ব বাসস্থান গৌরিভা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কবি সেক্সপিয়ার প্রণীত "হ্যামলেট" নাটক অভিনয় করেন। প্রসিদ্ধ বক্তা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহকারী ছিলেন। সেই সময় গৌরিভা গ্রামে তিনি একবার বাজীকর সাহেব সাজিয়া অতি আশ্চর্য্য কৌশলে এরূপ বাজী দেখাইয়াছিলেন ও ইংরাজীতে কথা কহিয়াছিলেন, যে, তাঁহাকে ইউরোপীয়ান বলিয়া সাধারণের ভ্রম জন্মিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের এই উনিশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার কলুটোলার বাড়ীতে "গুড উইল ফ্রেটারনিটী" এবং "হিন্দুকলেজে থিয়েটার গৃহে" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি" নামক দুইটী সভা স্থাপিত হয়। প্রথম সভার উদ্দেশ—ধর্ম্মালোচনা এবং দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য—সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চ্চা। কেশবচন্দ্র এই দুইটী সভাতেই প্রার্থনা ও বক্তৃতা করিতে শিক্ষা করিয়া বিশ্ব-বিমোহিনী বক্তৃতা-শক্তি লাভ করেন। এই সময় ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত "রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা" নামক একখানি পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি সেই পুস্তক পাঠেই ব্রাহ্ম সমাজে প্রবিষ্ট হন। এই সময় তিনি খৃষ্টানদিগের মত—ইংরাজী ভাষায় "O Lord" বলিয়া প্রার্থনা করিতেন, তাহাতে তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে খৃষ্টান বলিয়া সন্দেহ করিত। ফলে তিনি খৃষ্টান হইলেন না, ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্ম হইয়া পড়িলেন—সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ কার্য্যে কেশবচন্দ্রের উপর তাঁহার মাতার যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। তাহার কারণ, কেশবচন্দ্র যে দিন প্রথম ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সেই দিন ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি পুস্তক মাতাকে আনিয়া দেন। মাতা সে গুলি তাঁহার গুরুকে দেখান। গুরু তাহাতে বলিয়াছিলেন,—"ধর্ম্ম তো উত্তম, প্রতিপালন করিতে পারিলে হয়। মা, তুমি ভীত হইও না কেশব যে পথ ধরিয়াছে, তাহাতে তাহার মঙ্গল হইবে।"

মাতার তাহাতেই সহানুভূতি। ফলে কিন্তু লোকে বলিত,—"কেশবচন্দ্রের মাতাই কেশবচন্দ্রকে মন্দ করিল।"

এই সময় কেশবচন্দ্র গোপাললাল মল্লিকের বাড়ীতে "বিধবা বিবাহ নাটক" অভিনয় করেন। ইহার পর ১৮৫৯ খৃঃ অব্দের ২৫শে এপ্রেল একুশ বৎসর বয়সের সময় উক্ত গোপাললাল মল্লিকের বাড়ীতেই অল্প বয়স্ক যুবকদিগের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহায্যে ও উৎসাহে তিনি এক ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গলায় ও ও কেশবচন্দ্র ইংরাজীতে ধর্ম্মবিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে যে সমস্ত বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, তাহা পাঠে অনেক যুবক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করে। এই সময় খৃষ্টধর্ম্মের স্রোত ভারতে প্রবল ভাবে বহিবার উপক্রম হইয়াছিল। একটু ইংরাজী লেখাপড়া শিখিলেই অনেক যুবকের মন খৃষ্টধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইত। কেশবচন্দ্রের মুদ্রিত বক্তৃতাগুলি পাঠে তাহা কমিয়া আসিল। এমন কি, সে সময়ে যাঁহারা হিন্দু ও খৃষ্টধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া, নাস্তিকতার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কেশবচন্দ্রের মতের অনুবর্ত্তী হইলেন। ফলে খৃষ্টিয়ানেরা এই উপলক্ষে কেশবচন্দ্রের উপর বড়ই বিরক্ত হইল। এই একুশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার বেঙ্গল ব্যাঙ্কের চাকরি। সেই চাকরি স্থানে বসিয়াই "হে বঙ্গীয় যুবক ইহা তোমারই জন্য" নামক পুস্তক রচনা করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজে "ব্রাহ্মসমাজ সমর্থন" নামক একটি বক্তৃতাও কেশবচন্দ্র এই সময়ে প্রদান করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে, যে সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে কেশবচন্দ্র বিচ্ছিন্ন হইলেন, সেই সময় শিয়ালদহ রেলষ্টেশনে "ব্রাহ্মসমাজে স্বাধীনতা ও উন্নতির সংগ্রাম" নামক একটী বক্তৃতা তাঁহার কর্ত্তৃক প্রদত্ত হয়। এই বক্তৃতায় বহু লোকের সমাগম হইয়াছিল। এই সময় গোপাললাল মল্লিকের বাড়ীতেও ইনি এ সম্বন্ধে দুইটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন।

ইহার পর আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে তাড়িত ব্রাহ্মদলকে লইয়া ১৮৭৬ শকের ৬ই ফাল্গুন তিনি একটি সাধারণ-সভা সংগঠিত করিলেন।

একটি প্রচার-বিভাগও এই সঙ্গে স্থাপিত হইল। কিন্তু এ সভা অধিক দিন টিকিল না। তাহার পর ১৮৬৬ খৃঃ অব্দের ১৬ই নবেম্বর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে, কেশবচন্দ্র প্রকাশ্যভাবে প্রচার-কার্য্যে ব্রতী হয়েন। কলিকাতা, ভবানীপুর চুঁচুড়া, প্রভৃতি স্থানে তাঁহার প্রথম প্রচার আরম্ভ হয়। ক্রমাগত তিনি চারি বৎসর এইরূপ বাঙ্গালার নানা স্থানে প্রচার করিয়া, ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারি বোম্বাই মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে "যীশুখৃষ্ট; ইউরোপ এবং এসিয়া" বিষয়ে "মেডিকেল কলেজ থিয়েটারে" একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া অনেকে মনে করিয়াছিল, তাঁহার আর খৃষ্টান হইবার বড় বিলম্ব নাই। যে খৃষ্টানেরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহার উপর নানা কারণে চটিয়া গিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে তাঁহার উপর বড় সন্তুষ্ট হইল। মনে করিল, "কেশব সেন খৃষ্টান হইল।" এই বক্তৃতায় তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতিও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তৎকালীন গবরণর জেনারল সার জন লরেন্স বাহাদুর সংবাদপত্রে তাঁহার সেই বক্তৃতা পাঠ করিয়া, তাঁহার সহকারী গর্ডন সাহেবকে দিয়া সংবাদ প্রেরণ করেন যে, পর্ব্বত হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। তিনি এই সময় হইতে বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বরাবর কেশবচন্দ্রকে স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন। তিনিই কেশবচন্দ্রকে তৎকালীন সমস্ত প্রধান প্রধান প্রধান রাজপুরুষদিগের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরে মিস মেরি কার্পেণ্টর এদেশে আসিয়া গবরমেণ্ট-ভবনে অবস্থিতি করেন। তিনি কেশবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া, লাটভবনে লইয়া যান। সেখানে গবর্ণর বাহাদুরের সহিত কেশবচন্দ্রের অনেক কথাবার্ত্তা হয় এবং তাহাতে উভয়ের বন্ধুতা অধিকতর ঘনিষ্ট হয়। এই বৎসর ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে তিনি "মহাপুরুষ" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। ভবিষ্যতে তিনিও যে একজন মহাপুরুষ হইতে পারিবেন, এই বক্তৃতা শুনিয়াই সাধারণে তাহা বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর কেশবচন্দ্র ঢাকা, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ, হিন্দুস্থান ও পঞ্জাব অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন। তত্রত্য অধিবাসীবর্গ তাঁহার বক্তৃতায়

মুগ্ধ হইয়াছিল। পঞ্জাবের তদানীন্তন গবরণর ম্যাকলিয়ড সাহেব তাঁহাকে একদিন আহারের নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক বিশেষ সমাদর করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার "প্রকৃত বিশ্বাস" নামক পুস্তক লিখিত হয়।

১৮৭১ শকের ভাদ্রমাসে কেশবচন্দ্র স্বীয় কলুটোলার বাটীতে দৈনিক উপাসনা আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজে মৃদঙ্গ ব্যবহার আরম্ভ হয়। ইহার পর তিনি শান্তিপুর গমন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় ভক্তি বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বৎসরই সাধারণ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া ইনি "মাঘোৎসব" করেন। ব্রাহ্মসমাজে সংকীর্ত্তনের দল এই উৎসব উপলক্ষে রাজপথে প্রথম বাহির হয়। এই দিন সন্ধ্যার সময় গোপাললাল মল্লিকের বাটীতে "নবজীবনপ্রদ বিশ্বাস" বিষয়ে ইহার একটি বক্তৃতা হইয়াছিল। সস্ত্রীক মাহাত্মা পাদরী ম্যাকলাউড প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ইংরেজ এই বক্তৃতা-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ইহার পর কেশবচন্দ্র মুঙ্গেরে এবং তথা হইতে পুনরায় বোম্বাই অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় মুঙ্গেরে আসেন এবং সেখানে কিছুকাল সপরিবারে অবস্থিতি করেন।

ইংলণ্ডবাসী অনেকগুলি লোকের আগ্রহে ১৮৭০ খৃঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি লণ্ডনে গমন করেন। সেখানে গমন করিয়া সারজন বার্ডয়ারিং, ডাক্তার মার্টিনো ও ইউনিটেরিয়ান্ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হন। ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের যত্নে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য একটি সভাও আহূত হইয়াছিল। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। পুরোহিত ডিন্‌ষ্ট্যানলি ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোক বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র তাহার প্রতি বক্তৃতায় তাঁহার হৃদয়ের যে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ছিলেন, তাহাতেই তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা বিলাতের চারিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়ে। এমন কি, গ্রাফিক্-পত্রিকায় তাঁহার জীবনী ও প্রতিমূর্ত্তি বাহির হয়। ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের সম্পাদক রেভারেণ্ড স্পিয়ার্স সাহেব কেশবচন্দ্রকে নিজ

বাটীতে লইয়া যান। তিনি যখন বিলাতে গমন করেন, সে সময়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতা-টাউনহলে এক সভা আহ্বান করিয়া, "ভারতের সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ" নামক এক বক্তৃতা দ্বারা সাধারণের নিকট অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তাহাতে পাঁচ শত টাকার অধিক সংগৃহীত হয় নাই। কাযেই কেবল এক মাসের ব্যয়োপযোগী অর্থ মাত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার যে ব্যয় হইয়াছিল, তাহা ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায় বহন করেন, এতদ্ভিন্ন তাঁহার পরিবারকে পাঁচ সহস্র মুদ্রাও প্রদান করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের নিয়ম আছে, কোন আগন্তুক কোন উপাসনালয়ে উপাসন করিলে, তাঁহাকে একটী বা একাধিক স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করা হয়, কেশবচন্দ্র কিন্তু ইহা গ্রহণ করেন

ইহার পর তিনি তথায় মার্টিনোর ভজনালয়ে "ঈশ্বর প্রাণের প্রাণ" বিষয়ে বক্তৃতা করেন্। বিলাতের রমণীরত্ন মিস্ কব এবং অনেক সম্ভ্রান্ত রাজ পুরুষ সেই বক্তৃতা-স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তাহার পর কন্ওয়ের গির্জ্জায় "অপব্যয়ী পুত্র" হ্যাকনীচর্চ্চের 'প্রার্থনা' ইস্লিংটনে 'ঈশ্বর প্রেম' এবং একজেটার হলে "সাধারণ শিক্ষা' সম্বন্ধে কয়েকটী বক্তৃতা করেন। একজেটার হলের "সাধারণ শিক্ষা" শীর্ষক বক্তৃতা শুনিয়া একজন পাদরী বলিয়াছিলেন—"বাস্তবিক সেন মহাশয়, আমাদের উচিত যে, আপনার পদতলে বসিয়া কিছু শিক্ষা করি।" মদ্যপান, যুদ্ধ নিবারণী সভা, দাতব্য সভা, শ্রমজীবি এবং অন্ধ ও বধিরদিগের আশ্রমেও তিনি অনেক গুলি বক্তৃতা করেন। সেণ্টজেমস হলে পাঁচ হাজার শ্রোতার সম্মুখে বৃটিশ রাজের মদ্য ব্যবসায়ের প্রতি তীব্র আক্রমণ করিয়া, একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্পার্জ্জন্স্ টেবার্ণকেলে "ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য" বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি ভারতীয় নীচ শ্রেণীর ইংরাজদিগের অত্যাচারের কথা সুস্পষ্ট প্রকাশ করেন। ইহার পর তিনি খৃষ্টধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্ব লইয়া "খৃষ্ট ও খৃষ্টধর্ম্ম" নামক একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া সুইডেন বর্গ সভা তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র এবং কতকগুলি প্রেততত্ত্ব বিষয়ক সুদৃশ্য গ্রন্থ প্রদান করিয়াছিলেন।

১১ই জুন কেশবচন্দ্র লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া ব্রিষ্টলে গমনপূর্ব্বক মিস্ কবের ভবনে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের সমাধি মন্দির দর্শন করিতে গিয়া সমাধি স্থানে আপনার নাম লিখিয়াছিলেন। ইহার পর সেক্সপিয়ারের জন্মস্থান্ ষ্ট্রার্ট ফোর্ড, পরে লিচেষ্টার, বর্ম্মিংহাম, ও নটিংহাম গমন করেন। "খৃষ্টান না হইলে পরিত্রান নাই—"তুমি খৃষ্টান হইবে কি না?"—এই মর্ম্মে একখানি পত্র শেষোক্ত স্থানে প্রাপ্ত হন। সে পত্রে ৪০ জন পাদরীর স্বাক্ষর ছিল। কেশবচন্দ্র সেই পত্রের উত্তর এইরূপ লিখিয়াছিলেন,—আপনাদিগের মতানুসারে আমি খৃষ্টান হইব না, তবে যীশুর প্রেম, ভক্তি ও আত্মত্যাগ আমার প্রার্থনীয়।" এই সময় তিনি পীড়িত হইয়া কিছুদিন রেভারেণ্ড হার্ডফোর্ড ব্রুকের গৃহে অবস্থিতিপূর্ব্বক লিভারপুল গমন করেন। সেখানে পীড়িতাবস্থাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যাধিক পরিশ্রমে পীড়া-বৃদ্ধি হওয়ায় দুই সপ্তাহের জন্য কার্য্য বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। আমেরিকা গমনে কেশবচন্দ্রের বিশেষ ইচ্ছা ছিল কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পারিয়া উঠিলেন না। তিনি লিভারপুল হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহার পর এডিন্‌বরা, গ্ল্যাসগো প্রভৃতি স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই সময় অক্সফোর্ড নগরে পণ্ডিতবর মোক্ষমূলায়ের সহিত সাক্ষাৎ তাঁহার হয়। মোক্ষমূলার তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে লইয়া যান। ডাক্তার পিউজ, জন ষ্টুয়ার্ট মিল্, নিউম্যান, কার্ডয়েল প্রভৃতি বিলাতের প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিতও তাঁহার এই সময় সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর অসবরণ নামক রাজপ্রাসাদে তাঁহার, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে। রাজকন্যা লুইও তথায় ছিলেন। মহারাণী, কেশবচন্দ্রকে নিজের একখানি প্রতিমূর্ত্তি এবং তাঁহার স্বামীর দুইখানি জীবন বৃত্তান্ত প্রদান করেন। রাজকুমার লিওপোল্ড কেশবচন্দ্রের হস্তাক্ষর চাহিয়া লয়েন। মহারাণী স্বামীর দুইখানি জীবনী তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার হস্তাক্ষর ছিল। কেশবচন্দ্রও মহারাণীকে পত্নীর প্রতিমূর্ত্তি উপহার দেন।

ইহার পর তিনি ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্বদেশে ফিরিবার জন্য জাহাজে আরোহন করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাতের হানোয়ার রুমে তাঁহাকে বিদায় দিবার জন্য একটী সভা আহুত হইয়াছিল। জাহাজে আরোহন করিবার সময়ও অনেক বন্ধুর অনুরোধে তাঁহাকে কিছু বলিতে হইয়াছিল।

১৮৭০ খৃঃ অব্দের ২রা নভেম্বর "কেশবচন্দ্রের প্রযত্নে ভারত সংস্কারক সভা" স্থাপিত হয়। এই সভা ৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) সুলভ সাহিত্য বিভাগ; এই বিভাগ হইতে "সুলভ সমাচার" নামক একখানি এক পয়সা মূল্যের সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইত। (২) দাতব্যবিভাগ (৩) শ্রমজীবিদিগের শিক্ষা বিভাগ, (৪) স্ত্রীবিদ্যা-লয় বিভাগ (এই বিভাগে বয়স্থা মহিলাগণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন।) (৫) সুরাপান নিবারণী বিভাগ (এই বিভাগ হইতে "মদ না গরল" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত।)

১৮৭১ খৃঃ অব্দে "ইণ্ডিয়ান মিরর" সংবাদ পত্র দৈনিক হয়। ইহার পর "ভারত আশ্রম" সংস্থাপিত হয়। নানা কারণে এ সভা কিন্তু অধিক দিন জীবিত থাকিতে পারে নাই।

১৭৯৪ শকের শেষভাগে কেশবচন্দ্র স্বপাক ভোজন, মধ্যাহ্ণ ও সায়ংকালে কুটীরে বাস ইত্যাদি কতকগুলি ব্রত গ্রহণ করেন। এই রূপ ব্রত অবলম্বনে অতি শীঘ্রই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন, কাজেই বাধ্য হইয়া অত্যল্প দিনেই তাঁহাকে সে ব্রতগুলি ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে হইল।

১৭৯৮ শকের ৫ই বৈশাখ কেশবচন্দ্রের যত্নে "আলবার্ট হল" নামক সুরম্য অট্টালিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ শকের ৮ই জ্যৈষ্ঠ মোড়কপুর গ্রামে "সাধক কানন" নামক উদ্যানও ইহার স্থাপিত। ঐ স্থানে ব্রাহ্মগণ সাধন ভজন করিতেন। ঐ বৎসর ফাল্গুন মাসে টাউন হলে গবর্ণর জেনারেল লর্ড লিটন বাহাদুরের অনুরোধে "ধর্ম্মে বিজ্ঞান ও উন্মত্ততা' নামক একটী বক্তৃতাও প্রদান করিয়াছিলেন।

১৭৯৯ শকের আশ্বিন মাসে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের উত্তেজনায় ইনি প্রতিনিধি সভা স্থাপিত করেন। এই বৎসর মান্দ্রাজ অঞ্চলে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয়। কেশব চন্দ্র সে জন্য ভারত বর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে এক সভা আহ্বান করিয়া, অনেক টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ পাঠাইয়া দেন। এই বৎসরের ২৮শে কার্ত্তিক কলুটোলার বাস ভবন পরিত্যাগ করিয়া ইনি "কমল কুটীরে" বাস আরম্ভ করেন।

ইহার পর কেশবচন্দ্র স্বীয় কন্যাকে কোচবিহারাধিপতির করে অর্পণ করিলেন। কোচবিহারাধিপতির ইচ্ছায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণের মন্ত্রপাঠে এই বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইহাতে ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটু গোলযোগ বাধিল। এই কারণে তাঁহাকে বেদীচ্যুত করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হইল না। ফলে, ইহা হইতে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে দলাদলি, এবং তাহা হইতে আর একটী ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইল। ইহাই "সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ।"

এই কারণে কেশবচন্দ্রের মনে একটা বিশেষ আঘাত লাগিল। সেই আঘাতে তাঁহার পীড়া হইল। তাহার পর, সেই রোগ হইতে মুক্ত হইয়া, ১৮০১ শকে শারদীয় পূর্ণিমার দিবস কেশবচন্দ্র নৌকা ও বাষ্পীয় পোতে শারদীয় উৎসব সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে গঙ্গা-বক্ষে সংকীর্ত্তন ও গঙ্গা দেবীকে অর্চনা করা হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরের মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসও এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ইহার পর কেশবচন্দ্র কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে বিতরণ করেন। সাম্বৎসরিক উৎসব সময়ে তিনি "আমি কি প্রত্যা-দিষ্ট প্রেরিত মহাপুরুষ" সম্বন্ধে টাউন হলে বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতায় তিনি যে একজন অসাধারণ তাহা নিজেই প্রকাশ করেন। এ স্থলে তিনি তাঁহার নিজের অসাধারণত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ১৪ বৎসর বয়সের সময় আমিষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন—উল্লেখ করেন।

এই বৎসর টাউন হলে "খৃষ্টকে" সম্বন্ধে তিনি একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। এই সময়েই নারী জাতিকে জ্ঞান ধর্ম্ম ও গৃহ-কার্য্যে

সুশিক্ষিত করিবার জন্য "আর্য্য নারী সমাজ" নামে একটী সভাও স্থাপিত করেন। "মঙ্গল বাড়ী" নামে কতকগুলি বাড়ীও এই সময় কেশবচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সকল বাড়ীতে প্রচারকেরা থাকিত।

এই শকের ভাদ্রমাসে কেশবচন্দ্র কয়েকজন বিশেষ প্রচারককে কয়েকটী বিশেষ বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের উপর খৃষ্টীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র, গৌর গোবিন্দ রায়ের উপর হিন্দুশাস্ত্র, গিরীশচন্দ্র সেনের উপর মুসলমান শাস্ত্র, অঘোর নাথ গুপ্তের উপর বৌদ্ধশাস্ত্র এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের উপর সঙ্গীত অনুশীলনের ভার দেওয়া হয়। এই বৎসর কার্ত্তিকমাসে কেশবচন্দ্র স্বদলে প্রচার যাত্রায় বহির্গত হন। এই সময় তাঁহার হিন্দু আচার-ব্যবহারের উপর দৃষ্টি পড়ে;—এ জন্য অনেকে এই সময় তাঁহাকে হিন্দু হইয়াছেন বলিয়া মনে করিত। কেহ কেহ পরিহাস-ছলে তাঁহার ধর্ম্মকে "দরবেশের কাঁথা, খাসিদারের চানাচুর"—এরূপও বলিত। কেশবচন্দ্র সকলের কথাই শুনিতেন, শুনিয়া হাসিতেন মাত্র। এই সময় তাঁহাদের সমাজে গৈরিক বস্ত্রের প্রচলন আরম্ভ হয়। ইহার পরই কিন্তু ১৮০১ শকের ১২ই মাঘ ইনি "নব বিধান" ধর্ম্ম প্রচার করেন।

ইহার পর তিনি সপরিবারে নাইনিতাল পর্ব্বতে গমন করেন। এই সময় ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিয়া, পত্নীকে পার্শ্বে বসাইয়া, কেশবচন্দ্র ভজন-সাধন করিতেন। কেশবচন্দ্রের স্ত্রী এই সময় যোগ-সাধনের জন্য কেশ দাম মুণ্ডিত করেন। তাহার পর তিনি নাইনিতাল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময় তাঁহার কয়েকখানি ক্ষুদ্র ইংরাজী পুস্তক প্রণীত হয় এবং তখন হইতে তিনি প্রার্থনায় গ্রাম্য ভাষার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন।

১৮০২ শকের ১৬ই মাঘ ইনি "প্রচারক সভাকে" "প্রেরিত-দিগের দরবার" নামে অভিহিত করেন। এই বৎসর উৎসবের সময় বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও ললিত বিস্তার একস্থানে স্থাপিত করিয়া, তাহার উপর "নব বিধানের" নিশান উড়াইয়া দলস্থ সকলকে উহা স্পর্শ করিতে

বলেন। যাঁহারা স্পর্শ করিলেন, তাঁহারা বিধান ভুক্ত হইলেন, যাঁহারা স্পর্শ করিলেন না, তাঁহারা বিধানভুক্ত হইতে পারিলেন না। ইহার পর, মান্দ্রাজ পঞ্জাব, বিহার, উড়িষ্যা এবংবাঙ্গলার স্থানে স্থানে প্রচারকদিগকে প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। ইহার পর পুত্রের প্রতি সংসারের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া, গোঁফ ও মস্তক মুণ্ডন এবং গৈরিক বসন পরিধান পূর্ব্বক তিনি ভিক্ষার ঝুলি গ্রহণ করেন। এই সময় ইহাঁর "বিধান ভারত" নামক গ্রন্থ রচিত হয়।

১৮০৩ শকে ইনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। পীড়ার কিছু উপশম হইলে দার্জ্জিলিঙ্গ গমন করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া "নববৃন্দাবন নাটক' অভিনয় করেন।

১৮৮১ খৃঃ অব্দের ২৪ মার্চ্চ "নববিধান" নামক ইংরাজী সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। "পরিচারিকা" "বালকবন্ধু" "থিয়িষ্টিক কোয়াটারলি রিভিউ" পত্রও এই সময় প্রকাশিত হয়। "ব্রহ্ম বিদ্যালয়" ও স্ত্রীদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য "ভিক্টোরিয়া কলেজ"ও এই সময় স্থাপিত।

"নববিধান" প্রচারের পর কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরের নাম "টেবার্ণেকেল" রাখেন এবং তাঁহাদিগের নামের পূর্ব্বে "শ্রদ্ধেয় ভাই" শব্দ সংযুক্ত করেন।

১৮০৪ শকের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে তিনি স্বর্ণ-বলয় হস্তে দিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। এই বৎসর তিনি টাউনহলে "ইউরোপের নিকট এসিয়ার সংবাদ' নামক যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার শেষ বক্তৃতা। সেই বক্তৃতা-বিশারদ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ স্বীয় অমৃতময়ী বক্তৃতার ঝঙ্কারে শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কর্ণ-কুহর আর পরিতৃপ্ত করিতে পারেন নাই। কারণ বার্ষিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গেলে তিনি সপরিবারে শিমলা-শৈলে গমন করেন। পথের কষ্টে অম্বালায় গিয়া পীড়িত হন। তাহার পর একটু সুস্থ হইয়া গন্তব্যস্থানে গমন পূর্ব্বক "নব সংহিতা" নামক পুস্তক প্রণয়নে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত পুস্তক লিখিয়া, তাহার পাণ্ডুলিপি ডাকে পাঠান, তাহার পর উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া—এই সব কারণে সারিয়াও সারিতে পারিলেন

না, পুনরায় শীঘ্র পীড়া বাড়িয়া উঠিল। এই পীড়িতাবস্থাতেই আমেরিকার কোন ব্যক্তির অনুরোধে "যোগ" নামক আর একটী প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করিতে হয়। এই সব কারণে ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিল। এমন কি, এই সময়ে উপাসনার পর আর তিনি মুহূর্ত্তমাত্র বসিয়া থাকিতে পারিতেন না, শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতেন। অন্য লোকে কোমর ও পিঠ টিপিয়া দিলে আহার করিতে পারিতেন। চিকিৎসকেরা এই জন্য, তাঁহাকে ছুতারের কার্য্য করিতে পরামর্শ দিলেন। তাহার কারণ, শারীরিক পরিশ্রমে পীড়ার শান্তি হইতে পারে। কেশব চন্দ্র এই জন্য প্রত্যহ আহারান্তে ২৩ ঘণ্টা ধরিয়া ছুতারের কার্য্য করিতেন। এইরূপ কার্য্যে তিনি কয়েকখানি টেবিল ও ছোট ছোট আলমারি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

১৮৮৩ খৃঃঅব্দে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি ভগ্ন-শরীরে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। এ সময়ও তিনি নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারেন নাই যেই শরীর একটু ভাল বোধ হইত, তখনই 'নব-বিধানের' প্রুফ সংশোধন, বাটী মেরামত ইত্যাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন। এই সময় তিনি তাঁহার বাড়ীতে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। উদ্দেশ্য—সেই মন্দিরে দৈনন্দিন উপাসনা সাধিত হইবে।

ক্রমশঃ তাঁহার পীড়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। লর্ড বিশপ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, এই সময় ১৮৮৪ খৃঃ অব্দে তিনি জীবনের পরিণাম বুঝিতে পারিয়াই বুঝি, তাঁহার সেই দৈনন্দিন উপাসনার অসম্পূর্ণ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ইহার পর তাঁহার রোগ ভীষণ হইতে ভীষণ তর হইয়া উঠিল। তিনি রোগ-যন্ত্রণায় "বাবা-রে" "মা-রে" বলিয়া অনেক সময় চীৎকার করিতে থাকিলেন। একদিন তাঁহার জননী তাঁহাকে বেদনায় অস্থির দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"কেশব, আমার পাপেই তোমার এত যন্ত্রণা হইতেছে।" কেশবচন্দ্র মাতৃক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, উত্তর করিলেন,—'মা, তুমি এমন কথা বলিও না। তুমি আমার ধার্ম্মিক

মা। তোমার আশীর্ব্বাদেই আমার সব হইয়াছে, এবং তোমার গর্ভে জন্মিয়াছি বলিয়াই আমি এত ভাল হইতে পারিয়াছি।"

একদিন অমৃতলাল বসু কেশবচন্দ্রের শয্যা পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। কেশব, অমৃতলালের গলা ধরিয়া, তাঁহার ক্রোড়ে মাথা লুকাইয়া, বলিলেন,—"ভাই অমৃত, বেদনায় হাড় গুঁড়া হইয়া গেল।" তাহার পর দেবালয়ের মেজেতে কত শ্বেত পাথর লাগিবে, সেই সম্বন্ধে অমৃতলালের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে তিনি রোগের যন্ত্রণায় যেরূপ অস্থির হইয়াছিলেন, মন্দিরের ভাবনাও তাঁহার তদ্রূপ হইয়াছিল। তাঁহার রোগের সময় সিন্ধু-দেশ-বাসী নেভাল রাও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে বলেন, কোন ভাল দ্রব্য দেখিলে "আনন্দ বাজারে"র জন্য পাঠাইয়া দিও। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে অমৃতলালকে বলেন,—"মন্দিরের পার্শ্বস্থ জমি বিক্রয় করিয়া মন্দিরের ঋণ পরিশোধ করিও।

ইহার পরই ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে ৯টা ৫৩ মিনিটের সময় তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা,—পার্থিব-ভাবনা—সকলই অনন্তে মিশাইয়া গেল; কেশবচন্দ্র অনন্ত কালের জন্য অনন্তে আশ্রয় লইলেন। সকলই যাইল, স্মৃতিটুকু কিন্তু যাইবার নহে।

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

বিহারিলাল সৌন্দর্য্যময় স্বভাব-কবি। ইহাঁর কবিতা সরল-শিশুর সেফালিকা-হাসির ন্যায় প্রসন্ন-প্রাঞ্জল—মধুর-কোমল। "বঙ্গ-সুন্দরী," "সারদামঙ্গল" এবং "সাধের আসন" কবি-বিহারিলালের কীর্ত্তি স্তম্ভ। "সারদা মঙ্গল" তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। কবি রবীন্দ্রনাথ বিহারিলালের কবিতার বড়ই অনুরাগী। রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"বাল্যকালে বাল্মীকি প্রতিভা নামক একটী গীতি নাট্য রচনা করিয়া, বিদ্বজ্জন সমাগম নামক সম্মিলন উপলক্ষে অভিনয় করিয়াছিলাম। বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য

অনেক রসজ্ঞ লোকের নিকট সেই ক্ষুদ্র নাটকটী প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। সেই নাটকের মূল ভাবটি, এমন কি স্থানে স্থানে তাহার ভাষা পর্য্যন্ত বিহারীলালের সারদা মঙ্গলের আরম্ভ-ভাগ হইতে গৃহীত।

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেন,—

"বর্ত্তমান সমালোচক এক কালে বঙ্গ সুন্দরী ও সারদা মঙ্গলের কবির নিকট হইতে কাব্য শিক্ষার চেষ্টা করিয়াছিল, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে, বলা যায় না। কিন্তু এই শিক্ষাটী স্থায়ীভাবে হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছে যে, সুন্দর ছন্দে এবং ভাষার সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্য কবিতার পক্ষে সাংঘাতিক।"

কবি বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী" প্রথমতঃ "অবোধ সুন্দরী" নামক সাময়িক পত্রে, তাঁহার "সারদামঙ্গল" "আর্য্যদর্শন" নামক মাসিক পত্রে এবং "সাধের আসন" শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত, "মালঞ্চে" প্রথম প্রকাশিত হয়।

১২৪২ সালের ৮ই জ্যৈষ্ঠ কবি বিহারীলাল জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম দীননাথ চক্রবর্ত্তী। নিবাস কলিকাতা। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ইহাঁর শিক্ষালাভ হয়। ১৩০১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ বিহারী-লালের দেহান্তর হইয়াছে।

সৌন্দর্য্য-সেবক বিহারীলালের কবিত্ব কি মধুর গম্ভীর ভাবে মনো-হর। কবি হিমালয়ের বিরাটত্ব বর্ণনায় বলিতেছেন,—

বিশ্ব যেন ফেলে পাছে, কি এক দাঁড়ায়ে আছে!
কি এক প্রকাণ্ড কাণ্ড মহান্ ব্যাপার!
পদে পৃথ্বী শিরে ব্যোম, তুচ্ছ তারা সূর্য্য সোম,
নক্ষত্র নখাগ্রে যেন গণিবারে পারে;
সমুখে সাগরাম্বরা, ছড়িয়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখন যেন দেখিছে তাহারা।
ঝটিকা দুরন্ত মেয়ে, বুকে খেলা করে ধেয়ে,
ধরিত্রী গ্রাসিয়া সিন্ধু লোটে পদতলে।
জ্বলন্ত অনল ছবি, ধবক্ ধবক্ জ্বলে রবি,
কিরণ জ্বলন-জ্বালা মালা শোভে গলে॥

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।



যশোহর জেলার অধীনে জগন্নাথপুর গ্রামে ১২৪৪ সালের ২৫শে ফাল্গুন বুধবার সুরেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম প্রমথনাথ মজুমদার, ইহাঁরা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, ভট্ট-নারায়ণ গোত্রীয়।

সুরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে সামান্য শিক্ষালাভ করেন। ১২৫১ সালে ইনি পিতৃহীন হন। সংসারের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না;—অর্থোপার্জ্জনক্ষম দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহই সংসারে ছিল না। সাত বৎসর বয়স্ক বালক সুরেন্দ্রনাথ এ বিপদের কথা বুঝিলেন,—কিন্তু লেখাপড়া ছাড়িতে পারিলেন না। ১২৫৫ সালে কলিকাতায় ফ্রিচার্য্য ইনিষ্টিটিউশানে প্রবিষ্ট হইলেন; কিন্তু লেখাপড়া বেশী দিন চলিল না। ১২৬৬ সালে ইনি অপস্মার রোগগ্রস্ত হইলেন।

১২৭৮ সালে সুরেন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য মুঙ্গের যাত্রা করেন। পীর-পাহাড়ে থাকেন। এই স্থানেই তাঁহার "মহিলা" কাব্যের প্রথমাংশ লিখিত হয়। ১২৮০ সালে ইনি রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ কার্য্যে ব্রতী হন।

১২৮৫ সালের ৩ রা বৈশাখ ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের "মহিলা"কাব্য বঙ্গসাহিত্যে বড় আদরের সামগ্রী। সে বর্ণনা কি সুন্দর;—

শ্রুতিহর চারুনাদে চরণ সঞ্চার।
ভাব ভরা বিসাল আঁখির।
শোভিত সশব্দে অর্থবহ অলঙ্কার।
আবরিত রসের শরীর।—
পেয়ে হেমরূপ ছবি,
মানব হইল কবি,
বনিতা নবিতা কবিতায়,
মর্ত্ত্যকুঁড়ে বিকসিল কুসুম মন্দার।



ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়।



১৭৬১ শকে (সন ১২৪৬ সালে) ২৭শে ভাদ্র বুধবার শুক্লা চতুর্থী তিথিতে শান্তিপুরে মাতুলালয়ে ডাক্তার যদুনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস মুখোপাধ্যায়। নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত গরিবপুর। যদুনাথ শৈশবে তেমন সুস্থশরীর ছিলেন না। তথাপি দেশপ্রথানুসারে তাঁহাকে পাঁচ বৎসর বয়সেই গুরুমহাশয়ের হস্তে সমর্প করা হয়। তিনি গরিবপুরের নিকটবর্ত্তী ছাতনী নামক গ্রামে মধুসূদন নিয়োগীর পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করেন। শান্ত-শিষ্ট যদুনাথ পাঠে একদিনের জন্যও অমনোযোগী হইতেন না।

যদুনাথ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অতি প্রত্যুষে উঠিয়া পাঠশালে যাইতেন। উষার অনতিস্ফুট-আলোকে পাঠশালের পৈঠা তাঁহাকে হাত দিয়া স্থির করিয়া লইতে হইত। তিনি প্রতিদিনই সকলের অগ্রে পাঠশালে উপস্থিত হইতেন। শৈশবে, গুরুমহাশয়ের তাড়না কখনও তাঁহাকে সহ্ করিতে হয় নাই। গুরুমহাশয়ের মিষ্ট ভৎ’সনা শুনিলেও তিনি অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিতেন।

পাঠশালের পাঠ শেষ হইলে, পিতা কালিদাস, পুত্রকে মোক্তারীর কুঠিয়ালদের স্থাপিত স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তথায় সামান্য পরিমাণে ইংরাজি এবং তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা শিক্ষা হইবার পরে তিনি কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। তখন কৃষ্ণনগর কলেজের নাম খুবই ছিল। সুপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত তখন সে কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। পরলোক গত রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি শিক্ষকতা করিতেন। বিদেশীয় ছাত্রের জন্য কলেজের সংসৃষ্ট একটী বোর্ডিং ছিল। বোর্ডিংয়ের ভার রামতনু বাবুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল।

তখন জুনিয়ার স্কলারশিপ ও সিনিয়ার স্কলারশিপ নামক দুইটী পরীক্ষা দিতে হইত। যদুনাথ প্রশংসার সহিত জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। সিনিয়র স্কলারশিপ দিবার জন্যও

প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু উৎকট অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

ইহার পর ইনি কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তাহাতে বাধা বিপত্তি অনেক। হিন্দুর ছেলে মড়া কাটিবে,—ইহা তাঁহার আত্মীয়বর্গের আপত্তির কারণ হইয়া উঠিল। তথাপি যদুনাথ সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। ছয় মাসের মধ্যে তিনি প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা দিলেন, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন।

ইহার পর মেডিকেল কলেজে পাঁচ বৎসরের অধ্যয়ন শেষ হইল। ইংরাজী ১৮৬৬খৃঃঅব্দে যদুনাথ শেষ পরীক্ষায় বহু সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। প্রায় প্রত্যেক বিভাগেই তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা ধাত্রী-বিদ্যায় ইহাঁর বিশেষ অধিকার জন্মিয়াছিল।

কৃষ্ণনগর কলেজে পাঠাবস্থায় ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে যদুনাথের বিবাহ হয়। মেডিকেল কলেজে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সময় তাঁহার প্রথম সন্তান ভূমিষ্ট ও ধাত্রীর অনবধানতা দোষে বিনষ্ট হয়। ইহাই ধাত্রী-শিক্ষা লিখিবার প্রধান কারণ। একথা তিনি ধাত্রী শিক্ষার ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১২৭১ সালে যুবক যদুনাথ শিক্ষা-মন্দিরের উপাধি-পত্র গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন তাঁহার শক্তি সামর্থ্য অনন্ত,—হৃদয় উদ্যমে পরিপূর্ণ।

রাণাঘাটই তাঁহার প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র। এই প্রাথমিক কর্ম্মক্ষেত্রে কয়েকটী কঠিন রোগীর আরোগ্য-সম্পাদন করিয়া শীঘ্রই তিনি সাধারণের নিকট বিশ্বাস-ভাজন ও সুচিকিৎসক বলিয়া গণ্য হইলেন। চিরদিনই তাঁহার অর্থ-স্পৃহা অপেক্ষা পরোপকার স্পৃহা বলবতী। গরিব দুঃখীকে বিনামূল্যে ঔষধ দিতেন,—সম্পত্তি হীনকে পথ্যের খরচ দিয়া সাহায্য করিতেন।

"ধাত্রী-শিক্ষা রাণাঘাটে থাকিয়াই যদুনাথ রচনা করেন। প্রথমতঃ উহার প্রথম কয়েক ফর্ম্মা অন্য প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল।

১২৭৬ সালে যদুনাথ রাণাঘাট ত্যাগ করিয়া চুঁচুড়ায় গমন করেন। চুঁচুড়ায় তখন ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ৺রামগতি ন্যায়রত্ন, ৺ ক্ষেত্রমোহন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকগণ বহু গুণে বেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতে ছিলেন। কখন কখন সুপ্রসিদ্ধ বঙ্কিম বাবুও আসিয়া ৺ভূদেব বাবুর সভা উজ্জ্বল করিতেন।

যদুনাথ চুঁচুড়ায় ভূদেব বাবুর নিকট পরিচিত হইলেন। প্রথম দর্শনেই ভূদেব বাবু যদুনাথকে চিনিয়া লইলেন। "গুণী গুণং বেত্তি"—ভূদেব বাবু যদুনাথকে যেমন বুঝিয়াছিলেন, কার্য্যতঃ তাহারই পরিচয় পাইতে থাকিলেন। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতর হইতে লাগিল। প্রত্যুতঃ যদুনাথকে ভূদেব বাবু পুত্রবৎ স্নেহ-চক্ষে দেখিতেন।

"ধাত্রী-শিক্ষা" লিখিত হইলে, যদুনাথ উহার পাণ্ডুলিপি ভূদেব বাবুকে দেখাইয়া ছিলেন। ভূদেব বাবু দেখিয়া, তাঁহার সরল রচনার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন, "তুমি এই গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হইবে।" ভূদেব বাবুর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। ধাত্রী-শিক্ষা লিখিয়া যদুনাথ বাঙ্গলার অপরাপর সাধারণের নিকট সুপরিচিত হন। "ধাত্রী-শিক্ষার" কয়েক পরিচ্ছেদ এডুকেশন গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয়।

চুঁচুড়ায় আসিয়া যদুনাথ চিকিৎসা-ব্যবসায়ে অবহিত থাকিয়াও অবসর মত সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। পণ্ডিত রাখিয়া মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণ রীতিমত পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে চুঁচুড়া নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ে ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষার্থীর জন্য তাঁহার "উদ্ভিদ বিচার" নামক গ্রন্থ লিখিত হয়।

"উদ্ভিদ বিচারে"র পর যদুনাথ ভূদেব বাবুর অনুরোধে—'শরীর-পালন' লিখেন। ভূদেব বাবুরই উপদেশ মত এই পুস্তকের "শরীর পালন" নামকরণ হইয়াছিল। শরীর-পালন প্রথম সংস্করণে ক্ষুদ্র কলেবর ছিল। পরে উহার কলেবর-বৃদ্ধি হয়। এই পুস্তক বহুদিন বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল।

তৎকালে চিকিৎসা-বিষয়ক কোন সাময়িক পত্র না থাকায়, যদুনাথ 'চিকিৎসা-দর্পণ' নাম দিয়া, এক খানি মাসিক পত্র বাহির করেন। চিকিৎসা-দর্পণ বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। চরক প্রভৃতির অনু-

বাহক সুবিখ্যাত ডাক্তার ৺উদয়চাঁদ দত্ত ইহার নিয়মিত লেখক ছিলেন। "চিকিৎসা-দর্পণ" কয়েক বৎসর মাত্র জীবিত ছিল। ইহার পর ঐ মাসিক পত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

'চিকিৎসা-দর্পণ' বন্ধ হইয়া গেলে যদুনাথ চিকিৎসা বিষয়ে একখানি সুবৃহৎ শেষ-গ্রন্থ প্রকাশে কৃতসংকল্প হইলেন। স্যার রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দ-কল্প-দ্রুমের আদর্শে তিনি 'চিকিৎসা-কল্পদ্রুম' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই "চিকিৎসা-কল্পদ্রুম" বিশেষ আদৃত হইতে লাগিল। যদুনাথকে এই সময়ে প্রত্যহ ১৫।১৬ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিতেন। ছাত্রাবস্থা হইতে তাঁহার এই অভ্যাস হইয়াছিল। কখনও ইহার অন্যথা হয় নাই।

যদুনাথ যখন "চিকিৎসা-কল্পদ্রুম" সঙ্কলন করিতে ছিলেন, সেই সময়ে ভূদেব বাবু একদিন এই গ্রন্থখানি হাতে করিয়া যদুনাথকে বলিয়াছিলেন, "ইহা কি তুমি একা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিবে?" যদুনাথ উত্তর করিলেন "স্বাস্থ্য যদি অটুট থাকে, তবে একাই পারিব।" উত্তর পাইয়া ভূদেব বাবু যদুনাথের পৃষ্ঠে সস্নেহে করাঘাত করিয়া বলিলেন ;— "আত্ম-ক্ষমতায় বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ বড় হইতে পারে না। দেখিতেছি, তোমার আত্ম-ক্ষমতায় বিশ্বাস আছে।"

দুর্ভাগ্যক্রমে "চিকিৎসা-কল্পদ্রুম" প্রকাশিত হইয়া বন্ধ হইয়া গেল। উক্ত শেষ গ্রন্থের সমালোচনা উপলক্ষে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছিলেন, "রাজ সাহায্য এবং সমাজ-সাহায্য ভিন্ন এরূপ বিরাট গ্রন্থ পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না।" যদুনাথ রাজ সাহায্য পান নাই, ধনীর সাহায্য পান নাই। অন্যকীয় সাহায্য ব্যতীত মাত্র নিজ অধ্যবসায় ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া, তিনি যতদূর করা যাইতে পারে, তাহাই করিয়াছিলেন। যদুনাথ একবার বলিয়াছিলেন—তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে পারিলে দশ বৎসরে "চিকিৎসা-কল্পদ্রুম" সম্পন্ন করিতে পারিতেন। তাহা দুরাশা বলিয়া তাঁহাকে সংকল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

চুঁচুড়ায় থাকিতে যদুনাথের স্বাস্থ্য, অর্থাগম,—দুইএরই প্রাচুর্য্য ছিল।

চুঁচুড়ায় থাকিতে চিকিৎসা ব্যপদেশে কাঁঠালপাড়ার বঙ্কিম বাবুর সহিত তাঁহারপরিচয় হয়। এই পরিচয় শেষে ঘনিষ্ঠ-সৌহৃদ্যে পরিণত হয়। বঙ্কিম বাবুর একটী দৌহিত্রের পীড়ার চিকিৎসায় আহূত হইয়া যদুনাথ কাঁঠাল পাড়ায় যান। দৌহিত্রের সঙ্কট পীড়া—বড় বড় ডাক্তার, কবিরাজ আশাভরসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। যদুনাথ অত্যন্ত পর্য্যালোচনা সহ রোগ পরীক্ষা করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, "কোনও চিন্তা নাই। ইহার জীবন রক্ষা করিতে পারিব।"

যদুনাথ দুই দিন দুই রাত্রি থাকিয়া মৃতকল্প শিশুকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। একদিকে প্রিয়তম দৌহিত্রের জীবন রক্ষা, আর এক দিকে যদুনাথের সফল-চিকিৎসা—বঙ্কিম বাবু আনন্দ-গদগদ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "যদু বাবু আপনিই ধন্য।" বঙ্কিম বাবুর অগ্রজ সঞ্জীব বাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন,—"আজ থেকে আর আমরা আপ-নার সঙ্গে সেকৃহেণ্ড করিবার অধিকারী নহি। আপনাকে নমস্কার করিব

যদুনাথ চুঁচুড়া ছাড়িয়া ১২৮৩ সালে কলিকাতার বিস্তীর্ণতর কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন। এখানে প্রতিযোগীতা প্রবল হইলেও তিনি শীঘ্রই সুচিকিৎসক মধ্যে গণ্য হইলেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোনো কোনো সাহেব চিকিৎসক যেখানে রোগ-নির্ণয়ে অপারগ হইয়াছেন, যদুনাথ সেখানে কৃতকার্য্য হইয়া যশোলাভ করিয়াছেন।

যদুনাথ কর্ম্মানুরোধে সহরবাসী হইয়াও পল্লিগ্রাম গুলির জন্য অশ্রু-পাত করিতেন। পল্লিগ্রাম গুলির দুর্দ্দশার কথা সর্ব্বদাই বলিতেন। পল্লি-গ্রামের অল্প শিক্ষিত ডাক্তারেরাই পল্লীগ্রামের কর্ত্তা। তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিতে পারিলে পল্লিগ্রামে সুচিকিৎসার অভাব হয় না। এই উদ্দেশ্যে তিনি "সরল জ্বরচিকিৎসা" নাম দিয়া সরল ভাষায় তিন খণ্ড পুস্তক বাহির করেন। সেই পুস্তকের কল্যাণে আজ কাল বহু ভদ্র সন্তান নিজ আত্মীয় বর্গের ও অপরের চিকিৎসা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেছেন। এই তিন খণ্ড পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে ৺কালীময় ঘটক বলিয়া ছিলেন "আপনি কটমট-চিকিৎসাকে জলের উপর বসাইয়াছেন। যে-সে ইচ্ছা, উহা ধরিয়া লইতে পারে।"

বাঙ্গালায় পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-প্রচারে ব্রতী থাকিলেও, যদুনাথ দেশীয়-ভেষজের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে ক্রটী করেন নাই। নিজে ডাক্তার হইয়াও কবিরাজের উপরে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন না। তিনি মুক্তকণ্ঠে আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতেন। দেশীয় তাবৎ দ্রব্যের প্রতিই তাঁহার একান্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি কখনও বিদেশীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন না। পায়ে তালতলার চটী, পরিধেয়ের জন্য থান ও গায়ে মলমলের উত্তরীয়—কি গৃহে, কি বাহিরে—সর্ব্বত্র ব্যবহার করিতেন। কুত্রাপি ইহার অন্যথা পরিলক্ষিত হইত না।

কলিকাতায় থাকিতে যদুনাথ "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নাম দিয়া একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। উক্ত পত্র অল্প দিনেই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহার সম্পাদন ভার একজন সাহেবের উপর ন্যস্ত ছিল। ইহাতে যদুনাথ "মেলেরিয়া এণ্ড মেলিরিয়াস্ ফিবার" নামক একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। প্রবন্ধটী বিলাতের কোন খ্যাতিনামা পত্রে বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল। "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" পরে হস্তান্তরিত হয়।

বালকেরা সব চেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষায় বেশী মনোযোগী হয়, ইহা যদুনাথের একান্ত ইচ্ছা ছিল। তদুদ্দেশে তিনি বাঙ্গালার চব্বিশটী জেলায় প্রতি বৎসর ৫০০৲ পাঁচ শত টাকার পুরস্কার দিতেন। স্বাস্থ্যবিদ্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সর্ব্ব প্রথম ছাত্র তাঁহার এই পুরস্কার পাইত।

অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রমের জন্য কলিকাতায় যদুনাথের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার জল-বায়ু তাঁহার স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর হানি করিতে লাগিল। যদুনাথ চুঁচুড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু চুঁচুড়ায় বেশী দিন রহিলেন না। আবার কিছু দিনের জন্য তিনি কলিকাতার কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। আবার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইল। এবারে তিনি স্বগ্রামে ফিরিবার সংকল্প করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পল্লিগ্রামের উন্নতি করিবার ইচ্ছাও মনোমধ্যে জাগিয়া উঠিল।

এবারে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইলেন। কলিকাতার সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করিলেন।

১২৯৫ সালের পর হইতে যদুনাথ গরিবপুরে বাস করিতে থাকেন। ইহার পূর্ব্বে কিছু দিন রাণাঘাটের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। এই রাণাঘাটে তাঁহার 'বাঙ্গালীর মেয়ের নীতি-শিক্ষা' রচিত হয়। গরিবপুরে গিয়া তিনি পৈতৃক বসত বাটীর কিঞ্চিৎ দূরে খোলা ময়দানে নিজ বাসোপযোগী বৈঠকখানা নির্ম্মাণ করান। সেই প্রচণ্ড সুপ্রশস্ত গৃহই তাঁহার পুস্তক রচনার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

নিজ গ্রামের উন্নতির জন্য যদুনাথ অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন।

যদুনাথ নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। জীবনের কোন অংশেই তিনি পান-ভোজনে হিন্দুর আচার অতিক্রম করেন নাই। চরিত্রবল তাঁহার অসাধারণ ছিল।

গরিবপুরে থাকিতে যদুনাথ 'সমাজ ও সাহিত্য' নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহার সম্পাদন ভার কৃতবিদ্য পুত্র গিরিজানাথের উপর ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ইহার অধিকাংশ প্রবন্ধই যদুনাথ নিজে লিখিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার প্রচার তেমন হইয়া উঠে নাই। যদুনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাপ্তাহিক "সমাজ ও সাহিত্যের" লোপ পায়।

গরিবপুরে যাওয়ার পর হইতে যদুনাথের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। কলিকাতায় যে অপকার ঘটিয়া ছিল, গরিবপুরে বহু পরিমাণে তাহার পূরণ হইল। তাঁহার শ্রীমণ্ডিত উন্নত-দেহ দেখিয়া কে তখন মনে করিতে পারিয়াছিল যে, তাঁহার জীবনের কাজ ফুরাইয়া আসিয়াছে!

১৩০০সালের ৭ই কি ৮ই চৈত্রের প্রদোষে পাল্কী করিয়া তিনি নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে একটী আসন্নমৃত্যু বালক দেখিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। বালকটী তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে রক্ষা পাইয়াছিল। বাড়ী আসিয়া তিনি সর্দ্দিবোধ করিলেন। যথোচিত সাবধান হইলেন। কে জানিত,—তাহাই কাল-সর্দ্দি। পরদিন তিনি একটু জ্বরভাবও বোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাশীও দেখা দিল। বিছানায় বসিয়া তিনি কাশিতে কাশিতে পুত্র-পরিজনকে বলিলেন—'আমি নিজের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি, এ যাত্রা আমার রক্ষা

নাই।' কিছুক্ষণ পরে তিনি বলিলেন "একটা আক্ষেপ রহিয়া গেল— সমাজের চিহ্নের জন্য যে সকল কাজ করিব ভাবিয়া ছিলাম, তাহা অসম্পন্ন থাকিল।"

মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ঔষধাদি নিজেই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আত্মীয়-পরিজন, ডাক্তার বা কবিরাজ আনিবার কথা উত্থাপন করিলে, তিনি বিরক্ত হইতেন—বলিতেন, "এ রোগের কোন চিকিৎসা নাই। আমার সময় হইয়াছে, আমাকে যাইতেই হইল।" ইহার পর ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র রবিবার ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ইহাঁর দেহান্তর হয়।

যদুনাথ সরল রোগ নির্ণয়, সরল ভৈষজ্যপ্রকাশ, পল্লীগ্রাম, কুই-নাইন প্রয়োগ-প্রণালী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সরল রোগ নির্ণয় এবং সরল ভৈষজ্য প্রকাশ তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু এই দুই গ্রন্থের যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হই-য়াছে, তাহাতেই তাঁহার প্রভূত শক্তির পরিচয় প্রকটিত। অতীব দুরূহ জটিল বিষয়ও জলের মত করিয়া বুঝাইতে যদুনাথ সিদ্ধহস্ত। সরল জ্বরচিকিৎসা, সরল রোগ নির্ণয় ও সরল ভৈষজ্য প্রকাশে তাহার প্রমাণ ছত্রে ছত্রে।

আর তাঁহার 'পল্লীগ্রাম' ও 'বাঙ্গালীর মেয়ের নীতি শিক্ষা' বস্তুতই অনুপম। পল্লীগ্রামের আধুনিক দুর্দ্দশা দেখিয়া যদুনাথের প্রাণ কাঁদিয়াছিল,—হৃৎতন্ত্রী ছিঁড়িয়াছিল, তাই তিনি চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে এই গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকে পল্লীবাসী "পল্লীগ্রাম" পুনঃপুন পাঠ করুন। আর 'বাঙ্গালীর মেয়ের নীতি শিক্ষা',—এমন সদুপদেশপূর্ণ সহজ ভাষায় লিখিত স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য,—এমন গ্রন্থ বাঙ্গলায় বাজারে বিকায় না।

পিতা-পুত্র।

৺রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর ও শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আমার ও পিতৃদেবের জীবনী লিখিতে আমি অনেক দিন হইতে অনুরুদ্ধ ছিলাম; সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি আমাদের সাহিত্য-জীবনের কথা বিশেষ করিয়া লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল অনুরোধ রক্ষার চেষ্টা করিতেছি।

আপনার জীবনী, আপনি লেখা,—বড়ই কঠিন ব্যাপার। বিশেষ আমি কোন কাজ করিলাম না, কোন কর্ম্ম করিলাম না, আমার আবার জীবনী কি?

যখন স্কুলে পড়িতাম, তখন Rule of Three খুব সত্বরে কসিতে পারিতাম। Bernard Smith এর সামুকের (sndil) অঙ্ক অনেকে কসিতে পারে নাই, আমি কসিয়াছিলাম—এই সকল কারণে আমাকে তখন Genius বলিত। এ সকল কথা কাগজে, কালিকলমে বা ছাপাইয়া জগতে প্রচার করা, ভাল কি মন্দ তাহা ত বুঝিতে পারি না।

যৌবনে 'সাধারণীতে' যেরূপে তথা কথিত রাজনীতির চর্চ্চা করিয়াছিলাম, সেরূপ ভাবে, সেরূপ কথার যদি এখন পুনরাবৃত্তি মাত্র করি, তাহা হইলে বার্দ্ধক্যে শ্রীঘর বাসের বিবরণ আবার ভবিষ্যতে লিখিতে হইবে। তাহাত পারিব না; সুতরাং যৌবনের কীর্ত্তির-অকীর্ত্তির পুনরালোচনা চলে না।

প্রৌঢ়ে ও বার্দ্ধক্যে আমার জীবন—যমে মানুষে টানা-টানির পালা। কখন যম জিতিতেছে, কখন আমি জিতিতেছি। কলিকাতা, কটক, চুঁচুড়া, ইটোয়া, বৈদ্যনাথের ঘরের কোণে, নিভৃতে, নীরবে, বিনা আড়ম্বরে—এই যে রুষ-জাপান সমর, ইহার বিবরণ তোমাদের পড়িতে ভাল লাগিবে কেন? অন্তত ভাল লাগিবে না, আমি বুঝিয়াছি; সেরূপ বুঝিয়া, আমি লিখিতে যাইব কেন?

অতএব আপনার জীবনী লিখিব না। পিতৃদেবের জীবনীর দুই চারি কথা বলিব, আর তাঁহার আমার জীবনের যে ভাগের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধ, তাহাও কিঞ্চিৎ লিখিতে চেষ্টা করিব। আমার সহিত বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্বন্ধে, শিক্ষার কথাই বলিব, পরীক্ষার কথা একটু আধটু থাকিবে মাত্র।

একটা কথা গোড়ায় বলিয়া রাখা ভাল। অনেক বয়সে পিতৃদেবের মুখে সে কথাটা শুনিয়াছিলাম। পেন্‌সন্‌ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃদেব ঢাকা হইতে যখন আসেন, তখন মহা আড়ম্বরে তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হইয়াছিল। সেইরূপ একটী বিদায় সভার মুখপাত্র বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ পিতৃদেবের প্রশংসা কল্পে বলিয়াছিলেন, যে গঙ্গাচরণ বাবু গুরুতর রাজ-কর্ম্মের ভার লইয়াও বঙ্গ-সাহিত্য সেবা হইতে কখন বিরত থাকেন নাই, প্রত্যুত যত্ন পূর্ব্বকই বঙ্গ-সাহিত্য সেবা করিয়াছেন। এই জন্য সাধারণত বাঙ্গালিরা, বিশেষত ঢাকা-বাসীরা, তাঁহার কাছে ঋণী এবং এক মুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে অক্ষম। বাগ্মীপ্রবর বিশেষ দক্ষতা সহকারে ঐ কথার ব্যাখা করেন এবং সভাস্থ সকলেই করতালি প্রদানে পিতৃদেবের প্রশংসা কীর্ত্তন করেন। সকল বক্তার সকল কথা শেষ হইলে পর পিতৃদেব উত্তরে বলেন "আপনারা আমাকে ভাল বাসেন, সুতরাং প্রশংসা করিবেন, তাহা কিছু বিচিত্র নহে। ঐ সকল প্রশংসাবাদ আমি ভাল বাসার পরিচয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। তবে বঙ্গ-সাহিত্য সেবার জন্য আমার যে প্রশংসা হইয়াছে, তাহাতে আমি বিস্মিত। মাতৃ সেবা না করিলে অধর্ম্ম আছে, সেবা করিলে যে কিছু বাহাদুরী বা প্রশংসা আছে এ কথা আমি জানি না, ও মানি না।"—ঐ কথাই সর্ব্বাগ্রে সকলের নিকটে আমিও বলিতেছি। মাতৃভাষা সেবার কথা বলিব, কিন্তু বাহাদুরীর জন্য অথবা প্রশংসা প্রয়াসে বলিয়া কেহ গ্রহণ করিবেন না। এ বয়সে এতটুকু বুঝিতে পারি, যে শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষের মত এক জন, শত জন, বা সহস্র জন বাঙ্গালা ভাষায় চর্চ্চা করেন না বলিয়া, আমি করি, তুমি কর, তিনি করেন—আমাদের কিছু বাহাদুরী বা গৌরব নাই।

আমাদের অন্তত সাত আট পুরুষের ওলন্দাজি চুঁচুড়ার বাহিরে গঙ্গা ধারে বাস ছিল। আমার ঠাকুর দাদা ইংরাজী নবীশ ছিলেন। এই জন্য তাহার নাম ছিল রামবল্লভ মাষ্টার। কথিত আছে রামবল্লভ মাষ্টার ঘাসের ফুলের পর্য্যন্ত ইংরাজী নাম জানিতেন। পিতার মাতামহালয় খন্যানের নিকট শর্শা আমার ঠাকুরমা ছেলে বেলা Amateur শিশু কবির দলে কবির গান বাঁধিয়া দিতেন।

ত্রিশ সালের বন্যার বৎসর বন্যার সময় অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৩০ সালের আশ্বিন মাসে, পিতৃদেবের জন্ম হয়। অনেকেরই এখনও মনে থাকিতে পারে, যে অতি সামান্য কথাতেও পিতৃদেব রসের অবতারণা করিতে পারিতেন। তাঁহার জন্ম সময়ের এই ঘটনা লইয়া তিনি বলিতেন যে "ওহে! তোমরা যদি আমার কেহ জীবনী লিখিতে যাও, তবে তোমাদের আরম্ভ করিবার বড় সুবিধা হইবে। সচ্ছন্দে লিখিতে পারিবে, যে দামোদর নদের ও ভাগীরথী নদীর যুগপৎ ভীষণ প্লাবনে যখন সমগ্র বঙ্গভূমি জলে জলময়, অধিবাসীরা যখন স্বীয় স্বীয় ধন-প্রাণ আবাস ভবন লইয়া মহা ব্যাকুল, তখন সেই কুলপ্লাবিনী সুরধুনীর তটভূমি হইতে অতি নিকটে ক্যাঁকলিয়ালীর একটি কুটীরে একটী সদ্যপ্রসূত কৃষ্ণবর্ণ শিশু তদীয় কৃষ্ণবর্ণা মাতার অঙ্ক শোভিত করিয়া বিকট ক্রন্দন করিতে ছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি।"

ত্রিশ সালে অর্থাৎ এখন হইতে আশী বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা লেখার চর্চ্চা ছিল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে, ব্যবসাদারের খাতায় আর আত্মীয় স্বজনকে 'বন্ধুবান্ধবকেও নয়' পত্র লেখায়; পড়ার চর্চ্চা যথেষ্ট ছিল। কেবল পাঠশালে বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিতে বসিয়া, মোসাহেব মুকুয্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া. অবাধে দশবার জন শ্রোতৃমণ্ডলি মধ্যে, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায়, বাবাজী ঠাকুর আকড়ার আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দালানের দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলি মধ্যে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করিতেন।

এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, দুর্গা প্রসাদের গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ এই রূপই নিয়ত পঠিত হইত।

এই ১২৩০ সাল ইংরাজী ১৮২৩ সাল। এই সময় হইতে সাধারণের শিক্ষার উপর গবরমেণ্টের নজর পড়িল। কার সাহেব কৃত Review of Publice Instruction গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম বিভাগে দেখা যায়;—

"Previous to 1823 comparatively little had been done for the advancement of Native Education. The number of Institutions was very limited, and they attracted very little interest. There was no organized system of superintendence. All matters connected with education were under the general control of the Government, But about this time the subject of Native Education began to receive a greater share of attention. * * * In July 1823, several of the most experienced officers of Government residing in Calcutta were formed into a Committee of Pubiic Instruction.

কলিকাতায় তরঙ্গ উঠিল বটে কিন্তু সে তরঙ্গ চুঁচুড়ায় আসিতে ১২।১৩ বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে পিতার বাল্যজীবনে একটী বিষম সঙ্কট ঘটনা ঘটিয়াছিল, পিতৃদেবের বয়স যখন পাঁচ বৎসর হাতে খড়ি হইয়াছে বা হয় নাই, তখন আমার ঠাকুর দাদার মৃত্যু হয়; ঠাকুরমা সহমৃতা হন। আমাদের নিকটে বটতলার ঘাটে, এই কাণ্ড হয়। সে বটগাছটী এখন আর নাই বলিলেও চলে; এই বৎসর প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সেই "ক্যাঁকশীয়ালি ঘাটের বটবৃক্ষ" কে সম্বোধন করিয়া ১২৯১ সালের ১৬ই বৈশাখের সাধারণীতে পিতৃদেব যে পদ্য লেখেন তাহার কিয়দংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

* * * * *

আরো তুমি এই স্থানে, দেখিয়াছ সন্নিধানে, কত সতী লয়ে মৃত পতি।
স্বামীভক্তি অনুবলে, চিতায় জলন্তানলে, হাস্যমুখে হইয়াছে সতী।
তরু তব জানা আছে, তনুত্যজে তব কাছে, পতি শয়ে যে সব রমণী।
তার মাঝে এক সতী, পতিরতা গুণবতী, এদীনের ছিলেন জননী।
বহুকাল হ'ল গত, বৎসর অর্দ্ধেক শত, তদুপরি আর পাঁচ ছয়।
গতাসু হলেন পিতা, মাতা হন সহমৃতা, শৈশবেতে আমি নিরাশ্রয়।
এঘটনা বহুদিন, হয়েছে কালেতে লীন, পুরাকথা মাঝে প্রবেশিত।
আমি কিন্তু নাহি ভুলি, শ্মশানের সেই চুলী, মমহৃদে আছে জাগরিত।
সেই কাণ্ড দরশন, করিবারে আগমন, নরনারী হল উপস্থিত।
তীর চর উপকূল, আবরিল নর কুল, ঘাটে তরী কত উপনীত।
আইল বিধর্ম্মী কত, মুসল-মান শত শত, আর কত ফিরিঙ্গী ইংরাজ।
দারোগা মুহুরী সনে, ইষ্ট বুঝি হৃষ্ট মনে, অগ্রসর হয় বর্কন্দাজ।
জনতার পারাবার, নদী তটে সুবিস্তার, কোলাহলে উথলে কল্লোল।
বহুল বিকচ ছাতা, উত্তাপে রাখিতে মাথা, জনার্ণবে তরঙ্গ হিল্লোল॥
হেথা হয়ে ভক্তিমতী, সাত পাক ফিরি সতী, লয়েছেন চিতায় আসন।
রক্ত চেলী পরিহিতা, সিন্দূরে শোভিছে সঁীতা, মুক্তকেশী অপূর্ব্ব দর্শন।
গলেদোলে পুষ্প মালা, প্রেত ভূমি করি আলা, শব পাশে শোভিছে সুন্দরী।
শ্মশানে শঙ্কর যেন, ঘোর ঘুমে অচেতন, বামে বসে আছেন শঙ্করী।
নয়ন প্রফুল্ল অতি, ভাতিছে ভক্তির জ্যোতি, মুখপদ্মে হর্ষের উচ্ছ্বাস।
অটল বিশ্বাস মনে, লভিবে পতির সনে, অবিলম্বে স্বর্গে চিরবাস॥
পরে সতী এ জগতে, ঐহিক বান্ধব হতে, একে একে লইয়া বিদায়।
পুত্রে আশীর্ব্বাদ করি, পতি শব বক্ষে ধরি, প্রেমানন্দে শুলেন চিতায়॥
মম হাতে নুড়া জ্বলে, মন্ত্র দ্বারা পুত হলে, মুখদ্বয়ে দিলাম ফেলিয়া।
অনেক স্বজন আসি, দেয় তবে তৃণ রাশি, বাড়ে অগ্নি প্রবল হইয়া॥
পর্ব্বত প্রমাণ হয়ে, শত শত শিখা লয়ে, ভীমাকারে জ্বলিল অনল।
হরিবোল দেয় লোকে, আমি ভয়ে কিম্বা শোকে, ফেলিলাম নয়নের জল॥

* * *

এই সহমরণের পর সরকারদের সংসারে রহিলেন একজন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ মদনমোহন সরকার আর তাঁহার শিশু পৌত্র গঙ্গাচরণ। সে বেশ সংসার নয়! কিছু দিন পরে পিতা অবশ্য পাঠশালে যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে পাঠশালার সংস্করণে মিশনরিরা কোথাও

কোথাও মনোযোগী হইয়াছিলেন। একজন আমেরিকান মিশনরি মিষ্টার আদাম (Adam) চুঁচুড়ার পাঠশালা সংস্করণের প্রধান উ'দ্যাগী হন।

বাঙ্গালার অস্বাস্থ্যের কল্যাণে বৈদ্যনাথ দেওঘরে এখন অনেকেরই গতি বিধি হইয়াছে। বৈদ্যনাথে পাদরিণী বুড়ী মেমকে অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এক খানি ছোট ঠেলা গাড়ীতে বুড়ী মেম আধ শোয়া আধ বসা ভাবে আছেন; দুই জনে সেই গাড়ী টানিতেছে, আর একজন ছাতা ধরিয়া তাঁহার মুখে ছায়া করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতেছে। তিনি (Miss Adam) মিস্ আদাম্। তাহারই পিতা মিষ্টার আদাম চুঁচুড়ার পাঠশালার প্রথমসংস্কারক। অথবা বিশুদ্ধ প্রণালী সঙ্গত পাঠশালার সংস্থাপক; আমাদের বাড়ির নিকট মনসা-তলার কাছে, সেইরূপ একটি পাঠশালা ছিল। তাহাতে পিতা পড়িয়াছিলেন, সেই পাঠশালে পিতার সহাধ্যায়ী যদুনাথ বসুর এই বৎসরে মৃত্যু হইয়াছে। সাধারণ পাঠশালা হইতে এই সকল পাঠলাশার প্রভেদ ছিল যে, এখানে যত্ব ণত্ব বা বর্ণশুদ্ধি শিখিতে হইত এবং ছাপার বই পড়িতে হইত। বাবার বাঙ্গালা শিক্ষার এই সূত্র-পাত। যদিও পাঠশালার সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিতে গবর্ণমেণ্ট ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে ঐ আদাম সাহেবকে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু এই সকল পাঠশালার প্রণালী গবর্ণমেণ্টের ভাল লাগিল না। রিপোর্টে লেখা হইয়াছে "The plan of Village Schools had been tried at the Chinsurah, Dacca, Bhagalpur, Saugor and in the Ajmear district; but in every instance, the result was unsatisfactory and discouraging." ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা চালান স্থির হইল। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই চুঁচুড়াতে স্কুল ছিল। "১৮১৪ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনরি রেবরেণ্ড মে সাহেব চুঁচুড়াতে একটি মিশনরি স্কুল সংস্থাপন করেন। এতদ্দেশীয় (অর্থাৎ বঙ্গদেশের) ইংরাজি স্কুলের মধ্যে এই স্কুলটি সর্ব্বপ্রথম সংস্থাপিত হয়। মে সাহেব গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনা সফল হয়।

পরে কোন বিশিষ্ট হেতু বশত সেই সাহায্য রহিত হয়।" তাহার পর প্রাতঃস্মরণীয় মহম্মদ মহিসনের বিপুল সম্পত্তির একাংশের সরকার বাহাদুর ট্রষ্টী হইলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে ১৬ শ্রাবণ চুঁচুড়াতে College of Mahammad Mashin খুলিল। ইহাকেই এখন হুগলী কলেজ বলে, যে দিন খুলিল সেই দিনই পিতা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। শুনিয়াছি, সেদিন,—কলেজ খুলিয়াছে—ছেলেরা পড়িতে যাইতেছে—দেখিবার নিমিত্ত লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তখন ভর্ত্তি হওয়ার কোনরূপ সেলামিত লাগিতই না, স্কুলের মাহিনাও ছিল না, কাগজ, কলম, কালী, খাতা, পড়িবার সমস্ত পুস্তক, অধ্যক্ষেরা ছাত্রগণকে বিনামূল্যে দিতেন। তখন ছিল শিক্ষাদান, তাহার পর এতকাল চলিল শিক্ষা বিক্রয়, এখন আবার শুনিতেছি শিক্ষার অতিরিক্ত দাম চড়াইয়া, লাট সাহেব নাকি শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি করিবেন। সস্তার তিন অবস্থা আর থাকিবে না।

পিতৃদেবকে শিক্ষার জন্য কখন কিছু ব্যয় করিতে হয় নাই। ইহার কিছু কাল পরে তাঁহার পিতামহের মৃত্যু হইয়াছিল। এখনকার দিন হইলে, সেই অসহায় নির্দ্ধন বালকের লেখা পড়াই হয়ত হইত না।

মদনমোহন মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে, পিতার বিবাহ দিয়া যান। তাঁহাদের সংসারে আমার মাতা, মাতামহী এবং প্রমাতামহী ছিলেন মাত্র। শিশু পিতৃদেব, তাঁহাদের অভিভাবক হইলেন, আর তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশ্রূমাতা অভিভাবিকা রহিলেন। আমরা এখন যে বাড়ীতে কদম তলায় বাস করি, এই বাড়ী তাঁহাদের। আর যে কুটীরে পিতা ভূমিষ্ঠ হন, সেই জায়গা গুলি আমাদের আছে; তাহাতে দুই এক ঘর প্রজা এবং একটি শিবের মন্দির আছে। সে স্থানটী গঙ্গার অতি নিকটে।

১৮৩৬ সালে পিতৃদেব স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া ছিলেন। ১৮৪৫ সালে জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষাতে, বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বোধ করি ৪৬ সালে সিনিয়ার বৃত্তি পান, হুগলী কলেজে মাতৃভাষা শিক্ষা ভালরূপই হইত। পিতৃদেবদিগের সময়েও হইত, আমাদের সময়েও হইয়াছিল। আমাদের

সময়ে যে ভালরূপ হইত, তাহার সাক্ষী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন। মধ্য সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী বঙ্কিম বাবু ছিলেন। প্রথম সময়ে যে হইত, তাহার সাক্ষী হুগলীর হরচন্দ্র ঘোষ ছিলেন। পিতৃদেব সেই সময়ে কলেজে অধ্যয়ন কালেই যে ভালরূপ বাঙ্গালা শিখিয়া ছিলেন, তাহার ধাতুময় সাক্ষী (Medal) আমাদের বাড়ীতে আছে। তাহার এক পিঠে হুগলী কলেজের ছবি, অন্য পিঠে Gangacharan Sarkar. Bengali Essay. 1845. খোদিত আছে। ইতি পূর্ব্বে ইংরাজী-অভিজ্ঞের বাঙ্গালা ভাষার অনভিজ্ঞতার একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প ছিল। লোকে বলে কোকিলের স্ত্রীলিঙ্গ লিখিতে হইলে, তাঁহারা নাকি লিখিতেন 'মেদীকোকিল'। এতদুর্নাম প্রধানত এ কলেজে হরচন্দ্র ঘোষও পিতৃদেব কর্ত্তৃক দূরীকৃত হয়। যে ফিরিঙ্গী বাঙ্গালার লাঞ্ছনা এখন অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, [illegible] লাঞ্ছনা প্রথমে তিনিই প্রচার করিয়াছিলেন। "রাণী! ও মহারাণী! বাহকগণ, বিশেষত তোমার বাহকগণ, হয় খ্যাত্যাপন্ন ভাঙ্গ্‌তে কুশল কালেজের"। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ সদারলাণ্ড সাহেবের বাঁশবেড়ের রাণীকে লেখা একখানি ইংরাজী পত্রের মোসাবিদা হইতে ঐ কলেজের কেরাণী জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ অতি উজ্জ্বল বাঙ্গলা অনুবাদ করেন, তাৎকালিক পরম মেধাবী ছাত্র, আমার পিতৃদেব গঙ্গাচরণ সরকার তখনই তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলেন এবং পরে তাহা কৃষ্ণনগর প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার অনন্ত গল্পের মধ্যে প্রচার করেন। এই অপূর্ব্ব ইতিহাস সকলে জানেন না। অতএব লোকহিতার্থ তস্য পুত্র, অধম শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার, আমি ইহা লোক জগতে অদ্য প্রকাশ করিলাম।

ভাষায় রসসঞ্চার হইলে, তখন তাহাকে সাহিত্য বলা যায়, ভাষায় লেখা পড়া সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নহে। সাহিত্যের সর্ব্ব প্রথম অবস্থা গান। গানের সঙ্গে কখন কখন ছড়া থাকে। গান ও ছড়া একত্র আমরা পাঁচালি বলি। বাঙ্গালার আদি গীতিকাব্য সংস্কৃত-প্রধান গীত-গোবিন্দ জয়দেব। মৈথিলি প্রধান-বিদ্যাপতি। খাটি বাঙ্গালা-গীতিকাব্য-চণ্ডীদাস। সর্ব্বপ্রধান পাঁচালিকার কৃত্তিবাস; পরে মুকুন্দরাম

ও কাশীদাস। শ্রীগৌরাঙ্গের পর হইতেই বাঙ্গালায় এক প্রকার খুচরা গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। খুচরা বলিয়া তাহাকে 'কড়চা" বলে। সেই গুলি ছাড়িয়া দিলে, প্রথম গদ্য লেখক, রাজীবলোচন রায়। তিনি আন্দাজি ১৭২৫ খৃঃ অব্দে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের একখানি ইতিহাস প্রণয়ন করেন। দ্বিতীয় গদ্য-গ্রন্থকার রামরাম বসু। তিনি প্রতাপ আদিত্যের জীবন চরিত লেখেন। এই দুই গ্রন্থই বিলাতে লণ্ডনে ছাপা হয়। এখন দেখিতে পাওয়া যায় না। দুই খানির একখানি সমগ্র গ্রন্থও আমরা দেখি নাই। কিছু কিছু অংশ নানাস্থান হইতে দেখিয়াছি মাত্র; তৃতীয় গদ্য গ্রন্থকার মৃত্যুঞ্জয় * তর্কালঙ্কার। ১৭৬২।৬৩ খৃঃ অব্দে মেদিনীপুরে মৃত্যুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় তাঁহার জীবনকাল যাবৎ মেদিনীপুর উড়িষ্যার অন্তর্গত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ; খনের চাটুতি, শ্রীকরের সন্তান। মেদিনীপুরে তখন একভাগ বাঙ্গালা এক ভাগ হিন্দি, এক ভাগ উড়িয়া, সুতরাং মেদিনীপুরে একরূপ ত্র্যহস্পর্শ ভাষা প্রচলিত ছিল। মৃত্যুঞ্জয় নাটোর-রাজের সভাপণ্ডিতের নিকট তখনকার অর্দ্ধ বাঙ্গলার রাজধানী নাটোর নগরে, বিদ্যাশিক্ষা করেন। এবং পরে যৌবনে কলিকাতায় বাস করেন। সুতরাং তাঁহার ভাষা একরূপ পঞ্চগব্যময়ী হইবে তাহা আর বিচিত্র নহে। তাহাতে দধি দুগ্ধের সহিত, গোমূত্র, গোময়ের অসদ্ভাব নাই। নাই থাকুক তথাপি হিন্দু সংস্কার বশে আমরা মৃত্যুঞ্জয়ী গদ্য সাহিত্য অতি পবিত্রভাবে গ্রহণ করিয়াছি। পবিত্র ভাবেই গ্রহণ করিতে পাঠককে অনুরোধ করিতেছি। মৃত্যুঞ্জয় কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টে চীফ পণ্ডিত ছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লি সিবিলিয়নদের বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ ভাষা শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলে, মৃত্যুঞ্জয় সেই কলেজে দেশীয় ভাষা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত হইলেন। †

* এখন দেখিতেছি তাঁহাকে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারও বলে।

† Lord Wellesley, finding the Civil Serants imperfectly acquainted with the language of the country, established the College of Fort William in Calcutta,

মৃত্যুঞ্জয় "প্রবোধ চন্দ্রিকা" ও "রাজাবলী" নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এবং সংস্কৃত হইতে পুরুষপরীক্ষা ও হিন্দি হইতে 'বত্রিশ সিংহাসন" অনুবাদ করেন। ১৮৩৫ সালে প্রথম কাউনসিল অফ এডুকেশন বসিল। * পনের জন সভ্যের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ও প্রসিদ্ধ রসময় দত্ত দুইজন মাত্র বাঙ্গালী।

বঙ্গবিদ্বেষী মেকলে সাহেব এই সভার সভাপতি। সেই বৎসরেই মৃত্যুঞ্জয়ের মৃত্যু হইল। কিন্তু তাঁহার 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ও 'পুরুষ পরীক্ষা' স্কুল কলেজে পাঠ্য বলিয়া গৃহীত হইল। এই দুই গ্রন্থই কলেজে অধ্যয়ন কালে পিতার ও তাহার সহাধ্যায়ীদের প্রধান সম্বল ছিল। ঐ প্রবোধ চন্দ্রিকার ভাষার একটু নমুনা দিতেছি। "ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাঁহার ভার্য্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক। সে ব্যক্তি ঘৃতের ঘটেতে ছাই ধূলা অঙ্গার পূরিয়া, উপরে এক আধ সের ঘি দিয়া, দেশে দেশে শহরে শহরে অনিয়মিত বেশে ভ্রমণ করিয়া ঘড়া শুদ্ধ তৌলাইয়া দিয়া সম্পূর্ণ মূল্য লয়। কেহ যদি ঘড়া ভাঙ্গিয়া দুই তিন সের ঘৃত লইতে চাহে, তবে তাহাকে দেয় না, বলে যে এ হৈয়ঙ্গবীন অত্যুত্তম

in the year 1800 ... ... Able pundits were retained : and various works in Bengalee and other language. were compiled and printed : and thus a new impulse was given to the improvement of the country. The learned Mritynnjoy, a native of Orissa, was appointed chief of the Native Department, and reflected high honour on the institution by his great talents etc. etc. etc.

Marshman's History of Bengal.
Section XVIII. page 252.

* হুগলি কলেজ প্রথম হইতেই এই কৌনসিলের তত্ত্বাবধারণে রহিল।

The Superintendence of the general Commitee, now called the council of Education, was confined to the institutions in Calcutta, including the college at Hoogly and its Branch Schools.

ঘৃত, দেবতাদের হোমের উপযুক্ত, আমি এ ঘড়া হইতে তোমাকে কিছু দিতে পারি না। ... ... বিশ্ববঞ্চকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রেতারা কেহ কহে আমার অল্প ঘৃতের প্রয়োজন, তুই এক সের আজ্য যদি দিতে তবে লইতাম, অধিক হবির কার্য্য নাই। ... ... (বিশ্ববঞ্চক) তাদৃশ সর্পিকুম্ভ মস্তকে করিয়া ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইয়া ঐ তরুমূলে উপস্থিত হইল।" পাঠক দেখিবেন হৈয়ঙ্গবীন, আজ্য, হবি; ঘৃতের এই তিনটি প্রতিশব্দ বক্তাদের অবস্থোচিত না হইলেও কেবল ছাত্র শিক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। আর এক স্থানে দেখুন ;—

"উজ্জয়িনীপতি মহারাজ কাশ্মীর তুরঙ্গমী কথার সমস্ত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া কালিদাসকে হস্তে ধরিয়া বেলাবসানে উপবনে চলিলেন। উদ্যানে গিয়া যাতি, যুথী, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, শেফালিকা, পাটল সেবন্তিকা, নাগকেশরী, পুন্নাগ, সরোজ, কুমুদ, কহ্লার, কেতকী, চম্পক, কনকচম্পক, টগর, গন্ধরাজ, বক, করবীরাদি, পুষ্পমালঞ্চ শোভাদর্শনে ও ভ্রমরগণগুঞ্জিত কোকিলাদির গানেতে ও সুশীতল সুগন্ধি মন্দ মন্দ বায়ু সুখস্পর্শেতে ও শিষ্টালাপামৃত রস ধারাতে পরমাপ্যায়িত কালিদাসকে সানন্দচিত্তে প্রতিশ্রুত পারিতোষিক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া স্বস্থানে বিদায় করিয়া স্বয়ং সন্ধ্যাদি নিত্য ক্রিয়া করিতে দেবালয়ে গমন করিলেন।" এখানেও দেখিবেন কতকগুলি নাম শিখাইবার চেষ্টা হইয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় নবাঙ্কুরিত বঙ্গ গদ্য সাহিত্যের একজন প্রথম পথ প্রদর্শক। তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে তিনি স্বয়ং ভাষার সকলরূপ গতি, সকলরূপ পন্থা স্বয়ং দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছেন এবং সকলকে দেখাইয়া দিয়াছেন। নানারূপ রচনাভঙ্গি প্রবোধচন্দ্রিকায় বিরাজমানা। এক এক স্থানের রচনা ভঙ্গিতে স্তব্ধ হইতে হয়। "শার্দ্দূলেরভয়ঙ্কর গর্জ্জনাকর্ণন বিসঙ্কট-বদন-ব্যাদন বিকট-দংষ্ট্রা-কড়মড়ি, ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত চট চট শব্দ ভীম লোচনদ্বয়ের ঘূর্ণনেতে অত্যন্ত সংত্রস্ত" বাস্তবিকই যেন পাঠককে হইতে হয়। আবার "তরুণী-স্তন-সুন্দর-ইন্দীবর কৈরব-কোরক সুন্দরী-

মুখ-মনোহর আন্দোলিত ফুল্লরাজীব নির্ম্মল সুস্নিগ্ধ জল পুষ্করিণী তটস্থলে বট বিটপী ছায়াতে নিদাঘকালীন দিবাবসান সময়ে” যেন সত্য সত্যই আমরা শীতল সমীরণ সঞ্চারে সুস্নিগ্ধ হই। মৃত্যুঞ্জয় বঙ্গগদ্যের একজন আদি গ্রন্থকার বলিয়া সামান্য নহেন, তাঁহার রচনায় আমরা এখনকার শাখা প্রশাখা ময়ী বঙ্গভাষার সকল অঙ্গের অঙ্কুর দেখিকে পাই।

অন্যতর পাঠ্য পুস্তক পুরুষ-পরীক্ষা। এখানি বিদ্যাপতি রচিত সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এই গ্রন্থের কোন না কোন অংশ প্রতিবর্ষে প্রবেশিকা পাঠ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে উহা সর্ব্ব পরিচিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পুস্তক সম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

মৃত্যুঞ্জয় যে সময়ে অপোগণ্ড বঙ্গগদ্যের লালন পালন ভার গ্রহণ করেন, তৎকালে সত্য সত্যই ভাষা পিতৃমাতৃহীনা বালিকার মত অনাদৃতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা বিষয়ী ব্যক্তির অবহেলায় ম্রিয়মানা, সংস্কৃত পণ্ডিত মণ্ডলীর ঘৃণায় অবজ্ঞায় রোরুদ্যমানা। সেই সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের মত প্রতিভাশালী পণ্ডিত “তুমি সমস্ত প্রাকৃত ভাষার মধ্যে উৎকৃষ্ট ভাষা” বলিয়া আদর করিয়া, গৌরব বাড়াইয়া, মুখ চুম্বন করিয়া, কোলে না লইলে এবং ক্রমাগত শৈশবকাল কোলে পীঠে করিয়া মানুষ না করিলে, আজি এই সাগর তরঙ্গের তেজ ধারিণী, অক্ষয় ভূষণে ভূষিতা, হেম-ভূষণে জড়িতা, বঙ্কিম-ভঙ্গিমা-শালিনী অপূর্ব্ব দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পবিত্র শ্রীচরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ করিতে পারিতাম না।

কলেজে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য ঐ দুখানি প্রধান পুস্তক ছিল। তদ্ভিন্ন পিতৃদেব সংস্কৃত হিতোপদেশ কালেজেই শিক্ষা করিয়াছিলেন। হিতোপ-দেশের সেই সংস্করণে ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ ছিল। এই গ্রন্থ ১৮৩০ সালে ছাপা হয়। সংস্কৃতভাগ লক্ষ্মী নারায়ণ ন্যায়ালঙ্কারের তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়। ইংরাজী অনুবাদক কে তাহা বলিতে পারিনা। ম্যাক্সমুলার বলিতেছেন,—

“The reason why I preferred the text of Lakshmi Narayan Nyalankar, the Bengali editor and translator of this Indian School-book, to any single Ms. of the

Hitopadesa, was, as I stated before, of a purely practical nature—I wished there should be, as far as possible, a certain uniformity in the text-books used in England and in India."

সেই সময়ে বটতলায় ছাপান ছাড়া বাঙ্গালায় আর কোন পদ্যগ্রন্থই প্রকাশিত হয় নাই। বটতলার কাশীদাস, কৃত্তিবাস, বত্রিশ-সিংহাসন,—সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদিত অদ্ভুত রামায়ণ, শিশুরামের কৃষ্ণলীলা প্রভৃতি সকল পদ্য গ্রন্থই পিতৃদেব পাঠ করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র একরূপ অভ্যস্তই ছিল। তখন ইংরাজী সাহিত্য-বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতির কিরূপ চর্চ্চা হইত, তাহা নিম্নোদ্ধৃত কালেজের উচ্চতর ও নিম্নতর শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়।

SENIOR CLASSES.

LITERATURE.

Milton.

Shakspeare.

Beaon's Essays.

,, Advancement of Learning.

,, Novum Organum.

MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC.

Smith's Moral Sentiments.

Steward's Philosophy of the Mind.

Whateley's Logic.

Mill's Logic.

HISTORY.

Hume's England.

Mill's India.

Elphinstone's India.

Robertson's Charles V.

MATHEMATICS.

Potters' Mechanics.

Evan's three Sections of Newton.

Hymer's Astronomy.

Hall's Differential and Integral Calculas.

JUNIOR CLASSES.

LITERATURE.

Richardson's Selections from English Poets.

Addison's Essays.

Goldsmith's Essays.

MORAL PHILOSOPHY AND LOGIC.

Aborcrombies Intellectual Powers.

„ Moral Powers.

Whateley's Easy Lessons in Resoning.

HISTORY.

Russell's Modern Europe.

Tytler's Universal History.

MATHEMATICS.

Euclid, Six Books.

Hind's Algebra.

„ Trignometry.

১৮৪৫ সালে তৎকালিক ইংরাজি কৃতবিদ্যগণের মধ্যে বাঙ্গালা রচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া পিতা যে মেডেল পাইলেন, তাহা হইতেই তাঁহার চাকরীর সূত্রপাত হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি সিনীয়র স্কলারসিপ মাসিক ৪০৲ টাকা পাইতেছিলেন, আর চুঁচুঁড়াতে এবং কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন। তখন আইনের সকল বিষয়ে অধ্যাপনা হুগলী কলেজে হইত না, কোন কোন বিষয়ের শিক্ষা কলিকাতায় গিয়া করিতে হইত এবং পরীক্ষা কলিকাতাতেই হইত। এই সময়ে নদীয়ার

কালেক্টারির সেরেস্তাদারী পদ শূন্য হইল। কালেক্টার আলেনজোমনি সাহেব মেডেলিষ্ট গঙ্গাচরণকে নিয়োগপত্র দিয়া সে পদে একেবারে লইয়া গিয়া বসাইয়া দিলেন। ১৮৪৬ সালে ২৬শে মে এই নিয়োগ হইল। সুতরাং বহুদিন স্কলারসিপ্ ভোগ করা, পিতৃদেবের ভাগ্যে হয় নাই। সেই ২৬শে মে ১৮৪৬ সাল হইতে, ১৮৮২ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর ৭ মাসের কিছু অধিক কাল সমানে একটানে তিনি সরকারী চাকরী করেন। ৭৫৲ টাকায় আরম্ভ করেন; শেষের তিন বৎসর হাজার টাকা পাইয়া, চাকরী শেষ করেন। কোথায় কত দিন চাকরী করেন এবং কোন সময় হইতে কত কাল কিরূপ বেতন পান এবং কখন পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধি হয়, তাহার একটি ফর্দ্দ আমরা এই স্থানেই যোজনা করিয়া দিলাম। বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চার কথা পরে ক্রমে বলিব।

নিয়োগ আরম্ভ। ১৮৪৬, ২৬ মে।

নদীয়ার কালেক্টারীর	সেরেস্তাদার	—বেতন	৭৫৲
” ”	পেস্কার	”	৫০৲
কৃষ্ণনগর কলেজের	শিক্ষক	”	৪০৲
” জজ আদালতের	হেডক্লার্ক	”	১০০৲

নিয়োগ শেষ। ১২ জুন, ১৮৪৯।

অর্থাৎ তিন বৎসর আঠার দিন পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে থাকেন ও আমলাগিরি ও শিক্ষকতা করেন। এই কালের মধ্যে একদিনও বিরাম ছিল না। এক নাগাড় চাকরী ছিল। এই সময়ের অর্থাৎ কৃষ্ণনগরে পিতা যখন ছিলেন তখনকার একটি হাস্যকর ঘটনার কথা এইস্থলেই লিপিবদ্ধ করিলাম। কৃষ্ণনগরে জনকয়েক ভদ্রলোক জুটিয়া আপোষে সর্ত্তি খেলিতেছিলেন, কতকগুলি কাপড় চোপড় 'মাল' ছিল। দুইজন দুইটি হাঁড়ি হইতে 'টিকিট' তুলিতেছিলেন। কাহারও কাহারও নাম ডাকার পর মাল উঠিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে একটি হাঁড়ী হইতে টিকিট একখানি তুলিয়া একজন পড়িলেন 'গঙ্গাচরণ সরকার' অন্য হাঁড়ী হইতে আর একজন শাদা কাগজের মোড়া খুলিয়া বলিলেন 'ফর্শা'। পিতা, মহা আনন্দে

হাস্য করিতে লাগিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন "আমার বাপ মায় আমায় আদর করিয়াও কখন 'ফর্শা' বলেন নাই। আমি এমন সভামধ্যে 'ফর্শা' সাব্যস্ত হইলাম, ইহা অপেক্ষা আনন্দ আর কি হইতে পারে?" পিতৃদেব কৃষ্ণনগরে গেলে পর, ১৮৪৬ সালে ২৭শে অগ্রহায়ণ চুঁচুড়ার বাড়ীতে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মের সময় বা অন্নপ্রাশনের সময় পিতৃদেব বাড়ী আসিতে পারেন নাই। ছুটি পান নাই। এই তিন বৎসরের মধ্যে আইনের শেষ পরীক্ষা দিয়া ছিলেন। শেষ পরীক্ষায় পাসের ফল, সদর দেওয়ানির ওকালতী বা মুন্সেফী। ১২ই জুন, ১৮৪৯ কৃষ্ণনগরের জজ আদালতের হেডক্লার্কের কর্ম্ম শেষ হইল। ১৩ই জুন ১৮৪৯ অর্থাৎ পর দিন হইতেই, মুন্সেফী চাকরী আরম্ভ হইল। মুন্সেফ হইলেন ঐ নদে জেলারই-চৌকি হাঁসখালির। কাছারী হাঁসখালিতে হইত না, হইত উলায় বা বীরনগরে। ১৮৫৬ সালে উলায় মহামারী পড়িল তেমন মহামারী ইদানীং দেখা যায় না। উলা তখন খুব গুগ্রামগ ছিল বটে কিন্তু প্রত্যহ দুই দিন শত করিয়া লোক মরিলে গ্রামের গৌরব আর কত দিন থাকে? ঐ বৎসর পূজার ছুটির পর, পিতৃদেব কাছারী উঠাইয়া রাণাঘাটে লইয়া আসেন। সেই অবধি এখনও রাণাঘাটে মুন্সেফি আছে।

মহামারীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উলা অতি সভ্য স্থান ছিল। বহুতর ভদ্র লোক এই স্থানে বাস করিতেন। কায়স্থ পরিবারের সংখ্যা আঙ্গুলে গণা যাইত, কিন্তু সেই কায়স্থগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন। তখন হইতে তাঁহার বাঙ্গলা ভাষায় গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্তি ছিল, তাহার পরে 'অধিকার উক্ত' 'বেদান্ত' 'সৃষ্টি' প্রভৃতি নানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সৌভাগ্যের বিষয় তিনি এখনও জীবিত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা বহুতর ছিল। মাঝের পাড়ায়, উত্তর পাড়ার কতক গুলি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণও ছিলেন। আর বহুতর নবশাখ ও শৌণ্ডিক প্রভৃতি পতিত জাতি ও পটো, বাইতী, চুনুরী প্রভৃতি ইতর জাতি অনেক লোক ছিল। উলার বামনদাস বাবুর তখন প্রবল প্রতাপ। প্রতাপে বাঘে গোরুতে জল খায়, তিনি স্বয়ং অতিশয় ক্রিয়াবান পুরুষ ছিলেন। বার

মাসে তের পার্ব্বণ ও নিত্য নিয়মিত অতিথি-শালাও ছিল; স্নানযাত্রা, রথ, ও জগদ্ধাত্রী পূজায় মহা ধূমধাম হইত। রথের আট দিন, দিবা-রাত্রি এক দিকে যেমন নাচ, গাওনা, যাত্রা, কবি হইত, অন্যদিকে সেইরূপ মধ্যাহ্ন হইতে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত "দীয়তাং ভুজ্যতাং" শব্দে ভূরি ভোজন চলিত। স্নানযাত্রার সময় সত্য সত্যই অঙ্গবঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশী, কাঞ্চী, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড় হইতে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সমাগম হইত। তখন রেল হয় নাই, ষ্টীমার চলাচল ছিল না; সেই সময়ে দূরদেশাগত এক এক জন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের জন্য কত যে পাথেয় ব্যয় হইত, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। আমি তখন অতি বালক, এখন জু-বাগানে গিয়া যেমন সিংহ দেখি, উলায় আগত দ্রাবিড়ী; সুরাটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তখন সেই ভাবেই দেখিতাম; সেই জন্য বেশ মনেও আছে।

উলায় তখন সঙ্গীতের চর্চ্চা খুব ছিল, প্রসিদ্ধ গান-বিলাস মহাশয়ের পুত্র, হরচন্দ্র তখন বিদ্যমান। দুই তিন জন ভাল মৃদঙ্গী ছিলেন; দীনে ঢুলী ছিল; কয় জন বেশ ভাল সানাইওলা ছিল, নাম মনে পড়িতেছে না। অধিকাংশ ভদ্র লোকই মিষ্টভাষী, সদালাপী ও সুরসিক ছিলেন। এখন যেমন দশ জন এক সঙ্গে ঐকস্থানে বসিলেই, বৃষ্টি হইল না, কুয়াসায় আম কাটিয়া গেল, ইউনিভারসিটি বিলে সর্ব্বনাশ করিল, বঙ্গচ্ছেদে উত্তমাঙ্গ ছেদ হইল, ছেলে বেটা অবাধ্য, চাকর বেটা কেবল ঘুমায়,—অকারণ সকারণ—সময়ে অসময়ে—এইরূপ কথারই জল্পনা হইয়া থাকে, তখন সেরূপ কদাচিৎ হইত। তখন দশজন একত্র হইলে, সঙ্গীতের চর্চ্চা হইত, খোস গল্প চলিত; কেহ কেহ বা বড় বড় কেস্সা, কাহিনী বলিলে, সকলে শুনিত, সেই গল্পের রস উপভোগ করিত, আনন্দ পাইত, আনন্দ দান করিত। সন্ধ্যার পর পিতৃদেবের বাসায় মহা মজলিস্ হইত। মন্ত্রণাগৃহ নহে; দুঃখ-দারিদ্র্য জ্ঞাপনের স্থান নহে; পরনিন্দা, পরকুৎসা প্রসার করিবার কেন্দ্র নহে; দুর্ব্বিসহ রাজনীতি চর্চ্চা করিবার ক্ষেত্র নহে; রাণ্ডির ব্রাণ্ডির প্রমোদভবন নহে; কিন্তু মজলিস্, ভোরপুর মজলিস্—গন্ধে মজলিস। জুলুস্ শব্দ হইতে মজলিস্। জলসা শব্দে উজ্জ্বলতা।

সেই মজলিস কতই না উজ্জ্বল! তাহাতে আনন্দই কত! সেরূপ হাসির গড়রা, সেরূপ আনন্দের উচ্ছ্বাস—আর ত এখন কোথাও দেখিতে পাই না। ছেলে-পুলেরা কখন দেখিতে পাইবে কিনা তাহাও বলিতে পারি না।

এই শান্ত মজলিসে বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে, বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষরূপে হইত। সেই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঁচিশ, জীবনচরিত—প্রকাশিত হইল তিনি "কৃষ্ণনগরের মূলপুস্তক দৃষ্টে" ভারত চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ প্রকাশিত করিলেন। তারাশঙ্করের কাদম্বরী প্রকাশিত হইল। এই সকল পুস্তক এবং সেই সময়ের অন্যান্য পুস্তক—ভাল অক্ষরে ছাপায়, ভাল সংস্করণে, যেমন প্রকাশিত হইত, পিতা একখণ্ড ক্রয় করিতেন; আর এই সান্ধ্য সম্মিলনে পঠিত, আলোচিত, আন্দোলিত হইত। সেই সাহিত্যের আন্দোলনে আনন্দের ফুয়ারা উঠিত।

আমার মনে পড়ে যেদিন তারাশঙ্করের কাদম্বরীর প্রথমে পাঠ আরম্ভ হইল। শ্রীরামচন্দ্র বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় আসিতেছেন, পথি-মধ্যে বাল্মীকি সগৌরবে পরশুরামের অবতারণা করিয়াছেন। যৌবনে তাহা পাঠ করিয়াছিলাম, সে গৌরবও বোধ হয় ভুলিতে পারি। প্রৌঢ়ে রসিকদাস কীর্ত্তনিয়া মহাগৌরবে, মহাআড়ম্বরে জয়দেবের 'বদসি' গানের অবতারণা করিয়াছিল, তাহাও হয় ত ভুলিয়া যাইব, কিন্তু বাল্যে সেই যে পিতৃদেব কর্ত্তৃক কাদম্বরীপাঠ, তাহার গৌরব, তাহার মর্য্যাদা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না। সেই যে শ্রোতৃবর্গ বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া তামাকু টানিতে ভুলিয়া গিয়া, হুকা হস্তে, বিস্ফারিত নয়নে, একমনে এক ধ্যানে, পিতৃদেবের মুখপানে চাহিয়া আছেন, আর যেন সর্ব্বাঙ্গে কাণ পাতিয়া, সেই কাদম্বরী সুধা পান করিতেছেন, সাহিত্য-সেবার সেরূপ জাঁক-পসার, সেরূপ তন্ময়তা, সেরূপ একাগ্রতা, কখন ভুলিতে পারিব না। মনে পড়িতেছে "পূর্ব্বকালে শূদ্রক নামে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অতি বদান্য এক নরপতি ছিলেন। বিদিশানাম্নী নগরী তাঁহার রাজধানী ছিল। যে স্থানে বেত্রবতী নদী, বেগবতী

হইয়া ভাগীরথীর উপর উপহাস করত, ইত্যাদি ইত্যাদি।" বাবার সেই গলাভরা আওয়াজ, প্রাণভরা উৎসাহ, আনন্দপূর্ণ চক্ষু, আর শ্রোতাদের সেই ঐকান্তিক আগ্রহ, সকলেই মনে পড়িতেছে। তখনকার সাহিত্য-সেবা যেন দেবতার পূজা। এখনকার আমাদের সাহিত্য-সেবা যেন এনাটমিক্যাল ডিসেক্‌সন্। অস্থি-মাংস চর্ম্মের ব্যবচ্ছেদ। একখানি সাহিত্য গ্রন্থ পাইলে, আমরা করি কি, দুই ছত্র পড়িতে না পড়িতেই সমালোচনার ছুরী বাহির করিয়া তাহার ভাষা চিরি, তাহার ভাব চিরি, তাহার অলঙ্কার চিরি, ইতিহাস চিরি, খণ্ড খণ্ড করি, তাহার পর আবার বোতলে পুরিয়া মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইয়া দিই। বলি, আমিত সামান্য ডাক্তার, এই করিয়াছি; তুমি সাহিত্য-জগৎ,—কেমিক্যাল একজামিনার, রাসায়নিক পরীক্ষক,—তুমি একবার এসিড দিয়া, ঘৃণা দিয়া অবজ্ঞা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখনা কেন, ইহার মধ্যে কি আছে? আমাদের এখনকার কালের সাহিত্য-সেবা এইরূপ, আর তখনকার সেই কাদাম্বচরী পাঠ যেন বারাণসীর বিশ্বেশ্বরের আরতি। সাহিত্য তখন উপভোগের সামগ্রী, আরাধনার বস্তু। কত আয়োজনে, কত যত্নে, কত পরিশ্রমে, তখন সাহিত্য সেবা হইত। সাহিত্য-সেবায় লোক ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হইত, আনন্দে অশ্রু-পরিপ্লাবিত হইত। ভক্তি, আনন্দ, উচ্ছ্বাস এই সকল লইয়া তখন সাহিত্য-সেবা, সাহিত্যচর্চ্চা, সাহিত্যপূজা। এখনকার মত ছুরি কাঁচি বরষী লইয়া সাহিত্য ভেদ, সাহিত্যবেধ, সাহিত্য-ব্যবচ্ছেদ, তখন ছিল না। হায়! আমরা কি সাহিত্য-সেবাই শিখিয়াছি!!!

পিতৃদেব স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া, অধিনায়কতা করিয়া, তাৎকালিক শিক্ষা-বিভাগ পরিচালিত করিয়া উলা গ্রামে তিনটি বাঙ্গলা পাঠশালা ও একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এইজন্য তাঁহাকে সভা করিয়া বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। তখন ইংরাজিতে রামগোপাল ঘোষ বড় বক্তা। কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বে স্কুল স্থাপনের জন্য বা এইরূপ কোন কারণে কেহ যে বাঙ্গলা-ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন, এমন কথা শুনি নাই। সেই বক্তৃতায় উদ্বোধনভাগের নমুনা দিতেছি।

"আহা! রজনী কি সুখদায়িনী! যে রজনীতে আমরা বৈষয়িক ব্যাপারের ব্যস্ততা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্ষণিককাল সুখে সম্বরণ করণ কারণ এক সাতিশয় সদালোচনায় প্রবৃত্ত-চিত্ত হইয়াছি। যে রজনীতে এই বীরনগরের ভাবী সৌভাগ্যের সমুন্নতি-হেতু অত্রত্য সাধু ও সমৃদ্ধ জনসমাজের সমাগমন হইয়াছে। যে রজনীতে মদীয় বহুদিবসীয় মনোরথ পূর্ণ হওনের বিলক্ষণ সুলক্ষণ সমীক্ষণ করিয়া মম্মানস আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেছে।"

বিলক্ষণ, সুলক্ষণ, সমীক্ষণ, লিখিতে গিয়া পিতার পৌত্র হাসিলেন। সে কথাও পোপ সাহেব বলিয়াছিলেন,—

"We think our fathers fools, so wise we grow.
Our wiser sons shall surely think us so."

ভাষা পুরুষে পুরুষে পরিবর্ত্তন হইতেছে। ঈশ্বর গুপ্তের গদ্যে, মৃত্যুঞ্জয়ের স্থানে স্থানে, তারাশঙ্করের সমস্ত, এইরূপ বিলক্ষণ সুলক্ষণ অনুপ্রাসে ভরা। তখন বাঙ্গলা গদ্যের শিশুকাল। তখন পায়ে দিবে চারি গাছা মল,—কোমরে দিবে বোরপাটা, নিমফল,—কাণে দিবে বীর-বৌলি,—পিঠে ঝুলিবে ঝাঁপা,—হাতে দিবে বাজুবন্দ,—মাথায় দিবে পুঁটে—বেড়াবে ছুটে ছুটে,—তখন কি অলঙ্কার এড়ান যায়? না বালচাপল্যের নিবৃত্তি হয়? তাহাও হয় না। হিন্দী মহারাষ্ট্রী, উড়িয়া, মাগধী এখনও অলঙ্কারের ছটা লইয়া বিব্রত। আমরা যে কাটাইয়া উঠিয়াছি, আড়ম্বরশূন্য, অলঙ্কারশূন্য, সহজ, সরল, অথচ সতেজ, সুন্দর গদ্য লিখিতে আমরা যে পারি, সেইত বাঙ্গালির কৃতিত্ব, সেইত বাঙ্গালির গৌরব। তাহাইত বাঙ্গালির মহতী কীর্ত্তি।

এই তিনটি বাঙ্গালা স্কুলে প্রায় ৫০০ ছাত্র হইল। সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্য-সাহিত্যে উত্তীর্ণ এক জন করিয়া ছাত্র প্রধান শিক্ষক, অর্থাৎ হেড্ পণ্ডিত। নিম্নতর শ্রেণীর জন্য এক জন করিয়া গুরুমহাশয় আর এক জন করিয়া জরিপ ও পরিমিতি-অভিজ্ঞ বাঙ্গালা শিখাইবার পণ্ডিত। তখন বাঙ্গালা দেশে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপিত হয় নাই, জরিপ জানা দ্বিতীয় পণ্ডিতের বড়ই অভাব হইল। উলারই একটি ভদ্র লোককে

পিতা জরিপ শিখাইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে দক্ষিণ পাড়ার দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। দক্ষিণ পাড়ার বারইয়ারী পূজার বৃহৎ আট-চালায় ঐ বাঙ্গালা স্কুল হইত। সেই আটচালা আমাদের বাসার অতি নিকটে ছিল. ঐ দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় স্কুলের সময়ের পূর্ব্বে এবং পরে আসিয়া পিতৃদেবের কাছে পাঠ গ্রহণ করিতেন। ছয় মাসে তাঁহার শিক্ষা হইল। ইন্‌স্পেক্টর প্রথমে তাঁহাকে প্রবেশনরী পদ দিলেন, পরে পরিমিতির পরীক্ষা করিয়া পাকা পদে নিযুক্ত করিলেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। তিনি উলার ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়; তিনি পাখোয়াজে সিদ্ধহস্ত। মিঠে হাত এবং তালে দোরস্ত। তখনকার কালের আর একজন লোক বাঁচিয়া রহিয়াছেন, সেই জন্য এই কথাটা এত দীর্ঘচ্ছন্দে বলিলাম।

ইংরাজি স্কুলে চারি পাঁচ জন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। হেড মাষ্টার হইলেন পিতার এক জন ছাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিতৃদেব কৃষ্ণনগর-কলেজে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এই সকল মাষ্টার-পণ্ডিত-সমাগমে, আমাদের সেই সান্ধ্য সভা আর এক প্রকার জমাট হইল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সমাগমে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা হইতে লাগিল। এবং যে দিন হেডমাষ্টার মহাশয় আসিতেন সেদিন সেক্সপিয়র প্রভৃতিরও চর্চ্চা হইত। সঙ্গীতের চর্চ্চা নিত্যক্রিয়া ছিল। পিতৃদেব ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষা করিতেন। সভাভঙ্গের পর গুরুশিষ্যে মিলিয়া এই কাণ্ড হইত; রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া যাইত; তৎপূর্ব্বেই আমি অবশ্য শয়নাগারে গমন করিতাম।

এই যে স্কুল-পাঠশালা-প্রতিষ্ঠা ইহাতে পিতৃদেবের কৃতিত্ব ত ছিলই, সরকার বাহাদুরের সাহায্য এবং উৎসাহদান বিলক্ষণ ছিল। সংস্কৃত কলেজে তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় অধ্যক্ষ। তিনি সেই অধ্যক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা স্কুল স্থাপনের, রক্ষণের ও শাসনের ভার কয়েকটি জেলার মধ্যে পাইয়াছিলেন। হেডপণ্ডিত তিন জনকে তিনি পাঠাইয়া দেন। নদীয়া জেলার ডিপুটি ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিলেন, পাণ্ডুয়ার নিকট বেলুনের রামলাল মিত্র। তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃতজ্ঞ ছাত্র। কাজ চালানমত

ইংরাজি অবশ্য জানিতেন; কি ইংরাজি কি বাঙ্গালা, কি পেনে, কি শরে, তিনি মুটকলমে, কলমের উপর তর্জ্জনীর ভর দিয়া লিখিতেন। উড়েরা সকলেই এইরূপ লেখেন; বাঙ্গালা টোলের ছাত্রেরা কখন কখন ঐরূপ লেখেন। সাহায্য-প্রাপ্ত স্কুল স্থাপনার জন্য ভার পাইলেন হজ্‌সন্‌ প্রাট। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন শ্রীরামপুরের কালিদাস মৈত্র। সেই সময় বাঙ্গালাময় স্কুল বসাইবার ধূম পড়িয়া গেল। এখানে স্কুল, সেখানে স্কুল, চারিদিকে স্কুল, বিদ্যাবিতরণের জন্য সরকার বাহাদুরের ব্যগ্রতা ও ব্যয়-বাহুল্য দর্শনে লোকে বিস্মিত হইল, মহাকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। এখনকার দিনে হইয়াছে, মাছী পড়িয়াছে জাল গুটাও গুটাও। লেখা-পড়া শিখিয়া লোকে বিদ্রোহী হইতেছে, বাচাল হইতেছে; লেখা পড়ার বিস্তার কমানই ভাল। তাই এখনকার দিনে সেই পুরাণ কথাগুলি মনে পড়ে, আর মনে হয়, সেই এক দিন, আর এই এক দিন। যেমন সাহায্য-প্রাপ্ত বিদ্যালয় বসিল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হজ্‌সন্‌ প্রাট্ সংবাদপত্রে সাহায্যদান করিতে অগ্রসর হইলেন। তৎপূর্ব্বে যে সংবাদপত্র ছিল না এমন নহে এবং সংবাদ পত্রের যে প্রসার-প্রতিপত্তি ছিল না তাও নহে। তবে গবর্ণমেণ্টের কথা লোককে বুঝাইবার জন্য একখানি সংবাদপত্রের প্রয়োজন বোধ হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ওব্রাইনন্‌ স্মিথকে সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, ওব্রাইনন্‌ স্মিথ সংবাদপত্র প্রকাশিত করিলেন।

তখন খৃষ্টানির সংবাদপত্র ছিল, জ্ঞানকিরণোদয় প্রভৃতি। ধর্ম্মের জন্য ছিল, এক পক্ষে সমাচারচন্দ্রিকা। উহা দৈনিক। অন্য পক্ষে ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। উহা মাসিক। আর সাধারণ সংবাদ বহন ও বঙ্গভাষা সঞ্চালনের জন্য ছিল, এক দিকে প্রভাকর, অন্য দিকে ভাস্কর। তখন আমি চন্দ্রিকা দেখি নাই। পড়িতাম তত্ত্ববোধিনী ও মাসিক প্রভাকর। দৈনিক প্রভাকরে সংবাদ আদ থাকিত আর সরিফসেলের বিজ্ঞাপন থাকিত। উহা আমি বড় পড়িতাম না। প্রতি মাসের প্রথম দিনের প্রভাকরে প্রচুর পদ্য থাকিত। তাহাই পড়িতাম, নাড়িতাম-চাড়িতাম, মুখস্ত করিতাম। প্রতি বৎসরের ১লা বৈশাখের প্রভাকর অবয়বে

ছয় ভাগের কলিকাতা গেজেটের মত পুরু। সম্বৎসরের প্রধান ঘটনাবলী, খুং বিরুৎ পদ্যে, ঈশ্বর গুপ্তের সেই সরল সতেজ লেখনীতে প্রকাশিত হইত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১৮৪৬ সালে অগ্রহায়ণ মাসে আমার জন্ম হয়। ১৮৫৬ সালের আশ্বিন মাসে উলা ছাড়িয়া আসি। তখন আমার বয়স পুরা দশ বৎসর হয় নাই। ইতিমধ্যে তিনবারকার বার্ষিক প্রভাকর আমি পড়িয়াছিলাম; অর্থাৎ সপ্তমবর্ষে আমি প্রভাকর পড়িয়াছি, বুঝিয়াছি, মুখস্থ করিয়াছি। ঐ তিন বৎসরের মধ্যে অন্নদামঙ্গল, তিনখণ্ড চারুপাঠ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার, কাদম্বরী, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের আরবীয়োপাখ্যান ও সেক্সপীয়র হইতে অপূর্ব্বোপাখ্যান পাল বর্জ্জিনিয়া প্রভৃতি পাঠ করিয়াছিলাম। Honi soi qni maly .pense

এই নয় বৎসরমধ্যে তিনজন ডেপুটি ইনস্পেক্টরকে উলায় দেখিয়াছিলাম। একজনকার নাম করিয়াছি—বেলুড়ের রামলাল মিত্র; দ্বিতীয়—কৃষ্ণনগরের ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়। ইনি কৃষ্ণনগরের ব্রজ বাবু বলিয়া বিখ্যাত এবং পরে কৃষ্ণনগরে স্বয়ং স্কুল স্থাপনা করেন। তৃতীয় ব্যক্তি গরিফার চন্দ্রশেখর গুপ্ত; বিখ্যাত বি, এল গুপ্তের পিতা। ইহাঁর পত্নী অর্থাৎ বি এল গুপ্তের মাতা সুন্দর সাধুভাষায় বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন। আমি তাঁহার লেখা পত্র তৎকালে দেখিয়াছিলাম; একটু বেশী সাধুভাষা তাহাতে ছিল,—"পদবীতে পদার্পণা" প্রভৃতি বেতালপঁচিশী পদ সেই পত্রে ছিল। তাহা থাকুক্, কিন্তু লেখা অতি প্রাঞ্জল, সুন্দর ও সরল। পিতা সেই পত্র আদর্শরূপ আমার মাতাকে দেখাইয়া ছিলেন, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। কলিকাতার খবর, তখন ত জানিতামই না, এখনও ভাল জানিনা। তখনকার কালে আমাদের গঙ্গার দুধারের পল্লীর মধ্যে বেহারী বাবুর মাতার মত কেহ যে লিখিতে পারিতেন, এমন বোধহয় না। ১৮৫৬ সালে মার্চ্চ মাসে চন্দ্রশেখর গুপ্ত মহাশয় উলার বিদ্যালয় সকল পরিদর্শন করিতে যান। অবশ্য আমাদের বাসাতেই ছিলেন। আমি কোন স্কুলে পড়িতাম না, গুপ্ত মহাশয় আমাকে পৃথক্ পরীক্ষা করেন

এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিত "জীবনচরিত" পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে পারিতোষিক দেন। সে বইখানি আমাদের বাড়িতে আজিও আছে। এখানি তৃতীয় বারের ছাপা। প্রথম বারে ১৭৭১ শকে ভাদ্র মাসে ছাপা হয়। দ্বিতীয় বারে ১৭৭৩ শকে চৈত্র মাসে, আর তৃতীয় বারের এই সংস্করণ ১৭৭৭ শকের বৈশাখ মাসে ছাপা হয়। প্রাইজ পাইয়া অবশ্য আমি জীবনচরিত পাঠ করিয়াছিলাম।

কোকাল ডিস্‌টানস্ পদার্থটি কি, কাহাকে বলে, তাহা অবশ্য তখন কিছুই বুঝি নাই, কিন্তু বাঙ্গালা শিখিয়াছিলাম, "আধিশ্রয়ণিক ব্যবধি।" পঞ্চপাদিক মানে বুঝিয়াছিলাম, যাহার পরিমাণ পাঁচ ফুট। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বহুপরে শুনিয়াছি, যে সময়ে জীবন চরিত রচিত হয়, সে সময়ে কৃষ্ণবন্দ্যোর বা রেভারেণ্ড কে, এম, বানার্জীর বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য স্থিরীকরণ বিষয়ে একাধিপত্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই জীবন-চরিত, তিনি নাকি ভাষা-দুষ্ট বলিয়া দূরীকৃত করেন। এবং পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় নানারূপ চেষ্টা করিয়া তবে জীবন-চরিতকে পাঠ্য পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিতে সফল কাম হন।

গরিফার চন্দ্রশেখর বাবুর কথা পড়াতে গরিফার একজন তাৎকলিক গ্রন্থকারের নাম ও তাঁহার গ্রন্থের কথা মনে পড়িল। ১৮৫২ সালে গরি-ফার বৈদ্য শ্রীনন্দকুমার রায় ব্যাকরণদর্পণ নামে একখানি পদ্য ব্যাকরণ প্রণয়ণ করেন। আমি মুখে মুখে সন্ধি করিতে শিখিয়াছিলাম; আর এই ব্যাকরণদর্পণ পড়িয়াছিলাম ও অনেক স্থানই মুখস্ত করিয়াছিলাম, ব্যাকরণদর্পণের ছন্দের লক্ষণগুলি বেশ সুন্দর।

চারি চারি বর্ণ সারি তিন বারি রয়,
কহি শেষ, অবশেষ দুই শেষ হয়।
সারি সারি মিল ধারি বর্ণ চারি পাবে,
সর্ব্ব শুদ্ধ বর্ণ চৌদ্দ ইথে লব্ধ হবে॥
চতুঃসপ্ত বর্ণে দশাদ্যে বিহারি,
ভুজঙ্গ প্রয়াতে হবে হ্রস্ব চারি।

নন্দকুমার রায় কৃত আর একখানি পুস্তক সেই সময়ে পাঠ করিয়াছিলাম। সেখানি অভিজ্ঞানশকুন্তলা নাটকের বঙ্গানুবাদ। সংস্কৃত যেখানে শ্লোক আছে, বঙ্গানুবাদে সেই সেই স্থলে পয়ার বা ত্রিপদী ছিল। লেখা অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত। সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ এইখানি বোধ করি, সর্ব্ব-প্রথম হইবে। আমি তখন নাটকের কায়দা, কারচুপি সে সকল কিছুই জানিতাম না। পিতা বুঝাইয়া দেবার কোন চেষ্টাও করেন নাই। ভাষা ছাড়া আর কিছু যে কেতাবে বুঝিতে হয়, তাহা আমি বুঝিতাম না; তবে ভাষা বুঝার পরে আমার সেই বালক-হৃদয়ে যে কিছু রসগ্রহ হইত না, এমন কথা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। কৃষ্ণবন্দ্যোর ভাষাও ত ভাষা; তাহা পড়িতে একেবারেই ভাল লাগিত না; আর বিদ্যাসাগর, অক্ষর কুমার, ভারত চন্দ্র, নন্দকুমার ইঁহাদের সে ভাষাই বা পড়িতে ভাল লাগিত কেন? অক্ষয় কুমারের কথা সকল—অতি গভীর, লেখা-প্রগাঢ়, ভাব-গম্ভীর, তবু সে ভাল লাগিত, অথচ কৃষ্ণ বন্দ্যোর রাজোপাখ্যান কেবল গল্প বইত নয়, তাহা ভাল লাগিত না। কেন? কাজেই বলিতে হইতেছে, আমি বালজীবনে যে কেবল ভাষাই শিখিতেছিলাম এমন নহে, না বুঝিয়া না শুঝিয়া, একটু একটু সাহিত্যও শিখিতেছিলাম। রস-রচনা কাহাকে বলে তখন না বুঝি, কিন্তু রসের স্বাদ গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত হইতেছিলাম। প্রভাকরের পদ্য উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য না হইলেও সহজ সরল সরস রচনা বটে। নন্দকুমারের শকুন্তলার অনুবাদ খুব সহজ না হইলেও সরল সরস রচনা।

আমার জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে—১২৫৩ সালে, আমার জন্ম হয়, ১২৫১ সালে,—মহাত্মা রাজনারায়ণ মিত্র "কায়স্থ-কৌস্তুভের" প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা প্রচারিত করেন। আমার জন্মের দুইবৎসর পরে ১২৫৫ সালে তৃতীয় সংখ্যার কায়স্থ-কৌস্তুভ প্রকাশিত হয়। কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন ঐ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। তৃতীয় পৃষ্ঠায় নারায়ণের পদতলস্থ "এক বিংশতি চিহ্নের চিত্র বিচিত্র রূপ প্রকটিত" ছিল। আমি অতি শিশুকালে সেই সকল অপূর্ব্ব চিত্র বিচিত্র পাইয়া মনের সহিত কায়স্থ-কৌস্তুভ লইয়া খেলা করিতাম। সে পুস্তকখানি এখনও আমার আছে; সে

তৃতীয় পৃষ্ঠার ছবিগুলিও আছে। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ পরিষ্কার চিত্র খোদিত হইত, আমার সে বইখানি না দেখিলে, আপনারা বিশ্বাস করিবেন না। যাউক্ সে কথা, আসল কথা কায়স্থ ক্ষত্রিয় এই কথাটা মাতৃদুগ্ধের সহিত আমার উদরস্থ হইয়াছে। তখন এবিষয়ে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। শুনিতে পাওয়া যায়, আঁন্দুলের রাজারা, এই বিষয়ে নাকি লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। ত্রিস্রপুস্করিণীর পীতাম্বর তর্কভূষণ, শোভাবাজারের সভাপণ্ডিত ভগবান্ চন্দ্র ন্যায়রত্ন, কোন নগরের তারাচরণ তর্কবাগীশ, সোনামুখীর বৈদ্যনাথ ন্যায়ালঙ্কার, ভট্টপাড়ার হলধর তর্কচূড়ামণি, সংস্কৃত কলেজের জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি এতদ্দেশীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে মত প্রদান করেন। আমি অতি বালক কালে এই সকল কথা গলাধঃকরণ করিয়াছিলাম। কায়স্থকৌস্তুভ প্রকাশের ৬০ বৎসর পরে, এখনও সেই কথা সমানে চলিতেছে। এখনকার কায়স্থসভায় আমি কয়দিন যাতায়াত করিয়াছিলাম। আমার বোধ হইতেছে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে কথাটা যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে। কায়স্থ ক্ষত্রিয়, ব্রাত্য হইয়াছে, যাগ-যজ্ঞাদি করিলে সেই ব্রাত্যত্ব খণ্ডিত হইতে পারে। আমি বুঝিতে পারিনা যে পঞ্চাশ ষাট বৎসর অন্তর একথাটা এরূপ করিয়া আলোড়ন করার ফল কি? যদি হিন্দু বলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর, যদি জাতি বলিয়া কোন সত্য পদার্থ আছে মানিতে পার, তবে এ কথার আন্দোলনে অর্থ আছে, নতুবা "তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে"।

তখন পদ্যে যেমন প্রভাকরের প্রসার, গদ্যে তেমনই তত্ত্ববোধিনীর গৌরব। ১৮৪৩ সাল হইতে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশিত হয়। ১ম ভাগ ১ সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী আমাদের বাটিতে ছিল। এক দিকে অক্ষয় কুমারের ভাষা হইতে যেমন গম্ভীর রচনার ভঙ্গি শিক্ষা করিলাম, অন্য দিকে গুপ্তের সেই সরল চটুল চকচকে পদ্যের ভাষাও শিক্ষা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তখন প্রভাকরের প্রভূত পসার। লোকে কথায় কথায় প্রভাকরের পদ্য আওড়াইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করে. তামাসা করিতে হইলে প্রভাকরের ভাষায় বলে,—এই গৌরব এই আদর

দেখিয়া বালকহৃদয়ে একরূপ বুঝিয়া ছিলাম, যে সহজ সরল বাঙ্গালা একটা ফেল্‌না জিনিষ নয়। অক্ষয় কুমার হইতে এক দিকে যেরূপ মুখস্ত করিয়াছিলাম—"বন বিজন কানন বা তরুশূন্য মরুদেশ, গভীর সিন্ধু-গর্ভ বা জনাকীর্ণ রাজধানী, প্রখর রশ্মিপ্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সময় বা ঘোরা দ্বিপ্রহরা তামসী বিভাবরী, তরুণ যৌবন বা পরিপক্ক প্রবীণ কাল, সুশীতলসমীরসঞ্চালিত প্রভাত সময় বা বিহঙ্গকোলাহলকলিত শ্রান্তিহর সায়ংকাল, সর্ব্ব স্থানে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় পরাৎপর পরমেশ্বরকে সাক্ষী স্বরূপ দেখিয়া, ভক্তিমানের চিত্ত ভক্তিভরে দ্রবীভূত হয়।" অন্য দিকে সেইরূপ,—

"কেবলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর॥

ইত্যাদি এবং "বিবিজান চলে জান লবেজান্ করে" ইত্যাদি মুখস্ত করিয়াছিলাম। তাহার ফল এই হইয়াছে, সহজ বাঙ্গলা আমি এখনও ফেল্‌না জিনিস মনে করি না।

যে সাহায্যপ্রাপ্ত সংবাদ পত্রের কথা বলিতে ছিলাম তাহা এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ। এখনও সেই সাহায্য চলিতেছে কিন্তু সে আকার নাই, সে প্রকার নাই। এখনকার দিনের মত নয়, অপেক্ষাকৃত বৃহৎ অক্ষরে ছাপা প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত হইল, আমার বেশ মনে পড়িতেছে। ওব্রাইনন্ স্মিথ্ স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক, কালিদাস মৈত্র সহ-সম্পাদক। তাঁহার দুই তিন জন আত্মীয় উলায় থাকিতেন, তাঁহারা হর্ষে গৌরবে, তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন,—সকলে একটু ঠাণ্ডা হইলে আমি চুপি চুপি তাহা হইতে যাদব-মাধবের কথোপকথন পাঠ করিতে লাগিলাম। গেজেট কথাটা আমি তৎপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। বাঙ্গলা গেজেট দেখিয়াও ছিলাম। এডুকেশন কথাটা তৎপূর্ব্বে আমার কাণে উঠে নাই। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কথাটা কি?' বাবা বলিলেন "ওটা ইংরাজি কথা—অর্থ 'শিক্ষা'। আমি বলিলাম "তবে শিক্ষা গেজেট বলিল না কেন?" পিতা একটু হাস্য করিলেন। বোধ হয় শৈশবে আমার

সমালোচনার প্রবৃত্তি দেখিয়া, তিনি হয়ত একটু আহ্লাদিত অথচ বিচলিত হইতেছিলেন। আমি পঞ্চাশ বৎসর কথাটা শুনিতেছি কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের মুখপত্রের নাম এডুকেশন গেজেট এ বিড়ম্বনা কণ্টক এখনও প্রাণে খচ্ করিয়া উঠে।

তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ। শিক্ষাবিস্তারের সহায় এবং বাঙ্গালা পাঠ্য-পুস্তকের প্রণেতা। কিন্তু আমার বর্ণপরিচয় 'বর্ণপরিচয়ে' হয় নাই। আমরা প্রথমে স্কুলবুক্‌সোসাইটির বর্ণমালা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ছিল 'জল পড়ে, ছাতা ধর'। মদনমোহনের শিশুশিক্ষা পড়িয়াছিলাম। তাহাতে ছিল 'কাল কাক ভাল নাক'। 'পাখী সব সব করে রব'। 'কটু বাক্য কহা অনুচিত'। 'বেণী বড় দুরন্ত বালক।' 'ধার্ম্মিক লোক পৃথিবীর অলঙ্কার"। আমরা দশ জনে এখন কত রকম বাঙ্গালা লিখিতেছি। কেহ ঝাড়-ঝঙ্কার দিতেছি; কেহ ফুলে-ফলে শোভিত করিতেছি; কেহ পেঁচের পর পেঁচ লাগাইয়া ভাষার কায়দা বিন্যাসে গোলকধাঁধা করিতেছি। কিন্তু মদনমোহনের সেই সুন্দর, সতেজ সরল, সহজ, মিঠা-কড়া, মোলায়েম, জলের মত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ভাষা লিখিতে পারি কি? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয় প্রভৃতি পড়ি নাই বটে; সেই সময়ে পড়িয়াছিলাম, তাঁহার বেতাল-পঁচিশ। আমি মনে করিতেছি, উহাই তাঁহার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। বেতাল-পঁচিশ হইতেও নানা স্থানে মুখস্ত করিয়াছিলাম,—"যে স্থানে ত্রেতাবতার ভগবান্ রামচন্দ্র দশাননের বংশ ধ্বংশ করণাভিপ্রায়ে মহাকায় মহাবল কপিবল-সাহায্যে শতযোজনবিস্তীর্ণ অর্ণোবোপরি কীর্ত্তি হেতু সেতু সংঘটন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, কল্লোলিনীবল্লভ প্রবাহ মধ্য হইতে, অকস্মাৎ এক ভূরুহ উত্থিত হইল, তদুপরি এক সকল-লোক ললামভূতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী চার্ব্বঙ্গী বীণাবাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন।"

দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীতবক্ষে গণেশ-মূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর-চূড়া, টেরি-কাটা কার্ত্তিক স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহা দেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদনমোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহা

প্রতিমার উপাসক। অনর্থক পিতৃ-গৌরব বৃদ্ধির জন্য; পিতৃদেবকে মধ্য-স্থানে অধিষ্ঠিত করিতেছি, এমন কেহ মনে করিবেন না। বাঙ্গলা লেখা-পড়ায় আমার প্রবৃত্তি, পন্থানুসরণ, শিক্ষায় সাহায্য, ভ্রমে সংশোধন, প্রধানত তাঁহা হইতেই। তবে অন্য পাঁচ দেবতার উপাসনা অতি শৈশবেও যেমন করিয়াছি, এখনও তেমনি করিতেছি। তারাশঙ্করে ঝঙ্কার খুব। ঝঙ্কারে সুর তাল ডুবিয়া থাকে। শুনিতে মধুর, কাজে লাগে বড় কম। কাদম্বরী পাঠে মুগ্ধ হইতাম, স্তম্ভিত হইতাম, বিস্মিত হইতাম। কিন্তু কখন নিজের জিনিস বলিয়া মনে করিতে পারিতাম না। কাদম্বরী চমক দিত, কিন্তু প্রাণে লাগিত না। কিন্তু অন্নদামঙ্গলের ছন্দ, ঈশ্বর গুপ্তের লহর, অক্ষয়কুমারের গাম্ভীর্য্য, বিদ্যাসাগরের প্রসাদ গুণ, তখন হইতেই প্রাণে বাজিত, প্রাণে লাগিত, প্রাণে বসিয়া যাইত। তখন অবশ্য জানিতাম না, কাহাকে বলে প্রসাদ গুণ, কাহাকে বলে ওজোগুণ। এখনও যে বেশ জানি সে কথা বলিয়া বুড়া বয়সে অধর্ম্ম সঞ্চয় নাই করিলাম।

আর প্রাণে লাগিত না কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙ্গালা। অক্ষয়-কুমার, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন প্রভৃতি সকলের পূর্ব্বে বাঙ্গলার লেখকরূপে অবতীর্ণ হন রেবারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। সে হইল আমাদের জন্মের বহু পূর্ব্বে; তাহার পর আমাদের এল, এ, বি, এ পরীক্ষার বাঙ্গালায় পরীক্ষক তিনিই ছিলেন। তাঁহার লিখিত বাঙ্গলা বহুকাল পুনঃপুনঃ এণ্ট্রান্সের কোর্স ছিল, কিন্তু সেই যে ছেলেবেলা কৃষ্ণবন্দ্যী বাঙ্গলা প্রাণে লাগে নাই, ভাল বাসি নাই, সেইরূপ কখন উহা ভাল বাসিতে পারি নাই। এখন বুঝিয়াছি কৃষ্ণবন্দ্যের বাঙ্গলায় প্রাণ নাই বলিয়া প্রাণে লাগে নাই। তাঁহার লেখা পণ্ডিতি বাঙ্গলা, কিন্তু তাহাতে না আছে ভঙ্গি (ষ্টাইল) না আছে রস, না আছে আবেগ। মৃত্যুঞ্জয়ের পরে সকল গদ্যলেখকের অগ্রে, কৃষ্ণমোহন ইংরাজিতে বাঙ্গলায়-কোথাও ইংরাজির অনুবাদ বাঙ্গলায়, কোথাও বাঙ্গলার অনুবাদ ইংরাজিতে, কোথাও ইংরাজি বাঙ্গলা দুই সংস্কৃতের অনুবাদে,— এই ভাবে বিভাবিক গ্রন্থ সংখ্যাদি ক্রমে, ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত

করেন। তাহার বাঙ্গলা নাম বিদ্যাকল্পদ্রুম, ইংরাজি নাম Enclopœdia Bengalensis শৈশবে আমি তাহার তৃতীয় খণ্ড পড়িয়াছিলাম। সেই খণ্ড মাত্রই আমাদের বাড়ীতে ছিল, তাহাতে ছিল Arnoll হইতে রোমের ইতিহাসের কিয়দ্ অংশ, ইউক্লিডের জ্যামিতির কতকটা অনুবাদ। আর রাজদূত বলিয়া একটি গল্পচ্ছলে ধর্ম্মকথা। আমি অবশ্য কেবল বাঙ্গলা ভাগই পড়িতাম। জিওমেট্রির বাঙ্গলাও পড়ি নাই, সে হিজিবিজি ক, খ, গ আমার ভাল লাগিত না।

থাক এখন আমার কথা। পিতার সাহিত্য-সেবার আর একটি অঙ্গ বলি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে কবির গান প্রৌঢ়াবস্থা পাইয়াছে। হরু নিলু প্রভৃতি ঠাকুরেরা,—চিন্তে, ভোলা, প্রভৃতি ময়রারা—বলাইচাঁদ, উদয়চাঁদ, কৃষ্ণদাস, প্রভৃতি আমাদের নিকটস্থ বৈরাগী কবিওয়ালারা—সকলেই প্রায় অস্ত গত। এক দিকে চিন্তামণি, অন্যদিকে পরাণচন্দ্র, বাদ-বিবাদ করিয়া কোনরূপে বাঙ্গালার আসর রক্ষা করিতেছিলেন। যাত্রার গানে বদন তখন ওস্তাদ হইয়াছেন; গোবিন্দ অধিকারীর তখন খুব জাঁক-পসার; গোপাল উড়ের তখন মৃত্যু হইয়াছে, প্রসিদ্ধ নৃত্যকারী কেশে ধোবা সেই দল তখন জাঁকে-জমকে রক্ষা করিতেছে। আর তখন জাঁকপসার পাঁচালীর। গুরু-দুম্ব, গঙ্গালস্কর তখন চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু কথার ছটায় শব্দের ঘটায় দাশরথি তখন বাঙ্গলা আচ্ছন্ন করিয়াছেন; আর আমাদের নিকটে চুঁচুড়ায় গাওনার জোরে, সুর-তালের বলে, সন্ন্যাসী তখন দাশরথির সম-কক্ষতা করিতেছেন। এই সন্ন্যাসীর দলে একজন তবলা-বাদ্যকার ছিলেন ঠাকুরদাস সরকার, আমাদের অতি নিকট প্রতিবাসী। উলায়-থাকা সময়ের মধ্যে, এই ঠাকুরদাসের অনুরোধে, পিতা তিন চারি পালা পাঁচালীর গান তাঁহাকে রচনা করিয়া দেন। ঠাকুরদাস সন্ন্যাসীর দল হইতে ভাঙ্গিয়া আসিয়া, সেই রচনার বলে, পৃথক্ দল করিয়াছিলেন। এক পালা শিবের বিবাহ; দ্বিতীয় পালা শুম্ভ-নিশুম্ভ-বধ; তৃতীয় পালা বিরহ; চতুর্থ পালা আগমনী। আগমনীর ছড়া মনে পড়ে না, গান বলিতে পারি। পাঁচালীর একটু নমুনা দিতেছি।—

শিব-বিবাহের উপক্রমণিকা।

"ভবানীর লীলা খেলা ভাবনা-অতীত।
যে ভাব ভাবিয়া ভব আপনি মোহিত॥
দেখ দক্ষালয়ে দেহ করি পরিহার।
হিমাচলে লীলা ছলে কুমারী-আকার॥
মহীয়সী মায়া তাঁর অপরূপ গণি।
মেনকারে মা বলেন জগতজননী॥
গিরিরাণী কন্যা হেরে আনন্দ অন্তরে।
উমা নাম দেন তাঁর অসীম আদরে॥
পৌরজনগণ সব পুলকে পূর্ণিত।
আনন্দে অচলালয় সদা আমোদিত॥
বাড়িছেন শৈলবালা সম শশিকলা।
দিন দিন গিরীপুরী করেন উজ্জ্বলা।"

ঐ পালার একটি গানেরও নমুনা দিতেছি—

"(আজি) গিরিবাসে জান হর সাজি বর,
আনন্দ অপার, পরিহিত বাঘাম্বর,
শিরে শোভে শশধর, উথলিয়া গঙ্গাজল,
ঝরিছে ঝর ঝর।
অমর সকলে হইয়া মিলিত,
অশেষ আমোদে কত আমোদিত,
বরযাত্র জান সবে বরের সহিত
যাহার বাহন যেই তাহাতে করি ভর।
ধাধুম কেটেতাক্, ধাধুম কেটেতাক্, বাজনা বাজিছে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ
ভূতগণ নাচিছে।
বম্ বম্ গালবাদ্য সকলে করিছে,
কোলাহলে কুতুহলে বলিছে হর হর॥"

তখন বৈঠকি মজলিসে চুপির দেওয়ান মহাশয়ের, মুর্শিদাবাদের কালী ভট্টাচার্য্যের,নদীয়ার রাজা শিবচন্দ্রের, আর বাঙ্গলায় বহুপূর্ব্ব হইতে প্রচলিত রামপ্রসাদ নীলকমলের শ্যামাবিষয়িণী গীতি প্রায়ই গীত হইত। পিতার রচিত কতকগুলি শ্যামাবিষয়ের গান বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল। লক্ষ্য করিয়াছি, যে পিতৃ-কৃত একটি শ্যামাবিষয়িণী গীতি, রামপ্রসাদের গানের মধ্যে, অবশ্য রামপ্রসাদের বলিয়াই ছাপা হইয়াছে। গানটি এই—

কেরে কাল কামিনী।
বাস-পরিহারিণী।
চরণে তরুণ অরুণ-নিকর, নখর-নিভাতি নিন্দি নিশাকর,
উরু তরু-রম্ভা নাভী মনোহর, নৃকর কটিতে কিঙ্কিণী।
পীযূষ-পূরিত পীন পয়োধর, পানে পুলকিত সুরাসুর নর,
করেশোভে অসি মুণ্ডাভয় বর, কিবা নর-মুণ্ডমালিনী।
তড়িৎ জিনি হাস্য সুচারু বদনে, খঞ্জন-গঞ্জন যুগল নয়নে,
শিশু-শব সব শোভিত শ্রবণে, কিবা আধশশী-ভালিনী॥
হেরে কাল কান্তি এলো কুন্তলে, কাদম্বিনী কাঁদে বরিষণ ছলে,
বামা গঙ্গাধর হৃদি হ্রদজলে, শোভে যেন নীল-নলিনী॥

পিতার বালককালে গঙ্গাধর নাম ছিল; আমাদের বাড়ীর পাটাতেও ছিল। বৃদ্ধদিগকে গঙ্গাধর বলিতে আমি শুনিয়াছি। স্কুলে গঙ্গাচরণ লেখান হয়—সুতরাং চাকরিতে, কাজেই সর্ব্বত্র, তিনি গঙ্গাচরণ বলিয়াই পরিচিত। গানের ভণিতায় 'গঙ্গাধর' দিলে রস হয়, অনেক সময়ে শ্লেষে রস বৃদ্ধি হয়, সেই জন্য পিতৃকৃত সমস্ত ভণিতাযুক্ত গানে, গঙ্গাধর ভণিতাই আছে।

অনেকগুলি কৃষ্ণবিষয়ক গানও ছিল। পুঁথি বাড়িয়া যায় বলিয়া নমুনা দিলাম না, তবে একটি কৃষ্ণবিষয়ক গান আমি গোবিন্দ অধিকারীকে আসরে গাহিতে শুনিয়াছি, সেটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(সুর—ভুবন ভুলালে আজ ভুবনমোহিনী)
ভুবন ভুলালে হরি লীলার ছলেতে।
সুরাসুর নরনাগ না পায় ভেবে মনেতে॥

চক্রপাণি নীরদ তনু, কভু হাতে শর ধনু,
কভু ব্রজে বাজাও বেণু, চরাও ধেনু গোঠেতে॥
যারে প্রভু ধর পায়, কাঙ্গালিনী কর তায়,
কাঙ্গালিনী তব কৃপায়, বসে সিংহাসনেতে॥

বৈঠকি গানে তখন টপ্পা গানেরও জাঁকজমক খুব। রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু টপ্পার রাজা। এক দিকে শ্রীধর কথকের, অন্যদিকে ছাতু বাবুর টপ্পারও, চল্‌তি সে সময় খুব ছিল। পিতৃদেব কতকগুলি উৎকৃষ্ট টপ্পা গীত রচনা করেন। অনেকগুলি সে সময়ে খুব চলিত ছিল। দুই একটি এখনও চলিত আছে। স্বনামপ্রসিদ্ধ সুলেখক আমাদের স্বগ্রামবাসী, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত দীননাথ ধর গান করিয়া থাকেন।

রাগিণী—ঝিঁঝিট, তাল-কাওয়ালি।

রমণি তোমার গুণে সুখময় এ সংসার,
জগতমোহিনী তুমি জগতের অলঙ্কার।
তুমি যদি এ মহীতে বিধুমুখে না হাসিতে
শশিশূন্য নিশিসম হত সব অন্ধকার॥
তুমি ধনি যেই নরে নাহি হের প্রেমভরে,
নরপতি হয় যদি সংসারে সন্ন্যাস তার।

গারা ভৈরবী-মধ্যমান।

না হয়ে পুরুষ যদি রমণী হইতে,
প্রেম যে কেমন ধন তবে প্রাণ জানিতে।
প্রাণ-প্রেম পরস্পর পুরুষে তা স্বতন্তর,
নারীর জীবন কিন্তু কেবল তার প্রেমেতে।
দেখহ পুরুষ যত থাকে নানা কাজে রত,
ধন, মান, আর কত, অভিলাষ করে চিতে!
রমণী নহে তেমন, প্রেমে মাত্র তার মন,
সে ধনে বঞ্চিত হলে, জানে কেবল কাঁদিতে॥

তখন যাহাকে ব্রহ্মসঙ্গীত বলিত, সেরূপ গানও কয়েকটি পিতৃদেব রচনা করেন। দুইটি নমুনা-স্বরূপ দিতেছি—প্রথমটি সন্দেহ দূরীকরণার্থ; যথা—

ভাবিতে তাঁহারে মন কেনরে সংশয়?
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যাঁর সদা দেয় পরিচয়॥
দিবসেতে দিবাকর, রজনীতে নিশাকর,
আর যত তারাগণ ভ্রমে আর এই কয়,
"এক সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থান,
আমা সবার নির্ম্মাণ সেই প্রভু হতে হয়"।
যদি বল, তারা সবে, ভ্রমে সতত নীরবে,
কেমনে সঙ্গীত তবে তাঁরি গুণ কয়?
কিন্তু রে অবোধ মন কর জ্ঞান কর্ণার্পণ,
সে অপূর্ব্ব কীর্ত্তন শুনিবে নিশ্চয়।
ভাবিতে তাঁহারে মন নাহিক সংশয়,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁর সদা দেয় পরিচয়।

দ্বিতীয় গানটি ভক্তিভরে,—

আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য বাক্যমনো পথাতীত,
ভাবিলে আনন্দ-সিন্ধু হয় মনে উচ্ছুসিত,
এই দেখি প্রভাকরে ভুবন উজ্জ্বল করে,
ক্ষণেক বিলম্ব পরে সব তম আচ্ছাদিত।
কভু প্রভু অকস্মাৎ হয় ঝঞ্ঝাবজ্রপাত,
কভু মন্দ মন্দ বাত সৃষ্টি করে আমোদিত।
এইরূপ তবাদেশে কাল প্রদেশ বিশেষে,
প্রকৃতি বিবিধ-বেশে হয় প্রকাশিত
তুমি প্রভু মূলাধার যা কর তা চমৎকার,
তব মহিমা অপার, তব কার্য্যে পরিচিত।
আশ্চর্য্য তোমার কার্য্য বাক্যমনো পথাতীত,
ভাবিলে আনন্দ সিন্ধু হয় মনে উচ্ছুসিত॥

ব্রহ্মসঙ্গীতের কথায় সেই সময়কার ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা বলিতে হইতেছে। আর পিতার সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পর্কের কথাও বলিতে হইতেছে। পিতা তত্ত্ববোধিনী সভায় নিয়মিত চাঁদা দিতেন; তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা নিয়মিতরূপে গ্রহণ করিতেন, পাঠ করিতেন, আলোচনা করিতেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক আমাদের বাড়ীতে ছিল। প্রথম সংখ্যা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ছিল; আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" ছিল। হিন্দু ব্যবহারে, ব্রাহ্ম ব্যবহারে যে কিছু পার্থক্য আছে, এরূপ কথা শৈশবে আমি জানিতাম না। পিতার ব্যবহারেও কিছু বুঝিতাম না। পত্র কিম্বা কোন কিছু লিখিবার পূর্ব্বে, আমি তখন যত লোক জানিতাম, সকলেই লিখিতেন—"শ্রীশ্রীদুর্গা" বা 'শ্রীশ্রীহরি'। কেবল পিতা লিখিতেন—'শ্রীশো জয়তি।' ইহা যে কেবল পত্রের শিরোভাগে লিখিতেন এমন নহে, সকালে কোন কিছু লিখিবার পূর্ব্বে, এক খণ্ড শাদা কাগজে দুই পঙক্তিতে লিখিতেন শ্রীশো-জয়তি। আমি অতি বালককালেই, সাধারণ হইতে এই বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম; কখন জিজ্ঞাসা করি নাই। পিতার সুহৃদ্‌বর্গ মধ্যে কখন কখন কোন কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ কথা ধরিলে, পিতা বলিতেন 'শ্রীশঃ কি কোন দেবতারই নাম নহে?' ও কথা ঐ রূপেই শেষ হইত। উলায় আমাদের বাসা বাড়ী। তবু সেখানে প্রতিমা গঠন করিয়া সরস্বতী পূজা হইত। এক শ্রীপঞ্চমীতে, সেই-স্থানে আমার হাতে খড়ী হয়, বেশ মনে আছে। আমাদের বাসার অতি নিকটেই মুনসেফি কাছারী ঘর, মেটে আটচালা, খড়িটি করা। সেই কাছারীর খড়িটি করা দাওয়ার চারিদিকের মেজেয় আমি হাতে খড়ির পরদিন, খড়ী দিয়া বড় বড় ক খ লিখিয়া ঘুরিয়াছিলাম, আমার বেশ মনে আছে। উলায় সরস্বতী পূজা হইত, দেশে হইত কার্ত্তিক পূজা। পরে, দুর্গোৎসব হইত। সেত পরের কথা। এখন কেবল ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সহিত পিতার সম্পর্ক দেখাইবার জন্য এই কথা পাড়িলাম। তখন ধর্ম্মের টানে না হোক, তত্ত্ববোধিনীর ভাষার মায়ার অনেকেই তত্ত্ব-বোধনী সভার সভ্য ছিলেন। অক্ষয় কুমার,—বিদ্যাসাগর,—বাঙ্গলার

ছুট বাধা ভালুকো লেখক, তত্ত্ববোধিনীতে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তত্ত্ববোধিনীতে প্রত্নতত্ত্ব, শাস্ত্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা এই সকলের নিয়মিত আলোচনা হইত। স্বদেশ-হিতৈষী সাহিত্যানুরাগী সকলেই তত্ত্ব-বোধিনীর একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। আর যদিও প্রথমে রাজা রামমোহন রায় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তত্ত্ব-বোধিনীতে পৌত্তলিকতার বিরোধ প্রকাশিত হইত না। তখন হিন্দু-ধর্ম্মের ব্রণ বা বিস্ফোটকরূপে একরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম স্ফীত হইয়া উঠে নাই। মধ্যে সেইরূপ হইয়াছিল বটে, এখন বোধ হইতেছে সে ভাব আর নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাসনা পদ্ধতি-খৃষ্টানীর মত। সপ্তাহে, সপ্তাহে, স্থান বিশেষে সমবেত হইয়া আচার্য্যের অধিনায়কতায় সর্ব্বশক্তিমানের শক্তি, মঙ্গলময়ের মাঙ্গল্য স্মরণ করাই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা। তাহাতে হিন্দুর বিরক্তি বোধ করিবার কিছু ছিল না, কখন করেও নাই। অনা-চারের আড়ম্বরে ব্রহ্মধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্ম হইতে পৃথক হইয়া পড়ে; সেটা কলিকাতাতেই বেশী, মফস্বলে সে তরঙ্গ প্রায় যায় নাই। কৃষ্ণনগরে যৎকিঞ্চিৎ গিয়াছিল বটে; হুগলী, বর্দ্ধমানে কিছুমাত্র ছিল না। অনা-চারের সহিত আমাদের কোন সহানুভূতি ছিল না। অনাচারকে ধর্ম্মের অঙ্গ মনে করিতে হইবে, এমন বিড়ম্বনাবুদ্ধি তখনকার কালে আমাদের পরিচিত কাহারও মধ্যে ছিল না। দীর্ঘশিখা শোভিত—, ত্রিপুণ্ড্রকধারী ব্রাহ্মণপণ্ডিত-মণ্ডলী মধ্যে, অথবা তুলসী-ত্রিকণ্ঠি-গল ভূষণ গোস্বামী প্রভুকে লইয়া পিতৃদেব তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতেন; সকলেই আগ্রহে শ্রবণ করিতেন; এবং লিখিত কথার ভক্তিপূর্ব্বক আলো-চনা করিতেন। তবে রাজা রামমোহন রায় অনাচারী ছিলেন, বিলাতে গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়, ব্রহ্মবাদ যাহার তাহার জন্য নহে, কলিকাতার ব্রাহ্মণগণ জাতি মানেন না, আচার বিচার কিছু মানেন না, এ সকল কথাও সময়ে সময়ে হইত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বামন দাস বাবুর ক্রিয়া শীলতায় বীরনগর গ্রাম সনাতন ধর্ম্মের এক প্রকার কেন্দ্রভূমি ছিল, কিন্তু পিতৃদেবের স্বভাবগুণে সেই কেন্দ্রভূমিতে তত্ত্ববোধিনীর প্রতিপত্তি প্রচারের ত্রুটি হয় নাই।

তত্ত্বোধিনী দ্বারাই বাঙ্গালা গদ্যের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ একটু সম্বন্ধ ছিল। তত্ত্ববোধিনীতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই লিখিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়কে ব্রাহ্ম লেখক বলা যাইতে পারে না; অক্ষয়কুমার দত্তকে বলিতেই হইবে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমার দত্ত উভয়েই সাধু বাঙ্গালার লেখক; উঁহাদের দুইজন হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের গৌরব, সে বাঙ্গালা সাধুবাঙ্গালা। কিন্তু প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রথমে লেখনী চালনা করেন, পন্থা প্রদর্শন করেন,—প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুর। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য পড়িতাম, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, প্রচলিত বাঙ্গালা অবহেলার সামগ্রী নহে। তাহার পর সেই সময়েই যখন প্যারীচাঁদ মিত্রের "মাসিক পত্র" পড়িতে পাইলাম, তখনই বুঝিলাম, সে সহজ সরল, চলিত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালা দেশের কথা, বাঙ্গালির ঘরের কথা, বাঙ্গালীর সদাচার অনাচারের কথা, হাসি তামাসার কথা, লিখিলেও সুপাঠ্য গ্রন্থ হয়। অক্ষয়কুমারের বাহ্যবস্তুতে জ্ঞানের কথা পড়িতাম; সকল কথা বুঝিতে পারিতাম না। বিদ্যাসাগরের বেতাল-পঁচিশে পূর্ব্বকালের কথা পড়িতাম। "পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনী নগরে গন্ধর্ব্বসেন নামে এক নরপতি ছিলেন।" "বর্দ্ধমান নগরে রূপসেন নামে এক নরপতি ছিলেন" এইরূপ সকলই সে কালের কথা,—ছিলেন আর করিয়াছিলেন। কিন্তু টেকচাঁদ ঠাকুরে এই কালের, এই বাঙ্গালির, প্রাত্যহিক জীবনের কথা, ঘরকন্নার কথা, সমাজের কথা, সহজ কথায় দেখিতে পাইলাম। সেই শিশুজীবনে অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরের গাম্ভীর্য্যে, রচনাচ্ছটায়, ভাবের ঘটায় ভুলিয়াছিলাম; টেক-চাঁদের বিনা আড়ম্বর সরলতায়ও সেইরূপ বিমুগ্ধ হইলাম। গদ্যের গঙ্গা-যমুনাস্রোত, আর ঈশ্বর গুপ্তের পদ্যের সরস্বতী আমার বাল্যজীবনের প্রয়াগস্থলে সমানে বহিতে লাগিল। আমি সেই মহা সঙ্গমতীর্থে মহানন্দের সহিত হাসিতে হাসিতে কৃতার্থতা লাভ করিলাম।

ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য খৃষ্টানদের বাঙ্গালা মাসিকপত্র ছিল। কলিকাতার ধর্ম্মসভার মাসিকপত্র ছিল। তত্ত্ববোধিনীতে ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনের চর্চ্চা হইত। কিন্তু সামাজিক কথা লইয়া মাসিকপত্রে আন্দোলন

প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম করেন। "মাসিকপত্রে" খণ্ডশ প্রকাশিত হইত,—"আলালের ঘরের দুলাল" "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়, এবং "রামারঞ্জিকা"। পরে এই তিন খানি পৃথক্ পুস্তকরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আলালের ঘরের দুলালে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন চিত্র আছে। ভাল মন্দ দুই আছে। মদ খাওয়া প্রবন্ধে, মদের দোষ নানাভাবে, গল্পের ডাল পালা দিয়া বুঝান হইয়াছে। রামারঞ্জিকায় হরিহর পদ্মাবতী দম্পতি মধ্যে আপনাদের কন্যার শিক্ষার বিষয়ে কথোপকথনচ্ছলে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষ সমর্থিত হইয়াছে। এতৎপূর্ব্বে কাদম্বরীকার তারাশঙ্কর স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে দুই শত টাকা পুরস্কার পান। তাহাতে সেকালে হিন্দুমহিলাগণের মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, ইহাই দেখান হয় এবং একালেও স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া উচিত ইহাও বলা হয়। রামারঞ্জিকাতে মিত্র মহাশয় সেই কথারই বিশদরূপে এবং বিস্তারিতভাবে সমর্থন করেন। আমি উভয় গ্রন্থই সমাদরের সহিত পড়িয়াছিলাম। আমার মাতৃদেব লেখাপড়া জানিতেন; সুতরাং স্ত্রীশিক্ষা লইয়া এত গণ্ডগোল কেন? সেটা বড় বুঝিতে পারি নাই। মনে মনে ভাবিতাম বেটাছেলে যেমন লেখাপড়া শিখিবে, মেয়েরাও ত সেইরূপ লেখাপড়া শিখিবে, তবে আবার ইতরবিশেষ কেন?

বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ মিত্র হইতে এইটী যে কেবল শিখিয়াছিলাম এমন নহে, শব্দের ছটা, ঘটা না করিয়া, সোজা কথাতেও যে অনুপ্রাস আসে, আমি তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আলালের ঘরের দুলালের আরম্ভ "বৈদ্যবাটির বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন"। এত টেনে বুনে অনুপ্রাস নয়; শব্দের ঘটাছটায় মিলন নয়; সহজ কথা সহজে বলিতে গিয়া অনুপ্রাস হইয়াছে।

টেকচাঁদের সারল্যে মুগ্ধ হইয়াছিলাম বটে কিন্তু কেহ বলিয়া না দিলেও তাঁহার গ্রাম্য দোষ—তখন নাম টাম না জানিলেও—একটা দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। 'শ্যামের নাগাল পালাম না গো সই,—ওগো মরমেতে মরে রই,—টক্—টক্—পটাস্—পটাস্, মিয়াজান গাড়োয়ান

এক এক বার গান করিতেছে, টিটকারি দিতেছে ও 'শাগার গরু চলতে পারে না বলে, লেজ মুচড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।" এই লেখা আমার আপনা হইতেই ভাল লাগে নাই। তাহার পর যখন পিতৃদেবের সঙ্গেতে ঐ অংশ পাঠ করিলাম, তিনি শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিলেন। সেই একরূপ সমালোচন। আমি বুঝিলাম এরূপ লেখা প্রশংসনীয় নহে।

এইরূপ হাস্যে ও গাম্ভীর্য্যে আমার শিক্ষা লাভ। বালক কালে কর্ত্তব্যের কঠোরতায় বা শিক্ষকের তাড়নার ভয়ে ভয়ে দায়গ্রস্ত হইয়া আমাকে শিক্ষা লাভ করিতে হয় নাই। সেই আমার পরম সৌভাগ্য, এ সৌভাগ্য অনেকের অদৃষ্টে হয় না। এ সৌভাগ্যের সংযোজক পিতৃদেব। স্বদেশে বিদেশে বহুতর শিক্ষকের কাছে নানারূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি বন্ধুবান্ধবের মধ্যে অনেকে সিদ্ধকাম শিক্ষক আছেন, আপনিও দিনকতক সখের শিক্ষকতা করিয়াছি, আর পাঁচটি পুত্র কন্যা থাকাতে সর্ব্বদাই শিক্ষকতা করিতে হয়, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই পিতৃদেবের মত শিক্ষক আমি আর দেখিলাম না। পুত্র পিতাকে সার্টিফিকেট দিতেছে, সে সার্টিফিকের মূল্য বড় কম, তাহা বুঝি। কিন্তু তাঁহার জীবনীর দশ কথা লিখিতে বসিয়াও যদি এই কথাটা না লিখি, তাহা হইলে মহা অধর্ম্ম হয়, মনে করি। তাঁহার গুণের সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হইল না বলিয়া অধর্ম্ম নহে, এই কথাটা ছাড়িয়া দিলে জীবনী লেখার যে প্রধান উদ্দেশ্য তাহাই বিফল হইয়া যায়। একটি জীবনের ঘটনা হইতে দশটী জীবন আংশিক গঠিত হইতে পারে। আজি কালি শিক্ষকতা দুর্লভ সামগ্রী হইয়াছে। পিতা পিতৃব্য প্রভৃতি বালকগণের স্বাভাবিক শিক্ষক। তাঁহারা অনেক সময়েই আপনাদের 'কার্য্য' লইয়া ব্যস্ত থাকেন। পুত্রের শিক্ষা দানরূপ অকার্য্যে কাজেই তাঁহারা মনযোগ দিতে পারেন না। স্কুলের শিক্ষকেরা ডাইরেক্টার বা প্রিন্সিপল কি বলেন, কি করেন, কি ভাবে কোন্ কার্য্য করিতে বলেন, সেই চিন্তাতেই আকুল। ছাত্রগণ কোন কথা প্রকৃত প্রস্তাবে শিখিতেছে কিনা, তাহা অনুধাবন করিবার সময় তাঁহাদের নাই, প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না। কাজেই ছেলে পিলের শিক্ষা এখন একটা বিশেষ বিড়ম্বনার ব্যাপার হইয়া

উঠিয়াছে। পিতার বিচার আচার, আমোদ প্রমোদ, শিক্ষা পরীক্ষা প্রভৃতি শত কার্য্য থাকিলেও, আমাকে শিক্ষাদান তাঁহার সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্ব প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কাছারীর সময় ছয় ঘণ্টা ছাড়া, বাকি আঠার ঘণ্টা, আমি নিয়তই তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। একত্রে স্নান করিতাম, একত্রে আহার করিতাম, একত্রে শয়ন করিতাম, তাঁহার সেই সন্ধ্যাকালের গরগরম মজলিসের আমি বিনীত অথচ নিয়ত শিশু সভ্য ছিলাম। কখন বলেন নাই যে "অক্ষয় তুমি ও ঘরে গিয়া পড়গে।" গান গল্প হাসি মস্করা, শিশু বলিয়া সমানে ভোগী হইতে পারিতাম না, কিন্তু ভাগী হইতাম। তোমরা বলিবে, ইহাতে শিক্ষার কি হইল? আমি বলি, তুমি সবজজ বাহাদুর বা ডেপুটি মহাশয় অথবা উকীল প্রবর, তুমি দিন কত তোমার একটি ছেলেকে এইরূপ সহবত করিয়া রাখ দেখি. দেখিবে, যে সৎশিক্ষা এখন তুমি অসাধ্য মনে করিতেছ, উহা সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

একজন প্রবীণ আত্মীয় যদি একটি সুকুমার-মতি শিশুকে নিয়ত নিজের সঙ্গে রাখেন এবং সে কি করিতেছে না করিতেছে, তৎপ্রতি অনেক সময় দৃষ্টি রাখেন, তবে সেই বালকের সাধ্য কি, যে সে সেই প্রবীণের প্রদর্শিত পন্থা হইতে অল্পমাত্র বিচলিত হইবে। তাহার উপর, যদি সেই প্রবীণের মনে কোন প্রকার ছাঁচ থাকে, তবে সেই বালকের তরল মন সেই প্রবীণের ছাঁচে কাজে কাজেই ঢালাই হইবে। একজনকার ছাঁচে আর একজনকে ঢালাই করাই—প্রকৃত গুরুমুখী এবং গুরুমুখী শিক্ষাই শিক্ষা। বালকের শিক্ষা অনুকরণ; গুরু ভাল হইলে, সেই শিক্ষা যত গুরুমুখী হয়, ততই প্রবলা ও উজ্জ্বলা হয়। অতএব প্রথম কথা শিক্ষা গুরুমুখী হওয়া চাই এবং সেজন্ত গুরুর সাহচর্য্য একান্ত বাঞ্ছনীয়।

সাহচর্য্য সর্ব্বদা বাঞ্ছনীয় বলিয়া শাসন সামান্তত বাঞ্ছনীয় নহে। সে কালে শাস্ত্র যখন সজীব ছিল, তখন সমস্ত শাসনই শাস্ত্রে ছিল। পিতা-মাতার শাসন, রাজার শাসন, প্রভুর শাসন, শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া গণ্য ছিল না। কোথাও পিতা, কোথাও প্রভু, কোথাও রাজা—শাস্ত্রের শাসন মাত্র, পুত্রের প্রতি, ভৃত্যের প্রতি, প্রজার প্রতি পরিচালনা

করিতেন। সুতরাং তখন ছিল শাসন—কর্ত্তব্যকর্ম্মের একটি অঙ্গ। এখন হইয়াছে অনেক স্থলে অনিষ্ট আশঙ্কায় ক্রোধের পরিচয়। আমার প্রতি সাহচর্য্যের শাসন ছাড়া অন্তরূপ শাসন প্রায়ই ছিল না; তবে পিতার অপ্রীতি বা ক্রোধকে আমি বড়ই ভয় করিতাম। নিয়ত সাহচর্য্যে প্রীতি জন্মায় বা বর্দ্ধিত হয়। আর সম্পর্ক গৌরবজনিত একটি ভয়ভয়ভাব সেই প্রীতির সঙ্গে সঙ্গে থাকে। সেইজন্য পিতামাতা গুরুজনের কাছ হইতে, সাহচর্য্য থাকিলেই, শিক্ষা অতি সহজেই হয়। ক্রীত শিক্ষক বা বেতনভোগী স্কুল মাষ্টারের কাছে সেরূপ হইবার সম্ভাবন নাই। আমাদের এখনকার কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিষ্কর্ম্মা পিতা পিতৃব্য যদিও আপনারা বালককে শিক্ষা দিতে স্বচ্ছন্দে পারেন, তথাপি তাহা না দিয়া এক জন প্রাইবেট টিউটার হস্তে শিশুকে সমর্পণ করেন।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, এক জন বাঙ্গালি ভদ্রলোকের একটী ভাল চাকরী হইলে, বিদেশে তাঁহার বাসায় আর দশ জন আত্মীয় অনাত্মীয় ভদ্রসন্তান থাকিতেন। তাঁহাদের থাকার উদ্দেশ্য কাজ কর্ম্মের উমেদারী। তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ সন্তানেরা আপনা আপনি পাকাদি ক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিয়া লইতেন, অপরেরা হাটবাজারের তত্ত্বাবধান ইত্যাদি করিতেন। তখন ভাল চাকর, অল্প বেতনে যথেষ্ট পাওয়া যাইত। পাচক ব্রাহ্মণ অল্প বা অধিক বেতনে, একেবারেই পাওয়া যাইত না। কৃষ্ণনগরের বা বর্দ্ধমানের রাজবাড়ীতে বেতনভুক্ পাচক ব্রাহ্মণ ছিল না, এমন কথা বলিতেছি না বা বাঙ্গালার কোন বড় মানুষের বাড়ীতে বেতনভুক্ পাচক ছিল না, তাহাও বলিতেছি না, তবে সাধারণত বড় বড় উকীল, মোক্তার বা হাকিমের বাসায় যেরূপ ঘটিত, তাহাই বলিতেছি। আসল কথা ভদ্র ব্রাহ্মণসন্তান বেতন লইয়া পাচকতা করা অত্যন্ত হীনবৃত্তি মনে করিতেন। সুতরাং সে বৃত্তি সহজেই গ্রহণ করিতেন না। আমাদের বাসায় যখন আমার মাতা ও অন্যান্য মেয়ে ছেলেরা থাকিতেন, তখন আমি ও পিতা আমরা অন্তঃপুরে পরিবার মধ্যে পাচিত অন্নগ্রহণ করিতাম। যখন তাঁহারা না থাকিতেন, তখন বহির্বাটিতে ঐ উমেদার গোষ্ঠীগণের পাচিত অন্ন আমরা সমানে সচ্ছন্দে গ্রহণ করিতাম। উমেদারগণের মধ্যে

আহার বেলায়। গ্রামবাসী দীননাথ বসু আমার ঠাকুরদাদা সম্পর্কে ছিলেন। তিনি প্রাতঃকালে পিতার সমক্ষে, পৃথক্ আসনে বসিয়া, আমাকে কাছে লইয়া কসামাজা শিখাইতেন। পিতার দৃষ্টি আমাদের উপরে থাকিত; আমাদের মধ্যে সকল কথা তিনি শুনিতে পাইতেন ও শুনিতেন। সেই সময়ে তিনি দশজনের সঙ্গে নানা কথায় এবং নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও আমাদের নাতি ঠাকুরদাদাকে কখন নজরছাড়া, মনছাড়া করিতেন না। ইহাও একরূপ প্রাইবেট টিউসন; কিন্তু দোতালা বৈঠকখানায় বাবু মহাশয়, আর দালানের পাশে নীচের ঘরে স্যাঁৎসেঁতা মেজেয়, সেগুণের টেবিলের দুই পার্শ্বে ছাত্র এবং 'সার',—সেই একরূপ প্রাইবেট টিউসন।

পিতা শয়নে-ভোজনে আমাকে সঙ্গী করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ঐ সব সময়ে আমি ছিলাম তাঁহার সঙ্গী, আমার খেলার সময়, তিনি আমার সঙ্গী হইতেন। প্রত্যহ বৈকালে, আমার সমবয়স্ক স্কুলের ছেলেরা আসিয়া জুটিত, আমরা হাতে তৈয়ারি কাঠের ব্যাট ও সেলাই করা ন্যাকড়ার বল লইয়া ব্যাটম্‌বম খেলিতাম। পিতা কাছারী হইতে বাসায় গিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, হাত মুখ ধুইয়া, জল খাইয়া, আমাদের খেলায় যোগদান করিতেন। কখন ব্যাট দিয়া বল মারিতেন, কখন বোলারের কার্য্য করিতেন; অন্য খাটা খাটুনী কখন খাটিতেন না। তাঁহার মত গুরুজনের পক্ষে সেরূপ হওয়াই, স্বাভাবিক বলিয়া আমরা বুঝিয়া লইয়াছিলাম।

এক এক দিন সান্ধ্য মজলিস্—আমাকে লইয়াই হইত। ছেলেবুড়া আমরা সকলে মিলিয়া, পরস্পর পরস্পরকে হিঁয়ালী জিজ্ঞাসা করিতাম। কিছু কাল পরে দাঁড়াইয়া গেল যে, আমি একলা অভিমন্যুবৎ এক পক্ষ, আর মহামহা সপ্তরথী সকলেই আমার বিপক্ষ। কিন্তু অভিমন্যুর মত সকল সময় আমার পরাজয় হইত না; আমি এক এক দিন লবকুশের গৌরব রক্ষা করিতাম। আমার পেটে সংস্কৃত, হিন্দি, বাঙ্গালা প্রহেলিকা গজ গজ করিত। ইংরাজী তখন শিখি নাই, বলিলেই হয়, সুতরাং ইংরাজী হিঁয়ালীর ধার ধারিতাম না। কিন্তু

১। এক বর্গ সমুদ্ভূতশ্চতুর্বর্গ ফলপ্রদঃ।
অনুলোম বিলোমেন সদেব পাতু বঃ সদা॥

২। আয় ব্রাদার আজব দিদম্ চার্‌রঙ্গী জানোয়ার।
শের পঞ্জ, চসম্ আহু, ফীল্ গর্দ্দন্, বাঙ্‌খর।

৩। প্রথম অক্ষর নিলাম না, শেষের অক্ষর সেই,
নিরাকার নির্ম্মাত্র ভেদ মাত্র এই;
মধ্যের অক্ষর কহি শুন রায়,
পাপীলোকে বলিলে স্বর্গে তরি যায়॥

৪। হরি হ্যায়, গুণ করি হ্যায়, নও লাখ মতি জড়ি হ্যায়।
বাবুজিকা বাগ্‌মে দোশলা উড়কে খড়ি হ্যায়॥

প্রভৃতি সংস্কৃত, পারসী, বাঙ্গালা, হিন্দি বহুতর প্রহেলিকা আমার কণ্ঠস্থ ছিল; ক্রমে এমন হইল যে, আমাকে আর কেহ হেঁয়ালীতে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। নয় দশ বৎসরের একজন বালক, প্রকাণ্ড প্রহেলিকা-বাজ, বিদ্যা দিগগজ হইয়া উঠিয়াছে। সান্ধ্য মজ্‌লিসে এক এক দিন আমাকে লইয়া শুভঙ্করীর চর্চ্চা হইত। ক্রমে স্ফূর্ত্তির সহিত চালনার গুণে, আমি শুভঙ্করীতেও কীর্ত্তিমন্ত হইয়া উঠিলাম।

আমাদের মুন্‌সেফি কাছারীর একজন উকীল ছিলেন—গুপ্তি পাড়ার নিকট আয়্‌দার রামচন্দ্র দত্ত। তিনি দীর্ঘাকার, বলবান, তেজস্বী পুরুষ। বাঙ্গালায় দলিল-দরখাস্ত আদি নাকি অতি সারগর্ভ ভাষায় সংক্ষেপে লিখিতে পারিতেন। একথা পিতৃদেবের মুখে পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছিলাম বলিয়া বলিতেছি। সেরূপ ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আমার তখন ছিল না। তাঁহার হাতের বাঙ্গালা লেখা অতি পরিষ্কার ছিল। তিনি এক ইঞ্চি, সওয়া ইঞ্চি পরিমিত অক্ষরে আমাকে বাঙ্গলা কাপি লিখিয়া দিতেন, আমি বড় বড় অক্ষরে গোটা গোটা করিয়া ছাপার ছাঁদে লিখিতাম। কি লিখিতাম, তাহা মনে আছে। লিখিতাম—"ঘোর মোহানন্ধকার-হর ঐহিক পারত্রিক মঙ্গলাকর শ্রীগুরুদেব দেবাদি-দেব শ্রীচরণ সরসীরুহ রাজেষু।" এই গোটা গোটা লেখাতেও খেলা করিতাম। চাল চোঁয়াইয়া জলে ফেলিয়া, চোঁয়ানি জল তৈয়ার করিতাম। শাদা কাগজে,

সেই ঈষৎ রক্তিম জলে, ঐ ঘোর মোহানন্ধকার লিখিতাম। কাগজটি বেশ শুকাইলে, সমগ্র কাগজটির উপর কালীর ভুষা দিয়া, হাতে করিয়া ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া, সমগ্র কাগজটা ঘোর চকচকে কাল করিয়া ফেলিতাম। তাহার পর একটা বড় পীঁড়ের উপর সেই কাগজটা রাখিয়া, জলের ছাট মারা হইত। যে স্থানটা চোয়ানী জলের লেখন, সেই স্থানটা শাদা বাহির হইয়া পড়িত; বাকি জমিটা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ থাকিত। সেই কালর ভিতরে শাদা লেখা, আমার একটা খেলা।

আমার খেলার পরিচয় ঐরূপ, ব্যায়ামের পরিচয় ব্যাটমুবল। আর খেলা, ব্যায়াম ও আমোদের জন্য পিতা আমাদের বাড়ীর উঠানে একটি ছোট খাট ফুলের বাগান করিয়া দিয়াছিলেন। আমি সেখানে অল্প-স্বল্প খোঁড়া খুঁড়ি করিতাম, ঘাস নিড়াইতাম; চাকরেরা কূপ হইতে জল তুলিয়া দিলে, সেই জল লইয়া ফুলের গাছে দিতাম। বাগানে প্রজাপতির সঙ্গে খেলা করিতাম, কখন কখন চুপ করিয়া দশবাহু চণ্ডীর সবুজ লীলা প্রাণ ভরিয়া দেখিতাম, কখন বা মল্লিকার মালা করিয়া আমাদের বৈঠকখানায় রাখিয়া আসিতাম।

উলায় থাকিবার সময়ে, আমি ইংরাজী অতি অল্পই পড়িয়াছিলাম; কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছিলাম বুঝিয়া-সুঝিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি পড়িয়াছিলাম, ফার্ষ্ট নম্বর ও সেকেণ্ড নম্বর স্পেলিং, ফার্ষ্ট নম্বর রিডারের বার আনা, সেকেণ্ড নম্বর রিডারের অর্দ্ধেক। ইংরাজী ঐ পর্য্যন্ত; অঙ্ক বিষয়ে বাঙ্গালায় শিখিয়াছিলাম সমস্ত শুভঙ্করী ও ইংরাজী মতে সামান্য ও দশমিক ভগ্নাংশ। বাঙ্গালায় পিয়ারসনের ভূগোল আর ইয়েটস্ পদার্থবিদ্যা; বাঙ্গলা সাহিত্যের পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়াছি।

আমার শিক্ষা বিষয়ে পিতৃদেব কি রকম উপকরণ উপস্থাপিত করেন ও কি রকম প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন, তাহার কতক পরিচয় দেওয়া হইল। পদ্ধতির মধ্যে আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে, আমি খেলাধুলো, আমোদ-প্রমোদ যথেষ্ট করিতাম, কিন্তু সকলই পিতার সমক্ষে, তাঁহার নজরের উপর। উপকরণ সম্বন্ধে বিশেষত্ব এই যে, তাল ছাপার ভাল কাগজে যে সকল গদ্য, পদ্য পুস্তক সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে

সমস্তই দেখিতে পড়িতে ঘাঁটিতে আমি পাইতাম ; বটতলার ছাপার এক খানিও পুস্তক আমার সম্মুখে কখন আসে নাই । আমি দেখিতে বা পড়িতে পাই নাই । তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, এক দিকে যেমন কুৎসিত পুস্তক একখানিও আমি পড়ি নাই, সেইরূপ কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবি-কঙ্কণ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থ হইতে আমি বঞ্চিত ছিলাম । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃপায় অন্নদা-মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দরের এবং 'সু''কু' আমার সকলই উদরস্থ ছিল ।

আমার লেখাপড়া শিক্ষার প্রকরণ ও উপকরণের কথা বলিলাম। আমার আচার-ব্যবহার শিক্ষার প্রধান উপকরণ—পিতা স্বয়ং । এই সকল শিক্ষা—চরিত্র গঠন—যেমন দৃষ্টান্তে হয়, এমন আর কিছুতেই নয় । পিতৃদেবে বিলাস, বাবুয়ানা, দম্ভ, দর্প—এ সকল কিছুই ছিল না। শাদা-সিধা ডাল ভাত তরকারী, চলন-সই কাপড়, চাদর, জামা, জুতা—এই সকলই তাঁহার নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী ছিল । ভাল খাওয়া হইত, অতিথি অভ্যাগত আসিলে । ভাল পরা পরিতাম, পূজা পার্ব্বণে । নিত্য ব্যবহারে সকলই শাদা-সিধা । এই যে শাদা-সিধা কাপড়-চাদর ইহার মধ্যে বিলাতীর সংস্রব ছিল না । তা যে একটা ধর্ম্ম, বা কর্ত্তব্য, বা দেশ-হিতৈষীতা, তা বলিয়া নয়, আপনা-আপনিই, তাহাই আমাদের অভ্যাস ছিল । বিলাতী কাপড়ের জামা ছিল,—কিন্তু সেটা যে একটা দূষণীয় পদার্থ, তাহা কখন ভাবি নাই, ভাবিতে কেহ বলেন নাই । আমাদের এখানে, চুঁচুড়া, ফরাস ডাঙ্গায়, দেশী কাপড়-চাদরের অভাব ছিল না। থাকিতাম উলায়, শান্তিপুর অতি নিকটে, সেখানেও দেশী কাপড়-চাদর বিস্তর, কাজেই আমরা দেশী বস্ত্রই ব্যবহার করিতাম । যে বৎসর পিতা সিনিয়র স্কলরশিপ পরীক্ষা দিয়া শান্তিপুরে প্রথম বেড়াইতে যান, সেই বৎসর শান্তিপুর হইতে তিন লক্ষ টাকার থান রপ্তানি হইয়াছিল। এখন পালা উল্টাইয়া গিয়াছে । তাঁতিতে থান বুনিতে ভুলিয়াছে, দেশ-হিতৈষীতার দোহাই দিয়া এখন ছেলে পিলেকে দেশী কাপড় ব্যবহার করাইতে হয় । আমাদের এরূপ বিচিত্র শিক্ষা হয় নাই ।

পিতাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতাম ; পিতাহি পরমং তপঃ—

এ সকল জানিতাম না। শাস্ত্র জানিলে, তবে পিতৃভক্তি হয়—এ বিড়ম্বনাতেও কখন পড়ি নাই। পিতা—সরল, সংযমী, সদালাপী, মিতাচারী ছিলেন, আমি বালক হইলেও তাঁহারই মত স্বভাব পাইয়াছিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে পিতৃজীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল আমার সৎশিক্ষা। তাঁহার গুরুতর রাজকার্য্য তিনি নিকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তাঁহার জীবনের এই ভাগের বর্ণনায় আমার শিক্ষার কথাই বেশী বলিতে হইল। তাহাতে বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবায় তাঁহার অনুরাগও বুঝিতে পারা গেল।

এই স্থলে আর একটি কথা বলা বিশেষ আবশ্যক। পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে, আদালতে বাঙ্গালা, এক বিকুৎসিত ব্যাপার ছিল। এক পৃষ্ঠা দরখাস্তে একটি সমাপিকা ক্রিয়া থাকিত। "এতাবতা" "বিধায়" ইত্যাদি শব্দ দিয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ লাগাইয়া বাঙ্গালা ভাষার এবারৎ বা ষ্টাইল একটি বিষম গোলকধাঁধাঁ করিয়া তোলা হইত। বাঙ্গালা লেখার জন্য ষত্ব ণত্ব জ্ঞান থাকা আবশ্যক ছিল না। ঞর আকার (া) দিয়া হঞা (হইয়া) ওয়ে আকার দিয়া হওা (হওয়া) সর্ব্বদাই থাকিত। লেখকেরা কেহ বিশুদ্ধ বানানের ধার ধারিত না। ব্যাকরণ কাহাকে বলে জানিত না। গেরর উপর গের দিয়া, প্যাঁচের উপর প্যাঁচ দিয়া, জটিল-কুটিল দুর্ব্বোধ একটা কারখানা করিতে পারিলেই, লেখক বড় মুন্সি হইতেন। লেখকদিগের বুদ্ধি ছিল না এমন নহে; কিন্তু ঘোর-ফের করিয়া যে যত ভাষা অস্পষ্ট করিতে পারিত, তাহার মুন্সিয়ানা বুদ্ধির ততই প্রশংসা হইত। তাহার পর নির্ব্বুদ্ধিতাও যথেষ্ট ছিল। একজন উচ্চ কর্ম্মচারী তাহার উপরিস্থ আর একজন উচ্চতর কর্ম্মচারীকে লিখিলেন—"পুলিশ সাহেবের আশায় দস্যুরা পলায়ন করিল।" বড় সাহেব বাহাদুর অভিধান দেখিয়া জানিলেন সে 'আশা' অর্থে ইচ্ছা; অতএব বুঝিলেন, পুলিশ সাহেবের ইচ্ছাক্রমে ডাকাতরা পলাইয়াছে। সুতরাং পুলিশ সাহেব সস্পেণ্ড হইলেন, মহাতুমুল হইয়া উঠিল। লেখা উচিত ছিল "পুলিশ সাহেব আসাতে, তাহা না লিখিয়া "পুলিশ সাহেবের আশায়" লেখাতেই এত

এরূপ সর্ব্বদাই হইত। এই সকল বিড়ম্বনা দূরীকরণার্থ পিতা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। আহেলে মামলা, মুহুরি আমলা, উকীল মোক্তার সকলেরই কার্য্যে তাঁহাদের ত্রুটি দেখাইয়া দিয়া, তাঁহাদের ভাষা সংশোধন করিয়া দিতেন ; আর ভবিষ্যতে সেরূপ না হয়, তাহার জন্য সৎ-উপদেশ প্রদান করিতেন। আমার শিক্ষা-তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। যাহাদের লেখার প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা সহজে সরল ভাবে লিখিতে পারে, তাহার জন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা শিক্ষাদান, তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল : পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি চারিটি বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। কাছারী তাঁহার স্থাপিত নহে বটে, কিন্তু সেটি পঞ্চম স্কুল। সেখানে ষত্ব, ণত্ব ব্যাকরণ কিছু শিখাইতেন না বটে, কিন্তু লেখার রীতি, কায়দা ও লেখার মধ্যেও যে একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে, সেই ভাবটা— সর্ব্বদাই বুঝাইয়া দিতেন। আর কোন বিষয়েই সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হওয়া পিতৃদেব গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন না, তবে সাধারণত, যাহাতে শিক্ষা বিস্তার হয়, এবং চলিত লেখা-পড়ায় যাহাতে অধিকতর বিশুদ্ধি, সারল্য, প্রাঞ্জলতা এবং বুদ্ধি বিচার থাকে, তজ্জন্য তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই স্থলেই তিনি সংস্কারক। যখন যে জেলায় গিয়াছেন, সেই খানেই যাহাতে ভাষার সংস্কার হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। যে ভাষায় তিনি সাক্ষীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা অবিকল সাক্ষীর কথা হইলেও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা হইত। সাধারণ লোক কখন বাঙ্গালা বলিতে ভুলে না। আমাদের সহর-অঞ্চলে কখন কখন বলে বটে "ঠাকুর মহাশয় চলে গেল, তার জুতজোড়াটা পড়ে রইলেন" কিন্তু তখন তাহারা আমাদের অনুকরণ করিতে যায়, অর্থাৎ সাধুভাষা বলিতে যায়; গিয়া ভুল করে।

তাঁহার সাক্ষীর জবানবন্দি-অতি পরিষ্কার বিশুদ্ধ সহজ বাঙ্গালা। সমস্ত হুকুম নিজে লিখিয়া দিতেন, সাধারণত মোকর্দ্দামার রায় বাঙ্গালাতেই লিখিতেন, তাহা অতি প্রাঞ্জল বাঙ্গালা হইলেও বিশেষ প্রগাঢ় হইত। তাঁহার সেই আদর্শ বাঙ্গালা লেখার সংক্রামকতাগুণ ছিল ; কাজেই উকীল মোক্তার

মুনুসেফি অবস্থার কথা বলিতেছি। তিনি যখন সদর আলা হইলেন, তখন বাঙ্গালায় বিশ বৎসর বিশুদ্ধ বাঙ্গালার চর্চ্চা হইয়াছে; ঢাকার একজন এম, এ কে পিতৃদেব কিছুদিনের জন্য সব জজের সেরেস্তাদরী পদে নিযুক্ত করেন। তখন আর বাঙ্গালার ভাবনা তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তখন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষা দেশে শিকড় গাড়িয়াছে। ছাত্রবৃত্তিপাশ শত শত যুবক রাজকীয় কর্ম্মাগারে নানা কর্ম্ম করিতেছেন। উলা, পানিহাটা, জাহানাবাদ, সাতক্ষীরা, এই সকল স্থানে পিতৃদেবকে বাঙ্গলা ভাষার সংস্কারের কার্য্য করিতে হইয়াছিল। এই সংস্কার কার্য্যের প্রধান অধিষ্ঠান-ক্ষেত্রে উলা, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ-মণ্ডলীর আবাস ভূমি। ব্রাহ্মণ সন্তানগণ সকলেই লেখা পড়া শিখিতেন। হাতের লেখা গোটা গোটা পরিষ্কার উজ্জ্বল ছিল। বালকেরা আগ্রহ-সহকারে স্কুলে যত্ব ণত্ব ব্যাকরণ শিখিতে লাগিল। যুবক উমেদার-গোষ্ঠী, কাছারীতে আসিল, বাঙ্গলা লেখার এবারৎ দোরস্ত করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উকীল রামচন্দ্র দত্ত বাঙ্গলা এবারতে খুব মজবুত ছিলেন, তিনিও খুব আগ্রহ সহকারে এবিষয়ে পিতৃদেবের সহায়তা করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম হাকিমের মনোরঞ্জন-কারী বলিয়া কেহ কেহ ইঙ্গিতে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। কিছু দিন পরে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করিল; এবং এই কার্য্যের জন্য সকলেই পিতৃদেবকে ও রামচন্দ্র দত্তকে মনে মনে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

আমার শিক্ষার জন্য পিতৃদেব কিরূপ প্রকরণ-পদ্ধতি অবলম্বন করেন ও কিরূপ উপকরণ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন আমার কীর্ত্তির একটু পরিচয় দিতে ক্ষতি কি? যে সকল পুস্তক পড়িতাম, সে সকল পুস্তকের মধ্যে যে সকল দুরূহ শব্দ থাকিত, সেই-গুলি একখানি খাতায় একদিকে লিখিতাম ও শব্দার্থ পিতার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়া তাহার পার্শ্বে লিখিতাম। কখন কখন পিতৃদেব স্বহস্তেও পার্শ্বে অর্থ লিখিয়া দিতেন। এমনি করিয়া অনেকগুলি খাতা

ইচ্ছা হইয়াছিল। এই ইচ্ছার মধ্যে কতটা ছেলেমি ছিল, আর কতটা দুরাকাজ্ক্ষার বীজ ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলা একরূপ অসাধ্য। আমাদের বাড়িতে 'শব্দাম্বুধি' অভিধান ছিল। আমি কাজে কাজেই, শব্দসাগর' সঙ্কলন করিতে সঙ্কল্প করিলাম, সঙ্কল্প মত কার্য্য হইল। অভিধানের পরিচয়-পৃষ্ঠা এইরূপ—

"শব্দসাগর"

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রণীত।

সংবৎ ১৯১৩

শকাব্দা ১৭৭৮

সাল ১২৬৩

খ্রীষ্টীয় শাক ১৮৫৬

এই গ্রন্থে নানাবিধ পুস্তক হইতে দুরূহ শব্দ সঙ্কলনপূর্ব্বক তদর্থ তৎপৃষ্ঠে লিখিত হইয়াছে।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় 'কর্ত্তৃক প্রণীত' লিখিতেন, আমিও লিখিয়াছি। কেহ সংবৎ, কেহ শকাব্দা, কেহ সাল, কেহ খৃষ্টাব্দ দিতেন, আমি সবকটাই দিয়াছি। আর গ্রন্থের পরিচয় সর্ব্বশেষে দিয়াছি। তবে "এই গ্রন্থ" শব্দের কারক কিরূপে মিটিল, তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই গোল আরও স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, সেই ভূমিকা পৃষ্ঠার অবিকল প্রতিরূপ এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

এখানে দেখিবেন কর্ত্তৃবাচ্যে আরম্ভ হইয়া ভাববাচ্যে বাক্য শেষ হইয়াছে। আমার নামের পূর্ব্বে অধীন শব্দটীও লক্ষ্যের বিষয়। অক্ষয় শব্দের মোড়া 'অ'টি লক্ষ্যের বিষয়। মোড়া 'অ' দেবনাগর 'অ' তখন একটু আধটু চলিত। 'ক্ষ' পরে আছে, 'অ'টি দেবনাগর করিয়া দিলে, লেখাটি খুব ঘোরাল-ফেরাল হয়, এই জন্য রামচন্দ্র দত্ত আমাকে ঐরূপ লিখিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। শব্দসাগরের শকুন্তলা ভাগের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিব।

নান্দী	...	নাটকের প্রথমে আশীর্ব্বাদ-সূচক বাক্য।
সূত্রধার	...	প্রধান নট।
নেপথ্য	...	সাজঘর।
আর্য্যা	...	শ্রেষ্ঠা স্ত্রী।
আর্য্যপুত্র	...	স্বামী।
অভিনয়	...	ভাব প্রকাশ করা।
প্রস্তাবনা	...	আরম্ভ, ভূমিকা।
অপবার্য্য	...	ফিরিয়া।
বিষ্কম্ভক	...	প্রথমে পূর্ব্ব কথার স্মরণ করিয়া দিয়া যে বিষয়ের অভিনয় হইবে তাহার ভাবি কথার অংশকে যাহা সূচনা করিয়া দেয়। ইত্যাদি—।

অধিক নমুনা দেবার প্রয়োজন নাই।

শুনিয়াছি নাকি, হাতের লেখায় মানব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। মানব চরিত্রে বৈচিত্র আছে বলিয়াই, হাতের লেখায় বৈচিত্র আছে। যে ছোট ছোট গুজিবুজি লেখে, তাহার চিত্তও নাকি সঙ্কুচিত এবং জটিলতাময়। যে বড় বড় করিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে গোটা গোটা লেখে, জোয়াল টানে কলম টানে, তাহার নাকি উদার হৃদয় এবং বিশাল সাহস। নেপোলিয়ন খুব তেজ কলমে গোটা গোটা অক্ষরে নাম সহি করিতেন। ওয়াটারলুতে বিষম বিপর্য্যস্ত হইয়া, তাঁহার দস্তখতের টান নাকি নিস্তেজ হইয়াছিল। শেষের এন এর শেষ টান নাকি ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। জানিনা, এ সকল কথা কতদূর সত্য। আমার দশম বৎসরের জীবনের হিজিবিজির অবিকল প্রতিরূপ দিলাম। চরিত্রের পরিচয় এখন আপনারা বুঝিয়া লউন।

এই যে ভূমিকার তারিখ, শকাব্দা ১৭৭৮, ২৮শে আশ্বিন; আমার উলা জীবনের এই শেষ সময়। ইহার পর বেশীদিন আমরা আর উলায় ছিলাম

না। আমি ত আর যাই নাই। যে রামচন্দ্র দত্ত আমাকে হস্তাক্ষর শিক্ষা দিয়াছিলেন, একদিন হঠাৎ শুনিলাম তিনি অকাস্মাৎ মহাপীড়িত। শুনিয়া চাপরাসির সঙ্গে বৈকালে দেখিতে গেলাম। উলার প্রায় দক্ষিণ পশ্চিম সীমায় বাজারের সংলগ্ন একটি ছোট একতালা কুঠারিতে—তিনি বাস করিতেন। তখন পূজার পূর্ব্বে উলার চারিদিকে জলে জলময়। চারিদিকের মাঠ ছাপাইয়া গ্রামে কানায় কানায় জল উঠিয়াছে। দত্তজার সেই কুঠরিটি দেখিলাম অত্যন্ত সেঁতা। সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে, একদিকে চৌকীর উপর সদাশয় দত্ত মহাশয় অসাড় পড়িয়া আছেন; চিত হইয়া পড়িয়া আছেন; হস্তপাদাদি নাড়িতেছেন না। আমাকে চিনিতে পারিলেন—দুই চারিটি কথায় আশীর্ব্বাদ করিলেন, চাপরাসি আমাকে লইয়া চলিয়া আসিল। মৃত্যুর পূর্ব্বগামিনী ছায়ার সঙ্গে, সেই আমার প্রথম পরিচয়। উদাস প্রাণে নয়, ভয়া প্রাণে আমি বাসায় আসিলাম! সে রাত্রি পড়িতে শুনিতে পারিলাম না। পরদিন প্রত্যুষে শুনিলাম, দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিন দিনের জ্বরে দত্ত মহাশয়ের মৃত্যু হয়। তখন কাছারীর ছুটি হয় নাই। পিতা ছুটির অপেক্ষায় দুই চারি দিন রহিলেন। আমি, মাতা ও পরিবারের আর আর সকলে চলিয়া আসিলাম। উলায় তখন বিষম মহামারী আরম্ভ হইয়াছে। আট লক্ষ লোক পূর্ণ কলিকাতায় কোন দিন দুই শত লোকের মৃত্যু হইলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়; আর দশ হাজার অধিবাসীর বাসস্থান উলায়, প্রত্যহ দুই শত লোক নীরবে মরিতে লাগিল। পূজার পর পিতা রাণাঘাটে কাছারী উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এখনও সেই রাণাঘাটে আছে।

এই যে আমরা উলায় ছিলাম, ইহা ক্রমশভাবে বা একাদিলাগাড়ে নহে। ৺শারদীয়া পূজার ছুটী হইলে, পিতার সহিত বাড়ী আসিতাম, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সময় পিতৃদেব চলিয়া যাইতেন, আমরা অর্থাৎ মাতা, আমি প্রভৃতি কার্ত্তিক পূজা করিয়া, অগ্রহায়ণে নবান্ন সারিয়া, পৌষে পিঠা পার্ব্বণ খাইয়া, মাঘ মাসে উলায় যাইতাম। হেমন্ত ও শীত আমাদের চুঁচুড়ায় কাটিত। চুঁচুড়ার বাস, আমার সহরে বাস হইত। উলায় বাস আমার

পল্লীবাস ছিল। চুঁচুড়ায় গঙ্গা দেখিতাম, কলেজ দেখিতাম, লাল গোরা পিল পিল করিতেছে, এমন বারিক দেখিতাম; পালেদের বাড়ীর পার্শ্বে হোটেলের পূতিগন্ধের ঘ্রাণ লইয়া নাকে কাপড় চাপা দিতাম। দুর্গাপ্রসন্ন কাকা প্রভৃতি পাড়ার বর্ষীয়ান্ বালকেরা, আমার সঙ্গী হইয়া আমার সহুরে-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করাইয়া দিতেন। দুই বার অগ্রহায়ণ, পৌষ, তাহা হইলেই হইল চারি মাস। আমি পাড়ার প্রেমচাঁদ মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়াছিলাম। পৌষপার্ব্বণ পালার ভিতর পড়িত, দুই বারই গুরুমহাশয়কে চাল, ডাল, নারিকেল, গুড়, তিল, তিলের ছাঁই, রাঙ্গা আলু, গোল আলু প্রভৃতি পৌষের সিধা দিতে হইয়াছিল, আমার বেশ মনে আছে। সিধার সঙ্গে এক এক বোঝা সুঁদরী কাঠও দিতাম। শাস্ত্রমত তামাক চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দেওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই। বাড়ীর মধ্যে তামাক-খেক পুরুষ-সাধু চাকর। সে প্রত্যহ ১০ কড়ার তামাক পাইত, তাহা হইতে চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দেওয়া বড়ই কঠিন ও নিষ্ঠুর কার্য্য হইত। এই সকল বুঝিয়া সুঝিয়াই বোধ করি ঐরূপ কার্য্যে গুরুমহাশয় আমাকে কখন ব্রতী করেন নাই

এবার যখন উলা হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখনত আমি দ্বিগ্‌গজ পণ্ডিত। পাঠশালার সমবয়সী ছেলেদের, বানানে ঠকাইয়া দিই, মানেতে ঠকাইয়া দিই। তবে দুই একজন তিলি-জাতীয় ছাত্রের হাতের লেখা আমাপেক্ষা ভাল হইয়াছিল। পূজার পর পিতৃদেব রাণাঘাটে চলিয়া গেলেন। তাঁহার নিকট হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্তির একরূপ সমাধান হইল। কুসংসর্গে নষ্ট না হইয়া যাই, এরূপ শিক্ষা তিনি আমাকে দিয়াছিলেন। সদা সত্য কথা কহিবে, মিথ্যা কথা কহিবে না। এরূপ করিয়া তিনি আমাকে কখন শিক্ষা দেন নাই। শিক্ষা হয় দৃষ্টান্তে, কেবল উপদেশে নহে। তিনি আমাকে যে বিচিত্রা শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই শিক্ষার গুণে আমি কুসংসর্গ প্রুফ হইয়াছিলাম। কুসংসর্গে আমাকে নষ্ট করিতে পারিত না। এই শিক্ষার কথা বহুদিন পরে, পিতার মুখে শুনিয়া এবং বুঝিয়া, আমি সাধারণীতে প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলাম এবং পরে, 'আলোচনা' পুস্তকে সেই প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। দুই পঙক্তি

তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "মনুষ্যজীবনের প্রথম শিক্ষা—অহঙ্কার, আত্মগৌরব, আপনার উপর শ্রদ্ধা, আপনার উপর বিশ্বাস। কুসংসর্গে লোক মন্দ হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহার মনে নিয়মিত অহঙ্কার নাই, সেই উচ্ছিন্ন যায়।" পিতা হৃদয়ের মধ্যে এই আত্ম-গৌরবের অঙ্কুর প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতেই চারি দিকে অনাচার অত্যাচারের বিষম দৃষ্টান্ত থাকিতেও, আমি দশ বৎসরের বালক, সেই সময় হইতে সমস্ত কিশোর কাল, অনড় অচল ছিলাম।

পূজার কিছুকাল পরেই কালেজের পরীক্ষার সময়। আমি একেবারে গ্রীষ্মের ছুটীর পর, যেদিন সিপাহীরা ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে বিষম বিদ্রোহ ঘোষণা করে, ১৮৫৭ সালের ২রা জুন, সেই দিন আমি হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে সেকেণ্ড নম্বর রীডারের ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম।

পর দশবৎসরে, কিরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট কলে, ঘৃষ্ট ও পিষ্ট হইয়া একটী অদ্ভুত ম্যালেরিয়া-পূর্ণ কুষ্ণের জীবভাবে ১৮৬৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সে সকল কথা কিছু বলিব না। তবে এই দশ বৎসর কালের মধ্যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের কি শিক্ষা পাইলাম, তাহা বলা কর্ত্তব্য মনে করি।

তখন বাঙ্গালায় সঙ্গীত বলিয়া একটা জীবন্ত জিনিস ছিল। কবির গান নিস্তব্ধ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু যাত্রা পাঁচালী খুব আসর জমকাইয়া বসিয়াছিল। আমাদের পাড়াতেই পাঁচালীর দল ছিল। আর চুঁচুড়া ,ফরেসডাঙ্গায় যাত্রা, পাঁচলীর আড্ডা ছিল। তাহা ছাড়া পথে ঘাটে সর্ব্বদাই লোকে গান গাহিতে গাহিতে যাইত; রাত্রিতে ত বটেই। পড়িবার সময় ছাড়া, অন্য সময়ে, চারিদিক চাহিয়া দেখা ও সকল কথা কাণ খাড়া করিয়া শুনা, আমার অভ্যাস হইয়াছিল। বহুতর বাঙ্গালা গান আমার মুখস্ত হইয়াছিল। রাত্রি জাগরণ করিয়া যাত্রা শুনা,—বৎসরে দুই দিনও শুনিতাম না। এমনি দিবা ও সান্ধ্য গানে, আমার মগজ ভরপুর ছিল। পুর্ব্বেই বলিয়াছি হুগলি কলেজে বাঙ্গালা, শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যবস্থা হইতে উপকার

লাভ করিবার আমার ক্ষমতা হইয়াছিল। আমি উপকৃতও হইয়াছিলাম। আমরা পড়িতাম 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ।' এই ব্যাকরণের কথা, শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, একটী গ্রন্থ-তত্ত্ব-প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শত শত বালক ঐ ব্যাকরণ যে কণ্ঠস্থ করিত, তাহা বোধ হয় ত্রিবেদী কখন শুনেন নাই। ত্রিবেদী-গ্রন্থকারের নাম লিখিয়াছেন—শ্রীভগবান্ চন্দ্র সেন। ঠিক কথা, কিন্তু ১৮৫৭ সাল হইতে মুদ্রিত পুস্তকে 'শ্রীভগবৎচন্দ্র বিশারদ-প্রণীত' বলিয়া ছাপা হইয়াছে। এই ভগবান্-চন্দ্র সেন বা ভগবৎচন্দ্র বিশারদের কাছে, আমরা এন্‌ট্রান্স ক্লাসে ১৮৬২ সালে পড়িয়াছিলাম। আর তাঁহার ব্যাকরণ সমস্ত কিশোর জীবনে অভ্যাস করিয়াছিলাম। মুগ্ধবোধ হইতে যে কৃৎ, তদ্ধিত, ও স্ত্রীত্ব পড়িয়াছে, তাহাকে বাঙ্গালা লেখায় হঠাৎ ব্যাকরণে ঠকিতে হয় না। হুগলী কলেজের নীচের ক্লাসে কয়েক জন ভাল ভাল পণ্ডিত ছিলেন। এখনকার প্রসিদ্ধ বিপিনবিহারী গুপ্তের পিতা ৺ গোবিন্দ গুপ্ত তন্মধ্যে এক জন। স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই, তাঁহার হস্তে পড়িলাম। তিনি বড় সংশিক্ষক ছিলেন। তাঁহার কাছে আমি বিশেষরূপে ঋণী। সেইরূপ হরচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের কাছেও ঋণী। ভগবৎচন্দ্রের নাম পূর্ব্বেই করিয়াছি। তাঁহার উপর ছিলেন গোবিন্দচন্দ্র শিরোমণি। ইহার নিকট আমি মুগ্ধবোধ শিক্ষা করিতাম। তিনি অগ্রে হেড পণ্ডিত ছিলেন, পরে প্রফেসর হন। পিতৃদেবও তাঁহার নিকট কলেজে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা দুই পুরুষে, তাঁহার নিকট ও প্রসিদ্ধ প্রফেসর ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী। সংস্কৃত সাঙ্গালার জন্য আর আমি ছাত্র জীবনে শেষ ঋণী—৺ গোপাল চন্দ্র গুপ্তের নিকট ও শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের নিকট। সকলেই জানেন, তিনি এখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর বাইস চেয়্যারম্যান। কৃষ্ণবন্দ্যোর 'ষড়-দর্শন সংবাদ' আমাদের বি এর অন্যতম পাঠ্য ছিল। তাঁহার পদ-মূলে বসিয়াই সংস্কৃত দর্শনে যৎকিঞ্চিৎ প্রবেশ লাভ করি।

স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া দেখিলাম, সুবোধিনীনামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র কলেজের অতি নিকটে চৌমাথা হইতে প্রকাশিত হয়।

সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিত—বাঙ্গালার হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ। ওবারসিয়র পরীক্ষা পাস করা। সংস্কৃত, বাঙ্গালা বেশ জানিতেন। সরল, প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ সাধুভাষায়, সুবোধিনী ছাপা হইত। ফুল্‌স্ক্যাপ আকারের কাগজ; দুই স্তম্ভে। যাঁহারা সাধারণী দেখিয়াছেন, তাঁহারা এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সে সুবোধিনী আকারে প্রকারে সাধারণীর আদর্শ।

সুবোধিনীতে ঈশ্বর গুপ্তের ছাত্রশ্রেণী অনেকেই পদ্য লিখিতেন। তন্মধ্যে কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়কে এবং মাত্রালের গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বোধ হয় কেহ কেহ এখনও স্মরণ রাখিতে পারেন। অভয়চন্দ্র পাঁড়েকে বোধ হয়, সকলেই ভুলিয়াছেন। তিনি সম্পাদক রামচন্দ্র দিচ্ছিতের মামাত কি পিস্তুত ভাই ছিলেন। আর আমাদের তিন ক্লাস উপরে হুগলি কালেজের ছাত্র ছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সেটি সিপাহী সমরের সময়। পাঁড়েজী পদ্য লিখিতেছেন ;—

"জয় [redacted]র জয় জয় ব্রিটিশের জয়
যতেক বিদ্রোহিদল, যাক্ সব রসাতল,
প্রবল [redacted] বল, হউক অক্ষয়,
বল হউক অক্ষয়।
জয় [redacted] জয়, জয় ব্রি[redacted] জয়।"

স্কুলের প্রথমাবস্থায়, সংবাদপত্রের মধ্যে, এই সুবোধিনী আমার প্রধান সম্বল ছিল। এডুকেশন গেজেট বা প্রভাকর আর দেখিতে বা পড়িতে পাইতাম না। এ অঞ্চলে কৃত্তিবাস কাশীদাসের ভূয়ো প্রচলন ছিল। ঐ সকল পুস্তক এবং বটতলার প্রকাশিত রজনীকান্ত, জীবনতারা প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক আমি পাঠ করিয়াছিলাম। কাশীদাস কৃত্তিবাসের অনেক স্থলই মুখস্থ করিয়াছিলাম। এটি পড়িবে, উটি পড়িবে না, আমার মাথার উপর এমন কেহ বলিবার ছিলেন না, আমিও ভাল-মন্দ সমস্তই গলাধঃকরণ করিতাম। তখন একরূপ মুসলমানী বাঙ্গলা সাহিত্য, জীবন্ত ছিল। কাজি সফিউদ্দীন নামে কোন মুসলমান সেই সকল বটতলা হইতে প্রকাশ করিতেন। চাহার-দরবেশ, গোলে-বকোয়ালি,

ইসপ্-জেলেখাঁ, হাতেম-তাই প্রভৃতি সেই সকল মুসলমানী বাঙ্গালা গ্রন্থও গলাধঃকরণ করিতে আমি ছাড়ি নাই।

স্কুলে পড়িবার সময়েই, বৈষ্ণব-সাহিত্য এবং সংকীর্ত্তনের দিকে আমার মন আকৃষ্ট হয়। তবে তৎপূর্ব্বে যে উলায় থাকিবার সময়েও ঐ টানের কিছু অঙ্কুর জন্মে নাই, এমন কথা নহে। উলায় দেওয়ান মুখুয্যে মহাশয়দের নগর-সংকীর্ত্তন খুব ভক্তিপূর্ব্বক শুনিতাম। পিতৃদেব দুই একটী নগর-সংকীর্ত্তনের গান বাঁধিয়াছিলেন; তাহাও মনে আছে। আর উলায় থাকিলেও, ৺দুর্গাপূজার সময় প্রতি বৎসরই বাড়ীতে থাকিতাম; বিজয়া-দশমীর পরদিন হইতে একমাস কাল আমাদের বাড়ীতে নিয়ম সংকীর্ত্তন হইত। সেই অবধি এখনও হইয়া থাকে। আমাদের জন্মের পূর্ব্বে, আমাদের পল্লীতে, বাঞ্ছারাম কীর্ত্তনিয়া ছিলেন। তাহার সংকীর্ত্তন গানে মোহিত হওয়াতে, বাগনাপাড়ার বলরাম বিগ্রহের নাকি হস্ত-স্থিত শিঙ্গা খসিয়া পড়িয়াছিল। সেই বাঞ্ছারামের দৌহিত্র গুরুদাস বাওয়াজি আমাদের বাড়ীতে নিয়ম-সংকীর্ত্তন করিতেন। আমাদের বৈঠকখানায় তাঁহাকে বেশ করিয়া বসাইয়া, পিতা তাঁহার গান শ্রবণ করিতেন। আমি একমনে হাঁ করিয়া শুনিতাম। আর যেদিন গোষ্ঠ-গান হইত, সেদিন বড়ই আনন্দিত হইতাম। এখন গুরুদাস-বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছে। চুঁচুড়ায় থাকিবার কালে, বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে আর একরূপ শিক্ষা হইতে লাগিল। আমাদের পাড়ার সদ্‌গোপবংশীয় নিয়োগীরা সদ্ গৃহস্থ। সে সময়ে বর্ষীয়ান্ কর্ত্তা জগমোহন নিয়োগী মহাশয় প্রত্যহই অপরাহ্নে দুই পাঁচ জন প্রতিবেশী লইয়া চৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ নিজে করিতেন, কখন বা শুনিতেন। তিনি আমায় বড় ভালবাসিতেন। আমরা নিয়োগীদের বাড়ীতে সর্ব্বদা ইংরাজি পড়া-শুনা করিতাম। চরিতামৃত-পাঠের সময় খেলা-ধুলা ইংরাজি বা অঙ্ককসা ছাড়িয়া জগমোহন ঠাকুরদাদার পার্শ্বে বসিয়া চৈতন্যচরিতামৃত পান করিতাম। মাঝে মাঝে জগমোহন দাদা বলিতেন, "মদন কাকার প্রপৌত্র, না হবে কেন? আকরে টান যে।"

আসিলেন। পাঁচ হাত জোয়ান, কবাটের মত বক্ষ, লাল চেহারা; যদি পান, প্রত্যহ একটা গোটা পাঁঠা খাইতে পারেন; কিন্তু প্রত্যহই অপরাহ্নে পাঠ করেন;—কাশীরামদাসের মহাভারত। লাল লক্ষ্ণৌ ছিটের তুলা-ভরা জামা বন্ধক আঁটিয়া গায়ে দিয়া, রামরক্ষিতের দালানে বসিয়া, চন্দ্রশেখর বৈদিক মহাভারত পাঠ করিতেন। নিজে মহা পাঁঠা-খোর; কিন্তু নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠী মালা, পাড়ার বৈষ্ণব প্রতিবেশীরা সকলেই আগ্রহ-সহকারে সেই মহাভারত শ্রবণ করিতেন। আর তর্ক-বিতর্ক হইত—বৈষ্ণব-তত্ত্বের নিগূঢ় কথা লইয়া। যিনি যে দিক দিয়াই বলুন, ভগবানের নির্লিপ্তবাদ সকলেই স্বীকার করিয়া লইতেন। ও কথায় তর্ক চলে না সকলেই এইরূপ ভাবে কথা কহিতেন। আমিও সেই বালক কাল হইতে ঐ কথা মানিয়া লইয়াছি। এবং নির্লিপ্তিবাদে বিশ্বাস ক্রমে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের কথা নানারূপ জল্পনা হইত। আমি কিন্তু তৎ-কালে বা তাহার বহুপর পর্য্যন্ত ভাল করিয়া কিছুই বুঝি নাই। এখনও যে বেশ করিয়া বুঝিয়াছি, সে স্পর্দ্ধা করিতেছি না।

আমার শিক্ষার কথা বলিতে হইলে, সেই সময়ের সমাজের কথা বলা একান্ত আবশ্যক। যখন যাঁহার কাছে, যেটুকু শিখিয়া থাকি, পিতা যেরূপেই আমার চরিত্র গঠন করিয়া থাকুন, সে সময়ের সমাজের কথা না জানিলে, না বুঝিলে সেই সময়ের কাহারও শিক্ষার ভিত্তি বুঝা যায় না। মনুষ্য অদৃষ্ট হইতে কি পায়, না পায়, ঠিক বলিতে পারা যায় না। অভি-জাত হইতে কতকগুলি জিনিস পায়; নিকটস্থ আত্মীয় পিতা মাতা ভাই ভগিনী হইতে লালন-পালনে কতকগুলি সঞ্চয় করে। গুরু মহাশয় প্রভৃতির তাড়নায় অনেকে শিক্ষা করে। দীক্ষা গুরুর কৃপায়, কেহ কিছু পায়, কেহ পায় না। এ সকল বিশেষ প্রাপ্তির কথা—কিন্তু সমাজ হইতেই সাধারণত সক-লেই শিক্ষা করে। সমাজ—মনুষ্যের উপর নিঃশব্দে, বিনা আড়ম্বরে, গুরুগিরি করিয়া থাকে।

সেইজন্য বলিতেছিলাম, আমার কি কাহারও শিক্ষার কথা বুঝিতে হইলে, আমাদের বাল্যকালে, এই বঙ্গসমাজের কিরূপ অবস্থা ছিল,

আবশ্যক বটে কিন্তু বুঝা বড় কঠিন। এমন মনে হয় যে, সমাজের মুলভিত্তি বুঝি বদলাইয়া গিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসরে জাপানের বাহ্য পরিবর্ত্তনে জগৎ যেরূপ চমৎকৃত হইয়াছে, আমাদের বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক পরীবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলে, সেইরূপই বিস্ময় বোধ হইবে। কিন্তু আভ্যন্তরিক পরীবর্ত্তন লক্ষ্য করা বড় কঠিন; সেইজন্য কাহারও বড় বিস্ময় হয় নাই। আমাদিগকে নাকি, সেই সমাজে শিক্ষা পাইয়া, এই সমাজে পরীক্ষা দিতে হইতেছে, কাজেই এই আভ্যন্তরিক পরীবর্ত্তন, আমাদিগের, বিশেষ আমার, বিলক্ষণ লক্ষ্য হইয়াছে।

তখন বঙ্গসমাজের মূলে ছিল—সন্তোষ; এখন এই সমাজের মূলে দাঁড়াইয়াছে—অসন্তোষ, একেবারে চিতেন মোহাড়া উল্টাইয়া গিয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—সমাজও বুঝিয়াছিল, সন্তোষ সকল সুখের মূল। অর্থাৎ সুখ হয় সন্তোষ হইতে। য়ুরোপ বলে, কাজেই অনেকে তাহা কার্য্যে মানিয়া লইয়াছে—সন্তোষ হইতে আলস্য হয়, আলস্য সকল দুঃখের মূল। ইহার ফলে এই হইয়াছে, তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় শুধু পড়ে ঢেঁকীতে পাদ দিবেন, তবু চাসে মন দিবেন না।

পণ্ডিত, অপণ্ডিত, জ্ঞানী, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, চাষা-ভূষা সকল শ্রেণীর পনের আনা লোক থাকিত—আপন অবস্থায় সন্তুষ্ট; অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিত না? করিত বৈ কি যাহার উন্নতি করিবার উপায় থাকিত, সেই করিত। আকাশে ফাঁদ পাতিয়া চাঁদ ধরিতে যাইত না, শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া, ব্যবসায়ের ধূমধাম করিত না। দরিদ্র? ভদ্র সন্তানের মধ্যে এখন অপেক্ষা দরিদ্রের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল; কিন্তু লক্ষীছাড়ার সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। ভদ্র-শ্রেণীর মধ্যে ছিল না বলিলেই হয়। 'লক্ষীছাড়া' 'ছোট লোক' প্রায় একই পর্য্যায়ের গালি ছিল।

আমাদের পাড়ার পঞ্চু চাটুয্যে মহাশয় অতি দুঃখী ছিলেন। তাঁহাকে দীন দুঃখী না বলিয়া, দিন-দুঃখী বলিলে বোধ করি ঠিক হয়, কেননা তিনি প্রতিদিনই দুঃখী। চাটুয্যে মহাশয়ের ঘরে কিছু নাই, সকাল হয়ে'

সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া আটহাতী কাপড় খানির কোঁচাটি বাম হাতে ধরিয়া, ডান হাতে তুড়ী দিতে দিতে, নিজের পদস্থ চটির তালে গুণগুণ করিয়া গান করিতেছেন, ও একটু প্রকাশ্য পথে পাদ-চারণা করিতেছেন। সেই চটি কত দিনের কেহ বলিতে পারিত না; শুকর সময় চাটুয্যে মহাশয়ের পদানত, বর্ষাকালে চালের বাতায়,—শীর্ষস্থানীয়। তবে এক-পার্শে বটে। তখন লোকে ভিজা জুতা পায়ে দিবার সানিটেশন পর্য্য পাঠ করে নাই। চাটুয্যে মহাশয়ের সেই চট্‌চট্‌ পাদ-চারণাতেই বুঝা যাইতেছে, তাঁহার গৃহ অদ্য তণ্ডুল-কণা-শূন্য। তখন সমজদার লোক ছিল, দরদের দরদী ছিল; উহারই মধ্যে একজন চাটুয্যে মহাশয়কে গোপনে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি দুয়ানি বা দুই সের তণ্ডুল দিল। চাটুয্যে মহাশয় হাসিবেন, কি আশীর্ব্বাদ করিবেন, স্থির করিতে পারিতেন না। শেষে বাম হাতে চাল বা পয়সা সামলাইয়া, সেই তুড়ী দিবার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া মৌন আশীর্ব্বাদ করিয়া হাস্য মুখে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন। আহারের পর অশীতিপর বৃদ্ধ, তাসের সঙ্গে গান গাহিতেছেন, হাস্য করিতেছেন, নৃত্য করিতেছেন—কাল যে আবার কি খাইবেন, খাওয়াইবেন, সে ভাবনা কখন নাই।

আমরা সেই সন্তোষের সমাজে, সেই সুখের সমাজে, সেই আনন্দের সমাজে, সন্তোষেই গড়া-পিটা হইয়াছিলাম। তখন সেই সন্তোষ থাকাতে, সমাজে কতই না স্ফূর্ত্তি, কতই উৎসাহ, গান বাজনা, খেলা ধূলা, কুস্তি করতপ,—কতই না ছিল! কাজেই আমরা বুঝিয়া ছিলাম—সুখই জগতের নিয়ম, দুঃখ ব্যভিচার মাত্র। সুখের চোখে সকলই সুন্দর দেখায়। অতি বাল্য কালে, ঘোর ঝঞ্ঝার সহিত বজ্র স্ফোট হইলে, বুক ধড় ধড় করিত, কিন্তু সেই বুকের ভিতর তবু একরূপ অনন্দ উপভোগ করিতাম। পিতার নিকট শুনিতাম,—গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র তারকা সকলই মহাসুশৃঙ্খ-লায় আবদ্ধ ও নিয়োজিত—আকাশের সৌন্দর্য্য বুঝিতাম, শৃঙ্খলা মানিয়া লইতাম। পিতা দেখা'তেন, দুঃখের অপেক্ষা সুখ অনেক গুণে বেশী। কথাটী বেশ করিয়া, আপনার ভূয়োদর্শনে মিলাইয়া বুঝিয়া লইয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম জগৎ সুন্দর, সুশৃঙ্খল; পরে বুঝিলাম—ভগবান মঙ্গলময়।

ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ। আমার বাল্য কৈশোরের শিক্ষা ঐ বীজ পর্য্যন্ত।

স্কুল কালেজে পড়িবার সময় আমি আগ্রহ সহকারে সকল বাঙ্গালা পুস্তকই পাঠ করিতাম, চর্চ্চা করিতাম। সে সকলের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় দেওয়া অসাধ্য। তবে সাত আট জন গ্রন্থকারের নাম এবং তাঁহাদের গ্রন্থ হইতে কিরূপ ফল পাইয়াছিলাম, তাহা বলা আবশ্যক।

প্রথমেই বলিব,—রাজেন্দ্রলাল মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত বিবিধার্থসংগ্রহের বিষয়। আমি প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা হইতে, তিন চারি বৎসরের বিবিধার্থসংগ্রহ পাইয়াছিলাম। অত্যন্ত ভক্তিপূর্ব্বক সেই সকল পাঠ করিতাম। বিচিত্র যুড়িদার পাইয়াছিলাম—বৃদ্ধ অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে; তিনি পিতা অপেক্ষা বয়সে বিস্তর বড় ছিলেন। সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা পার্ব্বণ প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মে রত থাকিতেন, আর অবকাশ পাইলেই পাঠ করিতেন—বিবিধার্থসংগ্রহ। পূজার সময় পিতা আসিলে, আমরা দুই অপূর্ব্ব যুড়িদারে সেই পাঠের পরিচয় প্রদান করিতাম। পিতা আমাদিগকে লইয়া নানা কৌতুক করিতেন। বিবিধার্থ সংগ্রহ হইতে জ্ঞান পাইয়াছিলাম বহুতর। কিন্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের রচনায়, সাহিত্যশিক্ষার কোন সুবিধা পাই নাই; বলিতে কি, ভাষা শিক্ষারও নহে।

এই সময়ে মহা ধূমধামে চুঁচুড়ায় কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটকের অভিনয় হইল। তখনও কলিকাতায় নাটক অভিনয় আরম্ভ হয় নাই। প্রসিদ্ধ গায়ক এবং গাথক রূপচাঁদ পক্ষী আসিয়া গান বাঁধিয়া দিলেন, তালিম দিলেন; একদিন নিজে গাহিয়াও দিলেন। নাটকের নটীর গান হাটে বাজারে গীত হইতে লাগিল।—"অধিনীরে গুণমণি পড়েছে কি মনে হে?" গ্রন্থকার রামনারায়ণের রচনার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, তাঁহার নান্দী, নাপৃতে বৌএর পরিচয় ও তিনরূপ ফলারের লক্ষণ প্রভৃতি মুখস্ত করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ফলার এখনও ভুলি নাই।

তখন পুস্তকের ফেরিওলারা আমাদের এতৎ অঞ্চলের নগর পল্লীর অলিতে গলিতে সমস্ত দিন পুস্তক বিক্রয় করিত। কাশীদাস, কৃত্তিবাস,

ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ, চরিতামৃত, প্রেম-বিলাস, হাতেম তাই, চাহার দরবেশ, প্রভৃতি বটতলার প্রকাশিত গ্রন্থ, হিন্দু মুসলমান পুরুষেরা কিনিত। মেয়েরাও জীবনতারা, কামিনীকুমার প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রয় করিত। বটতল ছাড়া অন্যত্র ছাপা দুই এক খানি গ্রন্থও হকারদের কাছে মিলিত। ফেরিওলাদের সঙ্গে আমার বড় পোট ছিল। আমি প্রতি রবিবারে, তাহাদের পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করিতাম। তাহারা আমায় কিছু বলিত না, আমি যে একজন বাঁধা খরিদ্দার। এমন খরিদ্দার চটাইবে কেন? এক দিন নাড়িতে নাড়িতে একখানি এড়াটে চটি বই পাইলাম। গ্রন্থকারের নাম নাই, কোথায় কবে ছাপা হইল, তাহার কিছুই নাই। দুইখানি শাদা কাগজের মলাট দুই দিকে, মধ্যে ৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ; নাম "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ।" বহুপরে জানিয়াছি এখানি রামকমল ভট্টাচার্য্যের লেখা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যের আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়। প্যারীচাঁদও নয়, —এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া, আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না। এক স্থান হইতে উদ্ধৃত করিতেছি;—

"আমাদিগের জাহাজে সপ্তদশ-বর্ষ-বয়স্কা এক ফরাশি যুবতী ছিলেন। তাঁহার নাম জুলিয়া। তাঁহার স্বামীও এই জাহাজে ছিলেন। স্বামীর বয়ক্রম চল্লিশ বর্ষের ন্যূন ছিল না। বুঝিতেই পার, এমন স্ত্রীর এমন স্বামীর প্রতি কেমন অনুরাগ হয়। জুলিয়া দেখিতে অতি সুরূপা। তাহার অলক-গুলি কুঞ্চিত হইয়া এরূপ মধুরভাবে কপোলদেশে পতিত হইত যে, দেখিলে মোহিত হইতে হয়। নয়নযুগল উজ্জ্বল বিশাল ও ভ্রমরের ন্যায় নীল। কপোল-তল এরূপ স্বচ্ছ, যে মুখ দেখা যায়। আমি দেখিয়া অবধি যুবা-জন-সুলভ ভাবের অনধীন থাকি নাই। জুলিয়ার

স্বামী আমার নবীন বয়স ও নির্ভয় ব্যবহার দেখিয়া অবশ্যই উদ্বিগ্ন এবং কোন বিষম ঘটনার শঙ্কায় জড়ীভূত থাকিতেন। তিনি আমার প্রতি অতি অপরিচিত ভাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার পত্নীর সহিত আমার সাক্ষাৎকার বা কথোপকথন স্পষ্টরূপে নিষেধ করিতে পারেন নাই। ইউরোপের প্রথা, এদেশের মত, যুবতী স্ত্রীর পরপুরুষের সহিত আলাপ করিতে নিষেধ করে না, অতএব আমি জুলিয়ার প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে বিমুখ হই নাই। এইরূপে আমাদিগের পথ অতীত হইতে লাগিল। কোন দিন একটী হাঙ্গর, কোন দিন জগন্নাথের মন্দিরের চূড়', কোন দিন মছলী বন্দরে মাস্তলের বন, কোন দিন সাফ৷ উর্ম্মিমালায় আহত উপকূলে অধিষ্ঠিত মান্দ্রাজ নগরের প্রাসাদাগ্র —এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা বঙ্গোপসাগরের নীল জল ভেদ করিয়া যাইতে লাগিলাম।"

অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম বটে, 'কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের' ভাষার বিশেষত্ব বোধ করি দেখাইতে পারিলাম না। বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়া পদগুলি অনেক স্থলেই খাটি বাঙ্গালা। কাদম্বরীতে কঠোর সংস্কৃত দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু "এলা-লতা-লিঙ্গিত চূত ও তাম্বূল-বল্লী-পরিণদ্ধ সুপারি" এরূপ ঢং দেখি নাই।

বাঙ্গলা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের নানারূপ আলোচনা আলোড়ন হইতেছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানির কথা কাহাকেও বলিতে শুনি না, বা লিখিতে দেখি না। অথচ আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী। হউক বা না হউক, এই ভাষার বিশেষত্বের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ক্ষতি কি?

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম। গ্রন্থের সার কথা এই যে কতকগুলি আকাঙ্ক্ষা লইয়া থাকিলে, আমি হেন করিব, আমি তেন করিব, ইংরেজ তাড়াইব, ভারতের উদ্ধার করিব, এইরূপ দুরাকাঙ্ক্ষা সব হৃদয়ে পুষিলে, মানুষের স্বস্তি থাকেনা, সুখ থাকেনা, শান্তি থাকেনা।

তাহাকে কিসে যেন লুটপাট করিয়া তাড়াইয়া লইয়া বেড়ায়। তাহার পর ঘা খাইয়া, ঠেকিয়া শিখিয়া, যখন মানুষ শান্তির অন্বেষণ করে, তখন দৈবক্রমেই হউক, আর যে রূপেই হউক, পারিবারিক সচ্ছন্দতা লাভ করিলে, তাহার শান্তি হয়। আসল কথা সুখ-দৌড়-ঝাঁপে নহে, রাজনীতিতে নহে, ভারত-উদ্ধারে নহে, সুখ পারিবারিক শান্তিতে। একথা বাঙ্গলার অতি প্রাচীন কথা। বাঙ্গলার মজ্জাগত কথা। বাঙ্গালি কিছুকাল পূর্ব্বে এই কথা বুঝিত বলিয়া, বাঙ্গালি পারিবারিক অধিষ্ঠানের যেরূপ সুশ্রীকতা, সম্পূর্ণতা,—সম্পাদন করিয়াছিল, এমন কেহ কখন পারে নাই। অতি সামান্য আয়ে বাঙ্গালি দেবতা অতিথির সেবা করিয়া, গৃহপ্রাঙ্গণ সুপরিষ্কৃত রাখিয়া, দেহে স্বাস্থ্য মনে স্ফূর্ত্তি পরিপোষণ করিয়া, কিছুকাল পূর্ব্বে অতিসচ্ছন্দে দিনপাত করিয়াছে। এইটীই বাঙ্গালির গৌরব ছিল। উন্নতি উন্নতি উন্নতি করিয়া দারুণ দুর্দ্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষায় সেই গৌরব চূর্ণ করিতে বসিয়াছে। বালককালে অবশ্য এ সকল কথা বুঝি নাই। ভাবি নাই, কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণের উপদেশ হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছিল। আমি বিচিত্রা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটী গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে, জটা-যুটাসঙ্ঘটিত—এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিরালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটী ছোট খাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশর, মালব উলট পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন, তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে,

দুইটী বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ হইল। সমসাময়িক ঘটনার যতই বিবরণ পাঠ করিব, ততই এইরূপ আরও মিল দেখিতে পাইব, এইরূপ একটা আকাঙ্ক্ষা মনে উদয় হইল। এখন বুঝিয়াছি, গল্পের মিল ত দূরে থাকুক, দুইজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার যদি একই ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ লিখিতে বসেন, দুইজনে নিশ্চয়ই বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে, কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ্ হিস্টরি হইতে সঙ্কলিত। কিন্তু না জানাই ভাল ছিল, কেন না না জানাতেই মহা আনন্দভোগ করিয়াছিলাম।

পঠদ্দশায় আর একখানি পুস্তকে আমাকে আলোড়িত করিয়াছিল। আনন্দও পাইয়াছিলাম। সেখানি কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোমপেঁচার নক্সা। আলালের ঘরের দুলালেও অনেক স্থানে নক্সা বা ফটো তুলিবার চেষ্টা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে পল্লী-সমাজের চিত্র যেমন পরিস্ফুট হইয়াছে, কলিকাতার অলি-গলির নক্সা তেমন ফুটন্ত হয় নাই। তেপায়া উচ্চ টুলের উপর কাচের বাক্স বসাইয়া, দু পয়সা দাও, দু চক্ষু দিয়া দেখ, বলিয়া যেমন মেলার মধ্যে নানাবিধ ফটো দেখায়, অপূর্ব্ব ভাষার গাঁথুনিতে সেইরূপে কলিকাতার নানাবিধ নক্সা তুলিয়া পেঁচা দেখাইতে লাগিল ও ফুলো গাল টিপিয়া বলিতে লাগিল, 'ইয়ে রাজবাড়ী কি নক্সা, বড় মজাদার হ্যায়, ইয়ে শোভাবাজার কি গাজন, বড় তামাসা হ্যায়, ইয়ে হাইকোর্টকা বিচার, আজব তাজ্জব হ্যায়।' আমরা তখন নিতান্ত বালক, তাহার ভাষার ভঙ্গিতে, রচনার রঙ্গেতে, একেবারে মোহিত হইয়া গেলাম। মনে করিলাম আমাদের বাঙ্গালা ভাষাতে বাজি খেলান যায়, তুবড়ি ফুটান যায়, ফুল কাটান যায়, হুয়ারা ছোটান যায়। মনে করিলাম, আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গে রঙ্গময়ী। ভালকথা,—তোমরা কৃতিসন্তান, তোমরাও নানারূপে মাতৃভাষার সেবা করিতেছ, ভাষার নক্সা লিখিতে, ছবি আঁকিতে, ফটো তুলিতে চেষ্টা কর না কেন? পার না? না অবজ্ঞা কর? না, পার না বলিয়া, অবজ্ঞা দেখাও?

আমরা যখন চারি দিকের সন্ধান রাখিতে সমর্থ, তখন চুঁচুড়ায় নর্ম্মাল স্কুল বসিয়াছে। ভূদেব বাবু নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়াছেন। সপরিবার চুঁচুড়ায় ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করিতেছেন, শিক্ষা দান করিতেছেন, পুস্তক প্রচার করিতেছেন। তাঁহার হাবড়ার হেড মাষ্টারির কথা আমরা জানি না। তাঁহার পুরাবৃত্তসার তখন পড়ি নাই, তাঁহার প্রথম পুস্তক পাঠ করিলাম, ঐতিহাসিক উপন্যাসদ্বয়। সফল স্বপ্ন এবং অঙ্গুরীয়ক বিনিময়। এই দুই গ্রন্থও রোমান্‌স্ অফ হিস্‌টরি হইতে লিখিত। কয়েক পঙ্‌ক্তিতে স্ফুটরূপে স্বভাব বর্ণন করিয়া, নানারূপ স্বভাবজ শব্দের পরিচয় দিয়া, ভূদেব বাবু উপসংহার করিতেছেন, "যেন জগৎ যন্ত্রের মধুর লয়-সঙ্গতি হইতেছে।" লেখাটুকু কঠোরে মধুর, এই নূতন রসের আস্বাদ পাইয়া একরূপ অপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি করিলাম। বাল্যের সাহিত্য-চর্চ্চায় ভূদেব বাবু হইতে বিশেষ কোন শিক্ষা লাভ হইয়াছিল, এমন কথা নাই বলিলাম। সমাজ-তত্ত্বে তিনি সকল লেখকের শীর্ষ স্থানীয়। যৌবনে আমরা অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছি।

বোধ করি বিবিধার্থসংগ্রহে, আমি মাইকেলের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম। কিন্তু বালক কালে আমি মাইকেল কিছুই পড়ি নাই। একটু বড় হইলে, মাইকেলের মিত্রাক্ষরে উপহাস করিতাম। তাঁহার লেখার ভাবে, অবহেলা করিতাম। তাঁহার প্রতি এক প্রকার মুখস্থ বিদ্বেষ দেখাইতাম। আসল কথা মধুসূদনকে লইয়া তখন দুইটা পক্ষ হইয়াছিল। এক পক্ষ বলিত, মাইকেলের মত অমন হয় নাই, হবে না। আর এক পক্ষ বলিত, উহা কেবল ছাই ভস্ম। উহাতে না আছে ছন্দ, না আছে মিল, ব্যাকরণে দুষ্ট, অলঙ্কারে দুষ্ট। বালক কালে এই তর্ক শুনিতাম। মনে মনে বিদ্বেষী পক্ষের দিকে একটু টান ছিল। তাহার পর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া, যখন আমি স্বয়েন্‌সা বিদ্যা-দিগ্‌গজ বলিয়া পরিচিত হইলাম, তখন সেই বিদ্বেষী পক্ষের অধিনায়কতা, জানি না কেমন করিয়া, আমার স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাহার বাহাদুরী এই, দুই দশ ছত্র ব্যতীত তখন আমি মাইকেল ভাল

করিয়া পড়ি নাই। তবে তুখোড় ছেলে কিনা, মাইকেলের পক্ষে কেহ কিছু বলিলে, আমি বিপক্ষে একটা না একটা জবাব দিতে পারিতাম। মাইকেলকে ভেঙ্গচাইয়া, অমৃতাক্ষর পদ্য লিখিতাম। কিন্তু তখন বাস্তবিক জানিতাম না,—অমৃতাক্ষর কাহাকে বলে। স্তরের শেষের দিকে মিল না থাকিলেই, অমৃতাক্ষর বুঝিতাম। বাস্তবিক মিলে গরমিলে অমৃতাক্ষর, নহে। সাধারণত পয়ারে ২৮ অক্ষরে ভাব শেষ হয়। অমৃতাক্ষরে সে নিয়ম নাই। মাইকেল অধিকাংশ সময় শ্লোকটা ২৮ অক্ষরে শেষ না করিয়া, ৪০, ৪৪, ৫০, ৫২ অক্ষরে ভাব শেষ করিয়াছেন।

বিধাতার নির্ব্বন্ধে, বি এ পরীক্ষার জন্ত, বাঙ্গালার পদ্যাংশে মাইকেলের মেঘনাদের শেষ ভাগ স্থিরীকৃত হইল। সংস্কৃতাধ্যাপক গোপালচন্দ্র গুপ্তের সহিত, আমার নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। কিশোর-স্বভাব-সুলভ, অতিশয় উক্তিতে আমি বলিলাম যে, মাইকেলের সমস্তই চুরি, তাঁহার নিজের একটুও নয়। আর একথা মাইকেল নিজেই তাহা স্বীকার করিয়াছে। কেননা তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন "গাঁথিব নূতন মালা" অর্থাৎ আমি টীকা করিতেছি,—ফুলগুলি তোমাদের পাঁচজনের,—গাঁথনি খালি আমার। তখন যে স্থানটা পড়া হইতেছিল, সে স্থানে ছিল "অন্ধকার ঘরে দীপ আছিল মৈথিলী"। অধ্যাপক বলিলেন—"দেখ, দেখি কেমন সুন্দর নূতন উপমা?' আমি বলিলাম 'ওত চাহার দরবেশে আছে। "আঁধারিঘরমে এক দিয়া নাহিদিয়া।"

এল এ পরীক্ষা দিয়া আমি পিতার কাছে আরায় এক মাস কাল ছিলাম। পিতার কাছারীর সেরেস্তাদারকে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শকুন্তলা পড়াইতাম, তিনি আমাকে উর্দ্দু অক্ষরে চাহার-দরবেশ পড়াইতেন। সেই টাট্‌কা বিদ্যা লইয়া, এখন এই সাহিত্য সংগ্রামে মাইকেলের বিরুদ্ধে চাহার-দরবেশ-রূপ শর-সংযোগ করিলাম। অধ্যাপক ও সতীর্থেরা হাসিতে লাগিলেন। এমন নিত্যই হইত। কোন দিন বা আমি তারাশঙ্করের বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য লইয়া স্তম্ভ সাজাইয়া, মিত্রাক্ষরের মতন করিয়া দেখাইতাম। তাহাতেও হাস্য কৌতুক হইত। দুই বৎসরের মধ্যে পরীক্ষার জন্ত আমি মেঘনাদবধ পুস্তক কিনিলাম না। এইরূপে

বহু-বিদ্বেষের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইল। বলা বাহুল্য, এখন আমি, সেরূপ বিদ্বেষী নহি। মাইকেলের ছন্দ, কবিবর হেমচন্দ্রের অপেক্ষা সরল সতেজ, মোলায়েম, সহজ এবং সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্ট, তাহা বুঝিতে পারি।

পঠদ্দশায় মাইকেলের মেঘনাদ বিদ্বেষ দেখাইবার জন্য পুস্তক কিনি নাই বটে,কিন্তু মাইকেলের নাটক প্রহসন সমস্তই পড়িয়াছিলাম। নাটকের ভাষায় বিশেষ কিছু শিখিবার না থাকিলেও, সেই ভাষা সহজ সুমধুর বাঙ্গালা বটে; আর প্রহসনের ভাষা Just, appropriate, যাহার মুখে যেমন দেওয়া উচিত, তাহার মুখে ঠিক তেমনি দেওয়া আছে। একথা তখনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে জন্য মাইকেলকে শ্রদ্ধা করিতাম। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" প্রকাশিত হইবার কিছুকাল পরেই দীনবন্ধু বাবু প্রকাশিত করিলেন,—"সধবার একাদশী" ও "বিয়ে পাগলা বুড়"। শেষোক্ত দুই গ্রন্থ উপরোক্ত দুই গ্রন্থের অনুকরণে বা টক্কর দিয়া লেখা বটে। অনুকরণ অনেক সময় হীনবল হইলেও, সধবার একাদশী নাম ডাকে 'একেই কি বলে সভ্যতাকে' ছাপাইয়া উঠিয়াছিল। সেও নিমেদত্তের গুণে। নিমেদত্ত আবার মধুদত্ত। সুতরাং মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যদি দীনবন্ধু কোন স্থানে ছাপাইয়া থাকেন, সেও মধুসূদন দত্তের কৃপায়। অন্যত্র মধুসূদন একজন গ্রন্থকার; সধবার একাদশীতে মধু দত্ত বা নিমেদত্ত একজন পাত্র বা Dramatis Personœ. কলিকাতার নর্দামায় পড়িয়া পাহারওলার লণ্ঠন দেখিয়া নিমচাঁদ Milton আওড়াইয়া বলিতেছে—

"Hail holy light! the offspring of Heaven first-born. Of the eternal co-eternal beam" ইত্যাদি—শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল-চরিত্রের ঐতিহাসিক ঘটনা। 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়। That's moral courage. (বুকে হাত দিয়া) আমি সেই moral courage এর ছেলে বাবা!" ইত্যাদি অনেক কথাই মাইকেলের।

প্রহসনের কথায় প্রহসনের তীব্র সমালোচনার পরে, সমালোচকের দুর্দ্দশার গল্প মনে পড়িল। হুগলী কালেজ হইতে বি এ দিয়া যখন কলিকাতায় পড়িতাম, তখন রেবরেণ্ড লাল

বেহারি দে ফ্রাই ডে রিভিউ নাম দিয়া একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদিত করিতেন। বিলাতের স্যাটারডে রিবিউতে সাময়িক সাহিত্যের যেমন তীব্র সমালোচনা থাকে, অথবা সেইসময়ে থাকিত, ফ্রাইডে রিবিউতেও দে মহাশয় সেইরূপ তীব্র সমালোচনার চেষ্টা করিতেন। সধবার একাদশীর সমালোচনা করিলেন—"If this trash ever be put on the stage, we can not recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons." দীনবন্ধু বাবুর অবশ্য তেলে বেগুনে হইল। জ্বলিয়া উঠিল; শিখা দেখা দিল—"জামাই বারিকের" তোতারাম ভাটে। তোতারাম ভাট অর্থ তোতা বা টিয়া পাখীর মত মুখস্ত করিয়া যে ভাটের মত বলিতে পারে। রেবরেণ্ড লাল বেহারী দে ইংরাজীতে সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহাকে তোতারাম ভাট নাম দিয়া দীনবন্ধু বাবু গায়ের জ্বালা মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদিন পরে এ সকল কথা বলিবার প্রয়োজন কি? একটু প্রয়োজন আছে। দীনবন্ধু বাবুর গ্রন্থাবলী প্রকাশের অবসরে, ভূমিকায় বঙ্কিম বাবু বলিয়াছেন "তোতারাম ভাট—দীনবন্ধুর কলঙ্ক।" কেন কলঙ্ক? কিরূপে হইল? সেই কথারই টীকা টীপ্পনী করিলাম। তোতারাম ভাটের সমালোচনটা, মুখস্থ ছিল বলিয়াই গোড়া শুড়ি বলিতে সাহসী হইলাম।

দীনবন্ধুবাবুর প্রহসনের পরিচয় বি-এ পাস করিয়া পাইলাম বটে, কিন্তু আমার এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দেবার এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৮৬১ সালে প্রসিদ্ধ লং সাহেবের মকদ্দামা হয়। সেই সময়ে নীলদর্পণ নাটক ও নাটককার দীনবন্ধু বাবুর নাম বাঙ্গলার সর্ব্বত্র ঢি ঢি হইয়াছিল। আমরা তখন নাটক পড়িতে পাই নাই; কিন্তু নাটক যে একটা বড় গুরুতর জিনিষ, নাটকের লেখাতে লোকের মান অপমান হয়, সাহেবরা পর্য্যন্ত রাগিয়া উঠেন,—এরূপ কতকগুলি কথা, আমরা অনেকে ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিয়াছিলাম।

ইদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত আমাদের পঠদ্দশার শেষভাগে পরিচয় হয়। তখন আমরা বাঙ্গালার ভঙ্গি বুঝিতে পারি, ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে . কোনটা অপথ, কোন্‌টা কুপথ, একটু একটু চিনিতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা পাইয়া আমার মনে পড়ে, আমি প্রথম দিনে আহ্লাদে আটখানা হইলাম। প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীপ্রকাশের অবসরে ভূমিকায় যে কথা বঙ্কিমচন্দ্র জগৎকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—স্পর্দ্ধা করিতেছি মনে করিবেন না, সত্য কথা বলিতেছি, সেই কথা তখনই আমরা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালা ভাষা অতি সুন্দর হইলেও বয়স্কা কুলীনকন্যার মত যেন কেমন কেমন বোধ হইত। শীঘ্র ভিন্ন গোত্রা হউক, আপনার ঘর আপনি করিতে শিখুক, আপনার পথ আপনি দেখুক, এইপ্রকার ইচ্ছা হইত। যখন টেকচাঁদ ঘটক সাজিয়া সোজা বাঙ্গালাকে বর সাজাইয়া সভাতে উপস্থিত করিলেন, তখনও পাত্র আপনাদের আত্মীয় হইলেও কেমন যেন ছোট ঘরের অপাত্র বলিয়া বোধ হইল। বঙ্কিম বাবু যখন স্বয়ং বরবেশে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাকেই উপযুক্ত সৎপাত্র বলিয়া বোধ হইল। পাত্র মিলিল দেখিয়া, সেই আহ্লাদেই আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। পরে দেখা গিয়াছে, আমাদের সেই আহ্লাদ বালকের আহ্লাদ হয় নাই। বঙ্গভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আত্মসমর্পণ করিয়া প্রতারিত হন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ভাষার নানারূপ সেবা করিয়াছেন, বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন এবং এক ভাষার গুণে বাঙ্গালীকে জগতের নিকট পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ ইংরাজী ফরাসীতে অনুবাদিত হইয়াছে।

আমাদের কলিকাতার কালেজ জীবনের শেষাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" প্রকাশিত হইল। এমন অচ্ছিদ্র, উজ্জ্বল, বাচালতা-শূন্য অথচ রসপরিপূর্ণ, হিন্দুভাবে অস্থিমজ্জায় গঠিত, অদৃষ্টবাদের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম রেখায় ওতপ্রোত—কাব্যগ্রন্থ, বাঙ্গালায় আর নাই। কেবলমাত্র "কপালকুণ্ডলা" লিখিলেই, কপালকুণ্ডলাকার কবি বলিয়া পরিচিত হইতেন। অন্য গ্রন্থ লিখিবার প্রয়োজন ছিল না। আমরা যৌবনের

সেই ভাবোন্মেষ অবস্থায়, সংসার প্রবেশের সেই প্রথম উদ্যমে, এই অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায়, বাঙ্গালির লেখায় পাইয়া, একেবারে চরিতার্থ হইলাম। প্রেসিডেন্সি কালেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে, বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের সহাধ্যায়ী পাইয়া, আপনাদিগকে [illegible] ন্বত মনে করিলাম। কিন্তু এই গৌরব। একটা কিন্তু পড়িল। এখন যেখানে সিটি কালেজ, তাহার পশ্চিম ধারের তেতালা বাড়ী হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়া হইতে, আর-দালিকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া, বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কালেজের আইন শ্রেণীর গ্যালারিতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর, সুশ্রী-গঠন, পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোটের আশে পাশে একটু একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমা-জ্ঞান। আসেন, এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেষ্টরী লইতেন। কৃষ্ণকমল বাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিম বাবু অমনি উঠিলেন,—তাঁহার কাণের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন "আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন, মহাশয়!" কৃষ্ণকমল বলিলেন "আচ্ছা"। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদিগির ধার দিয়া, ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহার সহিত তখন বঙ্কিম বাবুর আলাপ হয় নাই। সেই টুকুই যা, কিছু কিন্তু। থাকুক 'কিন্তু,' তখন বুঝিয়াছিলাম, এখনও বুঝিতেছি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন।

আমার বাঙ্গালা লেখা-পড়া সাঙ্গ হইল। অর্থাৎ কালেজের শিক্ষাও শেষ, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাও শেষ—একত্রই হইল। আমার বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার কথা বলিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। আমিও নিজের কথা নিজে বলিবার অধর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইলাম।

এখন পিতৃদেবের জীবনীর কথা বলা যাইতেছে। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে রাজনীতি সংঘটিত কোন কথা বলা ত চলে না। সুতরাং ছাড়িয়া ছুড়িয়া, কথা এড়াইয়া, লিখিতে হইতেছে।

উলা হইতে চৌকি উঠাইয়া লইয়া, রাণাঘাটে গিয়া পিতৃদেব সেখানে অতি অল্পকালই ছিলেন। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ "অপদস্থ" হইয়া পাণিঘাটায় যাইতে হয়। পাণিঘাটা নদীয়া জেলার দেবগ্রামের নিকট। তখন সেখানে চৌকি ছিল, এখন নাই। হঠাৎ এই পরিবর্ত্তনের কারণ-প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনীতি। তখন নীলকর বিষধরে বাঙ্গলা জর্জ্জরিত। ইডেন, হর্শেল, গ্রাণ্ট, তখনও নীলকরের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন নাই। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশপরগণা, যশোহর-জেলার অনেক স্থলেই তখন নীলকর সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহাদের দৌলত দংপং দেখে কে? এই নীলকরের এক জনের সঙ্গে, পিতৃদেবের দুই একটি কি কথা হয়। নীলকর আপনাকে অপমানিত মনে করেন। অতি অল্পকাল পরেই পিতৃদেব বদলি হইলেন। রাণাঘাট হইতে পাণিঘাটা, পাণিঘাটা হইতে পূর্ণিয়ার সদর। সেখানে তখন উর্দ্দূ চলিত ছিল। তাঁহার পার্শী পড়ার ফল দেখিল। পূর্ণিয়া হইতে, জাহানাবাদ। জাহানাবাদে তিনি ইংরাজী স্কুল স্থাপনা করেন। সে স্কুল এখনও আছে। আর ১৮৬১ সালে প্রসিদ্ধ হিন্দু-হিতৈষী হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে, একটি শোকসভা আহ্বান করিয়া, তদীয় স্মরণার্থ চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটি সুন্দর সুললিত বক্তৃতা বাঙ্গালায় করেন। বহুদিন পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত, তাঁহার আবার এই সংস্পর্শ।

ইংরাজি ৫৭ হইতে ৬১ এই চারি বৎসরে, আমাদের পিতা-পুত্রে কেবল দুর্গোৎসব ও মহরমের সময় মিলন হইতে। ৬১ সাল হইতে, হয় শীতের ছুটিতে, না হয় গ্রীষ্মের ছুটিতে, আমি পিতার কাছে যাইতাম ও থাকিতাম। এইরূপে এক বৎসর আমি শীতের ছুটিতে জাহানাবাদে, আর এক বৎসর গ্রীষ্মের ছুটিতে, আবার পর বৎসর শীতের ছুটিতে কলিকাতায়, তাহার পর বৎসর ৬৩ সালে শীতের ছুটিতে

জঙ্গিপুরে, ৬৫ সালে গ্রীষ্মের ছুটিতে আরায়, ৬৬ সালে মুর্শিদাবাদে পিতার নিকট গিয়াছিলাম। ৬৮ সালে আমার শিক্ষা সাঙ্গ হইল। আমি পিতার নিকট বহরমপুরে ওকালতী করিতে গেলাম। ১৮৭০ সালের ২১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত, পিতা বহরমপুরের সদর মুন্সেফ থাকেন, অথচ প্রায়ই একটিনী প্রধান সদরআমিনীতে, অথবা একটিনী ছোট আদালতের জজিয়তিতে, ঢাকা, কটক, ভাগলপুর, চব্বিশপরগণা (আলিপুর) এবং যশোহর এই সকল স্থানে দুই মাস ছয় মাস ধরিয়া কাটাইয়া আসেন। দুই বৎসরের মধ্যে প্রায় এক বৎসর কাল, পিতাপুত্র, আমরা একত্র ছিলাম।

তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা-সাহিত্য চর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংসৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের 'ইতিহাস লেখক' পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন, বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্রবাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন; আর আমি যাবার কিছুকাল পরেই,—পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ-স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চ্চার মহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।

আমি বহরমপুরে এরূপে যাইবার কিছু পূর্ব্বেই, অর্থাৎ ওকালতি করিতে যাইবার কিছু পুর্ব্বেই পঠদ্দশায় একবার এক মাস মাত্র বহরমপুরে গিয়াছিলাম। সে কথা ধরিতেছি না। আমি বহরমপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু পূর্ব্বেই জজ কাছারির সেরেস্তাদার মহাশয়ের ঘরে একটি নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। সভ্যেরা একটু সকাল সকাল গিয়া সভা বসাইতেন,

জজ সাহেব আসিলেই, সভা-ভঙ্গ হইত। সাধারণত দিনে অর্দ্ধঘণ্টা জীবন। কোন কোন দিন কাজের ভিড় থাকিলে, সে জীবন টুকুও হইত না। এই সভায় বিক্রমাদিত্য ছিলেন—জজ সাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠ নাথ নাগ। সে ঘরটি তাঁহারই ঘর। বহরমপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্যামাচরণ ভট্ট—বেতাল ভট্ট। বাবু বৈকুণ্ঠ নাথ সেন (জাতিতে বৈদ্য সুতরাং)—ধন্বন্তরি। বহরমপুরের সরকারী উকীল দীননাথ গাঙ্গুলি-ক্ষপণক। বোধ করি তিনি একটু রাগী ছিলেন মনে করিয়া, তাঁহাকে এই সম্মান দেওয়া হইবে। স্বনাম-প্রসিদ্ধ গুরুদাস বাবু তখন বহরমপুরের আইনাধ্যাপক ছিলেন; অবশ্য ওকালতিও করিতেন। তিনি ছিলেন—বররুচি। আর পিতৃদেব—কালিদাস। ভোর পুর আসরে যখন নবরত্ন সভা জাঁকাইয়া বসিয়া আছেন, তখন আমি ওকালতি করিতে গেলাম। কোন বেকান্‌সি ছিল না যে আমি প্রবেশ করিতে পারি, অথচ নবরত্ন সভা আমার সহিত সম্পর্ক রাখিতে উৎসুক হইলেন। আমাকে উৎকট বিকট সম্মানের পদ প্রদত্ত হইল। আমি হইলাম—রাক্ষস। আমি সমস্যা দিতাম, নবরত্ন পূরণ করিতেন। নব-রত্ন-অধিষ্ঠিত নব বিক্রমাদিত্যের সভায়, আমি এক খানি অপোজিসন্ চেয়ার পাইলাম। প্রাচীন পুরাণ প্রথামত অনেক সময়েই, রাক্ষসের আক্রমণ হইতে কালিদাসই সভার সম্মান রক্ষা করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি কালেজে পঠদ্দশার সময় হইতেই, কতক মনের সহিত, কতক মজা দেখিবার জন্য, মাইকেলের বিদ্বেষী ছিলাম। এক এক দিন মেঘনাদের দুই দশ পংক্তি লইয়া নব-রত্নকে ব্যাখ্যা করিতে দিতাম। মনের ভাবটা এই যে, অনেক স্থলে মেঘনাদ বধ কাব্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। কেবল "ললিত-লবঙ্গ-লতা", কথাতেই পরিপূর্ণ।—

"উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্তদেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়ন-পদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুম-কুন্তলা মহী, মুক্তামালা গলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম পদ্মপর্ণ পদের অর্থ কি? হেম বাবু টীকা করিয়াছেন, পদ্মপর্ণ—পদ্মপত্র। সেটা কি জিনিস—পদ্মের গাছের পাতা, না পদ্মের ফুলের পাপড়ি? যদি গাছের পাতা হয়, তা হইলে উপমা বুঝা যায় না। কেন না পদ্ম পত্র হরিৎ-বর্ণ। উদয় অচল হরিৎ বর্ণ নহে। আর যদি পদ্মপর্ণ মানে পদ্মের পাপ্‌ড়ি হয়—সেই বা কি হইল। পদ্মের পাপড়িতে পদ্মযোনি-সুপ্ত কেন? যদি বা কখন থাকেন, তবে উদয়াচলের সহিত সাদৃশ্য কি? যাক্। ব্রহ্মার নয়নপদ্মের উন্মীলনের মত, আদিত্যের উদয়। তবে ব্রহ্মাকি এক চক্ষু? আর সুপ্ত পদ্মযোনিই বা নয়ন-পদ্ম উন্মীলন করেন কিরূপে? সুপ্তির পর, হইতে পারে বটে। আর ঘুম ভাঙ্গিয়াই বা সুপ্রসন্ন ভাবে মহীর পানে চান কেন? কোন পৌরাণিকী কাহিনী আছে কি?- যদি না থাকে, তবে কি বুঝিব? আর মহীর বা এত উল্লাসে হাসি কেন? যদি বল প্রভাত হইয়াছে বলিয়া, তাহা হইলে ত সব গোলমাল হইল। সাধ্য-সম হইল। উপমান উপমেয় পাল্টাপাল্টি হইয়া গেল। এইরূপ নবরত্নের সহিত ঘোরতর রাক্ষস-সুলভা রাক্ষসী বিতণ্ডা করিতাম।

মাইকেলকে লইয়া ঘোরতর বিতণ্ডাই হইত। কোনপক্ষে জয় পরাজয় স্থির হইত না। আমি প্রকাশ্যত মাইকেল-বিদ্বেষী-বটে, কিন্তু মাইকেলের কবিতা আবৃত্তি কালে, কাব্যের রস ভঙ্গ করিবার জন্য, আমি কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করিতাম না। এ কথা সকলেই বলিতেন। এবং আবৃত্তিতে ছন্দ ও রস সম্পূর্ণরূপে রক্ষা হয়, এ কথা বলিয়া সকলেই আমার প্রশংসা করিতেন। বররুচি প্রধান আলঙ্কারিক। তিনি একদিন বলিলেন যে মাইকেলের অনুপ্রাস বড়ই মিষ্ট। আমি বলিলাম কি বলিতেছেন বুঝাইয়া দিউন; তিনি বলিলেন যেমন—"কিম্বা বিম্বা-ধরা রমা অম্বুরাশি তলে।" আমি বলিলাম এইরূপ মিষ্ট অনুপ্রাস সচ্ছন্দে মুখে মুখে করা যাইতে পারে।' তিনি বলিলেন, "একটা করুন।" আমি বলিলাম "কানুচেন-রাঘব-বাঘা গামুছা আনুচে কেটা?" কেবল বিতণ্ডা নহে, এরূপ বিদ্রূপ-ব্যঙ্গ সর্ব্বদাই হইত।

এক দিন বররুচি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "এমন কি পদার্থ আছে, যাহা থাকা ভাল, কিন্তু পাওয়া মন্দ ?" কালিদাস শুনিয়াই উত্তর করিলেন,—"কৃষ্ণ"। কৃষ্ণ থাকা ভাল, কিন্তু কৃষ্ণ প্রাপ্তি মন্দ। উত্তর ঝটিতি বলাতে, এবং কৃষ্ণপ্রাপ্তি কথা থাকাতে সকলেই হাস্য করিলেন, কিন্তু সদুত্তর হয় নাই বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিলেন। বররুচি অবশ্য বলিলেন, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর হয় নাই। পরদিন অশ্ব-যানে কাছারি আসিতে আসিতে, কালিদাস, বররুচির বাস ভবনের নিকট অশ্বযান থামাইয়া, এই কবিতাটি তাঁহাকে শকট হইতে বলিয়া আসিলেন ;—

"প্রহেলিকা অর্থ তব শুন হে রসিক,
নর হতে নারী তাহা ধরয়ে অধিক ;
বিশেষ কি কব আর বুঝে দেখ ভাই ?
কল্য না বলিতে পারি পাইয়াছি তাই ॥"

তাহার পর সভায় আসিয়া কালিদাস বলিলেন "বররুচির প্রহেলিকার সদর্থ আমি তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছি। বলিয়া আবার কবিতাটি আওড়াইলেন। বিক্রমাদিত্য বলিলেন—"এ যে বড় দায় হইল—প্রহেলিকার অর্থ প্রহেলিকায়, এরূপ কতবার চলিবে ?"

একদিন রাক্ষস মহাদম্ভে নবরত্ন সভা আক্রমণ করিলেন। প্রহেলিকায় কবিতা আবৃত্তি করিলেন।

"বার দিন, মাস তিন, থাকে থাকে থাকে,
আপনার পরিচয় দেয় যাকে তা'কে,
আপনি নির্ব্বাক থাকি দেয় পরিচয়,
দিন দিন নব মূর্ত্তি ধারণ করয় ;
সকলের হিত করে নিজ পরিচয়ে
প্রয়োজন সিদ্ধ হয় অনেক বিষয়ে ;
নবরত্ন-সভা মধ্যে বার মাস রয়,
না বুঝিয়া নব রত্ন হন পরাজয় ;"

কত রকম কদর্থ, বদর্থ, টানাবোনা অর্থ, গোলমেলে অর্থ, এক এক রত্ন, এক এক সময়ে, প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাক্ষস শির-সঞ্চালন করিয়া হুঙ্কার দেন মাত্র। এক দিন গেল, দুই দিন যায়, ক্রমে সভা হেট-তুণ্ড হইতে লাগিলেন। সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে আনন্দ নাই, যেন সত্য সত্যই বিক্রমাদিত্যের সভা কোন রাক্ষসী আক্রমণ করিয়াছে। না পারিলে রাজ্যে প্রজা নষ্ট করিবে, হয়ত রাজাকেই কত কষ্ট দিবে। এমন যে রাক্ষসের মন, তাহাও টলিল। হৃদয় গলিল। নব-রত্ন-সভাগৃহের প্রাচীর সংলগ্ন ধাতুময় ক্ষুদ্র যন্ত্রীর দিকে লক্ষ্য করিয়া এবং সকলের লক্ষ্য সেই দিকে আকর্ষণ করিয়া, রাক্ষস নবরত্ন-সভার সম্মান রক্ষা করিলেন। সভাস্থ সকলে আরকিডিমিসের মত, Ureka, Ureka "প্রাপ্তোস্মি প্রাপ্তোস্মি" করিয়া উঠিলেন; আবার আনন্দের স্রোত বহিয়া উঠিল।

পূর্ব্বে রামগতি ন্যায়রত্ন ও লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়-দ্বয়ের নাম করিয়াছি। তাঁহারা ছাড়া আর একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তৎকালে বহরমপুরে ছিলেন। তিনি ত্রিবেণীর প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পৌত্রের পৌত্র—উমাচরণ ভট্টাচার্য্য। তিনি নৈয়ায়িক, অথচ বিশেষ কাব্য রসজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার কাছে আমি কালিদাসের শকুন্তলা পড়িয়াছিলাম। সে গুরুদত্ত পুঁথিখানি এখনও আছে। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি উত্তর পাড়ায় আব্দার করিয়াছিলেন,—"বিচারের ফলে বিদায়ের পরিমাণ স্থির করিতে হইবে।" সে কথা কেহ শুনিল না। সুতরাং তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন। সরকারী চাকরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতএব এখন উমাচরণ ভট্টাচার্য্য, বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখরের মত—ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত নহেন।

তিনি তৎকালে বহরমপুরে সদরালার সেরেস্তাদার ছিলেন। সেরেস্তা ছাড়িয়া উঠিবার তাঁহার অবকাশ হইত না। রাক্ষসাধমকে নবরত্নের নিত্য-লীলার নিত্যবিবরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাছে পেশ করিতে হইত। তিনিও এক এক দিন সভায় সমস্যা প্রেরণ করিতেন। দীনবন্ধু মিত্র

মহাশয়ও কচিৎ সভায় সমস্যা দিতেন। তাঁহার একটী সমস্যা মনে পড়িতেছে।

"একাকী দাঁড়ায়ে সতী, ভারতী রূপিণী
যত থাকে, তত যায়,-যামিনী শোভিনী।"

নবরত্ন সভা বসিতে বিলম্ব দেখিয়া, আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সমীপে ইহা পেশ করিলাম। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, হয়ত কত স্যায়-শাস্ত্র আলোড়িয়া, কত কাব্য-কলাপ মনে মনে আওড়াইয়া, শেষে সমাধা করিলেন,—"রজনীগন্ধ ফুলের ডাঁটা।" মিলাইয়া দিতেছেন, বলিতেছেন,—"রজনীগন্ধা ত যামিনী শোভিনী বটেই, শ্বেতবর্ণা বলিয়া ভারতী-রূপিণী, আর যত অধিক দিন থাকে, তত ফুল খসিয়া খসিয়া যায়।" আমরা প্রহেলিকার অর্থ শুনিয়া তাঁহার লক্ষ্য-শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলাম। পরে নবরত্ন প্রকৃত অর্থ ভাঙ্গিয়া দিলেন—জ্বলন্ত বাতি।

তাৎকালিক আমোদ প্রমোদের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বলিয়া এই সকল ফষ্টি-নাষ্টি সংগ্রহ করিয়া, বহুদিন পরে প্রকাশ করিতেছি।

আমার বহরমপুরে যাওয়ার কিছুদিন পরে, বঙ্কিম বাবু বহরমপুরে যান। তিনি এরূপ সভায় কখনই মিশিতেন না। কেন তাহার আভাস, প্রেসিডেন্সি কলেজে, তাঁহার যাওয়া আসার পরিচয়ে একটু দিয়াছি। এখন আর একটু বলিতে হইতেছে। তাৎকালিক বঙ্কিম চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়া, তাঁহার অহঙ্কারের কথা না বলা, ঘোরতর বিড়ম্বনা। বঙ্কিম বাবু আমাদের সমাজে, সা হত্যে গোলাপ ফুল। গোলাপের কেবল পাপড়ির রং দেখিবে, মিঠা মিঠা সৌরভ দেখিবে, ঢল ঢল রূপ দেখিবে; গোলাপের বৃন্তে যে কাঁটা আছে, তাহা কি দেখিতে নাই? গোলাপে কাঁটা আছে বলিয়া, কি গোলাপের মর্য্যাদা কম?

"দেবের দুর্লভ নিধি, বিরলে বসিয়া বিধি
সমাদরে সৃজন করেছে।
নরের নিষ্ঠুর করে পাছে লণ্ড ভণ্ড করে
এই ভয়ে কণ্টকে ঘিরেছে।"

এই রূপ বর্ণনা করিয়া পিতৃদেব ঋতুবর্ণনে গোলাপের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন। বঙ্কিম সম্বন্ধেও যদি তাই হয়? যদি সামাজিকদের হাতে "লণ্ড ভণ্ড" হইবার ভয়ে, বঙ্কিমকে কেহ অহঙ্কারের আলোক আবরণ দিয়া, ঘিরিয়া রাখিয়া থাকেন?

অত কথা বুঝি আর না বুঝি, এই বুঝি যে, বঙ্কিমকে অহঙ্কারী বলিলে তাঁহার মর্য্যাদা হানি করা হয় না। কোন সত্য কথাতে, কাহারও হানি করা হয় না; বিশেষ বঙ্কিম অহঙ্কারী ছিলেন বলিয়া, তিনি দাম্ভিক ছিলেন, এমন কথা বলিতেছি না। পিতৃদেব ও আমার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় কাহিনী গোড়া হইতেই বলা ভাল।

৬০।৬১ সালে পিতা যখন জাহানাবাদে মুন্সেফ, বঙ্কিম বাবুর মেজ দাদা সঞ্জীবচন্দ্র, তখন জাহানাবাদে সব রেজিষ্ট্রার হইয়া গেলেন। সেই অবধি তাঁহাদের দুইজনে বন্ধুত্ব হয়। বঙ্কিম বাবু বহরমপুরে যাইতেছেন, বলিয়া সঞ্জীব বাবু পিতাকে পত্র লেখেন, আমাদের বাসায় উঠিবেন বলিয়া জানাইয়া রাখেন এবং কাছারির নিকট বঙ্কিম বাবুর জন্য একটি বাটী ভাড়া করিবার জন্য অনুরোধ করেন। আমি অবশ্য পাঁচটা বাড়ী দেখিয়া শুনিয়া, একটি বাড়ী ঠিক করিয়া ঝাড়াইয়া ঝুড়াইয়া রাখিলাম; জল তুলাইয়া রাখিলাম; একটি ঠিকা চাকরও রাখিয়া দিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলা পড়িয়া আমি কাব্যে গুণ পণায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং কেবল আতিথ্যের খাতিরে নহে, প্রকৃত ভক্তিভরে, আনন্দ সহকারে, এই সকল কার্য্য করিয়াছিলাম। যথাকালে বঙ্কিম বাবু আসিলেন, আহারাদি করিলেন, শুনিলেন যে, আমি গৃহবাসী গঙ্গাচরণ বাবুর পুত্র, বি-এল্ পাস করিয়া বহরমপুরে ওকালতি করিতে আসিয়াছি। আহারের পর বিশ্রাম করিলেন; বিশ্রামের পর বৈকালে আমরা পিতাপুত্রে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে তাঁহার বাড়ী দেখাইতে লইয়া গেলাম। বাড়ী দেখিলেন, পছন্দ করিলেন, ঠিকা চাকর তিন খানা কেদারা বাহির করিয়া দিল, আমরা তিন জনে ক্ষণেক বসিয়া রহিলাম, বাসায় সকলে ফিরিয়া আসিলাম, বঙ্কিম বাবু সে রাত্রি আমাদের বাসাতেই যাপন করিলেন। পিতার সহিত কথাবর্ত্তা চলিল। পরদিন প্রাতে

তাঁহার জিনিস পত্র, চাকর ব্রাহ্মণ লইয়া, গাড়ী করিয়া তিনি নিজ বাসায় গেলেন, আমি গাড়ী করিয়া দিলাম, গাড়িতে তুলিয়া দিলাম ; হায়রে হায়! তখন কার কথা মনে পড়িলে, এখনও বুক ফাটে! এ পর্য্যন্ত বঙ্কিম বাবু আমার সহিত একটি কথাও কহিলেন না ; অধীনের প্রতি কপাল-কুণ্ডলাকারের করুণা কটাক্ষ হইলনা। বাবা সব বুঝেন, সব জানেন, সব দেখিতে ছিলেন, আমি ফিরিয়া উপরে গেলে, বলিলেন "বঙ্কিম গেল হে?" "আমি বলিলাম হাঁ"। "তোমার সহিত দু'দিনে একটিও কথা হয় নাই?" আমি বলিলাম "কথা কি, আমি যে একটা জীব, এই বাসায় থাকি, সে খবর হয়ত, তাঁহাতে এখনও পৌছে নাই।" পিতা বলিলেন "তাই বটে।" বলিয়া উচ্চ হাস্য করিতে লাগিলেন। তাহার হাঁসির ফোয়ারায় আমার মনের ময়লা ধুইয়া গেল ; পিতৃগৌরবে আমি গৌরবান্বিত, আমিও হাসিতে লাগিলাম।

কাছারীর ফেরতা পিতা পুত্র দুইজনে বঙ্কিমবাবুর সুবিধা, অসুবিধা কতদূর হইতেছে দেখিবার জন্য, বঙ্কিম বাবুর বাসায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম। বঙ্কিম বাবু "আসুন" বলিয়া পিতাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এবার মনে হইল, পিতাকে আসুনের সম্বোধনে, ব্রাকেটের মধ্যে আমিও যেন আছি। আমার নিযুক্ত সেই চাকর, সেইরূপ তিনখানি কেদারা বাহির করিয়া দিল ; বঙ্কিম বাবুর আদেশমত পিতাকে তামাক দিল, আমরা তিন জনে বসিয়া রহিলাম। পিতার সহিত বঙ্কিম বাবুর কথোপ-কথন হইতে লাগিল। আমি জনান্তিকে দুই এক কথার টোপ ফেলিতে লাগিলাম। বঙ্কিমবাবু কিন্তু টোপ ধরিলেন না। তবে আমি এবার বুক বাঁধিয়া গিয়াছি, বঙ্কিম বাবুর এই ভাব গায়ে কিন্তু মাখিলাম না ; তবে মনে মনে এমন ভাবটা হইয়া থাকিবে যে,—

"কাদা মাখা সার হ'ল মোর, মাছ ধরা হলনা।"

এই রূপে দিন যায়। বঙ্কিম বাবু নিজেই বলিয়াছেন, দিন কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। আমারও দিন আটকাইয়া রহিল না। যতদিন পিতা বহরমপুরে ছিলেন, ততদিন বঙ্কিমবাবু মাঝে মাঝে এক একবার আসিতেন, পিতার সহিত গল্প গুজোব করিয়া চলিয়া যাইতেন। তাহার পর পিতৃদেব

চলিয়া গেলেন, আমি একা বাসায় রহিলাম। বঙ্কিমবাবু আর আসে না। আমিও অবশ্য যাই না।

কিসের একটা ৪।৫ দিনর ছুটি হইল। বঙ্কিম বাবুও বাড়ী আসিবেন, আমিও বাড়ী আসিব। নলহাটিতে আসিয়া দুইজনে দেখা সাক্ষাৎ। সাত সাত ঘণ্টা কাল, নলহাটিতে বিশ্রাম বা কষ্টভোগ করিতে হইবে, তাহার পর হয়ত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান গাড়ী আসিবে, নয়ত দুই ঘণ্টা বিলম্বেও আসিতে পারে। সেকেণ্ড ক্লাসের বিশ্রাম-ঘরে বসিয়া বঙ্কিমবাবু ও আমি। দিন যায় ত, ক্ষণ যায় না। বহুদিন গিয়াছে, কিন্তু এবার বঙ্কিম বাবু ক্ষণ কাটাইতে পারিলেন না। শুভক্ষণে, অতি শুভক্ষণে, বঙ্কিম বাবু কথা কহিতে লাগিলেন। একথা, সে কথা, ও কথা, কোথা হইতে কিরূপ করিয়া পড়িল—রহস্যকার রেনল্ডের কথা। তথন দুই জনে অসি-ধারে রেনল্ডের মুণ্ডপাত করিয়া, বসিয়া বসিয়া তৃপ্তিপূর্ব্বক, দুই জনে সেই মুড়ি চিবাইতে লাগিলাম। চর্ব্বণের সেই রসগ্রহে, দুইজনের ভিতরে সহৃদয়তা জন্মিল,' দিনানুদিন, সেই সহৃদয়তা ক্রমে ক্রমে অবিচ্ছেদে বিশেষ বন্ধুতায় পরিণত হইয়াছিল। তিনি বড়, আমি ছোট ; তিনি বয়সে বড় জাতিতে বড়, বিদ্যায় বড়, কৃতিত্বে বড়, কিন্তু ছোট বড় বলিয়া বন্ধুত্বে কোন ব্যাঘাত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর "বন্ধুবৎসলাতার" পরিচয় চন্দ্রনাথ দাদা যথেষ্ট দিয়াছেন। আমি আর চন্দনে সুগন্ধি প্রক্ষেপ করিব কেন? আমাদের এই নব বন্ধুতার অচিরাৎ একরূপ পরিণতি হইয়াছিল। দুই দিকে তাহার দুইরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। সেই কথার একটু সবিস্তার পরিচয় এক্ষণে দিব। পাঠক, আবার বলি, আমার আত্মম্ভরিতা আবার মার্জ্জনা করিবেন।

বহু পরে বঙ্কিমচন্দ্র "লুপ্ত-রত্নোদ্ধারে"র ভূমিকায় বলিতেছেন,—"উহাতেই (আলালের ঘরের দুলাল হইতেই) প্রথম এই বাঙ্গলা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গলা সর্ব্বজনমধ্যে কথিত ও প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়। * * * বাঙ্গলা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলাল। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত

নয়। কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের পর হইতে, বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্গলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা লিখিবার সময় বঙ্কিমবাবু যে সম্যক্ প্রকারে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, এমন আমার বোধ হয় না। তাঁহার ভাষার "লম্ফত্যাগ" "নিদ্রা-গমন" প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থ কুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। আর কায়স্থ-কুলাধম আমি, ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভঙ্গি লইয়া বঙ্কিম বাবুর সহিত বিচার বিতর্ক করিয়াছি। মৃচ্ছকটিকা নাটকে দেখিবেন, প্রাড়্বিবাকের পার্শ্বোপবিষ্ট কায়স্থ প্রাকৃতে কথা কহিতেছেন। কালীপ্রসন্ন সিংহ হউন, দীনবন্ধু হউন, প্যারীচাঁদ হউন, আর রাজেন্দ্রলালই হউন,--আমাদের প্রাকৃতের দিকে একটু টান আছে। আমরা বুঝি ধর্ম্ম কার্য্যে, প্রত্নতত্ত্বে, ছটা-ছন্দ বিভূষিত কবিতায়, সেই কবিতার লালিত্যে ও মাধুর্য্যে, সংস্কৃতের প্রয়োজন। সংস্কৃত আমাদের গুরুজন; কিন্তু গুরুজন লইয়া ত সংসার হয় না। প্রধানত পুত্র-কলত্র, দাস-দাসী, বন্ধু-বান্ধব, এই সকল লইয়াই সংসার। এ সকল ত সংস্কৃত নয়, প্রাকৃত। তা' বলিয়া কেবল বিষয় কার্য্যের জন্য প্রাকৃত বা বাঙ্গালার প্রয়োজন এমন নহে। জীবন্ত কাব্যের বাঙ্গালাই জান অর্থাৎ প্রাণ।

যে কবিতা বুকের ভিতর দিয়া হৃদয়ে বসিয়া যায়, তাহা বাঙ্গালির পক্ষে বাঙ্গলাতেই হওয়া সম্ভব। সাধারণ বর্ণনায়, সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার বিতর্ক অনেক দিন চলিল। বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষে "গরু ঠেঙ্গাইতে" লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়রূপ ভাষার সমাবেশ হইল। তখন বিষবৃক্ষ হাতের লেখায়,—ছাপান হয় নাই।

মধ্যবর্ত্তিনী ভাষা-প্রচারের সূচনা হইতেই "বঙ্গদর্শন" প্রচারের সূচনা আরম্ভ হইল। কত দিন, কত জল্পনা চলিতে লাগিল। শেষে

কয়জন লেখকের নাম দিয়া ভবানীপুরের খৃষ্টান ব্রজমাধব বসু প্রকাশক রূপে, বঙ্গদর্শনের বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলেন।

লেখকগণের নাম বাহির হইল—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।

" " হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

" " জগদীশনাথ রায়।

" " তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

" " কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

" " রামদাস সেন।

এবং " অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

আর সকলে নামজাদা, আমিই কেবল নাম-হীন, অথচ আমায় নাম ছাপা হইল। ইংরাজী, সংস্কৃত, বাঙ্গলা—নানা পুস্তক ঘাঁটিয়া আমি "উদ্দীপনা" প্রবন্ধ প্রণয়ন করিলাম। বঙ্কিম বাবু বড় খুসি। আমি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চুপি চুপি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়কে দেখাইলাম। 'ভোগ্য' 'ভোজ্য' এই দু'টা কথায়, আমি একটা কি গোল করিয়াছিলাম। ব্যাকরণ ভুলই করিয়াছিলাম। তিনি সেটি সংশোধন করিয়া দেন। ব্রজমাধব প্রথম সংখ্যায়, আমার সেই প্রবন্ধেব টিকি কাটিয়া বাহির করিলেন। প্রবন্ধের মুখটুকুও দেখা গেল না। বঙ্কিম বাবু এপলজি করিলেন বটে, আমি কিন্তু মনে মনে চটিয়া লাল। ওদিকে পিতাকে বঙ্গদর্শন পাঠান হয় নাই। তিনি চটিয়া আমাকে লিখিলেন—"Why does not my friend Bankim Chandra send his Banga-darsan to me? I am able to understard it and can affaod to pay for it.

ঐ ক্ষুদ্র কথা কয়টিতে পিতার বঙ্গসাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং বন্ধুর সামান্য অবহেলায় "রাগ" বেশ বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য বঙ্গদর্শন তাঁহার নিকট প্রেরিত হইল, এবং তিনি পাঠ করিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

১৮৭০ সালের ২৯শে মার্চ্চ, পিতা পাকা সবজজ হন। পাকা পদ পাইয়া প্রথমে চট্টগ্রামে গমন করেন। সেই সময়ে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা হয়। বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, সেটির উল্লেখ করা আমি কর্ত্তব্য মনে করি। সাহিত্য কেবল মাত্র আধ্যাত্মিক ভাব লইয়া অর্থাৎ রস লইয়া, নাড়া চাড়া করে। সাহিত্যের এলেকা ছাড়া আরও অনেক গুরুতর আধ্যাত্মিক বিষয় আছে। সেই রূপ একটি আধ্যাত্মিক ঘটনার কথা বলিতেছি। ১২৯৩ সালের শ্রাবণের "নবজীবনে" যাহা লিখিয়া ছিলাম, তাহাই উদ্ধৃত করিতেছি :—

ভবিষ্যতের ছোটখাট ঘটনা আমি কতবার স্বপ্নে দেখিয়াছি, তাহা বলিতেই পারি না। সাঙ্গোপাঙ্গ একটি গুরুতর ঘটনা আমি একবার স্বপ্নে দেখিয়াছিলাম। আমি একরাত্রি বহরমপুরে থাকিতে হঠাৎ * স্বপ্নে দেখি যে, পূজ্যপাদ পিতৃদেব যেন চট্টগ্রামে কর্ম্ম করিতে যাইতেছেন, আর আমি তাঁহাকে কলিকাতায় রাত্রিকালে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিতে গিয়াছি। আলোয় জাহাজ ঝক্ ঝক্ করিতেছে, খালাসীরা কল্ কল্ করিতেছে, নীচে গঙ্গা কুল কুল করিতেছে, আর উপরে বায়ু ঝরঝর করিয়া বহিতেছে। স্বপ্নের কথা দুই এক জনকে বলিয়াছিলাম। ইহার কয়মাস পরে, ঠিক সেইরূপ ঘটনা হইল। তেমনই আলো, তেমনই গঙ্গা; আমার বোধ হইল, সেই রেঙ্গুন নামা জাহাজই আমি স্বপ্নে দেখিয়া ছিলাম। স্বপ্ন মিথ্যা আমি কখনই বলিতে পারি না।

১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইল। সেই বৎসর দুর্গোৎসবের পর, মাতাঠাকুরাণীর বায়ু রোগ বৃদ্ধি পাওয়ায়, আমি ওকালতি ছাড়িয়া দিলাম। বহরমপুরে আর গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম। ৮০ সালের বৈশাখ হইতে বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ড বঙ্কিম বাবুদিগের বাড়ী কাঁটালপাড়া হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল। সঞ্জীব বাবু কাঁটাল পাড়াতেই প্রেস স্থাপিত করিলেন। ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক অর্থাৎ আমি বাড়ী বসিয়া থাকিতে আরম্ভ করার এক বৎসর পরে, 'সাধারণী' প্রকাশিত

* হঠাৎ বলিবার ভাব এই যে, যে বিষয় স্বপ্ন দেখি, সে বিষয়ে জাগ্রত অবস্থায়, কোন তোলা পাড়া করি নাই।

হইল। আর সেই মাস হইতে, আমি 'বঙ্গদর্শনের' প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিতে লাগিলাম। 'সাধারণী'ও 'বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে' কাঁটাল-পাড়ায় ছাপা হইতে লাগিল। ৮১ সালের শ্রাবণ মাসে, আমি চুঁচুড়ার কদমতলায়, আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন, আমাদের আর একটি বাড়ীতে, 'সাধারণী যন্ত্রালয়' স্থাপনা করিয়া সাধারণী প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঐ সালের অগ্রহায়ণ মাসে পিতার "ঋতুবর্ণন" প্রকাশিত হইল। ঋতু-বর্ণনের উৎসর্গপত্র অতি বিচিত্র বলিয়া এই স্থলে উদ্ধৃত করিলাম ;—

প্রাণোপম প্রিয় পুত্র অক্ষয়চন্দ্র !

তুমি জান, আমাকে রাজকার্য্য-নিবন্ধন সময়ে সময়ে বিরল-বান্ধব স্থানে অবস্থান করিতে হইয়াছিল ; সেই সেই স্থানে অবকাশ কাল কথঞ্চিৎ সুখে যাপন করণার্থ, পদ্য রচনা করিতে চেষ্টা করিতাম, সেই চেষ্টার ফলস্বরূপ এই "ঋতুবর্ণন" অভিহিত গ্রন্থখানি হইয়াছে। গ্রন্থখানি সামান্য, এজন্য কোন বড় লোককে উৎসর্গ না করিয়া, ইহা তোমাকেই অর্পণ করিলাম। তুমি সন্তান, পিতৃদত্ত সম্পত্তি ভাল হউক হউক, তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিতেই হইবে।

অগ্রহায়ণ ১২৮১ } শ্রীগঙ্গাচরণ সরকার।

৮২ সালের বৈশাখে বঙ্কিম বাবু 'বঙ্গদর্শনে' 'ঋতুবর্ণনে'র সমালোচনা করিলেন। বলিলেন ঋতুবর্ণন রিয়ালিস্‌টিক্। বৃত্রসংহার আইডিয়া-লিস্‌টিক্। তাঁহার কথা তিনিই বলুন না কেন ?

"সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত বর্ণনা-কাব্যের উদ্দেশ্য, স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তাহার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে—এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।

আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য অবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। তাঁহারা প্রকৃতি সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লয়েন। যাহা অসুন্দর তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য্য নাই,—যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ, কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, "যে আলোক

জলে স্থলে কোথাও নাই” সেই আত্ম-চিত্ত-প্রসূত উজ্জ্বল হৈমকিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্য্যের অতি প্রাকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতি-প্রাকৃত কিন্তু অপ্রকৃত নহে। * * * আমরা দুইজন বাঙ্গালি কবির কাব্যকে উদাহরণ স্বরূপ প্রয়োগ করিয়া এই কথাটি সুস্পষ্ট করিতে চাহি। যে কাব্যের উদ্দেশ্য শোধন, হেম বাবু প্রণীত “বৃত্রসংহার” তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি পরিশুদ্ধ হইয়া, মনোহর নবীন পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, লোকের মনোমোহন করিতেছেন। মানব স্বভাব সংশুদ্ধ হইয়া দৈব এবং আসুরিক প্রকৃতিতে পরিণত হইয়াছে; কর্কশ পৃথিবী পরিশুদ্ধা হইয়া স্বর্গে ও নৈমিষারণ্যে পরিণত হইয়াছে। যে জ্যোতিঃ দেবগণের শিরোমণ্ডলে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। যে জ্বালা শচীর কটাক্ষে, তাহা জগতে নাই—কবির হৃদয়ে আছে। সংসারকে শোধন করিয়া, কবি আপনার কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বাবু গঙ্গাচরণ সরকার প্রণীত ঋতুবর্ণন। ইহাতে প্রকৃতির সংশোধন উদ্দিষ্ট নহে—প্রকৃত বর্ণনা, স্বরূপ চিত্র, বাহ্য জগতের আলোক চিত্র, ইহার উদ্দেশ্য। উভয়েই কৃতকার্য্য, উভয়েই সুকবি। কিন্তু প্রভেদও অতি স্পষ্ট। একটি উদাহরণে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। উভয়েরই কাব্যে বিদ্যুৎ আছে—গঙ্গাচরণ বাবুর কাব্যে বিদ্যুৎ, উৎকৃষ্ট রূপে আত্মকার্য্য সম্পন্ন করে, যথা,—

> “ঘনতম ঘোর ঘটা ক্রমে ঘোরতর।
> চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, অতি ভয়ঙ্কর।
> চপলা চমকি প্রভা করিছে বাহির।
> ভীষণ নিনাদে ঘন নির্ঘোষে গভীর।”

চারি ছত্রে এই চিত্রটি সম্পূর্ণ, ইহাতে অসম্পূর্ণতা কিছুই নাই। দোষ ধরিবার কথা কিছুই নাই। যাহা প্রকৃত, তাহার কিছুরই অভাব নাই; তাহার অতিরিক্ত একটি কপর্দ্দকও নাই। পরে হেম বাবুর বিদ্যুৎ দেখ,—

"কিম্বা গিরিশৃঙ্গ মাজি, মধ্যে যথা তেজে সাজি,
ক্ষণ-প্রভা খেলে রঙ্গে করি ঘোর ঘটা।
খেলে রঙ্গে ভীম ভঙ্গি, শিখর শিখর লঙ্ঘি,
শৈলে শৈলে আঘাতিয়া স্থূল তীক্ষ্ণ ছটা॥
নিমেষে নিমেষে ভঙ্গ, দগ্ধ গিরিচূড়া অঙ্গ,
অদ্রিকুল ভয়াকুল ছাড়ি ঘোর রাব।
বেগে দীপ্ত গিরি-কায়, বিদ্যুত আবার ধায়,
ছাড়ায়ে জ্বলন্ত শিখা উল্লাসিত ভাব॥

স্থানান্তরে বিদ্যুত আরও শোধিত, উৎকর্ষতা-প্রাপ্ত;—

"কেমনে ভুলিব বল, মেঘে যবে আখণ্ডল,
বসিত কার্ম্মুক ধরি করে।
তুই সে মেঘের অঙ্গে, খেলাতিস্ কত রঙ্গে,
ঘটা করি, লহরে লহরে॥"

* * * বাঙ্গালির সাহিত্যে শোধন এবং বর্ণন উভয়বিধ কাব্যেরই প্রাচুর্য্য আছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব গীতিকাব্য প্রণেতৃগণ শোধন পটু। বর্ণন-কাব্য-প্রণেতৃগণ মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত একজন।

ইহাও বক্তব্য যে গঙ্গাচরণ বাবু স্পষ্টতঃ দেখাইয়াছেন যে, তিনি শোধন কাব্যেও অপটু নহেন। উদাহরণস্বরূপ প্রভাত বর্ণন, হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

মরি কি তরল অমল কিরণে,
ঢল ঢল আভা ঢালিয়া ভুবনে,
পুলক-জনক আলোক ভূষণে,
প্রাচী নভোদ্বারে উষা উপনীত,—
আরক্ত অধরে কিবা হাসি হাসে,
সে হাসি হিল্লোলে চরাচর ভাসে,
নিরাশ তামস মিশায় আকাশে,
হেরিয়া হইল অখিল মোহিত।
মোহিনী মাধুরী করি দরশন,

প্রণয়-প্রয়াসে আপনি তপন,
আদরেতে কর করে প্রসারণ,
রূপসীরে যেন হৃদয়ে ধরিতে ;
অপরূপ রুচি মানস-রঞ্জন,
শান্তির সহিত শোভার মিলন,
সে রুচি দেখাতে বিহঙ্গমগণ
জাগায় জগৎ মধুর ধ্বনিতে

———

সুধীর গমনে সমীর শীতল
চলেছে জুড়াতে তাপিত ভূতল ;
প্রফুল্ল-আননে প্রসূন সকল
পরশনে তার নাচে ধীরে ধীরে ;
নলিনী নিকর তাহার হিল্লোলে,
কাচ সম স্বচ্ছ সরসীর কোলে,
হাসি হাসি মুখে আধ আধ দোলে,
নিরখি গগনে নবীন মিহিরে।

রায়ালিস্‌টিক আইডিয়ালিস্‌টিক বলিয়া বিভেদ করা মন্দ নয়। বুঝাইবার পক্ষে ভালই বটে। কিন্তু "ঋতু বর্ণনে" গৃহদাহ বর্ণনায় এই যে;—

ধেনুপাল, আল থাল, উল্ক ফুল্ক চাহিছে,
দগ্ধ-কায় শারিকায় মৃত্যুগীত গাহিছে।

এই যে কবিতা, ইহা রিয়ালিস্‌টিক? না আইডিয়ালিস্‌টিক? আমি মনে করি দুই এর মিশাল এবং তাহাই ভাল। "ঋতু বর্ণনে" সেরূপ পদ্যের অভাব নাই। যেমন নিদাঘ নিশীথের বর্ণন ;—

"হাসি হাসি স্রোতস্বতী, করি ধীরি ধীরি গতি,
নিজ নাথ সিন্ধু পানে যায়।
প্রতিবিম্ব তারকার, যেন কত হীরা হার,
তটিনীর অঙ্গে শোভা পায়॥

লতিকারে কোলে লয়ে, নিতান্ত নীরব হয়ে,
স্থিরভাবে আছে তরুচয়।
প্রিয়তমা নিদ্রা যায়, পাছে বিঘ্ন হয় তায়,
নাহি নড়ে কথা নাহি কয়॥"

মধুর তান, বেণুর গান,—কিরূপ শুনুন,—

"তখন বিপিনে হরি, বিম্বাধরে বেণু ধরি,
ধরিলেন গোপী-গুণ-গীত।
চতুর্দ্দিকে সুধাবর্ষে, প্রাণীকুল পিয়ে হর্ষে,
চরাচর হয় চমকিত॥
প্রভাতীয় কলরব, না করে বিহঙ্গ সব,
আছে তারা শাখায় সুস্থির।
দিন-পতি-দুহিতার, না হয় কল্লোল আর,
শান্তভাব গতি অতি ধীর॥
মলয়ার সমীরণ, করি রব আকর্ণন,
বৃন্দাবন না পারে ত্যজিতে।
হইয়া প্রফুল্ল আস্য, ফুলরাজি করে হাস্য,
ধরা কোলে বেণুর ধ্বনিতে॥
ঋষিগণ যেতে স্নানে, মোহিত হইল গানে,
পথে আর পদ নাহি চলে।
শুনি তান তরু-দল, কত প্রেম অশ্রুজল,
ফেলিতেছে শিশিরের ছলে॥
ব্রজ-গোপ-বালা যত, নিকেতনে নিদ্রাগত,
বাঁশীরব শ্রবণে পশিল।
শুনি মাত্র চমকিত, হয় সভে জাগরিত,
নীলোৎপল নয়ন খুলিল॥

আমি সমালোচনা করিতেছি না; পিতাকে পুত্রের প্রতিষ্ঠাপত্র প্রদান করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পিতা ত নিজেই বলিয়াছেন; "পিতৃ দত্ত সম্পত্তি ভাল হউক, বা না হউক, আমাকে আদরের সহিত গ্রহণ

করিতেই হইবে।" আমি কেবল বঙ্কিম বাবুর কথায় একটা কথা তুলিতে ছিলাম। স্বভাব বর্ণনায় যে, অতি-প্রাকৃত থাকে না এমন নহে; বরং প্রকৃতের সহিত অতি অতি-প্রাকৃত মিশিয়া ঘুসিয়া লুকাইয়া চুরাইয়া থাকিলে, কাব্য অতি সুন্দর হয়।

পিতা যখন যশোহরে, তখনই বঙ্গদর্শন প্রচারিত হয়; সাধারণী প্রকাশিত হয়; আর ঋতুবর্ণন প্রথমার্দ্ধ অমৃতবাজার যন্ত্রে, শেষার্দ্ধ সাধারণী যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া, চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। পিতার যশোহরে থাকা সময়ের মধ্যে, আরও দুই চারিটি ঘটনা হয়। তাহার মধ্যে একটির সাহিত্যের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ বলিয়া উল্লেখ যোগ্য;— দীনবন্ধু বাবু প্রণীত লীলাবতী নাটকের অভিনয়। বঙ্কিম বাবুতে আমাতে লীলাবতীর একরূপ পরিবর্ত্তন করি। নাটকে ভোলানাথের কন্যা অহল্যাকে লইয়া যে একটি উপকথা লাগান আছে, সেই ভাগটি পরিত্যাগ করা হয়। বঙ্কিম বাবু লীলাবতীর প্রণয়োন্মাদের অবস্থার Raving Scene প্রলাপ-দৃশ্য বসাইয়া দেন। আর টুক্‌রা টাক্‌রা পরিবর্ত্তন বিস্তর করা হইয়াছিল। দীনবন্ধু বাবু প্রথমে কি কাটা হইয়াছে না হইয়াছে না জানিয়া, বলিয়াছিলেন যে, "এক একটি শব্দ কাটা হইয়াছে, আর আমার শরীর হইতে রক্তপাত হইয়াছে। তবে বঙ্কিম ভাই, আর অক্ষয় ছেলে, ইহাদের ভালবাসি বলিয়া, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নাই।" এই অভিনয় রঙ্গে ৭।৮ টি গান ছিল; দুই একটি আমার কৃত; আর অনেকগুলি সঞ্জীব বাবুর রচিত। তাহার একটি উল্লেখ করা আবশ্যক। এক সময়ে এই গানটির আমি বৈদ্যনাথ, বহরমপুর, নাটোর, কলিকাতা এবং আমাদের অঞ্চলে সমানে গাহিতে শুনিয়াছি।

পিলু, যৎ।

"আগে যদি জানিতাম কপাল আমার,
দলিতাম আশালতা অঙ্কুরে তাহার।
যত পেলে আঁখি জল, তত সে হ'ল প্রবল,
এখন লতা ভরে—তরু মরে কে করে বিহিত তার?"

বোধ করি ১৮৭২ সালের গুডফ্রাইডের সময় চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ মল্লিক বাড়ীতে লীলাবতীর প্রথম অভিনয় হইল। কলিকাতা হইতে দীনবন্ধু বাবু প্রভৃতি, যশোহর হইতে পিতা প্রভৃতি, ভাট পাড়া হইতে ভট্টাচার্য্যগণ, কাঁটাল পাড়া হইতে সঞ্জীব বাবু প্রভৃতি, আমাদের স্বগ্রামের মহারাজ দুর্গাচরণ লাহা প্রভৃতি-শূরবীর রথীগণ শ্রোতা। বঙ্কিম বাবু গুডফ্রাইডের ছুটি পাইয়াও আসিতে পারেন নাই। বাগবাজারের নীলদর্পণের দল অর্থাৎ অমৃতলাল বসু প্রভৃতি তাঁহারাও নিমন্ত্রিত শ্রোতা।

খুব চুটিয়ে অভিনয় হইল। তখন থিয়েটরে "কীর্ত্তন" প্রবেশ করে নাই, আমরা লীলাবতীর মুখে খাটি মনোহরসাহী সুর লাগাইয়াছিলাম।—

"কে বলে গোকুলে আমার কানাই নাই?
আমি সতত তার অঙ্গের সৌরভ পাই।
আমার হিয়ার মাঝে, ও তার নূপুর বাজে,
ঐ রুণু ঝুনু বাজে, তোরা শোন গো সবাই।"

এই সুরে সকলে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। পাউণ্ড শিলিং পেন্স গণনায় যাপিত-জীবন মহারাজকে সকলে কঠোর প্রাণ বলিয়া জানিত, তিনিও বালকের ন্যায় কাঁদিয়া আকুল। দীনবন্ধু বাবু আমাদের সাত খুন মাপ করিলেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ভাটপাড়ার ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা ত দুই হাতে দুই পায়ের ধূলা লইয়া, মহাআনন্দে মহা আশীর্ব্বাদ করিলেন। বলিলেন "যেমনটা শ্রোত ছেলাম, তেমনটাই দ্যাখলাম্।" সে রাত্রিতে আমাদের কিন্তু অসম্পূর্ণতা ছিল। ললিত-লীলাবতীর মিলনের পরিচায়ক তেমন একটি ভাল গান বাঁধা হয় নাই। আমরা করিলাম কি, প্রাচীন খেমটা গান ভাঙ্গিয়া:—

আয় আয় মকর গঙ্গাজল!
লীলাবতীর বিয়ে হবে, সইতে বাড়ু জল।

কোথা গো লবঙ্গ লতা, কোথা গো উর্ব্বশী কোথা,
*　　*　　*　　*
ঘোমটার ভিতর খেম্‌টা নাচ'ব ঝমঝমাইয়ে মল।

এইরূপ একটা গান করিয়া, সেদিনের আসর-রক্ষা, রস-রক্ষা, মান-রক্ষা করিলাম। পরদিন পিতাকে অনুরোধ করিলাম যে, সেক্সপিয়ারের টেম্পেষ্ট নাটকের শেষ মিলনের গানটি যেমন প্রস্‌পিরর উক্তিতে আছে, সেইরূপ লীলাবতীর শ্রীনাথ মামার উক্তিতে একটি গান আমাদের করিয়া দিতে হইবে। তিনি স্বীকৃত হইলেন। বিশেষ করিয়া শ্রীনাথ মামা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, আমাদের স্বগ্রামবাসী দীননাথ ধর দাদা শ্রীনাথের রঙ্গ করিতেন; তিনি আমাদের অভিনয় সমিতির একজন অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁহার গান-শক্তিও বেশ ছিল। এখনও আছে।

পিতা পরদিন যশোহর চলিয়া গেলেন। তার পরদিন পৌছন পত্রের সঙ্গে গান আসিল। পিতা গাড়ীতেই গানটি রচনা করিয়াছিলেন। আমাদের গাওয়া সেই সুর, সেই তাল,—

"আজি কি সুখের উদয়!
লীলার সঙ্গে　ললিতের আজ　দিলাম পরিণয়॥
দুখ-তম তিরহিল,　সুখ-ভানু প্রকাশিল,
রোদনের পুরী হলো　আনন্দ আলয়।
যদি সব সভা-জন,　এই সুখে সুখী হন,
বুঝিব সফল শ্রম,　সফল আশয়॥

তাহার পরের কয়বারকার অভিনয়ে, আমরা এই গান গাহিয়া মাত্‌ করিয়াছিলাম।

পিতা যশোহরে থাকার সময়, যশোহর স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন—প্রসিদ্ধ নামা জগবন্ধু ভদ্র মহাশয়। তিনি বৈষ্ণব-সাহিত্য-সেবায় নিতান্ত অনুরক্ত এবং বৈষ্ণব সাহিত্য সংগ্রহে একজন প্রথম পথ প্রদর্শক। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমার অনুরাগ-সৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিবিধার্থ সংগ্রহে রাজেন্দ্র লাল মিত্র কর্তৃক উদ্ধৃত একটি মাত্র পদ পাঠে সেই অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। তাহার পর বহরমপুরে সদর মুনসেফির অন্যতম উকীল শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ রায় পরিষ্কার

হাতের লেখায়, গোটা গোটা কাল কাল অক্ষরে একখানি 'পদকল্পতরু' আমাকে পাঠ করিতে দেন। সেইখানি নিয়ত নাড়িয়া চাড়িয়া, দুরূহ পদের ক্রমাগত অর্থ করিবার চেষ্টা করিয়া, আমি সেই অনুরাগ পোষণ করিতে ছিলাম। জগবন্ধু বাবু কর্ত্তৃক পিতার নাম সম্বলিত "বিদ্যাপতির পদাবলী" পাইয়া আমি মহা আনন্দিত হইলাম। সেই আনন্দফলস্বরূপ শ্রীযুক্ত (অজ) সারদা চরণ মিত্র মহোদয়ের সঙ্গে আমা কর্ত্তৃক প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ প্রকাশ। অমৃত বাজারের-হেমন্ত কুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষের সহিত পিতার যশোহরেই আলাপ হয় এবং তাঁহারাই ঋতুবর্ণনের প্রথমার্দ্ধ তাঁহাদের স্বীয় যন্ত্রে ছাপাইয়া দেন।

বঙ্গসাহিত্যের কথাই আমি প্রধানত লিখিতেছি, পিতার সহিত সেই সাহিত্যের সম্পর্কের কথাই প্রধানত বলিতেছি। কিন্তু আর একটা কথা পরিস্ফুট করিয়া না বলিলে, পিতার জীবনী নিতান্ত অসম্পূর্ণ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার জীবনের সহিত রাজনৈতিক ঘটনার কথা বলিতে পারিব না, আর তাঁহার বিচার নীতির ও বিচার দক্ষতার সম্যক্ পরিচয় দিতে পারিব না, বলিয়া আপাততঃ লিখিব না, কিন্তু এ সকল ছাড়া আরও দুই একটা কথা বলা আবশ্যক; কেবল সাহিত্যের কথাই বলা প্রচুর নহে। উলা, বহরমপুর, যশোহর, ঢাকা—সর্ব্বত্রেই বহুতর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সহিত পিতার পরিচয় হয়; এমন কি ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি তাঁহাদিগের সহিত, নানা বিষয়ে ঘোরতর তর্ক করিতেন, কোন বিষয়ে ইংরাজি মতটা কি, তাহা তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন; কিন্তু সর্ব্বদাই চেষ্টা থাকিত যে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যাহাতে লোভী, লালায়িত না থাকিয়া, বৈরাগ্যবলে পূর্ব্বমত সমাজের উন্নত পদবীতে অধিরোহণ করেন। শাস্ত্রচর্চ্চা, ধর্ম্মচর্চ্চা, দেশে যাহাতে বহুতর বিস্তৃতি লাভ করে, সে পক্ষেও তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল। অনুস্বার, বিসর্গ দিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেই যে শাস্ত্র বলিয়া নত-মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে, এমনটা না হয়। বিচার হউক, বিতণ্ডা হউক, কিন্তু যে যতটুকু শাস্ত্র মানিতে পার, শাস্ত্রে

বিশ্বাস করিতে পার, সে ততটুকু মান, বিশ্বাস কর,—ইহাই তাঁহার মত ছিল। 'কররকায কাঠিন্য ভ্রম' এই কথা লইয়া তিনি নৈয়ায়িকগণকে বিষম উপহাস করিতেন। বলিতেন পদার্থ-বিদ্যা ও রূপে পরিচালনা করিতে নাই। কতকগুলি সূত্র আগে ধরিয়া লইয়া, তাহার পর পদার্থের বিচার করা চলে না। সে বিপরীতা বুদ্ধি। আগে পদার্থ বিশ্লেষণ করিতে হইবে। ভূরি ভূরি পরীক্ষার দ্বারা পরামর্শ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; কোনটা ব্যাপক, কোনটা ব্যাপ্ত, তাহা বুঝিতে হইবে, তাহার পর সূত্র স্থির হইবে। ইহাই অন্বীক্ষণ এবং তাহাই প্রকৃত ন্যায় শাস্ত্র।

নৈয়ায়িকগণ প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন না বলিয়া, তিনি মহাদুঃখ প্রকাশ করিতেন। এই জন্য অনেক দিন হইতে ইচ্ছা ছিল যে এক জন সৎ-বুদ্ধি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লইয়া চুঁচুড়াতে একটী চতুষ্পাঠী করেন। যশোহরে জগবন্ধু ভট্টাচার্য্যের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহাপণ্ডিত না হইলেও, সদাচারী ও সৎ-বুদ্ধিশালী। কথা স্থির হইল যে, তিনি চুঁচুড়ায় আসিয়া চতুষ্পাঠী করিবেন। তিনি এ দেশে আসিলেনও বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাহায্যে তিনি আমাদের ও পারে গরীফা-গ্রামে চতুষ্পাঠী করিলেন; সে চতুষ্পাঠী এখনও সেইখানে আছে। পিতার প্রবল ইচ্ছা ছিল জানিয়া, এবং নিতান্ত কর্ত্তব্য, বোধে আমি একটী চতুষ্পাঠী করিয়াছি।

এখন ব্রাহ্মণ-রক্ষার্থ, ব্রাহ্মণের গৌরব রক্ষার্থ, চারিদিকে চেষ্টা হইতেছে, চতুষ্পাঠী বসিতেছে। মহাত্মা ভূদেব বাবু কর্ত্তৃক বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার চতুষ্পাঠীতে বিশ্বনাথ বৃত্তিদান, গোপালচন্দ্র বসু মল্লিক কর্ত্তৃক বেদান্ত প্রচার উদ্দেশে দান, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-মণ্ডলীকে প্রচলিত ব্যবহার শাস্ত্র শিক্ষা দান জন্য, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের দান—এ সকলই ব্রাহ্মণের গৌরব-রক্ষার্থ কীর্ত্তি। কিন্তু ব্রাহ্মণ কিছুতেই বুঝিবেন না, কিসে তাঁহার গৌরব। ব্রাহ্মণ চেত্তী শ্রেষ্ঠী কাক্রো মারবারীর মত ধন, ধন করিয়া ব্যগ্র। ব্রাহ্মণের গৌরব লোভ-হীনতায়, অল্পে সন্তুষ্টিতে। 'অসন্তুষ্ট দ্বিজ নষ্টৎ' হন, তোমরাইত বলিয়াছিলে? আর তোমরাই বা সে কথা ভুলিলে

কেন। জীবন যাবৎ ঐ কথা বলিয়া পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, আমারও আর কোথাও যাইবার দিন আগত প্রায়,—যদি একজনও ঋষি-বৃত্তি নির্লোভ ব্রাহ্মণ দেখিয়া যাইতে পারিতাম,—তবে জীবন-সার্থক বোধ করিতাম। ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্ব হইতে "সাধারণী"তে এই কথা লিখিয়াছি। ২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে "নবজীবনে" পুনরুক্তি করিয়াছি; দশ বৎসর চতুষ্পাঠী করিয়াছি; এখনও ধান ভানিতে শিবের গীত গাহিতেছি। ব্রাহ্মণের কি চক্ষু ফুটিবে না!

সাহিত্য সেবা উপলক্ষে বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে, নবজীবনে যে কথার পরিচালনা করিয়াছিলাম, এখন ও সাহিত্য-সেবার ইতিহাস গ্রন্থন প্রসঙ্গে, সেই কথা পরিচালনা, করিতে দিন। সেই সমাচার নবজীবন হইতে উদ্ধৃত করিতে দিন। আমার দোষ মার্জ্জন করিবেন; আমি আমার মজ্জার কথা বলিতেছি;—

ব্রাহ্মণ এখনও হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয়। ব্রাহ্মণের পুনরুত্থান সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক; ব্রাহ্মণ উঠিলে, সকলের উদ্ধার সহজ হইবে। এই বিষয়ে, অগস্তকোমতের মত অতি বিচিত্র। তিনি বলেন, ব্রাহ্মণ হইতে ভারতের পুনরুদ্ধার হইবে; তবে তজ্জন্য বিষয় বাসনা, এবং ঐহিক প্রভুত্ব লালসা পরিত্যাগ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। তাঁহার সবিস্তার মত, সানুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

* * * Positivism must fitst regenerate the polytheists of India, then of China, lastly those of Japan.

Although it will act simultaneously on the three, whether through the direct agency of the West or indirectly through the Mussulman, it is impossible to doubt that *the] theocracy whch has sufferd the least from time will be the most open to the regenerative process* Besides my iectures on this subject, I must refer to the preceding volume for explanations inconsistent with thetimits of my present sketch, to show the latent pre-

disposition of the Brahmins in favor of the faith which will restore their moral nature and their mental organisation. ... ... Positivism will deliver it (the theocratic caste i. e. the Brahmins) from the oppression of the temporal power, to which it has been subjected for twenty centuries, an oppression which it bows to, more and more without ever losing its consciousness of its spiritnal superiority and the hope of sceing it definitively re-established. Such a restoratian, it is a true, demands its comlete renunciation of command and even of property, but the systematic guardians of human order will not be slow to aceept conditions, in name of their social mission and of their indidual dignity.

Positivison offers, then, the regenerate Brahmins the reorganisation of Brahmanical body, but it offers them besides and nothing else does, gratification of the noble wish they have cherished to free their country from all forcign dominion. Appealling in fitting terms to the English nation, it will peacably remove a yoke which under whatever veil of illusion, justly inspires more antipathy than that of the Mussalmen. ......the great object of iustituting that doctrine (the positive faith) being to enable the Brahmins who have become posivists, to modify their theocratic milien.

Extrect from Positive Polity Vol IV Page 447.

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম প্রথমে ভারতের, পরে চীনের, সর্ব্বশেষে জাপানের দেবোপাসকগণকে পুনর্জীবিত করিবে।

বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ঐ তিন জাতির উপরেই একই সময়ে শক্তি চালনা

করিবে বটে ; তা সাক্ষাৎভাবে য়ুরোপীয়দিগের দ্বারাই করুক, অথব পরোক্ষভাবে মুসলমানদের দিয়াই করুক, কিন্তু, যে জাতি কালবলে সকল অপেক্ষা অল্প পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহারাই (ব্রাহ্মণেরাই) বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের নবজীবনী শক্তিতে শীঘ্র সঞ্চালিত হইবে। এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার জন্ম আমার অন্যান্য বক্তৃতা এবং এই গ্রন্থের পূর্ব্বখণ্ড দেখিতে বলি ; এই ক্ষুদ্র বিবরণে সকল কথা বিবৃত করা আয়ত্তি সাধ্য নহে ; ঐ সকল দেখিলে, বুঝা যাইবে, যে, যে ধর্ম্মে ব্রাহ্মণদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্ব সামাজিক গৌরব দেয়, অথচ তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি সর্ব্ব-গুণ-সম্পন্ন করে, সে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতে ব্রাহ্মণ-দের গূঢ় প্রবৃত্তি আছে।

বিগত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা রাজ-শক্তির অধীন হইয়া আছেন ; এই রাজশক্তির অত্যাচারের হস্ত হইতে বিজ্ঞান ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-দিগকে উদ্ধার করিবে। ব্রাহ্মণেরা রাজশক্তির অত্যাচারের নিকট দিন দিন অধিকতর নত হইয়া আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আপনা-দিগকে আধ্যাত্মিকতায় অন্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নত বলিয়া জানেন,—সে জ্ঞান তাঁহারা এক দিনের তরেও হারান নাই ; আর সর্ব্বতোভাবে সেই শ্রেষ্ঠতা পুনঃ সংস্থাপনের আশাও এক দিনের তরে ত্যাগ করেন নাই। আপনাদের গৌরব পুনঃ স্থাপনের জন্য ঐহিক বিষয়ে প্রভুত্ব ও বিত্তাদির বাসনা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করা,—ব্রাহ্মণের পক্ষে আবশ্যক ; নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণেরা তাহা করিবেন। যাঁহারা এতকাল ধরিয়া ধারাবাহিক ক্রমে মানব সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের ব্যক্তিগত মহত্ত্ব রক্ষার জন্য, এবং তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্যসাধন জন্য, ঐরূপ পন্থা অবলম্বন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না।

ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায় পুনর্গঠনের সুবিধা নব-জীবন-প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণকে *বিজ্ঞান-ধর্ম্ম প্রদান করে* ; আর সর্ব্বপ্রকার বৈদেশিক আধিপত্য হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবার যে আশা তাঁহারা এত দিন ধরিয়া পোষণ করিয়াছেন, সেই আশা ফলবতী করিবার সুযোগও বিজ্ঞান

ধর্ম্মই তাঁহাদিগকে প্রদান করে,—সে সুযোগ আর কিছুতেই দেয় না। ইংরাজ জাতির নিকট কথোপকথন ভাবে আত্ম-বেদন জানাইয়া ইহাঁরা বিনা রক্তপাতে ইংরেজের প্রভুত্ব হইতে আপনাদিগকে উন্মোচন করিবেন। ইংরাজের প্রভুত্ব যতই কেন কুহু কুহকে ঢাকা ঘেরা থাকুক না, মুসলমানের রাজত্ব অপেক্ষা বাস্তবিক অধিকতর অসন্তোষের নিদানীভূত। .... বিজ্ঞান-ধর্ম্ম ভারতে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যই এই যে, ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাঁহারা ঐ মতাবলম্বী হইবেন, তাঁহারা এতদ্দ্বারা সহজে যাজক সম্প্রদায়ের প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।"

বিজ্ঞান-ধর্ম্মের বলে, ব্রাহ্মণ জাতির পুনরুত্থানের কথা,—সহজেই মনে করা যাইতে পারে, কোম্‌তের নিজ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মে গাঢ় অনুরাগের পরিচয় মাত্র। অথচ বিষয়-বৈভব-বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই, ব্রাহ্মণ জাতি আবার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন, এ কথাটিতে বড় আশা হয়, বড় আনন্দ হয়। কিন্তু য়ুরোপের সুদূর প্রান্ত হইতে, কঠোর বৈজ্ঞানিক কোমৎ ভারতের বিকৃত ইতিহাস পাঠ করিয়া যে কথাটি বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাদের কথা, তাঁহারা শাস্ত্রের বিধি নিষেধ সহস্র স্থানে স্পষ্ট দেখিয়াও সেই কথা বুঝিতে পারেন না,—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাই আক্ষেপের বিষয়। যখন তোমার বিষয়-বাসনা ছিল না, সামান্যে সন্তুষ্ট থাকিতে, তখন তুমি ঊর্দ্ধ হস্তে, কেবল আশীর্ব্বাদ করিয়া, সমগ্র সমাজের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়াছ, আর আজি তুমি বৈষয়িক বৈভবের জন্য ব্যস্ত, কাজেই আজি তোমাকে দক্ষিণার জন্য দ্বারে দ্বারে জোড় হস্তে পরিভ্রমণ করিতে হইতেছে। জানি না! কতদিনে তোমার চক্ষু উন্মীলিত হইবে?

ব্রাহ্মণগণ এখন যদি জাতি স্থিতির ভাবনা না ভাবিয়া, স্বজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম-জীবনের উচ্চ ব্রত অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব লাভ করেন, এবং ভারতে সত্য সত্যই নবজীবন হয়। জানি না, ব্রাহ্মণের চক্ষু কবে উন্মীলিত হইবে! এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?

যশোহরের পর পিতা ঢাকায় যান। ইংরাজী ৭৬ সাল হইতে ৮২ সাল পর্য্যন্ত কয় বৎসর ঢাকাতেই থাকেন। ঢাকায়, কথঞ্চিৎরূপে তাঁহার উচ্চ পদের গৌরবে, কিন্তু প্রধানত তাঁহার গুণ-গৌরবে, তিনি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় হয়েন। তিনি নিরভিমান থাকিয়া সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতে পারিতেন, নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ কথা বলিতে পারিতেন, চরিত্রে নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া, সকলের সম্মান ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারিতেন; তাহার উপর পদগৌরব ত ছিলই; সুতরাং তিনি সকল সম্প্রদায়ের শীর্ষ-স্থানীয় হইয়াছিলেন; ঢাকায় হিন্দু ব্রাহ্মে একটু ফুটন্ত অফুটন্ত ঘর্ষণ ছিল। এক দিকে হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা ছিল। অন্যদিকে স্বয়ং বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ব্রাহ্মধর্ম্ম রক্ষা করিতে ছিলেন। পিতা অবশ্য হিন্দু, 'হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী' সভার সভ্য, কিন্তু তাহা বলিয়া কোন ব্রাহ্ম কখন তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া মনে করেন নাই, অবজ্ঞা করাত দূরে থাকুক। ঢাকায় মুসলমানের অর্থ আছে, কাজেই সামর্থ্য আছে, কীর্ত্তিও আছে; কিন্তু পিতৃদেবের নায়কতায় এই শক্তিসম্পন্ন মুসলমান সম্প্রদায়, হিন্দুর সহিত মিলিত হইয়া একটি সম্মিলন সভা করিয়া, যাহাতে উভয় জাতি মধ্যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি সম্বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য যত্ন করিতেন। সেই সভারও পিতা অধিনায়ক ছিলেন। উকীল সম্প্রদায় মধ্যে মনোমালিন্য এবং দলাদলি ছিল। পিতা ঢাকা ছাড়িলে, মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া এই মনোমালিন্য অতি কুৎসিত আকারে ফুটিয়া উঠে। কিন্তু যতদিন পিতা ঢাকায় ছিলেন, এই মনো-মালিন্য থাকিলেও, কাজে বা কথায় তাহা ফুটিতে পারিত না। হয়ত কোন এক রবিবারে, পিতা পদ-ব্রজে ভ্রমণে বাহির হইয়া একজন নেতা উকীলের বাসায় গিয়া তামাক খাইলেন। তাহার পর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অন্য পক্ষের নেতা উকীলের বাসায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিয়ত-দ্বন্দ্ব পরায়ণা লক্ষ্মী সরস্বতীর মধ্যবর্ত্তী নারায়ণের মত, সেই দুই জন কল-হকারী উকীলকে লইয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানা গল্প গুজবের পর, বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। এমন করিয়া একজন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি, সপ্তাহে সপ্তাহে খাটিলে মনোমালিন্য ফুটে কিরূপে বল?

তৎকালে, ঢাকায় দুই এক জন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর একটু আধটু অনাচার অত্যাচারের দিকে, ভিতরে ভিতরে টান ছিল। পিতা সন্ধ্যা হইতে না হইতেই, আপন বাসায় তাঁহাদিগকে আনাইয়া রাখিয়া, নানাবিধ গল্প গুজবে অর্দ্ধ-রাত্রি অতি বাহিত করিয়া ফেলিতেন। তাঁহারা উঠিয়া যাইবার ফুরসুৎ পাইতেন না। এদিক ওদিক টান থাকিলেও পিতার চরিত্রের টানে প্রাণের টানে, আর তাঁহার মন-প্রাণ-মজান মিষ্ট কথার টানে, বাহিরের টান আর বল করিতে পারিত না। এই একরূপ সংশোধিনী সভা।

পিতা যখন প্রথম ঢাকায় যেলেন, তখন সাহিত্য-রথী শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন ঘোষ সরকারী চাকরী করিতেছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই পিতার কাছে আসিতেন। সাহিত্য, অসাহিত্য, অনেক বিষয়েই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। বান্ধবের প্রসাদে কালীপ্রসন্ন বাবুর কীর্ত্তি প্রসারিত হইল। তিনি বঙ্গের সর্ব্বত্র কীর্ত্তিমান বলিয়া প্রথিত হইলেন। ঢাকায় বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মের চর্চ্চাও জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। ১২৮৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, ঢাকায় হিন্দু ধর্ম্ম-রক্ষিণী সভায়, পিতা হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বড় বড় অক্ষরে ৩২ পৃষ্ঠায় সেই বক্তৃতা পুস্তিকাকারে, সাধারণী যন্ত্রে আমরা ছাপিয়া ছিলাম। বক্তৃতার প্রধান কথা, এই যে হিন্দু ধর্ম্মই হিন্দু জাতির জাতিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। অন্যান্য জাতি যে কালমধ্যে মহাকালের কবলে বিলীন হইয়াছে, হিন্দুধর্ম্ম তাহার পূর্ব্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া এখন পর্য্যন্ত আপনার পক্ষ বিস্তার করিয়া হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিতেছে। এই ধর্ম্ম কেবল জনসাধারণের ধর্ম্ম নহে, পরম পণ্ডিতগণ, পরম জ্ঞানিগণ এবং সাধুগণ এই ধর্ম্মের পূজা করিয়া আসিয়াছেন। খৃষ্টানদিগের বাইবেল, অথবা মুসলমানদিগের কোরাণের ন্যায় হিন্দুধর্ম্ম কেবল একখানি পুস্তকের বিষয়ীভূত বস্তু নহে। বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা প্রভৃতি—সমস্ত গ্রন্থ সমষ্টি এই ধর্ম্মের ধর্ম্মপুস্তক। ইহা এক প্রকার অধিকারীর ধর্ম্ম নহে। কিন্তু সবল দুর্ব্বল—সর্ব্বপ্রকার অধিকারীর ধর্ম্ম। ইহা যেমন প্রশস্ত, তেমনই উন্নত।

ইহা যেমন ভক্তির আসন পরিগ্রহ করিয়াছে, তেমনই যুক্তির উপর অধিকার লাভ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ডে বহুরূপা প্রকৃতির পূজা। হিন্দুসমাজ একটি বিরাট ধর্ম্মমন্দির। ইহাতে অহরহ ধর্ম্মের যাগ প্রভূতভাবে হইতেছে। প্রতিদিন উষাকাল হইতে যামিনী যামার্দ্ধ পর্য্যন্ত, প্রতিক্ষণেই হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মগুণে হিন্দুদিগের ভক্তি-তরঙ্গ কেবল উর্দ্ধে উচ্ছ্বসিত হয় নাই, ইহা সমাজে, সংসারেও প্লাবিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম নিরীহ অথচ উদার ধর্ম্ম, অন্য কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ করে না। আপনার বিস্তার করিবার জন্য, কখন নর-শোণিতে হস্ত ধৌত করে না। কর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের বল এবং মহিমা।

ঐ ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে অর্থাৎ পর মাসেই ঢাকার কলেজ ভবনে পিতা বঙ্গসাহিত্য ও বঙ্গভাষা বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সে খানিও বড় বড় অক্ষরে ৭৪ পৃষ্ঠায় সাধারণী যন্ত্রে ছাপিয়াছিল। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্কিম বাবু প্রভৃতি পর্য্যন্ত অধিকাংশ লেখকের লেখার ভঙ্গির সমালোচনা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অতি বিশদরূপে আছে। ইহার শেষ ভাগের দুই দশ পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দিতেছি।

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতি ও জীবন চরিতের পর, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কাদম্বরী সাহিত্য সংসারে দর্শন দিল। কাদম্বরী তো কাদম্বরী! ভাষাকে যেন ক্ষণকালের জন্য মাতাইয়া তুলিল। যেমন শব্দের ঘটা, তেমনি সমাসের ছটা, তেমনি উপমার আড়ম্বর। বাঙ্গালার জন্‌সোনিয়ান্ ভাষা। বাঙ্গালায় গদ্য-ছন্দে কাব্যের উচ্ছ্বাস। কিন্তু মদিরার মত্ততা অধিকক্ষণ থাকে না। এই জন্য কাদম্বরীর ভাষা যদিও বঙ্গসাহিত্যের কিছু শোভা সম্পাদন করিয়াছে, কিন্তু অনুকৃত হইতে পারে নাই। * * * ইহার কিছু দিন পরে সাহিত্য সংসারে আর একজন আশ্চর্য্য লেখক প্রবেশ করিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র আসরে নামিলেন। বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা অতি চমৎকার। এই লেখা কেবল শ্রুতি মোহকর নহে, কেবল মধু পরিপূর্ণ নহে, ইহাতে তাড়িত্তেজ প্রভূত ভাবে বহিতেছে, ইহা ভাব-বৈভবেও অতি ঐশ্বর্য্যশালী। বঙ্কিম বাবু কেবল বাঙ্গলা

ও সংস্কৃত ভাষায় সুশিক্ষিত নহেন, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যাতেও অতি সুপণ্ডিত এবং তাঁহার নিজের কল্পনা শক্তিও অতি বলবতী। অতএব তিনি যেমন এক দিক্ হইতে সংস্কৃত-সাহিত্যের মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইতে যত্ন করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিক হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রচনা যেমন মাধুরি-ময়ী, তেমনি শক্তি-সম্পন্না ও ভাব-পরিপূর্ণা। তিনি বঙ্গভাষায় একরূপ নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন। যে দিন বঙ্কিমবাবু কতিপয় বন্ধু লইয়া 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করিলেন, সেই দিন বঙ্গভাষা-নদীতে উন্নতির কোটালে মহাবিক্রমের সহিত বান ডাকিয়া উঠিল; উন্নতির স্রোত তর-তর বেগে ছুটিতে লাগিল; নদীর জল ক্রমশই স্ফীত হইতে লাগিল; দেখিয়া শুনিয়া ভাবুকের মন আনন্দ রসে গলিয়া গেল। বঙ্কিম বাবু হইতেই বঙ্গবাসীগণ "সক" করিয়া বাঙ্গলা বই পড়িতে শিখিয়াছে।"

এই সময়ে ঢাকায় পিতার চারি পোয়া প্রতিষ্ঠা হইল। তিনি আদালতে পদস্থ প্রভু, আর সর্ব্বত্রই মধ্যস্থ বন্ধু। তিনি ঢাকায় থাকিবার সময় মধ্যে, আমি তিনবার তথায় গিয়াছিলাম। শেষ বার তাঁহার কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর]। তিনি সকাল হইতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত, সমনে বাসায় বসিয়া রায় লিখিতেন। নির্জ্জনে, একাকী; কোন আমলাও নিকটে থাকিত না। নিজেই পাতা উলটাইতেছেন, একমনে কাগজ দেখিতেছেন, এখানকার কথার সহিত সেখানকার কথার তুলনা করিতেছেন, একটা খসড়া কাগজে নোট লইতেছেন, আর রায় লিখিতেছেন। একজন আরদালি নীচেকার দেউড়িতে বসিয়া থাকিত মাত্র। বসিয়া থাকিতই বা বলি কেন? সে প্রায়ই নিদ্রা-সুখ ভোগ করিত। সে সময়ে পিতার নিকটে কেহই আসিতে চাহিত না। সুতরাং নিবারণ করিবার জন্য তাহাকেও জাগিয়া থাকিতে হইত না।. ভিখারী ফকির আসিত, তাহাদিগকে বাসার চাকরে মুষ্টি দিয়া বিদায় দিত; আরদালির সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। কচিৎ কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত আগন্তুক গাড়ী-ঘুড়ি করিয়া আসিলে, চাপরাসি চমকিয়া উঠিয়া, বাম হাতে পাগড়ি

পরিতে পরিতে, ডান হাতে চোক্ মুছিতে মুছিতে, পিতার কাছে এত্তালা বা কার্ড দিত। পিতা আগন্তুককে সসম্ভ্রমে আনাইয়া লইয়া সসম্ভ্রমেই ১০।১৫ মিনিটে বিদায় দিতেন। হয়ত সেই সময়ে একবার তামাক দিতে বলিতেন। এটা হইল নৈমিত্তিক তামাক। নিত্য তামাক ছিল, সকাল বেলায় রায় লিখিবার পরে একবার, অর্থাৎ ৬॥ টা ৭ টার মধ্যে একবার, আর ১০॥ টায় পর একবার। তাহার পর স্নান আহার, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ও তামাকু সেবন। তাহার পর কাছারী গমন। কাছারীর ছয় ঘণ্টা কালমধ্যে কখন জলপান, টিফিন বা তামাকু খাইতেন না। শৌচ প্রস্রাব করিবার জন্য উঠিতেন না। এ কেবল ঢাকায় বলিয়া নয়, ৩৬ বৎসর চাকরীর মধ্যে পারতপক্ষে কোথাও করিতেন না। পারতপক্ষে বলিবার তাৎপর্য্য আছে। মুনসেফি করিবার কালে জাহানাবাদে একবার, আর সদর আমিনি করিবার কালে, আরায় বা সাহাবাদে আর একবার, গ্রীষ্মকালে, হাঁপানি কাশীতে, তাঁহাকে বড়ই ভুগিতে হইয়াছিল। জাহানাবাদ তখন অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। মাটী খট্‌ খটে, জল অতি পরিষ্কার, বায়ু শুষ্ক এবং দুর্গন্ধ হীন। আর ত চিরকালই স্বাস্থ্যভূমি। এখনও সেইরূপ আছে। অথচ এই সকল স্থানে গ্রীষ্মকালে হাঁপানি রোগের বড়ই প্রাবল্য হয়। পিতার তাহাই হইয়াছিল। তিনি উঠিয়া নামিয়া, কোনরূপ যানারোহণেও কাছারী যাইতে পারিতেন না। জজ সাহেবের অনুমতি লইয়া, নিজের বাসাতেই, তাকিয়া বুকে দিয়া, কাছারীর কার্য্য করিতেন। চট্টগ্রাম অতি অস্বাস্থ্যকর স্থান। ম্যালেরিয়া জ্বর লাগিয়াই আছে। চট্টগ্রাম গিয়া পিতার হাঁপানি চোদ্দআনা কমিয়া যায়। ছিল না বলিলেই হইল। কচিৎ কখন একটু আধটু দেখা দিত। তাহাতে কার্য্যের ব্যাঘাত হইত না। যশোহর, ঢাকাতে সে বালাই প্রায় দেখা দেয় নাই।

পিতা ঢাকাতে শীতকালে ৫টার পর, গ্রীষ্মকালে ৬টার পর বাসায় ফিরিয়া আসিতেন। নিত্য ক্রিয়াদি সমাপন করিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত। তাহার পর মজলিস্। ঘোরতর মজলিস্। তবে আরম্ভে উলার

মজলিস হইতে ঢাকা প্রভৃতি স্থানের মজলিসের প্রভেদ এই যে, মুনসেফি অবস্থায় উলা প্রভৃতি পল্লীগ্রামে, প্রধানত পল্লীস্থ ভদ্র লোক লইয়াই মজলিস। আর সবজজ পদে সদরে থাকিতে হয়, সুতরাং ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি স্থলে, পদস্থ, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া মজলিস। ঢাকার মজলিসে প্রায় থাকিতেন সব্‌জজ নফরচন্দ্র ভট্ট, এন্‌জিনিয়ার রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উকীল ত্রৈলোক্যনাথ বসু। তিনি আজিও ঢাকায় আছেন। আর একজন সবজজ পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাবু- ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সান্ধ্য সমিতিতে অবশ্য নানা সৎকথারই আলোচনা হইত; কিন্তু কোন একটি বিষয়ে গম্ভীর রূপে আলোচনা হইবার পূর্ব্বে, সেই দিবসের ঢাকার ঘটনাবলীর বিজ্ঞাপনও আলোচনা হইত। তাহার পর ক্ষণ-মাহাত্ম্য অনুসারে কোন দিন সমাজতত্ত্ব, কোন দিন সাহিত্য, কোন দিন ধর্ম্মতত্ত্ব সরস গল্পের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল বিষয়ের আলোচনা আলোড়ন হইত। পরনিন্দা যে একেবারে হইত না, এমন কথা বলি না; অথবা পরনিন্দা পিতা ত্যজ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার মজলিসে পরনিন্দা উঠিতেই পারিত না, এমন কথাও বলি না। পরনিন্দা আরম্ভ হইলে, বাবা অল্পের মধ্যে কথাটা কি শুনিয়া লইয়া, একবার বেশ করিয়া শুনিয়া লইয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, একটু প্রভুত্ব ব্যঞ্জক স্বরে "যাক ও কথা" বলিয়া সহাস্য বদনে, আর একটি কথার অবতারণা করিতেন; ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব কি ভাবে কেমন করিয়া হইবে, তাহার পরামর্শ আঁটিবার মন্ত্রণা-গৃহ এই মজলিস্। আবার ঢাকায় কলের জল বসাইতে হইলে, কি রূপে দরখাস্ত করিতে হইবে, মিউনিসিপ্যালিটিকে অন্তত কতটাকা দিতে হইবে, নবাব সাহেবকে কিরূপে হাত করিতে হইবে—এ সকল পরামর্শেরও সেই কেন্দ্র-স্থল। অর্দ্ধবঙ্গ তোলপাড় করিয়া রমাবাই ঢাকায় আসিয়া উপস্থিত, কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা হইবে, ঢাকায় কোন্ পণ্ডিত বেশ সংস্কৃত কথা কহিতে পারেন—এ সকল যেমন সেই সান্ধ্য সমিতির ভাবনা, ...ার বসাক মহাশয় স্কুল পাঠ্য পাটী-গণিত প্রণয়ন করিয়াছেন; তিনি ঢাকার ইন্‌সপেক্টর অফিসে প্রধান কর্ম্মচারী, ঢাকা সার্কলে তাঁহার বইত চলিবেই।

এ সকল কথারই পরামর্শ সেই সান্ধ্য-সমিতিতে হইতেছে আর পরামর্শ-দাতাগণের শীর্ষস্থলে সব-জজ গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয়ই আছেন।

বিচার কার্য্যে পিতার বিশেষ দক্ষতা ছিল এবং বিপুল সুনামও ছিল তাঁহার ৫৫ বৎসর বয়ক্রম হওয়ার পর, ৮০ সালের ২৬শে আগষ্ট গবরমেণ্ট তাঁহাকে অতিরিক্ত একবৎসর কাল কর্ম্ম করিবার অনুমতি দিলেন বাবাকে প্রার্থনা করিতে হয় নাই। সেই এক বৎসরের যখন ১০ মাস পূর্ণ হইল, তখন গুজব উঠিল যে, গঙ্গাচরণ বাবুকে গবরমেণ্ট আর অতিরিক্ত সময় দান করিবেন না। ঢাকার অধিবাসীদের তখন যেন চমক ভাঙ্গিল, তবে ত আমরা গঙ্গাচরণ বাবুকে হারাইব! সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিয়া, মহামান্য হাইকোর্টের বিচারকদিগের সমীপে সময় প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলেন। আমি যে কথাটা উপরে বলিতেছিলাম, সেই কথাটা অতি সংক্ষেপে দরখাস্তে লেখা ছিল।

"That as an instance of his power of endurance and patience, your Memorialists do not deem it out of place to inform your Lord Ships, that even at this age. Babu Gunga Charan Sircar, is never seen to adjourn the court, to take a short respite, but is observed to be always at his work and engaged in the discharge of his duties till dusk."

এই প্রার্থনার ফল হইয়াছিল। গবরমেণ্ট আর দেড় বৎসর কাল সময় দেন। পিতা ১৮৮২ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় পান। তাহার পর ঢাকার সকল সম্প্রদায় সাড়ম্বরে পিতাকে বিদায় দেন। সেই বিদায় গ্রহণের জন্য পিতাকে ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসেও ঢাকায় থাকিতে হইয়াছিল। দেশীয় বিদেশীয় সকল কর্ম্মচারী নিজ কর্ম্ম হইতে অবসর পাওয়ার পর, সেরূপ আদর অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, এমন কথা আমি জানি না। এক কলিকাতার রিপণ বিদায় উৎসব ছাড়া, আর বোধ করি, কটকের র্যাবেন্স বিদায়ের কথা ছাড়া, আর কোথাও যে এরূপ হইয়াছে

তাহা আমি জানি না। একমাস কাল ধরিয়া সমগ্র ঢাকা-নগরী সমুদ্র সাগরের মত কল্লোলের রোল তুলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল।

এই সময়ের একটি বিশেষ ঘটনার কথা বলিবার পূর্ব্বে, পিতার মনে বিশ্বাস কিরূপ ছিল, এবং সাধারণত নিষ্ঠা, আস্থা, বিশ্বাস কি পদার্থ—সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি।

কর্ম্মে নিষ্ঠা, আপ্তবাক্যে আস্থা, থাকিলে মনে বিশ্বাস হয়, অথবা বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়। আমাদিগের আস্থা ও নিষ্ঠা কমিতেছে বলিয়া, আমাদের বিশ্বাসও কমিতেছে। কর্ম্ম তখনও লোক করিত,, এখনও লোক করে; কিন্তু তখন যেমন প্রাণের সহিত, জিদের সহিত, নিষ্ঠার সহিত, লোক কর্ম্মে লাগিয়া থাকিত, এখন আর সেরূপ প্রায় দেখা যায় না। যেন আল্‌গা আল্‌গা, শিথিল ভাবে, অনেককে কর্ম্মে অনুসরণ করিতে দেখা যায়। কর্ম্ম না করিলে নয়, তাই করিতেছি, এই রূপ কথা সকলেরই মুখে। কাজেই বোধ হয়, এইরূপ ভাবও সকলেরই মনে। কর্ম্মে জিদ না থাকায়, তেজ করিয়া কর্ম্ম না করায়, না কর্ম্মীর স্ফূর্ত্তি থাকে, না কর্ম্মে শ্রীবৃদ্ধি হয়। আমি ভাল কর্ম্ম বা মন্দ কর্ম্মের কথা বলিতেছি না। ভাল মন্দ দুইরূপ কর্ম্মেই আমাদিগের মধ্যে এখন প্রবৃত্তির তেজ না থাকারই কথা বলিতেছি। তাহার পর আপ্তবাক্যে আস্থা। তখনও লোক করিত, এখনও লোকে করে। তবে তখন হইতে এখনকার প্রভেদ এই যে, তখন লোক আপ্ত বাক্যকে আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত হইত না। এখন আমার মতের সহিত কোন এক বাক্যের মিল আছে, সেই জন্য, সেই বাক্যটিকে আমার মতের সমর্থনার্থ প্রয়োগ করা হয়। একটা স্থূল উদাহরণ দিতেছি। ধরুন যেন, ঋষি বাক্য আছে যে একাদশীতে অন্নাহার নিষেধ; সোজাসুজি সেটি আপ্তবাক্য মনে করিয়া নিষেধ মানিলেই চলে। তাহা না করিয়া, অনেকে বলেন, যে একাদশীর সময় হইতেই রসের সঞ্চার হয়, সেই জন্য একাদশীতে লঘু আহার করা, বা উপবাস দেওয়া, ভাল। অর্থাৎ এই মত যেন বিজ্ঞান বলে স্থির করিয়াছি, ঋষিবাক্যে সমর্থন

পাইয়াছি মাত্র। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে একাদশীতে লঘু আহার, আর ত্রয়োদশী চতুর্দ্দশীতেই বা নয় কেন? তাহা হইলে আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা কোন হেতুবাদ দিতে পারেন না। বাস্তবিক একাদশীতে লঙ্ঘন প্রভৃতি বাক্যে শাস্ত্রের শাসন বা শাব্দ প্রমাণ ব্যতীত অন্য হেতু কিছু নাই। শাব্দ প্রমাণে বা আপ্ত বাক্যে আস্থা না থাকায়, আমরা অনর্থক বৈজ্ঞানিক হেতু-বাদের অনুসন্ধান করি মাত্র।

আপ্ত বাক্যে আস্থা না থাকিলে কি সংসারের, কি ধর্ম্মের কোন কার্য্যই হয় না। তবে সংস্কৃত করিয়া একটা শ্লোক বলিলেই তাহা ঋষিবাক্য বলিয়া তাহাতে আস্থা করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। এক বেদ ভিন্ন, সর্ব্বত্রই বিচার চলে। বেদ অপ্রচলিত পদার্থ। মাক্ষ মূলার বা রমেশ দত্ত ছাপিলে বেদ হয় না। পরম্পরা মন্ত্র-শুদ্ধি থাকিলে বেদ বলিয়া একরূপ উজ্জ্বল জ্ঞান থাকিত। সেই জ্ঞান থাকিলে, বুদ্ধি বৃদ্ধি স্বত বিকাশিতা হইত। এ সব কথা এখন পুরাণ কাহিনী হইয়াছে। এ সকল কথায় আস্থা কর, বা না কর, তাহাতে ক্ষতি নাই। বেদই অপ্রচলিত, তা বেদনিন্দুক শব্দের অর্থ কি হইবে? কিন্তু তা' বলিয়া আপ্তবাক্য নাই, এমন কথা বলা যায় না। বেদের পরেই মনুর প্রমাণ। সেই মনুর কতকগুলি কথা, আমরা ভৃগুসংহিতায় ও নারদসংহিতায় দেখিতে পাই। কোন্‌টি আপ্ত, কোন্‌টী আপ্ত নহে, ইহার বিচার হউক। কিন্তু আপ্ত বলিয়া স্থির হইলে, তাহাতে আস্থা না করিয়া কিরূপে থাকা যায়; মনের অবস্থা অনুসারে আস্থার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। চিত্ত পরিষ্কার থাকিলে, তাহাতে যেন একরূপ আঠার মত পদার্থ থাকে, যাহাতে লাগাও, তাহাতেই লাগিয়া যায়। ভাষা-ভাষি থাকে না, আঁটা আঁটি হয়। শুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধি হইতেই আস্থা হইয়া থাকে। এই বুদ্ধি আমাদের দিন দিন কমিয়া যাইতেছে; কাজেই আস্থাও কমিতেছে।

দেখিতে পাওয়া যায়, এখনকার দিনে, 'অন্ধ' বিশ্বাসে অনেকেরই মহাভয় হয়। কিন্তু কতটুকু অন্ধ-বিশ্বাস, আর কতটুকু চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস—তাহা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবে? আমাদের দেশের মহা মহা দার্শনিক, এমন কি, এই সকল বিষয়ে 'মিল কোম্‌ৎ' হইতেও অধিকতর

দার্শনিক ঋষিগণ, তপস্বীগণ, ব্যাখ্যাকারগণ, নাস্তিকের নানা তর্ক খণ্ডন করিয়া, পরকালের বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়াছেন। সেই সকল দেখিব না, পড়িব না, বুঝিবার চেষ্টা করিব না, আর না পড়িয়া, না শুনিয়া, বলেন যে, পরকালের বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাস মাত্র। এ সকল অতি অসার কথা; কিন্তু আমরা দিন দিন এই অসারতার কূপে মগ্ন হইতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিতার মাতৃদেবী, শিশু পিতাকে রাখিয়া পতির পাদ বক্ষে ধারণ করিয়া অনুমৃতা হন। আগুণ খাকির বিশ্বাস, আগুনের মত জ্বলন্তই ছিল, সন্দেহ নাই। শাস্ত্র বিধিতে বাধ্য হইয়া, মৃত ঠাকুর দাদাকে লইয়া, ঠাকুরমাকে জাহ্নবী তটে বটতলায় তিনদিন বাস করিতে হয়। সুতরাং লোকে বুঝাইবার পড়াইবার, অথবা উত্যক্ত করিবার, সময় সুযোগ প্রচুর পাইয়াছিল। সকলে বলিল "তুমি এই কাঁচা বয়সে পুড়িয়া মরিতে পারিবে না!" নিকটে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, ঠাকুর মা জ্বলন্ত শিখায় অঙ্গুলি ধরিয়া রহিলেন। লোকে স্তব্ধ হইল। কিছুক্ষণ পরে তাঁহাকে ক্ষান্ত করিল; তাঁহার সহিত বিতর্ক ছাড়িয়া দিল। বলিল "এমন দুধের ছেলেটিকে ফেলিয়া যাইতে তোমার মমতা হইতেছে না?" ঠাকুরমার চক্ষু জ্বলিতে লাগিল; দূরে জ্বলন্ত কটাক্ষক্ষেপ করিলেন, যেন গঙ্গাপারে কিছু দেখিতে পাইতেছেন। বলিলেন,—"তোমরা দেখিতে পাইতেছ না, আমি দেখিতে পাইতেছি, আমার এই ছেলে, রাজা হইবে, মহাযশস্বী হইবে মহাসুখী হইবে।" বাবা এই সকল কথা বলিতেন, আর বিশ্বাসে তাঁহার মুখ প্রফুল্ল হইত। তাঁহার মাতৃস্বসাকে সম্বোধন করিয়া, একদিন আমাদের সমক্ষে বলিলেন "তা মাসি, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ত হইয়াছে, আমিও রাজাই হইয়াছি। আর তিনি দেখিলেন না বলিয়াই বা আমি দুঃখ করিব কেন? তিনি অবশ্য দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন ত।" ঠাকুরমার আগুণ খাওয়ার মত জ্বলন্ত বিশ্বাস না থাকুক, পিতা বিশ্বাসী হিন্দু ছিলেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, পরকালে বিশ্বাস করিতেন। পূজা পার্ব্বণে বিশ্বাসের সহিত কত আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাহা গৃহ-স্বামীর বর্ণনায় নিজেই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন; সে কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সে চিত্র আপনাদের সমক্ষে ধরিয়াছি।

মহাবিপন্ন হইয়া, একজনে কাতর প্রাণে ঈশ্বরকে ডাকিলে, ভগবান অভয় দান করিয়া থাকেন। পিতা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জীবনে তিনি দুইবার এই সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একবারকার কথা তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, আর একবারকার তাঁহার বলিবার সুযোগ হয় নাই, অথবা আমার শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

একবারকার কথা কি তাহা বলিতেছি। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের কিছুকাল পূর্ব্বে, ঢাকায় তুমুল মোকদ্দমা বাধিল। ঢাকার তাৎকালিক নবাব গণিমিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহার কতিপয় জ্ঞাতিবর্গ বহুতর টাকার দাবিতে একটি দেওয়ানি মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। মকদ্দমার বিবরণ আমি দিব না; দিবার প্রয়োজনও নাই। আসল কথা এই যে, বাদীর পক্ষ-হীন বল, দরিদ্র, পর মুখাপেক্ষী। বাদী প্রতিবাদীর আর্জ্জি জবাবের ভঙ্গি দেখিয়া, পিতা মনে মনে বুঝিলেন যে, বাদীগণ অর্থহীন সুতরাং বিপন্নও বটে। কিন্তু ন্যায় বিচারে, সুবিচারে, সম্ভবত তাহাদিগকে হারিতে হইবে। এই ধারণা মনে উদয় হওয়ায়, তিনি আপনাকে মহা বিপন্ন মনে করিলেন। বিপদ এই যে, লোকেত সুবিচার, অবিচার দেখিবে না, লোকে লক্ষ মুখে ব্যক্ত করিবে যে, গঙ্গাচরণ বাবু যাইবার সময় বেশ খাইবার মাছ করিয়া গেলেন। এক লক্ষ হউক দুই লক্ষ হউক, নিশ্চয় তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বাদীগণের মনোরথ ব্যর্থ হইব'র যতই সম্ভাবনা হইতে লাগিল, ততই তিনি আপনাকে বিপন্ন মনে করিতে লাগিলেন। শেষে এক দিন নিশীথে নিভৃতে, শুদ্ধমনে, যুক্ত-করে বিপদ-ভঞ্জন ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন। হঠাৎ অবসাদের অন্ধকারের মধ্যে, যেন সুস্নিগ্ধ আলো উদ্ভাসিত হইল। সুমধুর অভয়বাণী যেন তাহার কর্ণে ঘোষিত হইল। আনন্দে হৃদয় পরিপূরিত হইল। এতক্ষণ নিদ্রা হয় নাই, নিদ্রাভিভূত হইলেন। পর দিন প্রাতে শরীর-মন যেন সরল, সহজ। ভার যেন চলিয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে ঢাকায় টেলিগ্রাফ পৌঁছিল, ছোটলাট হঠাৎ ঢাকা পরিদর্শন করিতে আসিতেছেন। পিতা তখনই মনে করিলেন "ইঁহাকে দিয়াই আমার বিপদ কাটাইতে হইবে।"

যথাসময় ছোটলাট আসিলেন। কমিশনর, জজের পর, পিতা তাঁহার সহিত রোটাসে একাকী দেখা করিলেন। তিনি আদরে পিতাকে তাহার কামরায় বসাইলেন। একথা সে কথার পর বলিলেন "আপনি যেন আমাকে কিছু বলিবেন বলিবেন মনে হইতেছে।" পিতা উত্তরে বলিলেন "বলা কহা আর কি? নবাব বাড়ির মোকদ্দমা আপনাকে মিটাইয়া দিয়া যাইতেই হইবে।" ছোটলাট বলিলেন "আমি বলিলেই মিটিবে।" পিতা বলিলেন 'নিশ্চয়,' হইলও তাই। বিপদবারণ বিপদ হইতেরক্ষা করিলেন। ছোটলাট তিন দিন থাকিয়া মোকদ্দমা মিটাইয়া দিয়া, কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

যত কাল পদস্থ ছিলেন, পিতা সকল স্থানেই সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন, সকলের সহিত বসা-দাঁড়া করিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি কোন সদ্জাতির ভবনেও কখন ভোজন বা ফলাহার করেন নাই। এরূপ করিয়া লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে, গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন বিধি-বিধানে নিষেধ ছিল। সাহেবেরা অবশ্য মাকড় মারিলে ধোকড় হয়; তাঁহারা সচ্ছন্দে সপত্নীক সকল বাড়ীতে গিয়া চর্ব্ব্য চোষ্য-লেহ্য-পেয় সেবা করিয়া আসিতেছেন; কিন্তু সে কথা বলেই বা কে,—আর ধরেই বা কে? কিন্তু সাহেবেরা মানুন আর নাই মানুন, ও গুলা নিষিদ্ধ। বাঙ্গালিরা সকলেই যে এই নিষেধ মানিয়া থাকেন তাহাও নহে, তবে পিতা অতিরিক্ত মাত্রায় এই নিষেধ বিধি প্রতিপালন করিতেন। কোন ভদ্র লোকের বাড়ীতে একটা ডাব খাওয়াও যেন গ্লানি-কর মনে করিতেন। দুই এক স্থলে যৎ কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যভিচার ছিল। শুনিয়াছি, তিনি কটকে থাকার কালে পুরীর রাজা তাঁহাকে, চোপদার প্রভৃতি সঙ্গে দিয়া, বৃহৎ রূপার থালে, গুটি আষ্টেক পটল পাঠাইয়া দেন। পটল তখন কটকে বারমাসই দুর্লভ ছিল। বাবা প্রত্যাখ্যান না করিয়া রাজদূতকে দুই মুদ্রা পারিতোষিক দেন, এবং পটল কয়টি গ্রহণ করেন, পরে সেবনও করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদে, নবাবের বৎসরে দুইবার ভেট, জ্যৈষ্ঠে আমের, আর শীতে মেওয়ার, সকল কর্ম্মচারীই গ্রহণ করিতেন। পিতাও গ্রহণ করিতেন।

প্রত্যাখ্যান করা অন্যায় মনে করিতেন। আর মহারাণী স্বর্ণময়ীর ভোজ, তাঁহার বাড়ীতে নয়, তাঁহার পুরোহিতের বাড়ীতে, উকীল আমলা দলবলের সঙ্গে পিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর মফঃস্বল তদারক করিতে গিয়া, রাত্রি যাপনার্থ কচিৎ কোন ব্রাহ্মণের বাটিতে প্রসাদ পাইয়াছিলেন। আর একস্থানে মুসলমানের সিধা লইয়া, নিজ ব্রাহ্মণের পাকে আহার করিয়া, দুই দিনের পর দেহ রক্ষা করিয়াছিলেন।

ঢাকাবাসী এইবার তাঁহাদের সাধের সব জজকে অবসর প্রাপ্ত পাইয়া, বিশুদ্ধ গঙ্গাচরণ বাবু রূপে পাইয়া, শৃঙ্খল বিমুক্ত বন্ধুভাবে পাইয়া, ভোজে নাচে, উৎসবে মাতিয়া উঠিল। আমিও আমার বন্ধু, হুগলী নর্ম্মালের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগ্রামের পূর্ব্বে রণ-রঙ্গ-স্থলে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু আমার কায়স্থের উদর, দিন দিন পর্য্যায়-ন্যস্ত সে ভোজের ভার সহিতে পারিল না। আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। আমার বন্ধু ব্রাহ্মণ; তাহাতে চিরদিনই ফলাহার-পটু; তবু পলান্ন-দায়ে বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তবে রণে ভঙ্গ দিলেন না। পিতা কিন্তু অক্ষুন্ন অটুট। সকল জায়গায় সমানে যাইতেছেন, আহার করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, থিয়েটার দেখিতেছেন। একবারও অবসাদ বোধ করিতেছেন না। কে বলিবে বৃদ্ধ কার্য্য হইতে অবসর লইতেছেন। যেন যুবা পুরুষের কার্য্য ক্ষেত্রে এই প্রথম উদ্যম। থিয়েটারে মেঘনাদ বধ হইয়াছে, প্রমীলা সহগামিনী হইবেন। রাবণ স্পীচ দিয়া চলিয়া গেলেন। জন প্রাণীটী নাই; প্রমীলা বেচারা আপনার চিতা আপনি ফুৎকার দিয়া জ্বালাইতেছে। আমি পিতার পশ্চাতে ছিলাম, এই বিষদৃশ বিড়ম্বনা দেখিয়া বলিয়া উঠিলাম, "ইহাদের কি আর কেহ নাই নাকি? ভৃত্য পরিচারক সব কোথায় গেল?" পিতা শুনিতে পাইয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন,—"রাম কি আর কিছু রেখেছে গা, রাক্ষস-পুরী শূন্য করিয়াছে।" এরূপ কথা সর্ব্বদাই শুনিতাম।

ঢাকার জনসাধারণ সভা ১২৮৮ সালের ৪ঠা মাঘ স্বর্ণ-চিত্র-বেষ্টিত পার্চমেণ্ট পত্রে পিতাকে অভিনন্দন দিয়া, মহতী সমিতি মধ্যে তাঁহাকে বিদায় দান করিল। ঢাকা ব্যাঙ্কের ম্যানেজার কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন,—"You have no business to be here Babui

We bid fareweel to your father, you have no locus starndi আমি বলিলাম সাহেব তোমার ঐটী ভুল You say, farewell, farwell, I say "welcome father." I oppose you ! Havenot I a locus not standiz সাহেব নীরব হইয়া হাসিতে লাগিলেন। বাসায় গিয়া রাখাল বাবুর মুখে এই গল্প শুনিয়া, পিতা আনন্দে অশ্রু-পাত করিলেন।

বাস্তবিক আমি পিতাকে Welcome করিয়া আনিতে অর্থাৎ আদরে আগু বাড়াইয়া আনিতে গিয়াছিলাম বটে! সেই মাঘ মাসের মাঝামাঝি আমরা বাটিতে ফিরিলাম। বন্ধনমুক্ত পিতাকে পাইয়া আমাদের গ্রাম-শুদ্ধ লোকের আনন্দই না কত! পিতা বাড়ীতে আসিয়াই গয়াগমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই যে ৩৬।৩৭ বৎসর চাকরী, ইহার মধ্যে পিতা নিজের পীড়ার জন্য একমাস কাল, আর আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশনের উৎসবের জন্য, ১৮ দিনমাত্র, ছুটি লইয়াছিলেন। ৺ দুর্গাপূজার ছুটীতে প্রতি বৎসরই বাড়ীতে থাকিতেন এবং সেইটাই প্রিবিলেজ ছুটীর মত গণ্য হইত। নিকটে থাকিলে বড় দিন, মহরম ও গুডফ্রাইডের সময়েও বাড়ীতে থাকিতেন। অন্যথা মহালয়া হইতে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া পর্য্যন্ত, বাড়ীতে অবস্থান কাল মাত্র। যখন আরায় ছিলেন, তখন ৺ কাশীধামে গিয়াছিলেন; যখন কটকে ছিলেন, তখন ৺ পুরীধামে গিয়াছিলেন; আর আলীপুরে থাকার কালে অবশ্য ৺ কালীঘাটে গিয়াছিলেন; ইহা ছাড়া, অন্য কোন তীর্থ করেন নাই। তাহার জন্য বিশেষ ব্যগ্র বা ক্ষুণ্ণ ছিলেন না। এবার বাটীতে আসিয়াই, যেন গয়া-গমনের জন্য একটু ব্যগ্র ব্যগ্র বোধ হইল। বাড়ীর চাকর ত সঙ্গে গেলই, তবে একজন বিশ্বাসী—ভাল ব্রাহ্মণ পাইতে একটু বিলম্ব হইল। তাহাতেই তাঁহার ব্যগ্রতা আমরা বুঝিতে পারিলাম। কেন ব্যগ্র, তাহাও জানিতে পারিলাম। তাঁহার পিতামহ, মাতামহ, তাহাই বা বলি কেন—সে কালে সকল হিন্দুই-আশা করিতেন, মনে মনে দাবি করিতেন, যে পুত্র পৌত্রগণ কৃতি হইলে যেন গয়ায় পিণ্ডদান করে। পিতার পিতামহ, মাতামহ, ঐরূপ আশার কথা হয় ত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন; তখন রেল ছিল না, পথ ছিল না,

পথে ভীষণ দস্যুভয়, হিংস্র জন্তুর ভয় অতিশয় ছিল, তবু তাঁহারা এরূপ আশা করিয়াছিলেন। এখন রেল হইয়াছে, পথ-ঘাট সুগম হইয়াছে, পিতা ত কৃতি বটেনই, সুতরাং রাজকার্য্য হইতে অবসরান্তে তাঁহাদের দাবির কথা স্মরণ করিয়া পিতা গয়া গমনের জন্য বিশেষ ব্যগ্র হইয়াছিলেন।

চাকর, ব্রাহ্মণ, আর পিতার পিসতাত ভাই—আমার প্রসন্ন কাকাকে সঙ্গে লইয়া বাবা গয়া গমন করিলেন। ভাবটা এই যে নিজের পিতৃপুরুষ ও মাতামহ বংশের যেরূপ পিণ্ডদান হইবে, পিসার পিতৃপুরুষদিগেরও সেইরূপ পিণ্ডদান হইবে। তাঁহারা কয়দিন গিয়া ৺বৈদ্যনাথে থাকেন। তাহার পর গয়া করিয়া আসিয়া আবার বৈদ্যনাথে ছিলেন। জ্বরের তাড়নায়, ৺বৈদ্যনাথের কৃপায় বৈদ্যনাথধাম তৎপূর্ব্ব হইতেই আমার একরূপ (Second domicile) দ্বিতীয় নিবাস হইয়াছে। পিতার কিন্তু সেই একবার বা দুই বার যাওয়া। তাঁহাকে হাতে পাইয়া পাণ্ডা মহাশয়েরা খুব আদর আবদার করিলেন। আমাদের বাড়ীতে আড়ম্বরে তাঁহাদের সপাক পক্কান্ন ভোজ হইল। আর আমাদের খাস পাণ্ডা জয়কুমার ঠাকুর পট্টবস্ত্র, শাল, উত্তরীয় প্রাপ্ত হইলেন। কিছুদিন পরে পিতা ফিরিয়া আসিলেন। আমি জীবনী লিখিতেছি না, মাস মাস বা বৎসর বৎসর পর পর ঘটনারও উল্লেখ করিব না, তবে এই সকল বিষয়ে উঁহার ভক্তি শ্রদ্ধা কিরূপ ছিল, সেই কথাই বুঝাইবার জন্যই গয়া গমনের কথা বলিলাম। আসল কথা, অন্য তীর্থাদির জন্য তিনি ব্যগ্র না থাকিলেও গয়া গমনের জন্য ব্যগ্র হন। অন্যান্য তীর্থ প্রধানত আপনার জন্য, গয়া তীর্থ প্রধানতঃ পিতৃপুরুষদিগের জন্য। দেবতায় তাঁহার কিরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতার শেষভাগ দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। সেই বক্তৃতার শেষ দিকে যে দুর্গোৎসবের বর্ণনা আছে, তাহা কেবল প্রথম পুরুষে, তাঁহারই স্বরূপ বর্ণনা মাত্র। "এই সময়ে গললগ্নীকৃতবাসা কৃতি (যিনি প্রকৃত হিন্দু) প্রতিমার সম্মুখে, অথচ কিঞ্চিৎ পার্শ্বে, দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে দেখিতেছেন এবং ভাবিতেছেন। ... ... এই ভাবিতেছেন যে,

পরমা প্রকৃতি, আদ্যা শক্তি তাঁহার আলয়ে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন গৃহস্বামী এই ভাবিতেছেন এবং তাঁহার হৃদয়ে ভক্তি ও আনন্দ-তরঙ্গ যুগপৎ উদ্বেলিত হই নয়নযুগল দিয়া দর-দরিত ধারায় পড়িতেছে। গৃহস্বামী পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার ভবনে আত্মীয় বন্ধু, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, প্রতিবাসী, গ্রামবাসী এবং দীনদুঃখীগণ প্রভৃতি বহুল ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে। সকলেই আনন্দ উৎফুল্ল; গৃহস্বামী ভাবিলেন যে অদ্য আমার ভবনে আনন্দময়ী আগমন করিয়াছেন, ইহাতেই এত আনন্দ। তাঁহার নয়ন দিয়া আবার আনন্দধারা বহিতে লাগিল। এই আনন্দ অতি বিমল আনন্দ, ইহা ভক্তির আনন্দ, ইহা স্বর্গীয় আনন্দ। এই শোক-তাপ-সন্তপ্ত সংসারে এরূপ আনন্দ যে লাভ করিতে পারে, সে ধন্য এবং তাঁহার জীবন সার্থক।" আবার বলি, এই চিত্র পিতার নিজকৃত স্বরূপ-চিত্র; তিনি ভক্তির আনন্দ উপভোগ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিলেন।

পিতা আমাদিগের মত পোলিটিক্যাল কখন হন নাই। রাজনীতির খিচুড়ি করিয়া, দুহাতে ছড়াইয়া, কাককে বককে খাওয়াইতে তিনি কখন অভ্যাস করেন নাই। চাকুরী করিতে করিতে তিনি যে রাজনীতির চক্র-ব্যূহ-মধ্যে পড়িয়াছিলেন, সে কথার পরিচয় পূর্ব্বেও দিই নাই, এখনও দিব না। তিনি পোলিটিক্যাল ছিলেন না, সুতরাং সাধারণীতে লিখিতে ভাল বাসিতেন না। গবরমেণ্ট এ সকল কাজে নিতান্ত নারাজ, রাজ-কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে সংবাদপত্রে দেখা একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল। কাজেই সাধারণীতে লিখিতে আমি তাঁহাকে কখন অনুরোধও করি নাই। কেঁকশীয়ালির বটবৃক্ষের বর্ণনার কথা প্রথমেই বলিয়াছি, সেইরূপ পদ্য কচিৎ কখন লিখিতেন এবং সাধারণীতে প্রকাশিত হইত। আর ঋতুবর্ণনের নিদাঘ ভাগের অনেক অংশ সাধারণীতে ক্রমশ প্রকাশিত হইয়াছিল; আর বর্ষার কয়েকটা বর্ণনা প্রকাশিত হয়, তাহা অদ্যাপি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। গদ্য প্রবন্ধ সাধারণীতে অতি অল্পই লেখেন। ১২৮১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ সাধারণীতে প্রকাশিত "সাক্ষী" নামক প্রবন্ধটি এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, অবশ্য সমালোচনা করিব না।

সাক্ষী।

বিচারকার্য্য সাধনার্থে সাক্ষীর সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কোন ব্যবহার মীমাংসা করিতে হইলে, তদ্বিষয়ে উভয় পক্ষের বিবৃত ভূতপূর্ব্ব ব্যাপার সমূহের বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু সেই সমস্ত ব্যাপার সম্বন্ধে বিচারপতি সম্যক্ অনভিজ্ঞ থাকায়, কোন্‌টি সত্য কোন্‌টি মিথ্যা কিছুই নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। তখন সাক্ষীর বাক্যই তাঁহার প্রধান উপায়। তিনি তদ্দ্বারা অন্ধকারে আলোক লাভ করেন; আপনার পথ দেখিতে পান, এবং জটিল জাল ছেদন করিয়া সত্যের উদ্ধার করিতে পারেন! যাঁহার বাক্যের দ্বারা ঈদৃশ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাঁহাকে আদর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং ভগবান মনুও তদীয় সংহিতায় সাক্ষীকে সম্মান করিতে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অধুনা ইংরাজ রাজ-প্রতিষ্ঠাপিত ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে সাক্ষীদিগকে আদর বা সম্মান করা দূরে থাকুক, তাহাদের বিশেষ অবমাননা ও সময়ে সময়ে নিপ্পীড়ন করা হয়। এই সকল ধর্ম্মাধিকরণে সাক্ষীদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিলে বোধহয় যেন তাহারা কোন গুরুতর অপরাধ করিয়াছে এবং তজ্জন্যই তাহাদের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হইতেছে। দণ্ডার্দ্ধই হউক, কিম্বা প্রহরদ্বয়ই হউক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাক্ষীকে সাক্ষ্য দিতে হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহাকে কাঠগড়া বেষ্টিত একটি সংকীর্ণ স্থানে দণ্ডায়মান থাকিতে হয়। এরূপ অবস্থা কেবল ক্লেশকর নহে, অধিকন্তু ভদ্র ব্যক্তিদিগের পক্ষে অতীব অপমান-জনক। যদি বলেন যে বিচারালয়ের সম্ভ্রম-রক্ষার্থ দণ্ডায়মান অবস্থায় সাক্ষ্য প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় কেবল এরূপ কাল্পনিক সম্ভ্রমের জন্য কাহাকেও কষ্ট প্রদান করা কোন প্রকারেই উচিত নহে। বিশেষত যে স্থানে কার্ত্তিক বাগ্দী ও খোয়াজ নিকারী দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিয়াছে, সেই স্থানে সেই অবস্থাতে ফুলের মুখুটি বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান হর লাল মুখোপাধ্যায়কে কিম্বা বিশাল ভূসম্পত্তিশালী যোগীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীকে সাক্ষ্য দিতে হইলে, তিনি যে আপনাকে হতমান বোধ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এবং এই অপমান ভয়েই সম্ভ্রান্ত সাক্ষীরা বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে সঙ্কুচিত হয়েন।

সত্য বটে, বিচারপতির সম্মুখে সকলেই সমান, কিন্তু তজ্জন্য যে সর্ব্বপ্রকার সাক্ষীকেই একই আসনে দণ্ডায়মান না করিলে, বিচারে দোষ-স্পর্শ হইবে একথা যুক্তি যুক্ত নহে। বিশেষত কার্য্যত রাজাজ্ঞার দ্বারা এ বিষয়ে ইতর বিশেষ দেখা যাইতেছে। অনেকানেক ধনাঢ্য ভূস্বামীগণ সাক্ষ্য প্রদানার্থ বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন, এবং সচরাচর দেখা যায়, যে যদি কোন ইউরোপীয়কে সাক্ষ্য দিতে হয়, তবে তিনি প্রায়ই বিচার-পতির পার্শ্বে সমাসীন হইয়া থাকেন। অতএব বিচারালয়ের সম্ভ্রমরক্ষার্থ ভদ্র অভদ্র সকল সাক্ষীকেই এক কাঠগড়ার মধ্যে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে এ তর্ক নিতান্ত নিতান্ত দুর্ব্বল; এরূপ প্রথা অবলম্বনে কোন উপকার নাই, বরং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগকে মানসিক ও দৈহিক কষ্ট দেওয়া হয় ও সময়ে সময়ে তাঁহাদিগের সাক্ষ্যলাভের পথ অবরোধ করাও হয়। কিন্তু কেবল ইহাই নহে, সাক্ষীদিগের আরও দুর্গতি আছে। যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক সাক্ষী আহূত হন, তাঁহার পক্ষ হইতে জিজ্ঞাসা-বাদ হইলে পর, পক্ষান্তরের উকীল তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করেন। আদালতের ভাষায় এই প্রশ্নের নাম জেরার সওয়াল, এবং তাহা কখন কখন এতদ্রূপ জটিল ও সুদীর্ঘ হইয়া উঠে, যে সে জেরার জের মিটান অতি সুকঠিন। প্রমাণ-বিষয়িণী-ব্যবস্থাবিৎ পণ্ডিতেরা কহেন যে এ প্রশ্নের দ্বারা অনেক প্রকৃত বিষয়ের আবিষ্কার হইতে পারে, অতএব ইহা প্রয়োজনীয়। আমরাও বলি, যে যদি জেরার সওয়াল বিশুদ্ধ প্রণালীতে করা হয়, তবে অনেক গুপ্ত বিষয় প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু উকীল মহাশয়েরা তদুদ্দেশে প্রতিপ্রশ্ন করেন না। সাক্ষীকে মিথ্যাবাদী করাই তাঁহাদের প্রতিপ্রশ্নের প্রধান উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়ে প্রায়ই কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। জেরার সওয়াল কালে উকীল-দিগের সকোপ নয়নে দৃষ্টিপাত, ও পরুষবাক্য প্রয়োগ এবং সময়ে সময়ে বিচারপতির ভয়ঙ্কর তাড়না, সাক্ষীকে এরূপ সভয় ও ব্যতিব্যস্ত করে যে, সে একেবারে হতচেতন হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুখে যাহা আইসে সে তাহাই বলিতে থাকে। ইহাতে সত্যের আবিষ্কার না হইয়া

বরং সত্য, তিমির-জালে অধিকতর আচ্ছন্ন হয়। বিশেষত বিচারপতি কর্ত্তৃকই হউক, কিম্বা উকীল কর্ত্তৃকই হউক, সাক্ষীকে তাড়না করা কোন প্রকারেই বৈধ ও সাধু-সম্মত নহে। স্বীকার করি, যে এরূপ দূষণীয় কার্য্যে কোন কোন উকীলের প্রবৃত্তি জন্মে না, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। আমরা যে কুপ্রথার বর্ণনা করিলাম, তাহা অধিকাংশ উকীলেরাই করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহা সাধারণ প্রথা হইয়া উঠিয়াছে এবং তদ্দ্বারা কুফলও ফলিতেছে। এই প্রথা যাহাতে দূরীকৃত হয়, এবং সাক্ষীদিগের অবস্থানুসারে মর্য্যাদা রক্ষা পায়, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক অনুরোধ।

ঠিক একবৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮২ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ "সীতা-বিলাপ" (দণ্ডকারণ্যে) সাধারণীতে প্রকাশিত হয়। সেটি পদ্য। তাহার তিনটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম।

'যে দিন বলিলে দিতে পরীক্ষা অনলে,
করিলে ঘোষণা এই শুনিল সকলে,-
যদি এই পরীক্ষায়, সীতা মম মুক্তি পায়,
জানিব কলঙ্ক হীনা জনক নন্দিনী।
আজীবন সিংহাসনে করিব সঙ্গিনী॥'

বিশ্বাস করিয়া সেই ঘোষিত বচনে,
বিশ্বাস করিয়া আর মম আচরণে,
পশিলাম হুতাশনে, প্রফুল্ল পবিত্র মনে,
বাহির হইনু পুনঃ দেখিল ত্রিলোকে
বিমল সুবর্ণ যথা বিমল আলোকে॥

কিন্তু অয়ি নাথ, একি সর্ব্বনাশ।
কোথা সিংহাসন, কোথা বনবাস!
উঠি অকস্মাৎ, ঘন ঘূর্ণ বাত,
জীবন কানন ছিন্ন ভিন্ন করি,

ঢাকা ছাড়বার কিছু পূর্ব্বে ১২৮৯ সালের ১৮ই বৈশাখ সাধারণীতে পিতৃকৃত "যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ" প্রকাশিত হয়। ইহার বহুপরে তৎকালের দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু "মহাপ্রস্থান" নাম দিয়া স্কুল পাঠ্য "কবিতা প্রসঙ্গ" গ্রন্থের প্রথমেই একটি কবিতা প্রকাশিত করেন; সেটি অতি সুন্দর; অনেক স্থলে পিতার স্বর্গারোহণ হইতে সুন্দর। তবে যোগীন্ বাবু বলিতেছেন, যুধিষ্ঠির—

"শোকচ্ছায়ে" বিমলিন, নরপতি আভাহীন,
মেঘাবৃত যেন দিবাকর,
অন্তরে চিন্তার ভার, কষ্টের নাহিক পার
ধীরে ধীরে হন অগ্রসর।

আর পিতা বলিতেছেন—

প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হৃদয়-দর্পণ।
বিমল আভায় করে সভে প্রদর্শন,—
কুচিন্তা, কুটিল দ্বেষ, শোক-তাপ পাপলেশ,
পারে নাই করিবারে কভু অধিকার।"
সত্যব্রত পুণ্য-পূত অন্তর তাঁহার।

এই দুই চিত্রের বিভিন্নতা যেন কেমন কেমন লাগে। [illegible] পিতার যুধিষ্ঠির কুক্কুর সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"নারিব কদাচ এই আশ্রিত ত্যজিতে"

যোগীন বাবুর যুধিষ্ঠির বলিতেছেন,—

"প্রতি জীবে ভগবান করিছেন অধিষ্ঠান
শ্বান বলি ত্যজিব কেমনে?"

সমালোচনা আমার সেকালে রোগ বলিয়া এই কথাগুলা বাহির হইয়া পড়িল। নতুবা যোগীন বাবুর মহাপ্রস্থান কবিতা সুন্দর, অতি সুন্দর। সে সৌন্দর্য্যে হস্তার্পণ করিতে অতি নৃশংসও পারে না। তবে স্বর্গারোহণের বহু পরে মহাপ্রস্থান লেখা, সুতরাং এইরূপ বিভেদ

যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক যোগীন বাবু করিয়া থাকেন, তবে লক্ষ্য করিবার বিষয় বৈ কি। সমগ্র স্বর্গারোহণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ।

দুঃসহ দীধিতি-দীপ্ত দিবা গত-প্রায়,
বৈকালিক মাধুরিতে মহী শোভা পায়;
ফুটিছে কুসুম-চয়, সুমৃদু সমীর বয়,
ধীরে ধীরে অস্তাচলে চলে দিন মণি;
শান্তির কোমল কোলে অর্পিয়া অবনী।

সান্ধ্য সৌর হৈম দ্যুতি হিমাদ্রি উপরে,
তরল লাবণ্যে খেলে শিখরে শিখরে।
তুষার মুকুটে সাজি, স্তরে স্তরে শৃঙ্গরাজি,
কনক কিরণে মরি কিবা সুশোভিত,
স্বর্গের সোপানাবলী সুবর্ণ-নির্ম্মিত।

তার মাঝে হের এক তুঙ্গ শৃঙ্গোপরি,
চূড়া যার পরশিছে অমর নগরী,
অপূর্ব্ব পুরুষ-বর, দেব যক্ষ কিবা নর,
একাকী দণ্ডায়মান কেহ নাহি আর,
এক সারমেয় মাত্র সঙ্গেতে তাঁহার।

দীর্ঘাকৃতি, সৌম্য-মূর্ত্তি বয়সে প্রবীণ,
অঙ্গের উজ্জ্বল আভা ঈষৎ মলিন।
শুক্লবাস পরিহিত, শুক্ল কেশ বিলম্বিত,
শুক্ল শ্মশ্রু সুধাংশুর শিখা-সম ভাষে,
অমল অনিলে দুলি সুনীল আকাশে।

প্রফুল্ল মুখারবিন্দ হৃদয়-দর্পণ—

কুচিন্তা কুটিল দ্বেষ, শোক-তাপ পাপ-লেশ,
পারে নাই করিবারে কভু অধিকার ;
সত্য-ব্রত পুণ্য-পূত অন্তর তাঁহার।

ললাট প্রশস্ত অতি, অতি সুলক্ষণ,
তদুপরি ছিল বুঝি মুকুট ভূষণ ;
ওষ্ঠাধর বিম্ব হেন, ঈষৎ কাঁপিছে যেন,
প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে অনন্ত গগনে,
হেরিছেন উর্দ্ধদৃষ্টি আয়ত নয়নে।

হেনকালে ধ্বনি এক হইল আকাশে,
সুগভীর তার স্বরে এই কথা ভাসে।—
'পাণ্ডবেন্দ্র যুধিষ্ঠির, সত্যব্রত ধর্ম্মবীর,
স্বর্গলাভে যদি থাকে, কামনা তোমার,
আবলম্বে সারমেয় কর পরিহার।

ধর্ম্মশাস্ত্রে জ্ঞানী তুমি, ধর্ম্ম-অবতার,
কুক্কুরে লয়েছ সঙ্গে কেমন বিচার!
যার পর্শে পুণ্য-ক্ষয়, অশুচি হইতে হয়,
কেমনে আসিবে বল হেন পশু লয়ে।
পরম পবিত্র ধাম অমর আলয়ে॥"

হইল আকাশে এই ধ্বনি নিনাদিত,
টলাতে নারিল কিন্তু ভূপতির চিত ;
অচলে অচল সম, স্থিরভাব নিরুপম,
অকম্পিত স্বরে কন অপূর্ব্ব বচন,
অন্তরীক্ষ হতে শুনে যত দেবগণ।

"শিরোধার্য্য দৈববাণী কিন্তু কদাচন,
নারিব করিতে আমি কুক্কুরে বর্জ্জন।

বনিতা পাঞ্চালী সতী, ভ্রাতা চারি মহামতি,
লয়ে সঙ্গে মহাপন্থে করি আগমন,
সভে স্বর্গে আরোহিব করিয়া মনন।

নিয়তি-নিয়ম কিন্তু কে লঙ্ঘিতে পারে?
একে একে সবে তারা ত্যজেছে আমারে;
কে থায় দ্রুপদ সুতা ধর্ম্ম পত্নী গুণ-যুতা,
কোথায় নকুল আর সহদেব বীর!
কোথা ভীম মহাবল, কোথা পার্থবীর!

মৃত্যু-বশে অন্ত পথে গিয়াছে সকলে,
ফেলিয়া আমায় এই দুর্গম অচলে।
কেহ নাহি ছিল আর চতুর্দ্দিক শূন্যাকার!
উঠিলাম তবু শৈলে ধৈর্য্য ধরি মনে
কিছুদূরে মিল হয় সারমেয় সনে।

নাহিক রক্ষক আর, নাহিক দোসর,
মম সম একা ভ্রমে শিখর উপর।
আমারে দেখিতে পেয়ে, সত্বর আইল ধেয়ে,
পরস্পর মধ্যে ক্রমে সানুভূতি হয়,
সে হইল সঙ্গী, আমি দিলাম আশ্রয়।

পবিত্র কি অপবিত্র হউক যেমন,
আমি তারে নাহি পারি ছাড়িতে কখন;
যেখানে করিব গতি, তাহারে লইব তথি,
এই সত্যে আপনারে করেছি বন্ধন,
নারিব নারিব তাহা করিতে লঙ্ঘন।

হতে হয় হব, স্বর্গ-সম্ভোগে বঞ্চিত।
কিম্বা এই গিরি-পৃষ্ঠে তুষার গলিত॥

দেবগণ-সন্নিধানে দুর্লভ অমৃত পানে,
বিড়ম্বিত হতে হয়, তাও আমি হব,
ত্রিদশের কোপানল শির পাতি লব।

সখা মম নারায়ণ দয়ার আধার,
ক্রুদ্ধ হয়ে রুদ্ধ করুন গোলোকের দ্বার;
অন্তিমে নরক-গামী হতে হয় হব আমি,
তথাপি নারিব নিজ বচন খণ্ডিতে,
নারিব কদাচ এই আশ্রিত ত্যজিতে।

এত যদি বলিলেন নৃপ চূড়ামণি,
আকাশে ঘোষিত হয় ধন্য ধন্য ধ্বনি।
খুলিল স্বর্গের দ্বার জ্যোতি অতি চমৎকার,
ধরায় ধারায় পড়ি কিবা মনোহর,
ঢল ঢল গলা হেমে ভাসে চরাচর।

সে দ্বার শোভিছে কিবা দিব্যাঙ্গনা দলে,
কক্ষে স্বর্ণ-কুম্ভ-পূর্ণ মন্দাকিনী জলে।
লুটিয়া নন্দনবন পারিজাত অগণন,
শত শত সুরবালা আনি সমাদরে,
হর্ষে বর্ষে নৃপতির মস্তক উপরে।

কত দেব দেবী কত, কিন্নর কিন্নরী,
সুমধুর বীণা-যন্ত্র যত্নে করে ধরি
আরম্ভিল সুললিত অপূর্ব্ব মোহন গীত,
পবন হিল্লোলে গীত অনন্ত আকাশে,
ব্যাপিল, শুনিল বিশ্ব অসীম উল্লাসে।

গীত।

রাগিণী জয়-জয়ন্তী, তাল একতালা।

জয় যুধিষ্ঠির পুণ্য-পরায়ণ,

জয় বিপদার্ত্ত বিপদভঞ্জন,
জয় সুর নর মানস-রঞ্জন;
জয় সত্যনিষ্ঠ জয় মহাভাগ,
অনুপম তব সত্য অনুরাগ,
করেছ ধরায় কত পরিত্যাগ,
বিনা ক্ষোভে ভূপ সত্যের কারণ।
ধন্য ধন্য তুমি ধন্য পুণ্যবান,
তব পুণ্যে বাধ্য বিভু ভগবান,
সুরগণ যাচে পেতে তব স্থান,
সুরলোকোপরি তোমার আসন।
নিত্যধামে তব পুণ্য পুরস্কার,
অক্ষয় আনন্দ ভুঞ্জ অনিবার,
বিমুক্ত হয়েছে ত্রিদিবের দ্বার,—
এস এস ত্বরা এস হে রাজন॥
গগনে দুন্দুভি ধ্বনি হইল তখন,
নামিল ভূধরোপরি বিচিত্র স্যন্দন;
আরোহিয়া তদুপরি নরশ্রেষ্ঠ নৃপবর,
সশরীরে পশিলেন ত্রিদশ আলয়,
চতুর্দ্দিকে নিনাদিল শব্দ জয় জয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অতি বাল্যকাল হইতে পিতা আমাকে নিয়ত সাথের সাথী করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। আমার যৌবনে, সেরূপ সাহচর্য্যের সুবিধা ছিল না বটে, কিন্তু পুত্রং মিত্র বদাচরেৎ যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে আমাদের পিতা পুত্রের মধ্যে হইয়াছিল। কেবল মিত্র বলিয়া নয়, বন্ধু বলিয়া নয়, তিনি ইচ্ছা করিয়া আমাকে সময়ে সময়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সম-কক্ষতা প্রদান করিতেন। হঠাৎ এক দিনে নহে, আমাকে তাঁহার সমকক্ষ করিতে, প্রতিদ্বন্দ্বী করিতে—

কোম্‌তের প্রত্যক্ষবাদ লইয়া, হারবার্ট স্পেনসারের সমাজ তত্ত্ব লইয়া, আমরা পিতপুত্রে ঘোরতর তর্ক-বিতর্ক করিতাম। মিল, কোম্‌তের তিনি তীব্র প্রতিবাদ করিতেন; হারবার্ট স্পেনসারের সমাজতত্ত্বের সময়ে, জিজ্ঞাসুর মত পূর্ব্বপক্ষ করিয়া, ঠিক যেন শিক্ষা করিতে বসিতেন।

মধুস্থদনকে লইয়া নবরত্নের সহিত আমার কলহের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজী বাঙ্গালার আর কোন কবির কবিত্ব লইয়া পিতাপুত্রে আমাদের বিবাদ ছিল না। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির রস আমরা পিতাপুত্রে লোফালুফি করিয়া উপভোগ করিতাম। সেক্‌সপিয়ারের নাটকের রস তাঁহার পাদমূলে বসিয়াই উপভোগ করিয়াছি। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মেকলে, কাপ্তেন রিচার্ডসন্‌কে বলিয়াছিলেন, যে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত ভুলিতে পারিব, কিন্তু তুমি যে এই সেক্‌সপিয়ারের আবৃত্তি করিলে, এ আবৃত্তি কখন ভুলিতে পারিব না। রিচার্ডসন্ যখন বিলাত চলিয়া যান, তখন তদীয় ছাত্রেরা দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে আপনি চলিয়া গেলেন এখন কাহার কাছে আমরা সেক্‌সপিয়ারের পাঠ শিক্ষা করিব? রিচার্ডসন্ বলিয়াছিলেন "অধ্যাপক উইলিয়ম মাষ্টারস্ রহিলেন। তাঁহার কাছে সেক্‌সপিয়ার শুনিও।" আমি সেই উইলিয়ম মাষ্টারসের ছাত্র। পিতা রিচার্ডসনের ছাত্র। আমার মনে হয় রিচার্ডসন সাহেব, উইলিয়ম মাষ্টারস্ সাহেবের নাম না করিয়া, যদি পিতার নাম করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত। গুরু-নিন্দার বাহাদুরীর জন্য বা পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন জন্য, এমন কথা বলিতেছি, কেহ মনে করিবেন না। যে স্থলে রস-গভীর, ভাষা-প্রগাঢ়, আবেগ-পরিপূর্ণ,—সেই সকল স্থলের সেক্‌সপিয়র পাঠ পিতা যেমন করিতে পারিতেন, এমন আর কাহাকেও শুনি নাই। লিউইসের লাইসিউম্ থিয়েটারের রঙ্গস্থলেও নহে। তবে সেখানে হ্যাম-

লেটের স্বগত উক্তির To be or not to be প্রভৃতির যেরূপ বিকাশ দেখিয়াছিলাম, সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই। বিনিসের রাজ সভায় ওথেলোর উক্তি Her father loved me, oft invited me প্রভৃতি পিতা অতি আশ্চর্য্যরূপ আবৃত্তি করিতেন। Father, loved. oft প্রভৃতি গালভরা কথা, কেন সেকস্‌পিয়র সংযোজনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার আবৃত্তিতেই প্রথমে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কথোপকথনে রস-বিস্তারে পিতার মত দ্বিতীয় লোক আমি দেখি নাই। অনেকেই বলেন, তাঁহারাও দেখেন নাই। অজ্ঞ, বিজ্ঞ, হিন্দু, ব্রাহ্ম, যুবা বৃদ্ধ, লইয়া একটা ভরপুর মজলিসে তিনি একাই এক-শ হইয়া গল্পের ছটায়, হাঁসির ঘটা তুলিয়া দিগ্‌বিজয়ী রূপে বিরাজ করিতেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও বিচারক দ্বারকানাথ মিত্র বেশ কথোপকথনপটু ছিলেন বটে, কিন্তু অনেক সময়, তাঁহার আপন কথাই পাঁচকাহন বলিয়া অনেকের মনে হইত এবং সেই জন্য অনেকে বিরক্তি প্রকাশও করিতেন। আর একজন মজলিসি মানুষ ছিলেন মুখর্জ্জীস্ মেকাজিন্ ও রেইস এণ্ড রায়তের সম্পাদক-প্রসিদ্ধ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। কিন্তু অনেক সময়েই তিনি অহিফেনে মস্‌গুল-মগজ হইয়া থাকিতেন। কথা চিবাইয়া চিবাইয়া বাহির হইত। মুখুয্যে মহাশয়ের নায়কতার মজলিস্ যেন একটু একটু ফরাসডাঙ্গার আড্ডার মত মনে হইত। মদের মজলিসের বক্তাদের সঙ্গে তুলনাই করিব না। কেবল এই স্থলে পিতার ব্যঙ্গ রচনার, হাস্যরসোদ্দীপক রচনার একটু পরিচয় দিব। সেই লেখার ইতিহাস বুঝাইবার জন্য তাঁহার গুণ-পুত্রের গুণের পরিচয়ও একটু দিতে হইল।

সাধারণীতে "চেনাচুর" নাম দিয়া, পাঠককে বালক সাজাইয়া মুঠা মুঠা বিদ্রূপ বর্ষণ করিতাম। "সাধারণীর চেনাচুর" একটা উপমার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। সাহিত্যে, সংবাদপত্রে,—সাধারণীর চেনাচুরের উল্লেখ থাকিত। "কিষণ দাস্ কি চেনা,—তের রূপেয়া, চার আনা—বড় লোক লেতেহে, বড় লোক খাতেহে" ইত্যাদি কথা তখন লোকের মুখে মুখে শুনা যাইত। চেনাচুর ছেলেরাই খায়; সাধারণীর চেনাচুর বুড়ারাও ফোক্‌লা দাঁতে চিবাইতে লাগিলেন; এ দিকে কেশব বাবুর সম্প্রদায়ের

দুই চরি জন লেখক, বুদ্ধদেব যীশুখৃষ্ট শ্রীগৌরাঙ্গকে লইয়া বড়ই নাচাইতে আরম্ভ করিলেন। পিতা ধর্ম্মের বিকৃত ভাব লক্ষ্য করিয়া সাধারণীতে এক 'ধরম্‌চাঁদকি চেনাচুর' লিখিলেন। ইহাতে শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রাহ্ম,—এই সকল ধর্ম্মের বিকৃত ভাবের উপর তীব্র কটাক্ষ আছে। এরূপ বিদ্রূপে কোন প্রকৃত বিশ্বাসীর হৃদয়ে কিছু মাত্র আঘাত লাগিবে না। এই বিশ্বাসে তখন পিতৃদেব উহা ছাপাইয়া ছিলেন, এখনও আমি সেই বিশ্বাসেই সেই পদ্য পুনঃ প্রকাশিত করিলাম।

ধরম-চাঁদকি চেনাচুর।
মজামে ভোর পুর।

হর্‌তরেকে চেনা মেরা হর্ তরেসে তৈয়ারি।
দেখ্‌লে খা লে চুনি চুনি গুণ বিচারি॥
য্যায়সা লেজ্জৎ, ত্যায়সা গুণ, কিয়া কহোঁ তারিফ।
খানেসে দফা হোয়ে দুনিয়াকি তক্‌লিফ॥
গুঙ্গী হোগা গাইয়া, আওর বয়রা পা গা কাণ।
লেংড়া যাগা কুঁদ কর্কে হোকে আগুয়ান॥
দেল খুব খোস্ রহেগা, বুঢ্যা হোগা জোয়ান॥
অন্ধেকা আঁখো হোগা, বন্ধেকা সন্তান।
দৌড় দৌড়কে আও সব্ আও রে বাঙ্গালি।
পসন্দ কর্‌লে মেরা চীজ, মেইনে উতারা ডালী॥
পহেলা নম্বরমে দেখ তন্ত্রশাহী চেনা;
আগর চে হুয়া হ্যায় থোড়াসা পুরাণা।
তৌভি হ্যায় খুব তাজা, আওর তেজী,
ভক্তিসে যো খাওয়ে এস্‌কো, শক্তি ওস্‌পর রাজী।
পুরব সে লে আয়া হোঁ দেকে মন্ত্র ছিটা।
যন্ত্রমে বানায়া হুয়া, হুয়া বহুৎ মিঠা॥
শূদ্র ভদ্র বিপ্র বৈশ্ হোকে এক সাত,
খুব খুসি কর্‌লে ভাই! খাকে সারে রাত;

লেও মজা আনন্দমে হোকে মাতোয়ারা ;
দুনিয়াকা দুখ ভোগ মৌকুফ হোগে তেরা ॥

দোসরা নম্বরমে হ্যায় গোরাচাঁদকি চেনা,
রূপেয়া রূপেয়া সের আওর চার চার আনা ;
প্রভুনে তৈয়ার কিয়া, কিয়া মোলাম দানা !
সবকে ওয়াস্তে মজুত হ্যায় নেহি কিসিকো মানা
নেহি এসমে ময়লা যোগ নেহি কুছ জঞ্জাল।
প্রেম রস্‌সে বনি হুই, বড়াহি রসাল।
যেত্থা খাগা, হোগা আওর লালচ তুহার।
আখের লে কর্ কফ্‌নি টুক্কী ছোড়েগা সংসার।
নাচেগা দোবাহু মেলি, বজায়গে মৃদং।
পঙ্গৎ কি সঙ্গৎ মাঝ হোগা সাধু ঢং ॥

তেস্‌রা রকম্‌কা হ্যায় আউল চাঁদকি চেনা।
ঘোষপাড়াকা বাজারমে ইস্কা লেনা দেনা।
আচ্ছা মসলা সাত হুয়া, সাফা তস্‌লামে ভাজা।
বড়ি মজাদার চীজ,—চেনা কর্ত্তাভজা ॥
খানেসে খুসিমে হোগা মেজাজ্ ভোরপুর।
কিস্‌মৎ কি খুবিসে দুখ যাগা দূর।
বাড়েগা কর্দ্দানি, হোগা জাহের কেরামৎ।
দর্দ্দী-দেল হোগা তেরা কেত্নী আওরৎ ॥
ভজন্ ভোজন্ বট্‌না পানা হোগা এক সাত।
বড়ী আরামসে দিন যাগা সচ্চি মেরা বাত ॥

চৌঠা নবেম্বরমে হ্যায় রায়জীকা চেনা,
আগর সব্ না লে সকো লেও থোড়া নমুনা।
সহর কলকতামে হুয়াএস্কা পয়দা,
বহুৎ খোস্‌বদার চীজ বহুৎ এস্কা কয়দা।

এক দম আঁখো মুদকে লেও এস্কা রস।
ভুক্, পিয়াসা সব যাগা হপ্তা রোজ বস্।
সুরতভি আচ্ছি হোগী চেক্কেগা চেহারা,
নজর কা রৌসনীসে ভাগে গা আন্ধিয়ারা।
খরচ কা কম্‌তী হোগী রহোগে ফিটু ফাটু
সংসার কা সুখ পাগা, না পাগা ঝঞ্ঝাট।
আপনাকো পালো, আওর কর জরুকো পিয়ার।
দরকার নেহি আওর কিসিসে রাখনা সরোকার।

আখের মে দেখ ভাই সেনৃজীকা চেনা,
তাকত নেহি হ্যায় মেরা, তারিফ এস্কা কহনা।
নয়া তৌরসে ভজা হুয়া, হ্যায় খুব টাট্‌কা।
সব্ চেনাসে মজাদার হ্যায়, নেহি এস্‌মে খট্‌কা।
পয়সা পয়সা এক এক যোড়কী কিম্মৎ।
খা দেখ, মেলেগা হর্ রকম্ কি লেজ্জৎ।
জবানকা জোর হোগা, হোগা মিঠা বুলি।
কেত্থা আদ্‌মী লেগা তেরা দো পাঁওকি ধূলি।
আজব তরেকা কাম করেগা নাম হোগা জাহের।
নেহি রহেগা ডর, নেহি সরমকা খাতের।
মেজাজ ফলাও হোগা ফেরেগা আহোয়াল।
হর্ ওয়াক্ত দেখেগা হর্ তরেকা খেয়াল।

তু দেখেগা কেত্থা সাধু, কেত্থা অবতার
নাচ রংমে তেরা সামনে করেগা বিহার।
মুসা নাচে, য়িসা নাচে, শাক্য সিংকা সাত,
নাচে লুথর, পাকড় লেকে নানকজীকা হাত।
জনক নাচে, জসূয়া নাচে, নাচে গঙ্গাধর,
মক্কা ছোড়কে মোহিত হোকে নাচে পগম্বর।

জন নাচে, লুক নাচে, নাচে সেইণ্ট পাল,
পিটর নাচে, কুঞ্জী বাজে, মেখু দেওয়ে তাল।
গৌর নাচে খিয়া খিয়া, গিরে আঁসু ধার,
চস্‌মা চোক্‌মে দেকে নাচে, সেন অবতার।

দেখো গে এইসি তরে খেয়াল তাজা তাজা,
কাহাঁ তেরা ভাং, আওর কাহাঁ তেরা গাঁজা॥

আমাদের পিতাপুত্র মধ্যে সমবয়স্ক সহচরের মত বিশুদ্ধ রসাভাষেরও অভাব ছিল না। এক দিনের একটা গল্প বলি। তখন আমি বহরমপুরে ওকালতি করি। বঙ্কিমবাবুও বহরমপুরে থাকেন। পিতা বহরমপুর একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে কেবল পূজার সময় বাড়ীতে দেখা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্কিম বাবুতে আমাতে দীনবন্ধু বাবুর লীলাবতী নাটক কাটাকুটি করিয়াছিলাম। কিন্তু এই গল্পের একটু পূর্ব্বপীঠিকা আছে। সেটুকু আগে বলিতে হইতেছে। সেই সময়ে বহরমপুরে আমাদের সব জজ ছিলেন রাইট সাহেব নামক একজন শ্বেতকায় ফিরিঙ্গি। তিনি একরূপ কিম্ভূতকিম্ভবিখ্যাতি রূপ পদার্থ ছিলেন। একটি মকদ্দমার দাবি ডিক্রি দিলেন। উকিল আমলারা এজলাস হইতে চলিয়া গেল, বিশ মিনিট পরে তাঁহাদিগকে আবার ডাকাইলেন; পেস্‌কারকে বলিলেন "পার্ব্বতি পুরা হুকুম লিখা যয়।" উকিলদিগকে বলিলেন "আপনারা শুনুন" "পার্ব্বতি লিখ।" টেবিলে একটি মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বলিলেন "দাবি-ভার ডিক্রি।" এই গল্প পিতার সমক্ষে আমি টাট্‌কা টাট্‌কি করিয়াছি। সে দিন তখন আমাদের বাহিরের বৈঠক খানার মজলিসে লীলাবতী সংশোধনের সমালোচন চলিতেছিল। দৃশ্য বরাহনগর, সেই স্থলের একজন স্ত্রীলোকের উক্তিতে দীনবন্ধুবাবু লিখিয়াছিলেন "গ্যাদারী"। আমি কাটিয়া করিয়াছিলাম "ঠ্যাকারী"। পিতা বলিলেন "গ্যাদারী, ঠ্যাকারী দুই হয়; তুমি গ্যাদারী কাটিয়া ঠ্যাকারী করিলে কেন?" আমি বলিলাম

থাকে।" পিতা বলিলেন "তুমি আমার চেয়ে বেশী জানিলে কি করিয়া?" আমি বলিলাম "আপনি বহুকাল বিদেশে থাকেন, নদে জেলায় বহুকাল ছিলেন, সেখানে গ্যাদারীই বলে, সেই জন্যই আপনার এরূপ ভ্রম হইতেছে।" (পাঠক লক্ষ্য করিবেন আমি পিতার সহিত কিরূপ সম-কক্ষ-ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতাম। পিতা বলিলেন "তবে ইহার মীমাংসা হয় কিরূপে? তোমার মা ত আমার সঙ্গে বিদেশে প্রায়ই জান না। তিনি যদি বলেন গ্যাদারী ঠ্যাকারী দুই হয়, তবে তুমি ত হারিবে?" আমি বলিলাম "অবশ্য হারিব।" (সহৃদয় পাঠক আবার লক্ষ্য করিবেন, আমাদের পিতাপুত্রের সাহিত্য বিবাদে, সালিসির ব্যবস্থা কিরূপ) বৈঠকখানায় একঘর ভদ্রলোক হাস্যবদনে উৎফুল্ল নয়নে উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া রহিলেন। আমরা পিতা-পুত্রে উঠিয়া অন্দরে মহাবিচারক মাতার নিকট উপস্থিত হইলাম। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন "স্ত্রীলোক অহঙ্কারী হইলে তাহাকে কি বলে?" আমার মাথা খাইতে, মা একেবারে বলিয়া ফেলিলেন "ঠ্যাকারীও বলে, গ্যাদারীও বলে।" আমরা হাসিতে হাসিতে বর্হিবাটীতে আসিলাম। সকলে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল? কি হইল?" পিতা সটানে মজলিসের মাঝখানে গিয়া রাইট সাহেবের অনুকরণে মেজেতে এক প্রচণ্ড মুষ্টাঘাত করিয়া, বলিলেন "দাবি ভোর ডিক্রি। গৃহিণী বলিলেন ঠ্যাকারী গ্যাদারী দুই হয়।" হাস্যের তরঙ্গ উঠিল, হাসির ফোয়ারা ছুটিল। এখনও আমার হাঁসি আসে, হাসির সঙ্গে একটু কান্নাও পায়; পিতা নাই বলিয়া নয়, পিতা কাহারও চিরদিন থাকেন না। কিন্তু এরূপ রসামোদ বাঙ্গালা হইতে, যে লোপ পাইতে চলিল, সত্য সত্যই তাহাতে কান্না আসে।

সার বার্নিস পীকক তখন হাইকোর্টের চীফ্‌জষ্টিস্‌। তিনি বিজ্ঞ বিদ্বান, প্রবীণ, কিন্তু, অনেকগুলি ফুলবেঞ্চের বিচারে তিনি একলা একদিকে মত দিলেন, আর অন্যদিকে অন্য সকল জজে জুটিয়া বিপরীত মত দিলেন।" আমাদের সংসার ধর্ম্মের গৃহস্থালির কথায়, তখন আমরা পাঁচ জন জজ ছিলাম। আমি, আমার সহধর্ম্মিণী, আমার বিধবা পিস্‌তুত

দিদি, মাতাঠাকুরাণী ও পিতৃদেব। এমন সময়ে সময়ে হইত যে তত্ত্ব-তাবাস প্রভৃতি আহার ব্যবহারাদি, কোন গৃহস্থালি কথায় মাতা ভগিনী আমি ও আমার সহধর্ম্মিণী, আমরা চারিজনে একমত হইলাম, কিন্তু পিতা আমাদের মতে মত দিলেন না। আমাদের বুদ্ধি-সাধ্য-মত তাঁহাকে বুঝাইলেও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি তাহাতে রাগ করিতেন না, ক্রুদ্ধ হইতেন না, ক্ষুন্ন হইতেন না; হাসিতে হাসিতে বলিতেন "আমরা বাঙ্গলার বিচারক সার বার্ণিস্পীককের জাতি; তাহার অনুকরণ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। আমি এ বাড়ীর চীফজাষ্টিস্, তোমাদের সকলের হইতে আমার মত বিভেদ হওয়াই ঠিক, আর তোমাদের মতানুসারে কার্য্য হওয়াও ঠিক! তোমরা এককাট্টা এবং অধিকাংশও বটে।" কাজেই পিতা কর্ত্তা হইয়া, অকর্ত্তা হইয়া থাকিতেন, আমরা কোন কোন স্থলে কর্ত্তৃত্য করিতাম।

পিতা যখন রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া চুঁচুড়ায় আসিয়া বসিলেন, তখন সাধারণী চৌ-চাপটে চলিতেছিল। তখন গ্রাহকের সংখ্যা লইয়া কাগজের সম্মান হইত না। কোন খবরের কাগজের খবর যদি গবরমেণ্ট রাখিতেন, অভাব অভিযোগ প্রকাশিত হইলে, যদি সেই অভাব পূরণ করিতেন, অভিযোগে কর্ণপাত করিতেন, বা কখন কোন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ মাত্র ব্যগ্রতা দেখাইতেন,—তাহা হইলে, সেই সংবাদ পত্রের সম্মান হইত। অর্থাৎ রাজার আদরে সর্ব্ব সাধারণের কাছে সম্মান পাওয়া যাইত। আর তখন সাহিত্যের একরূপ সমাদর ছিল; এখন তাহা দেখিতে পাই না। সে দিন বঙ্গ-দর্শনে যে "বঙ্গ-মঙ্গল" প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ শ্লেষ-ব্যঙ্গ-পূর্ণ কবিতা বা পঞ্চানন্দি কবিতা, সেই সময়ে যদি সাধারণীতে প্রকাশিত হইত, তাহা হইলে সমগ্র বঙ্গে একটা ঢিঢি পড়িয়া যাইত। এখনত সেরূপ কিছু হইল না। বঙ্গ-মঙ্গলের কেহ খবরই লইল না। বিদ্রূপাত্মকে পদ্যের দশা এইরূপ; গভীর, গম্ভীর ভাবপূর্ণ গদ্যের কেহ সংবাদই রাখেন না। ১০।১৫ বৎসরে, ক্রমে ক্রমে, এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। কেন হইয়াছে, সে বিষয়ের আলোচনা এখানে করিব

না। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ফুটোমুখ বঙ্গসাহিত্যের যথা সম্ভব সম্মান ছিল। সরস রচনার সমাদর ছিল। সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমানে সেবা করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই! সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই। সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আব্দার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট ছোট আব্দারে কর্ণপাত করিতেন; বড় আব্দার করিলে এখন মুখ বাঁকান, ভৎসনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণ-পাত করিতেন বলিয়া, সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্য-সেবা-পরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিম বাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালি বাবু সক্ করিয়া বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি জড়িত সাহিত্যের সক্ মিটাইবার জন্য,—সাধারণীর জন্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ১২৭৯ সালের ১লা বৈশাখ বঙ্গদর্শন, আর দেড় বৎসর পরে ১২৮০ সালের ১১ই কার্ত্তিক সাধারণী প্রকাশিত হয়। তাহার পূর্ব্বে রাজনীতির সহিত সাহিত্যের সেবা, কি আর কোন সংবাদ পত্রে হইত না? হইত বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিতেন, লাট সাহেবকে সম্বোধন করিয়া পদ্য। কিন্তু সাধা-রণী প্রকাশের সময় সেরূপ কিছু ছিল না! ছিল মহামহিমান্বিত সোম প্রকাশ। তাহাতে থাকিত—(বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রেতাত্মা ক্ষমা করিবেন।) তাহাতে থাকিত—"যদি রাজস্ব সচিবের অবিমৃষ্যকারিতা দোষে দেশীয় জনগণের উপচীয়মান গুণাবলী অপচিত হইতে থাকে"—এই সাহিত্য রচনা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বর্গের আদরের সামগ্রী হইলেও, ইংরাজী কৃতবিদ্যগণ ইহাতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন, সাধারণ জনগণ উহার ত্রিসীমাতেই অগ্রসর হইতে পারিতনা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঈশ্বর গুপ্তের পদ্য, 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম-প্যাচার নক্সা' প্রভৃতি অতি শিশুকালে পাঠ করিয়া, শিখিয়াছিলাম যে সহজ বাঙ্গালা উপেক্ষার পদার্থ নহে। আর সংস্কৃতানুসারিণী বাঙ্গালায় যে, অধিকতর শাস্তৌর্য্য হয় তাহাও ভুলিনাই। অতি শিশুকাল হইতেই তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতাম, স্কুলে ভর্ত্তি হই-

য়াই সুবোধিনার সহিত সাক্ষাৎ হয়। সুবোধিনীতে গদ্যে পদ্যে রীতি মত সাহিত্যের সেবা থাকিত। সেই সুবোধিনীর আকার প্রকার লই-য়াই সাধারণী প্রকাশিত হয়। পিতা চুঁচুড়ায় যখন আসেন, তখন সাধারণী চৌ-চাপটে চলিতেছিল। আমাদের বাড়ীতে ঢুকিতে দরজার বামদিকের ঘরে, সাধারণীর আফিস্ ঘর। আর দক্ষিণদিকের ঘরে সঙ্গীতের আড্ডা। হারমোনিওম্ বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রোত্থিত সুর সহ সঙ্গীত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ষোল ঘণ্টা চলিতেছে। পিতা আমাদের আফিস্ ঘরেই প্রায় বসিতেন; কচিৎ কখন সঙ্গীত সমাজেও যাইতেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর পর্য্যন্ত আমাদের বাহির বাড়ীর সঙ্গীতে, সাহিত্যে, সম্বাদ পত্রে, গানে গল্পে, সমস্ত দিনই ভোরপুর। পিতা অবসর গ্রহণ করিয়া আসিলে কৃষ্ণ যাত্রার মাঝখানে মধ্য রাত্রিতে গোবিন্দ অধিকারী আসিলে, যেরূপ হইত,—সেই রূপ হইলে পালা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, গান জমাট হইল।

এ সৌভাগ্য কিন্তু অধিক দিন আমার সহিল না। জ্বরে জ্বরে বিষম জ্বালাতন হইয়া উঠিলাম। কিশোর কাল হইতেই, এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পূর্ব্ব হইতেই, ৬৯ সালের কার্ত্তিক মাস হইতেই, এই বিষম ম্যালেরিয়া আমাকে আশ্রয় লইয়াছে। যৌবনের মধ্যে একবার মাত্র ৫ বৎসর কাল ইহার দেখা পাই নাই। সেই কালটি সাধারণীর প্রথম ৫ বৎসর। তাহার পর আবার ভোগানি আরম্ভ হইয়াছে; এখন সাধারণীর দশ বৎসর হইয়াছে। জ্বরের জ্বালায় জ্বালাতন করিয়া তুলিয়াছে। কম্পোজিটর, প্রেসম্যান, পণ্ডিত মহাশয় প্রভৃতি সকলেই জ্বরে পড়িয়া-কাগজ ত আর সময়ে বাহির হয় না। এক সপ্তাহ নহে, দুই সপ্তাহ নহে; আশ্বিন, কার্ত্তিক ক্রমাগতই এইরূপ হয়, পরের পয়সা ঘরে লইয়া, এরূপ করিলে চলিবে কেন? কাজেই আমাকে তোড়-জোড় সমস্ত লইয়া কলিকাতায় যাইতে হইল। দেখ বিড়ম্বনা। এত কাল চুঁচুড়ায় রহিলাম, আর পিতা যেই দেশে আসিলেন, কোথায় তাঁহার চন্দ্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া চাতক-প্রাণ শীতল করিব, সাক্ষাতে তাঁহার সেবা করিয়া, তদীয় সমক্ষে তদীয় আরাধ্য বঙ্গভাষার সেবাপূজা করিয়া,—আপনাকে

চরিতার্থ করিব, না কিসের কর্ত্তব্য জ্ঞানে, আমাকে এমন দিনে কলিকাতায় যাইতে হইল। হায় রে! কর্ত্তব্যজ্ঞান। তোমার ছায়া লইয়াই রহিলাম, কিন্তু কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে অগ্রসর হইতে পারিলাম না। কর্ত্তব্য কি তাহাই বুঝি না, তবে কর্ত্তব্য সম্পাদন কিরূপে হইবে!

১২৯১ সালের জ্যৈষ্ঠে সাধারণী কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া গেলাম। তৎপূর্ব্বেই কলিকাতায় একটা বাসা লইয়া আমাকে বসিতে হইয়াছিল। তখন যুবার্টের প্রদর্শনীর বড় জাঁক। কলিকাতায় বাড়ী ভাড়া অগ্নিমূল্য হইয়াছে। আমাকে থিতাইয়া জিরাইয়া, খুঁজিয়া পাতিয়া, বাড়ী দেখিতে হইতে ছিল। বামুনের গোরুর মতন ভাল পল্লীতে ভাল বাড়ী হইবে, অথচ ভাড়াটা অগ্নিমূল্য না হয়।

সেই সময়ে কলিকাতার কলুটোলায় বঙ্গসাহিত্যের সম্রাট-রূপে বঙ্কিম বাবু বিরাজমান। শশধর তর্কচূড়ামণি মুঙ্গের হইতে আসিয়া, পথিমধ্যে বৰ্দ্ধমান বিজয় করিয়া, কলিকাতায় শিবির স্থাপন করিতেছেন। বঙ্কিম বাবুর বৈঠকখানায় প্রতি রবিবারে সাহিত্য-সঙ্গত হয়। থাকেন চন্দ্রনাথ বসু দাদা মহাশয়, এখন পরলোকগত তখন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সরকারী অনুবাদক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, খিদিরপুরের দুই মহাত্মা,—কবিবর হেমচন্দ্র এবং কোমৎ শিষ্য যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ,—বঙ্কিমবাবুর প্রতিবাসী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম, কেশববাবুর সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন, পরে কটক কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নীলকণ্ঠ মজুমদার প্রভৃতি। মধ্যে মধ্যে আসেন বারাসতের ডেপুটি তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। বৰ্দ্ধমানের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রভৃতি। বঙ্কিমবাবুত অবশ্যই থাকিতেন। কলিকাতায় বাসা করার পর প্রতি রবিবার অপরাহ্নে ত বটেই, অন্য অন্য সময়েও সেইখানে যাইতাম। চূড়ামণি মহাশয়ও এক এক দিন থাকিতেন। সাহিত্য সেবার সভায় ধর্ম্মের কাহিনী উঠিল। চূড়ামণি মহাশয় আলবর্ট হলে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন। শাস্ত্রসম্মত ধর্ম্ম ব্যাখ্যার সঙ্গে, তিনি বিজ্ঞানের দোহাই, জাঁকাইয়া দিতে লাগিলেন। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের উপর দাঁড়াইবে, কথাটা নিতান্ত উল্টা কথা বলিয়াই আমার বোধ হয়। সাধারণীতে এই মতের প্রতিবাদ করিলাম। ধর্ম্মই সকলের

আশ্রয়, ধর্ম্মই সকলের অবলম্বন, ধর্ম্ম আবার বিজ্ঞানের আশ্রয় লইবে কেন? এই সকল কথার আলোচনার ফলে নবজীবন প্রকাশিত হইল। নবজীবনের সূচনাতেই লিখিলাম "যে বিশাল মহান স্তর সমাজ তত্বাদির আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ হইয়া ঐ সকলকে গর্ভে ধারণ করত, অনবরত উহাদের পুষ্টিসাধন, অবস্থা পরিবর্ত্তন এবং ক্ষয় সাধন করিতেছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া,—সেটি যে অবলম্বন এবং আশ্রয়, কিয়ৎ পরিমাণে উপাদান এবং হেতু—তাহা না বুঝিয়া, সেইটিই সকল তত্ত্বের সারতত্ব সম্পর্ণরূপে না হউক, কিন্তু অংশত সকল তত্ত্বের সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত কারণ, ইহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া,—কোন তথ্যের কথা কহিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। চিন্তাশীল বাঙ্গালী দেখিতে দেখিতে অন্তর স্তরের আভাস পাইয়াছেন। একটু একটু বুঝিতেছেন যে, সেই মূলীভূত সারস্তস্তের কথা উপেক্ষা করিয়া সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ, বিতর্কবাদ বা স্থিতিবাদ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। সেই বিশাল মহান আশ্রয়-স্তরের নাম—ধর্ম্ম"

নব-জীবন প্রকাশিত হইয়া। বঙ্গের মহামহারথীগণ প্রায় সকলেই লিখিতে লাগিলেন। আমি সম্পাদক, কাজেই আমার জাঁক পসার খুবই হইল। পিতা অবশ্য চুঁচুড়াতেই রহিলেন। পিতাপুত্রের এই বিচ্ছেদে আমি কিন্তু মর্ম্মে পীড়িত। কি আনন্দেই পিতাকে ঢাকা হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলাম, আর কি নিরানন্দে তাঁহাকে চুঁচুড়ায় রাখিয়া, কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চুঁচুড়ায় জ্বরের জ্বালায় জ্বলাতন হইয়াছিলাম; নিয়মিতরূপে সাধারণী প্রকাশ করিতে কোন মতেই পারিতাম না; ভূয়ো কর্ত্তব্যের দায়ে সাধারণী উঠাইয়া, কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় বসিয়া বঙ্কিম-সঙ্গতে হাওয়ার সুর বুঝিয়া নবজীবন প্রকাশিত করিলাম। সাধু সন্দর্শন, সুহৃৎ-সঙ্গম যথেষ্ট হইত; কিন্তু পিতার সহিত বিচ্ছেদে আমি মর্ম্মাহত থাকিতাম; মধ্যে মধ্যে পত্নীকে ও পুত্রকন্যাকে কলিকাতায় আনিতে হইত; দুই একটি সন্তান তাঁহারই কাছে চুঁচুড়ায় রাখিতাম; আপনি কাজ কর্ম্ম ফেলিয়া মাঝে মাঝে গিয়া শ্রীচরণ দর্শন করিতাম; তিনি

মাসের মধ্যে দুই একদিন আসিয়া আমাদিগকে দেখা দিয়া যাইতেন, কিন্তু তাহাতে আমার মনের সাধ মিটিতনা। জগৎ এক দিকে, আর বাবা আর একদিকে থাকিলে,আমার মনের তুল-দাঁড়ীতে বাবার দিকেই ঝোঁক ছিল।

পিতা কিন্তু মহা আনন্দিত, আমার গৌরবে মহাসুখী। থাকি না কেন আমি পৃথক—থাকি না কেন দূরে—আমার গৌরব বাড়িয়াছে তাহাতেই তিনি মহা আনন্দিত। নবজীবনের প্রথম মাসে ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তাঁহার রচিত চারি ছত্রের গানটি (ভোর হইল, জাগত জাগিল ইত্যাদি) আমি মহা ধৃষ্টতা করিয়া বিশ ছত্র করিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলাম—তাহাতেও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে, তাঁহা হইতে পৃথক হইয়া, আমিও মনে ধিক্কার দিতেছিলাম। কাজেই ভাল মন্দ কোন কথাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম না। তাঁহার সঙ্গে সমান ভাবে কত তর্ক করিতাম, কিন্তু কেমন তিনি রাশভারি লোক ছিলেন,—যতই তাঁহাকে ভাল বাসি ও ভক্তি করি, সঙ্গে সঙ্গে একটু ভয় তাঁহাকে যাবজ্জীবন সমানে করিয়াছি। তিনি এখন অন্যধামে-তবু এখনও তাঁহাকে পূর্ব্বমতই ভয় করি।

নবজীবনের দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হইল। তাহাতে ছিল আমার লিখিত 'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম'। পাঠ করিয়া পিতার মনে আনন্দ আর ধরে না। যাহাকে পান, তাহাকেই ধরিয়া নবজীবন পড়িতে বলেন। কলিকাতায় আসিলেন, কলিকাতায়ও আনন্দ ছড়াইয়া গেলেন। ৺পূজার সময় উলার কৃষ্ণবেহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাড়ীতে আসিলেন। তিনি পেন্সন-প্রাপ্ত মুন্সেফ, সরল বৈষ্ণব, পিতার পরমবন্ধু। সমস্ত প্রবন্ধটি পিতা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তিনি আমাকে কত আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহাঁদের আনন্দে পিতৃ-বিচ্ছেদের ভারটা আমার মন হইতে খানিক কমিয়া গেল।

ক্রমে সহিয়াও গেল। পিতাও আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। মাসে একবার কলিকাতায় আসিতেন। আমিও মাসে দুই বার বাড়ী যাইতাম। আরও সহিয়া গেল,—কলিকাতায় পিতার লীলা খেলা দেখিয়া। সাবিত্রী লাইব্রেরিতে আমি বক্তা—তিনি পাঁচজনের মধ্যে আমার একজন

রক্ষা-কর্ত্তা। চূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্ম ব্যখ্যা হইবে, মির্জাপুরে কালিদাস সিংহের গলিতে। অঘোরনাথ কুমারকে সঙ্গে লইয়া পিতাপুত্রে পিছন-দিকে আড়ালে চুপি চুপি রহিয়াছি। ওরিয়েণ্টাল সেমিনারির বাটীতে চন্দ্রনাথ দাদা মহাশয় হিন্দু বিবাহ সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিলেন, বাল্য বিবাহের কথা উঠিল; পিতা তাঁহার বাল্য বিবাহের ফল বলিয়া অধমকে দেখাইয়া দিলেন; আমার একটি পুত্র এককালে একটি বাক্স ভাঙ্গিয়াছিল, সে কথাও বলিলেন,—মহাহাস্য কৌতুক হইল। শোভাবাজারে, অক্ষয়কুমা-রের স্মরণ সভায় পিতৃ-দেব সভাপতিত্ব করিলেন। পঞ্চাশী পরব—জুবিলির সময়, দলে বলে চুঁচুড়া হইতে আসিলেন, সকলে মিলিয়া আলিপুরে গবর্ণ-মেণ্ট টেলিগ্রাফ ষ্টোর আফিসে বসিয়া বাজী পোড়ান দেখিলাম। নবজীব-নের প্রথম বৎসরেই আমরা রীপণকে লইয়া কত বাড়াবাড়ি করিয়াছিলাম। পিতা প্রথম দিন অপরাহ্নে যে রূপ সিয়ালদহ ষ্টেশনে রীপণ অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত, শেষের দিন সেই রূপ সাতপুকুরিয়ার বাগানে গভীর নিশীথ পর্য্যন্ত উৎসবে উৎফুল্ল। কলিকাতায় কংগ্রেসের কন্‌ফরেনস বসিয়াছে। আমিও সকল ভাল বাসিনা, যাই না। প্রথম দিন আমাদের আহারের পর পিতা বলিলেন 'অক্ষয় যাবে না, হে ?' আমি বলিলাম 'বলেন ত যাই।' উত্তর 'তবে এসো'। আমি অমনই তাঁহার সঙ্গে সেই খানে গেলাম। সেখানে, পোলিস্ কিরূপ অনর্থক হুমকি দেখাইয়া আমার একটি পুত্র ও তাহার সমবয়সীদের ক্লব ভাঙ্গাইয়া দেয়, সে গল্প বলিলেন। সকলেই বিস্মিত হইল। পিতার পরিপক্ক বয়সের এই সকল অপূর্ব্ব লীলা-খেলায় আমি মহা আনন্দিত থাকিতাম। তাঁহার স্ফূর্ত্তিতে, আমার স্ফূর্ত্তি হইত। পিতার যৌবনের বন্ধু ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়; তাঁহার মত সরল লোক আমি অতি অল্পই দেখিয়াছি। পিতা তাঁহাকে শ্যামাচরণ (বিশ্বাস) দে মহাশয়দের বাড়ীতে লইয়া গিয়া কত কৌতুক রহস্যই না করিতেন। আমি সঙ্গে থাকিতে পারিতাম না, রিপোর্ট পাইতাম; শুনিয়াই আমার না কত আনন্দ হইত!

বাড়ীতে, চুঁচুড়ায় যখন থাকিতেন, অধিকাংশ কাল বাড়ীতেই থাকি-তেন; তখন আমার ছেলে মেয়েদের, ও আরও দুই একটি ছেলে মেয়ে

লইয়া, এক রসের পাঠশালা বসাইয়া, সকাল, সন্ধ্যা বেলা, সেই পাঠশালার গুরু-গিরি করিতেন। তাহারা সমস্ত দিনই হাসিতেছে, আর প্রতি দশ মিনিটে কিছু না কিছু শিখিতেছে। বৈঠকখানার বড় দেওয়ালে একখানা ভারতের মাণচিত্র খোলা টাঙ্গান আছে। আমার তিনবৎসরের শিশু পুত্রটি 'লঙ্কা' দেখাইয়া,নাম ভুলিয়া গিয়া বলিতেছে-'ঝাল।' তাহা অপেক্ষা যাহারা বড়, তাহারা আরেবিয়ান নাইটের, বা সেক্সপীয়রের গল্প, ঠাকুরদাদার মুখে শুনিতেছে; কখন বিস্ময়ে স্তব্ধ, কভু করুণায় বর্ষণোন্মুখ, কখন বা আহ্লাদে হাসিয়া উঠিতেছে। আমি শিখিয়াছিলাম—অনুকরণে। ইহারা শিখিতেছিল—হাসিতে খুসিতে। একজন বৃদ্ধ দুইটি নাতিকে কাঁধে লইয়া, একটিকে পীঠে লইয়া যাইতেছিল। দেখিয়া, একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল—'এ কি ?" বৃদ্ধ উত্তর করিল,—"ভাই, বুঝ না—আসলের চেয়ে সুদের মায়া বেশী।" পিতা আমার সমক্ষে এই গল্পটি শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"ঠিক বলেছে।"

পিতা, নবজীবনে "দুর্গোৎসব" দুইটি "আগমনী" একটি পদ্য,—সাধারণীতেও শরৎ বর্ণনার দুই একটি পদ্য লিখিয়াছিলেন। "ব্রিটনিয়া সমীপে ইণ্ডিয়া" নামে একটি পদ্য খণ্ডশ নবজীবনে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা শেষ হয় নাই।—সেই দারুণ কথা এইবর অবশ্যই আমাকে বলিতে হইবে।

সেই কথা একদিন দেওঘরে শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অতি নিকটে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিতেছিলাম। বলিতেছিলাম, "কেবল দুইটি বিষয় ছাড়া, পিতার আর কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভয় ছিলনা। অন্ধকার, ভূত, সাপ, বাঘ, ইংরেজ, চোর, ডাকাত"—এই টুক মাত্র আমার যাই বলা হইয়াছে, রাজনারায়ণ বাবু শুইয়াছিলেন, অমনই ধড়ফড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া, বলিতেছেন—"বাহবা! beautiul! beautiul!—সাপ, বাঘ, ইংরেজ, চোর, ডাকাত,—beautiful!" আমি প্রথমে তাঁহার এত প্রশংসাবাদের মর্ম্ম-স্পর্শ করিতে পারিনাই—পরে বুঝিলাম, রাজ নারায়ণ বাবু মহা রাজনৈতিক, ঐ যে ইংরাজকে সাপ, বাঘ, চোর, ডাকাতের মাঝে ফেলিয়া

এক তালিকা (category) মধ্যে পুরিয়াছি,—তাহাতেই তাঁহার মহা আনন্দ হইয়াছে।

বাস্তবিক দুইটি বিষয় ছাড়া আর কিছুতেই পিতার মনে ভয়ের কিছু মাত্র উদ্রেক হইত না। আমরা উলায় ভূতের বাড়ী, অথচ বেশ দোতালা দক্ষিণ-খোলা সস্তা পাইয়া, ভাড়া করিয়া ছিলাম। গৃহস্বামীর অতি বৃদ্ধা মাতাকে সেই বাড়ীতে ভূতে মারিয়াছিল; কিন্তু রাত্রিকালে একটু আধটু শব্দ করা ছাড়া, ভূত আমাদের কখন কিছু বলে নাই। সে বাড়ী সাপের সঙ্গে আমাদের ভাগ বাটরায় ছিল। নীচের তিনটা ঘর আমরা কদ্রুপুত্রদের ছাড়িয়া দিয়াছিলাম; তাহারা কিন্তু নিদাঘ পূর্ণিমার রাত্রিতে আমার ছোট ফুল বাগানটিতে (trespass) অনধিকার প্রবেশ পূর্ব্বক আমার কেলো-ভুলো কুকুর দুটার সঙ্গে-রঙ্গরস করিত।

বাঘ,—বাঘ একটা ভয়ের কারণ বটে। পিতা কিন্তু বাঘকেও ভয় করিতেন না। পিতা দেওয়ানি কর্ম্মচারী ছিলেন। মুন্‌সেফীতে প্রথমে বেতন ছিল মাসে ১০০৲ টাকা। যে রাজনৈতিক ভ্রমে পড়িয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একটু অপদস্থ করিয়া পানিঘাটায় পাঠান, সেই ভ্রম দূর হইলে ১০০৲ টাকার কর্ম্মচারীকে ২০০৲ টাকা দিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ সেই সময়ে সুন্দর বনের বন্দোবস্তের কার্য্যে বড় বিশৃঙ্খলা হইতেছিল; গবর্ণমেণ্ট পিতাকে দেওয়ানি শ্রেণীতে রাখিয়া, ডেপুটি কালেক্টরি দেন। তালিকায় দেখিবেন ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৬২ হইতে ৩রা জুন, ১৮৬৩ পর্য্যন্ত এক বৎসর তিন মাস আট দিন, পিতা সুন্দর বনের বন্দোবস্তের ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। কাজ অত্যন্ত জরুরি, কাজেই পিতাকে অনেক রাত্রি নিবিড় বনমধ্যেই পাল্‌কিতে বাস করিতে হইত। এই খানেই বঙ্কিম বাবুর বৃহল্লাঙ্গুল ব্যাঘ্রাচার্য্যগণ নিতান্ত রাজভক্ত প্রজার-মত, দস্তুর মোতাবেক সরকারি ডেপুটি কালেক্টরের সঙ্গে গভীর নিশীথে মুলাকাত করিতে আসিতেন। শিবিকার দ্বার বন্ধ দেখিয়া হাকিম সরকারের ফুরসুৎ নেহি বুঝিয়া পঞ্জার চিহ্ন ভিজা ভূমিতে রাখিয়া চলিয়া যাইতেন। বাবা এই গল্প করিতে করিতে বলিতেন,—"যদি পালকীর দ্বার টানিয়া একবার উকী মারিয়া বলিত, 'হাকীম হাজুর!'

তাহা হইলেই মুস্কিল হইত আর কি?" অর্থাৎ তিনি মুস্কিল মানিতেন না! জানিতেন "যঁহা মুস্কীল, তাঁহা আসান।"

দুইটা পদার্থে বাবার ভয় ছিল। বজ্রপাতে ও ওলাউঠায়। বজ্রপাতে ভয় বৈজ্ঞানিক, Scientific, বজ্রে ভয় নয় ভয় Eilectricityতে। একটু মেঘ ডাকিল ত অমনই চাকরদিগকে বলিলেন,—"ওরে ঘটী গাড়ু সব ঘরে রাখ।" জানালায় একটিও লোহার গরাদে দেন নাই। আমি উকীল হইয়া আমার নূতন শয়ন কক্ষে লোহার গরাদে দিয়াছিলাম। পূজার সময় বাড়ী আসিয়া, ঐ সকল দেখিয়াই পিতা আমাকে মহা ভৎ-সনা আরম্ভ করিলেন। বলিলেন—"তোমাদের মত নাস্তিক আর কখন জগতে হয় নাই; যারা বিজ্ঞান মানে না, তাহাদের মত নাস্তিক আর কোথাও আছে না কি?" আমি বলিলাম, হুগলি কলেজের সামনের তেতলা বাটীতে বড় লোহার শীখ আছে, তাহার বিপরীত দিকের খিলানে বজ্র পড়াতে বাড়ীটা নষ্ট হইয়াছে। আরও লোহার রেল গরাদে চারিদিকে ছিল, কোথাও পড়ে নাই বা বাধা পায় নাই—ইত্যাদি ইত্যাদি।" পিতার রাগ তখনই পড়িল, ভয় কিন্তু তেমনই রহিল।

ওলাউঠায়ও তাঁহার অত্যন্ত ভয় ছিল। এবার Scientific নয়, Nervous প্রাণের ভিতরের ভয়। পিতার মৃত্যুর দুই চারি বৎসর পূর্ব্বে ওলাউঠার দেবতার গল্প হইতেছিল। একজন বহু সাধনায় বর পাইল যে, দেবতারা ছদ্মবেশে মর্ত্ত্যে আসিলে, সে চিনিতে পারিবে। একদিন রাত্রিকালে, সে দেখিল যে ওলাউঠার দেবতা তাহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন। সে মহা অনুনয় বিনয়ে, তাঁহাকে বলিল, আমাদের গ্রামে আসিবেন না। তিনি বলিলেন—'তিন জনের নিয়তি আছে; আমাকে অবশ্য গ্রামে যাইতে হইবে!' সেই তিন জনকে লইয়া,আমি সাত দিন পরে এই সময়ে চলিয়া যাইব। সে ব্যক্তি পথ ছাড়িয়া দিল। সাতদিনে কিন্তু গ্রাম উজাড় হইল; চারিদিকে হাহাকার; শবের সৎকার হয় না। সাত দিন পরে যখন দেবতা গ্রাম হইতে যাইতেছেন, তখন সেই ব্যক্তি ধরিয়া বলিল, দেবতারাও মিথ্যা কথা কহেন? দেবতা তাহাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামের ভিতরে গেলেন। একজনকে দেখাইয়া

বলিলেন, "দেখ দেখি ঐ ব্যক্তি কে ? সে বলিল উনি দেখিতেছি ভয়ের দেবতা" "উনিই তোমাদের গ্রাম নষ্ট করিয়াছেন।" পিতা গল্প শুনিয়া বলিলেন বালককালে এই গল্পটি শুনিলে ভাল হইত।"

১২৯৫ সালের দুর্গোৎসব আসিল। ঐ সালের আশ্বিনের নবজীবনের প্রথম প্রবন্ধ পিতার রচিত 'দুর্গোৎসব' পদ্য। দুর্গোৎসবের সময়ে পিতার প্রাণ আনন্দে নৃত্য করিত। চিরদিন বিদেশে থাকিতেন, এই সময়ে মাত্র বাড়ী আসিতেন। স্বয়ং পৌরাণিক ধর্ম্মের মধুর স্বাদ গ্রহণ করিতে পারিতেন, কাজেই আনন্দে প্রাণ নৃত্য করিত। আমাদের বাড়ীতে ৺পূজায় সম্ভবাতিরিক্ত ব্যয়বাহুল্য হইত। ঠাকুর গঠনে, চিত্রে, সাজ সজ্জায় দেশীয় শিল্প উৎসাহ পাইত। ব্রাহ্মণ কায়স্থ নবশাখ,ভদ্র, দরিদ্র ভোজনে আমরা যশ পাইতাম, আশীর্ব্বাদ পাইতাম। ভাল যাত্রা গান কীর্ত্তনে, উৎসব উছলিয়া উঠিত। কাজেই পূজার সময় আমাদের আনন্দের দিন। পিতা 'দুর্গোৎসব' পদ্যে এই আনন্দ বর্ণন করিতেছেন ;—

* * * *

তমোঘন ঘোর নিশা যেন পোহাইল !
সৌভাগ্য আকাশে রবি গৌরবে উদিল।
অতি অপরূপ শোভা,
জগজন মনোলোভা ;
সাজিল অখিল কিবা কনক কিরণে।
ভারত জাগিল যেন নবীন জীবনে ॥

* * * *

দাসত্ব দুর্গতি কারো মনে নাহি আর।
হাস্য লাস্যে শোভিতেছে শ্রীমুখ সবার ॥
কিবা ধনী কিবা দীন,
গৃহী কিবা উদাসীন,
বাল বৃদ্ধ নর নারী সবে পুলকিত,
বিশ্ব-ব্যাপী মহোৎসবে সকলে মিলিত।

* * * *

অর্থ-দান বস্ত্র-দান করে কতজন।
কত জন করে কত ভক্ষ্য বিতরণ॥
যেমন বিবিধ দান,
সেই রূপ নৃত্য গান,
তুষিতেছে মোহিতেছে মানস সবার।
মহাদিন মহোৎসব আনন্দ অপার॥

*　　*　　*　　*

এস এস বঙ্গবাসী মিলিয়া সকলে,
জগত জননী পূজি, পূজ কুতুহলে।
দাঁড়ায়ে মায়ের পাশে,
গললগ্নী কৃত বাসে,
পুষ্পাঞ্জলি পাদপদ্মে, দেহ অবিলম্বে,
উচ্চৈস্বরে বল 'জয় জয় জগদম্বে'॥

আমাদের বৈষ্ণবী পূজা, বলিদান হয় না; আখ কুমড়াও নয়। কিন্তু প্রতিদিন পূজার পর—আমরা ঢাকের বাদ্য থামাইয়া—"জয় জগদম্বে, জয় জগদম্বে, জগদম্বে—মা আ" বলিয়া সকলে শতকণ্ঠে মহাধ্বনি করিয়া উঠিতাম। আমরা থামিলেই, ঢাকে বলিদানের বাজনা বাজিয়া উঠিত; ছেলেরা সকলে নৃত্য করিত; আমার কোন একটি ছেলেকে কোলে করিয়া পিতাও কখন কখন নৃত্য করিতেন; পায়ের নৃত্য নহে,—ছেলে নাচাইতে নাচাইতে, বুকের নৃত্য, বাহুর নৃত্য;—পা ছাড়া আর সর্ব্বশরীরের নৃত্য।

পঁচানব্বই সালের পূজার মহোৎসবহ—নাচাকুঁদা আমাদের, হইয়া গেল। আমি কলিকাতায় গেলাম। প্রায় দুই সপ্তাহ আছি। ইংরাজিতে কয় পংক্তি লেখা পিতার একখানি কার্ড পাইলাম। "৺শ্যামা-পূজার সময় তুমি বাড়ী আসিবে, এখানে বড় ওলাউঠা হইতেছে।" তাঁহার হৃদয়ে ওলাউঠার ভাব-গতি জানিতাম। আমি বাড়ী আসিলাম। আসিয়া দেখি পিতার মুখ আধখানা হইয়াছে। আমাদের কদমতলা পল্লী ও কৈঁকশিয়ালী ওলাউঠায় উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আমাদের প্রতিবেশিনী একটি দুঃখিনী মুমূর্ষ অবস্থায়। সেবা পায় নাই, চিকিৎসা

হয় নাই। নিজে তাহার ঘরদ্বার পরিষ্কার করিয়া দিয়া, চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। সেই দিনই বুঝা গেল, সে রক্ষা পাইল। পিতা এই সংবাদে মহা উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহার আনন্দে, আমারও আনন্দ হইল।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন চিরকালই পায়স হয়। সেবার ও হইল। মধ্যাহ্নে আহার একটু গুরুতর হইল। অপরাহ্নে পিতার মুখমণ্ডল অত্যন্ত গম্ভীর। বড় গ্রন্থ লিখিবার সময় পূর্ব্বে যেরূপ গম্ভীর হইত, সেইরূপ গম্ভীর। সন্ধ্যার পর বলিলেন, আজি রাত্রিতে আমি কিছু খাইব না।' কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—"পেট কেমন ঘুট ঘুট করিতেছে।' রাত্রিতে শয়ন করিলেন। তাঁহার ঘরের দ্বারে আসিয়া কাণ পাতিয়া শুনিলাম, পিতার যেমন নাক ডাকিত, সেইরূপ ডাকিতেছে—তিনি সচ্ছন্দে ঘুমাইতেছেন। রাত্রিতে দুই তিনবার এইরূপ শুনিলাম—বুঝিলাম সচ্ছন্দে সুপ্তি। ভোরে আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। উঠিয়া শুনিলাম পিতা পীড়িত—মল অপাক,—তবে বেশী হয় নাই; প্রস্রাব হইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ আসিলেন। ৯।১০ টার সময় একবার বমি হইল। বলিলেন "রোগের নাম করণ খুব সঙ্গত—ওলাউঠা—এতক্ষণ ওলা ছিল, এইবার উঠা হইল।" নানা ঔষধ চলিল; সন্ধ্যার সময় আমরা অনেকে বুঝিলাম, ঔষধ বৃথা হইতেছে। ইতি পূর্ব্বে কোম্পানির কাগজগুলি পিতা আমার নামে সই করিয়া দিবার জন্য প্রস্তাব করেন। ডাক্তার বাবু বলেন "সেকি মহাশয়! ও সকল কথা ভাবেন কেন?" বলিয়া নিষেধ করেন। সেটা মঙ্গলবার। সেই রাত্রিতে আমাদের কদমতলার ত্রিপথে সকলে মিলিয়া ৺ রক্ষাকালীপূজা করিয়াছিলেন। তাহার পুরোহিত আসিয়া—অর্দ্ধরাত্রিতে পিতাকে দেবীর চরণামৃত সেবন করাইয়া গেলেন। কালরাত্রি কিন্তু কাটিল না। ১২৯৫ সাল ২২শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রি তৃতীয় প্রহরের পর, তখন চতুর্থী পড়িয়াছে—পিতা নিজ যোগ্য ধামে গমন করিলেন!

পিতার কথা লিখিবার জন্য এই প্রবন্ধ; পিতার জীবন শেষ হইল তবু কিন্তু আমি গোটা দুই চারি কথা আর ও বলিব; পাঠক মার্জ্জনা করিবেন।

পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে সকল ঘাটের পার্শ্বেই শব-দাহ হইত। মিউনিসিপালিটি সে প্রথা বন্ধ করিয়াছে।—নির্দ্দিষ্ট শবদাহের ঘাট স্থির করিয়া দিয়াছে। কেঁকশিয়ালির বটতলার ঘাটের পার্শ্বে পিতার পিতা-মাতা সহমরণ লাভ করেন। পিতার ঠাকুর দাদারও সেই ঘাটে দাহন হয়। পিতার ইচ্ছা ছিল, সেই ঘাটেই তাঁহার অন্ত্যেষ্টি হয়। আমাকে একথা বলেন নাই। আমি কাণা ঘুষায় কথাটা জানিতাম। মিউনিসিপাল কমিসনর মহোদয়েরা উপস্থিত থাকিয়া সেই ঘাটেই শবদাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রচণ্ড পোলিসও দেখিল—কিন্তু ভ্রূকুটি করিল না।

সময়ে সময়ে পুত্রের ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য পিতাকে করিতে হয়। এই কথা লইয়া ভাবিতাম 'আমাদের শাস্ত্র কি কঠিন, কি কঠোর, কি নৃশংস!' আজি পিতাকে স্নান করাইয়া, নব যুগ্ম বস্ত্র পরাইয়া, কপালে গঙ্গা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র দিয়া, চিতায় উঠান হইয়াছে, আমি দক্ষিণ হস্তে বট জটা ধরিয়া, দূরে দাঁড়াইয়া সেই নৃশংস শাস্ত্রের কথা ভাবিতেছি; মনে করিতেছি, আজি আমার যদি এই সকল অবশ্য কর্ত্তব্য না থাকিত, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই ভূশায়ী হইয়া পড়িয়া থাকিতাম। উঠিতেও পারিতাম না, কেহ উঠাইতেও পারিত না। আজি শাস্ত্রই আমাকে উঠাইয়াছে, দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছে, কর্ত্তব্যে ব্যস্ত করিতেছে; তবে শাস্ত্র নৃশংস কেন? শাস্ত্র মানিলে,—শাস্ত্র মহদুপকারী।

সমস্ত ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য হইয়া গেল। বাড়ী আসিলাম। মাতা সালঙ্কারা গুম্‌ হইয়া বসিয়া আছেন। কেহ তাঁহার কাছে যাইতে পারে নাই। তাঁহার অলঙ্কারগুলি স্বহস্তে খুলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলেন 'কি হইয়াছে'? উত্তর "বাবাকে দাহ করিয়া আসিলাম, আমার গলায় এই কাচা।" তাহার পর, তাঁহাকে স্নান করাইলাম, যথা যোগ্য বস্ত্র পরাইলাম; কিন্তু ক্রমেই আমার চক্ষে সমস্ত কুজ্ঝটিকাময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কুয়াসা অথচ ফাকা কুয়াসা—সমস্তই যেন ফাকা আছে অথচ নাই। আমার কোন চিন্তাও নাই, ভাবনাও নাই। যেন আমি বলিয়াই একটা বোধ নাই। পত্নী ছেলে পিলেদের লইয়া ঘরের মধ্যে থাকেন, আমি একাকী বারান্দায় কম্বল-শয্যায় শয়ন করি। দ্বিতীয়

রাত্রি এক ঘুমের পর চিন্তা আসিল। ভাবিতে লাগিলাম 'দেখা যাঁ'ক আমার বয়সী বা আমার অপেক্ষা বয়সে বড়, আমাদের এখানে, এমন কয় জনের পিতা বর্ত্তমান আছেন।' দুই ঘণ্টা মনে মনে খতিয়ান করার পর দেখিলাম, একজনের মাত্র আছেন—অন্নদা মুখোপাধ্যায়ের। ক্ষণেক চিন্তা-হীন অবস্থায় আবার রহিলাম—আপনা আপনি কখন শ্বাস বন্ধ হইয়াছিল, চিন্তার সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। ভাবিলাম তবে আমি 'ভাগ্যহীন' কিসে? সেই একরূপ মুখ-পোড়ার সান্ত্বনা পাইলাম। চতুর্থ রাত্রিতে পত্র প'ড়িবার প্রয়োজন হইল। দেখি যে চোখে ভাল দেখিতে পাই না। এচোখ ও চোখ বুজিয়া পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, বাম-চক্ষু ক্ষীণ দৃষ্টি হইয়াছে। ক্রমে বুঝিলাম বাম হস্তের ও বাম পদেরও কম-জোর। সেই হইতে 'পক্ষাঘাত' আমাকে পাড়িবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ষোল বৎসরে আমি ব্যবস্থা লইয়া ৩।৪ বার চতুর্ম্মুখ খাইয়াছি। মধ্যে মধ্যে তাল-পাতার আগুণের সেকের সঙ্গে, কুব্জপ্রসারিণী তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি।

পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সর্ব্বত্রই হা হুতাশের ধ্বনি, 'এমন লোকও হঠাৎ মারা যায় গা!' যেন তিনি দুই চারি মাস ভুগিয়া লীলা সম্বরণ করিলে, তাঁহার বা সমাজের কিছু না কিছু লাভ ছিল। পিতা 'চুঁচুঁড়া হিতৈষিণী' সভার সভাপতি ছিলেন। অন্যতর সভ্য রাধাজীবন রায় (হায় রাধাজীবনই বা কোথায়?) নববিভাকর সাধারণীতে শোক-পদ্য প্রকাশিত করিলেন; দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

এক দিন পর বলি, ভাবি নাই মনে,
জনকের মত তাঁরে, করিতাম জ্ঞান—
পুত্রসম ভাবিতেন, তিনি সর্ব্বজনে,
হৃদে তাঁর ছিল চিন্তা—মোদের কল্যাণ!

'আমারে বাসেন ভাল সবার উপর,'
পরস্পর সবাকার আছিল ধারণা;
হেন লোক আছে কোথা ভবের ভিতর,
এগুণ স্মরণে আরো, হতেছে যাতনা।

সর্ব্বইত্রই হা হতাশ! আমি কোথাও গিয়া একটু স্বস্তি পাই না। সকলকার হা হতাশে আমিও সান্ত্বনা পাই না, আমার হৃদয়ের হতাশ আরও জ্বলিয়া উঠে। স্থির করিলাম কলিকাতায় যাওয়া ভাল; সেখানে কত ভাল লোক আছেন। আর লৌকতা রাখিতে ত হবেই।

একটি ভৃত্য সঙ্গে ভাগীরথীর পুলের উপর দিয়া নৈহাটী যাইতেছি। কয়খানা মধ্যশ্রেণীর গাড়ীতে, আমি আর আমার সেই ভৃত্য। আর জন প্রাণী নাই। গাড়ীতে উঠিয়া একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। গাড়ী যখন মধ্য গঙ্গার উপরে,—কুল-প্লাবিনী কুল্ কুল্ করিয়া সরিয়া পড়িতেছেন, গঙ্গার শীতল বায়ু বেশ আমার গাত্রে সর সর করিয়া লাগিতেছে, তখন ঠাহর হইল, আমি গুন্ গুন্ করিয়া নিধু বাবুর বিরহ-গীতি গান করিতেছি।—

আয় রে! বিচ্ছেদ রাখি তোরে,
যতনে, হৃদি মাঝারে।

ঠাওর হওয়ার পর, পোড়া-মুখে একটু হাসি আসিল—পিতৃশোকে বিরহ গান! মন্দ নয়! তখন কেহ ছিল না, এখন তোমরা আমার সম্মুখে রহিয়াছ,—এই হাসিতে হাসিবে, না কাঁদিবে?

কলিকাতার বাসায় গিয়া রহিলাম। প্রত্যহ একখানা গাড়ী করিয়া গঙ্গা-স্নান তর্পণ করিয়া আসি, আর দুই চারি বাড়ী লৌকতা সারিয়া আসি। কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই চুঁচুড়ার মত হা-হুতাশ!

খিদির পুর গেলাম। হেম বাবুর কাছে সারিয়া, যোগেন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলাম। সঙ্গে সেই চাকর, আর ঢাকার শেষ যাত্রার সেই সঙ্গী—পুর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভায়াও আছেন। আমি আগে আগে, উঁহারা দুজন আমার পিছনে। বৈঠকখানায় দ্বার দিয়া আমি যেমন প্রবেশ করিয়াছি—যোগেন্দ্র দাদা বসিয়াছিলেন, উঠিয়া সহাস্য মুখে, দুই হাত একটু তুলিয়া, যেন আমাকে আলিঙ্গন করিবেন এই ভাবে অগ্রসর হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—'অক্ষয় ভায়া এলে, এসো! এসো! হিন্দু পেট্রিয়টে গঙ্গাচরণ বাবুর মৃত্যু সংবাদ পড়িয়া আহ্লাদ আর রাখিতে পারি না—(আমি হতভম্ভ) আরে ভাই! আমরাত কেহ মৌরসি পাট্টা লইয়া আসি নাই—তুমি তাঁর একমাত্র

সন্তান—তোমাকে রাখিয়া যে তিনি চলিয়া গেলেন, ইহার অপেক্ষা আহ্লাদ আর আছে নাকি ?" এই অপূর্ব্ব কথাগুলি কাণে, মনে, প্রবেশ করিতে লাগিল, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র জীব হইতে লাগিলাম। আমার দেহ বিশুদ্ধ হইয়াছে মনে হইল ; শরীরের ভার কমিয়া গেল ; সমস্ত কুজঝটিকা সরিয়া গেল ; আমি আবার যেন মানুষ হইলাম। যোগেন্দ্র দাদা আমাকে আলিঙ্গন করিলেন ; আমি চোখের জল পুঁছিতে পুঁছিতে তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিলাম। তাহার পর কত গল্প হইল। চলিয়া আসিবার সময়, পূর্ণচন্দ্রে আমাতে বলাবলি করিতে লাগিলাম—যোগেন্দ্র ঘোষ-একটা সত্যিকার মানুষ বটেন।

সেই যে ডাক্তার বাবু কোম্পানির কাগজে পিতাকে সই করিতে নিষেধ করেন, কেমন করিয়া জানি না, সেই কথা কলিকাতায় রাষ্ট্র হইয়াছে ; সকলেই ডাক্তার বাবুর নিন্দা করেন। বলেন, তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতে তোমার কতকগুলা টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় যাইবে।" একজন মাত্র ইহার উল্টা কথা বলিলেন,—ডাক্তার দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলিলেন, "সেইরূপ করার পর, পিতার মৃত্যু হইলে, আপনি চিরকালই মনে করিতেন, ডাক্তার বাবু সই করাতে সম্মতি দেওয়াতেই পিতা জীবনে হতাশ হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সই করিলে, এই শেল আপনাকে বহুকাল হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকিতে হইত। ডাক্তার বাবু যে সই করিতে দেন নাই, তাহাতেই তিনি আপনার মহোপকারী বন্ধু।" কথাটায় আমার চক্ষু ফুটিল। এমন দুর্দ্দৈবে অনেককেই পড়িতে হয়, দীননাথ সান্ন্যালের কথা কয়টি তাঁহাদের শুনিয়া রাখা ভাল বলিয়া, এই স্থানেই লিপি বদ্ধ করিলাম।

আমরা সামান্য গৃহস্থ। পিতা চাকরি করিতেন মাত্র। অথচ নাম ডাক খুবই ছিল; আমাকে সেই নাম ডাকের মতন করিয়াই শ্রাদ্ধ করিতে হইল। পিতা গম্ভীর প্রকৃতির রাশ-ভারি লোক হইয়াও হাস্যরসে রসিক ছিলেন। দুদণ্ড তাঁহার কাছে বসিলে, মহাদুঃখীও হাসিতে থাকিত। তাঁহার জীবনের শেষ কথা বলিতে, মহা বিষাদ কাহিনী গাঁথিয়াছি। অতএব একটা হাসির কথা বলিয়া, এখন সেই সদানন্দের

জীবনী শেষ করি। পিতার শ্রাদ্ধে আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের জন্ম আতপ তণ্ডুল, গব্য-ঘৃত, দুগ্ধ, মটরের দাল, কাঁচকলা প্রভৃতি হবিষ্যান্নে যাহা চাই সেইরূপ নিরামিষ আহারের যোগাড় রাখিয়াছিলাম ; নবদ্বীপের মহামহোপাধ্যায় ভুবন চন্দ্র বিদ্যারত্ন যোগাড় দেখিয়া বলিলেন, "কৃতীর পিতৃ-বিয়োগ, আমরা করিব হবিষ্য! এব্যবস্থা কে দিলে হে?" আমি মনে করিলাম, আমার শ্রাদ্ধ পণ্ড হয় নাই। কেন না, এই কথা শুনিয়া, পিতা যোগ্য ধামে থাকিয়া, নিশ্চই উচ্চহাস্য করিয়াছেন। কাজেই আমার শ্রাদ্ধ সার্থক হইয়াছে। শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার,

কদমতলা,—চুঁচুড়া।

চন্দ্রশেখর বসু

সন ১২৪০ সালের ৮ই শ্রাবণ জেলা নদীয়ার উলা গ্রামে চন্দ্রশেখর বসুর জন্ম হয়। ইহাঁর পিতার নাম কালিদাস বসু এবং কৌলিন্য পর্য্যায় পঁচিশ। ইহাঁরা মাইনগর সমাজভুক্ত বড়া নিবাসী কনিষ্ঠ ধবু বসুর সন্তান। চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ রামসন্তোষ বসু পলাশী যুদ্ধের পঞ্চাশবর্ষ পূর্ব্বে উলার মুস্তৌফী বাটীতে বিবাহ করেন। তৎকালে মুস্তৌফী বংশ মহা প্রতাপান্বিত ছিলেন। তাঁহারা সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে "মুস্তৌফী" খেতাব পাইয়াছিলেন. উক্ত বিবাহ উপলক্ষে মুস্তৌফীদিগের ষ্টেট হইতে ভূম্যাদি সম্পত্তি পাইয়া চন্দ্রশেখরের বৃদ্ধ প্রপিতামহাদি তাঁহাদের ভবনে বাস করেন এবং এপর্য্যন্ত সেইখানেই চন্দ্রশেখর স্বীয় বংশের ভদ্রাসন প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। চন্দ্রশেখরের মাতামহবংশ জেলা নদীয়ার (সম্প্রতি জেলা যশোহর) গুয়াতলি গ্রামের মিত্র গোষ্ঠী। তাঁহারা কোন্নগরস্থ মুখ্যকুলীন মিত্র পরিবারের শাখা।

চন্দ্রশেখর বাল্যকালে পারস্য এবং উর্দ্দূ পড়িয়াছিলেন। পশ্চাৎ ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে কিছুদিন পড়িয়া, পাঠার্থ স্বীয় মাতুলের নিকট বরিশাল গমন করেন। তথায় জমীদার-দিগের ব্যয়ে নির্ব্বাহিত একটী সামান্য স্কুল মাত্র ছিল। তাহাতে,

তাঁহার পাঠের সুবিধা হইল না। সন ১৮৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সদরদেওয়ানী আদালতের জজ কলভিন সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিয়োগে পূর্ব্ববঙ্গীয় জেলা সমূহের অবস্থা পরিদর্শনার্থ গমন করেন। তিনি বরিশালে উপস্থিত হইলে, চন্দ্রবাবু উক্ত স্কুলের বালকগণকে সঙ্গী করিয়া এবং স্বয়ং অগ্রনী হইয়া বরিশালের সরকিট হাউসে তাঁহার নিকট উক্ত স্কুলকে গবর্ণমেণ্টের অধীন করার প্রার্থনায় আবেদন পত্র প্রদান করেন। কলভিন সাহেব পরমাদর পূর্ব্বক ঐ দরখাস্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রাগুক্ত স্থানীয় স্কুলের হেড মাষ্টার এক পাদরী সাহেব ছিলেন। তিনি তেমন সুযোগ্য ছিলেন না। তাঁহার ভয় হইল গবর্ণমেণ্ট স্কুল হইলে তাঁহার চাকুরি যাইবে। সেজন্য তিনি এবং আরো দুইজন সাহেব চন্দ্রশেখরের প্রতি ক্রোধযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ফৌজদারীতে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু জেলার জজ চার্‌ল্‌স ষ্টীয়ার সাহেব এবং একজন ইউরেসিয়ান এবং বিস্তর গণ্যমান্য নেটিব কর্ম্মচারী চন্দ্রশেখরের পৃষ্ঠপোষক থাকায় তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইয়াছিল।

কলভিন সাহেবের অনুরোধে ১৮৫৩ সালের নবেম্বরে উক্ত স্থানীয় স্কুল তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির সহিত গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ হইল। চন্দ্র বাবু ঐ গবর্ণমেণ্ট স্কুলে পড়িয়া ১৮৫৫ সালের এপ্রেল মাসে জুনিয়ার স্কলার্সিপ একজামিন দেন। পাস হইয়া গবর্ণমেণ্ট স্কলার্সিপ এবং তত্র-জমাতে অন্যান্য পুরস্কার পান। পশ্চাৎ কিছুদিন হুগলী কলেজে পাঠান্তে কলেজ পরিত্যাগ করেন। অগ্রসর হইবার সুবিধা হইল না।

বরিসালের ব্যাপ্টিষ্ট মিসন সোসাইটীর সম্প্রদায় ভুক্ত রেভরেণ্ড জেম্‌স সেল নামে এক মহানুভব পাদরী সাহেব ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার পরমগুণবতী মেমের সহিত চন্দ্রশেখরের বিশেষ অনুরক্তি ছিল। চন্দ্রশেখর স্কলার্সিপ পাওয়ায় তাঁহারা বড়ই খুসি হইয়া তাঁহাকে নগদ টাকা, বস্ত্র ও পুস্তকাদি অনেক পারিতোষিক দিয়াছিলেন। পশ্চাৎ তাঁহারা যশোহরে বদলি হইয়া আসেন এবং তথায় চূড়ামনকাঠী নামক গ্রামে এক বিস্তীর্ণ খৃষ্টিয়ান পল্লির অধিপতি হন। সেখানে ভৈরব নদীর তীরে তাঁহাদের উৎকৃষ্ট কুঠি গির্জা ও বাগান ছিল। চন্দ্র-

শেখর কলেজ ত্যাগ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে চাকুরি করিয়া দিবার মানসে তথায় আহ্বান করেন। কিছুদিন নিকটে রাখিয়া পশ্চাৎ যশোহরের পোষ্ট আফিষে একটি সামান্য কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন। যতদিন সেকর্ম্ম হয় নাই, চন্দ্র বাবু ততদিন উক্ত গ্রামের মহাসম্ভ্রান্ত ঘোষ মহাশয়দিগের বাটীতে অবস্থিতি পূর্ব্বক এণ্ডরসন নামক কেম্ব্রিজ এম, এ এক ছোট পাদরী সাহেবকে হিন্দুধর্ম্ম পড়াইতেন এবং উক্ত সাহেব তাঁহাকে বিস্তর ইংরাজী গ্রন্থ শিক্ষা দিতেন। চন্দ্রবাবু সর্ব্বদা ঐ সাহেব দ্বয়ের ও তাঁহাদের সরল হৃদয় বিবিদিগের সৎসঙ্গ কালযাপন করিতেন।

ঐ সময়ে নদীয়া, যশোহর এবং রাজসাহী এই তিন জেলায় ভয়ানক রূপে নীল কুঠির অত্যাচার বৃদ্ধি হইয়া উঠে। তাহাতে একদিকে নীলকর সাহেবেরা ঐক্যবদ্ধ, অন্যদিকে প্রজারা জোঠবদ্ধ হয়। মহানুভব পাদরী সাহেবেরা ইণ্ডিয়া হইতে বিলাত পর্য্যন্ত একবাক্য হইয়া উক্ত অত্যাচারের স্রোত থামাইবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। রেভরেণ্ড জেম্‌স সেল সাহেব কয়েক খানি গ্রাম হইতে অত্যাচারের ঘটনা সকল লিখিয়া আনিবার জন্য চন্দ্রশেখরকে নিয়োগ করেন। চন্দ্রশেখর তাহাতে কোমর বাঁধিলেন এবং যিনি শ্যামচাঁদ নামক দণ্ডধারী ছিলেন, তাঁহার বিস্তর অব্যবহার কার্য্য লিপি করিয়া সাহেবকে দিলেন। সাহেব সেই ভূমির উপরি বড় বড় রিপোর্ট লিখিয়া বিলাতে প্রেরণ করিলেন।

উহার তিন বর্ষ পরে কলিকাতায় ইণ্ডিগোকমিসন বসিল। তাহাতে রেবরণ্ড জেম্‌স সেল সাহেব এক জন মেম্বর হইলেন। মোল্লাহাটী কনসারণের স্বামী ফরলং সাহেব কড়ায় গণ্ডায় নীলের অত্যাচার কমীসনের সম্মুখে স্বীকার করিলেন। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দরভাঙ্গারাজ্যের মেনেজার নিযুক্ত করিলেন। সেল সাহেব এবং তাঁহার পত্নীর চন্দ্রবাবুর প্রতি এতই ভালবাসা ছিল যে, তাঁহাকে খৃষ্টিয়ান করিবার জন্য তাঁহাদের বড়ই আগ্রহ হইল। তাঁহারা এক ষোল বৎসরের খৃষ্টিয়ানকন্যা চন্দ্রবাবুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিলেন, "চন্দ্র, তুমি ইহাঁকে বিবাহ করিতে সম্মত হও। ইনি সদ্গোপের কন্যা এবং নানা গুণের গুণবতী। বিশেষ তোমার একজোড়া

পিরাণ সেলাই করিয়া, তোমার পিরাণের বক্ষে তোমার নাম লিখিয়া দিয়াছেন।" চন্দ্র বাবু কহিলেন, আমার বিবাহ হইয়াছে, বিশেষতঃ খৃষ্টিয়ানধর্ম্মে আমার বিশ্বাস নাই। তাহাতে খৃষ্টিয়ান ধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া কিঞ্চিৎ বাদানুবাদ হইয়া মেমসাহেব চন্দ্রবাবুকে কহিলেন" "তোমার অন্তঃকরণ প্রস্তরের ন্যায় কঠিন।" তথাপি তাঁহারা বহুদিন ধরিয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসা দেখাইতে ক্রটী করেন নাই।

ইতিমধ্যে সন ১২৬৩ সালের ভাদ্র মাসে (১৮৫৬ আগষ্ট সেপ্টম্বর) উলা গ্রামে ভয়ানক জ্বর রোগের মারীভয় উপস্থিত হয়। তখন গ্রামে ৩২০০০ লোকের বসতি ছিল। ৪ বৎসরের মধ্যে প্রায় ২০০০০ লোক মরিয়া যায়। সেই মহামারীতে চন্দ্র বাবুর পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়। তাহাতে তিনি অবশিষ্ট পরিবার লইয়া বাঁশবেড়িয়া গ্রামে পিসির বাড়ী পলাইয়া যান। তাঁহার পিতৃভবন স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া যায়! ভূমি-সম্পত্তির অতিসামান্য আয়দ্বারা বিদেশে কষ্টে-শ্রষ্টে দিনপাত করিতে হইল। তখন তিনি চাকুরি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং ঐ অবশিষ্ট পরিবারগুলির আরোগ্য সম্পাদনার্থ বিশেষ যত্ন প্রয়োজন হইয়াছিল।

১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বর্দ্ধমানের কালেক্টরিতে দ্বিতীয় ক্লার্কের পদ খালি হয়। সেই পদে লোক মনোনীত করিবার নিমিত্তে কালেক্টর চার্‌লস প্যারি হবহউস (পশ্চাৎ জষ্টিস্ অনরবল) ক্রমে ২৫৫ জন উমেদওয়ার একজামিন করেন। একজামিন সর্‌বে ও সেটল-মেণ্ট নথী হইতে রুবকারী ও দরখাস্তের ইংরাজীতে তরজমা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় চন্দ্রবাবু কৃতকার্য্য হইলেন। বেতন ৩০ টাকা মাত্র। ফলে তিন মাসের মধ্যেই তিনি একটি হেডরাইটর হইয়াছিলেন। এই নূতন চাকুরি পাইয়া চন্দ্রবাবু পরিবারদিগকে বর্দ্ধমানে নিজের কাছে লইয়া রাখিলেন। গাঁ ভূমি ক্রমে অরণ্যে পরিণত হইতে লাগিল। চন্দ্রবাবু বলেন, এই ঘোরতর বিপদের মধ্যে এই চাকুরি পাইয়া তাঁহার মনে যে আনন্দ হইয়াছিল, এবং পরিবারবর্গের মধ্যে যেরূপ শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ ১২০০৲ বেতন পাইয়াও তাঁহার সে সুখ হয় নাই।

১৮৬০ সালে হবহাউস সাহেব নদীয়া যশোহর ও রাজসাহী এই তিন জেলার নীল সংক্রান্ত সর্‌সরী আপীল এবং সেসনস্ মোকদ্দমা বিচারের নিমিত্তে আডিসনল সিভিল এবং সেসনজজ নিযুক্ত হন। তিনি চন্দ্রবাবুকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং তাঁহাকে "ওয়ারহর্ষ" (যুদ্ধের ঘোঁড়া) বলিতেন। তিনি বর্দ্ধমানে কালেক্টর থাকিতে চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে নীলের অত্যাচারের এবং রেবরণ্ড জেম্‌স সেল সাহেবের দেশহিতৈষিতার অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি আডিসনল জজ হইয়াই চন্দ্রবাবুকে প্রথমে স্বীয় আদালতের হেডক্লার্ক পরে সেরেস্তাদার নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পদিন পরে তিনি অস্বাস্থ্য জন্য স্বীয় কোর্ট এবালিস করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। তখন ইণ্ডিগো কেস্ ক্রমে হ্রাস হইয়াছিল। এ নিমিত্তে গবর্ণমেণ্ট নদীয়ার তৎকালীন জেলা জজ লিটিলডেল সাহেবকে সে সমস্ত মোকদ্দমা-বিচারের ভার অর্পণ করিলেন এবং হবহাউস সাহেবের সুপারিস মতে চন্দ্রবাবুকে উক্ত জজসাহেবের অধীনে নীল বিভাগের সেরেস্তাদার এবং রেজিষ্ট্রার পদে বাহাল রাখিলেন। কাজ অনেক কমিয়াছিল। বসিয়া থাকিলে দুর্নাম হয়। অতএব চন্দ্রবাবু লিটিলডেল সাহেবকে তাহা জানাইলেন, এবং কহিলেন যে, বসিয়া না থাকিয়া, তাঁহার কোর্টের যে কোন বিভাগে কাজ বাকী পড়িয়া থাকে, যদি অনুমতি হয় তো তিনি তৎসমস্ত তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন এবং আবশ্যক মতে নীলবিভাগের সেরেস্তার কার্য্যও করিবেন। সাহেব বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। এবং তাঁহার হস্তে ইংলিস রেকর্ডের (ইংরাজী নথিপত্রের) সিল সিলা করা বজেট প্রস্তুত করা, এবং বিস্তর দায়রার মোকদ্দমার ক্যালেণ্ডার বা সূচীতালিকা তৈয়ার করার ভার অর্পণ করিলেন। চন্দ্রবাবু অসাধারণ পরিশ্রম পূর্ব্বক অল্পদিনের মধ্যেই ঐ সকল কার্য্য সমাধা করিয়া দিলেন।

ইতিমধ্যে বর্দ্ধমানের কালেক্টর ই, জি, বার্চ সাহেব তাঁহাকে উক্ত কালেক্টরির আসালতন হেডক্লার্ক নিযুক্ত করিয়া স্বীয় আরদালীর মারফত চন্দ্রবাবুকে চিঠি লিখিয়া পাঠাইলেন। তিনি লিটিলডেল সাহেবকে

ঐ পত্র দেখাইলেন। সাহেব কহিলেন ভালই হইয়াছে ; কেননা ইণ্ডিগো মোকদ্দমা কমিয়া গিয়াছে। 'তুমি বর্দ্ধমান যাও আমি শীঘ্র ইণ্ডিগো সেরেস্তা আমার সাধারণ কার্য্যালয়ের অন্তর্গত করিয়া লইব।"

চন্দ্রবাবু বর্দ্ধমানে গিয়া হেডক্লার্ক হইলেন। পশ্চাৎ ষ্টুয়ার্ট হগসাহেব কালেক্টর হইয়া তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য সেরেস্তাদার করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সালে তিনি কলিকাতা পুলীশের কমিশনর ও মিউনিসিপালটীর চৈয়ারম্যান হন। তিনি চন্দ্রবাবুকে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিবার নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টে সুপারিস করিয়াছিলেন। ৬ মাস অপেক্ষা করিলে তাহা হইত। কিন্তু তিনি চন্দ্রবাবুকে স্বীয় পিতা স্যারজেমস্ উইয়ার হগ বাটের ইণ্ডিগো কাণসারণ ও জমীদারীর ম্যানেজার হইতে অনুরোধ করিলেন। স্বাধীনতা লাভের অনুরোধে চন্দ্রবাবু তাহাতে সম্মত হই-লেন এবং গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট পরিত্যাগ করিলেন।

উক্ত কাণসারণ যশোহর ও ফরিদপুর জেলার সীমামধ্যে স্থিত। উহার নাম মীরগঞ্জ কাণসারণ। নিজ মীরগঞ্জ সদরকুঠি ও জমীদারী কাছারী। মেনেজারের থাকিবার গৃহ উপর নীচে প্রায় ত্রিশটা কামরা প্রশস্ত বারান্দা, মনোহর কাষ্ঠের সিঁড়ি, পুষ্পোদ্যান, ফলের বাগান, শাক সবজির ক্ষেত্র, এবং জাঁতঘর, বড়িগুদাম, হাউস, জালঘর আমলা-গণের বাসাবাটী, তহশীলদারের কাছারী এবং বাজার—এ সমস্ত অতি সুন্দর দৃশ্যে বারাখিয়া নদীর উপরিস্থিত ছিল। নদীটী মধুমতির একটী প্রকাণ্ড শাখা। অতি গভীর ও তরঙ্গিণী। উহাতে কাণসারণের দুইখান বজরা বাঁধা। উপরে একটী হস্তী। ঐ নদী, মধুমতি নদী কুমারনদী, এবং নবগঙ্গা এই চারিটী স্রোতস্বতির ধার দিয়া ১২টী কাঁড়ি কুঠি ছিল। এক সময়ে এই কানসারণে প্রতিবর্ষে প্রায় ২০০০ মন নীলবড়ি তৈয়ার হইত। তাহার মূল্য প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। কিন্তু অত্যাচার জনিত বিদ্রোহানলে সমস্ত দগ্ধ হইয়া যায়। ১৮৬৫ সাল পর্য্যন্ত যদিও আর বিদ্রোহ ছিলনা, কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন হয় নাই ; আর দাদন লইয়া নীল করিতে বা আপনাদের প্রধান শ্রেণীর ক্ষেত্র সকল কুঠির নিজ আবাদের জন্য দিতে প্রজাগণের ইচ্ছা ছিলনা। তৎকালে

উক্ত কানসারণে দুই জন ইংরেজ মেনেজার ছিলেন। হগসাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, উক্ত সাহেবদিগের দ্বারা শান্তি স্থাপন এবং জমীদারীর সুবন্দোবস্ত হইবে না। এই জন্য তিনি চন্দ্রবাবুকে মনোনীত করিলেন। তাহাতে সাহেবের ভ্রাতারা এবং পিতা স্যার জেমস উইল্যার হগ সম্মত হইলেন।

১৮৬৬ সালের ৩ সেপ্টেম্বর চন্দ্রবাবু, জেম্‌সক্যাম্পবেল ও এডওয়ার্ড টেলর নামক ম্যানেজার দ্বয়ের নিকট হইতে মীরগঞ্জ কনসারণের চার্জ লইলেন এবং প্রাগুক্ত অট্টালিকায় আপনার বাসস্থান করিলেন। তিনি প্রথমেই সমস্ত মুলতবী মোকদ্দমা, তহশীলের বাকীজায়, খাজানা খাজানার হিসাব প্রভৃতি বুঝিয়া লইলেন এবং ক্রমে অধিকাংশ মোকদ্দমা আপোষে রফা করিয়া ফেলিলেন। প্রায় ১৬।১৭ জন আমলা ছিল। তন্মধ্যে ৯ জন মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট কর্ম্মচারিগণকে পরিবর্জ্জন করিলেন। প্রজার নিকট হইতে নজর লওয়া বন্দ করিয়া দিলেন। সরকার হইতে ময়দা, জলকরের মৎস্য, পাখাকুলি, জলতোলা বেহারা সরদার বেহারা প্রভৃতি যাহা ম্যানেজারের নিজ ব্যবহারের জন্য বরার্দ্দ ছিল, সে সমস্ত, তিনি উঠাইয়া দিলেন। রাইয়ত, আমলা বড় বড় মালগুজারদার, মহাজন প্রভৃতির প্রেরিত উপঢৌকন দ্রব্যাদি গ্রহণকরা রহিত হইল। অথচ তিনি প্রতিদিন নিয়মপূর্ব্বক সকলের প্রার্থনা শ্রবণ করত যথোচিত বিচার করিয়া দিতেন। প্রজাদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইলে তিনি আপোষে সীমাংসা করিয়া দিতেন এবং কাহারো নিকট হইতে জরিমানা লন নাই। হগ সাহেব বিস্তর ঔষধি পাঠাইতেন; তাহা চন্দ্রবাবু পীড়িত প্রজাগণকে বিলি করিয়া দিতেন। বিস্তর শাক সবজির বীজ পাঠাইতেন, তদুৎপন্ন ফসল আমলা দিগকে বণ্টন করিতেন। ১৮৬৭ সালের কার্ত্তিকাঝড়ে বিস্তর প্রজার ঘর পড়িয়া যায়। চন্দ্র বাবু বোট ও হাতি চড়িয়া প্রত্যেক প্রজার দ্বারে দ্বারে স্বয়ং গিয়া প্রত্যেক ঘরে ৪৲ ৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য দেন। তখন জে মন্‌রো সাহেব যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, তিনি ও ঐরূপ খয়রাৎ জন্য চন্দ্র বাবুর হস্তে ১০০০৲ টাকা অর্পণ

করেন। মনরো সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিয়ার এবং ডবলিউ, এম, সুটার সাহেব দ্বয় সবডিবিজনেল অফিসার চন্দ্র বাবুকে বড়ই শ্রদ্ধা করিতেন।

১৮৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চন্দ্রবাবু দেখিলেন কনসারণের গ্রাম সকল নড়াইল, মাগুরা এবং ফরিদপুরের সবডিভিসনের অধীন। বাঁকী খাজানার মোকদ্দমা ও ডিক্রীজারী করিতে ঐ তিন স্থানে যাইতে হয়। তাহাতে কনসারণের বিস্তর ব্যয় হয়, এবং প্রজাগণের অসুবিধা হয়। এই কথা তিনি হগসাহেবকে বুঝাইয়া লিখিলে, তিনি লেফটানণ্ট গবর্ণরকে বলায়, কনসারণের মোকদ্দমা সকল তজবিজের জন্য একজন স্পেসেল ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। কনসারণের নিকটবর্ত্তী অপর জমীদারের মোকদ্দমা, বিচারের ভারও তাঁহার প্রতি অর্পিত হইল। ইহাতে বিস্তর সুবিধা হইয়াছিল। ডেপুটী কালেক্টরের কাছারীর ঘাটে চন্দ্রবাবু বজরায় কাছারী করিতেন। ডেপুটী বাবু শ্রবণের পূর্ব্বে প্রত্যেক মোকদ্দমা তাঁহার নিকট রফার জন্য পাঠাইতেন। প্রজা সঙ্গে সঙ্গে, চন্দ্রবাবু তৎক্ষণাৎ প্রজার আপত্তি শুনিয়া জমাতে ও বাকী খাজানাতে বাদ সাদ দিয়া মোকদ্দমা রফা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে অবিলম্বে বিস্তর টাকা আদায় এবং প্রজার হিসাব পরিষ্কার হইত। বলা বাহুল্য যে তহশীলের মুহরিগণ সমস্ত গোলমালের মূল। তাহারা এক আধ টাকা পাইলে একজনের জমা অন্যের নামে দাখিল করে এবং খাজানা আদায়ে শৈথিল্য করে।

১৮৬৭ সালের জানুয়ারী মাসে, চন্দ্র বাবু নীল যাহাতে বিনা অত্যাচারে আবাদ হয়, সে সম্বন্ধে হগসাহেবকে লেখেন। তিনি লেখেন যে, রায়তেরা বিনাদাদনে ইচ্ছাপূর্ব্বক নীল আবাদে রাজি হইতে পারে। হগসাহেব এসম্বন্ধে লেফটেনণ্ট গবর্ণরের সহ পরামর্শ করেন। লেফটেনণ্ট গবর্ণর কহেন, ফ্রী কলটিভেসন (Free clutivation) অবাধ আবাদে তাঁহার সাহানুভূতি আছে। তদনুসারে তিনি চন্দ্র বাবুকে চিঠি লেখেন। চন্দ্রবাবু প্রধান প্রধান প্রজাদিগকে সমবেত করিয়া তাহাদিগের

মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা সন্তোষপূর্ব্বক ঐ নিয়মে নীল আবাদ ও নীল পাতি যোগাইতে রাজি হইল। কিন্তু তাহারা চন্দ্রবাবুকে কহিল, "যদি হগসাহেব এমত প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন যে, ভবিষ্যতে বাঙ্গালী ভদ্র ও ধার্ম্মিক লোক ভিন্ন তিনি এ কনসারণে অন্য কাহাকেও ম্যানেজার করিয়া পাঠাইবেন না, তবেই আমরা বেদাদনী নীল আবাদের ভার লইতে পারি।" একথা চন্দ্র বাবু রিপোর্ট করিলেন এবং ইহার উপকারিতা বুঝাইয়া দিলেন; কিন্তু আর উত্তর পাইলেন না।

সুতরাং চন্দ্রবাবু কনসারণ বিক্রয় করিবার পরামর্শ দিলেন এবং হগ সাহেব তাহাতে সম্মত হইলে, তিনি প্রায় ৮।৯ মাস পরিশ্রম করিয়া ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত জমিদারী টুকরা টুকরা করিয়া ডাক নিলামে বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। ছোট বড় ধরিয়া ১১০০ মহল বিক্রয় করিলেন। এই বিক্রয়ে হগসাহেব বড়ই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পুরস্কার দিয়াছিলেন। অমন রাজত্ব ধ্বংস করিয়া, আমলা ও প্রজাগণকে কাঁদাইয়া এবং নিজে কাঁদিয়া চন্দ্রবাবু কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন। ১৮৬৯ সালের ৭ই জানুয়ারী হগসাহেব কনসারণ ঘটিত ব্যাপার বন্দ করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে তিনি চন্দ্রবাবুকে ষ্ট্রাণ্ড ব্যাঙ্কের (এক্ষণে কলিকাতা পোর্টভুক্ত) সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-পদে বাহাল করিলেন। তখন উহার লাট সমূহ হইতে বার্ষিক একলক্ষ পোনর হাজার টাকা আয় ছিল। ইতিমধ্যে ৬ মাসের অবসর লইয়া হগসাহেব বিলাত যাত্রা করিলেন এবং তাঁহার পদে হরেস কক্‌রেল সাহেব আফিসিয়েটিং চেয়ারম্যান ও পুলীশ কমিসনার হইলেন। তাঁহার আমলে চন্দ্রবাবু কয়েকটী খালিলাট বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পরম সন্তুষ্ট হন।

হগসাহেব বিলাত হইতে ৬ মাস পরে প্রত্যাগত হইলেন এবং চন্দ্র বাবু পুর্ব্ববৎ কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের ম্যানেজমেণ্টের অধীন দারভাঙ্গার নাবালক মহারাজার ম্যানেজারী আফিষে ঘোরতর বিভ্রাট উপস্থিত হইল। তৎকালীন পার-

সনেল এসিষ্টাণ্ট প্রভৃতি ৮।৯ জন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর ক্রমাগত অনেক পরিমাণ ঘুষ লওয়া প্রকাশ পাইল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পদচ্যুত হইলেন। পাটনার কমিশনর জেঙ্কিন্‌সসাহেব একজন পারসনেল এসিসট্যাণ্ট মনোনীত করিবার জন্য হরেস ককৃরেলকে পত্র লেখেন। ককৃ-রেল পূর্ব্বে মজঃফরপুরের কালেক্টর ছিলেন ; এখন তিনি প্রেসিডেন্সি ডিবিজনের কমিসনর। ককৃরেল এবং হগ দুইজনে পরামর্শ করিয়া চন্দ্র-বাবুকে, তাঁহার অনিচ্ছায়, ঐ কর্ম্মের যোগ্য বলিয়া এবং তাঁহাকে সেইপদে নিযুক্ত করিবার অনুরোধ করিয়া জেঙ্কিন্‌স্ সাহেব কে চিঠি লিখিলেন। তিনি সম্মত হইয়া চন্দ্রশেখরকে দারভাঙ্গা পাঠাইতে লিখিলেন। চন্দ্রবাবু অগত্যা উক্ত দুই সাহেবের চিঠি লইয়া বাঁকীপুর গিয়া, কমিশনরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সাক্ষাৎ মাত্রে তিনি চন্দ্রবাবুকে চিনিলেন। কেননা, তিনি বৰ্দ্ধমানের কমিশনর ছিলেন। তথায় তাঁহাকে জানিতেন। তিনি নিজের একচিঠির মধ্যে ঐ দুই চিঠি পুরিয়া চন্দ্রবাবুকে মজঃফরপুরের কালেক্টর হালিডে সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি হ্যালিডে সাহেবের সহ দেখা করিলে, তিনি ঐ তিনখানি চিঠীর সহ আপনার এক চিঠি যোগ করিয়া, চন্দ্রবাবুকে দারভাঙ্গা রাজধানীতে রাজ ষ্টেটের তৎ-কালীন জেনেরেল ম্যানেজার মেজর বরণ সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রবাবু দারভাঙ্গায় পৌঁছিলে বরণ সাহেব তাঁহাকে স্বীয় পারসনেল এসিসট্যাণ্টের পদে গ্রহণ করিলেন। ১৮৬৯ সালের নভেম্বর মাসে তিনি উক্ত পদে নিযুক্ত হন।

ইহা বলা বাহুল্য যে, মীরগঞ্জ কানসাননে আপনার নিষ্ঠাকাষ্ঠা সম্বন্ধে চন্দ্রবাবু যে সমস্ত নিয়মাবলম্বন করিয়াছিলেন, এখানেও যথা প্রয়োজন সেগুলি ত্যাগ করেন নাই। নজর ও উপঢৌকন বন্দ করিয়াছিলেন এবং অর্থী প্রত্যর্থীদিগের সহিত কাছারী ভিন্ন স্বীয় বাসস্থানে দেখা করিতেন না। ইহা বোধ হয় সকলেই জানেন যে, দ্বারভাঙ্গার রাজ্য সামান্য ষ্টেট নহে। উহা সম্রাট আকবরের সময় হইতে প্রতিষ্ঠিত। যে সময় চন্দ্রবাবু তথায় যান, তখন উহার বার্ষিক আয় প্রায় কুড়িলক্ষ টাকা। তদ্ভিন্ন ৬ ঘর খোরপোষার্থ উপসত্ত্ব মাত্রভোগীর বাবুয়ানা সম্পত্তির আয় প্রায় আট

লক্ষ টাকা। তৎকালে মহারাজার খাষ অংশের গ্রাম সকল অধিকাংশতই ৯।৯ সাল মেয়াদে ঠিকাদারী অর্থাৎ ইজারা বন্দোবস্ত হইত। বিস্তর ইজারাদার ছিলেন। তাঁহাদের অনেকের সহিত, এবং অনেক ইজারা চ্যুত ব্যক্তির সহিত, কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের পূর্ব্বেকার দেনা পাওনার হিসাব অপরিষ্কার ছিল। সুতরাং অর্থী প্রত্যর্থীর সংখ্যা কম ছিল না। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে দশ পোনর হাজার টাকার বার্ষিক মালগুজারদার ছিলেন। দুই তিনজন রায় বাহাদুরও তন্মধ্যে ভুক্ত ছিলেন। সুতরাং সে সমস্ত বড়লোককে বাসায় প্রবেশ করিতে বা ঘরে প্রার্থনার কথা কহিতে নিষেধ করা চন্দ্রবাবুর পক্ষে বড়ই কঠিন কার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কৌশলে আপনার দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি সবিনয়ে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখুন আমার পূর্ব্বকার এসিষ্টাণ্টগণ বেলা ১টা ২টার সময় কাছারী যাইতেন। আমি ৯টার সময় যাই। আমার নিকট প্রাতে কথা কহিতে আপনারা সে সুবিধা পাইতে পারেন না। সন্ধ্যার পরও আমার সাবকাশ নাই। বিশেষতঃ একবার গৃহে ও আর একবার কাছারীতে আপনাদের মামলার আলোচনা করা দোকর পরিশ্রম। আপনারা কাছারিতে দরখাস্ত দ্বারা প্রার্থনা জানাইবেন, তাহাতে জেনেরেল ম্যানেজার যেরূপ হুকুম দেন, তদনুসারে আফিষের কাগজপত্র দেখিয়া যাহা সুবিচার হয় করা যাইবে।" চন্দ্রবাবুর এই পরামর্শে তাঁহারা অগত্যা সম্মত হইলেন। চন্দ্রবাবু বরণ সাহেবকে এই সকল কথা জানাইলেন। সাহেব অত্যন্ত খুসি হইলেন। তাঁহাদের আশা ছিল, চন্দ্রবাবু স্বয়ং দরখাস্ত লইয়া বিচার করিবেন। কিন্তু তাহা হইল না। বরণ সাহেব দৈনিক নিয়মিত প্রজার দরখাস্ত গ্রহণের সহিত ঐ সকল বড় বড় ঠিকাদারের দরখাস্ত গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং সমস্ত কৈফিয়ত ও কাগজপত্র মিছিলবদ্ধ হইয়া পেস হইলে, যেগুলি সহজ মামলা নিজেই তাহাতে হুকুম দিতেন; আর যে গুলি জটিল তাহা চন্দ্রবাবুকে সোপর্দ্দ করিতেন। চন্দ্রবাবু তদুপরি ইংরাজী নোট

লিখিয়া সাহেবকে দিলে, সাহেব হুকুম লিখিতেন এবং তখন কমিশনর সাহেবের নিকট রিপোর্ট যাইত। চন্দ্রবাবু নিজের ক্ষমতা এই রূপে হ্রাস করায় সমস্ত সাহেবেরা তাঁহার প্রতি তুষ্ট এবং লিপ্ত-পক্ষেরা রুষ্ট হইতেন। এই সমস্ত কার্য্য ব্যতীত চন্দ্রবাবুর হস্তে যাবতীয় মোকদ্দমা, উকীলদিগকে চিঠিলেখা, বড় বড় মোতফরকা রিপোর্ট ড্রাফট করা, বিস্তর পিরিয়ডিকেল ষ্টেমৃমেণ্ট সবমিট করা, দশ বারটা ডিপার্টমেণ্টের রেজিষ্ট্রীজাত ও কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনকরা এসকল ভার অর্পিতছিল। মফস্বলের কার্য্যপরিদর্শন, ইজারা বন্দোবস্ত, খাষ মহলের রাজস্ব সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্যের ভার জর্জ লিউহেলিন নামে একজন ইওরোপিয়ান এসিসট্যাণ্ট ম্যানেজারের হস্তে ছিল। জেনেরেল ম্যানেজার ২৭৫০৲, এসিষ্টণ্টমেনেজার ১২০০৲ এবং পারসলেন এসিষ্টণ্ট ৩০০৲ বেতন পাইতেন।

১৮৭৪ সালের শীতের প্রারম্ভ হইতে বেহার প্রদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। উহা এক বর্ষব্যাপী হইয়াছিল। এবং উহাতে রাজ্যের ছত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই একবর্ষ চন্দ্রবাবু বেলা ৯টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত তৎসংক্রান্ত কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ হইলেন। বিশেষতঃ তিনি মনে করিলেন, ডেস্কে বসিয়া এত লেখাপড়া এবং দ্বারভাঙ্গার জলবায়ু তাঁহার আর সহ্য হইবে না। এই কারণে তিনি ইস্তফা দিবার সঙ্কল্পে ৩ মাসের ছুটি লইয়া বাটী আসিলেন এবং কলিকাতা আসিয়া তাঁহার মহামুরব্বি হগসাহেবের সহ সাক্ষাৎ পূর্ব্বক তাঁহাকে সকল কথা জানাইলে তিনি দুঃখিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে কহিলেন "আমি তোমাকে চাকুরি দিতে পারি।" চন্দ্রবাবু স্বীয় স্বাস্থ্য সংস্কারের নিমিত্তে আউটডোর ওয়ার্ক যাচ্ঞা করিলেন। তাহাতে সাহেব সম্মত হইয়া বিনাবিলম্বে তাঁহাকে জুট ইন্‌স্পেক্টরের পদে ২৫০৲ বেতনে নিযুক্ত করিলেন এবং কিছুদিন পরে ৩০০৲ বেতনে কলিকাতা সহরের নর্দারণডিবিজনের কালেক্টর করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে নূতন মিউনিসিপাল আইন অনুসারে নির্ব্বাচণ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। তাহার বন্দোবস্তের সমস্ত ভার হগসাহেব চন্দ্রবাবুর প্রতি অর্পণ করিলেন। চন্দ্রবাবুর

অসাধারণ পরিশ্রমে প্রথম নির্ব্বাচন ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

উহার পরই হগসাহেব বদলী হইলেন এবং তাঁহার পদে মেটকাফ সাহেব আসিলেন। তিনি চন্দ্রবাবুকে দরভাঙ্গায় জানিতেন এবং এখানেও আদর করিতেন। তাঁহাকে তিনি ৬ মাসের জন্য এসিষ্টাণ্ট এসেসর নিযুক্ত করিলেন, তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং মিউনিসিপালটী হইতে ঐ কালের নিমিত্তে একটা ঘোড়া যোগান দিলেন। ঐ ৬ মাসের মধ্যে চন্দ্রবাবু সমস্ত সহরের বস্তিস্থিত কাঁচা গৃহের এসেস্‌মেণ্ট রিভাইজ করিয়া বিস্তর টাকা টেক্‌স বৃদ্ধি দেখাইলেন।

মেট্‌কাফ সাহেব বদলী হইলে, ডবলিউ এম সুটার সাহেব তাঁহার পদস্থ হইলেন। তিনিও চন্দ্রবাবুকে তাঁহার মীরগঞ্জের থাকা কালে জানিতেন; তাঁহার আদেশে চন্দ্রবাবু প্রথমবারের ন্যায় দ্বিতীয় নির্ব্বাচনের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হইল।

১৮৭৯ সালের শেষে দরভাঙ্গার মহারাজা রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চন্দ্রবাবুকে পুনরায় দারভাঙ্গা যাইতে অনুরোধ করেন। মেটকাফ ও সুটার উভয়ে তাহাতে অনুমোদন করায় চন্দ্রবাবু ১৮৮০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তথায় ৪০০৲ বেতনে কর্ণেল রবার্ট মনি সাহেবের পারসনেল এসিষ্টাণ্ট হইলেন। ঐ সালের ২১শে অক্টোবর মহারাজা তাঁহাকে জেলা-মুঙ্গেরের অন্তবর্ত্তী খড়্গপুর পরগণার স্বাধীন এসিষ্টাণ্ট মেনেজারি পদে ৫০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। ২২শে অক্টোবর তিনি এসিস্‌টাণ্ট মেনেজার এচ, ও, কিং সাহেবের নিকট চার্জ লইলেন।

এই পরগণা বিস্তীর্ণ পর্ব্বত ও অরণ্যময় প্রদেশ। তথা হাইলে ভেলইরিগেসন ক্যানাল আছে। কোর্ট অফ্‌ওয়ার্ডস তাহা সাত লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করেন। ইহা চতুর্দ্দিকে প্রসারিত। জল পরিবেষণার্থ শতাবধি দৃঢ় কৃত্রিম জলপ্রপাত ও ফাটক দ্বারা এবং শত শত পাইপ দ্বারা পুষ্টাঙ্গ। এই সুদূর প্রচারী কেদার কুল্যা-প্রেরিত জল সেচন দ্বারা ভূমির উর্ব্বরাশক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার প্রতি লক্ষ্য, রাখিয়া কোর্টঅফওয়ার্ডস্ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, প্রতি সাত বর্ষ অন্তর প্রজার কবুলতি রিভাইজ হইবে। যখন চন্দ্রবাবু তথায়

পৌঁছিলেন, তখন প্রথম রিভিসনের সময়। চন্দ্রবাবু চারি বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাহা করিলেন। তদতিরিক্ত তিনি কর্ণেল মনি সাহেবের আদেশে "ফরেষ্টকন্‌সারভেন্সি", এবং জঙ্গল, শ্লেটখান ও সাবেঘাসের খাস তহশীল-প্রথা প্রবর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত দ্বারা পূর্ব্ব পঁচাশী হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের স্থলে এক লক্ষ বিশহাজার টাকা আয় দাঁড়াইল। ইহাতে মহারাজা ও মণিসাহেব ভারি খুষি হইয়াছিলেন।

উক্ত পরগণার আফিস, বন্দোবস্ত প্রণালী, জঙ্গল ম্যানেজমেণ্ট, আদায় উসুলের নিয়ম প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগে চন্দ্রবাবু উন্নতি সাধন করিলেন। তাঁহার উৎসাহে ও উদ্যমে এবং ম্যানেজার ও মহারাজার মঞ্জুরমতে প্রস্তর-নির্ম্মিত কাছারী গৃহ, দেবী মন্দির, ফাটক, পুষ্পোদ্যান, ফলের বৃক্ষবাটিকা, জলাশয় প্রভৃতি সুন্দররূপে রচিত হইল। তদ্ভিন্ন রাজপথ ও ক্যানালের ধারে ধারে চারি হাজার সংখ্যার ঊর্দ্ধ কাঁঠাল, শিশু, জাম, অন্য নানাবিধ বৃক্ষ, জবলপুরী বাঁশ-ঝাড় প্রভৃতি রোপিত হইল। এক্ষণে সে সমস্ত অতি মনোরম আরাম-শ্রেণীরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে বহুমূল্য কাষ্ঠ প্রদান করিবে। এই সমস্ত কার্য্য ইঞ্জিনিয়ার বাবু পূর্ণচন্দ্র বসুর অসাধারণ অধ্যবসায় ও রচনা কৌশল দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল।

চন্দ্রবাবু গজারোহণে ক্রমিক পর্ব্বত, অরণ্য, লেক (পর্ব্বত মধ্যগত সরোবর), ক্যানাল (খাল), পার্ব্বতীয় ও কৃত্রিম জল প্রপাত, উষ্ণকুণ্ড, শ্লেটের আকর, ভদ্রগ্রাম, সাঁওতাল পল্লি, সঞ্চিত জলের খাজানা প্রভৃতি পরিদর্শন করত মণি সাহেবের নিকট তাহার রিপোর্ট পাঠাইতেন এবং তিনি তাহাতে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিতেন।

তথায় মহারাজার ব্যয়ে এক উচ্চশ্রেণীর হসপিটাল ও ডিস্পেনসারি এবং হিন্দি ও উচ্চ শিক্ষার এক মিডেল ভারনেকিউলার স্কুল আছে। সমস্তই রাজ ম্যানেজমেণ্টের অন্তর্গত। চন্দ্রবাবু তথায় পৌঁছিবার অল্পদিন পরেই ভাগলপুরের কমিশনর বারলো সাহেবের অনুরোধে তথায় ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বেঞ্চ স্থাপিত হয়। তাহাতে গবর্ণমেণ্ট চন্দ্রবাবুকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

১৮৮৬ সালের মে মাসে মহারাজা ১৫০৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়া চন্দ্র বাবুকে পুনর্ব্বার দরভাঙ্গা লইয়া যান। সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার পূর্ণবাবু স্বীয় কার্য্যের অতিরিক্ত তাঁহার কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে কর্ণেল মনিসাহেব কর্ম্মত্যাগ করেন এবং তাঁহার পদে কোর্ট অফওয়ার্ডসের সময়ে যিনি ১২০০৲ টাকা বেতনে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার ছিলেন সেই জর্জ লিউহেলিন সাহেব ২৭৫০৲ টাকা বেতনে ম্যানেজার হন। চন্দ্রবাবু তাঁহার অধীনে এসিষ্টাণ্ট ম্যানেজার হইলেন এবং মহারাজা ক্রমে তাঁহার বেতন ১২০০৲ টাকা করিয়া দিলেন। লিউহেলিন সাহেব ও চন্দ্রবাবু একযোগে রাজ্যের বিস্তর উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজার ওজর সাফ করিয়া বিস্তর বকেয়া ও হাল খাজনা আদায় করিবার সুযোগ করিয়া দিলেন। ভূমি বন্দোবস্তের সুনিয়ম স্থাপন করিলেন এবং চন্দ্রবাবু মফস্বলে সব ম্যানেজারদিগের ও তহশীলদারগণের কাছারী ক্রমিক পরিদর্শন করিয়া তাহার ইনস্পেক্সন রিপোর্ট প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

কোর্ট্অফওয়ার্টসের অবসান সময়ে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর স্যারজর্জ ক্যাম্পবেল কর্ত্তৃক দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের ঠিকাদারী বন্দোবস্তের নিয়ম উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে একা এক প্রত্যেক প্রজার নিকট হইতে কর সংগ্রহ হয়। কর্ণেলমনি সাহেব তাহার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া যান। কিন্তু আই-নের প্রয়োজনানুসারে চন্দ্রবাবু তদুপরি বিস্তর উন্নতি সাধন করেন। অবশ্য যখন যিনি জেনেরেল ম্যানেজার ছিলেন, তখন তাঁহার ও মহারাজার আদেশ ও সম্মতিক্রমে ঐ সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন রাজ্যের খাষ বার্ষিক আয় বত্রিশ লক্ষ টাকা।

লিউহেলিন সাহেব পাঁচ বর্ষ কর্ম্ম করিয়া রিটায়ার হন। চন্দ্রবাবু বহু দিন একাকী আপনার ও তাঁহার কর্ম্ম চালান। তাহার পর ১৮৯২ সালের মার্চ্চ কি এপ্রেল মাস হইতে হেনরি বেলসাহেব সিভিলিয়ান ব্যারিষ্টার জেনেরেল ম্যানেজার হন এবং চন্দ্রবাবু তাঁহার অধীনে কার্য্য করেন। তিনিও চন্দ্রবাবুকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। পাঁচবর্ষ পরে অর্থাৎ আনুমানিক ১৮৯৭ সালের এপ্রেল অথবা মে মাসে তিনি কর্ম্ম-

ত্যাগ করেন। তাহার পর আর কেহ জেনেরেল ম্যানেজার হয় নাই। তাঁহার প্রস্থান অবধি ১৯০২ সালের ১৫ই মে পর্য্যন্ত এই পাঁচবর্ষ চন্দ্রবাবু একাকী সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সময়ে কিছুদিন আর একটা দুর্ভিক্ষের কার্য্য এবং কেডাসট্রাল সর্‌বে ও সেটলমেণ্টের কার্য্য বড়ই বিরক্ত জনক হইয়াছিল।

১৮৯৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর রাত্রিকালে মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর জি, সি, আই, ই, বৈকুণ্ঠ লাভ করেন এবং তাঁহার সহোদর শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রমেশ্বর সিংহ বাহাদুর ১৮৯৯ সালের ২৩ জানুয়ারী লেফটেনাণ্ট গবর্ণর স্যারজন উডবরণ কর্ত্তৃক বিহিত বিধানে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া চন্দ্রবাবুকে রাজ্য ম্যানেজ করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা পত্র প্রদান করেন। চন্দ্রবাবু তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিয়া তিন বৎসর পাঁচ মাসকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাঁহার প্রদত্ত বার্ষিক ৫০০০৲ টাকা পেনসন শিরোধার্য্য পূর্ব্বক ১৯০২ সালের ১৬ মে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। মহারাজা বাহাদুর আশা করিয়াছিলেন, চন্দ্রবাবু সবল হইয়া পুনর্ব্বার স্বীয়কার্য্যে যাইতে পারিবেন। কিন্তু ক্রমিক বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি হেতু চন্দ্র বাবুর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। তিনি মহারাজার আদেশে বর্ষাবধি পরিশ্রম করিয়া কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের সময় হইতে তাঁহার সময়ের শেষ পর্য্যন্ত রাজ কার্য্য নির্ব্বাহের যত নিয়মাবলী সময়ে প্রচারিত হইয়াছিল তৎসমস্তের সংগৃহীত "কোড" প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে দিয়া আসিয়াছেন।

তিনি ১৬ মে ১৯০২ সাল সমস্ত পরিবাবরর্গের সহিত বেলা ৮টার সময় রেলট্রেণের একখানি প্রথমশ্রেণীর রিজার্ভ সেলুন গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দ্বারভাঙ্গা রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহাকে শেষ-সম্বর্দ্ধন করিবার নিমিত্তে অনেক ইউরোপিয়ান এবং মেমসাহেব এবং শতাবধি অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী সমবেত হইয়াছিলেন এবং রাজ ব্যাণ্ড মাষ্টার মিষ্টার আরমর প্রভৃতি সাহেব লোক উচ্চ রবে তাঁহার কল্যাণে জয়ধ্বনি করিলেন। পর পর আর দুইটী ষ্টেসনেও অনেক রাজকর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

এই তাঁহার দ্বারভাঙ্গা রাজ্যের প্রায় ৩০ বৎসরের এবং সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৪৪ বৎসরের চাকুরি সমাপ্ত হইল।

দ্বারভাঙ্গা নগরে ষ্টেসনের সন্নিকট বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজা স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ জি সি আই ই বাহাদুরের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এক প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছে। সমস্ত রাজকর্ম্মচারী এবং রাজ জ্ঞাতি কুটম্বগণ আর নগরবাসী অনেক মান্তগণ্য ব্যক্তি তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্ত অনেক টাকা চাঁদা দিয়াছেন। চন্দ্রবাবু সেই ফণ্ডে সাতশত টাকা দান করিয়াছেন। মহারাজা স্যার রমেশ্বর সিংহ কে সি আই ই বাহাদুর, স্বীয় স্বর্গীয় ভ্রাতার দয়ার স্মরণার্থ সমস্ত রাজ কর্ম্মচারিকে দুই মাসের অথবা একমাসের করিয়া বেতনের তুল্য টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন। তদনুসারে চন্দ্রবাবুকে তিনি দুই হাজার চারিশত টাকা পুরস্কার দিয়াছেন।

চন্দ্রবাবু বর্দ্ধমানে থাকা কালে তথা অনেক গুলি কীর্ত্তি করিয়া-ছিলেন। ১৭৮০ শকাব্দা (১৮৫৮ ইংরাজি) বৈশাখ মাসে তিনি বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজ, ১৭৮১ শকের ফালগুণ মাসে তথায় এক ব্রহ্ম-বিদ্যালয়, ১৭৮৪ শকের ভাদ্রমাসে দর্শন ও পুরাণাদি শাস্ত্রের অনুশীলনা জন্ত 'ধর্ম্মসংসং" নামে একটী মাসিক সভা এবং উহার কিছুপরে "ব্রহ্ম ইউনিয়ন" নামে এক মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। ঐ স্কুলই এক্ষণ বর্দ্ধমানের মিউনিসিপেল স্কুল হইয়াছে। চন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজে বিস্তর লোকের শুভাগমন হইত। তিনি মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ জনপদবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে আহ্বান করিয়া সভায় আনিতেন, তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা শ্রবণে সাধুবাদ দিয়া যাইতেন। চন্দ্রবাবুকে না লইয়া বর্দ্ধমানে প্রায় কোন কার্য্য হইত না।

ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই চন্দ্রবাবু জানিতে পারিলেন যে, সমাজে কতকগুলি এরূপ ভদ্র লোক আসেন, যাঁহারা আপনাকে ব্রাহ্ম বলেন এবং পাপ পুণ্য স্বর্গ নরক এবং কর্ম্মফল ভোগী জীবাত্মার অস্তিত্ব মানেন না। চন্দ্রবাবু ক্রমিক পরিশ্রম করিয়া তাঁহা-দের ভ্রম বুঝাইয়া দিলেন। সেই ফলে অন্তান্ত সাধুপুরুষদিগের দ্বারা সমাজ পূর্ণ হইয়া উঠিল।

১৮৬৬ সালের জুন মাসে চন্দ্রকোণা অঞ্চলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তৎকালে বর্দ্ধমানের পরলোক গত মহারাজাধিরাজ মাহতাব চন্দ বাহাদুর দারজিলিং ছিলেন। ক্রমে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত আবাল বৃদ্ধ বনিতা-গণ বর্দ্ধমান নগরে হা অন্ন জো অন্ন করিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। অন্না-ভাবে অনেকের মৃত্যু হইল। এই সময় চন্দ্রবাবু কোমর বাঁধিয়া কয়েক-জন বন্ধুকে সহযোগী করিয়া বর্দ্ধমান নগরে খোষবাগানে অন্নছত্র খুলিয়া দিলেন। একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত কিছুই সম্বল ছিল না। এইখানে দৈব, পুরুষকারের সহায়তা করিলেন। চারিদিক হইতে জমীদার, মহাজন, দোকানদার ও গৃহস্থগণ সহস্র সহস্র টাকা অজস্র-ধারে অন্নছত্রফণ্ডে অযাচিত রূপে দান করিতে লাগিলেন। প্রতিদিন প্রায় ৬০০০ লোককে নিরামিষ্য অন্ন ব্যঞ্জন খাওয়ান হইত। ৩১শে আগষ্ট চন্দ্রবাবু মীরগঞ্জে গেলেন। তখন ও এই মহা-ভোজ চলিত। জেলার সাহেবগণ সকলেই ইহাতে মাসিক চাঁদা দিতেন এবং পুলীশ প্রহরী সকল নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমান রাজধানিতে প্রত্যাগত হইয়া স্বীয় ভবনে অন্নছত্র উঠাইয়া লইয়া গিয়া দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে অন্ন, ব্যঞ্জন, দধি, দুগ্ধ, মিষ্টান্নাদি দ্বারা পরি-তোষ করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। অন্নছত্র ফণ্ডে যে টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহা দ্বারা দরিদ্রগণকে বস্ত্র, কম্বল ও ঘটি প্রদত্ত হইল।

চন্দ্রবাবু যখন ১৮৬১ সালে প্রথম দরভাঙ্গা গিয়াছিলেন, তখন সেখানেও তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহা পূর্ব্বে প্রতি রবিবার, সন্ধ্যাকালে এবং ইদানী অপরাহ্নে বসিত। তাহাতে ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক বক্তৃতা অথবা উপনিষৎ ও গীতা পুরাণাদি পাঠ হইত এবং আদ্যন্ত মধ্যে পূর্ব্বে হিন্দি এবং ইদানী রামমোহন রায় কৃত বৈদান্তিক ও অন্যান্য ব্রহ্ম-সঙ্গীত হইত। বিস্তর ভদ্রলোক এবং মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ শুভাগমন করিতেন। শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন। প্রতিবর্ষে বসন্ত পঞ্চমীতে উহার উৎসব হইত। তন্মধ্যে একবারকার উৎসবে নানকপন্থী আচার্য্য গুরু দাউজি বেদী গ্রহণ করিয়া বৈদান্তিক

আত্ম-জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছিলেন। চন্দ্রবাবু ১৯০২ সালের ১৫ই মে কর্ম্মত্যাগ করিবার পুর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সমাজ রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। তিনি এই ভাবে ব্রাহ্মসমাজ চালাইয়াছেন যে, ভদ্রকুলোদ্ভব হিন্দু সন্তান-গণ চিত্ত শুদ্ধিকর শাস্ত্র বিহিত নিত্য নৈমিত্তিক দেব সেবাদি, এবং রাজসেবা ও গৃহকর্ম্মের, অবকাশ কালে অন্ততঃ সপ্তাহে একবার শ্রুতি বেদান্ত, গীতা ও আগম পুরাণ প্রতিপাদ্য নিরঞ্জন নিরাময় পরব্রহ্মের জ্ঞানানুশীলন করিবেন।

চন্দ্রবাবু অনেকগুলি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তৎসমস্তই শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ক্রিয়া ও ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক। তন্মধ্যে নিম্নস্থ আট খানি গ্রন্থই প্রধান।

(১) অধিকারতত্ত্ব ১২৭১ বঙ্গাব্দে ষ্টান হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত। "হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে প্রতিপালন, যাহার যেমন অধিকার তাঁহাকে তদনু-রূপ উপদেশ প্রদান, স্বজাতীয় আচার ব্যবহার রক্ষা, শাক্ত বৈষ্ণবাদি প্রত্যেক সম্প্রদায় ভুক্ত উচ্চাধিকারিগণকে স্ব স্ব সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমতের যোগে ব্রহ্মজ্ঞান দান ইত্যাদি রূপ প্রচারব্রত অবলম্বন করা ব্রাহ্মও ব্রহ্ম জ্ঞানীর কর্ত্তব্য—এই গ্রন্থে তাহারই প্রস্তাব।

(২) বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ১২৮২ বঙ্গাব্দে গুপ্তপ্রেসে মুদ্রিত। ইহাতে বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মোপাসনা ও ব্রহ্ম জ্ঞান সম্বন্ধে কতিপয় বক্তৃতা আছে।

(৩) বেদান্ত প্রবেশ। ঐসনে ঐ প্রেসে মুদ্রিত। ষড় দর্শনের সংক্ষেপ বিবরণের সহিত বেদান্ত সূত্রের প্রকৃতি, শঙ্করাচার্য্যের বৈদান্তিক মত, অন্যান্য বৈদান্তিক প্রস্থান, রামমোহন রায়ের বেদান্ত ভাষ্য ও তাঁহার কৃত মীমাংসার সংক্ষেপ বিবরণ এই গ্রন্থের বিষয়।

(৪) সৃষ্টি। ঐ সনে ঐ প্রেসে মুদ্রিত। ইহা বেদান্ত প্রবেশের পরিশিষ্ট স্বরূপ। ইহাতে অব্যক্ত অবধি মহদহঙ্কার, অণ্ড ও হিরণ্যগর্ভ প্রকরণ পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক সৃষ্টি এবং ব্রহ্মার কৃত উদ্ভিদ, অন্ন, তির্য্যক্-যোনি, দানব, গন্ধর্ব্ব, দেবতা এবং মানব পর্য্যন্ত বৈকারিক সৃষ্টির বিবরণ আছে। শ্রুতি বেদান্ত স্মৃতি গীতা পুরাণ ও তন্ত্র সম্মত।

প্রকাশিত হইবার পরেই এই সকল গ্রন্থ পরম আদর প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় তৎসমূহের প্রচারের প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।

(৫) বেদান্ত দর্শন ১২৯২ বঙ্গাব্দে আদি ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা প্রথমে ক্রমশঃ তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে মহর্ষি বাদরায়ণ প্রণীত শারীরক সূত্রের প্রথম একাদশটীমাত্র সূত্রের সংক্ষেপ ব্যাখ্যা আছে। প্রথমাবধি চতুর্থ সূত্রে জগৎসৃষ্টি এবং যজ্ঞাদিকর্ম্ম হইতে ব্রহ্মজ্ঞানের ভিন্ন প্রকৃতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং পঞ্চমাবধি একাদশ সূত্র পর্য্যন্ত সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের আপত্তি খণ্ডিত হইয়া ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে আদ্যোপান্ত বেদান্ত প্রতিপাদ্য অত্যুন্নত নিরঞ্জন ব্রহ্মজ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি শ্রুত্যুক্ত জ্ঞানরূপ অবয়ব দ্বারা পূর্ণ।

(৬) প্রলয়তত্ত্ব। ১২৯২ বঙ্গাব্দে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই গ্রন্থে শ্রুতি, বেদান্ত, পুরাণ ও গীতার প্রতিপাদ্য প্রলয়রূপ অবয়বের বিস্তার আছে এবং আদ্যোপান্ত ব্রহ্মজ্ঞানই ইহার প্রতিপাদ্য। ইহার কতিপয় প্রকরণ নবজীবনে প্রকাশিত হইয়াছিল।

(৭) পরলোকতত্ত্ব। ঐ সনে ঐ প্রেসে মুদ্রিত। এই গ্রন্থে ঐ রূপ শাস্ত্রীয় পরলোকতত্ত্ব রূপ অবয়বের ব্যাখ্যা সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ আছে। ইহাতে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরের বিবরণ, পরলোকে যাইবার পথের বার্ত্তা, স্বর্গ সকলের সংস্থান এবং ভোগলক্ষণ, ব্রহ্মলোক ও তাহার সগুণমুক্তির বিবরণ এবং নির্গুণ মুক্তির লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।

(৮) হিন্দু ধর্ম্মের উপদেশ। ১২৯১ বঙ্গাব্দে গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। বৈদিক ধর্ম্ম ও শাস্ত্র সমন্বয় ইহার বিষয়। বৈদিক নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিধর্ম্ম, উপনিষদুক্ত ব্রহ্মোপাসনা, নিষ্কামভাবে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, কর্ম্ম ব্রহ্মসমন্বয়, দেবসমন্বয় ও শাস্ত্রসমন্বয় ইহার অধ্যায় বিভাগ।

এই সমস্ত গ্রন্থ কেবল শাস্ত্ররূপ ভূমির উপরি প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যে কোথাও বৈদেশিক মত মুখ্য প্রমাণরূপে গৃহীত হয় নাই। কেবল শাস্ত্রই ব্যাখ্যাত এবং অবলম্বিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ বিস্তর রাজা

মহারাজা জমীদার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অন্যান্য ভদ্রলোককে বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছে।

চন্দ্রবাবু অতি শান্ত স্বভাব ব্যক্তি। তিনি ধীর ও গম্ভীর ভাবে রাজকার্য্য এবং এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কখনও নামলুব্ধ হন নাই। বর্ত্তমান মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাঁহাকে রায় বাহাদুর টাইটেল অর্পণার্থ গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার রিটায়ার হইবার সময়-ইওরোপিয়ান ও নেটিব রাজ কর্ম্মচারিগণ মহারাজার সম্মতি ক্রমে তাহাকে অভিনন্দন পত্র দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে নিরস্ত করেন।

দরভাঙ্গার সদর আফিসে এসিষ্টণ্ট মেনেজর হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল হইতে তিনি কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তাহার পূর্ব্বে যখন যেমন সুবিধা হইত শেষ রাত্রিতে, অথবা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে বেলা ৭।৮ টা পর্য্যন্ত, অথবা দুর্গোৎসবের বন্ধে অবসর থাকিলে, তিনি গ্রন্থ লিখিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার জমী, জেরাত, দেনা পাওনা, ব্যবসা বাণিজ্যাদি কোন কারবার নাথাকায়, এবং তিনি বাহ্য আমোদে প্রমোদে আসক্ত না হওয়ায় রাজকার্য্যে ষোল আনা এবং অবসর ক্রমে শাস্ত্র চিন্তায় এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহ সদালাপে মনঃ সংযোগ করিতে অনেক সময় পাইতেন। অধিকন্তু তিনি রাজকার্য্য গতিক্রিয়া করিয়া ফেলিয়া রাখিতেন না, কিন্তু যতদূর সম্ভবে সত্বরতার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। অথচ তাঁহার মেনেজারিকালে কার্য্যের পরিমাণ এতই বেশী ছিল যে, কখন কখন তাঁহাকে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত আফিষ করিতে হইত। তাহাতে প্রতিদিনের কার্য্য প্রতিদিন অধিকাংশতঃ সমাপ্ত হইত, এবং পরদিনের নিমিত্তে তাঁহার হস্তে প্রচুর অবসর থাকিত। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে তাঁহার বাসায় ব্রাহ্ম সমাজ হইত সত্য, কিন্তু প্রাতে ৩ ঘণ্টা এবং ১২টা হইতে তিনঘণ্টা এই ৬ ঘণ্টার মধ্যে হস্তের সমস্ত রাজকার্য্য শেষ করিয়া তিনটার পর নিশ্চিন্ত মনে সমাজের কার্য্যে মনোযোগী হইতেন।

এইরূপে তাঁহার বয়ক্রম ৭১ বর্ষ। শরীরের অপটুতা জন্য বেশী

পরিশ্রম করিতে পারেন না। তথাপি রিটায়ার হওয়া অবধি অল্প অল্প লেখেন এবং শাস্ত্রীয় নব নব সংগ্রহের অনেকগুলি পাণ্ডুলেখ্য প্রস্তুত করিয়াছেন।

অতঃপর মহারাজাধিরাজ মিথিলেশ্বর শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুরের সভাসদ মহামহোপাধ্যায় মীমাংসা শাস্ত্রের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চিত্রধর মিশ্র স্বীয় সহযোগী পণ্ডিতমণ্ডলীর সহ একবাক্য হইয়া চন্দ্রবাবুর পরলোকতত্ত্ব, প্রলয়তত্ত্ব, বেদান্ত দর্শন ও হিন্দুধর্ম্মের উপদেশ পাঠ পূর্ব্বক তাঁহাকে ইংরাজি ১৮৯৫ সালের ১৮ই অক্টোবরের লিখিত যে প্রশংসা পত্র দিয়াছেন, তাহার প্রতিলিপি ও অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু সমীপে—

পরলোকতত্ব প্রলয় তত্ব প্রভৃতয় স্ত্রি চতুরা ভবদ্রচিতা! গ্রন্থাঃ সম্যগস্মাভি-রসকৃদবলোকিতাঃ। রচনানৈপুণ্যে নান্যুনানতিরিক্ত বচনোপন্যাসেন চ হর্ষাতিশয়ং জনয়ন্ত্যেব.পরং।বিশেষতঃ প্রশংসা হেতুস্ত্বয়ং যদেতে গ্রন্থাঃ স্বরূপতো বঙ্গভাষা ময়া অ।প অর্থতোঽতি নিগূঢ়ং দর্শনাদি শাস্ত্রতাৎপর্য্য বিষয়ীভূতমর্থং স্বচ্ছতয়া প্রকটয়ন্তো অংশতো দর্শন শাস্ত্রমপ্যতিশেরত ইতি

তথা স্থলে স্থলে পুরাণাদি প্রতিপাদিতস্য পদার্থতত্বস্যাধুনিক দেশান্তরীয় বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রপ্রতিপা।দতেন পদার্থতত্বেন সহোত্তান বুদ্ধীনাং প্রতিভাসমানং বিরোধমনায়াসেন পরিহরন্তো দুষ্পরিহর বিরোধস্থলেচ দৃঢ়তর যুক্ত্যা পুরাণ দর্শনাদি শাস্ত্রমতং দেশান্তরীয় বৈজ্ঞানিক মতাৎ প্রবলয়ন্তো অস্মভ্যমিমে গ্রন্থা অতীব রোচন্তে, কিমধিকেনেতিশং।

শ্রী ৫ মন্মিথিলা মহীমণ্ডলাখণ্ডল সেবকানামন্যতমো মীমাংসকঃ

শ্রীচিত্রধর মিশ্র

১৮।১০।১৮৯৫ ইং—

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু সমীপে—

আপনার রচিত পরলোক তত্ব ও প্রলয় তত্ব প্রভৃতি তিন চারিখানি গ্রন্থ আমরা অনেক বার ভালরূপ অবলোকন করিয়াছি। এই গ্রন্থ কয়েক খানির রচনা নৈপুণ্য এবং অন্যূন ও অনতিরিক্ত বচন বিন্যাসে আমরা সাতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ গ্রন্থ কয়েকখানির প্রধান প্রশংসার বিষয় এই যে, এই সকল গ্রন্থ স্বরূপতঃ বঙ্গভাষায় লিখিত হওয়াতেও অর্থতঃ দর্শনাদি শাস্ত্র তাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত অতি নিগূঢ় অর্থ বিশদরূপে প্রকটিত করিয়া অংশতঃ দর্শন শাস্ত্রাপেক্ষাও আতিশয্য লাভ করিয়াছে।

আর এক কথা, স্থানে স্থানে পুরাণাদি শাস্ত্র প্রতিপাদিত পদার্থ তত্ত্বের আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রপ্রতিপাদিত পদার্থ তত্ত্বের সহিত এখনকার উন্নত বা উদীয়মান-বুদ্ধি-জনগণের যে বিরোধ প্রতিভাসিত হইত এই গ্রন্থ সমূহ দ্বারা তাহা অনায়াসে খণ্ডিত হইয়াছে। এবং দুষ্পরিহর বিরোধ হলেও সুদৃঢ় যুক্তি দ্বারা দেশান্তরীয় বৈজ্ঞানিক মত হইতে পুরাণ ও দর্শনাদি শাস্ত্র মতকেই প্রবলরূপে উল্লিখিত করায় এই গ্রন্থ কয়েক খানি আমাদিগের নিকট বড়ই উপাদেয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। অধিক লেখা বাহুল্য ইতি।

শ্রী ৫ মন্মিথিলা মহীমণ্ডলাখণ্ডল সেবকানাং মন্যতমো মীমাংসকঃ

শ্রী চিত্রধর মিশ্র

১৮।১০।১৮৯৫ ইং—

চন্দ্রনাথ বসু।

সন ১২৫১ সালের ১৭ই ভাদ্র হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন হরিপাল থানার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা ৺ সীতানাথ বসু, পিতামহ ৺ কাশীনাথ বসু। ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হিন্দু বলিয়া সে অঞ্চলে আমার পিতামহের বড় প্রসিদ্ধি ছিল পিতৃদেবকে পিতামহের পদাঙ্কানুসরণ করিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের কাহারও পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি নাই।

হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি ভাগীরথীর পশ্চিমকূলস্থিত জেলা সকল তখন অতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল। কলিকাতায় পীড়া হইলে আমরা গ্রামে চলিয়া যাইতাম, এবং বিনা চিকিৎসায় তথায় সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিতাম। এবং মহোল্লাসে খাইয়া খেলাইয়া বেড়াইতাম। স্কুল কালেজের ছুটী হইলেই দেশে যাইতাম, সেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা হইত না, ছুটী ফুরাইলে এক মাস দেড় মাস পরে কলিকাতায় আসিতাম—তাও এক রকম কাঁদিতে কাঁদিতে। আমার পুত্র পৌত্রাদি সে গ্রামও দেখিল না, সে গ্রাম্য সুখের আস্বাদও পাইল না। তাহাদের জীবন অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন হইল। সে গ্রাম্য-জীবন

যাহাদের হইল না, বঙ্গদেশ কি জিনিস তাহারা তাহা জানিতে পারিল না। তাহারা যথার্থই হতভাগ্য।

কৈকালা তখন জনপূর্ণ ছিল। তথায় প্রায় এক শত ঘর ব্রাহ্মণ এবং প্রায় চারি শত ঘর তন্তুবায় ছিল। কায়স্থ এবং অন্যান্য জাতিও অনেক ছিল। সকলেই এক রকম স্বচ্ছন্দে ছিল। কারণ ধান চাল সস্তা ছিল এবং স্বাস্থ্য-সুখে কেহ বঞ্চিত ছিল না। কৈকালায় মিহি মোটা বিস্তর বস্ত্র বয়ন হইত—সে বস্ত্রে। বড় আদর ছিল, খুব নাম ছিল, খুব কাটতি ছিল। কৈকালায় প্রকৃত ধনাঢ্য তন্তুবায় ছিল। কৈকালা গ্রামে কুড়ি পঁচিশ খানা পূজা হইত, কত ঘরে দোল দুর্গোৎসব হইত। কিন্তু কৈকালা আজ ম্যালেরিয়ায় প্রায় জনশূন্য—গত ৪০ বৎসরে বোধ হয় শত করা ৭৫ জন চলিয়া গিয়াছে—গ্রামে গৃহ অতি অল্পই আছে, পথের দুই ধারে কেবল কাঁতড়া পড়িয়া রহিয়াছে। তন্তুবায় দুই দশ জন মাত্র আছে—তাহারা এখনও কাপড় বুনিতেছে, হাবড়ার হাটে তাহাদের কাপড়ের আদর এখনও আছে—কিন্তু দুই দশ জন বৈ নয়, তাও ম্যালেরিয়ায় মৃতবৎ, কয়খানা কাপড়ই বা বুনিবে, কয়টা টাকাই বা পাইবে? সমস্ত গ্রামে এখন একখানি মাত্র পূজা হয় (বসু বাড়ীতে)—তাহাতেও ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় কুড়ি পঁচিশটার অধিক ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না। বাগ্দী-দুলে সব মরিয়া গিয়াছে—তারকেশ্বর রেল রাস্তা নির্ম্মাণার্থ অন্য স্থান হইতে আনীত কুলী-মজুর—কোল-সাঁওতাল—তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। গ্রামে জঙ্গল বাড়িয়াছে, বন্য শূকরাদি হিংস্র জন্তু দেখা দিয়াছে। ম্যালেরিয়ার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর সোণার কৈকালায় যাই নাই। এত দিনের পর অবসর গ্রহণ করিলাম। আজ সেই সোণার কৈকালায় বসিয়া সেই বাল্য সুখ উপভোগ করিব। কিন্তু তাহা আর হইল না। কি জানি কে শত্রুতা সাধন করিল—আমার সেই সোণার কৈকালা মাটী করিয়া দিল। অথবা বিধাতাই আমাদের প্রতি বিমুখ!

পঞ্চমবর্ষে যথারীতি হাতে খড়ি হইলে পর আমি পাঠশালায় প্রবেশ করি। আমাদের বাড়ীতেই পাঠশালা ছিল। উদয় নামক এক ব্যক্তি

আমাদের গুরুমহাশয় ছিলেন। (তাঁহার অসাক্ষাতে) তাঁহাকে আমরা উদো মোশাই বলিতাম। তিনি আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। সদর বাটীতে পাঠশালা বসিত। সেখান হইতে আমাদের অন্দর বাটী কিছু দূর। মনে আছে, এক দিন অপরাহ্নে বৃষ্টি হইতেছিল বলিয়া গুরু-মহাশয় একটী গোলপাতার ছাতা মাথায় দিয়া আমাকে কোলে করিয়া অন্দরবাটীতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। আমার বয়স যখন আট বৎসর, তখন আমার পিতামহের চারি পুত্রের মধ্যে কেবল কনিষ্ঠ, আমার পিতৃদেব, বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে লইয়া কলিকাতায় বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতেন। ইংরেজী শিখাইবার জন্ত তিনি আমাকে হেদোর স্কুলে পাঠাইয়াছিলেন। তখন আমাদের বাসা শিমলার বাজারের প্রায় সম্মুখে। সুতরাং ঐ স্কুলের অত্যন্ত নিকটে ছিল বলিয়াই বোধ হয় তথায় পাঠাইয়াছিলেন। খৃষ্টানদিগের স্কুল, হয় ত' আমাকে খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে, আমার সর্ব্বদা এই ভয় হইত। আমাদের মাষ্টার নস্ত লইতেন, তাঁহার হাতে একটী নস্ত-দান থাকিত। আমি মনে করিতাম, উহাতে গোমাংস আছে, কবে জোর করিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিবে। আমার স্বর্গীয় পিতামহীর নিকট এই কথা বলিয়াছিলাম। ছয় মাস মাত্র হেদোর স্কুলে রাখিয়া পিতা আমাকে ওরিয়েণ্টল সেমিনরির শাখা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ওরিয়েণ্টল সেমিনরি স্বর্গীয় গৌরমোহন আঢ্যের প্রতিষ্ঠিত, তখন বড়ই প্রসিদ্ধ, এখন খর্ব্ব হইয়াও সুন্দরভাবে পরিচালিত। তখন উহার দুই তিনটী শাখা ছিল—একটী কলিকাতায়, উহারই নিকটে, আর একটি ভবানীপুরে, আর একটী বেলঘরিয়ায়। মূল ও শাখা স্কুল কয়টীতে বোধ হয় দেড় হাজার বালক শিক্ষা লাভ করিত। মূল স্কুলে ইংরাজী সাহিত্যের বড়ই আদর ছিল। তজ্জন্ত উহার যেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল, বোধ হয় কলিকাতার আর কোন স্কুল বা কালেজের সেরূপ প্রসিদ্ধি ছিল না। অঙ্ক ও বাঙ্গালায় তত মনোযোগ ছিল না। এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিবার এক বৎসর পূর্ব্বে শাখা স্কুল হইতে মূল স্কুলে গিয়াছিলাম। তাহার কারণ, হেডমাষ্টার মহাশয়কে দুই চারিটা কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,

তিনি অর্থ জানিতেন না। আমাকে নিরস্ত করিবার জন্য চড় মারিয়াছিলেন। তখন আমার Pope's Iliad পড়া হইয়া গিয়াছিল। মূল স্কুলের প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় কৈলাসচন্দ্র বসু মহাশয় (বিবাহবিভ্রাট প্রণেতা আমার স্নেহাস্পদ অমৃতলালের পিতা) আমাকে এত ভালবাসিতে লাগিলেন যে, আমার ক্লাসের কয়েকটী ছেলে আমাকে তাড়াইবার জন্য প্রতিদিন টেবিল চাপড়াইয়া আমাকে বিদ্রূপ করিয়া গান গাহিত। আমি চুপ করিয়া শুনিতাম—একটী কথাও কহিতাম না, কৈলাস বাবুকেও কিছু বলিতাম না। গানের গোড়াঠা মনে আছে—

"চতুরঙ্গের কিবা ছিরি ম'রি হায় হায়।
পেট মোটা গলা সরু, বেটা যেন বামণের গরু॥"

তাহারা দিন কতক এইরূপ করিয়া আপনারাই পলাইয়া গেল। তখন স্কুলের স্থাপয়িতা গৌরমোহন আঢ্য লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ৺হরেকৃষ্ণ আঢ্য মহাশয় স্কুলের অধিকারী ও অধ্যক্ষ—জ্যেষ্ঠের কীর্ত্তি রক্ষণে বড়ই যত্নশীল। উচ্চশ্রেণীতে তিনি বড় বড় ইংরাজ ও ইউরেশীয় শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন। প্রসিদ্ধ কাপ্তান রিচার্ডসন, হার্ম্মান জেফরয়, কাপ্তান পামার, উইলিয়ম কার্কপ্যাট্রিক, রবার্ট ম্যাকেঞ্জি—এইরূপ লোকে উপরে অধ্যাপকতা করিতেন। আর নিম্নতম শ্রেণীর শিক্ষকতার যেরূপ বন্দোবস্ত ছিল, সেরূপ বোধ হয় আর কোন স্কুলে কখন হয় নাই। বাঙ্গালী বালকের ইংরাজী উচ্চারণ প্রায়ই অশুদ্ধ হয় বলিয়া ওরিয়েন্টল সেমিনরির নিম্নতম শ্রেণীতে একজন ফিরিঙ্গি শিক্ষক নিযুক্ত হইতেন। তাহাতে ছোট ছোট ছেলেরা প্রথম হইতেই শুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণ শিখিত এবং সংখ্যায় অধিক হইলেও সুশাসনে থাকিত।

যখন জুনিয়র ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অর্থাৎ preparatory ক্লাসে পড়ি তখন রিচার্ডসন সাহেব আমাদিগকে দুই একদিন পড়াইয়াছিলেন। এণ্ট্রান্সের পাঠ্যের মধ্যে Rogers's Pleasures of Memory নামক কাব্য ছিল। প্রথম দিন সাহেব Rogers, Goldsmith, Campbell, Akenside, Thomson প্রভৃতি descriptive কাব্য

প্রণেতাদিগের দোষগুণ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন তেমন কথা আর কখন শুনি নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার কাছে দুই চারি দিনের বেশী পড়া হয় নাই—তিনি বিলাতে চলিয়া গেলেন। দুই দিনেই কিন্তু বুঝিয়াছিলাম যে, ইংরাজী সাহিত্যের তাঁহার মত অধ্যাপক বঙ্গে আর আসেন নাই।

আমাদের একটী ক্লব ছিল—নাম ওরিয়েণ্টল ডিবেটিং ক্লব। কেবল ছাত্রদিগের ক্লব। আমরা আপনারাই পর্য্যায়ক্রমে প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম এবং আপনারাই তর্ক বিতর্ক করিতাম। বার্ষিক অধিবেশনেও আমরাই প্রবন্ধ পাঠ করিতাম। এখন অনেক লাইব্রেরী ও রিডিংরুম হইয়াছে। তথায় বড় বড় সাহেব ধরিয়া আনিয়া তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করা হয়। সভ্যেরা আপনারা প্রবন্ধ পাঠ, তর্ক বিতর্ক কিছুই করেন না। আমাদের সেই ক্লবের পদ্ধতি অবলম্বন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

ইং ১৮৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হই। কেমন করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারি নাই, অঙ্কে ও বাঙ্গালায় এতই কাঁচা ছিলাম। উত্তীর্ণ হইবার পর স্থির হইল যে, আমাকে কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইয়া কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে হইবে, পিতৃদেব মাসে দশ টাকা করিয়া বেতন দিয়া আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াইতে পারিবেন না। কিন্তু বিধাতা একটু অনুকূল হইলেন। Atkinson সাহেব তখন শিক্ষা-বিভাগের ডিরেকটর বা অধ্যক্ষ। তিনি বড় উদারচেতা ছিলেন। হরেকৃষ্ণ বাবুকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ একটী ছাত্রকে আট টাকা মূল্যের একটী ছাত্রবৃত্তি দিবেন। হরেকৃষ্ণ বাবু আমাকে তাঁহার বাটীতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং সাশ্রু লোচনে ঐ কথা বলিলেন। ১৮৬১ সালের প্রারম্ভেই আমি প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তি হইলাম। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ৺প্যারীচরণ সরকার আমাদিগকে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়াইতেন। অতি অল্প অধ্যাপককেই তাঁহার স্তায় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া পড়াইতে দেখিয়াছি। প্রতি সপ্তাহে দুই দিন করিয়া তিনি আমাদিগকে ইতিহাসের প্রশ্ন দিতেন, আমরা

বাড়ী হইতে উত্তর লিখিয়া লইয়া যাইতাম, তিনি সেই সত্তর আশি খানা উত্তর সাবধানে সংশোধন করিয়া ফিরাইয়া দিতেন। Carnduff নামক একজন অধ্যাপকও মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লেখাইতেন। শুনিতে পাই, ঐরূপ লেখাইবার প্রথা এখন আর নাই। দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যাপক কাউয়েলের নিকট পড়িয়াছিলাম। তেমন অধ্যাপক বুঝি আর হয় না—পাণ্ডিত্য যেমন বহুবিষয় ব্যাপক তেমনই প্রগাঢ়, ছাত্রের প্রতি স্নেহ ও যত্ন বর্ণনাতীত। ১৮৬২ সালে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে পঞ্চম স্থান লাভ করিয়াছিলাম—প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন রাসবিহারী। যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন ওরিয়েণ্টল ডিবেটিংক্লবের ন্যায় প্রেসিডেন্সি কালেজেও আমাদের একটী ক্লব ছিল। ক্লবেও আমরা আপনারাই প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতাম, আপনারাই তর্ক বিতর্ক করিতাম, বাহিরের লোক আনিতাম না। যখন চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন আমরা Calcutta University Magazine নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র বাহির করিয়াছিলাম। আমার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী সৈয়দহোসেন বেলগ্রামি, যিনি এখন নিজামের রাজ্যে শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ, উহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ঐ পত্রে On the importance of the study of history নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে Englishman সম্পাদক লিখিয়াছিলেন—we trust this article is from a native pen, thought we doubt it. আর বলিয়াছিলেন যে উহাতে খুব originality of thought ছিল। একথা এত দিন কাহাকেও বলি নাই। এখন বলিতে হইল। কাগজখানি পনর মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাহাও কেবল ৺প্যারীচরণ সরকারের অনুগ্রহে হইয়াছিল। তিনি কাগজখানি আপনার প্রেসে ছাপাইয়া দিতেন। আমরা সংসারানভিজ্ঞ—মূল্য আদায়ে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতাম। ছাপিবার ব্যয় প্রায় চারিশত টাকা দেওয়া হয় নাই, প্যারী বাবুও কখনও চাহেন নাই।

১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে বি-এ পরীক্ষা দিয়া আমি প্রথম

স্থান অধিকার করিয়াছিলাম, রাসবিহারী এবং মৃত অধ্যাপক ব্লকম্যান সাহেব দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্কিম বাবু একবার আমাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি পরীক্ষায় ব্লকম্যান অপেক্ষা বড় হইয়াছিলে, কিন্তু ব্লকম্যান আইন আকবরীর ন্যায় গ্রন্থখানা অনুবাদ করিয়া ফেলিলেন, তুমি কি কাজ করিলে?" বঙ্কিম বাবু ঠিক কথাই বলিয়াছিলেন—আমরা কেবল পরীক্ষা দিতে পারি। ১৮৬৬ সালে এম্-এ এবং ১৮৬৭ সালে বি-এল পরীক্ষা দিয়াছিলাম। শেষোক্ত পরীক্ষায় রাসবিহারী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করি।

বি-এল পাস করিয়া সকলে যেমন আদালতে ছোটে, আমিও তেমনই ছুটিয়াছিলাম। চাকরী করিয়া স্বাধীনতা নষ্ট করিব না, তখন মনের ভাব এইরূপ ছিল। কিন্তু হাইকোর্টে গিয়া দেখিলাম, সেখানকার হাওয়া ভাল নয়। মামলা-মোকদ্দমা আমার ভালও লাগিত না। শীঘ্রই বুঝিলাম, অনেকে ন্যায় অন্যায়ের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া বৈরসাধনার্থ অথবা জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া অর্থনাশ করে, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হয়, এবং সমাজে বিষম অসদ্ভাব এবং মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে। মফস্বল হইতে আমার নিকট মোকদ্দমা পাঠাইবার লোকও ছিল না। মোক্তারদিগের খোসামোদ করিতেও পারিতাম না। ওকালতিতে কিছু হইল না দেখিয়া অগত্যা চাকরীর চেষ্টা করিতে হইল। অধ্যাপকতা করিবার ইচ্ছা হইল। তখন উড্রো সাহেব শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ। তিনি বড় সহৃদয়তা প্রকাশ করিলেন। কন্তু যখন বিদায় গ্রহণ করণার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—'আমি যদি তোমার পিতা হইতাম, তাহা হইলে তোমাকে এ বিভাগে আসিতে নিষেধ করিতাম, এ বিভাগে কাহারও কিছু হয় না'। তেমন করিয়া কথা তাঁহার ন্যায় কর্ম্মচারীরা এখন কহেন কি না জানি না। তিনি পাঁচ সাত দিন পরেই আমাকে কটক কালেজে দুইশত টাকা বেতনের একটী অধ্যাপকতা দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে, আমার একটী ডিপুটী মেজেষ্টরী পাইবার সম্ভাবনা হইয়াছে তখন

আপনিই বলিলেন—না, অধ্যাপকতা লইও না, ডিপুটী মেজেষ্টরীই লও। ১৮৭৮ সালে টাকায় ডিপুটীগিরি করিতে যাই। ডিপুটীগিরি ভাল চাকরী বলিয়া বোধ হইল না। ছয়মাস পরে ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় আসিলাম। আসিবা মাত্র স্যার রমেশ মহাশয় আমাকে বলিলেন—জয়পুর কালেজের প্রিন্সিপাল নাই, কান্তি বাবু আপনাকে চান, যাইবেন কি? আমি যাইলাম। জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর ভারতবর্ষে আর নাই। একজন ইংরাজ আমাকে বলিয়াছিলেন যে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস ছাড়িয়া দিলে, জয়পুরের ন্যায় সুন্দর সহর পৃথিবীতে আর নাই। জয়পুর মহারাজ জয়সিংহের স্থাপিত। উহার গঠন-প্রণালী বিদ্যাধর নামক একজন বাঙ্গালীর উদ্ভাবিত। বিদ্যাধরের গলী বলিয়া জয়পুরে এখনও একটী রাজপথ আছে। জয়পুরের দেবালয়ে বাঙ্গালী পুরোহিতের সংখ্যাই অধিক। জয়পুরের রাজকার্য্যে অনেক দিন হইতে বাঙ্গালীরই প্রাধান্য। দেখিলাম কান্তি বাবুই জয়পুরের প্রকৃত রাজা। জয়পুরে বিস্তর বাঙ্গালী দেখিলাম। ৺যদুনাথ সেন মহাশয়ের বাটীতে একটী বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলাম। বালক-বালিকাশুদ্ধ প্রায় দেড়শত বাঙ্গালী ভোজনে বসিয়াছিলাম। জয়পুরে থাকিলে অনেক টাকা করিতে পারিতাম। যে দিন সেখানে যাই তাহার পরদিনই কান্তি বাবু বলিয়াছিলেন—কালেজের কর্ম্মে কিছুই হইবে না, শীঘ্রই আপনাকে শাসন বিভাগে আনিব। কিন্তু দেখিলাম, রাজ সভার হাওয়া বড় ভাল নয় এবং আপন স্বাধীনতা রক্ষা করাও কঠিন। সহরটাও দেখিলাম বড় শুষ্ক ও রুক্ষ-দর্শন। তিন দিকে তৃণশূন্য পাহাড়, সমতল স্থান তৃণশূন্য, বারিশূন্য, বালুকাময়। আমি বাঙ্গালার ন্যায় বিশাল উদ্যান বিহারী, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং বঙ্গের বাঙ্গালী, জয়পুরের দৃশ্য আমার ভাল লাগে নাই। তিন মাসের ছুটী লইয়া বাড়ী আসিলাম—বিধাতাকে বলিতে বলিতে আসিলাম, ঘরেই যেন আমার যৎকিঞ্চিৎ হয়। বিধাতা কৃপা করিলেন। ছুটী ফুরাইবার অগ্রেই বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ খালি হইল। কয়েকজন ঐ পদের প্রার্থী হইলেন। স্যর আল্‌ফ্রেড ক্রফট বলিলেন—চন্দ্রনাথ

যদি প্রার্থনা করেন, আর কেহ এ কর্ম্ম পাইবেন না। তাঁহার কাছে আমি পড়ি নাই। তাঁহারা কিন্তু উপাধিধারীদের সংবাদ রাখিতেন। তাঁহাদের ন্যায় শিক্ষা বিভাগের পদস্থ সাহেবেরা এখন রাখেন কি? ১৮৭১ সালের ৭ই অক্টোবর তারিখে আমি ঐ কর্ম্ম পাই। পাইয়া ৭ বৎসর কয়েক মাসে বিস্তর বাঙ্গালা পুস্তক পড়িয়াছিলাম। তাহার পর আমার সহোদর সদৃশ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় অতি অকালে স্বর্গারোহণ করায় ১৮৮৭ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে আমি বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের পদপ্রাপ্ত হই। অনুবাদকের কাজ যেমন কঠিন, তেমনই অপ্রীতিকর, পরিমাণে প্রায় অসীম। বড় অনিচ্ছায় এই কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু গ্রহণ করিবার পর ইহাকে ধর্ম্মচর্য্যার তুল্য ভাবিয়া প্রাণপণে কর্ত্তব্য পালন করিয়া বিগত ১লা জানুয়ারিতে অবসর গ্রহণ করিয়াছি।

গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে বাঙ্গালা শেখা হয় নাই। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম দুই বৎসর যাঁহার কাছে বাঙ্গালা পড়িয়াছিলাম তিনি বাঙ্গালী বটে, কিন্তু বাঙ্গালা জানিতেন না। তথাপি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় আটক পড়িতে হয় নাই। বাঙ্গালার পরীক্ষা শব্দ-গত না হইয়া এত অর্থ-গত হইত। তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে পণ্ডিতবর কৃষ্ণকমল বাঙ্গালা পড়াইয়াছিলেন। ভালই পড়াইয়াছিলেন। কিন্তু গোড়া কাঁচা ছিল, তাঁহার অধ্যাপনায় বিশেষ ফল পাই নাই। তিনি ও সংস্কৃতে বেশ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমাদিগকে সংস্কৃত শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত আমাদের পরীক্ষার্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সুতরাং উহাতে তত মনোযোগী না হইয়া, পাঠ্য নয় এমন ইংরাজী পুস্তক বহুল পরিমাণে পড়িতাম। ইংরাজীতে বেশী আকৃষ্ট হওয়ায় মনটাও কতক ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছিল। একদিকে যেমন দেব দেবীতে বিশ্বাস ঘুচিয়া গিয়াছিল, অন্যদিকে তেমনই বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত। যখন বি-এ পাস করি নাই তখন ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের Bengalee কাগজে লিখিতাম। এম্-এ পাস করিয়াই On the Life and Character of Oliver Cromwell নামক একটী প্রবন্ধ পড়িয়া ছাপাইয়াছিলাম। এইরূপ যাহা লিখিতাম,

ইংরাজীতেই লিখিতাম। বঙ্গদর্শন পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি ; কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গলায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিবিউ নামক ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীব বাবুর হাতে। বঙ্গদর্শনে অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু লিখিবার পূর্ব্বেই আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ বাল্মীকি প্রেস যে বাড়ীতে ছিল বাল্মীকির রামায়ণের অনুবাদক আমার ঋষিতুল্য বন্ধু পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেই বাসায় থাকিতেন। তাঁহার অনুবাদ কার্য্য তখন চলিতেছিল। প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় আমরা দুই চারিজন তাঁহার নিকট যাইতাম এবং রাত্রি দশটা এগারটা পর্য্যন্ত সাহিত্য শাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতাম। অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনা ও হইত। শকুন্তলা তত্ত্ব লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছা ও হয় নাই—এখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছা হইয়াছে। লিখিতে হইলে মাতৃভাষায় লেখার ন্যায় অন্য কোন ভাষায় লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি তখন যাহা লিখি তাহা সম্মুখে মূর্ত্তিমান দেখি ; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন এক খানা পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।

যখন কালেজে পড়ি, তখন আমার দেবদেবীতে বিশ্বাস ছিল না, আমি সত্যধর্ম্ম খুঁজিতাম। তখন কেশব বাবুর ধর্ম্মান্দোলনের ধূম পড়িয়াছিল; অনেক যুবক তাঁহার চেলা হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সি কালেজে আমার সঙ্গে তাঁহার কয়েক জন উদ্যমশীল চেলা পড়িতেন। আমি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্ম সমাজে যাইতাম—কেশব বাবুর বক্তৃতা শুনিতাম। কিন্তু তাহাতে Reed, Hamilton, Kant, Victor Cousin প্রভৃতি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের কথাই অধিক থাকিত, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না তাহার পর অগষ্ট কোমতের দুই এক খানা

গ্রন্থ পড়ি এবং স্বর্গীয় মহাপুরুষ দ্বারকা নাথ মিত্রের সহিত বন্ধুত্ব হয়। দেখিলাম কোমতের প্রণালীতে আমাদের সমাজ প্রণালীর অনেক সমর্থন আছে। বড় আহ্লাদ হইল, কিন্তু কোমতের ঈশ্বর নাই দেখিয়া তাঁহাতে আমার তৃপ্তি হইল না। দ্বারকানাথকে বলিলাম। মহামনা মহাপুরুষ বলিলেন,—তবে জোরে ঈশ্বরকে ধরিয়া থাক। আবার সত্যধর্ম্ম খুঁজিতে লাগিলাম। ইংরাজীতে দেখিতাম, ইংরাজের মুখে শুনিতাম, Religion কেবল ঈশ্বর লইয়া, আর কিছু লইয়া নয়। ভাবিতাম— তবে ঈশ্বর ছাড়া এই যে এত বস্তু ব্যাপার রহিয়াছে ইহাদের সহিত তবে কি মানুষের কোন ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ নাই? বঙ্কিম বাবুর বাসায় প্রতি রবিবার আমরা এই সকল আলোচনা করিতাম। সেই সময় পূজনীয় শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণির নাম শুনা গেল। ইন্দ্রনাথকে বলিয়া বঙ্কিম বাবু চূড়ামণি মহাশয়কে একদিন আপন বাসায় আনাইলেন। চূড়ামণি মহাশয় ধর্ম্ম কথা কহিলেন। তিনি যেমন বলিলেন—ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম, অর্থাৎ, যাহা ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম—অমনি আমার সকল সংশয় দূর হইল, বিশ্বে যাহা কিছু আছে সকলই ধর্ম্মের অন্তর্গত দেখিলাম, বিশ্বে যাহা কিছু আছে বিশ্বনাথ হইতে তাহা স্বতন্ত্র রাখিয়া দিলে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায় না বুঝিলাম, কারণ বিশ্ব তাহা হইলে আমাদিগকে রক্ষা না করিয়া বিনাশই করে; যাহা এত অন্বেষণে পাই নাই তাহা পাইলাম। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। পূর্ব্বে যখন দেব দেবীতে বিশ্বাস ছিল না ইংরাজী ভাবাপন্ন ছিলাম, তখন আমাদের সবই মন্দ মনে হইত। ঠিক মনে নাই, বোধ হয় ১৮৭৭ সালে Bethune Society নামক সভায় High Education in India নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের জাতিভেদ প্রণালীর নিন্দা করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর শাস্ত্রের কথা শুনিয়া এবং সামাজিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐ প্রণালীর যৌক্তিকতা বুঝিয়াছিলাম। বুঝিয়া অক্ষয়চন্দ্রের "নবজীবনে" জাতীয় চরিত্র ও বর্ণভেদ প্রণালী শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। উহা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বলিয়াছিলেন—"আমিও জাতিভেদটাকে অতি জঘন্য জিনিস

মনে করিতাম, কিন্তু তোমার প্রবন্ধ পড়িয়া আমার মত উল্টাইয়া গিয়াছে।” নবজীবনের ঐ প্রবন্ধটী মৎপ্রণীত ত্রিধারানামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহার প্রায় সমস্তই ক্রমে ক্রমে পুস্তকাকারে শকুন্তলাতত্ত্বে, ফুল ও ফলে, ত্রিধারায়, হিন্দুত্বে, সাবিত্রীতত্ত্বে প্রকাশিত করিয়াছি। কঃ পন্থাঃ শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলাম। হিন্দু সভ্যতা এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে কোন্‌টী মনুষ্যোচিত, উহাতে এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি নামক একটী প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পাঠ করিয়াছিলাম। পরিষৎ তখন রাজা বিনয়কৃষ্ণের বাটীতে ছিল এবং দ্বিজেন্দ্রবাবু উহার সভাপতি ছিলেন। কি জন্য উহা পরিষৎ পত্রিকায় সন্নিবিষ্ট হয় নাই বলিতে পারি না। আমি উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছি। সাধু ও অসাধু দুই প্রকার বাঙ্গালা ভাষার মধ্যে বঙ্গের সকল স্থানের সুবিধা ও উন্নতির জন্য এবং বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রকার একতা বর্দ্ধনার্থ সাধু ভাষাই অবলম্বনীয়, এই প্রবন্ধে এই মত স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। একখানি জাতমাত্র মৃত মাসিক পত্র ভিন্ন এ পর্য্যন্ত আর কোথাও এ প্রবন্ধের প্রতিবাদ দেখি নাই। উক্ত পত্রের প্রতিবাদ অনেক চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। অথচ বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তখনও যেমন অসাধু ভাষার ব্যবহার করিতেন এখনও তেমনই করিতেছেন। হিন্দুত্বে হিন্দুর মানসিক বিশেষত্বের এবং সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছি এবং জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু বিবাহ প্রণালী, সাকার পূজা প্রভৃতির যৌক্তিকতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। যে সকল স্থানে এই সকল মতের প্রতিবাদ দেখিব মনে করিয়াছিলাম সে সকল স্থানে এপর্য্যন্ত প্রতিবাদ দেখি নাই। অথচ এই সকল মত গৃহীত হইবার লক্ষণ কোথাও দেখি না। ‘বেতালে বহুরহস্য’ সম্বন্ধে এখন কোন কথা বলিতে পারি না—আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কালীময় ঘটক।

সন ১২৪৭ সালের কোজাগর রজনীতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত রাণাঘাট গ্রামে কালীময় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। ইহাঁরা বন্দ্যোবংশীয় রাঢ়ী শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ। যে সময়ে সমাজ মধ্যে ঘটকদিগের যথেষ্ট সম্মান ছিল, কালীময়ের পিতামহ সেই সময় ঐ উপাধি লাভ করেন।

রাণাঘাটেই গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ইহাঁর প্রথম শিক্ষারম্ভ। তৎকালে ইহাঁদের সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল না, তাহারই ফলে কালীময়ের লেখা-পড়ায় সময় অতিবাহিত করা অধিক দিন ঘটিয়া উঠিল না। শিক্ষা আরম্ভের ৫।৬ বৎসর পরেই ইহাঁর পিতা ইহাঁকে জমীদারি সেরেস্তায় কার্য্য শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলেন। পিতৃকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া কালীময় সে কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তিনি পাঠাভ্যাসে আদৌ বিরত হইলেন না। অবসর মত অনেক সময়ই লেখা-পড়ার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন। এমন কি, এই সময় প্রায় দুইশত পৃষ্ঠায় একখানি গণিত পুস্তক ইনি স্বহস্তেও অনুলিপি করেন।

কালীময়ের পিতা এ সকল কথা শুনিলেন। লেখা-পড়ায় এতাদৃশ অনুরাগী পুত্রকে লেখা-পড়ার চর্চ্চা হইতে বিরত করিয়া ভাল করেন নাই; ইহাও অনেকবার ভাবিলেন। ভাবিয়া শেষে তাহাঁকে আবার পড়ান স্থির হইল। কালীময় আবার রাণাঘাট স্কুলে ভর্ত্তী হইলেন।

এই ছাত্র-জীবনে সংসারের অনেক কার্য্যেই কালীময়ের অনুরাগ লক্ষিত হইল। সূত্রধর, দরজি, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি শিল্পদিগের অনেক

কার্য্যই কালীময় অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। মজুরেরা তাহা দেখিয়া বলিতে লাগিল,—"ঠাকুর, সব তাতেই পণ্ডিত।" কিন্তু এ সকল করিলেও প্রধান কার্য্য—বিদ্যাশিক্ষা কালীময় অতি মনোযোগ সহ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাণাঘাটের পড়া শেষ করিয়া ইনি হুগলি-নর্ম্মাল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৎকালে নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। অত্যল্প বয়স ও প্রশস্ত প্রতিভাময় কপোলে কালীময় তাঁহার বড় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সুশিক্ষা গুণে দেড় বৎসর মাত্র অধ্যয়ন করিয়াই কালীময় নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের শেষ-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

এইবার কালীময়ের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্রের সময় উপস্থিত হইল। নদীয়া জেলার ভালুকা গ্রামের বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে ইনি প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র, মুখ-মণ্ডলে শ্মশ্রুগুম্ফের চিহ্নমাত্র উঠে নাই। প্রথমতঃ এই কারণে বিদ্যালয়ে বড় গোলযোগ বাধিল। কারণ ছাত্রদিগের মধ্যে কয়েকজন তাঁহার অপেক্ষা অধিক বয়স্ক ছিল। কিন্তু কালীময়ের জ্ঞান গম্ভীর ভাবপূর্ণ কয়েকটি কথা শুনিয়াই বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা নিশ্চিন্ত হইলেন, আর কোনো গোলযোগ বাধিল না। ইহার তিন চারি বৎসর পরে ইনি বর্দ্ধমান জেলার বেলেড়া নামক গ্রামের বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত হন। তাহার পর তাঁহার আর চাকুরি করা ভাল লাগিল না; জন্মভূমি রাণাঘাটে আসিয়া তত্রত্য জমীদার পাল চৌধুরীদিগের সাহায্যে স্বীয় বাটীর সন্নিকটে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে যশোহরের অন্তঃপাতী বারাকপুর গ্রামের প্রেমচাঁদ তর্কালঙ্কারের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কালীশ্বরী দেবীর সহিত ইহাঁর পরিণয় হয়।

ক্রমে ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা অত্যধিক হইল। ৪।৫ জন অধস্তন শিক্ষকও এজন্য নিযুক্ত করিতে হইল। এই সময় মজুর ও ব্যবসায়িগণের শিক্ষার জন্য একটি "নৈশ বিদ্যালয়"ও স্থাপন

করেন। রাণাঘাট বালিকা-বিদ্যালয়ের ভারও এই সময় ইহাঁর হস্তে ন্যস্ত হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা বিদ্যালয়টি, তদানিন্তন ইনেস্পক্টার মিষ্টার গ্যারেট ও সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর উদ্যোগে রাণাঘাটের ইংরাজী বিদ্যালয়টির পরিপুষ্টি কল্পে তাহার সহিত মিলিত হইল। কালীময়ের "পদ্যময়" পুস্তক এই সময় লিখিত।

ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে রাণাঘাট নিবাসী শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক ইহাঁর জনৈক ডেপুটি বন্ধুর দেহান্তর হয়। তদুপলক্ষে "মিত্র বিলাপ" লিখিত হয়। ইহার পরে কৃষি-প্রদর্শনী উপলক্ষে "মেলা" নামক একখানি ক্ষুদ্র কাবতা পুস্তক লিখেন। তাহার পর চরিতাষ্টকের ১ম ও ২য় ভাগ লিখিত হয়। ইহার পর কালীময়ের একটি পুত্র সন্তান হইল। সেটি মুক ও বধির। কালীময়ের "ছিন্নমস্তা" উপন্যাস খানি সেই সময় সেই কারণে লিখিত। ঐ মুক সন্তানের প্রতিচ্ছায়া সেই পুস্তকে অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার পর ইহাঁর "কৃষিশিক্ষা" ও "কৃষিপ্রবেশ" লিখিত। ইহারপর রাণাঘাটের জমীদার সুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরীর জীবন বৃত্তান্ত লইয়া "সুরেন্দ্র জীবনী" লিখিত। ইহাই তাহাঁর শেষ গ্রন্থ।

সন ১৩০৭ সালের ৩রা আষাঢ় রাত্রি ৮টা ৪১ মিনিটের সময় ৬০ বৎসর বয়সে ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

ইহাঁর তিনটি পুত্র। প্রথম জ্ঞানানন্দ, ২য় ধ্যানানন্দ, ৩য় কৃষ্ণানন্দ। ১মটি মুক ও বধির। ১মটিকে লইয়া অপর দুইভ্রাতা কলিকাতায় অবস্থিতি পূর্ব্বক কর্ম্মাদি করিয়া থাকেন।

কালীময়ের "চরিতাষ্টক" বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এ পুস্তক বহুসংখ্যক বিদ্যালয়ে বহুকাল ধরিয়া পঠিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ চরিতাষ্টকের উপাদান সংগ্রহ করিতে ইহাঁকে অসাধারণ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শুনা যায় ইনি বহুব্যয় ও ক্লেশ স্বীকারে একখানি শতধা চূর্ণ প্রস্তর ফলক পাইয়া, একমাস কাল রাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক তদ্বারা বর্ণমালার সংযোজন ও একটি জীবনীর সন তারিখ সংগ্রহ করেন। এইরূপ প্রভূত চেষ্টার ফলেই কালীময়ের "চরিতাষ্টক" আজি বহুজন সমাদৃত।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক।



ইহাঁর জন্মস্থান কলিকাতা পঞ্চাননতলা সেকেণ্ড লেন্—এই স্থানে ১৮৩২ সালের ৬ই জুনে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। হুগলি খাঁটিয়া বাজারেই কিন্তু ইহাঁর অধিবাস। ইনি হিন্দু, এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের একটী বিখ্যাত ছাত্র; মাসিক ৪০৲ টাকা করিয়া দুই বৎসর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ইহাঁর ইস্কুলে মাহিয়ানা বাবত সাকল্যে পিতার ৬৲ টাকা মাত্র ব্যয় হইয়াছিল—ইহার বেশী এক পয়সা তজ্জন্য তাহাঁকে ব্যয় করিতে হয় নাই।

লর্ড অক্ লাণ্ডের আদেশানুসারে ১৮৪০ সালে সর্ব্ব প্রথম কলিকাতায় একটি বাঙ্গলা ইস্কুল সংস্থাপিত হয়। এখনও এই বিদ্যালয় টি বর্ত্তমান, আদর্শ বাঙ্গলাবিদ্যালয় নামে এখন ইহা কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুল সহ সংযুক্ত। ইনি সর্ব্ব প্রথম এই স্কুলে প্রবেশ করেন। এই স্কুলে দুই বৎসর থাকিয়া—হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে হিন্দু কলেজে যাইয়া অবশেষে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া-শুনা করিয়া অধ্যয়ন সমাধা করেন।

গবর্ণমেণ্টের ১৮৪৪ সালের ১০ই অক্টোবরের প্রস্তাবানুসারে তিনি এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের আর দুইটি ছাত্র সরকারী উচ্চ কাজের জন্য মনোনীত হন। ১৮৫৩ সালে তিনি বাঁকুড়া জেলার স্কুল সমস্ত দেখিবার জন্য ডেঃ ইনেস্‌পেক্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যে-সে নন,—শিক্ষা বিভাগের কয়েকটি মহার্হ রত্ন—অর্থাৎ বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি আই, ই, হজসন্ প্রাট্ এবং মেডলীকট সাহেব তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।

সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টারের পদের সৃষ্টি হইলে ১৮৭৭ সালে তিনি সর্ব্ব-প্রথম তৎপদ প্রাপ্ত হন, পরে স্কুল ইনস্পেক্টার নিযুক্ত হন এবং প্রভূত যশের সহিত ৩৬শ বৎসর সরকারী কার্য্য করিয়া ১৮৯২ সালের জুন মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৬৩ সালে তিনি বাঙ্গালাতে রণজিৎ সিংহের জীবনী লথেন। এই তাহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। ইহা ১৮৬১ সালে ইংরাজী বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হয়।

১৮৭১ সাল হইতে সুরু করিয়া ১৮৯৪ সালের মধ্যে তিনি গণিতের পাঁচখানি বাঙ্গলা পুস্তক লেখেন ও প্রচার করেন। তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত বাঙ্গালা জ্যামিতি সম্বন্ধে অন্যান্যের মধ্যে ইংলিস ম্যান পত্রিকা সম্পাদক বলেন, "ইউক্লিডের জ্যামিতি খানি বিশুদ্ধ এবং পূর্ণাবয়ব সংস্করণ।" প্রখ্যাত সিভিলিয়ান্ কোলিয়ার সাহেব তৎসম্বন্ধে বলেন. "ছাত্রদের পড়িবার উপযোগী ইহা অপেক্ষা ইউক্লিডের ভাল জ্যামিতি হইতে পারেনা।" তাঁহার ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে কলিকাতা রিভিউ সম্পাদক বলেন, "পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের তথ্য গুলি সহজ ও সুন্দর ভাবে দেশীয়দের সম্মুখে তিনি সমুপস্থিত করিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি তাঁহাদের ধন্য বাদার্হ হইয়াছেন।"

বলিতে কি, বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং বাবু ব্রহ্ম মোহন মল্লিক বাঙ্গলার পাশ্চাত্য গণিতের কতকগুলি পুস্তক রচনা এবং প্রচার করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে যেন একটি নব যুগ সমুপস্থিত করিয়া দিয়াছেন।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

ঠাকুরদাস বাবু,—"বালকের" সুনিপুণ মালাকর,—"পাক্ষিক সমালোচকের" পরিপক্ক সম্পাদক,—নবজীবন, সাধারণী, নব্যভারত সাহিত্য সাধনা, প্রচার প্রবাহ প্রভৃতি বহু সুবিখ্যাত সাময়িক পত্রের সমাদৃত সন্দর্ভ-লেখক, এবং নবীন ভাষা-ছাঁচের বিশিষ্ট প্রবর্ত্তক। ইহার "সাহিত্য মঙ্গল" "সাত নরী" "উদ্ভট কাব্য" "শারদীয় সাহিত্য" এবং "বিডন-বালা" সাহিত্য-রত্নাকরে মরকত মণি। ইহাঁর রচনা স্বভাবতঃ অনুপ্রাস-বহুল। অনর্গল অনুপ্রাসে কচিৎ কদাচিৎ ইহাঁর রচনা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া উঠে বটে, কিন্তু প্রায়ই, ইহাঁর প্রবন্ধ সুখপাঠ্য।

১২৫৮ সালের আষাঢ় মাসে বৃহস্পতিবার উনি জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মস্থান খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার অধীন সারসা গ্রাম। সারসার পাদ মূল বিধৌত করিয়া, কল-নাদিনী কপোতাক্ষী প্রবাহিতা। পরপারে,—সাগর দাঁড়ি,—মাইকেল মধুসূদনের সাধের ভূমি—সাগর দাঁড়ি। ঠাকুরদাস বাবুর পিতার নাম নবকুমার মুখোপাধ্যায়। ইহাঁরা সর্ব্বানন্দী মেল।

চৌদ্দবৎসর বয়সে ঠাকুরদাস বাবুর পাঠ আরম্ভ। অতঃপর, ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গার ইংরেজী স্কুলে তাঁহার অধ্যয়ন। প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই তাঁহার স্কুলের পাঠ শেষ। কিন্তু অধ্যয়ন-স্পৃহা আমরণ তাঁহার সম্যক্ বলবতী ছিল।

সারসার মাইনর স্কুলে হেডমাষ্টারী—তাঁহার প্রথম চাকুরী। অতঃপর, ছাপরা স্কুলে শিক্ষকতা। ১৮৭৬ সালে তিনি দ্বারবঙ্গে কোর্ট-অব-ওয়ার্ডে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাহার পর, বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে আড়াই বৎসর কাল চাকুরী। ইহার পর, দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্টেটে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। "বঙ্গনিবাসীর" সম্পাদকতাও কিছুদিন করেন। ফলে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে তাঁহার জীবনস্রোত একান্ত বিভিন্ন-গতি হইয়া উঠিয়াছিল। ইদানী ইনি যশোহর চৌগাছার ঘোষ বাবুদের বাটী ম্যানেজারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। সেই খানেই পীড়াক্রান্ত হন; চিকিৎসার জন্য কলিকাতা কাঁটাপুকুরে সপরিবারে অবস্থান করিতেছিলেন। ডাক্তারেরা বলেন,—তাঁহার রোগ,—এলবুমেনোরিয়া, এই রোগই তাঁহার কাল হইল। এই রোগেই ১৩১০ সালের ১১ই কার্ত্তিক বুধবার তাঁহার দেহান্তর হইয়াছে। অর্থসম্বল তিনি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বুঝি, বাণী-সেবার ইহাই সার্ব্বভৌমিক নীতি, "যেজন সেবিবে ও পদযুগল—সেই সে দরিদ্র হবে।"

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী

বাঙ্গলা সন ১২৬৫ সালের ২৩ কার্ত্তিক তারিখে জেলা নদীয়ার অন্তঃপাতী শান্তিপুর গ্রামে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ীর জন্ম হয়। শান্তিপুর জগদীশচন্দ্রের মাতুলাশ্রয় এবং জেলা নদীয়ার অন্তর্গত পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী শিবনিবাস ষ্টেসনের সন্নিকট মাজদিয়া নামক গ্রাম তাঁহার পৈতৃক বাস স্থান। জগদীশচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যদিও নীলকুঠী আদি কারবারে প্রভূত ধন সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার পিতামহ মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি নানা কারণে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। এই কারণে জগদীশচন্দ্রের পিতা ৺ উমাচরণ লাহিড়ী পল্লী-গ্রামস্থ মধ্যবিত্ত লোক ছিলেন মাত্র এবং পৈতৃক যে সামান্য জমী জমা ছিল, তাহার আয় ও চাকুরীর আয় হইতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। ৺উমাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা ছিল। পুত্র-গণের মধ্যে নৃত্যগোপাল সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ, পুলিনবিহারী মধ্যম এবং জগদীশ চন্দ্র কনিষ্ঠ। উমাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবদ্দশাতেই খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ৺লোকনাথ মৈত্রের সহিত তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ হয়। কনিষ্ঠা কন্যা পিতার মৃত্যুর লোকান্তরের পর অগ্রজ নৃত্যগোপাল কর্ত্তৃক সুপাত্রে বিবাহিতা হয়েন।

জগদীশচন্দ্র, জন্মের কয়েক মাস পরেই পিতৃভবনে আনীত হইয়া লালিত পালিত হয়েন এবং পঞ্চম বর্ষ বয়সে উপনীত হইলে মাজদীয়া গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে তাঁহার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তখন তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ নৃত্যগোপালের বয়ক্রম ১৬ বৎসর মাত্র এবং তখনও তাঁহার পাঠাবস্থা। এই ঘটনায় নৃত্যগোপালকে পড়া-শুনা ত্যাগ করিয়া সংসার প্রতিপালন জন্য চাকুরী স্বীকার করিতে বাধ্য হইতে হয়। পিতার মৃত্যুকালে জগদীশচন্দ্রের পিতামহী জীবিতা ছিলেন। তিনি সঙ্গতিপন্ন পিতার একমাত্র কন্যা ছিলেন এবং পিতার পরলোকের পর পিতৃসম্পত্তি উত্তরাধিকারিণী হইয়া পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে বাস করিতেন। জগদীশচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর পর

তাঁহার পিতামহী তাঁহাকে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুলিনবিহারীকে নিজ পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে লইয়া যান এবং উভয় ভ্রাতা তথায় থাকিয়া তথাকার ইংরাজী স্কুলে পাঠাভ্যাস করিতে থাকেন। এ দিকে নৃত্যগোপাল চাকুরীর দ্বারা নিজের মাতা, ও কনিষ্ঠা ভগ্নীর ভরণপোষণ এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের পড়াশুনার আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে থাকেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগ্নীপতি লোকনাথ মৈত্রের উপদেশ ক্রমে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিতে থাকেন।

ইংরাজী ১৮৭৫ সালে কলিকাতা মহানগরের শ্যামবাজার ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার মৈত্র মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত জগদীশ-চন্দ্রের বিবাহ হয়। ইহার অব্যবহিত পরে তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া পড়া-শুনা করিতে আরম্ভ করেন এবং হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র উক্ত স্কুল হইতে এণ্টান্স পরীক্ষা দিয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন এবং ইহারই দুই বৎসর পরে কলিকাতার ডফ কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হয়েন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, জগদীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা নৃত্যগোপাল চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে ক্রমশঃ হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করিয়া কিছু দিন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎ-সকের ব্যবসা করেন। বলা বাহুল্য, বিদ্যার অনুরূপ অনেক সময়ে অর্থোপার্জ্জন হইয়া উঠে না, বিশেষতঃ ব্যবসায়ের প্রথম অবস্থায় উপার্জ্জন অল্পই হইয়া থাকে। নৃত্যগোপালেরও সেইরূপ হইল, কিন্তু তাঁহার ব্যয় অধিক—নিজের ব্যয়,—মাতা-ভগ্নী প্রভৃতির ভরণ পোষণের ব্যয়, ভ্রাতাদের পড়াশুনার ব্যয়। ব্যবসায়ের আয় হইতে নৃত্যগোপালের সকল ব্যয় কুলাইয়া উঠিল না, অগত্যা তিনি পুনরায় চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাহা হউক, এই ঘটনায় জগদীশচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য স্থিরীকৃত হয়। লোকনাথ মৈত্র ও নৃত্যগোপালের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অদ্ভুত ফল দেখিয়া হোমিওপ্যাথির উপর তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার বিশেষ

অনুরাগ হয়। এই কারণে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সন ১৮৭৯ অব্দে কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি এত উৎসাহে পড়িতে থাকেন যে, যত দিন তিনি মেডিকেল কলেজ পড়িয়াছিলেন, তত দিন সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক বাৎসরিক পরীক্ষাতেই বৃত্তি পাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ জগদীশচন্দ্রের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালেই নৃত্যগোপালের মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় জগদীশচন্দ্রকে বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। যাহা হউক, জগদীশচন্দ্র যে বৃত্তি পাইতেন, তদ্বারা ও বক্রী কর্জ্জ দ্বারা অতি কষ্টে পড়া-শুনা চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের উপর দুর্ভাগ্য! তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি শ্বাস রোগগ্রস্ত হইলেন। ইহাতেও তিনি পাঠ ত্যাগ করিলেন না; অসাধারণ পরিশ্রমের সহিত তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু জাগতিক কার্য্য মনুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে। পরীক্ষার পূর্ব্বে সন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পীড়া এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল যে, তিনি কোন মতেই পরীক্ষা দিতে পারিলেন না, এই সময় এইরূপে স্বাস্থ্যভগ্ন হওয়ায় তাঁহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করিতে হয়। এক বৎসরকাল নানারূপ চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনাদির দ্বারা কিঞ্চিৎ আরোগ্যলাভ করিলে, জগদীশচন্দ্র পুনরায় মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু চিকিৎসকগণের পরামর্শ অনুসারে অনিয়মিত ছাত্র স্বরূপে (Ex Student) পড়িতে লাগিলেন। এক বৎসর এইরূপভাবে পড়ায় তাঁহার পাঠ সমাপ্ত হয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন। ভারতবর্ষে হোমিওপ্যাথির বিস্তারই জগদীশচন্দ্রের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই নিমিত্ত তিনি প্রথমতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের কার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অকৃত্রিম হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রাপ্তির সুবিধার জন্য তদীয় অনেক বন্ধুর সহিত অংশীদারীতে লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানীর নাম দিয়া কলিকাতা কলেজ স্কয়ার ১৪ নং বাটীতে এক হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। এই লাহিড়ী কোম্পানীর ঔষধালয় এক্ষণে কলিকাতার ১০১ নং কলেজ ষ্ট্রীটে অবস্থিত এবং কলিকাতায় ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে ও পাটনা, বাঁকীপুর, মথুরা প্রভৃতি দূর প্রদেশে ইহার শাখা প্রশাখা সকল প্রসারিত হইয়া দেশবাসী সকলেরই সুপরিচিত। উক্ত ঔষধালয় সম্বন্ধে কিছু বলা অনাবশ্যক, তবে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, উক্ত ঔষধালয়ের বর্ত্তমান অবস্থা কেবল জগদীশচন্দ্রের অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল। এই সময়ে জগদীশচন্দ্রের মন দুইটী বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তিনি দেখিলেন, সাধারণে হোমিওপ্যাথির উপকার না বুঝিলে হোমিওপ্যাথির বিস্তারের সম্ভাবনা নাই। সাধারণকে হোমিওপ্যাথি শিখাইতে হইলে সাধারণের উপযোগী হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে পুস্তক রচনা ও যাহাতে পল্লীগ্রামের লোক সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পাইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। জগদীশচন্দ্রের লেখার অভ্যাস পাঠাবস্থা হইতেই ছিল, তাহারই ফলে সময়ে সময়ে অনেক সংবাদ ও মাসিক পত্রে তিনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ ঐ সকল প্রবন্ধের কোন সংগ্রহ নাই। যাহা হউক, জগদীশচন্দ্র এক্ষণে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে সুশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা মেডিকেল স্কুলে শিক্ষক স্বরূপে যোগদান করিলেন। বাঙ্গালা ১২৯২ সালের অগ্রহায়ণ মাসে "হোমিও-প্যাথি মতে গৃহ চিকিৎসা" নামক জগদীশচন্দ্রের প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। যাহাতে সর্ব্ব সাধারণ পরিবার বর্গের সামান্য পীড়ায় হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় ফললাভ করিতে পারে, ইহাই এই পুস্তক লেখার উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর পুস্তকের মধ্যে এই পুস্তকই সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্বোৎ-কৃষ্ট। ইহার ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্জল যে, স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত এই পুস্তক পড়িয়া চিকিৎসা করিতে পারেন। অল্পদিনেই ইহা জন-সমাজে এতদূর আদৃত হয় যে, ইহা প্রকাশিত হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যেই তাঁহাকে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হয়। জগদীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুস্তক "হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে আপত্তি খণ্ডন।" "গৃহ চিকিৎসা" প্রকাশিত হওয়ার পর জগদীশচন্দ্র দেখিলেন, হোমিওপ্যাথির মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকেই সন্দিহান। এই কারণে তিনি এই পুস্তকে হোমিওপ্যাথির বিপক্ষে যে সকল আপত্তি হইতে পারে, তাহা ক্রমশঃ

উত্থাপিত করিয়া তর্কযুক্তি দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তক প্রকাশিত হয়। হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যাঁহাদের অবিশ্বাস আছে, অথবা যাঁহারা হোমিওপ্যাথি শিক্ষার্থী, তাঁহাদের এই পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহার ভাষা অতি সুন্দর ও প্রাঞ্জল।

এই সময়ে নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি প্রদেশে ওলাউঠায় ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। জগদীশচন্দ্র এই সময়ে স্বীয় সহৃদয়তার গুণে ঔষধাদি বিতরণ দ্বারা সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গলা ভাষায় ওলাউঠা রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করার আবশ্যকতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হওয়ায় তিনি "ওলাউঠা চিকিৎসা" নামক তৃতীয় পুস্তক রচনা করেন। বঙ্গভাষায় হোমিওপ্যাথিতে ওলাউঠা চিকিৎসা সম্বন্ধে পুস্তক ইহাই সর্ব্ব প্রথম এবং পুস্তকখানিও সুন্দর।

হোমিওপ্যাথিক স্কুলে শিক্ষকতা করা কালে জগদীশচন্দ্র দেখেন যে, সুচিকিৎসক হইতে হইলে, নরনারীর তত্ত্বজ্ঞান ও শব-ব্যবচ্ছেদ নিতান্ত প্রয়োজন এবং তদ্ভিন্ন একটী হাঁসপাতাল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের গবর্ণমেণ্ট হোমিওপ্যাথি মত। প্রচারে সেরূপ উদ্যোগী নহেন; ফলে শব-ব্যবচ্ছেদ জন্য গবর্ণমেণ্ট-হাঁসপাতাল হইতে শব সংগ্রহ করা অসম্ভব বিবেচনায় জগদীশচন্দ্র কতিপয় এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও কতিপয় কবিরাজ একত্র করিয়া কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটে একটী স্কুল স্থাপন করেন। উহাতে তিনটী বিভাগ থাকে—একটী হোমিওপ্যাথিক, একটী এলোপ্যাথিক, একটী কবিরাজী। ঐ স্কুল হইতে শব-ব্যবচ্ছেদ জন্য শব পাইবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করা হয় এবং জগদীশচন্দ্র বহু চেষ্টা ও যত্নে ঐ আবেদন মঞ্জুর করেন। এই সময়ে উক্ত স্কুলের ছাত্রদিগের জন্য নরশারীর তত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানাবিধ পুস্তক আলোচন পূর্ব্বক জগদীশচন্দ্র "নরশারীর তত্ত্ব" নামক পুস্তক লেখেন। পুস্তকখানি তদানীন্তন সমস্ত নরশারীর তত্ত্ব বিষয়ক পুস্তকাবলীর সার সঙ্কলন এবং তৎসম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ। দুঃখের বিষয়, জগদীশচন্দ্র অসাধারণ পরিশ্রমে উপরি-উক্ত যে স্কুল স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, পরে নানা কারণে ঐ স্কুল উঠিয়া যায়।

"জ্বর চিকিৎসা" জগদীশচন্দ্রের পঞ্চম পুস্তক। বঙ্গদেশ যেরূপ ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, তাহাতে জ্বর সম্বন্ধীয় চিকিৎসা পুস্তক প্রকাশিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনায় জগদীশচন্দ্র এই পুস্তক লেখেন। ইঁহার অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ইহাও সারকথাপূর্ণ।

উপরোক্ত কয়েকখানি পুস্তক রচনার পর ইংরাজী অনভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যাহাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দ্বারা ফল পাইতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে "চিকিৎসা তত্ত্ব" নামক পুস্তক রচনা করেন। ইহা প্রায় সমস্ত রোগেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইতে গেলে ভৈষজ্যতত্ত্বজ্ঞান অপরিহার্য্য। এই কারণে জগদীশচন্দ্র "ভৈষজ্যতত্ত্ব' নাম দিয়া সুবিখ্যাত ডাঃ হেরিঙ্গ সাহেবের মেটিরিয়া মেডিকার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "সদৃশ চিকিৎসা" নামক সুবৃহৎ "প্র্যাকটীস্ অব মেডিসিন" লিখিতে থাকেন। "ভৈষজ্যতত্ত্ব' একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ।

উল্লিখিত পুস্তকগুলি ব্যতীত জগদীশচন্দ্র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নামে একখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্র ও Indian Medical Record নামে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র অতি দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের শ্বাসরোগের উপর সন ১৮৯১ সাল হইতে তাঁহার বাতরোগ উপস্থিত হয়। উক্ত সালে উক্ত ভীষণ রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ১৮৯৪ সালের নবেম্বর মাসে তিনি পুনরায় ঐ রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহাতে তাঁহার হৃৎপিণ্ড আক্রান্ত হয়; ঐ বৎসর ৭ই ডিসেম্বর রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ৩৭ বৎসর বয়সে ২টী পুত্র, ২টী কন্যা এবং একটী বিধবা স্ত্রী রাখিয়া জগদীশচন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি সাতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন; স্বগ্রামে মাতার নামে একটী দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।



বিজয়কৃষ্ণ নদীয়া-শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশসম্ভূত। পিতা ৺আনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী পরম ধার্ম্মিক অনুরক্ত ভগভক্ত ছিলেন। পিতামহ শান্তিপুর হইতে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডী দিতে দিতে ৺শ্রীক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার দেহাবসান হয়।

পরম পবিত্র কুলে ১২৫১ সালে বিজয়কৃষ্ণের জন্ম। তিনি ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিজয়কৃষ্ণ কৈশোরে উপবীত ত্যাগ করিয়াছিলেন; যৌবনে ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন; আবার প্রৌঢ়ে হরি-পদাশ্রয়ে ফিরিয়াছিলেন। এক জীবনের এত পরিবর্ত্তন; তবুও কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ভক্ত। কর্ম্মফলে প্রকৃত পথ-প্রণালী চিনিতে ভুল হউক,—কর্ম্মফলে বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করুন,—ব্রাহ্ম হউন; বিজয়কৃষ্ণ ভক্ত। জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় অনেক সময় অনেকে ভুল করিয়া ফেলেন। বিজয়কৃষ্ণও ভুল করিয়াছিলেন; তবুও কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ভক্ত।

বিজয়কৃষ্ণের জীবনে আমাদের প্রধান লক্ষ্য,—তাঁহার একাগ্রতা, অকপটতা, "সমদর্শিতা ও নির্ভীকতা। উপবীত ত্যাগে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণে আবার জীবনের শেষ আচরণে,—সর্ব্বত্রই সর্ব্বাবস্থায়, সেই একাগ্রতা, সেই অকপটতা, সেই সমদর্শিতা, সেই নির্ভীকতা, তাঁহার জীবনের প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে পদে পদে ইহারই পরিচয় পাইবেন।

পাঁচ বৎসর বয়সকালে বিজয়কৃষ্ণের পিতৃবিয়োগ হয়। অদ্বৈতবংশের বহু শিষ্য। পিতৃবিয়োগে বিজয়কৃষ্ণকে অবশ্য গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব ভোগ করিতে হয় নাই।

বাল্যকালে বিজয়কৃষ্ণ বার তের বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শান্তিপুরে টোলে পাঠ করিয়াছিলেন। পরে তিনি কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলিকাতার ওপারে সাঁতরাগাছি গ্রামে চৌধুরীদের বাড়ীতে

তিনি আশ্রয় পাইয়াছিলেন। প্রত্যহ সাঁতরাগাছি হইতে তাঁহাকে কলেজে পড়িতে আসিতে হইত এবং পড়িয়া ফিরিয়া যাইতে হইত। তখন গঙ্গার পুল ছিল না। প্রত্যহ নৌকা করিয়া গঙ্গা পার হইতে হইত। বালক বিজয়কৃষ্ণ বাত-বৃষ্টি-বজ্র মানিতেন না। প্রত্যহ এত পথ হাঁটিতে হইত, নৌকা করিয়া পার হইতে হইত; বালক তাহাতে এক মুহূর্ত্তের জন্য কষ্টানুভব করিতেন না। সংস্কৃত কলেজে পড়িতে পড়িতে বিজয়কৃষ্ণের কি যেন কি একটা বিভাব হইত। বালকের প্রাণ যেন কি অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় উদাস হইয়া পড়িত। ন্যায় পড়িবার সময় তাঁহার এই ভাব স্পষ্টই উন্মেষিত হইয়াছিল। বালক বিজয়কৃষ্ণ পরম পবিত্র পিতৃপুর শান্তিপুরে গিয়াও শান্তি পাইতেন না,—তৃপ্তি পাইতেন না। সর্ব্বদা তিনি ম্লানমুখে ভাবময় চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সুস্থ, বলিষ্ঠ, সুন্দর, সুস্মিত বিজয়চাঁদ যেন চিন্তায় রাহুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। একদিন তিনি শান্তিপুরে কোন নির্জ্জন-নিভৃত বৃক্ষমূলে দাঁড়াইয়া আপন প্রাণে একটু অনুচ্চস্বরে বলিয়াছিলেন,—"আমাদের বহু শিষ্য বটে; কিন্তু আমরা কি এই সকল শিষ্যকে মন্ত্র দিবার উপযুক্ত পাত্র? আমাদের ভাব নাই, ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই, বিদ্যা নাই, আমরা কি গুণে এত গুলি লোকের মন্ত্রদাতা হইয়াছি।"

একটী বালক অলক্ষ্যে বিজয়কৃষ্ণের এই কয়টী কথা শুনিতে পাইয়াছিল। সে কথাগুলি শুনিয়া, বিজয়কৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলিল,—"বিজ্‌-দাদা! কি বলিতেছ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন,—"তোকে তা কি বলিব?" বালক হাসিয়া বলিল,—"বিজ্‌দাদা না বলো, আমি কিন্তু শুনিয়াছি। বলি যদি উপযুক্ত নও, তবে ভান কেন? পৈতে কেন?"

বিজয়কৃষ্ণ একবার বিস্মিতনেত্রে বালকের পানে চাহিয়া মনে মনে বলিলেন,—"ঠিক বলিয়াছে। পৈতে কেন? এ ভাণ কেন?" এই কথা বলিয়া বিজয় তৎক্ষণাৎ উপবীত ত্যাগ করিলেন।

মুহূর্ত্তে প্রচার হইল—বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করিয়াছে। সহরে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রামের লোক, বিজয়কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ, অন্যান্য আত্মীয়

এবং মাতাঠাকুরাণী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া বিজয়কৃষ্ণের নিকট আসিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা বিজয়কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বিজয়কৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া, পরে ধীরে ধীরে বিনয়সহকারে বলিলেন,—"আমার কার্য্য আপনাদের চক্ষে নিশ্চিতই দুষ্কৃতি বলিয়া বোধ হইবে। জানি,—আপনারা আমাকে ভর্ৎসনা করিবেন,—আমাকে ত্যাগ করিবেন,—আমাকে গৃহে যাইতে দিবেন না,—আমাকে অন্ন পর্য্যন্ত দিবেন না,—কিন্তু আমি যত দিন না বুঝিব, আমি উপবীত ধারণের যোগ্য হইয়াছি, তত দিন আমি উপবীত গ্রহণ করিব না।"

বিজয়কৃষ্ণের পদস্খলন হইল। আত্মীয়বর্গ তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন, অনেক তিরস্কার করিলেন; বিজয়কৃষ্ণ কিন্তু বাঙনিষ্পত্তি করিলেন না। তিনি নীরবে শান্তিপুর ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণের মাতা বাষ্পাকুলিত লোচনে পুত্রকে আলিঙ্গন করিতে করিতে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষঃ ভাসাইয়া দিলেন। বিজয়কৃষ্ণও কাঁদিলেন। জননী বলিলেন,—"সব যায় যাউক আমি তোমায় ছাড়িব না।" বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন—"মা! আমি অসামাজিকের কাজ করিয়াছি। সমাজে আমার স্থান হইবে না। আমায় ছাড়ুন। আমি যাই।"

মাতাকে অনেক বুঝাইয়া, শান্ত করিয়া, বিজয়কৃষ্ণ রাজসাহীতে গমন করেন। তথায় তিনি একটী আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লন। আত্মীয় তাঁহাকে বলেন,—"বিজ! সমাজে তোমার আর স্থান নাই। তুমি কলিকাতায় গিয়া ব্রাহ্ম দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয় লও।"

বিজয়কৃষ্ণ তাহাই করিলেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রয় লন। অতঃপর তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজে বাঙ্গালা ডাক্তারী শ্রেণীতে প্রবেশ করেন। তিন বৎসর কাল বিজয়কৃষ্ণ এখানে যথারীতি পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। তিনি যখন তৃতীয় বর্ষে পড়েন, তখন কলেজের একটি ছাত্রকে গবরমেণ্ট চৌর্য্যাভিযোগে অভিযুক্ত করেন। ইহাতে সকল ছাত্র বিরক্ত হইয়া উঠে। সকলেই কলেজ ত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হয়। এই সময় ছাত্রদিগের পক্ষ হইয়া ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় তাৎকালিক ছোট লাট

সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারই পরামর্শমতে ছোট লাট বাহাদুর সকল ছাত্রকে আবার কলেজে ফিরিয়া আসিতে বলেন। সকলেই ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ ফিরিলেন না। রাষ্ট্র হইয়াছিল, বিজয়কৃষ্ণই ছাত্রধর্ম্মঘটে পালের গোদা। ফিরিয়া গেলে, কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে সুদৃষ্টিতে দেখিবেন না, তাঁহার কোন কোন আত্মীয় এ কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের কথায় কলেজে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করেন।

অতঃপর তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকের কার্য্যে নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন। ৺কেশবচন্দ্র সেনও তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। তাঁহার একাগ্রতা, অকপটতা, সমদর্শিতা ও নির্ভীকতা দেখিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যমণ্ডলী চমৎকৃত হইতেন। ১২৭১ সালে আশ্বিন মাসে যে ভীষণ ঝড় হইয়াছিল, অনেকের তাহা বোধ হয় স্মরণ আছে। যে দিন ঝড় হয়, সে দিন বুধবার। বুধবার আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার দিন। ঝড়ে সে দিন সমাজে কেহই যান নাই। একা বিজয়কৃষ্ণ মাত্র উপস্থিত ছিলেন। দারুণ ঝড়-বৃষ্টিতে সহর শূন্য; দিকে দিকে বৃক্ষসমূহ উৎপাটিত; ভগ্নগৃহস্তূপ নিপতিত; পথ-ঘাট কর্দ্দমাক্ত; গাছ দুলিতেছে; বাড়ী দুলিতেছে; হাহাকার-আর্ত্তনাদে গগন-মেদিনী কাঁপিতেছে; বিজয়কৃষ্ণের কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি একাকী পদব্রজে পথ চলিয়া সমাজে গিয়াছিলেন। উপাসনার অবসানে ফিরিয়া আসিবার কালে কেশব বাবু পাল্কী করিয়া সমাজে গিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণের এই এক-নিষ্ঠতার কথা শুনিয়া হিন্দুব্রাহ্ম অবাক্ হইয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ আহার-নিদ্রা ভুলিয়া অনেক সময় বক্তৃতা করিতেন, উপাসনা করিতেন প্রচার করিতেন।

কেশব বাবু যখন আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন বিজয়কৃষ্ণও আদি সমাজ ত্যাগ করিয়া কেশব বাবুর সহিত আসিয়াছিলেন। তখন কেশব-বিজয়ে হরি-হর-আত্মা। বিজয়কৃষ্ণের সহিত কেশব বাবুর নিভৃত-নিলয়ে ভগবৎ-কথার আলোচনা হইত। বিজয়কৃষ্ণ কেশব বাবুকে লইয়া খালপারে যাইতেন

এবং তথায় তিনি তাঁহাকে খোলবাদ্যের সঙ্গতসহ বৈষ্ণবের গান শুনাইতেন। তাঁহারই উদ্যোগে কেশব বাবুর সমাজে খোল করতালের প্রবর্ত্তন হইয়াছিল। ভগবদন্বেষণে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন; কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ শান্তি পান নাই। তাঁহার মনে হইত, কি যেন কি নাই, কি যেন কিসের অভাব, প্রাণের গুপ্ত মন্দির হইতে কি যেন কি সরিয়া পড়িয়াছে, কি যেন কিসে খালি হইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ, ব্রহ্মান্বেষী; কিন্তু অশান্তি পূর্ণ। বিনয়ী বিজয়কৃষ্ণ শান্তির ভিখারী। তিনি যখন যেখানে কোন সাধু সন্ন্যাসী সন্দর্শন করিতেন, তখনই তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া ভক্তি গদগদ স্বরে, কাতর-কণ্ঠে করযোড়ে বলিতেন,—"প্রভু! আমায় শান্তি দিন।" কখন কখন তিনি কোন কোন সাধুকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজে আনিতেন। একদিন একটি সাধু ব্রাহ্মসমাজ হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময় বলেন,—"বিজয়! ওযে আকাশে ভিত্তি। গুরু কৈ?" বিজয়কৃষ্ণ চকিতে চমকাইলেন! প্রাণের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহে কি যেন কি একটা উষ্ণোচ্ছ্বাস চলিয়া গেল। সহসা যেন হৃদয়াকাশে পাতলা ভাঙ্গা-মেঘ আসিয়া পড়িল। সংশয় বাড়িল।

একবার কেশব বাবু বিজয়কৃষ্ণকে দারজিলিঙ্গে পাঠাইয়াছিলেন। সেখানে তিনি সর্ব্বদাই সাধুর অন্বেষণ করিতেন। ভাগ্যক্রমে একটী জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধ সাধু পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। সাধুকে দেখিয়া বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলেন এবং দরবিগলিত ধারে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"প্রভু! শান্তি দিন।" সাধু সস্নেহে বলেন,—"বৎস! শান্তি পাইবে, কিন্তু এখনও সময় হয় নাই; শীঘ্রই সে সময় আসিবে।" সাধুর কথায় বিজয়কৃষ্ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

অল্প বয়সে বিজয়কৃষ্ণের বিবাহ হইয়াছিল। উপবীত পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন শান্তিপুর ত্যাগ করেন, তখন স্ত্রীকে শান্তিপুরেই রাখিয়া আসিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ দ্বিধর্ম্ম-প্রবণ হইলেও শান্তিপুর-বাসীরা তাঁহার নানাগুণে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির যথাযোগ্য যত্ন করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ যখন আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন, তখন তিনি শান্তিপুরে গিয়া বৎসর কতক চিকিৎসা-ব্যবসায়

করিয়াছিলেন। তখনও তিনি শান্তিপুরবাসীর স্নেহযত্নে বঞ্চিত হন নাই। কেশব বাবুর সমাজে যোগ দিয়া তিনি স্ত্রীপুত্রাদি কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি প্রচারক-হিসাবে ব্রাহ্মসমাজ হইতে কিছু কিছু সাহায্য পাইতেন। তাহাতে কষ্টে সংসার চলিত। প্রচারকালে তাঁহাকে অনেক সময় ভীষণ অন্নকষ্ট পাইতে হইত; একবার ঢাকায় তাঁহাকে দোপাটীফুল খাইয়া জীবন রক্ষা করিতে হইয়াছিল। তবুও কিন্তু তিনি স্বকর্ত্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেন না। তিনি অকাতর পরিশ্রমে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে প্রচার করিতেন।

অতঃপর কুচবিহারের মহারাজের সহিত কেশব বাবুর কন্যার বিবাহ-প্রসঙ্গে, অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মের মতন কেশব বাবুর সহিত বিজয়কৃষ্ণের মনোবাদ ঘটিয়াছিল। এই মনোবাদসূত্রে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে মাসিক ৪০৲ টাকা পাইতেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইয়াও বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। পরমহংস বিজয়কৃষ্ণকে দেখিলেই প্রেমালিঙ্গন দিতেন। পরমহংসের শিষ্যেরা সংশয়ান্বিত হইলে, পরমহংস বলিতেন,—"বিজয় ব্রাহ্ম বটে; কিন্তু ইহা ইঁহার সাধনপথ নহে; ইনি শীঘ্রই সে পথ পাইবেন।"

পরমহংসের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল। একবার বিজয়কৃষ্ণ গয়ায় প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সেই খানে তিনি এক সিদ্ধ যোগীপুরুষের কৃপা লাভ করেন। বিজয়কৃষ্ণ যোগীর কাছে শান্তি ভিক্ষা করিয়াছিলেন। যোগী তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করেন। ইহাতে তাঁহার দিব্য নেত্র লাভ হয়। অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়াছিল। এই যোগী তাঁহার গুরু হইলেন। তাঁহাকে মন্ত্র দিলেন। এই যোগীপুরুষের সৎপরামর্শে বিজয়কৃষ্ণ কাশীতে পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিয়া, আবার কাশীতে তাহা ত্যাগ করেন। যোগীর কৃপায় বিজয়কৃষ্ণের শাস্ত্রজ্ঞান হইয়াছিল। যে শাস্ত্রকে তিনি ভুল বুঝিতেন, যোগীর কৃপায় তিনি সেই শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিলেন। যোগীর কৃপায় বিজয়কৃষ্ণের জন্মান্তরে বিশ্বাস

লাভ হয়। এ সম্বন্ধে কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মৈত্র মহাশয় নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়াছেন,—

"গয়ার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে যাইবার ইচ্ছা মনে উদয় হয়। ঐ স্থানটী জঙ্গলময়। গয়া হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধান। সন্ন্যাসীরা তথায় অনেক সময় আসিয়া থাকেন। নিকটে লোকের বসবাসও আছে। গোস্বামী একটী লোক সঙ্গে করিয়া ঐ স্থানে যান। তথায় পহুঁছিয়া তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—'আমি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী নহি, অন্য কোন ব্যক্তি।' তিনি বলিতেন,—'বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আমি মনের এই বিচিত্র ভাব দমন করিতে পারিলাম না। সেই স্থানে পহুঁছিবার পর ঐ ভাব মনে আরও প্রবল হইল। নিকটে একটি বৃক্ষতলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; এখানে যে দুইটী সন্ন্যাসী ছিলেন, তাঁহারা কোথায় গেলেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "কিনকী বার পুছতে হাঁয়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "য়ে লোগ তো বহুত পহিলে মর গয়ে।" গোস্বামী আবার বলিলেন, এই স্থানে হনুমানজীর মন্দির আছে।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আগে হাও মিলেগা।" গোস্বামী হনুমানজীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিল। তিনি এবং আর দুই ব্যক্তি সন্ন্যাসী হইয়া এই মন্দিরে বাস করিতেন। যে ঘরে বাস, যে ঘরে শয়ন, যে ঘরে পাঠ, যে ঘরে আহার করিতেন—সমুদয় মনে উদয় হইল। তত্রস্থ সমুদয় গৃহগুলি পর্য্যটন করিয়া দেখিলেন। তৎপরে মনে পড়িল, নিকটস্থ একটি পুষ্করিণীতে তাঁহারা তিন জনে স্নান করিতেন। তিনি সেই পুষ্করিণী ও দেখিলেন। আবার মনে পড়িল—একটি বৃক্ষের গায় তিনি কিছু লিখিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে সেই বৃক্ষটিও পাইলেন। বৃক্ষটী একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ; যখন ছোট ছিল, তখন তাহার ছাল কাটিয়া "ওঁ রামঃ" এই কয়টি কথা লিখিয়াছেন। অক্ষরগুলি এখন বাঁকা-চোরা হইয়া গিয়াছে; তথাপি তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিয়া গুরুকে আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত বলিলেন।"

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করেন। তিনি একবার ঢাকায় প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে উপাসনার পূর্ব্বে চণ্ডীস্তোত্র পাঠ করিতে করিতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অতঃপর জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

পরমহংসের স্পর্শ-সোহাগায় বিজয়-কনকের কালিমা কাটিয়াছিল; গয়ার সাধুর কৃপায় বিজয়কৃষ্ণ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন; সাধুর মন্ত্রবলে বিজয়কৃষ্ণ সাধনধন শ্যামসুন্দর পাইয়াছিলেন। শুনিতে পাই, শান্তি-পুরের বিগ্রহ শ্যামসুন্দর বিজয়ের হৃদয় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া-ছিলেন। বিজয় শ্যামসুন্দরকে ভুলিয়াছিলেন; কিন্তু শ্যামসুন্দর বিজয়কে ভুলেন নাই। এইরূপ প্রকাশ, শ্যামসুন্দর বাল্যে বিজয়কে স্বপ্নে দেখা দিতেন, নিত্যলীলায় সত্য তথ্য দেখাইতেন। পুরোহিত জল দেয় নাই, স্নান করান নাই, শ্যামসুন্দর স্বপ্নে বিজয়কে সকল কথা শুনাইতেন। স্বপ্নে বিজয়কৃষ্ণের কাছে; "শ্যামসুন্দর" চূড়া চাহিতেন।

বিজয় গৈরিক বসন পরিলেন, জটাজুট রাখিলেন, মালা ধরিলেন; আবার করুণায় কাঁদিয়া শ্যামসুন্দরকে হৃদয়ে বসাইলেন। বিজয় হরি-প্রেমে পাগল হইলেন। যেখানে হরিপ্রসঙ্গ, যেখানে হরির কথা, সেই খানে বিজয়! গয়ার যে পথে গৌরাঙ্গ গিয়াছিলেন, বিজয় সেই পথে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন। হরিনামে বিজয় উন্মত্ত।

বিজয়কৃষ্ণ সাধু সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকে আহার করাইতেন বস্ত্রদান করিতেন। দানে দেনা হয়, হরি-কৃপায় দেহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহার দেনা পরিশোধ হইয়াছিল।

পবিত্র পুরীধামে ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ বলিতেন,—"গৌরাঙ্গ আঠার বৎসর নীলাচলে স্থান পাইয়া-ছিলেন; আমি অন্ততঃ আঠার মাস স্থান পাইব না।" তিনি পনের মাস কাল পুরীতে ছিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বহু শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর প্রণীত "ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর" গ্রন্থ শত শত জনের অতীব আদরের সামগ্রী।

রামচন্দ্র দত্ত।



রামচন্দ্র দত্ত এই কলিকাতা নগরেরই উপকণ্ঠ নারিকেল ডাঙ্গায় ১৭৭৩ শকাব্দে বা ১২৫৮ সালে,—১৮৬১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতা ৺ নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত, পিতামহ ৺কুঞ্জবিহারী দত্ত পরম ধার্ম্মিক এবং অতি ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও তাঁহারা সংস্কৃত চর্চ্চার অনুরাগী ছিলেন। পিতা সংস্কৃতে সবিশেষ অধিকারী ছিলেন। রামচন্দ্রের মাতাও যে, পিতার ন্যায় স্বধর্ম্মে পরম অনুরক্তা ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য,—হিন্দুমহিলার পক্ষে ইহা ত সাধারণ গুণ। রামচন্দ্র সম্পন্ন বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গ্রহ-বৈগুণ্যে এবং অবস্থা-চক্রে পড়িয়া, সম্পত্তিহীন হইয়া, শেষে এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাল্যে সুঁড়ার স্কুলে বিদ্যালাভ করিয়া জেনেরল এসেমব্লি ইনষ্টিটুশনে প্রবেশপূর্ব্বক প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াই কেম্বেল-মেডিকেল-স্কুলে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কেম্বেল স্কুলে পড়িবার সময় এবং সেখানকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরে রামচন্দ্র ডাক্তারীবিদ্যা সাতিশয় যত্নপূর্ব্বক আলোচনা করিয়াছিলেন। রসায়নশাস্ত্রে তাঁহার সমধিক যত্ন এবং অনুরাগ ছিল। তাই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিভাগে ৪০৲ টাকা বেতনে সহকারীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কেম্বেল-স্কুলের ছাত্রের পক্ষে ইহা তৎকালে সামান্য গৌরবের বিষয় হয় নাই। যত্নে রত্নলাভ হয়। মেডিকেল কলেজের রসায়ন বিভাগে নিযুক্ত হইয়া রামচন্দ্র ক্রমেই স্বীয় রসায়নজ্ঞানের উন্নতি করিয়া শেষে ঐ শাস্ত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন; আর শুদ্ধ স্বীয় যোগ্যতার গুণেই মাসিক দুই শত টাকা বেতনে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। সামান্য পদে কার্য্যারম্ভ করিয়া শেষে মেডিকেল স্কুলের ছাত্র রামচন্দ্র মেডিকেল কলেজের ছাত্রদিগকে রসায়নবিদ্যার শিক্ষা দিবার উপযুক্ত এবং অধিকারী হইয়াছিলেন। বিলাতে অনেকেরই এরূপ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে—বিশেষতঃ মেডিকেল কলেজে—

এরূপ উন্নতি আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। ঐ সময়েই রামচন্দ্র আমাদের দেশের কৃমি-জ্বরাদিনাশক কুটজ বা কুরচি হইতে কুরচিসীন নাম দিয়া এক মহৌষধের আবিষ্কার করেন, এবং এই মহৌষধের জন্য গবর্ণমেণ্টের কাছে আর বিলাতেও সুখ্যাতিভাজন হন। রামচন্দ্রও ক্রমে প্রগাঢ় রসায়নবিৎ বলিয়া প্রথিত হইয়া পড়েন। কিন্তু কেবল মেডিকেলকলেজের কার্য্যেই তাঁহার তৃপ্তি হইত না। সুচিকিৎসক রামচন্দ্র চিকিৎসা-কার্য্যে বিলক্ষণ যশোলাভ করিয়াও তুষ্ট হইতে পারিতেন না, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানশালায়ও রসায়নশাস্ত্রের উপদেশ দিতেন। সেখানে তিনি যত উপদেশ দিয়াছিলেন, আমাদের মনে হয়, আর কোন মহোদয়ই তত উপদেশ দিতে পারেন নাই। তাঁহার রসায়নিক উপদেশ শুনিবার জন্য শুদ্ধ ছাত্রদিগকে নহে—অনেক বিজ্ঞলোককেও আমরা ব্যস্ত হইতে দেখিয়াছি, রসায়নশাস্ত্রের সকল কথাই—সকল তথ্যই—তিনি জলের মত করিয়া বুঝাইয়া দিতে জানিতেন। সেই জন্যই তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য সকল লোককেই লালায়িত হইতে হইত। রামচন্দ্র বৈষ্ণব-কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যৌবন সুলভ চাপল্যবশতঃ স্বধর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ হইয়াও কিন্তু কৌলিক আচারের কদাচ ব্যতিক্রম করেন নাই। নিজে নিরামিষাশী ছিলেন, বিষম রোগে চিকিৎসকের আদেশসত্ত্বেও কখনও স্বভবনে মাংসের ব্যবহার হইতে দেন নাই। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র ও তাঁহার মাসতুতো ভাই মনোমোহন মিত্র দক্ষিণেশ্বরে ৺ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। আর তাঁহার উপদেশেই রামচন্দ্রের মন ভক্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। পরমহংসের এরূপ ভক্ত আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি তাঁহাকে শুদ্ধ গুরুর আসনে বসাইয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই;—ভগবান অবতার মনে করিয়া তাঁহার পূজা করিতেন। পরমহংসদেবও তাঁহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত শিষ্য বলিয়াই জানিতেন। পরমহংসের তিরোভাব হইলে পর, রামচন্দ্র কাঁকুড়গাছীর বাগানে তাঁহার সমাধিপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; আর সেই যোগোদ্যানকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পরমহংসের তিরোভাব দিবসে

প্রতিবৎসর বহুব্যয়ে মহোৎসব করিতেন। শেষে নিজেও সেই যোগোদানেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। ৺রামচন্দ্রের দয়া বড় বলবতী ছিল, সরকারী কার্য্যে ও চিকিৎসা ব্যবসায়ে মাসে হাজার টাকা উপার্জ্জন করিতেন। কথঞ্চিৎ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, সমস্তই তিনি পরোপকারের খরচ করিতেন। ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের পরম ভক্ত শিষ্য রামচন্দ্র অনেক ভক্তশিষ্য রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। রামচন্দ্র অনেকগুলি বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়াছেন; ইহাঁর "তত্ত্ব প্রকাশিকা" এবং 'রসায়ন বিজ্ঞান' গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। ইহাঁর বাঙ্গালা বক্তৃতাবলীও প্রকাশিত হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নিমাইচাঁদ শীল।

নিমাইচাঁদ শীল—চুঁচুড়ার বিখ্যাত শীলবংশসম্ভূত। এই বংশে মৃত "রাম" শীল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। গীত গোবিন্দের কতক অংশ তিনি সুরে বসাইয়া গান করিতেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি সুন্দর হিন্দি গান এখনও তাঁহার প্রশিষ্যগণ গাইয়া থাকেন। "রাম" শীল মহাশয় নিমাই বাবুর অদূর জ্ঞাতি ছিলেন। দেখা যাইতেছে, যে বংশে নিমাই বাবু জন্মগ্রহণ করেন,—তাহাতে গায়ক ও কবির উদয় হইয়াছিল। তিনি ১৮৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

নিমাই বাবু বঙ্কিম বাবুর সতীর্থ ছিলেন। হুগলি কলেজে অধ্যয়ন কালেই তাঁহার বাঙ্গলা সাহিত্যে অনুরাগ জন্মে। তাঁহার সেই অনুরাগ বরাবর বর্ত্তমান ছিল।

নিমাই বাবুর প্রথম রচনা "যামিনী-যাপন কামিনী গোপন" একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনি কয়েকখানি নাটক লেখেন,—

(১) "চন্দ্রবতী"। বোধ হয়, রেনল্ডস্ রচিত (Loves of the Harem) অবলম্বনে লিখিত।

(২) "ধ্রুবচরিত" শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্রুবোপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। নাটক খানির উল্লেখমাত্র যথেষ্ট।

(৩) 'এরাই আবার বড় লোক" এ খানি প্রহসন;—"একেই কি বলে সভ্যতা, "সধবার একাদশী"র ছাঁচে।

(৪) "তীর্থমহিমা" মহান্ত মাধব গিরি ও এলোকেশী ব্যাপার লইয়া রচিত। নাটকচ্ছলে উক্ত ব্যাপার সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

নিমাই বাবুর শেষ পুস্তক "সুবর্ণ বণিক্।" সুবর্ণ-বণিক্ জাতি বৈশ্য, এইটী সংস্থাপন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। কলিকাতা-চুণাগলি নিবাসী শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল মল্লিক মহাশয়, নিমাই বাবুর অনুসরণ করিয়া পরপর এই নামের অর্থাৎ সুবর্ণ-বণিক অভিধেয় দুই খণ্ড পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন। শীল ও মল্লিক মহাশয়ের উদ্দেশ্য একই। ১৮৯৩ সালে ৫৮ বৎসর বয়সে নিমাই চাঁদের দেহান্তর হইয়াছে।

দীননাথ ধর।

দীননাথ ধর—চুঁচুড়াবাসী এবং চুঁচুড়াতেই তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতৃদেব কুমারহট্ট-হালিসহর-বাসী ছিলেন; কিন্তু চুঁচুড়ায় বিবাহ করার পর হইতে চুঁচুড়াতেই বাস করিতেন। দীন বাবু ১৮৩৯।৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

দীন বাবুর পিতৃদেব সুরসিক ছিলেন। ইনি চুঁচুড়ার সঙের স্রষ্টা, তাঁহার মাতামহ-ভ্রাতা নবকিশোর মল্লিক একজন বীরপুরুষ ছিলেন। সুবিখ্যাত সুবর্ণ-বণিক্ কবি উমাপতি ধর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সমসাময়িক লোক। ইতিবৃত্ত পাঠে জানা যায় যে, বল্লালের অত্যাচারে তেজস্বী ধর্ম্মভীরু সুবর্ণবণিক্গণ সুবর্ণগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে চলিয়া আইসেন।

এই সমস্ত স্থান হইতে সুবর্ণবণিকগণ কুমারহট্ট-হালিসহর জনপদে ছড়াইয়া পড়েন। দীন বাবুর পিতৃ-পুরুষেরা হালিসহরবাসী। অনুমান্, তিনি এই কবি উমাপতি ধরের বংশসম্ভূত।

দীন বাবু প্রথমতঃ "পাঠশালায়", পরে চুঁচুড়া ফ্রিচার্চ্চ স্কুলে এবং তৎপরে হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন। সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি কলেজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিছু দিন কাজ কর্ম্মের চেষ্টা করেন, মনোমত কোন কাজ কর্ম্মের যোগাড় করিতে না পারিয়া, কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামচাঁদ ধর

(ডিষ্ট্রীক্ট সেশনজজ) সহ আবার পড়া-শুনা করিতে থাকেন। বাড়ীতে পড়িয়া তিনি এন্ট্রান্স হইতে বি-এল পরীক্ষা দিয়া উকীল হন। প্রথমতঃ হুগলিতে পাঁচ বৎসর, পরে আর দুইটি স্থানে পাঁচ বৎসর ওকালতি করিয়া ১৮৮১ সালে তিনি ঢাকায় উকীল সরকার হন। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ১৮৯৬ সালে তিনি উকীল-সরকারের কাজ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এখনও তিনি ওকালতি করিতে ক্ষান্ত হন নাই। হুগলিও হাইকোর্টে মধ্যে মধ্যে তিনি ওকালতী করিয়া থাকেন।

এক দিবস পরিহাস-রসের অবতার মৃত বাবু গঙ্গাচরণ সরকার দীন বাবুর রচিত কয়েকটি গান শুনিয়া তাঁহার সবিশেষ প্রশংসা করেন। তাঁহার রচিত গান সমস্ত মন্দ নয় এবং যত্ন করিলে তিনি কবি বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন,—দীন বাবুর মনে এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়। তিনি কবিতাদি রচনায় বিশেষ রূপে ব্যাপৃত হন। পরে মনীষী কুলমণি মৃত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মৃত বাবু ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারের অন্যতম সমুজ্জ্বলরত্ন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাহায্যে তাঁহার পদ্য, গদ্য এবং গান রচনা করিবার শক্তি পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এই চারি ব্যক্তির উৎসাহে এবং সাহায্যে তিনি কবিতাদি লিখিতে দিন দিন পারদর্শী এবং বীণাপাণির পূজায় বিশেষরূপে নিরত হন।

কবিতা-রচনা বিষয়ে দীন বাবু মাইকেল মধুসূদন দত্তের একরূপ শিষ্য। দত্তমহাশয়ের "মেঘনাদ বধ" প্রচারিত হইবার কিছু দিন পরে ১৮৬১ সালে মেঘনাদবধের অনুকরণে তিনি "কংস-বিনাশ" নামক একখানি কাব্য রচিত, মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করেন। তৎকালের প্রধান মাসিকপত্র, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" সম্পাদক "কংস-বিনাশের" যৎ-পরোনাস্তি নিন্দা করিয়া স্বীয় পত্রিকায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন।

দীন বাবুর রচিত এই প্রথম কাব্য। তিনি নিজেই বলেন, বিবিধার্থ সংগ্রহ" সম্পাদক তাঁহার অযথা অসঙ্গত নিন্দা করেন নাই। তাঁহার বাক্যগুলি বিষাক্ত সুতীক্ষ্ণ বাণস্বরূপ তৎকালে তাঁহার হৃদয়বিদ্ধ করে,

সত্য; কিন্তু অস্ত্র-চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাতের ন্যায় তাহাতে তাঁহার ভাবী মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল।" এই ঘটনার পর তিনি একটি ভট্টাচার্য্যের নিকট "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণ পঁড়িতে আরম্ভ করিয়া তাহার অর্দ্ধেকের বেশী শেষ করেন। অপিচ তাঁহার কবিতাদি লিখন প্রবৃত্তি কিছু কালের নিমিত্ত নিবৃত্তি পায়, ভাল করিয়া লিখিতে-পড়িতে না শিখিয়া আর লেখনী-ধারণ করিবেন না, তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করেন।

চারি পাঁচ বৎসর তিনি উক্ত সঙ্কল্প তিনি রক্ষা করেন; পরে ১৮৬৫ সালে তাঁহার মাতৃ-বিয়োগ-জনিত শোক অবলম্বনে লিখিত এক খানি ক্ষুদ্র কাব্য সাধারণে প্রকাশিত হয়, এই খানি তাহাঁর রচিত দ্বিতীয় কাব্য। ইহার নাম "প্রসূতি বিয়োগে তস্য সুত।" পাছে কেহ মন্দ বলে, এই ভয়ে এই কাব্যে রচয়িতা বলিয়া তিনি স্বীয় নাম সংযোজিত করেন নাই। সবিশেষ সতর্কতার সহিত কাব্যখানি লিখিত হয় এবং কেহ কেহ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

১৮৭৬ হইতে ১৮৮২ সালের মধ্যে দীন বাবুর তিনটি পুত্র কন্যার মৃত্যু হইলে ১৮৮৩ সালে "ত্রিশূল' নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক তিনি রচনা এবং প্রকাশ করেন।

১৮৮৬ সালে দীন বাবু "উষাচরিত" নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহা তাঁহার মৃত জ্যেষ্ঠপুত্র উষানাথ ধরের জীবনী।

১৯০২।৩ সালে দীন বাবু আর দুই খানি পুস্তক লেখেন। একখানি আনন্দ ভট্টকৃত সংস্কৃত বল্লাল চরিতের বাঙ্গালা অনুবাদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অত্যুদার সাহায্যে তিনি এই অনুবাদ করিতে-সমর্থ হন। অনুবাদের ভাষা বিশুদ্ধ, অনেক স্থলে মনোহর এবং হৃদয়গ্রাহী। সুবর্ণবণিক্ জাতির হিতোদ্দেশে তিনি এই অনুবাদ করেন। দ্বিতীয় পুস্তকের নাম "সুবর্ণবনিক কুলোদ্ধারক ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত।'

পূজ্যপাদ ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় "এডুকেশন গেজেটে" পদ্য ছাপিতে বড়ই নারাজ ছিলেন; কিন্তু দীন বাবুর রচিত অনেক পদ্য এবং কয়েকটি গান তিনি যত্ন করিয়া তাহাতে ছাপাইয়া ছিলেন। তাঁহার জীবদ্দশায় এবং পরলোক গমনের পর এ বাবৎ অনেক প্রবন্ধ,

অনেক পদ্য, অনেক গান এবং অনেক চুটকী গল্প মধ্যে মধ্যে এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত দীনবাবুর রচিত ফ্রাঙ্কো প্রুসিয়ান্ যুদ্ধ সম্বন্ধীয় একটী গানের "হিন্দু পেট্রিয়ট' বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ও বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে তাঁহার পদ্য অনেকেরই প্রশংসিত। "পূর্ণিমা" নামক মাসিক পত্রে কথিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে দীনবাবু একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন।

গান রচনা বিষয়ে দীনবাবুর যথেষ্ট ক্ষমতা। ভক্তিরসাত্মক সাধন সংগীত রচনে তাঁহার যেরূপ পটুতা, হাস্যরসাত্মক গান রচনেও তদ্রূপ। নমুনা স্বরূপ ধর্ম্ম-তত্ত্ব ও প্রেমঘটিত তাঁহার তিনটি গান নিম্নে দেওয়া হইল,—

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়াখ্যামটা।—চলিত প্রসাদী সুর।

এই দেহ রেলগাড়ির কল।
ভবপথে কোর্চ্চে চলাচল ॥
কোথা জেমস্ ওয়াটের বুদ্ধি, একলের এম্নি কৌশল ;
উদর-বয়লারে জমৃচে বাষ্প, মিশে সদা আগুন জল।
আহারাদি কয়লার গাদি, পড়চে তায় অবিরল ;
ভাঙা ফুটো সারা, অয়েল্‌করা, ডাক্তারের কাজ সকল॥
সুমুখেতে লন্ঠন্ তারি, চক্ষুদুটি সমুজ্জ্বল ;
শ্বাস দম্‌পাতে, হইছে কলের কোঁস কোসানি অবিকল॥
সূক্ষ্ম শিরা দেয় তারা, তারের খবর প্রতিপল ;
ধর্ম্মজ্ঞান গার্ড, কাম ক্রোধ দয়া দ্বেষ আরোহীদল ॥
লোকোমোটিভ ডিপার্টমেণ্ট জননীর গর্ভস্থল ;
আপিস্ বাড়ী বাগান হয় ইষ্টেসাণ, কোর্চ্চে এ কল শীতল ॥
জন্ম মৃত্যু টার্‌মিনাস্ দুই, ড্রাইভার মন চঞ্চল ;
যার মদগুণে দীন ভণে, দ্বন্দ্ব কোলিসান্ আর আউট রেল॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী।—তাল পোস্তা।

শোন্‌তো মন, তোমায় বলি, দিন কি তোমার এম্নি যাবে।
তুমি চিরদিন কি বসে বসে, হেঁসে পান তামাক খাবে॥

ফুলিয়ে ছাতি, গতাগতি, ধম্মাকে মরা মতন ভেবে ;
যে গোঁচ শুপো, দেহকুপো, একবারে কাৎ কোরে দেবে॥
সুন্দর শরীর-গর্ব্ব, খর্ব্ব সুঁদুরি কাঠে হবে ;
মাথা নাড়া, দর্প করা, বাঁশের চোটে মেটাবে।
ধর্ম্মে ঠেলে যাচ্চো চলে, সঞ্চয় কোর্ত্তে বিভবে ;
অটল ভাবে, নাহি ভাবে, পটল একদিন তুল্‌বে ভবে॥
তুষছো বাই, আস্‌চে বাই, বায়ু বড় বোল্‌চে সবে ;
কঠোর কফে বাই ছাপলে, তোমার বাই সব নিবৃত্তি পাবে॥
বসে কাছে, দুধে মাছে, খাচ্ছে পাঁচ বন্ধু-বান্ধবে ;
দূরে রবে সবে, তোমার যবে, পাঁচে পাঁচ মিশাইবে॥
দাওনা ভাই, দেক্তে পাই, একটি পাই দুঃখী-গরিবে ;
তোমায় দেখলে বেগোজ, এলে কাগজ, সই করিয়ে সকল নেবে।
দীন বলে দিন তুই কিন্তে পারিবি তবে,
দীননাথ-পদপঙ্কজ-ষটপদ হইবি যবে॥

বেহাগ খাম্বাজ।—কবির সুর।—আড়খ্যামটা।

যদি এসেছিলি, যাবিই বলে, আস্‌লি কেন বল।
এমন শান্তি জলের চেয়ে ভাল, ছিল সে বিরহানল॥
সাধ কোরে আপনি, এলে হে গুণমণি,
সাধে তার বিষাদ কেন কোরলে বল শুনি ;
না মিটতে আশা থোড় পিপাসা,
কেড়ে নিলি মুখের জল (!)॥
না দেখে তোরে, একরূপ ছিলাম অন্তরে,
দুঃখে-সুখে যাচ্ছিলো দিন।
আজি-কাল করে, এবে বিদ্যুৎ দেখা দিয়ে ওরে,,
বাড়ালি আঁধার কেবল॥

এই তিনটী গানের মধ্যে শেষটি "সাধারণী"তে এবং প্রথম দুইটী এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল।

দীন বাবু সরল-সুমিষ্ট কৌতুকপূর্ণ গল্পের অক্ষয়-ভাণ্ডার। অনেকেই তাঁহাকে পাইলে প্রসন্ন হয়েন। এডুকেশন গেজেটে "বিবিধ চাটনী, ঢাকাই আমমানী" ইদানীং "কৌতুককণা" শীর্ষক সরল চুটকী কথা, তিনি পূর্ব্বে যোগাইয়াছেন এবং এ পর্য্যন্ত যোগাইতেছেন। "সাধারণী"

এবং এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত তাঁহার দুইটি গল্প অথবা কথা নিম্নে লিখিত হইল,—

১। 'নকুড় বাবুর করাস বিছানায় জল পড়িলে, নিবারণ বাবু বলেন "দু'হাতে করিয়া খানিক জল লইয়া এইমাত্র দীনবাবু ইহার নিকট দিয়া গিয়াছিলেন: তিনিই বিছানায় জল ফেলে নষ্ট করিয়াছেন।" দীনবাবু প্রত্যুত্তর করেন"—"আমি বেণের ছেলে, বেণের হাত দিয়ে জল গলে না। এ কাজ আমার দ্বারা হয়নি।"

২। না চেকে না খেয়ে দীনবাবু কয়েকবার বাজার হতে বেশী দাম দিয়ে আম কিনে আনেন। আম কেনার পয়সা স্ত্রীর হাতে দেন নাই। ইহাতে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে কয়েকবার বলেন,—"না চেকে না খেয়ে আম আনো. সব টক জেঁাদা। আমরা বাড়ীতে চেকে নিই, আম কেবল মিষ্টি।" ইহার কয়েক দিন পরে একটি বুড়ী দীনবাবুর বাড়ীতে ঝাঁটা বেচিতে আসিলে, তিনি বুড়ীকে বাড়ীর ভিতর সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া, স্ত্রীকে বলেন,—"আমি ত না খেয়ে এনে ঠোকেছিলাম, তুমি খেয়ে দেখে নাও।"

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

ইনি বাঙ্গালার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ লেখক। ইহাঁর রচনার কৌশল ভাবের সৌন্দর্য্য, ভাষার সরলতা সবিশেষ প্রশংসা-জনক।

চব্বিশ পরগণার মধ্যে বারাসত সবডিভিসনের অন্তর্গত নৈহাটী থানার অধীনে রাহুতা গ্রামে ১২৫০ সালে ১৪ই আষাঢ় মঙ্গলবার ইহাঁর জন্ম

বহুকাল হইতে ২৪ পরগণার অধীন রাহুতা গ্রাম অনেকগুলি বিখ্যাত সুকবির জন্মস্থান। প্রসিদ্ধ রামানন্দ নন্দী এই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ফরেশডাঙ্গার বহু ওস্তাদি দলের কবিওয়ালারা রামানন্দের কাছে গান লইত। বংশীধর পোদ, ধরণীধর পোদ, এবং চণ্ডীচরণ রজক এই গ্রামেই জন্ম লইয়াছিলেন, তাঁহারাও কবির দলে গান বাঁধিতেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী। ইহাঁরা ছয় সহোদর ছিলেন; তাহার মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ রাজেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৭ বৎসর বয়সে ইহলোক

পরিত্যাগ করিয়াছেন। সম্প্রতি পাঁচ সহোদর বর্ত্তমান আছেন; রঙ্গলাল বাবুই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। ইহাঁর মধ্যম সহোদরের নাম শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়; ইনি ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় একজন প্রসিদ্ধ লেখক এবং সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত। সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়; ইহাঁর রচিত "মুকুটোদ্ধার কাব্য", কাব্য প্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই আদর পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন। তৃতীয় মহেন্দ্র বাবু, চতুর্থ শ্যামলালবাবু। বিশ্বম্ভর বাবুর এই ৬ পুত্র তাঁহার জ্যেঠাই গোপী-মণি দেবীর যত্নে ও অর্থ-ব্যয়ে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। তৎকালে রাহুতা গ্রামে গোপিমণির তুল্য দয়ালু ও নানা সদগুনে অলঙ্কৃতা নারী অল্পই ছিলেন।

রঙ্গলাল বাবুর পিতামহ ৺ লক্ষ্মী নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সুকবি ও শ্রুতিধর ছিলেন। এক সময়ে গাজিপুরের মাজিষ্টার সাহেব গবর্ণমেণ্টের এক খানি দরকারি পত্র একবার মাত্র পড়িয়া হারাইয়া ফেলিয়া ছিলেন। সাহেবের মুখ চিন্তায় বিরস। কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবু তৎকালে সেখানকার প্রধান কেরাণী ছিলেন; তিনি পত্র খানি প্রথমে একবার মাত্র পড়িয়া সাহেবকে দেখিতে দেন। সেই একবার পাঠেই লক্ষ্মী-নারায়ণ বাবুর স্মৃতিপট হইতে পত্রের বিষয় কিছুমাত্র অপসৃত হয় নাই। তিনি পত্রখানির সমস্ত বিবরণ পড়িয়া সাহেবকে শুনাইলেন। সাহেব চমৎকৃত হইলেন।

রঙ্গলাল বাবু কোন প্রসিদ্ধ কলেজাদিতে বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন নাই। বালক কাল হইতেই সংসারের গুরুতর ভার তাঁহার উপরেই পড়িয়াছিল। সে কারণ বালক কাল হইতে তাঁহাকে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম বয়সে তিনি সে কালের পদ্ধতি অনুসারে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাহার পর রাহুতা গ্রামেই একটা ইংরাজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল—সেই খানে বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। শেষে পুরুলিয়াস্কুলে তাঁহার খুল্লতাত ৺ শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মধুসূদন বন্দোপাধ্যায়ের কাছে গিয়া তথাকার স্কুলে কিছুদিন ইংরাজী পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্র শিখিতে ইহাঁর

অত্যন্ত অনুরাগ ছিল, সে আশা কতক পরিমাণে পূর্ণ হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার আশা এই পর্য্যন্ত। তবু লেখা-পড়ার চেষ্টা কোন কালেই ত্যাগ করেন নাই। কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের কাছে ইংরাজী সাহিত্য ও গণিত-বিদ্যা শিখিতেন। ১৮৬২ সালে পাণিনির ব্যাকরণ এবং পাণিনির অন্যান্য টীকা পুস্তক এবং পাতঞ্জলির মহাভাষ্য ভাল করিয়া পড়িতে তাঁহার একান্তই ইচ্ছা হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হয় নাই। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতা মাতার, মৃত্যু হয়। সে কারণ সংসারের খরচ চালাইবার নিমিত্ত তিনি অর্থ উপার্জ্জন করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

প্রথমে বালীর পশ্চিমে বলুটীগ্রামে ইংরাজী-বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের তিনি ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন; তাহার পর ১৭৬৩ সালে চন্দননগর স্কুলে বদলী হইয়া আসেন। এখানে তিনি ছাত্রদিগকে গণিত ও সাহিত্যশাস্ত্র পড়াইতেন। এই সময়ে রঙ্গলাল বাবুর বিবাহ হয়। বৈদ্যবাটীর লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিত ইহাঁর শ্বশুরের নাম এবং পত্নীর নাম জ্ঞানদা দেবী।

চন্দননগরে যে সময়ে রঙ্গলাল বাবু শিক্ষকের কাজ করিতেছিলেন, তাহার দুই তিন বৎসর পূর্ব্ব হইতেই চন্দননগর, রাহুতা প্রভৃতি স্থানের চারিদিকেই ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অসংখ্য লোক প্রাণত্যাগ করে। রঙ্গলাল বাবুও ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু সুখের বিষয়, তিনি সেই উৎকট রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন; তবে ম্যালেরিয়া জ্বরে এবং প্লীহা ও যকৃতের উপসর্গে তাঁহাকে অনেক দিন ভুগিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার শরীর অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়ে। কাযেই স্কুলের কাজ পরিত্যাগ করিতে হয়। তথাপি তিনি বিদ্যাশিক্ষা পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহার চিকিৎসক ও বন্ধু ডাক্তার রমণ চন্দ্র সাধুর কাছে এবং ডাক্তার আই হাঙ্গার্ড সাহেবের কাছে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা শাস্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার আর একটী সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রথম প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রথিতনামা রাজেন্দ্রলাল দত্ত বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত চন্দননগরে আসিয়া বাস করিয়া-

ছিলেন, এবং প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিণী সাহেব মধ্যে মধ্যে আসিয়া, রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে তিন চারিদিন করিয়া অবস্থিতি করিতেন। রঙ্গলাল বাবু তাঁহাদের কাছে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন।

কেবল ইহাই নয়, রঙ্গলাল বাবুর পরম বন্ধু ৺ লোকনাথ কবিরাজ কবিরঞ্জন মহাশয় আয়ুর্ব্বেদের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার অনুরোধে রঙ্গলাল বাবু এ দেশের সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি ইছাপুর স্কুলে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু ম্যালেরিয়া-জ্বরের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন এবং কলিকাতার টাকশালে প্রথমে পয়সা কাটিবার ঘরে, আফিসিয়েটিং অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন। তাহার পর পয়সার মুদ্রাঙ্কণ করিবার ঘরে কিছুদিনের জন্য আফিসিয়েটীং অধ্যক্ষের কাজ করিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল বাবু কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু দুঃসাধ্য ম্যালেরিয়া জ্বর তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িল না। শেষে তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গাজিপুরে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ৺ মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে চলিয়া গেলেন। গাজীপুরে পদার্পণ করিবা মাত্র ম্যালেরিয়া জ্বর একবারেই ছাড়িয়া গেল, প্লীহা-যকৃতের চিহ্নমাত্রও রহিল না, আরোগ্য-লাভ করিয়া রঙ্গলাল বাবু কিছুদিন পুলীশে কেরাণী গিরির কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে কাজ তাহার মনঃপুত হইল না, স্কুলের কর্ম্মই তাঁহার বিশেষ ভালবাসার জিনিস।

তৎকালে ৺হরকালী বাবু বীরভূমের স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলেন। তিনি রঙ্গলাল বাবুর নিকট-আত্মীয় ও জ্ঞাতি, ইহাঁদের দুইজনে চিঠি-পত্র লেখা-লিখি হইতে লাগিল, শেষে হরকালী বাবু রঙ্গলাল বাবুকে ডাঁড়কার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করিলেন। ১২৭৩ সালের ভাদ্র মাসে রঙ্গলাল বাবু ডাঁড়কায় আসিয়া ডাঁড়কা স্কুলের ভার গ্রহণ করিলেন।

ডাঁড়কায় আসিয়া রঙ্গলাল বাবুর মন-প্রাণ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া

উঠিল; এবং ভাঁড়কাবাসীরাও রঙ্গলাল বাবুকে পাইয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৎকালে স্কুলের অবস্থা নিতান্ত মন্দ, অর্থের নিতান্ত অভাব। সে কারণ কিছুদিনের নিমিত্ত রঙ্গলাল বাবু মালিয়াড়ার রাজপুত্রকে পড়াইবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার মন টিকিল না, পুনর্ব্বার তিনি ভাঁড়কায় ফিরিয়া আসিলেন। ১৮৭১ সালে ভাঁড়কার নিকটবর্ত্তী বিস্তরগ্রামে ভয়ঙ্কর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ হইয়া উঠে। ভাল ভাল পল্লীগুলি উলট-পালট হইয়া যায়। এই সময়ে রঙ্গলাল বাবু স্কুলের কাজ পরিত্যাগ করিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিলেন এবং অল্পদিনেই চিকিৎসার কাজে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইলেন, কোন বিষয়েই তাঁহার অর্থের অনাটন থাকিল না।

গাজিপুরে অবস্থিতি কালে তখনকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও জমিদার ৺ঠাকুর দত্ত পণ্ডিতের কাছে রঙ্গলাল বাবু পঞ্চতন্ত্র, শ্রীমদ্ভাগবত, হিতোপদেশ, এবং তাঁহার আদরের ব্যাকরণ পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীই অল্প অল্প পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু অবসরের অভাবে ভাল করিয়া পড়িবার সুবিধা হইত না। রঙ্গলাল বাবুর কাছে শুনিয়াছি, ঠাকুর দত্ত পণ্ডিতের কাছে মল্লিনাথকৃত ভাগবতের টীকা গ্রন্থ ছিল। তিনি সেই টীকা দেখিয়াই ভাগবত পাঠ করিতেন। এখন ঠাকুর দত্ত পণ্ডিত এ সংসারে আর নাই। গাজীপুর হইতে কাশী যাইতে নন্দনগঞ্জ নামে গ্রাম আছে; সেই খানে ঠাকুর দত্ত পণ্ডিতের জামাতা থাকিতেন। ঐ জামাতার কাছে উক্ত সটীক ভাগবত খানি ছিল।

প্রসঙ্গ ক্রমে এইখানে আর একটী কথা বলা আবশ্যক; কানপুরে যখন বৃদ্ধ মন্নূলাল শাস্ত্রীর কাছে রঙ্গলাল বাবু সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার কাছে জ্ঞানেশ্বরকৃত গীতার টীকা দেখিয়াছিলেন। হঠযোগ প্রদীপিকা গ্রন্থের টীকায় উক্ত টীকা-পুস্তকের নাম উল্লেখ আছে, চেষ্টা করিলে ঐ টীকা-পুস্তকখানিও পাওয়া যাইতে পারে। গীতার যতগুলি টীকা গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কোথাও ঐ টীকার নাম উল্লিখিত হয় নাই।

রঙ্গলাল বাবু কাণপুরের নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তের পণ্ডিত গিরিজাদত্ত শাস্ত্রী, নয়াগায়ের পণ্ডিত যুবক মন্নুলাল শাস্ত্রী, এবং বৃদ্ধ মন্নুলাল শাস্ত্রীর নিকটে ভট্টোজি দীক্ষিত কৃত সিদ্ধান্ত কৌমুদী, (পাণিনির সবৃত্তি পুস্তক), বামন জয়াদিত্য কৃত কাশিকা (পাণিনির সবৃত্তি পুস্তক, পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্য) কাত্যায়ন বররুচি কৃত বার্ত্তিক পাঠ এবং পাণিনির অন্যান্য বাখ্যা পুস্তক, এবং কাব্য-নাটকাদি পাঠ করিয়াছিলেন, পরে ঋগ্বেদ, পুরাণ, এবং আগম শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি কাশীতে পরমহংসের নিকটে প্রথমে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাহার পর আবার তারা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার শরীর একবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং নানপ্রকার উৎকট রোগের আকর হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার স্মরণ-শক্তি খারাপ হইয়াছে। পূর্ব্বে তিনি উপস্থিত-কবি ছিলেন, কোনপ্রকার প্রশ্ন দিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভাবপূর্ণ সরস কবিতায় পূরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু সে শক্তি আর এক্ষণে কিছুই নাই। স্বর্গীয় ৺ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের মত চলিত করিলে রঙ্গলাল বাবু হাস্যোদ্দীপক এই গান বাঁধিয়াছিলেন—

"বেঁচে গেলুম অলো দিদি একাদশীর দায়ে,
বিদ্যাসাগর দেবে নাকি বিধবা রমণীর বিয়ে,
শাঁখা, খাড়ু, পড়্‌বে হাতে, খেতে পাব মাছে ভাতে,
শাড়ী, সিন্দুর, পরে আবার বেড়াব লো এয়ো হয়ে।
জামাই আসবেন শ্বশুর বাড়ী, বেশ করিব তাড়াতাড়ি,
গা দুলিয়ে চল্‌ব (আবার) হরেক রকম বাহার দিয়ে॥"

ডাঁড়কায় রঙ্গলাল বাবু একটী ধর্ম্মসভা করিয়াছিলেন। সেই সভার জন্য তিনি গান রচনা করেন। ডাঁড়কার জমিদার ৺দুর্গাদাস বাবু উত্তম গান করিতে পারিতেন। রঙ্গলাল বাবুর রচিত গীতগুলি তিনি গান করিতেন; তখন সহস্র সহস্র গান রচিত হইয়াছিল, এখন তাহার দুই একটী ভিন্ন পাওয়া যায় না। দুটী গান উদ্ধৃত হইতেছে।—

(১) ঠেকা।

অকূলে পারেরি অর্থ ছিল না হে ভক্তাধীন।
মন-প্রাণ বান্ধা দিয়ে চরণে লইনু ঋণ॥
এ ধারে উদ্ধার পাব, কিম্বা চির ঋণী রব—
এই চিন্তা করে করে হইলাম বোধহীন॥
সাধ নাহি হয় চিতে, মন-প্রাণ ফিরে নিতে,
আমি ঋণের দায়ে, বান্ধা রব তব পাশে হে চিরদিন॥
এ ঋণে না আছে শাস্তি, খাতকের পাতক নাস্তি,
রঙ্গলাল তায় ভাবিয়ে পরিশেষে উদাসীন॥

(২) একতালা।

চিন্তে নারিনু চিন্তা হলো সার।
জান্‌তে তোমারি তদন্ত, হল দিন অন্ত,
অন্ত না পাইনু কিছু তা'র॥
সখা সুজ্ঞান প্রদানে, রাখহে নিদানে,
ক্রমে ঘূরাও না আর।
আমি হয়েছি তোমারি, তুমি প্রাণ হরি,
অন্তে হয়ো হে আমার॥

ডাঁড়কায় অবস্থিতি কালে তথাকার ভদ্রলোকেরা এবং অভ্যাগত পণ্ডিত প্রভৃতি আমোদ করিয়া কবিতা শুনিবার নিমিত্ত রঙ্গলাল বাবুকে নানাপ্রকার প্রশ্ন দিতেন এবং পঞ্চানন রায় ও মহাতাপচন্দ্র রায় মহাশয় রঙ্গলাল বাবুর কবিতা দ্রুত হস্তে লিখিয়া লইয়া এডুকেশন গেজেটে পাঠাইয়া দিতেন। যাঁহারা এডুকেশন গেজেট ফাইল করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা সেই সকল কবিতা পাঠ করিয়া মোহিত হইবেন। আমরা বহু যত্নে নিম্নলিখিত কয়েকটি কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।

ডাঁড়কা নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন রায় প্রশ্ন দিলেন, হাতের বাঁশীটি কেন হইল সরল,—

রঙ্গলাল বাবু তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন,———

"এক দিন হাসি হাসি শশিমুখী রাই,
কহিলেন শুন শুন প্রাণের কানাই।
লইয়া বাঁকার হাট ওহে নটরাজ,
আগমন করিয়াছ এই ব্রজ মাঝ।
ললাটে অলকা তব, বাঁকা ভাবে আঁকা,
চরণে নূপুর পরো—তাও শ্যাম বাঁকা।
শিরে শিখি-পুচ্ছ-চূড়া বাঁকা হ'য়ে রয়,—
সকলি তোমার বাঁকা—সোজা কিছু নয়।
বাঁকা আঁখি, বাঁকা ঠাম্—বাঁকাই সকল,
হাতের বাঁশিটি কেন হইল সরল?"

১৮৭০ সালে স্কুল ইন্সপেক্টর ভূদেব বাবু ডাঁড়কার স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন, দিবসে পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রাত্রিতে তিনি এবং অন্যান্য অনেক ভদ্রলোক রঙ্গলাল বাবুকে লইয়া বিস্তর আমোদ করিয়াছিলেন। ভূদেব বাবু কবিতা-পূরণ শুনিবার নিমিত্ত রঙ্গলাল বাবুকে নানা প্রকার প্রশ্ন দিয়াছিলেন। আমরা দুইটি প্রশ্নের পূরণ সংগ্রহ করিয়াছি, এখানে তাহাই প্রকাশ করিলাম।

ভূদেব বাবু প্রশ্ন দিলেন, গোদ হয় নি চুলে। রঙ্গলাল বাবু তৎক্ষণাৎ পূরণ করিলেন,—

"সুন্দরে দেখিয়া যত পুর নারী দলে,
নিজ নিজ পতি নিন্দা করিছে সকলে।
এক ধনি কহে সই কি কহিব দুঃখ,
বিধাতা আমার প্রতি বড়ই বিমুখ।
গোদা পতি, বাম বিধি দিলেন আমায়,
গোদের ভরেতে মম সদা প্রাণ যায়।
নাকে ঝোলে লম্বা গোদ যেন পাঁড় শশা,
কাণেতে ঝুলিছে গোদ বাবুয়ের বাসা।
চোকে গোদ, দাঁতে গোদ, গোদ (প্রতি) গ্রন্থিমূলে,
সত্য পীড়ে সিন্নি মেনে গোদ হয় নি চুলে।"

ঘরের ভিতরে খুব হাসি পড়িয়া গেল। তাহার পর ভূদেব বাবু পুনর্ব্বার প্রশ্ন দিলেন ঠেঁটি পাঁচ হাতি,—

রঙ্গলাল বাবু তৎক্ষণাৎ পূরণ করিয়া দিলেন—

"বেশ্যার ভাগ্যে ঘটে সাঁচ্চা সাড়ী বারাণসী,
স্ত্রীর ভাগ্যে মুখ-ঝামটা গালি রাশি রাশি।
চুলির ভাগ্যে শাল-দো-শালা ছালা-ছালা মেলে,
ছেলের ভাগ্যে জোটে না কানি কাঁদিয়া ককালে।
ঠাকুরের ভাগ্যে ঘোড়া মোণ্ডা আর ঠোটে কলা,
খাজা গজা পোলাও কোপ্তা ইয়ারদের বেলা।
খেমটির ভাগ্যে মণি-মতি জোটে নানাজাতি,
পুরুতের ভাগ্যে ঘসা পয়সা, ঠেঁটি পাঁচ হাতি।"

চুঁচড়ার বাড়ীতে বর্দ্ধমানে মহারাজ মহাতাপ চাঁদ আসিয়া অবস্থিতি করিলে, রঙ্গলাল বাবু মধ্যে মধ্যে গিয়া তাঁহার কাছে কবিতা শুনাইতেন। মহারাজ কবিতা-পূরণ শুনিয়া তাঁহাকে "কাব্য রত্নাকর" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

চন্দননগরের গঙ্গাতীরস্থ বাটীতে ভূকৈলাসের রাজা সত্যশরণ ঘোষাল মহাশয় যখন আসিয়া অবস্থিতি করিতেন, তখন রঙ্গলাল বাবু মধ্যে মধ্যে গিয়া কবিতা শুনাইতেন। একদিন ভবানীপুরের প্রসিদ্ধ কবি বাবু গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজা বাহাদুরের নিকটে বসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে রঙ্গলাল বাবু সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা, গোপাল বাবুকে রঙ্গলাল বাবুর সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "রঙ্গলাল বাবু একজন সুকবি।" এই কথা শুনিয়া গোপাল বাবু বলিলেন, "রাই, কাল তোমায় কিসে ভাল লাগে! ছিছি রাই, কাল তোমায় কিসে ভাল লাগে!" দুঃখের বিষয়, সমস্ত গানটি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কাজেই প্রকাশ করা হইল না। সভায় একজন উত্তম গায়ক ছিলেন। তিনি ঠেকার তালে গানটি গাইলেন। তখন রাজা মহাশয় রঙ্গলাল বাবুকে বলিবেন,—আপনি ক্ষণকালও চিন্তা না করিয়া গোপাল বাবুর গানটির

উত্তর দিউন। রঙ্গলাল বাবু গানের উত্তর বলিতে লাগিলেন এবং গায়ক মহাশয় লিখিয়া লইলেন,—

"কালার রূপে জগৎ আলো, আমার শ্যামের রূপে জগৎ আলো।
সে হয় কুৎসিৎ কিসে মনে যারে লাগে ভাল ॥
ভাল বাসার অনুরাগে, ভাল বাসায় ভাল লাগে,
ভাল বাসার ভাল সব—কালকে না লাগে কাল।
নিয়ে আমার যুগল আঁখি, শ্যামের পানে চাও দেখি,
ভাল লাগে কি লাগে কাল—এই চোখেতে দেখে বল।"

গায়ক মহাশয় চারি পাঁচ বার আবৃত্তি করিয়া গানটি গাইলেন। ভূ-কৈলাসের রাজা এবং গোপাল বাবু উঠিয়া আসিয়া, আহ্লাদে পুনঃ পুনঃ রঙ্গলাল বাবুর মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন।

রঙ্গলাল বাবুর প্রথম রচিত পুস্তক "শরৎশশী" তাহার পর "বিজ্ঞান-দর্শক" এবং "চিত্ত চৈতন্য উদয়" রচিত হয়। বোধ করি, এই তিনখানি পুস্তক আর পাওয়া যায় না। তাহার পর "বৈরাগ্য-বিপিন-বিহার" কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

রঙ্গলাল বাবুদের পূর্ব্ব পুরুষেরা কবি ছিলেন। ইঁহার পিতার রচিত সখের পাঁচালির ছড়া ও গান, যাত্রার গান, কবির গান বিস্তর ছিল। ইঁহার কনিষ্ঠ পিতামহ ইংরাজ পর্ব্বনামে এক বৃহৎ কাব্য পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সকল কাব্য ও গান এখন আর পাওয়া যায় না। রঙ্গলাল বাবু সোমপ্রকাশে সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেক দিন প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং কল্পদ্রুমে ও আর্য্যদর্শনে (১২৯১ সালে) শতবর্ষের প্রাকৃত বঙ্গ নামে অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। জন্মভূমিতে তাঁহার লিখিত সাত,—আটটী সুপাঠ্য প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তনি অন্যান্য বাঙ্গালা কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই।

১২৯০ সালে তিনি কলিকাতায় একটী ছাপাখানা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে লাভ করিতে পারেন নাই। বিস্তর টাকার ক্ষতি হইয়া গেল। সে কারণ নিজ গ্রামে ছাপাখানা উঠাইয়া লইয়া যান। কলিকাতায়

অবস্থিতি কালে প্রথম "হরিদাস সাধু" পুস্তক ক্ষুদ্রাকারে লিখিত হইয়াছিল। রাহুতা গ্রামে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বা'হর হয়। তাহার পর বঙ্গবাসী আফিস হইতে ঐ পুস্তক দুইবার প্রকাশিত হইয়াছে।

রঙ্গলাল বাবুর প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাই বঙ্গের প্রধান সৌভাগ্যের কারণ। ইহা রঙ্গলাল বাবুরও নিজের অক্ষয়-কীর্ত্তিস্তম্ভের ভিত্তি। রাহুতাগ্রামে তিনি প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ গ্রন্থ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই অভিধানে প্রথম ভাগ হইতে দ্বিতীয় ভাগের কিয়ৎদূর পর্য্যন্ত রঙ্গলাল বাবুর নিজের রচিত। কেবল অভাব প্রবন্ধ নবদ্বীপের মৃত সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিনাথ তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছিলেন। অঙ্কুর এবং অনুবীক্ষণ প্রবন্ধ কৃত-বিদ্য শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র দত্ত এম, এ, সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার পর রঙ্গলাল বাবু নিজের ভাষায় প্রবন্ধ দুটী লিখিয়া লইয়াছেন। অথর্ব্ব—এই প্রবন্ধের বিষয়গুলি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহা-মহোপাধ্যায় এবং রঙ্গলাল বাবু মিলিত হইয়া সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহার পর রঙ্গলাল বাবু স্বয়ং প্রবন্ধটী রচনা করেন।

ভাষাপ্রিয় সুরসিক ব্যক্তিরা একবার বিশ্বকোষ অভিধানের প্রথম ভাগের প্রবন্ধগুলি পড়িয়া দেখুন, মন কিরূপ মুগ্ধ হয়। বসন্ত-নিকুঞ্জের পিকবর কি প্রকারে গদ্যভাষায় পাতায় পাতায় মধুর ললিত সুরে গান করিয়াছেন, একবার পড়িয়া দেখুন। যতদিন বিশ্বকোষ অভিধান থাকিবে, ততদিন রঙ্গলাল বাবুর প্রতিষ্ঠা চিরোজ্জ্বল রহিবে। রঙ্গলাল বাবু এই বৃহৎ অভিধান শেষ করিতে পারেন নাই। নানা কারণে গ্রন্থ-প্রচারের ভার অন্যের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহার সম্পাদক।

রঙ্গলাল বাবুর ধর্ম্মে বিশ্বাস আমাদের দেশের ধর্ম্মপদ্ধতিসম্মত। তিনি বলেন, বৃক্ষ-তৃণাদি এবং কীট-পতঙ্গ সকলেরই আত্মা আছে। তাহারা পরস্পর কথা কহিতে এবং সঙ্কেত করিতে পারে। মানুষ হইতে বৃক্ষ হইতে পারে, এবং বৃক্ষ হইতে মানুষ হইতে পারে। তাঁহার বিশ্বাস, মানুষ নিজে কিছুই করিতেছে না। জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা যাহা করাইতেছেন, মানুষ, কীট, পতঙ্গ তাহাই করিতেছে।

তিনি এই সূত্রটির বড় আদর করেন—

"যেন দেবেন হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

ইনি স্বভাবতঃ পরম দয়ালু। দরিদ্রের উপকার করা ইহাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত।

পূর্ব্বজন্মে রঙ্গলাল বাবুর দৃঢ় বিশ্বাস। ইহাঁর বিশ্বাস, কণ্ঠে নিয়ত রুদ্রাক্ষ-মালা ধারণ করিলে শরীরে কোন প্রকার রোগ প্রবেশ করিতে পারে না। ইনি বলেন,—"কেহ বয়ঃক্রম জিজ্ঞাসা করলে যতই কেন বয়ঃক্রম হউক না, এগার, বিশ, পঞ্চান্ন, ষাট, তের্ষট্টি এবং আটানব্বই বলা কর্ত্তব্য। তাহা না বলিলে পরমায়ু ক্ষয় হয়।"

ইনি ভূতযোনির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। রঙ্গলাল বাবু বলেন, সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত মনে পরকালের চিন্তা করিতে হয়; পরকালের চিন্তা না করিলে মৃত্যুর পর উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয় না; বৃক্ষ ও কীট পতঙ্গরূপে জন্মগ্রহণ করিতে থাকে।

গোপালকৃষ্ণ ঘোষ।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে মালদহ সহরে ইহাঁর জন্ম হয়। তখন সেই স্থানে তাঁহার পিতা হরচন্দ্র ঘোষ আবকারি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ম্ম করিতেন। মালদহ হইতে তাঁহার পিতা বহরমপুরে ডেপুটী কলেক্টর হইয়া আসিলে, গোপালকৃষ্ণ বহরমপুরে আসিয়া তত্রত্য কলেজে ভর্ত্তি হন। ঐ সময়ে সুবিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের পিতা ৺ঈশানচন্দ্র দত্ত ও ঐ স্থানের একজন ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। মিষ্টার রমেশচন্দ্র দত্ত তাহার সহধ্যায়ী ছিলেন। এবং কখন কখন এক পালকীতে চড়িয়া দুইজনে ঈশান বাবুর

বাড়ীতে আসিতেন এবং একত্রে খাওয়া-দাওয়া ও খেলা করিতেন। তখন উহাঁদের বয়স আট কি নয় বৎসর হইবে। সেই সময়ে সাঁওতাল-লড়াই হইতেছিল। এইরূপে গোপাল কৃষ্ণ তাঁহার পিতা-মাতার সহিত অনেক দেশ বিদেশে ঘুরিয়া, অবশেষে তাঁহার পিতা হরচন্দ্র বাবু কটকে বদলী হইলে, কটকে আসিয়া, তথাকার গবর্ণমেণ্টের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। এ স্কুলের নাম এক্ষণে রাবেন্স৷ কলেজ হইয়াছে। কিন্তু সে সময়ে ঐ স্কুলে ভাল পড়া-শুনা হইত না বলিয়া, গোপাল কৃষ্ণ একা কলিকাতায় আসিয়া কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন এবং ঐ স্কুল হইতে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করিয়া, সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠাভ্যাস করেন। এই সময়ে কবি নবীন চন্দ্র সেন তাঁহার সহপাঠী ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সখ্য ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে তিনি ১৮৬৬ সালে হুগলী-কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হন। তাহার কিছু দিন পরে পড়া-শুনা ছাড়িয়া দেন। পরে ১৮৬৮ সালে কলিকাতায় ডফ কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন এবং ঐ স্থান হইতে এল-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর পুনর্ব্বার প্রেসিডেন্সি কলেজে থার্ডইয়ার ক্লাসে ভর্ত্তি হন। ঐখানে ফোর্থ ইয়ার পর্য্যন্ত পড়িয়া কলেজ ছাড়িয়া দেন। শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে যান। তাহার কয়েক বৎসর পরে ১৮৭৬ সালে আইনের পরীক্ষা দিয়া উকীল হন এবং আলিপুর আদালতে প্রথম ওকালতী আরম্ভ করেন। আলিপুর হইতে বর্দ্ধমানে গিয়া, তত্রত্য উকীল শ্রেণীভুক্ত হইয়া, সেই-স্থানে বৎসর দুই ওকালতী করেন। তখন ফৌজদারীতে তাঁহার বড় মন্দ রোজগার হইত না। কিন্তু আইন ব্যবসা তাঁহার বড় প্রীতিকর না হওয়ায়, তিনি হাইকোর্টে নাম রেজেষ্টরী করাইয়া ১৮৮২ সালে প্রথম মুনসেফ পদে নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতে তিনি মুনসেফী করিতেছেন। ইং ১৮৭০ সালে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন শিক্ষা করেন, সেই সময়ে তাঁহার কৃত কবিতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার আত্মীয় হাইকোর্টের জজ সারদাচরণ মিত্র ও পণ্ডিত শিবনাথ

শাস্ত্রী ও আইন শিক্ষা করিতেন। একদিন গোপাল কৃষ্ণ বাবু "সোম প্রকাশে" ছাপাইবার জন্য শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে একটি কবিতা দেন। তখন পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। দিন দুই পরে শাস্ত্রী মহাশয় কবিতাটি গোপাল বাবুকে ফেরৎ দিলেন,—কহিলেন,—"মামা, তাঁহার কাগজে আদিরস ঘটিত কোন কবিতা ছাপেন না।" পরে এ কবিতা সত্য গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত "সাহিত্যমুকুর' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর গোপাল কৃষ্ণ বাবু ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এডুকেশন গেজেটে গদ্য ও পদ্য —উভয়ই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। তখন ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঐ কাগজের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭০ সালে অর্থাৎ যখন গোপাল বাবু প্রেসিডেন্সি কলেজে এ আইন শিক্ষা করেন, ঐ সময়ে বা তাহার কিছু পরেই পুর্ব্বোক্ত মাননীয় মিত্র মহাশয় "প্রকৃতি রঞ্জন" নামক এক সাময়িক পত্র বাহির করেন। ঐ পত্রে গোপাল কৃষ্ণ বাবু অর্পণা নামে একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস বাঙ্গালায় লেখেন। সে পত্রিকাখানি বড় দীর্ঘজীবী হয় নাই। এই সময়ের কিছু পরেই সুবিখ্যাত "বঙ্গদর্শন" বাহির হইল। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গীয় কবিগণ ও চিন্তাশীল ও লিপিপটু লেখকগণ "বঙ্গদর্শনে" লিখিতে আরম্ভ করিলেন। গোপাল বাবু একটি কবিতা "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশার্থ সম্পাদক ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট মুরশিদাবাদে পাঠাইয়া দেন। তাহার ২।৪ দিন পরে বঙ্কিম বাবু তাঁহাকে লিখিয়া পাঠান যে, "কবিতাটী খোয়া গিয়াছে"। গোপাল কৃষ্ণ বাবু তাহার একটি কপি পাঠাইয়া দিলেন, উহা "বঙ্গদর্শনে" প্রকাশিত হইল। এইরূপে তাঁহার কয়েকটী কবিতা "বঙ্গদর্শনে" বাহির হইল। অন্যান্য কোন কোন সম্পাদক, লেখকগণের রচনা যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করেন, বঙ্কিম বাবু সেরূপ করিতেন না। যে সমস্ত লেখক তাঁহার পছন্দ হইত, তিনি তাহার কোন অংশ পরিবর্ত্তন করিতেন না। গোপালকৃষ্ণ বাবু সময়ে সময়ে ইংরাজী কাগজেও লিখিতেন। ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস নামক দৈনিক ইংরেজী পত্রে তিনি বহুতর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তজ্জন্য সম্পাদক উইলসন সাহেব তাঁহাকে

একখানি প্রশংসাপত্র লেখেন। মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিন নামক মাসিকপত্রেও তিনি লিখিতেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁহার বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামক পত্রে বঙ্কিম বাবুর "বিষবৃক্ষ" সমালোচনা করিলে, গোপাল কৃষ্ণ বাবু মুখার্জ্জিস ম্যাগাজিনে ঐ সমালোচনার সমালোচন করিলেন। ঐ প্রবন্ধ প্রবন্ধকারের স্বাক্ষর ছিল না। উহা পড়িয়া, বঙ্কিম বাবু লেখকের নাম জানিবার জন্য শম্ভু বাবুকে পত্র লেখেন। এইরূপে বঙ্কিম বাবুর সহিত গোপালকৃষ্ণ বাবুর পরিচয় হয়। "নেশানাল ম্যাগজিনে" গোপালকৃষ্ণ বাবু বঙ্কিম বাবুর কপাল কুণ্ডলার এক অনুবাদ ছাপাইয়াছেন। গোপালকৃষ্ণ বাবু বঙ্গবাসীতেও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

১৮৭৭ সালে গোপালকৃষ্ণ বাবুর "কুসুমমালা" নামক কবিতা পুস্তক প্রচারিত হয় তাহার ১০ বৎসর পরে তাঁহার কৃত পদ্য উপনাস "ব্রহ্মচারী" প্রকাশ হয়। তিনি কতকগুলি গানও অল্প দিন হইল ছাপাইয়াছেন। এখনো তাঁহার অনেক কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রভৃতি প্রস্তুত আছে, কিন্তু ছাপান হয় নাই।

তাঁহার "কুসুমমালা" নামক কবিতা পুস্তক সাময়িক পত্রে ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যথেষ্টরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় গ্রন্থকারকে ইংরেজীতে লিখিয়াছেন,—"আপনার মানসবাসিনীর মত এমন কবিতা পুস্তক আমি অনেক দিন দেখি নাই।"

পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহোদয় ইংরেজিতে বলিয়াছিলেন,—"আপনার কবিতা মাধুর্য্যময়। বাস্তবিকই আপনি কবি। লিখিবার শক্তি, ভাবপ্রকাশের শক্তি, আপনার অসাধারণ অদ্ভুত। গোপালকৃষ্ণ বাবুর "ব্রহ্মচারী" জন্মভূমি ও অন্যান্য পত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কলিকাতা গেজেট এবং কলিকাতা রিভিউতে "ব্রহ্মচারীর" প্রশংসা করিয়াছেন।

"কুসুমমালা" হইতে গোপালকৃষ্ণ বাবুর কবিতা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত

"হাসি।

বিধি কি মধুর হাসি দিয়েছে বদনে!
সে যে হাসি সুধাময়
সুধার অধরে রয়
সরসী-হিল্লোল যেন মাখা শশি-কিরণে!

হাসিতেই যেন বিধি গড়েছে সে কামিনী!
হাসি তা'র ওষ্ঠাধরে—
হাসি সে কপোলোপরে—
হাসি তা'র দু'টি চক্ষে খেলে যেন দামিনী!

সে হাসি যখন আসি উপজিল নয়নে;
চমকিল আচম্বিত
এ মোর চকিত চিত
জাগাইয়া যত মোর শৈশবের স্বপনে —

ম্লান হোল তা'রে আঁখি যেন কোথা হেরেছে,—
যেন তা'রে জন্মান্তরে
হেরেছি স্বপ্নের ঘোরে,—
সে মাধুরী আজো তাই ভাঙা ভাঙা রয়েছে!"

যদুনাথ মজুমদার।



যশোহর জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া গ্রামে শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরের পৈত্রিক বাস ভূমি; কিন্তু তাঁহার মাতামহালয় খুলনা জেলার অন্তর্গত বাগের হাটের সন্নিকট দশনি গ্রামে। যদুনাথ ১৭৮১ শকাব্দে (১২৬৬ বঙ্গাব্দে) ৭ই কার্ত্তিক সোমবার ভূমিষ্ঠ হন।

রায় যদুনাথ ৮ম বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। তাঁহার স্বাভাবিকী প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই সবিশেষ দীপ্তিমতী দেখা গেলেও তিনি শৈশব-সুলভ-চাপল্যের বশে লেখা-পড়ায় আদৌ মনোযোগী ছিলেন না। ৯ম বর্ষ বয়সে যশোহর জেলা-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া, প্রথমে ইংরাজী বর্ণমালা অভ্যাস করিলেন এবং এই সময় হইতে তিনি রীতিমত শিক্ষায় মনোযোগী হইয়া যথা সময়ে ক্রমান্বয়ে এণ্ট্রেন্স, এল্‌-এ, বি-এ, এবং "অনর্" সহিত ইংরাজীতে এম্‌-এ পাশ করিলেন। এম্‌-এ পরীক্ষায় তিনি পারদর্শিতানুসারে বিশ্ববিদ্যায়ের ২য় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

এম্‌-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি ইঁহার স্বাভাবিক বিদ্যানুরাগিতা-বশে অন্য বিভাগে বিষয়, কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করিয়া, প্রথমত আরা গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সহকারী প্রথম শিক্ষকের পদে ও তৎপরে তত্রত্য প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া, বিশেষ পারদর্শিতার সহিত কার্য্য করেন। তৎপরে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ২য় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ৺ ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি এম্‌, এ, ডি, এল্‌ মহাশয়ের সহিত এক যোগে "ইউনাইটেড্‌ ইণ্ডিয়া" নামক একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র সম্পাদন করেন। তৎপরে সংস্কৃত কালেজের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি লাহোর ট্রিবিউনের সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন, তখন উক্ত সম্বাদপত্র কলিকাতায় সম্পাদিত অমৃত বাজার পত্রিকার সহিত মিলিত হইয়া যায়। কিছুকাল লাহোর ট্রিবিউনের

সম্পাদকতা করার পরে নেপালের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী সার মহারাজা রণদ্বীপসিংহ জং বাহাদুর কে, সি, এস, আই, তাঁহাকে নেপালি দরবার স্কুলের হেড্ মাষ্টারের পদে নিযুক্ত করেন। মহারাজা রণদ্বীপ সিংহ বাহাদুর যখন তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্রগণের ষড়যন্ত্রে নিহত হন, তখন ইনি নেপাল রাজধানী কাঠমণ্ডপে ছিলেন। ঐ সময়ে নেপালের নানাবিধ রাজনৈতিক বিভ্রাট পরিদর্শনে তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার লাহোরে উক্ত ট্রিবিউন" পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। এই স্থানে কিছু দিন কার্য্য করার পরে, কাশ্মীরের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রী বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। তৎপরে কাশ্মীরের মহারাজা সিংহাসনচ্যুত হইবার সূচনার সময়ে তিনি ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, এম, এ পরীক্ষার ৮ বৎসর পরে পিত্রাদেশে বি, এল, পরীক্ষায় উপস্থিত হন এবং উহাতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, যশোহর জেলায় ওকালতী আরম্ভ করেন। তথায় ৪ বৎসর ওকালতী করিয়া হাইকোর্টের উকিল হয়েন; এবং অল্প দিন হাইকোর্টে কার্য্য করার পরে তাঁহার পিতার শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ পুনরায় যশোহরে আসিতে বাধ্য হন, এবং তদবধি যশোহরেই ওকালতী করিতেছেন।

ওকালতী আরম্ভ করিবার অল্পকাল মধ্যেই ইনি যশোহর ও খুলনার অন্যতম প্রধান উকিল হইয়া উঠেন। যখন ১৮৮৯। ৯০ সালে যশোহর জেলা নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়, তখন রায় যদুনাথ প্রপীড়িত প্রজাবর্গের প্রধান আশ্রয় ছিলেন। দরিদ্র প্রজাদিগের নিকট হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ না করিয়া তিনি নীলকরের উপদ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। ভারতবন্ধু স্বর্গীয় ব্রাড্‌লী সাহেবের দ্বারা তিনি পার্লিয়ামেণ্ট পর্য্যন্ত উক্ত প্রজাদের দুঃখ-কাহিনী জানাইয়াছিলেন এবং পার্লিয়ামেণ্ট হইতে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টে কৈফিয়ৎ তলবও হইয়াছিল। ইহাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলেই যশোহরের মাগুরা ও ঝিনাইদহ মহকুমা হইতে নীলের চাষ একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। ওকালতী ব্যবসায়ে ইনি চিরদিনই নিঃসম্বল ও প্রপীড়িত দীন-দরিদ্রগণের আশ্রয়-স্বরূপ।

ইনি যশোহর হইতে প্রথমতঃ "সম্মিলনী" নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় এক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশ করেন। কতিপয় কারণে কিছু দিন পরে ঐ পত্রিকা উঠাইয়া দিয়া, বিগত দশ বৎসর হইতে "হিন্দু-পত্রিকা" সম্পাদন করিতেছেন এবং কয়েক বৎসর হইতে "ব্রহ্মচারিণ" নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেছেন।

ওকালতী ব্যবসায়ে তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জিত ধনের অল্পাংশই তিনি নিজে ভোগ করেন। দীন-দরিদ্র ও বিদ্যানুরাগী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও সাহিত্য-সেবী এবং সাধু-সন্ন্যাসী গণের জন্য তাঁহার বদান্যগার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। যশোহর জেলার উপর তাঁহার প্রিয়বন্ধু জমীদার বাবু অক্ষয়কুমার মিত্রের সহিত একযোগে "সম্মিলনী ইনষ্টিটিউসন" নামক এনট্রেন্স স্কুল পোষণ করিতেছেন। উহাতে বহু হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র বালক "ফ্রি", "হাপ্ ফ্রি" হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। তাঁহার স্থাপিত যশোহরে "ব্রহ্মচারি আশ্রম" তৎ সংসৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র ও সুবৃহৎ পুস্তকালয় ঐ স্থানের গৌরব স্বরূপ। এতদ্ব্যতীত নিজ পৈত্রিক বাসভূমি লোহাগড়া গ্রামেও তৎস্থাপিত এক দাতব্য চিকিৎসালয় ও এনট্রেন্স স্কুল ও তাঁহার দেশহিতৈষিতা বদান্যতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। নিজ গ্রামেও তাঁহার প্রজাবর্গের হিতার্থ তাঁহার জমীদারীতে কতিপয় পুষ্করিণী, রাস্তা প্রভৃতি বিবিধ সাধারণ হিতকর পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া, বঙ্গের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত অধ্যাপকমণ্ডলীর অর্চ্চনা ও দীন-দুঃখিগণকে যথেষ্ট দানাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

বিগত ৬ বর্ষ যাবৎ রায় যদুনাথ যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত হইয়া, সহরের স্বাস্থ্য, শোভা ও সুবিধা সম্বন্ধে নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট তাঁহার কার্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ইংলণ্ডে রাজাধিরাজ সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক সময়ে তাহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। উপাধির কথা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই, এবং তজ্জন্য তিনি কখনও

কোনরূও চেষ্টাও করেন নাই। এই উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ তিনি সর্ব্ব প্রথমেই বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব পরলোকগত ছোট লাট উডবর্ণ সাহেবের স্বহস্ত লিখিত পত্রে পরিজ্ঞাত হন। উক্ত ছোটলাট সাহেব যখন যশোহরে আগমন করেন, তখন তিনি প্রকাশ্য দরবারে বলেন যে, "এদেশে রাজপ্রদত্ত উপাধি লাভের আশায় অনেক স্থলে অনেক প্রকার চেষ্টা-তদ্বির হইয়া থাকে, কিন্তু রায় যদুনাথ বাহাদুরের পক্ষে এই উপাধি তাঁহার সম্পূর্ণ অচেষ্টা সম্ভূত, পরন্তু তাঁহার সংপূর্ণ কৃতিত্বের ফল মাত্র। অতএব তাঁহার এই উপাধি শুধু কেবল তাঁহাকেই সম্মানিত করে নাই, ফলে ইহা বস্তুতঃ যশোহরবাসীমাত্রেরই সম্মানের হেতুভূত হইয়াছে।"

ইনি যখন "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, তখন বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশীয় অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাঁহার নিকট বিস্তর আনন্দ-প্রকাশক পত্রাদি প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং এতদ্দেশীয় অনেক সংবাদপত্র এই উপাধি-প্রাপ্তি-উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশের সহিত আবার ইহা বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশও করিয়াছিলেন যে, গবর্ণমেণ্ট যদুবাবুর চেয়ারম্যান পদের কার্য্যকারিতার পুরস্কার স্বরূপ এই রাজসম্মান প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সাহিত্য জগতের প্রসিদ্ধি ও প্রতিপত্তির কিছুই উল্লেখ করিলেন না!

নিজের নিয়মিত বৈষয়িক কার্য্য—ওকালতী, তদ্ভিন্ন মিউনিসিপালিটীর সভাপতিত্ব, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সদস্যত্ব, তদ্ভিন্ন যশোহরে ও স্বগ্রামে এন্‌ট্রান্স স্কুল, স্বগ্রামস্থ ডাক্তারখানা, যশোহরের ব্রহ্মচারি আশ্রম, ছাপাখানা, "হিন্দু পত্রিকার" ও 'ব্রহ্মচারি" পত্রিকা সম্পাদন, নিজের জমীদারী রক্ষণ ও পালন ইত্যাদি বহু সংখ্যক বিভিন্ন গুরুতর কার্য্যভার পরম্পরার সুনির্ব্বাহ করিয়াও, তিনি তাঁহার চির সেবিত নিজের প্রিয় শাস্ত্র সাহিত্য-সেবা অদ্যাপি পূর্ণ ভাবেই অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

রায় যদুনাথ প্রথমতঃ যখন সংস্কৃত কালেজের শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হয়েন, তখন হইতেই সংস্কৃতের উপর তাঁহার অকাতর আসক্তি জন্মে। সেই হইতেই সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্য-সেবায় ব্রতী থাকিয়া, পরে নেপালে অবস্থিতির সময় তথায় অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক অনেক সন্ন্যাসীর নিকট

বেদান্ত সাংখ্যপাতঞ্জলাদি দর্শন শাস্ত্র ও অপর নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। সেই হইতে এ যাবৎ তাঁহার সংস্কৃত শাস্ত্র-সেবা দিন দিন উন্নতির সহিত অব্যাহত আছে। গত কয়েক বৎসর যাবৎ প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রের রত্ন-ভাণ্ডার হইতে অনেক মহার্হ রত্ন সংগ্রহ করিয়া, তিনি হিন্দুপত্রিকায় স্বদেশীয় নিকট প্রকাশ করিয়াছেন।

তাঁহার আমিত্বের প্রসার নামে যে গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গের প্রত্যেক চিন্তাশীল সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। সকলেরই মতে "আমিত্বের প্রসার" বাঙ্গালা সাহিত্যে এক খানি সমুজ্জ্বল নূতন অলঙ্কার। এতদ্ব্যতীত পরিব্রাজক সূক্তমালা, "শ্রেয় ও প্রেয়" গ্রন্থ ও গীতাত্রয় প্রভৃতি কতিপয় পুস্তক উল্লেখযোগ্য।

তৎকৃত শাণ্ডিল্যসূত্রের ইংরাজী টীকা-গ্রন্থ প্রাচ্য শাস্ত্রসেবী পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহার সম্পাদিত "ব্রহ্মচারি" পত্রিকাতেও বিস্তর মহোপকারী মহার্হ প্রবন্ধনিচয় প্রকাশিত হইয়া, বিষয়ভেদে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইবার জন্য প্রস্তুত আছে। রায় যদুনাথ বাহাদুরের রচনার নমুনা তাঁহার প্রণীত বহুদিন পূর্ব্বপ্রকাশিত "শ্রেয় ও প্রেয়" গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"ভারতবাসিগণ পূর্ব্বাপেক্ষা যে অধিক প্রেয়-প্রিয় হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জ্বলন্ত পাবকরূপ প্রেয়ের রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া, পতঙ্গের ন্যায় ভারতবর্ষীয় নর-নারিগণ উহাতে পতিত হইয়া, আপনাদিগের বিনাশ-সাধন করিতেছেন। ভারতবাসিগণ বর্ত্তমান সময়ে কেবল স্রক্ বণিতাদি বৈষয়িক সম্ভোগই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে। অর্থের কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা হইলেই, প্রায় পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া, প্রেয়-নিকেতন কলিকাতা প্রভৃতি নগরীতে রম্য-হর্ম্ম সংস্থাপন করা, কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করা ও ভার্য্যাকে আপাদ-মস্তক হীরকাদি খচিত স্বর্ণাভরণে ভূষিত করাই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগের জীবনের প্রধান কার্য্যস্বরূপ হইয়াছে। হাকিম, উকীল, ডাক্তার, জমিদার—সকলেই এক পথের পথিক।"

রায় যদুনাথ ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দ্দূ, গুরুখা, গুরুমুখী,

উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন। পার্শীও কিঞ্চিৎ জানেন। সংক্ষেপতঃ দাক্ষিণাত্যের তেলেগু, তামিল মারহাট্টি ভাষা ব্যতীত তিনি প্রচলিত আর কতকগুলি ভাষাই জানেন। বিদ্যানুরাগিতাই যদুনাথ বাবুর জীবন। সাহিত্যসাধনই তাঁহার হৃদয়ানন্দবৰ্দ্ধক। বিশেষতঃ সংস্কৃতশাস্ত্র ও বঙ্গ-সাহিত্য-সেবাই তাঁহার চিত্ত-পিপাসার পরিতর্পণ। অধুনা সই ভাবে—সেই জীবনেই তাঁহার অবস্থিতি।

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়।

"জেলা নদীয়া থানা নওয়াপাড়ার অধীন সিমলা গ্রামে ইংরাজী ১৮৬১ সালের ১লা মাঘ শুক্রবার অপরাহ্নে আমি জন্মগ্রহণ করি। প্রসবান্তে আমার মাতা আমাকে মৃত বলিয়া ত্যাগ করেন। পোড়াদহর সন্নিকট মীরপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট একটা পুরাতন কুঠী দেখিতে পাওয়া যায়। এই কুঠীর সাহেবদের এক বিলাতী ধাত্রী ছিলেন। তিনি নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা আমাকে সঞ্জীবিত করেন।

আমার পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়। মাতার নাম সৌদামিনী দেবী। আমরা বারেন্দ্র শ্রেণীর রোহিলা পটির কুলীন। রাজসাহীর বৈদ্যনাথ বাগচী নামে একজন প্রধান লোক ছিলেন। সংস্কৃত এবং পারসী ভাষায় তাঁহার সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। আমার মাতা তাঁহারই কন্যা। আমরা রাজসাহীর অন্তর্গত গুড়নই গ্রামের মৈত্রেয় বংশ। আমাদের মধ্যে কামদেব মৈত্রেয় ফরিদপুর জেলার নিকটবর্ত্তী মেখনা গ্রামের জমিদার বংশে বিবাহ করেন। সেই হইতে রাজসাহীর বাসস্থলী পরিত্যক্ত হয়। ফরিদপুর জেলায় রুক্মিণী গ্রামে কামদেবের বংশধরগণ বাস করিতে আরম্ভ করেন। পিতামহ গোপীকৃষ্ণ চট্টগ্রামে ওকালতী করিতেন। পিতামহ উমাকান্ত কোন বিষয়কর্ম্ম করিতেন না। তিনি তিন বিবাহ করেন। মথুরানাথ তাঁহার প্রথম পক্ষের সন্তান। নীলকরদিগের দৌরাত্ম্যে রুক্মিণী গ্রাম হইতে পিতামহী পুত্র-কন্যা লইয়া, তাঁহার পিত্রালয় কুমারখালি

গ্রামে পলায়ন করেন। সেই হইতে আমরা কুমারখালিতে আসি। কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার ও আমার পিতা মথুরানাথ বাল্য-সুহৃদ্ এবং কুমারখালির অধিকাংশ উন্নতির মূল। নীল-বিদ্রোহের সময়ে এই দুইজনের নিকট হইতে হিন্দুপেটরিট সম্পাদক ৺হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং প্রভাকর সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—মফস্বলের অনেক সংবাদ পাইতেন।

এই সময় মথুরানাথ, কুমারখালি ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন। তখন হরিনাথ, মথুরানাথ এবং তাঁহাদের সমবয়স্ক কুমারখালির যুবকগন অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা পাঠ করিতেন এবং তাঁহাকে আদর্শ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেন। তজ্জন্য তাঁহারা একটী বঙ্গ বিদ্যালয় এবং একটি বালিকা-বিদ্যালয় কুমার-খালিতে স্থাপিত করেন। হরিনাথের বিজয়বসন্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর, গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা নামক সাপ্তাহিক পত্রের সূচনা হয়।

এই সকল বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মথুরানাথের প্রথম সন্তান আমি। আমি ইহাঁদের সকলের স্নেহের পাত্র হই। "এই বালক বাঙ্গালা সাহিত্যের যাহাতে উন্নতি করে, এইরূপ শিক্ষাই ইহাকে দিতে হইবে," এই উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের নাম স্মরণে আমার নামও অক্ষয়কুমার রাখা হয়। হরিনাথই আমার এই নামকরণ করেন এবং তিনিই আমার সাহিত্য-পথের গুরু।

আমার জন্মের পর পিতা ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য রাজসাহী গমন করেন। সে বৎসর পরীক্ষা গৃহীত হয় না। পিতা রাজসাহীতে গবর্ণমেন্টের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া রাজসাহীবাসী হন। গত অর্দ্ধোদয়ের পূর্ব্ব অর্দ্ধোদয় যোগের সময় আমি রাজসাহীতে নীত হই।

বাল্যকালে দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি কখন কুমারখালিতে, কখন বা রাজসাহীতে থাকিতাম। হরিনাথের বঙ্গবিদ্যালয়ের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শ্রীযুত জলধর সেন এবং আমি একসঙ্গে বিদ্যারম্ভ করি। আমরা তিনজনই হরিনাথের নিকট বিদ্যা ও রচনা শিক্ষার উপদেশ পাইয়াছি।

১৮৭১ সালে বোয়ালিয়া-গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে আমার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ। ১৮৭৪ সাল হইতে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, পণ্ডিত শিবচন্দ্রের পিতা চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশের নিকট, আর রামকুমার বিদ্যারত্নের (স্বামী রামানন্দ ভারতী) নিকট এবং বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। বিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক দিগের মধ্যে পণ্ডিত হরিশ্চন্দ্র গোস্বামী এবং পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন,—ইহাঁরাই এক্ষণে জীবিত আছেন।

১৮৭৮ সালে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, রাজসাহী বিভাগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম হই এবং গবর্ণমেণ্ট হইতে পনর টাকার বৃত্তি পাই। তখন বোয়ালিয়া গবরমেণ্ট স্কুল রাজসাহী কলেজে পরিণত হইয়াছে। ঐ কলেজে এফ-এ পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া, গবরমেণ্ট হইতে কুড়ি টাকা বৃত্তি পাই। এই সময় পাবনা জেলার অন্তর্গত তাঁতিবন্দর নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার স্বর্গীয় অন্নদাগোবিন্দ চৌধুরীর তৃতীয় কন্যা হৃদ্‌কমল দেবীর সহিত আমার বিবাহ হয়। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই, কলেজে রসায়ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠ সমাপ্ত করি। অধ্যয়ন শ্রমে ক্রমে অসুস্থ হইতেছি বলিয়া, পিতা আমাকে এম এ পরীক্ষা হইতে নিরস্ত করিয়া, ওকালতী পরীক্ষা দিবার জন্য পাঠার্থ রাজসাহীতে লইয়া যান। রাজসাহী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ১৮৮৫ সাল হইতে রাজসাহীতে ওকালতী করিতেছি। শৈশবে যে পাঠানুরাগ ও বঙ্গসাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়াছিলাম, তাহা ক্রমে বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হইয়াছে।

প্রথম আমি কবিতা লিখি; বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গ বিজয়ের প্রচলিত বিবরণ যে সর্ব্বথা কাল্পনিক, এই ধারণায় বঙ্গবিজয় নামে আমি প্রথম কাব্য লিখি। ঐ গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। গৃহদাহে অপ্রকাশিত বাল্য-রচনা পুড়িয়া গিয়াছে। বাল্যকালের অনেকগুলি রচনা রাজসাহীর "হিন্দুরঞ্জিকা" ও কুমারখালির "গ্রামবার্ত্তায়" প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড লিটন প্রেস এক্ট পাশ করায় বৃদ্ধ হরিনাথকে অবসর দিয়া, আমি, জলধর ও প্রসন্ন

চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক হরিনাথের জনৈক ছাত্র "গ্রামবার্ত্তা" সম্পাদনের ভার গ্রহণ করি। এই কালের মধ্যে স্বদেশের নানা ঐতিহাসিক বিবরণ ঐতিহাসিক চিত্র নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিবার কল্পনা করি। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সনে সমর সিংহ নামক গ্রন্থ প্রকাশ করি। এই গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকগণের মধ্যে অতি অল্প সময়েই বিক্রীত হইয়া যায়। ইহার লভ্য জাতীয় ধন ভাণ্ডারে উৎসর্গীকৃত হয়। এফ-এ পড়িবার সময়ে মেকলের ক্লাইব এবং হেষ্টিংসের গ্রন্থ আমাদের পাঠ্য ছিল। ঐ গ্রন্থ অধ্যয়ন উপলক্ষে রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক ডাউডিং সাহেবের সহিত প্রত্যহ আমার বচসা হইত। মেকলের বর্ণনা যে প্রকৃত নহে, তাহা সাহেবকে বুঝাইবার জন্য আমি নানা প্রমাণের অনুসন্ধান করিতাম। এই অনুসন্ধান কার্য্য, দীর্ঘ কাল পরিচালিত হয়। তদুপলক্ষে বাঙ্গলার ইতিহাসের আমি বহু বিবরণ সংগ্রহ করি, তদবলম্বনে বাঙ্গলার ইতিহাস লিখিবার জন্য বন্ধুগণ আমাকে উপদেশ দান করেন। ইতিহাস লিখিবার সময় আসে নাই বলিয়া, রাণীভবানীর জীবন চরিত উপলক্ষ করিয়া, ঐ সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ প্রকাশ করিবার সংকল্প করি। কতকগুলি বিশেষ ঘটনায় "রাণী ভবানী" প্রকাশে বিলম্ব ঘটায়, "সিরাজ-উদ্দৌলার" ঐতিহাসিক চিত্র কবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'সাধন' নামক মাসিক পত্রিকায় প্রেরিত হয়। কিয়দংশ প্রকাশিত হইবার পর "সাধনা" বন্ধ হইয়া যায়। "সিরাজউদ্দৌলা"র অবশিষ্টাংশ "ভারতী"তে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে "সাহিত্যে" সীতারামের ঐতিহাসিক চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে "সাহিত্যে" রাণী ভবানীর প্রথমাংশ ও "ভারতীতে" 'মীরকাশিম' সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। মীরকাশিমের কিয়দংশ মীরজাফর নামে "সাহিত্যে" প্রকাশিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ, ভারতী পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলে, তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে, ঐতিহাসিক চিত্রনামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করি। ঐ পত্র এক বৎসরের অধিক চলে নাই।

বড় লাট লর্ড কর্জ্জন যখন গৌড় দেখিতে যান, তখন তিনি হিন্দুদের

সময়ে গৌড় কিরূপ ছিল, তাহা জানিবার জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরীর অনুরোধে লর্ড কর্জ্জনের পাঠের জন্য আমি Gour under the Hindus নামক এক ইংরেজী প্রবন্ধরচনা করি। এ গ্রন্থ কেবল বিতরণার্থ মুদ্রিত হয়। আমি এসিয়াটিক সোসাইটীর মেম্বর এবং এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে আমি লক্ষ্মণ সেনের তাম্রলিপি প্রকাশ করিয়াছি।

বাল্যকাল হইতে স্বদেশ-হিতের জন্য নানারূপ সভা-সমিতির সহিত আমার যোগ ছিল। আমি রাজসাহী ছাত্র-সভা, কলিকাতা ষ্টুডেন্স এসোসিয়েশন নামক ছাত্রসভা, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং রাজসাহী এসোসিয়েশনের সভ্য। সাত বৎসর কাল রাজসাহী এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলাম। রাজসাহীর মিউনিসিপ্যালিটি, লোকালবোর্ড, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সভ্যরূপে দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছি। আমি কখন নির্ব্বাচক হইবার জন্য প্রার্থী হই নাই। প্রতিবারই গবরমেণ্ট আমায় মনোনীত করিয়াছেন।

ইহাঁর সম্বন্ধে আমরা আরও যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহা এই,—"ডায়মণ্ড জুবিলির সময়ে বক্তৃতায় বত্রিশ হাজার টাকা উঠে। এই টাকায় রেশম-শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। ইনি পাঁচ বৎসর কাল এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। কলিকাতায় যে বার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, সেবার ইনি স্বয়ং বহুলোকের সমক্ষে প্রদর্শনীতে রেশম-শিল্পের নানা অঙ্গের প্রদর্শন করেন।

রাজসাহীতে সংস্কৃত নাটক—যথা শকুন্তলা বেণীসংহার প্রভৃতির অভিনয়ের ইনি সূত্রপাত করেন। ইহাঁর উদ্যোগে রাজসাহীতে যে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হয়, তাহা দেখিয়া পরলোকগত ছোট লাট বাহাদুর পরম প্রীতি লাভ করেন। বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত,—যথা মদনগোপাল গোস্বামী, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, বর্দ্ধমান-রাজ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরিনাথ বেদান্তবাগীশ,—এই অভিনয় দেখিয়া সংস্কৃত শ্লোকনিবদ্ধ অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন।

ক্রিকেট-খেলা এবং চিত্রাঙ্কণে ইনি সুপটু। রেশম-শিল্পের সকল বিষয়েই ইনি অভিজ্ঞ।

প্রত্যহ স্নানের পর ইনি মাতৃ প্রণাম না করিয়া জলগ্রহণ করেন না। গবরমেণ্ট দুইটী বিষয়ে ইহাঁর প্রতি সুবিবেচনা করিয়াছেন। বে-সরকারী বহু লোকে গবর্নমেণ্টের জন্য খাটিয়া থাকেন, গবরমেণ্ট প্রায়ই সরকারী রিপোর্টে তাঁহাদের সুস্পষ্ট নামোল্লেখ করেন না। কিন্তু ইনি রেশম-শিল্প সম্বন্ধে যে যে কার্য্য করিয়াছেন, গবরমেণ্ট স্থানীয় রিপোর্টে তাহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

সংস্কৃত, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা ভাষায় ইনি তুল্যরূপ ব্যুৎপন্ন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শকাব্দাঃ ১৭৭১।২ জ্যৈষ্ঠ সোমবার কৃষ্ণা-সপ্তমী শ্রবণা নক্ষত্রে মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে বেলা অনুমান দেড় প্রহরের সময়ে আমার জন্ম। পাণ্ডুগ্রাম আমার বর্ত্তমান বাসস্থান গঙ্গাটিকুরী হইতে ঈষৎ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ ক্রোশ। গঙ্গাটিকুরী,—বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী।

পিতাঠাকুর পূর্ণিয়ার উকীল ছিলেন। আমার যখন সাত মাস বয়ঃ-ক্রম, তখন পিতা মাতার সঙ্গে প্রথম পূর্ণিয়া যাই। নবম বর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণি-য়াতেই থাকিতাম; কেবল বৎসর বৎসর ৺ শারদীয় পূজার সময়ে গঙ্গাটিকুরীর বাটীতে আসিয়া মাসেক-দেড়মাস থাকিতাম। পূর্ণিয়ায় প্রচলিত ভাষা হিন্দী বা উর্দ্দূ।

পঞ্চমবর্ষ বয়সে আমার হাতে-খড়ি হইয়াছিল। গুরু মহাশয় বলাই সরকার আমাদের সঙ্গে বিদেশে থাকিতেন, তাঁহারই কাছে বিদ্যারম্ভ বলিতে হইবে।

বাঙ্গলা লেখা-পড়া কিছু ভাল করিয়া শেখা হইল না; বোধ করি, ষষ্ঠবর্ষেই পূর্ণিয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলে আমি ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। ঐ স্কুলে তখনকার থার্ডক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। ইংরেজীই পড়িতাম, উর্দ্দু অতি অল্প, বাঙ্গলা মোটেই পড়িতাম না। বাঙ্গালায় অক্ষর পরিচয় মাত্র ছিল, কিন্তু সেকালে শ, ষ, স, ণ, ন, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতির আধুনিক অত্যা-চার ছিল না, কাজেই আমিও তখন তদ্দ্বারা উপক্রুত হই নাই।

পূর্ণিয়াতে পঠদ্দশায় দুইখানি ছাবা বাঙ্গলা বহি দেখা আমার মনে পড়ে,—(১) রবিন্‌সন্ ক্রুশো, (২) পশ্বাবলী। দুই খানিতেই ছবি ছিল; তাহাই দেখিয়াছিলাম; কিন্তু বহি পড়িয়া দেখা মনে হয় না।

আট বৎসর বয়সের সময়ে আমার উপনয়ন,—গঙ্গাটিকুরীতে হইয়াছিল। নবমবর্ষে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। তাহাও টিকুরীতে।

পিতৃবিয়োগে আমরা আর পুর্ণিয়া গেলাম না। কৃষ্ণনগর কালেজে পড়িতে গেলাম। যখন ভর্ত্তি হই, তখন সেসনের অন্তিমকাল, সেই কারণে আমাকে সেবেন্থ ক্লাসে ভর্ত্তি হইতে হইয়াছিল। অল্পকাল পরেই বাৎসরিক পরীক্ষা উপস্থিত, আমিও অবশ্য পরীক্ষা দিলাম। ইংরেজীর পরীক্ষা যেমন হউক, দিয়াছিলাম; কিন্তু বাঙ্গালাতেই আমাকে বিব্রত করিয়াছিল। ক্লাসে বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলী' পড়া হইত, কিন্তু আমি তাহা পড়ি নাই; বোধ করি, পড়িবার সুযোগই পাই নাই। বাঙ্গলা পরীক্ষার দিনে 'চরিতাবলী'র এক স্থান আবৃত্তি করিতে হইয়াছিল, তাহা কোনও প্রকারে আবৃত্তি করিলাম। তাহার পর পরীক্ষক বলিলেন,—'শব' বানান কর।" আমি বলিলাম 'শ' আর 'ব'। কোন্ শ, অর্থাৎ তালব্য, দন্ত্য বিশেষণ দিয়া বলিতে কখনও শিখি নাই, বলিতেও পারিলাম না। এখন যেমন বর্গ্য ব, অন্তঃস্থ ব, বলিতে হয় না, আমি জানিতাম যে, 'শএর'ও সেই দশা। কিন্তু পরীক্ষক, তাহা বুঝিতে পারেন নাই; প্রশ্ন করিলেন—"কোন্ শ?" আমি অম্লান বদনে উত্তর দিলাম—"কোন্ শ?—শ। আর কি?" পরীক্ষক এক প্রস্ত পরাস্ত হইলেন। তিনি পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, "শব' মানে কি?" আমি উত্তর দিলাম—"তামাম্"। পরীক্ষক বলিলেন, "বাঙ্গলা শব্দ বল;" আমি তখন বলিলাম,—"বিলকুল"। পরীক্ষা সুসম্পন্ন হইল। এ ঘটনা আমার বিলক্ষণ রূপেই মনে আছে। পরীক্ষান্তে ষষ্ঠ ক্লাসে উন্নীত হইয়াছিলাম।

অধিক দিন কৃষ্ণনগরে পড়া হইল না। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরও কৃষ্ণনগরে পড়িতেন, তিনি পীড়িত হইলেন। কঠিন জ্বর-প্লীহাদি। কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিলাম। কিছুকাল পরে আমার জ্যেষ্ঠের সহিত বীরভূমে পড়িতে গেলাম। ইহা বোধ হয়, ১২৬৪ কি ১২৬৫ সালে।

বীরভূম গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রথমতঃ ভর্ত্তি হই। তাহার পর দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়াও কিছুকাল সেখানে পড়িয়াছিলাম। মোটের উপর দুই বৎসর কি কিছু কম বীরভূমে পড়িয়াছিলাম। এত

কাল পর্য্যন্ত আমার জ্যেষ্ঠ অল্পাধিক পীড়াই ভোগ করিতেছিলেন। মনে হইতেছে, ১২৬৭ সালের কার্ত্তিক মাসে জ্যেষ্ঠের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইতিমধ্যে ১২৬৬ সালের ১৩ ফাল্গুন গঙ্গাটিকুরীর পার্শ্ববর্ত্তী বালুটিয়া গ্রামে ৺ বনয়ারিচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে আমি বিবাহ করি। এই পত্নীই বর্ত্তমান আছেন।

জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হওয়াতে আর বীরভূমে থাকা হইল না। ভাগলপুরে আমার পূর্ব্বপুরুষের সময় হইতে আমাদের বাসনের ব্যবসা ছিল, সেখানে আমাদের লোক জন থাকিত, বিশেষতঃ এক পিতৃব্যপুত্র (জ্যেঠতুতা দাদা) সেখানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। এই কারণে ভাগলপুরে পড়িতে গেলাম। সেখানে গবর্ণমেণ্ট স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া, ক্রমে ১৮৬৩ সালের ডিসেম্বরে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া ভাগলপুর ত্যাগ করি।

বীরভূমেই বাঙ্গলা শিখিতে আরম্ভ করি। ভাগলপুরে বাঙ্গলা শিখিবার সুযোগ ছিল না, উর্দ্দু পড়িতাম। কিন্তু এনট্রান্স পরীক্ষা বাঙ্গলাতেই দিয়াছিলাম। সে কেবল বাহুবলে বলিতে হইবে। কেননা তখন পর্য্যন্ত বাঙ্গলা কিছু শেখা হয় নাই।

এনট্রান্স্ পাস্ করিয়া কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়িতে গেলাম। আগে কখনও কলিকাতা দেখি নাই। কলিকাতা গিয়া আমার শরীর ভাল ছিল না, মনও ভাল ছিল না। ৩।৪ মাস পরেই স্কলার্সিপ ট্রান্সফর করাইয়া হুগলী কালেজে আসিলাম।

আমি আজন্মই অলস। পড়া-শুনায় আমার অ টা হয় না। ১৮৬৫ সালের ৺ শারদীয় পূজার সময়ে বাটী আসিয়া আমার প্রবল জ্বর হয়। অগ্রহায়ণ মাসে পরীক্ষার সময় পর্য্যন্ত আমার জ্বর; কাজেই পড়া হইল না। তথাপি পরীক্ষা দিলাম, যথাবিধি ফেল হইলাম। যে যে বিষয়ে না পড়িলেও পরীক্ষা দেওয়া যায়, তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম—হিষ্টরী এবং মাথেমাটিক্সে ফেল হইয়াছিলাম; ইংরেজী, ফিলজফি এবং বাঙ্গলাতে ফেল হই নাই। সেই বারের পরই বাঙ্গলায় পরীক্ষা দেওয়া উঠিয়া গেল।

ফেল্ হইয়া দুঃখ হইয়াছিল, লজ্জাও হইয়াছিল। হুগলী কালেজে

আর ফিরিয়া গেলাম না। কলিকাতায় গিয়া ফ্রী-চর্চ্চে ভর্ত্তি হইলাম। ফ্রী ছাত্র হইয়া ভর্ত্তি হইবার প্রার্থনা করাতে কর্ত্তৃপক্ষ বলিলেন যে, "এক মাস তোমাকে ফ্রী রাখিব', যদি মাসিক পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিতে পার, উত্তম নচেৎ ইহার পর বেতন দিতে হইবে। 'তথাস্তু' বলিয়া লাগিয়া গেলাম; কিন্তু পথে দুই কণ্টক—সংস্কৃত জানি না; বাইবেলেও পরীক্ষা দিতে হয়।

বিদ্যাসাগরের উপক্রমণিকা ব্যাকরণের কৃপায় স্বল্পকাল মধ্যেই নাগর-অক্ষর-পরিচয় এবং শব্দরূপ কিঞ্চিৎ আদায় করিলাম। বাইবল্ সম্বন্ধে একটু ভক্ত-বিটল হইলাম। তাহার ফলে মাসিক পরীক্ষায় উচ্চ স্থানই অধিকার করিলাম। বৃত্তিও পাইলাম। মাসে মাসে এইরূপ বৃত্তি পাইতে থাকিলাম। ক্রমে ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষা দিবার পূর্ব্ব রাত্রিতে আমার ভেদ বমি হওয়াতে আমি বড়ই কাতর হইয়াছিলাম। জাড়া নিবাসী যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় আমার সুহৃৎ ছিলেন, তাঁহার এবং অপর এক সুহৃৎ ডাক্তার্ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শুশ্রূষায় আমি রক্ষা পাই এবং কাতর অবস্থাতেই পরীক্ষা দিই।

হুগলী কলেজের প্রিন্সিপাল Thwaytes (থোয়েটস্) সাহেব আমাকে—আম'কে কেন প্রায় সকল ছাত্রকেই—খুব ভাল বাসিতেন। ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হইয়াছি, দেখিয়া, তিনি আমাকে জোর করিয়া হুগলী কালেজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। থার্ড ইয়ার্ এবং ফোর্থ ইয়ারের অর্দ্ধেক হুগলী কলেজে পড়িলাম। তখন শতকরা পঁচাত্তর দিন কালেজে উপস্থিত হইয়া নিয়ম প্রচলিত হওয়াতে দেখিলাম যে, আমি হুগলী হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিতে পাইব না। অগত্যা একটু নীতি খাটাইয়া কলিকাতার (Cathedral missoin) কেথিড্রাল মিশন কালেজে ট্রান্সফার হইয়া গেলাম। সেই খান হইতে বি, এ, পরীক্ষা দিলাম। ১৮৬৯ জানুয়ারিতে আমি গ্রাজুয়েট হইলাম।

পরীক্ষার পর ছয় সাত মাস গঙ্গাটিকুরীতে বসিয়া কাটাইলাম। তাহার পর এ অঞ্চলের তৎকালীন ডেঃ ইন্‌স্পেক্টর বিষ্ণুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে এবং অনুরোধে আমি মাষ্টারি স্বীকার করিয়া বীরভূম

জেলার হেতমপুর স্কুলে মাস দুই হেড মাষ্টার হইয়াছিলাম। এমন সময়ে বর্দ্ধমান জেলার ওকড়সা গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টারী পাওয়াতে আমি হেতমপুর ত্যাগ করিলাম। ওকড়সায় বৎসরের শেষ কয় মাস কাটাইয়া ১৮৭০ সালের প্রারম্ভে আবার কলিকাতায় গিয়া (B. L.) বি, এল পরীক্ষার লেক্‌চর সারা করিলাম এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারীতে পরীক্ষা দিয়া নিতান্ত ঠেলাঠেলি করিয়া বি-এল হইলাম। ১৮৭১ সালের মার্চ্চ মাসে হাইকোর্টে নাম লেখাইলাম; এবং সেই হইতে হাইকোটের জয়পত্র মাথায় বান্ধিয়া ভবের ঘানিতে যোড়া রহিয়াছি।

আমার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে স্থূলকথা এই যে, আমি অল্পই পড়িয়াছি; তবে, অল্প যাহা পড়ি, তাহা সুজীর্ণ করি, তাহাতে অম্লোদ্‌গারাদি হয় না, বলাধানই হয়। আর এক কথা এই যে, আমার পড়া-বিদ্যা অপেক্ষা কুড়ান বিদ্যা বেশী। আমি কুড়াইয়া বহুবিদ্যা লাভ করিয়াছি।

আমার পিতাঠাকুরের কর্ম্মস্থান পুর্ণিয়াতেই আমি প্রথম ওকালতী করিতে গিয়াছিলাম। আমার পিতাঠাকুর পারসী ভাল জানিতেন এবং সাতিশয় দান-শৌণ্ড ছিলেন। 'মুন্সীজী' বলিলে, যেন পারিভাষিকরূপে তাঁহাকেই বুঝাইত। দীর্ঘকাল পরে ১৮৭১ এপ্রিল কি সালের মে মাসে পুর্ণিয়া গিয়া দেখিলাম যে, লোকে আমাকে "মুন্সীজীকা লেড়কা" বলিয়াই চিনিতেছে; এবং পরিচয় করিয়া দিতেছে। তাহাতে আমার বড়ই আহ্লাদ হইয়াছিল। পিতৃ গৌরবে আমার বড়ই গৌরব মনে হয়।

পুর্ণিয়াতে দীর্ঘকাল থাকা হইল না। মাস দুই মধ্যেই আমি মুনসেফি পাইয়া, ঐ জেলায় ডগুখোবা চৌকীতে গেলাম। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত মুন্সেফ ছিলাম, কিন্তু জ্বরে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ৺পূজার বন্ধে বাড়ী আসিয়া আর সেখানে ফিরিয়া গেলাম না। আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে দিনাজপুরে ওকালতী করিতে গেলাম। ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর পর্য্যন্ত দিনাজপুরে কাজ করিয়া, হাইকোটে ওকালতী করিতে ইচ্ছা হইল।

কলিকাতা হাইকোর্টে ১৮৮১ সালের জুলাই কি আগষ্ট পর্য্যন্ত ছিলাম। তাহার পর হইতে বর্দ্ধমানে আছি।

আমার বংশ পরিচয় এইরূপ,—প্রপিতামহ ঠাকুর অভয়াচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাটিকুরীর ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের গৃহে বিবাহ করিয়া গঙ্গাটিকুরীতেই বাস করেন। পূর্ব্বে শ্রীখণ্ডের অনতিদূরস্থ গাঁফুলিয়া গ্রামে আমার পূর্ব্বপুরুষদের বাস ছিল। প্রপিতামহের তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ঠাকুর ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতামহ। তাঁহার অনেকগুলি পুত্র-কন্যা, তন্মধ্যে ঠাকুর শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার পিতা। বিমাতা ঠাকুরাণী স্বর্গ প্রাপ্তির পর আমার পিতাঠাকুর পাণ্ডুগ্রামের ঠাকুর ভবানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনিই আমার পরমারাধ্যা জননী।

ইং ১৮৭০ সালে ইংরেজী এন্‌ট্রান্স কোর্সের নোটস্ লিখিয়া গুপ্তপ্রেসে ছাবাইতেছিলাম, সেই সময়ে সেই প্রেসে একখানি বাঙ্গলা নাটকও ছাবা হইতেছিল। মনে হইতেছে, সেই নাটক দেখিয়াই একটুকু ব্যঙ্গ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল; ইচ্ছা হইল; অতি ক্ষুদ্রকায় এক কবিতা পুস্তক লিখিয়া ফেলিলাম, নাম দিলাম—"উৎকৃষ্ট কাব্যং।" গুপ্তপ্রেসেই তাহা ছাবান হইল। যে দিন শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্যানিং লাইব্রেরীতে "উৎকৃষ্ট কাব্যম্" আনা হইল, সেই দিনই মনে হইতেছে—অল্প সময় মধ্যে এক খান একখান করিয়া ১৬ খান পুস্তক বিক্রয় হইল। পুস্তকের মূল্য করিয়াছিলাম ১২॥০ সাড়ে বারো গণ্ডা, অর্থাৎ আড়াই পয়সা, তাহাতে ভারি রঙ্গ হইল, প্রত্যেক ক্রেতাকেই অন্যস্থান হইতে আধলা ভাঙ্গাইয়া আনিতে হইয়াছিল; কেন না, কেহ তিন পয়সা দিতে আসিলে তাহা লওয়া হইত না। যাহা হউক, অল্প সময় মধ্যে ॥৶০ দশ আনা পয়সা পাইয়া, আমরা আমোদ করিয়া মিষ্টান্নাদি কিনিয়া খাইলাম। তাহার পর সে পুস্তকের ভাবনা আর ভাবি নাই। আমি বড়ই অলস এবং কতকটা উদাসীন। তাহার পর ১২৭৯ কি ১২৮০ সালে তৎকালীন দার্জ্জিলিঙ বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব বাক্‌সিনেশন্ আমার প্রিয় সুহৃদ "স্বর্ণলতা" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা যশস্বী ৺ তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কার্য্য উপলক্ষে যখন দিনাজপুরে আইসেন, তখন সাহিত্য সম্বন্ধে বহু আলাপ তাঁহার

সঙ্গে হইত। "স্বর্ণলতার" এক কি দুই অধ্যায় মাত্র তখন লেখা হইয়াছে এবং রাজসাহীর বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাসের "জ্ঞানাঙ্কুর" পত্রে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তারকনাথ আমাকে আপন রচনা দেখাইলেন, এবং "জ্ঞানাঙ্কুরে" লিখিতে অনুরোধ করিলেন। সেই অনুরোধের ফলে ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসের শেষ ভাগে কি জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রারম্ভে আমি "কল্পতরু' লিখি। আমার বাসার উঠানে গুটি-কতক ফুলগাছের সম্মুখে দূর্ব্বাঘাস লাগাইয়াছিলাম। অতি সুন্দর দূর্ব্বাবন উৎপন্ন হইয়াছিল; সুশ্যামল, সুদীর্ঘ—বায়ুভরে দোলায়মান তেমন দূর্ব্বাবন আর বুঝি দেখি নাই। প্রত্যহ কাছারী হইতে আসিয়া সেই দূর্ব্বাবনের উপর মাদুর পাতিয়া,—কবিহৃদয়হারী সুকোমল সান্দ্র সুশীতল সেই সুখাসনে বসিয়া, একটী টীনের বাক্সের উপর কাগজ রাখিয়া "কল্পতরু' লিখিয়াছিলাম। "কল্পতরু" লিখিতে ১৮।১৯ দিন লাগিয়াছিল। "কল্পতরু' রাজসাহী গেল, শ্রীকৃষ্ণদাস মহাশয় পুস্তক পাওয়া সংবাদ দিলেন; তাহার পর, তাঁহার সঙ্কট উপস্থিত হইল,—পুস্তক "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত না হইলে তারকনাথ চটিবেন, হয়ত আমিও চটিব; প্রকাশিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ বাবুর নিজের অপ্রিয় কার্য্য হইবে। অতএব শ্রীকৃষ্ণ বাবু "ন যযৌ ন তস্থৌ" হইলেন। এজন্য আমিও তাগাদা আরম্ভ করিলাম; প্রায় ৫।৬ মাস কি তদধিক কাল পরে, শ্রীকৃষ্ণ বাবু বিনয়পূর্ণ এক পত্রে আমাকে জানাইলেন যে, "কল্পতরু" উপাদেয় গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাহা "ব্রহ্মের" নিন্দাসূচক, কেমন করিয়া তাহা "জ্ঞানাঙ্কুরে" প্রকাশিত হইতে পারে। আমি কৃতার্থ হইলাম, শ্রীকৃষ্ণ বাবুকে অভয় দিলাম, "কল্পতরু" ফিরিয়া পাইলাম। তাহার পরে আপন ব্যয়ে কলিকাতায় ছাবাইয়া গ্রন্থকার হইলাম।

গ্রন্থ রচনার ঝোঁক থামিয়া গেল। তবে মধ্যে মধ্যে অক্ষয় দাদার (শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার) "সাধারণীতে" পত্রে-প্রবন্ধ লিখিয়া সময়ে সময়ে সাহিত্যিক কণ্ডুয়নের নিবৃত্তি করিতাম।

কলিকাতা হাইকোর্টে যখন ওকালতী করি, তখন সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটে কিছুকাল আমার বাসা ছিল। এই বাসায় প্রায়ই সাহিত্যিক

সংঘ হইত। এই সংঘে ৺অঘোরনাথ কুমার একজন নিত্যসেবক ছিলেন। সাহিত্য-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় সমাচার, এবং তদতিরিক্ত রাজনৈতিক গগনের জ্যোতিষ্কগণের গতাগতির স্থূলসূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল অঘোরনাথ নিত্য নিত্য সংগ্রহ করিয়া আমাকে উপঢৌকন দিতেন। তাহাতেই কি জানি কেমন করিয়া, আমার কবি-কণ্ডূতির উদ্রেক হইল। ইং ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঐ সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটস্থ ভবনে "ভারত উদ্ধার" লিখিয়া ফেলিলাম। "ভারত উদ্ধার" রচিতে গোটা তিন বৈকালি নষ্ট হইয়াছিল। বৈকালি বুঝ ত? এ অঞ্চলের খাটুনি খাটা লোকে তিন প্রহর কাজ করে; বিকালে অবশিষ্ট বেলাতে যদি কাজ জুটিয়া যায়, তাহাকে 'বৈকালি' খাটা, বা 'বৈকালি" দেওয়া বলে। আমার "ভারত উদ্ধার"ও সেই "বৈকালির" কাজ। যাহা হউক, "ভারত উদ্ধার" বাজারে বাহির হইল; অমনি দেবগণ মুষলধারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মলয়জ গন্ধে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, পক্ষাপক্ষ নিবৃত্ত হইয়া, দিবারাত্র কেবল কৌমুদী কেলি হইতে লাগিল;—আমার শুভ্র যশো-রাশির ভয়ে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া যেন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগি-লেন। ধরিত্রীকে আমি অভয় দিলাম,—ভয় নাই,—আর বোধ হয়; আমি লেখনী চালাইব না।

অক্ষয় কুমারের আনন্দ রাখিবার স্থান ছিল না; কেন, তাহা পত্রে লিখিব না। 'সাধারণী:তে' সমালোচনার জন্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার দাদাকে একখানি 'ভারত উদ্ধার' দিয়াছিলাম। দাদা তাহা আগাগোড়া তুলিয়া 'সাধারণীর' ক্রোড় আলো করিয়াছিলেন।

ভারত উদ্ধার সম্বন্ধে বহু রঙ্গ বার্ত্তা আছে।

সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীটের বাসাতেই অক্ষয় দাদা আর আমি দুইজনে "হাতে হাতে ফল" নাম দিয়া এক প্রহসন লিখিয়াছিলাম। চুঁচুঁড়াতে তাহা ছাবাও হইয়াছিল, কিন্তু সাহিত্যের বাজারে তাহাকে ছাড়া হয় নাই। অক্ষয় দাদার বাড়ীতে সে পুস্তক থাকিতেও পারে।

তাহার পর ঐ বাসাতেই "পঞ্চানন্দের" সূত্রপাত হয়। অক্ষয় দাদার সঙ্গে এক পরামর্শী হইয়া পঞ্চানন্দ লিখিতে আরম্ভ করি; কিন্তু কতক

কতক লিখিয়া, যাই চুঁচুড়ায় পাঠাইয়া দিলাম, অমনই দাদা তাহা "সাধারণীর" উদরসাৎ করিয়া ফেলিলেন। দুই একবার এইরূপ হইবার পর, একবার চুঁচুড়ায় গিয়া দুই জনে এক খণ্ড পঞ্চানন্দ লিখিলাম; তাহা ছাবানও হইল। কিন্তু আমাদের উভয়েরই আলস্য, এবং ঔদাসীন্য রীতিমত পঞ্চানন্দ চালাইবার অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, একখানি ছাড়া তখন আর পঞ্চানন্দ বাহির হয় নাই।

কলিকাতা হইতে ভবানীপুরে আমার বাসা উঠিয়া গেলে পর, ভূধর গঙ্গোপাধ্যায়—ভূধর চট্টোপাধ্যায় নহেন—প্রভৃতি কতকগুলি যুবক পঞ্চানন্দ বাহির করিবার প্রস্তাব করিয়া আমাকে ধরিয়া বসিলেন। বোধ হয়, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদও তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন। যাহা হউক, তাঁহারা কাগজ চালাইবেন, ছাবাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দেওয়াতে আমি লিখিতে সম্মত হইলাম। 'পঞ্চানন্দ' রীতিমত বাহির হইতে লাগিল।

তাহার পর আমি হাইকোর্ট ছাড়িয়া বর্দ্ধমানে আসিলাম। বর্দ্ধমান হইতে কয়েক খণ্ড পঞ্চানন্দ বাহির করিলাম। কিন্তু রীতিমত কাগজ চালান আমার কাজ নহে, ধারা রাখিতে পারিলাম না।

এই সময়ে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র বসু পঞ্চানন্দের লাগিয়া আমাকে আক্রমণ করিলেন। শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়াও এ আক্রমণে বসুজের প্রবল সহায় ছিলেন। আমি পরাভব স্বীকার করিয়া বঙ্গবাসীতে "পঞ্চানন্দ" দিতে লাগিলাম।

'বঙ্গবাসীর' উপহার দিতে হইবে বলিয়া, আমি 'ক্ষুদিরাম' লিখিতে সম্মত হই। ক্রমে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়া গেল, কিন্তু আমার গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হইল না। মহা সঙ্কটে পড়িয়া বর্দ্ধমানে একদিন এক পরিচ্ছেদ 'ক্ষুদিরাম' লিখিয়া ফেলিলাম; কিন্তু আর লেখা কোনও মতেই ঘটিল না। অগত্যা 'অজ্ঞাত বাসের' ব্যবস্থা করিলাম; বর্দ্ধমান হইতে পলাইয়া, শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভায়ার বাটী শিব-নিবাসে গিয়া ৭।৮ দিন থাকিলাম, আর সেই কয়দিনে যত দূর পারিলাম, 'ক্ষুদিরাম' লিখিলাম। তাহাই ছাবা হইল, 'বঙ্গবাসীর' মান বাঁচিল, আমি বাঁচিলাম

এবং পড়িতে হয় নাই বলিয়া বোধ করি 'ক্ষুদিরাম' অনেককেই বাঁচাইয়াছে।

এই ত আমার মাতৃভাষার চর্চ্চা। দুই চারিটা প্রবন্ধ রচনাও করিয়াছি, কিন্তু ধারা ধরিয়া আর কোনও গ্রন্থ লেখা হয় নাই। তবে দিনাজপুরে থাকিতে 'সিরাজ উদ্দৌলা' নামে এক নাটক লিখিয়াছিলাম, তাহা ছাবান হয় নাই। কলিকাতায় কে তাহা আমার নিকট চাহিয়া লইয়া ছিলেন, কিন্তু তিনি কে, তাহা আমার মনে নাই। "সিরাজ উদ্দৌলা"ও আর আমাকে জ্বালাতন করেন নাই।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু।

ইনি সন ১২৬০ সালের ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীর দিন কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর আদি নিবাস জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রাম। সেখানেই তাঁহার পৈতৃক বৃহৎ বাটী ও দেবালয় আছে, পরিবারস্থ অন্যান্য সকলেও থাকেন। ইহাঁরা ঐ অঞ্চলের সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইহাঁদের স্থাপিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহের রাস, দোল, ঝুলন, প্রভৃতি বাৎসরিক উৎসব সমারোহে অদ্যাপি সম্পাদিত হয়। ইহাঁর প্রপিতামহ ৺দেওয়ান নন্দকুমার বসু মহাশয় ধার্ম্মিকতা ও বদান্যতার জন্য সবিশেষ বিখ্যাত। তিনি নিজ বাটীর দেবালয় ছাড়া বৃন্দাবনে এক দেবালয় স্থাপিত করেন। তথায় সেবাদি রীতিমত চলিতেছে। এবং তথাকার গোবিন্দজী, মদনমোহন ও গোপীনাথের মন্দিরের দরদালান ন্যূনাধিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রস্তুত করাইয়া দেন। তিনি এবং তাঁহার পুত্রগণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে উচ্চ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রশংসার সহিত কার্য্য করেন।

বৈকুণ্ঠনাথ ৺শ্রীনাথ বসু মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। বাল্যকালে ইনি পিতার স্থাপিত ইংরাজি বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া, ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে এন্‌ট্রান্স একজামিনেসন পাস করিয়া, কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কালেজে

উচ্চ শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। শৈশবে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকিয়া ইনি সঙ্গীত বিদ্যার আস্বাদ পান। ইহাঁর বাটীর ঠাকুরবাড়ীতে প্রত্যহ সংকীর্ত্তন হয়। ইনি সেইখানে খোল বাজাইতে অভ্যাস করেন। উৎসব উপলক্ষে ইহাঁদের বাটীতে ওস্তাদি কবি হইত, নহবতও বাজিত। সেই কবির ঢোলের "রং" বাদ্য ও টিকারা শুনিয়া, বৈকুণ্ঠনাথ ঐ সকল যন্ত্র বাজাইতেও শিক্ষা করেন। ইহাঁর পিতা একজন সবিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, সেতার যন্ত্র বাদনে তাঁহার প্রসিদ্ধি বিলক্ষণ ছিল। তাঁহার নিকটে যে সকল ওস্তাদ আসিতেন, তাঁহাদের বাদ্য শুনিয়া বাঁয়া-তবলা ও পাখোয়াজ বাজাইতে ইহাঁর চেষ্টা হয়। কখন কখন পিতা আমোদ করিয়া, তাঁহার সেতারের সহিত সঙ্গত করিতে পুত্রকে ডাকিতেন। পুত্র তাল ঠিক রাখিয়া, সঙ্গত করিয়া, সকলের প্রশংসা-ভাজন হইত। ইহাঁর সমপাঠিরা বলিতে পারিবেন, কিরূপে ইহাঁর বাজাইবার আকাঙ্ক্ষা বিদ্যালয়ে পুস্তক ও টেবিল চাপড়াইয়া পরিতৃপ্ত হইত। পিতার সেতার বাদন শুনিয়া ঐ যন্ত্র বাজাইবার প্রবৃত্তি জন্মে এবং অল্প অল্প বাজাইতে শেখেন। পঠদ্দশান্তে যখন ইনি বিষয়-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন ঐ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে তাঁহার সুযোগ ঘটিল। খৃঃ ১৮৭১ সালে রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপিত করেন। বিদ্যালয়ের এডমিশন বুকে দেখা যাইবে, বৈকুণ্ঠ বাবুর নাম সর্ব্বপ্রথমে লিখিত আছে। ইনি সুবিখ্যাত সঙ্গীত অধ্যাপক ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শিক্ষাধীনে যথাক্রমে সেতার ও সুর বাহার প্রশংসার সহিত শিক্ষা করেন, ও বৎসর বৎসর পারিতোষিক পদক প্রাপ্ত হন। ১৮৮১ খৃঃ যখন রাজা বাহাদুর বেঙ্গল একাডেমি অব্ মিউজিক সভা স্থাপিত করেন, তখন ইহাঁকে উহার অনরারি সেক্রেটারী করা হয়। উক্ত একাডেমির এক সাম্বৎসরিক সভায় ইনি একাডেমি কর্ত্তৃক "সঙ্গীত উপাধ্যায়" উপাধির সহিত ঐ উপাধি-চিহ্ন স্বর্ণকেয়ূর দ্বারা ভূষিত হন। উপাধিদান উপলক্ষে উইলিয়ম হণ্টার (সভার পেট্রন) ইহাঁর বিশেষ প্রশংসা করেন। অধ্যাপক ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় ইহাঁকে বিশেষ ভাল বাসিতেন এবং মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত সম্বন্ধে

উপদেশ দিতেন। ১৮৮০ খৃঃ অব্দ হইতে বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয় বেঙ্গল গরবমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। সেই সময় ইনি ঐ বিদ্যালয়ের অনররি সেক্রেটারী বলিয়া মনোনীত হন এবং এ যাবৎ উহার তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতজ্ঞতার প্রসিদ্ধি জগদ্ব্যাপী এবং তাঁহার সহিত সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুসন্ধান উপলক্ষে চিঠি-পত্র ও পুস্তক-প্রবন্ধাদি প্রেরণও জগদ্ব্যাপী। এই উপলক্ষে রাজা বাহাদুরের সহকারিতাজনিত ইহাঁর সঙ্গীত বিজ্ঞানের অনুশীলন বৃদ্ধি পায়। ইনি এস্রাজ, হারমোনিয়ম পিয়ানো, প্রভৃতি বাদনেও পারদর্শী। ঐকতান বাদন সম্প্রদায় উপযোগী ইনি অনেক গৎ রচনা করিয়াছেন। তাহাতে নূতনত্ব আছে। গানের স্বর যোজনাও ইনি বিস্তর করিয়াছেন। তাহাতে ইহাঁর রাগরাগিণী জ্ঞান ও বিশুদ্ধি রাখিবার চেষ্টা ও মৌলিকতা বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে। ইহাঁর স্বর-যোজনার বিশেষত্ব এই যে, ইনি গানের ভাব ও ছন্দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া স্বরযোজনা করেন; এবং এমন ভাবে স্বর বিন্যাস করেন যে, তাহাতে গানের কথা স্পষ্টরূপে উচ্চারিত ও ভাব পরিস্ফুট হইতে পারে। বৈষ্ণব বংশ সম্ভূত এবং বাল্যে বৈষ্ণব ধর্ম্মোপযোগী গীতবাদ্য শ্রবণে অভ্যস্ত বলিয়া হউক বা যে কারণেই হউক, কার্ত্তন ও মহাজন পদাবলীর স্বর-যোজনায় ইনি বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর স্বর-যোজনা সর্ব্বদাই সুশ্রাব্য, ও বর্ত্তমান রুচিসঙ্গত অথচ বিশুদ্ধিতার জন্য সঙ্গীত রসজ্ঞের মনোজ্ঞ। কীর্ত্তনাঙ্গ সঙ্গীতের স্বরযোজনায় ইহাঁর শক্তি অনন্য-সাধারণ। আমরা জানি বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার মহাশয়ের সুমধুর ভাবময় কীর্ত্তন সঙ্গীতে বৈকুণ্ঠ বাবু যে স্বর সংযোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গবাসী মাত্রেই বিমুগ্ধ।

সঙ্গীত শাস্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত; দৃশ্য ও শ্রাব্য। শ্রাব্য সঙ্গীতে পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহাঁর অন্য সঙ্গীতে কিরূপে অধিকার, তাহা বিবৃত হইল। ইনি অনেকগুলি নাটক প্রসহনাদি রচনা করিয়াছেন। রচনার কাল অনুসারে উহাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল

১ ঠেকুল কে ? প্রহসন,	রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে		অভিনীত।	অপ্রকাশিত
২ নাট্যবিকার	,,	,,	,,	প্রকাশিত
৩ যুগের হুজুগ	,,	,,	,,	অপ্রকাশিত
৪ পৌরাণিক (পঞ্চরং)	বেঙ্গল থিয়েটারে	অভিনীত,	,,	প্রকাশিত
৫ রামপ্রসাদ (ধর্ম্মমূলক নাটক)	,,		,,	প্রকাশিত
৬ বারবাহার (প্রহসন)	,,		,,	,,
৭ লছমীলীলা (রূপক)	,,		,,	অপ্রকাশিত
৮ গোবরগণেশ (প্রহসন)	,,		,,	অপ্রকাশিত
৯ বসন্তসেনা (নাটক)	,,		,,	প্রকাশিত
১০ ষোল কড়াই কানা	এমারেল্ড		,,	অপ্রকাশিত
১১ নাট্য সংহার	,,	,,	,,	,,
১২ মান	পৌরাণিক গীতিনাট্য		,,	প্রকাশিত
১৩ অদলবদল (প্রহসন)	,,		,,	অপ্রকাশিত

১। ঠকুলে কে ?"—ইংরাজি আদর্শে রচিত। ইহার অভিনয় বেশী দিন চলে নাই।

২। "নাট্যবিকার"—বর্ত্তমান কালের স্ত্রীশিক্ষার উপর লক্ষ্য। নাটক নভেল পড়িয়া এবং অভিনয়াদি দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে সম্যক্ নীতিশিক্ষার অভাবে কোন কোন বঙ্গমহিলার বুদ্ধি কিরূপ বিকৃত হইতে পারে,—তাহা দেখানই এই প্রহসনের উদ্দেশ্য। ইহাতে তৎকালে পঠিত নভেল বা অভিনীত নাটক সকল হইতে গীতি, কথোপকথন ও দৃশ্য-বিশেষ অতি কৌশলের সহিত গ্রথিত হইয়াছে। যাঁহারা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখিয়া থাকেন, তাঁহারা এই প্রহসনের রস সম্যক্ আস্বাদন করিয়া থাকেন।

৩। "যুগের হুজুগ"। বাঙ্গালীর সৈনিক পুরুষ হইবার সাধ এই প্রহসনের লক্ষ্য।

৪। "পৌরাণিক পঞ্চরং"। একটি লাটিন নাটক অবলম্বনে পৌরাণিক চরিত্র সন্নিবেশিত করিয়া রচিত। কেহ কেহ বলেন, ইহা সেক্সপিয়রের Comedy of rrors অবলম্বনে লিখিত। কিন্তু একথা ঠিক নহে। বিষয় ও ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

৫। "রামপ্রসাদ"। সাধক-প্রবর রামপ্রসাদের জীবনী অবলম্বনে রচিত। ইহাতে প্রসাদের রচিত অনেক গান সুকৌশলে দৃশ্যের অনুগত করিয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে।

৬। "বার-বাহার"। কোন কোন উকীল জীবনের হাস্যোদ্দীপক আংশিক ছায়া চিত্র।

৭—"লছমী লীলা"। নীতি মূলাত্মক রূপক। লক্ষ্মীদেবী ধার্ম্মিকের আশ্রয় গ্রহণ করেন,—নাট্যচ্ছলে তাহাই দেখান হইয়াছে।

৮—"গোবর গণেশ"। পল্লী গ্রামস্থ সরল-প্রকৃতি লোককে সহর বাসিগণ কিরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিতে পারে—তাহাই এই প্রহসনে দেখান হইয়াছে। ইহাতে কোন কোন ডাক্তারী ব্যবসায়ীর কীর্ত্তিকলাপও কতক কীর্ত্তিত হইয়াছে।

৯—বসন্ত সেনা। স্বনামখ্যাত সংস্কৃত প্রকরণের অনুবাদ। মূলের অনেক স্থান পরিত্যক্ত ও অনেক স্থান স্বল্পীকৃত করা হইয়াছে। কিন্তু মূলকে বিকৃত করিতে কোন খানেই চেষ্টা করা হয় নাই।

১০—"ষোল কড়াই কানা"। কোন ফরাসি প্রহসন অবলম্বনে রচিত।

১১—"নাট্য সংহার"। কতকট Sheridan's Critic অবলম্বনে রচিত। কোন কোন ম্যানেজারের হস্তে পড়িয়া নাট্যকারের মূল রচনা কি প্রকারে দুর্দ্দশাপন্ন হয় ও নাটক অভিনয়ে সময় সময় কিরূপ অস্বাভাবিক ভাবের, দৃশ্যের ও চরিত্রের অবতারণা করা হয়, তাহার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করা হইয়াছে। নাটকের ভাষা কিরূপ সময়ে সময়ে পাত্রের অনুপযুক্ত করিয়া রচিত হয়,—তাহা দেখানও এই পুস্তকের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১২—"মান"। শ্রীমতী রাধিকার মান বিষয়ক গীতি-নাট্য। ইহার গান গুলি মহাজন পদাবলী হইতে দৃশ্যোপযোগী করিয়া বিশেষ কৌশলের সহিত উদ্ধৃত। শ্রীকৃষ্ণের মধুর লীলার আধ্যাত্মিক ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। এই নাটকখানি মহারাজ বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে অনুমতি ক্রমে উৎসর্গ করা হইয়াছে। পুস্তক পাঠে মহারাজা বাহাদুর সবিশেষ আনন্দিত হইয়া রচয়িতাকে এক প্রশংসা সূচক পত্র লিখিয়াছিলেন।

১৩—"অদল বদল"। ইংরাজী কোন প্রহসন অবলম্বনে,দেশীয়ভাবে রচিত।

ইহাঁর প্রহসন গুলি হাস্য রসের প্রবল প্রস্রবণ, অথচ নির্দ্দোষ আমোদপ্রদ। কোনখানিতেও কুরুচির লেশ মাত্র নাই। এই হিসাবে ইহার প্রহসন গুলি বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের আদর্শ স্থানীয়। সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য বিভাগে ইহাঁর কিরূপ পারদর্শিতা, তাহার পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া হইল। এই দুই বিষয়ে ইহাঁর সমালোচনা শক্তিও বিলক্ষণ আছে। অনেকে গীতের স্বর-যোজনা বা নাটকাদি রচনা করিয়া, অগ্রে ইহাঁকে দেখাইয়া, ইহাঁর অভিমত লইয়া, কিম্বা ইহার পরামর্শ মত পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার বা প্রকাশ করেন। ইংরাজি সাহিত্যে ইহাঁর যথেষ্ট অনুরাগ আছে। বিশেষ, বৈদেশিক নাট্য সাহিত্য, প্রাচীন গ্রীক লাটিন ফরাসী ও জরমান নাটকাদি (ইংরাজী অনুবাদের সাহায্যে) এবং প্রাচীন কাল হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত পাঠোপযোগী অধিকাংশ নাটক ইনি পাঠ করিয়াছেন।

সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ অসময়ে ত্যাগ করিয়া সন ১৮৭০ কালের ১লা ডিসেম্বর কলিকাতা টাকসালের Deputy Bullisn Keeper নায়েব-দাওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮০ সালের জুন মাসে ইনি শিয়ালদহ পুলীশ কোর্টে অনরার মাজিষ্টর পদে নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরে এইখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষমতা ও একক বসিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা পান। ১৮৮২ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে ইনি কলিকাতার অনরারি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। পরে এখানেও একক বসিয়া বিচার করিবার ক্ষমতা পান। ঐ বৎসরের ১লা আগষ্ট মাস হইতে করেন্সি অফিসের ডেপুটি ট্রেজারার রূপে পদোন্নতি হয়। ইনি পর বৎসরের ১০ই জুলাই টাকশালের দেওয়ান হইয়া ফিরিয়া আসেন ; এক্ষণেও ঐ কার্য্য করিতেছেন এবং সিয়ালদহে ও কলিকাতার পুলীশ কোর্টেও অবৈতনিক ম্যাজিষ্টেরের কার্য্যও করিতেছেন। ১৮৯৪ সালের ১লা সালের জানুয়ারী মাসে ইনি রায় বাহাদুর উপাধি পান। ঐ উপাধির সনন্দ দান সময়ে ইনি শিরপ্যাঁচ ও তরবারি খেলাৎ স্বরূপ পাইয়াছিলেন।

ইনি অনেক সভা সমিতির সদস্য এবং কোন কোন সভার হিসাব পরিদর্শক আছেন। অনেকে ইহাঁর নিকট বার্ষিক বিবরণী ও কাগজ পত্রের ও বাঙ্গালা পদ্যের ইংরাজী পদ্য অনুবাদ বা মৌলিক ইংরাজী গদ্য বা পদ্য লিখাইয়া লন। ইহাঁর বর্ত্তমান নিবাস ১৬৭ মাণিক-তলা ষ্ট্রীট, রামবাগান কলিকাতা।

দীনেশচন্দ্র সেন।

আমি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত। পূর্ব্বপুরুষদের আদি নিবাস যশোহর জেলার সেনহাটি গ্রাম। আমরা হিঙ্গু সেন, শক্তি গোত্র এবং আমাদের সমাজে কুলীন পদ বাচ্য। ১৭৮৮ শকের কার্ত্তিক মাসের ১৭ই তারিখ শুক্রবার রাত্রি ৪ দণ্ড থাকিতে ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের অধীন বগজুরী গ্রামে মাতুলায়ে আমার জন্ম হয়। আমার মাতামহ ঠাকুর ৺ গোকুল কৃষ্ণ মুন্সী ঢাকা জেলার তৎসাময়িক লোকদিগের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন; এখনও ঢাকা জেলার লোকের মুখে এই চারি পং কবিতা শুনা যায়—

"গণি মিঞার ঘড়ী,
নীলাম্বরের বড়ি
গোকুল মুন্সীর গোঁপে তা,
গল্প শুনবি তো মৃত্যুঞ্জয় মুন্সীর কাছে যা'।"

তিনি ঢাকা জেলাকোর্টের সরকারী উকীল ছিলেন এবং তাঁহার পশার ও প্রতিপত্তি তৎকালে সকল উকীল অপেক্ষা অধিক ছিল, এখনও পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বস্থলে আমরা তাঁহারই নামে পরিচিত হইয়া থাকি।

আমার পিতা ৺ ঈশ্বরচন্দ্র সেন মহাশয় ইংরেজী ও বাঙ্গলায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি এক সময় ইংলিশম্যান প্রভৃতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মে গভীর বিশ্বাস ছিল, কিন্তু কোন-রূপ আহারাদির উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকায় তিনি সমাজে নিগৃহীত হন নাই। তিনি প্রথম জীবনে ঢাকাজেলার ধামরাই গ্রামে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক ছাত্র এখন বাঙ্গালা দেশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

আমার জ্ঞাতি খুল্লতাত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন মহাশয় তাঁহার নিকট থাকিয়া পড়া শুনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে আস্থাবান হন। তিনি এখন জেলা কোর্টের সেসন্স জজ। আমার পিতৃদেবের অন্যতম ছাত্র ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালী মহাশয় তাঁহার অতি প্রিয় ছিলেন। ডাক্তার কালী আমার সঙ্গে পিতৃদেবের আকৃতি-সাদৃশ্য দেখিয়া পরিচয় দিবার পূর্ব্বেই এই কলিকাতায় আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনিও পিতৃদেবের প্রভাবে প্রথমত একটু ব্রাহ্মভাবাপন্ন হইয়া, শেষে হিন্দুধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন; ইহা ছাড়া সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় ও পিতৃদেবের দ্বারা কতকটা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। গৌহাটীর সর্ব্ব প্রধান উকীল ৺ দীননাথ সেন,—বাঁকিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকুমার বসাক প্রভৃতি তাঁহার অনেক ছাত্রের নাম এখন বহুস্থানে পরিচিত।

তিনি ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন, সেই বক্তৃতার কতকগুলি আমি সময়িক সংবাদপত্রে সমগ্র উদ্ধৃত দেখিয়াছি।

তাঁহার দুইখানি পুস্তক আমার জানিবার পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল, একখানি গানের পুস্তক, নাম ব্রহ্মসংগীত রত্নাবলী। অপর খানির নাম "সত্যধর্ম্মোদ্দীপক নাটক।" এই পুস্তকে জনৈক শিক্ষিত ব্রাহ্মযুবক সংস্কৃত অধ্যাপকগণের সঙ্গে বাদানুবাদ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—এরূপ বর্ণিত আছে। নাটকখানির মধ্যে মধ্যে কবিতা আছে; তাহার একটি কবিতার অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—ধনীর মজলিসে নর্ত্তকীর নৃত্য ও গান হইতেছিল;—সেস্থান হইতে উঠিয়া যাইয়া শিক্ষিত ব্রাহ্ম একান্তে বলিতেছেন—

"বাসনা যদ্যপি হয় আলোক দর্শনে। চল মন হেরি যেয়ে সুদৃশ্য গগনে॥
সুধেন্দু যথায় করে নিত্য বিচরণ। লইয়া নক্ষত্র সব অনুচরগণ॥
নৃত্য সন্দর্শনে যদি হয় আকিঞ্চন। কেন মন নাহি যাও শিখীর ভবন॥
সংগীত শ্রবণে যদি হও ব্যাকুলিত। বিহঙ্গম গানে মন হবে প্রফুল্লিত॥
উচ্চাসন নিম্নাসন দ্বেষের কারণ; নাহি ভেদাভেদ তথা করিতে দর্শন॥
অনায়াসে লব্ধ তারা সবাকার ঠাঁই। ভূপতি দরিদ্রে কিছু বিভিন্নতা নাই॥"

আমার মাতামহ ঠাকুরের আলয়ে সর্ব্বদা উৎসবোপলক্ষে নৃত্য-গীতাদি হইত। পিতৃদেব স্বগৃহে দ্বার রোধ করিয়া উপাসনাদি করিতেন। কোন ক্রমে এ মজলিসে আসিতেন না। আমার মাসীমাতা,—পিতৃদেব শ্যামল ক্ষেত্রের উপর শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া চক্ষু বুঁজিয়া কি ভাবে উপাসনা করিতেন, তাহা বলিতে যাইয়া যে কত হাসিতেন, তাহা আর কি বলিব ?

শেষ বয়সে তিনি "হরির লুটে" যোগদান করিতেন এবং "হরির নাম লইতে অলস হইও না, রসনা যা হবার তাই হবে, ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি ঢেউ দেখে তরী ডুবাবে"—প্রভৃতি গান প্রায়ই গাহিতেন, কিন্তু মৃত্যুকালেও তাঁহাকে কালী দুর্গানাম শুনাইতে যাওয়াতে তিনি মুখ ফিরাইয়া "ঈশ্বর" "ঈশ্বর" বলিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের "ওঁ নমস্তে সতে" শ্লোকগুলি তিনি অস্ফুটবাক্যে একাকী বসিয়া, সর্ব্বদা আবৃত্তি করিতেন। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ সেন, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর কালী প্রভৃতির মুখে তাঁহার চরিত্র ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের অজস্র প্রশংসা শুনিয়া এই দীন লেখকের মনে কত গর্ব্ব হইয়া থাকে, তাহা বলিবার নহে। মৃত্যুকালে তাঁহার শাস্ত্রসমাহিত ধৈর্য্য, তাঁহার আজীবন ক্রোধাধি রিপুর উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব,—আমার মনে তাঁহার দেব মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সঙ্গে পিতা ধর্ম্মঃ পিতা মোক্ষঃ, পিতা হি পরমন্তপঃ "শ্লোক মন হইতে যেন স্বতঃ নিঃসৃত হইয়া, সেই দেবতার স্তোত্র স্বরূপ জিহ্বাগ্রে উপস্থিত হয়। শেষ বয়সে তিনি মাণিকগঞ্জের গবরমেণ্ট প্লিডার হইয়াছিলেন। কিন্তু বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া দশ বার বৎসর কোন কাজকর্ম্ম করিতে পারেন নাই, মাঝে একেবারে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন ; তখনও তাঁহার মুখে কোন বিলাপের কথা শুনি নাই ; আজীবন তিনি একটি সত্যনিষ্ঠ, বিষয়-নিস্পৃহ অচঞ্চল ভাবের আদর্শ দেখাইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আমার মাতা হিন্দুধর্ম্মে অত্যন্ত আস্থাবতী ছিলেন এবং পিতৃদেবের সহিত তাঁহার ধর্ম্মসংক্রান্ত বিরোধ চিরদিন চলিয়াছিল। এক সময় অক্সফর্ড মিসনের এস, টি, ফিলিপস্ সাহেব আমাদের বাড়ী দেখিবার জন্য

আমার নিবাসভূমি সুয়াপুর গ্রামে যাইতে চাহিয়াছিলেন। আমি এপিফনি কাগজে লিখিতাম। সেই সূত্রে উক্ত সাহেবের বড় প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলাম;—সাহেব ঢাকায় গিয়াছিলেন, সেখান হইতে সুয়াপুরে যাইবেন বলিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। বাবা সেই পত্র পড়িয়া বলিলেন,—"বেশ ত সাহেব আসুন না। গ্রামে কয়েকটা বক্তৃতা দিবেন।" কিন্তু মাতাঠাকুরাণী সেই উপলক্ষে যে সকল তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া পিতৃদেব আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বাবা যদি আমাকে ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিতে যাইতেন, মাতাঠাকুরাণী অমনই কান্না জুড়িয়া দিতেন; সেই কান্নার প্লাবনে ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা ভাসিয়া যাইত। বস্তুত আমার অতি শঙ্কটাপন্ন অবস্থা ছিল। আমি শৈশবে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি গাঢ় আস্থা-পরায়ণ ছিলাম,—মাতুলালয়ের উৎসবাদির মধ্যে আমি হিন্দু দেবদেবীর প্রতি অচলা ভক্তি সঞ্চয় করিতেছিলাম; এদিকে পিতৃদেব রচিত—"যেমন বালকগণে বিচারশক্তি বিহীনে, পুত্তলিকা লয়ে করে সময় যাপন। তেমনই জানিবে ভাই, ঈশ্বরের রূপ নাই, অজ্ঞ ক্রীড়ামাত্র তাহা হয়েছে সৃজন।" প্রভৃতি পড়িয়া মনে যে ধোঁকা লাগিত, তাহা সেই অচল ভক্তির মূলে দুই একটী ঘা' দিয়া একটু বিচলিত করিয়া যাইত।

মাতা ও পিতার আজীবন বিরোধ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু একবার তাঁহাদের গাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছিলাম :—যে দিন পিতৃদেবের মৃত্যু হইল, তাহার অব্যবহিত পরেই মাতা শয্যাশায়িনী হইলেন এবং দুই মাসের মধ্যে শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন। পিতার শ্রাদ্ধের সময় মাতাঠাকুরাণী আমাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন,—"খোকাকে ঠিক কর্ত্তার মত দেখায়"—এই বলিয়া নিঃশব্দে অজস্র অশ্রুবিগলিত চক্ষে তিনি ঊর্দ্ধে চাহিয়া ভগবানকে কি প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। তাহার ফলে এক মাস পরেই তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন,—এই হতভাগ্য এক সঙ্গে পিতৃমাতৃহীন হইল।

আমার ১১টি সহোদরা ছিল,—তন্মধ্যে তিনটি মাত্র জীবিত। আমি পিতামাতার একমাত্র পুত্র, আমি এবং আমার এক ভগ্নী যমজ; সে ভগ্নির নাম মঙ্গময়ী দেবী। আমাদের চেহারা, অনেকটা এক রকমের।

এতগুলি মেয়ের মধ্যে এক ছেলে হইলে, সে ছেলে রাজচক্রবর্ত্তীর মত আদর ও যত্ন লাভ করিয়া থাকে। শৈশবে আমি মাতার অতিরিক্ত আদরের বলিয়া, দুর্নিবার হইয়া পড়িয়াছিলাম—সেই আদর যে সর্ব্বদাই মধুর ছিল, তাহা নহে; তাহা প্রায় অম্লের চাটনি সংযোগে ভিন্ন রসাশ্রিত হইত, কোনও সময়ে বিবিধ খেলনা, বাক্স, মিষ্ট দ্রব্য এই সকলের মধ্যে রাজা হইয়া বসিয়া থাকিতাম। কখনও বা মাতৃদেবীর মুষ্টিযোগে জর্জ্জরিত হইয়া, ভূলুণ্ঠিত হইয়া চীৎকার করিতাম। বাল্যকাল হইতে অন্ন ব্যঞ্জনাদির মত প্রহার আমার নিত্য উপভোগ হইয়া পড়িয়াছিল। যখন বি, এ, পড়ি, তখনও আমার মাতার হস্তের সন্দেশ লুচির সঙ্গে চড়, চাপড় প্রভৃতি প্রকার প্রসাদও লাভ করিয়াছি। আমার মাসীমাতা এই বিষয়ে আমার মাতার অপেক্ষাও অধিক অগ্রসর ছিলেন। তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র সেন এখন ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। ইনি এম্‌·এ পরীক্ষায় ইউনিভার্সিটিতে ইংরেজী সাহিত্যে প্রথম হইয়াছিলেন। কিন্তু উক্তরূপ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ার পরেও তিনি মাতৃ হস্তের চড়-প্রসাদ লাভে বঞ্চিত ছিলেন না। আমি ঢাকা কলেজে পড়িতাম। তখন একদিন আহার করিতে বসিয়াছি, এমন সময় মাসীমাতা কি একটা উপলক্ষে আমার গণ্ডদেশে হঠাৎ একটা থাপড় দিয়া গেলেন। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলাম, "এ তোমার নিজের ছেলে পাওনি, আমি পরের ছেলে, ফের মারবে ত বুঝবে।' এ কথা শুনিয়া তিনি বড় মজা পাইয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমার চক্ষু দিয়া অজস্র জল পড়িতে লাগিল। বস্তুতঃ আমি যখন ঢাকা কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখনও আমি কলেজে মা'র খাইতাম।

যাহা হউক, এখন আমার শিক্ষার কথা। শৈশবে অষ্টমবর্ষ বয়স হইতে আনন্দ করিয়া ২০ বৎসর পর্য্যন্ত আমি যে কত কবিতা লিখিয়াছি, তাহা বলা যায় না। বোধ হয় ছাপা হইলে, তাহা ছোট খাট একখানি এনসাই-ক্লো-পিডিয়ার মত হইত। কবিতা দেবীর এত সাধ্য সাধনা করিয়াও তাঁহার যখন মন পাইলাম না, তখন গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা সর্ব্ব জ্যেষ্ঠা সহোদরা বৈষ্ণব সাহিত্য ও বাঙ্গালা প্রাচীন

পুঁথির প্রতি আমার অনুরাগ আকর্ষণ করেন। তাঁহার কৃপায় আমি কৃত্তিবাসী রামায়ণের অনেকাংশ মুখস্ত বলিতে শিখিয়াছিলাম। তখন আমার বর্ণপরিচয় হয় নাই, এবং আমি প্রায়ই কাপড় পড়িতাম না। সেই শৈশব হইতে যে শিক্ষা পাইয়া আসিয়াছিলাম, তাহারই ফলে বাঙ্গালাভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া যৎকিঞ্চিৎ সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

তার পরের অধ্যায় বড় জটিল—তাহার সম্বন্ধে আমি কোন কথাই বলিতে চাহি না, বলিতে পারিব না। আমি ইংরেজীতে অনার শুদ্ধ বি, এ পাশ করিয়া ত্রিপুরা স্কুলে হেডমাষ্টার করিয়াছি। মাঝে ২ বৎসর হবিগঞ্জ স্কুলে মাষ্টারি করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে কেবল একটি বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারি,—"তাহা বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তক লেখার পরিশ্রমের কথা। আমি পুঁথি খুঁজিতে যাইয়া পাগলের মত নানাস্থানে ঘুরিয়াছি। পিতামাতার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আমার দুইটি কনিষ্ঠা সহোদরা (একটি ১৪ বৎসর বয়স্কা ও অপরটি ১৬ বৎসর বয়স্কা) হঠাৎ মরিয়া যায়,—আমার গৃহের শ্মশানদৃশ্য আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছিল,—আমি সেই অন্তর্জ্জালা ভুলিবার জন্য বঙ্গভাষার নিমিত্ত যে পরিশ্রম করি, তাহাতে প্রাণের আশা, স্বাস্থ্যের আশা, ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, আমার জীবনের প্রতি একটুকু মমতা ছিল না,—কোনরূপে জীবন বিসর্জ্জন দিবার সাধে বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া পুঁথির সন্ধান করিয়াছি,—সেই উৎকট, অশান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের ইতিহাস বলিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। তারপর মস্তিষ্ক-রোগগ্রস্ত হইয়া জীবনে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এই অকিঞ্চিৎকর জীবনে বাল্যের সুখের স্মৃতি ব্যতীত আর এমন কিছুই নাই;—যাহা মনে উদিত হইলে একান্ত অবসন্ন ও অধীর না হইয়া পড়ি।—এখন কেবল পীড়িত আত্মা জগজ্জননীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া গাহিতে চাহে—

"প্রসাদ বলে, ভবের খেলা এবার যা হ'ল তা হ'ল।
এখন সন্ধ্যা হ'ল, মা! কোলের ছেলে কোলে নিয়ে চল॥"

মৎরচিত পুস্তকের নাম,—"রেখা, কুমার ভুপেন্দ্রসিংহ (কাব্য), "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" "তিনবন্ধু" "রামায়ণী কথা।"

ইহাই দীনেশ বাবুর আত্ম-কথা। দীনেশ বাবু সাহিত্যালোচনার জন্য বেঙ্গল গবরমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক পঁচিশ টাকা বৃত্তি পাইতেছেন। ইহাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্দ্ধিত আকারে বাহির হইয়াছে। এই পুস্তক কি ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় উল্লিখিত হইয়াছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সন ১২৮৩ সালের ৯ই আশ্বিন (ইংরাজী ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬) রবিবার শারদীয়া পূজার সপ্তমী দিবস যশোহর জেলায় কপোতাক্ষ তীরবর্ত্তী চৌগাছা গ্রামে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁর পিতামহ ৺তারিণীপ্রসাদ ঘোষ নদীয়ার কৃষ্ণনগরে উকীল সরকার রূপে খ্যাতি ও অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, যথেষ্ট সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি পার্সী ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণনগরে তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান, ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি অধিক ছিলেন না। চৌগাছার কুলীন ঘোষ বংশ সে অঞ্চলে প্রাচীন ও বিশেষ সম্মানিত। এই বংশে তারিণী-প্রসাদ ব্যতীত আরও কয়জন খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। হেমেন্দ্র প্রসাদের খুল্ল পিতামহ অম্বিকাচরণের বিদ্যানুরাগের সাক্ষ্য স্মৃতি ফলক (Tablet) অদ্যাপি কৃষ্ণনগর কলেজে বর্ত্তমান। "সুধীরঞ্জনে" ইহার উল্লেখ আছে। খুল্লপিতামহ কালিচরণ কলিকাতার ল্যাণ্ড একুইজিসন কালেক্টর ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ এম, এ পরীক্ষার রসায়নে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করেন। ইনি রস্কো প্রণীত রসায়ন সূত্রের বঙ্গানুবাদক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ বিবিধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের রচক ও সুপণ্ডিত।

হেমেন্দ্রের পিতা গিরীন্দ্রপ্রসাদ কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতায় মধু-সূদনের ও হেমচন্দ্রের কবিতার ছায়া অঙ্কিত হয়। তিনি সঙ্গীতানুরাগী ও গীতবিদ্যা বিশারদ ছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল।

তাঁহার পুস্তকাগারে বহু ইংরাজীও তৎকালে প্রকাশিত প্রায় সমস্ত বাঙ্গলা পুস্তকের সমাবেশ সেই অনুরাগের পরিচায়ক।

বর্ষমাত্র বয়সে হেমেন্দ্রপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ হয়। শিক্ষার ভার পিতামহী ও জননীর উপর ন্যস্ত হয়। পিতামহী বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং নাবালকত্বের অভিভাবকরূপে সমস্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেন। জননী বিশ্বানুরাগিনী। গ্রামের পাঠশালায় এবং জননীর নিকট হেমেন্দ্রের ইংরাজী ও বাঙ্গলা শিক্ষা আরম্ভ হয়।

শিক্ষার সুবিধার জন্য ভ্রাতৃদ্বয়কে কৃষ্ণনগরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে হেমেন্দ্রপ্রসাদ মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। কিছুদিন পরে জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রপ্রসাদের পীড়ার জন্য কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া, কিছুকাল পশ্চিমে কাটাইয়া, সকলে কলিকাতায় আসিলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স কোর্সে বি, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হন। ১৩০১ সালে পরিণয় হয়। দুই কন্যা বর্ত্তমান।

অনুমান পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হেমেন্দ্রপ্রসাদ অধুনা বিলুপ্ত "প্রতিজ্ঞা" পত্রে বহুরচনা প্রকাশ করেন। সন ১৩০০ সাল হইতে "সাহিত্যে"র সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই সময় হইতে "সাহিত্য" ভিন্ন "দাসী", "সুহৃদ", "উৎসাহ", "মুকুল", "প্রদীপ", "সুধা", "ভারতী", "বঙ্গদর্শন" প্রভৃতি বিবিধ পত্রে বহু গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

ইনি ইংরাজীতে কলিকাতা রিভিউ, ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট, ইণ্ডিয়ান রিভিউ, হিন্দুস্থান রিভিউ প্রভৃতি বিবিধ পত্রের লেখক। কলিকাতা রিভিউ পত্রে প্রকাশিত ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ আংলো ইণ্ডিয়ান দৈনিক ডেলি নিউস, ষ্টেট্‌সম্যান পত্রে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছিল।

প্রথম পুস্তক গীতিকবিতা "উচ্ছ্বাস" ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয়। উপন্যাস "বিপত্নীক" ১৩০৪ সালে, "অধঃপতন" ১৩০৬ সালে ও "প্রেমের জয়" ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহারই মধ্যে বালক বালিকাদিগের পাঠ্য "আষাঢ়ে গল্প" প্রচারিত হয়।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।



রাজা সৌরীন্দ্রমোহন,—১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার প্রাসাদে জন্ম গ্রহণ করেন। আজ সৌরীন্দ্রমোহন যে গুণগৌরবে জগন্মান্ত, তাঁহার ছয় মাসের বয়সে, তাঁহারই জন্মকোষ্ঠিতে, গ্রহাচার্য্য কালীনাথ আচার্য্য, সেই সব গুণোল্লেখ করিয়া, হিন্দু জ্যোতিষের সফল গণনার একটী অব্যর্থ নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন। "গান্ধর্ব্ববিদ্যা-নিপুণতা";—সৌরীন্দ্রমোহনের কোষ্ঠিতে ইহা স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। "সৌরীন্দ্রমোহন বারটী স্বাধীন নরপতির নিকট সম্মান পাইবেন", কোষ্ঠির উল্লিখিত এই কয়টী কথার সার্থকতা সৌরীন্দ্রমোহনের জীবনে প্রমাণিত নহে কি?

বাড়ীর পাঠশালে সৌরীন্দ্রমোহনের বিদ্যারম্ভ হইয়াছিল। আট বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ৮।৯ বৎসর পরে হিন্দু কলেজের পড়া সাঙ্গ হয়। কলেজের পাঠাবস্থায় সাহিত্যে তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভারাগ উদ্ভাসিত হইয়াছিল। চৌদ্দ পনর বৎসর বয়সে তিনি "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" নামে একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইতিহাসে ও ভূগোলে রাজা বাহাদুরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি তিনি আমাদেরই সম্মুখে কোনরূপ মানচিত্র না দেখিয়াই স্বহস্তে ইউরোপের এক খানি মানচিত্র আঁকিয়াছিলেন। মানচিত্র খানি সুন্দর হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল, এরূপ ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা বুঝি আর কোন বাঙ্গালীর নাই।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে "ভূগোল ও ইতিহাস ঘটিত বৃত্তান্ত" প্রকাশিত হইয়াছিল। এক বৎসর পরে সৌরীন্দ্রমোহন "মুক্তাবলী নাটক" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা তাঁহার নিজস্ব-রচনা। কিছুদিন পরে তিনি কালিদাসকৃত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নাটকের অনুবাদ করেন।

১৭ বৎসর বয়সে সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীত-বিদ্যারম্ভ হয়। আজ যে বিদ্যা-বিশারদতায় তিনি সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলে সমাদৃত, ৺শারদীয়া পূজার মহাষ্টমীতে সন্ধিপূজার সময়ে তাহারই সূত্রপাত হইয়াছিল।

পবিত্র কৌষিক বস্ত্র পরিধান করিয়া, সুগন্ধকুসুম-মাল্যে পরিশোভিত হইয়া, অগুরুচন্দনচর্চ্চিতবিশালবপু সৌরীন্দ্রমোহন, সেই দশভূজা জগদম্বার স্বর্ণপ্রতিমা সম্মুখে, ভূমিষ্ঠ-প্রণিপাতে, ভক্তি গদগদকণ্ঠে বর চাহিয়াছিলেন,—"মাগো! সঙ্গীত-বিদ্যায় যেন যশ লাভ করি।" ভক্তের-বাঞ্ছা ভক্তবৎসলা ভগবতী পূর্ণ করিয়াছেন। অনুধ্যানেই ভক্ত অভয় পাইয়াছিলেন।

কলেজের পড়া সাঙ্গ হইলে পর, সৌরীন্দ্রমোহন বাড়ীতে পণ্ডিত তিলকচন্দ্র ন্যায়ভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ পড়িয়াছিলেন। ইংরেজি পড়াও বন্ধ হয় নাই। হিন্দু স্কুলের তাৎকালিক হেড মাষ্টার ঈশ্বরচন্দ্র সাহা তাঁহার গৃহশিক্ষক ছিলেন।

সংস্কৃত-সঙ্গীত-শাস্ত্রচর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়া, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে অধুনা তিনিই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ। অতঃপর তিনি ইউরোপীয় সঙ্গীত-শাস্ত্রের আলোচনা করেন। সে সব শাস্ত্রেও তিনি অনেক ইউরোপীয় সঙ্গীতবিদ্যা-বিভূষণ ব্যক্তি অপেক্ষা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। সঙ্গীতের নানা শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা-লাভ করিয়া, সৌরীন্দ্রমোহন বাঙ্গালার বাঙ্গলা গীতবাদ্যকে বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পূর্ণ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সেই প্রয়াসেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইতেছে। তাঁহার অসীম অভিজ্ঞতার এবং অব্যর্থ অধ্যবসায়ের ফলে, বাঙ্গালা সঙ্গীত বিদ্যা, সংস্কৃত ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানপথে অগ্রসর হইতেছে।

বিখ্যাত সঙ্গীত-শাস্ত্র-বিশারদ লক্ষ্মীপ্রসাদ মিশ্র এবং অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর নিকট সৌরীন্দ্রমোহন শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। উপযুক্ত শিষ্য উপযুক্ত গুরুর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইনি একজন জর্ম্মণ অধ্যাপকের নিকট পিয়নাফোর্ট শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাঁর সঙ্গীত-শিক্ষা সার্থক হইয়াছে।

সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গীতবিদ্যা বিশারদতার পরিচয় আর অধিক কি দিব? সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধে এদেশে ও বিদেশে যে সকল বড় বড় গ্রন্থ আছে, তিনি তাহার অধিকাংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সংগ্রহের ফ

তাঁহার রচিত "সঙ্গীতসার"। সঙ্গীতের মূল সূত্র এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। বহু প্রাচীন প্রমাণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাঁর স্বরচিত ও সঙ্কলিত অনেক গ্রন্থ আছে। ইহাদের মধ্যে এইগুলি উল্লিখিত হইল,—জাতীয় সঙ্গীত বিষয়ক প্রস্তাব, যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা, মৃদঙ্গমঞ্জরী, একতান, হারমোনিয়াসূত্র, হিন্দু সঙ্গীত যন্ত্রকোষ, বিক্টোরিয়া গীতিকা, (সংস্কৃত কবিতা), সঙ্গীত সার-সংগ্রহ, প্রিন্স-অব্-ওয়েলেসের আগমনোপলক্ষে হিন্দু রাগ-রাগিণীতে ইংরেজি কবিতার সংযোগ, মুক্তাবালা নাটিকা প্রভৃতি।

সঙ্গীত সম্বন্ধে এত গ্রন্থ আর কার আছে? এত অনুরাগ, এত অভিজ্ঞতা, এত একাগ্রতাই বা আর কাহার আছে? সঙ্গীত শাস্ত্রে সৌরীন্দ্রমোহন দিগ্বিজয়ী বীর। তাই ত জগতে তাঁহার অতুল সম্মান। পৃথিবীর এমন দেশ,—এমন রাজা নাই, যেখান হইতে তিনি উপাধি বা পারিতোষিক না পাইয়াছেন। তাঁহার সচিত্র একটী প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠে উপাধি ও পারিতোষিকমালা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। ইহাও পৃথিবীর একটী আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার। তাঁহার সচিত্র ষড়রাগসমন্বিত গ্রন্থ জগতের একতম বিচিত্র পদার্থ।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

ইনি ১৭৮৪ শকাব্দের ৮ই শ্রাবণ দিবা ৯ দণ্ড ৪০ পলের সময় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর বর্ত্তমান নিবাস নবদ্বীপ। শাস্ত্রী মহাশয় অতি পুরাতন বংশের লোক। গোড়াধিপ রাজা শশাঙ্ক গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ পীড়িত হইয়া উহার শান্তি বিধানের জন্য সরযূতীর হইতে যে দ্বাদশজন বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহারা গ্রহের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দান গ্রহণ করায় "গ্রহবিপ্র" নামে পরিচিত হন এবং রাজার আদেশে বঙ্গদেশে বাস করেন। তাঁহাদের অন্যতমের বংশে জ্যোতিষের প্রসিদ্ধ টীকাকার কমলাকারের জন্ম হয়। এই কমলাকর পশ্চিম রাঢ় হইতে নবদ্বীপে

আসিয়া বাস করেন। তিনি ইহাঁদের আদিপুরুষ। কমলাকরের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় রামরুদ্র বিদ্যানিধি, নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ও পঞ্জিকাকার হইয়া, অনেক সময় কৃষ্ণনগরের রাজসভায় থাকিতেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বাধীনচেতাঃ, তিনি কোন রাজা বা ভূম্যধিকারীর ভৃতি গ্রহণ না করিয়া চতুষ্পাঠী করেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে জ্যোতিষ ব্যতীত ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার স্মৃতিও অধ্যাপিত হইত। রাজীবলোচন বিদ্যাসাগরের পাঁচটী প্রপৌত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, তাঁহার কোন আত্মীয়ের অনুরোধ ক্রমে কিছুদিনের জন্য গোয়ালন্দের সন্নিহিত ধরমাঠী গ্রামে গিয়া অবস্থান করেন। তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতৃগণ নবদ্বীপেই থাকেন। তাঁহার আত্মীয় নাটুরের রাজার জ্যোতির্ব্বিদ্ সভাপণ্ডিত ছিলেন। শেষে তিনি আর নবদ্বীপে ফিরিতে পারেন নাই, পাঁচটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র উমাকান্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সুপণ্ডিত ও অতিশয় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতিঃ শাস্ত্রের ব্যবসায় ব্যতীত দুই তিনখানি গ্রামের খাজনা তহশীলের কার্য্যও তাঁহার তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইত। জমিদারে জমিদারে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তিনি প্রবীণ বয়সে উক্ত গ্রাম ত্যাগ করিয়া, অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর একটী গ্রামে বাস করেন। উক্ত গ্রামটীর নাম খালকুলা। উহা স্রোতস্বতী চন্দনানদীর তীরে অবস্থিত। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের চারিপুত্র ও দুই কন্যা ছিল। তন্মধ্যে তিনি দ্বিতীয় পুত্রকে বাটী রাখিয়া, তিন পুত্র, এককন্যা সহ নৌকারোহণে তীর্থযাত্রা করেন। বারাণসীক্ষেত্রে দুই দিবস যাপন করিয়া, তৃতীয় দিন অরুণোদয়কালে মনিকর্ণিকার ঘাটে ১০৩ বৎসর বয়সে তিনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

এই বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ৺ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ই পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর পিতা। ইনি অতি বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। জ্যোতিঃ শাস্ত্রে অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বঙ্গের অনেক রাজা ও জমিদারের বাটীতে সর্ব্বদাই তাঁহার আহ্বান হইত। ফলিত জ্যোতিষে

তাঁহার ন্যায় কৃতী ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় সর্ব্ব সাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ বলিত। তাঁহার গ্রহযজ্ঞ ও স্বস্ত্যয়নের ফলে অনেক ব্যক্তিকে অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে। বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, সর্ব্বদা পূজা আহ্নিক তপ জপে কাল কাটাইতেন এবং দোল, দুর্গোৎসব, ব্রত, নিয়ম, অতিথি সেবা, শ্রাদ্ধ শান্তি প্রভৃতি অতি শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত সম্পন্ন করিতেন। ইহাঁর দয়া সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে; একবার দুর্ভিক্ষের সময় বিদ্যাবাগীশ মহাশয় তিনটী বলদের পৃষ্ঠে ধান্য চাউল বোঝাই দিয়া বাটী আসিতেছিলেন, এমন সময় পথে কোন দুঃখীর রমণী তিন চারিটী সন্তান সহ তাঁহার পায়ে আসিয়া পড়ে। তখনি সেই স্ত্রীলোকের দুঃখকাহিনী শুনিয়া, তিনি এক বলদ ধান্য দিয়া আসেন। দুর্ভিক্ষের সময় তাঁহার বাটী হইতে যাহারা ধান্য চাউল ধার লইত, তাহারা তাহা প্রত্যর্পণ করিলেও তিনি লইতেন না। ইহাঁর চারিপুত্রের মধ্যে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী দ্বিতীয়। ইনি শৈশবে কিছু কাল বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া কোঁড়কদীর ৺ কৈলাসচন্দ্র তর্করত্ন ও নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ৺ কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ. উহার টীকা, ধাতুপাঠ, অমরকোষ ও ভট্টি, রঘু, কুমার প্রভৃতি কয়েক খানি কাব্য অধ্যয়ন করেন। শিরোরত্ন মহাশয় ইহাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তাঁহার চতুষ্পাঠীতে যে সকল বিদ্যার্থী ব্যাকরণ পড়িতে আসিত, তাহার অর্দ্ধাংশের অধ্যাপনার ভার পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন,—আর অর্দ্ধাংশের ভার অপর একটী ছাত্রের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল। ইনি ন্যায় শাস্ত্রের "ভাষা পরিচ্ছেদ" শেষ করিয়া, "ব্যাপ্তি পঞ্চক" পড়িতে পড়িতে ৺ জাহ্নবীচরণ ভট্টাচার্য্য নামক কোন বন্ধুর পরামর্শে বেণারস কলেজের সংস্কৃত বিভাগে গিয়া ভর্ত্তি হন। সেখানে কলেজের নিয়মানুসারে ভট্টজি দীক্ষিতের বৃত্তির সহিত পাণিনি ব্যাকরণ, মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি কাব্য, দর্শন, জ্যোতিষ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বেণারস কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ বাপুদেব শাস্ত্রী মহাশয় ইহাঁকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। তিনি বলেন,—

"তুমি আর কিছুকাল সাধারণ বিভাগে পড়িয়া, শেষে কেবল আমার নিকট জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত গ্রন্থ গুলি অধ্যয়ন করিবে। কারণ,তুমি পুরাতন-জ্যোতির্ব্বিদ্ বংশের লোক,—তোমার দ্বারাই বঙ্গদেশে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনার উন্নতি হওয়া অধিক সম্ভব"। কিন্তু পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর জ্যোতিষ অপেক্ষা ব্যাকরণ, কাব্য, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের উপর অনুরাগ অধিক ছিল, সুতরাং তিনি এই সকল শাস্ত্রেই সমধিক পরিশ্রম করিতেন। কিছু কাল পরে কাশীতে ভয়ানক কলেরা উপস্থিত হওয়ায় ইনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসেন। শরচ্চন্দ্র,—চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় শিরোরত্ন মহাশয় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, পুনরায় তাঁহার চতুষ্পাঠীতে আগমন করায় শিরোরত্ন মহাশয় ইহাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পরামর্শে গবর্ণমেণ্ট, উপাধিপরীক্ষার সৃষ্টি করেন। পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী উক্ত পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হন, কিন্তু সে সময় ৺ কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন, ৺ ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, ৺ হরমোহন চূড়ামণি প্রভৃতি নবদ্বীপের সুবিখ্যাত অধ্যাপকবর্গ পরীক্ষা প্রদানের বিরোধী ছিলেন। নবদ্বীপ হইতেই তাঁহারা উপাধি প্রদান করিতেন, সুতরাং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ছাত্র পাঠাইতে প্রথম প্রথম সম্মত হন নাই। শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে থাকিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা না দেখিয়া, ইনি মৌরাটের শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পরামর্শে পূর্ব্বস্থলী-নিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠিতে অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। সেখান হইতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তাহার পর আর্থিক অসচ্ছলতা প্রযুক্ত রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নওগাঁ মহকুমাস্থ উচ্চশ্রেণী ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। সেখানে অবস্থান কালেও ইনি শাস্ত্র চর্চ্চায় বিরত হন নাই। কাশী, বোম্বাই প্রভৃতি নানাস্থান হইতে প্রতি বৎসর বহু সংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ আনাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। ঐ স্থানে অবস্থান কালে ইনি এক-

বার মিথিলায় গমন করেন এবং তদানীন্তন মিথিলেশ মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের পণ্ডিত সভায় শাস্ত্রার্থ করিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের বিদায় প্রাপ্ত হন। কয়েক বৎসরের পর ইনি গ্রীষ্মাবকাশে কাশীতে গিয়া ভয়ানক জ্বরে আক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যে ছয় মাসের অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্যাবর্ত্তের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং উদয়পুরের মহারাণার পণ্ডিত সভায় প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকের বিদ্যায় প্রাপ্ত হন। তাহার পর, নওগাঁর কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতা সিটি কলেজিয়েট্ স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করেন এবং ঐ পদে অবস্থান কালে একবার গ্রীষ্মাবকাশে দক্ষিণাপথে গমন পূর্ব্বক উজ্জয়িনী, ইন্দোর, বড়োদা, বোম্বাই, পুণা, নাসিক প্রভৃতি বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক স্থান সন্দর্শন করেন। ঐ যাত্রায় বড়োদা রাজধানীর পণ্ডিত মণ্ডলী কর্ত্তৃক ইনি বিশেষ ভাবে সমাদৃত হইয়াছিলেন এবং পুরণা বেদশাস্ত্রোত্তেজক সভায় পরীক্ষা প্রদান করিয়া উপাধিসহ প্রশংসাপত্র ও পুরস্কার লাভ করেন। আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথে ভ্রমণ কালে ইনি পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সহিত নিরচ্ছিন্ন সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। কিছুকাল পরে ইনি গবর্ণমেণ্টের তিব্বতীয় ও সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের সাহায্যার্থ রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়ের অধীনে কয়েক বৎসর কার্য্য করেন। উক্ত কার্য্য শেষ হইলে অস্থায়ী ভাবে ইনি কিছুকালের জন্য দার্জ্জিলিঙ হাইস্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। সেই সময়েই কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের অন্যতম পণ্ডিতের পদে নিয়োগের আদেশ হয়। কিন্তু উক্ত পদের লোকের অবসর গ্রহণে বিলম্ব থাকায় ইনি কিছু দিনের জন্য ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন। তাহার পর, ট্রেণিংস্কুলে কয়েক মাস কার্য্য করিয়া হিন্দু স্কুলের অন্যতম সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং এখন। উক্ত কার্য্যেই ব্রতী আছেন।

শৈশব হইতেই ইহাঁর সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা রচনায় অনুরাগ ছিল। কি পাঠাবস্থায়, কি অধ্যাপনার সময়—যখনই ইনি সময় পাইতেন, কবিতা ও প্রবন্ধাদি লিখিতেন। শৈশবের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতাগুলি

প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। "নীতিচম্পূ"নামক গদ্য পদ্যাত্মক সংস্কৃত কাব্যখানি এখনও অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রথম প্রবিষ্ট হওয়া অবধি এ পর্য্যন্ত শিক্ষা পরিচর, জন্মভূমি, নব্যভারত, কল্প, জ্যোতিঃ এডুকেশন গেজেট, দৈনিক, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী ভারতী, সাহিত্য প্রদীপ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, সাহিত্য সংহিতা প্রভৃতি বহু সংখ্যক মাসিক সাপ্তাহিক পত্রে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের অভিধান প্রণয়নের সময় রায় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়ের সহকারী রূপে চন্দ্রকীর্ত্তির বৃত্তির সহিত নাগার্জ্জুন কৃত মাধ্যমিকসূত্র ও করুণা পুণ্ডরীক প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থের সম্পাদন কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ইহাঁর রচিত্র সংস্কৃত কয়েকটী কবিতা পাঠ করিয়া, অক্‌সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত পণ্ডিত মোক্ষমূলর অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়া ইহাঁকে পত্র লেখেন। ইহাঁর বাঙ্গালা গ্রন্থের মধ্যে "দক্ষিণাপথ ভ্রমণ" প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে দক্ষিণাপথের অনেক সুপ্রসিদ্ধ স্থানের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সহ প্রাকৃতিক দৃশ্য ও স্থানীয় অধিবাসীদের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইনি "শঙ্করাচার্য্য চরিত" নামক আর একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে অদ্বৈত মতের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি সহিত সম্পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। এ গ্রন্থখানিও সুধী সমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিশেষ সভ্য ও সাহিত্য সভার সভ্যপদে বৃত আছেন।

ইনি কলিকাতা আসার পর অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে সংস্কৃত পড়াইয়াছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ এটর্ণি শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ্র, গবর্ণমেণ্ট হাউসের ভূতপূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ট রায় ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এবং ভূতপূর্ব্ব ষ্টাণ্ডিং কাউন্সিল মিঃ শেলি ব্যানার্জ্জির নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। কলিকাতার কতিপয় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলাদিগেরও সংস্কৃত' ও বাঙ্গালা শিক্ষার ভার ইহাঁর প্রতি অর্পিত আছে। এখনও ইনি কোন বড় লোকের বাটীর মহিলাদিগকে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পড়া য়াথ.কেন। ইহাঁর সন্তানের মধ্যে দুইটি মাত্র পুত্র।

ইহাঁর আয় অধিক নহে, তথাপি যাহা আয় হয়, তাহা ইনি নিজের সংসার খরচ ব্যতীত দরিদ্র আত্মীয় স্বজন ও বিপন্ন ব্যক্তিদের দানেই নিঃশেষ করেন। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের প্রথা অনুসারে কোন ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ও ভিক্ষুক কেহ ইহাঁদের গৃহ হইতে নিরাশ হইয়া ফেরে না। এখন ইনি অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বাস করেন।

বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ বিজয়চাঁদ।

মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাহাদুর ইংরাজী ১৮৮১ সালে বৰ্দ্ধমান রাজবাটীর দক্ষিণ খণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকালেই মহারাজের মাতৃবিয়োগ হয়; কিন্তু স্নেহময় পিতার ক্রোড়ে লালিত হওয়ায়, মহারাজকে দুঃসহ মাতৃবিয়োগের ক্লেশ সেরূপ অনুভব করিতে হয় নাই। মহারাজাধিরাজ আফতাপ চাঁদের মৃত্যুর পর, পোষ্যপুত্র নির্ব্বাচন লইয়া, বর্দ্ধমান রাজবাটীতে এক বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। মহারাজ আফ্‌তাপ চাঁদের পত্নী—মহারাণী-অধিরাণী-বেনদেয়ী দেবী স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে পোষ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হন। ক্রমে সেই বিষয়ের উদ্যোগ হইতে থাকে। কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই সেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মৃত্যু হয় এবং ক্রমে ক্রমে আর দুইটি ভ্রাতারও এই অবস্থা ঘটে। তখন মহারাণী-অধিরাণী বেনদেয়ী দেবী বর্ত্তমান মহারাজকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদের পত্নী মহারাণী-অধিরাণী শ্রীমতী নারায়ণকুমারী দেবী ইহাতে আপত্তি প্রকাশ করেন। ক্রমে এ বিষয় লইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল মধ্যেই সমুদায় গোলমাল মিটিয়া যায়। মহারাণী-অধিরাণী বেনদেয়ী দেবী ১৮৮৭ সালের ৩১শে জুলাই মহারাজ বিজয়চাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, এবং রাজা বনবিহারী কপুর সাহেব তাঁহার অভিভাবক নিযুক্ত হন।

রাজা সাহেব স্বয়ং যেরূপ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত, তিনি মহারাজকেও সেইরূপ সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র কারবার জন্য মহারাজের বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সুশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। এক জন বহুদর্শিনী ইংরেজ-শিক্ষয়িত্রীর হস্তে ইঁহার শৈশবকালীন শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। পরে সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ দত্ত মহাশয় শিক্ষক নিযুক্ত হন। রামনারায়ণ বাবুর সুশিক্ষার গুণে মহারাজ বাহাদুর অতি অল্প দিনের মধ্যেই নানাবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠেন।

১৮৯০ সালে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র স্বর্গীয় আলবার্ট ভিক্টর মহোদয় যখন কলিকাতা আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মহারাজ বাহাদুরের নিমন্ত্রণ হয়। শ্রীযুক্ত রাজা বনবিহারী কপুর সাহেব মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতার আলবার্ট ভিক্টরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহারাজ বাহাদুর ও রাজা সাহেব— উভয়েই এ সময় সমাদৃত হন। ১৮৮৮ সালে মহারাণী-অধিরাণী বেনদেয়ী দেবীর মৃত্যু হয়। মহারাজ বাহাদুর চিরন্তন প্রথা অনুসারে ১৮৯১ সালে কালনায় আফতাপচাঁদ বাহাদুর ও মহারাণী-অধিরাণী বেনদেয়ী দেবীর সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দে ভারত গবরমেণ্ট মহারাজকে ৬ শত বন্দুকধারী সৈন্য এবং ৪১টী কামান রাখিবার অধিকার প্রদান করিয়া, সম্মান প্রদর্শন করেন। বাঙ্গালার আর কোন জমীদারের প্রতি গবরমেণ্ট এরূপ সম্মান প্রদর্শন করেন নাই। ১৮৯৮ সালে লাহোর নিবাসী ঝাণ্ডামল মেহেরার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রাধারাণী দেবীর সহিত মহারাজের শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। তৎকালে পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় বর্দ্ধমানে আগমন করেন। বিবাহ কালীন সমারোহ বর্দ্ধমান রাজের ঐশ্বর্য্যের অনুরূপই হইয়াছিল। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে মহারাজ বাহাদুর কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষা কালে ইঁহার জন্য স্বতন্ত্র পরীক্ষা গৃহ এবং স্বতন্ত্র গার্ড নির্দ্ধারিত হয়। ১৯০০ সালে ভারত গবরমেণ্ট মহারাজ বাহাদুরকে লাটসাহেবের সহিত ইচ্ছামত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন। ১৯০৩ সালের জানুয়ারি মাসের দিল্লীর দরবারে

মহারাজ বাহাদুর বংশানুক্রমে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ব্যবহারের অধিকার পাইয়াছেন।

এই নবীন বয়সেই মহারাজ বাহাদুর যেরূপ প্রজাপুঞ্জের প্রীতি ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। মহারাজ বাহাদুর সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ; প্রজার দুঃখে তাঁহার করুণ হৃদয় স্বতঃই বিগলিত হয়। উড়িষ্যা কেল্লাকুজং মহলে পরিদর্শন কালে, তিনি সেখানকার প্রজাগণের দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া, ২৫ হাজার টাকা খাজনা রেহাই দেন। দরিদ্রের অশ্রুলোচনে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। দিল্লীর দরবার হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি শুনিতে পান, কোন সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণ মহিলা অর্থাভাবে ৺কাশীধামে কষ্ট পাইতেছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট ১০৲ টাকা পাঠাইয়া দেন এবং মাসিক ৩৲ টাকা মাসহারা নির্দ্ধারিত করেন। তাঁহার এরূপ দানের কথা কত বলিব ?

কার্য্যকুশল নরপতি বর্দ্ধমান রাজবংশে ত অনেকেই হইয়াছেন, কিন্তু নব মহারাজ বিজয়চাঁদ বর্দ্ধমানবাসীর প্রীতি-ভক্তির এরূপ কেন্দ্র-স্থান কেন হইলেন ? ইহার প্রধানতম কারণ, মহারাজের স্বধর্ম্মানুরাগ। মহারাজ নিষ্ঠাবান হিন্দু,—ইহা দেখিয়া আমরা মহারাজকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি এবং সেই সঙ্গে ভক্তিও করি। এই ঘোর দুর্দ্দিনে, হিন্দু সমাজের এই বিষম বিপ্লবকালে, এই পরম প্রলোভনের বিশাল রাজত্বে নব মহারাজ প্রত্যহ যে সন্ধ্যা আহ্নিক ও দেব পূজাদি যথানিয়মে করিয়া আসিতেছেন, ইহাই আমাদের আজ আহ্লাদের বিষয়। শুধু ইহাই নহে,—প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া, রবিবার সমস্ত দিন তিনি নির্জ্জনে বসিয়া, ইষ্টদেবের আরাধনা এবং গীতা পুরাণাদি পাঠ করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহার আহার,—ফল মূলাদি, শয়ন,—কম্বল শয্যায় ; ভোজন,—কদলীপত্রে,—জলপান মৃৎপাত্রে। নিরামিষ ভোজনের দিকেই ইহাঁর স্পৃহা বলবতী। রবিবার ব্যতীত সোম এবং বৃহস্পতিবার এই দুই দিনও তিনি নিরামিষ ভোজন করিয়া থাকেন। দেবালয় দর্শন, দেবতার আরাধনা, ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি, সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা, দরিদ্রের প্রতি দয়া,—কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ভালবাসা, বয়ো-

জ্যেষ্ঠ পুরাতন আমলাগণের প্রতি সম্মান এবং সুপাত্রে দানশীলতা, এই সকল নানা গুণরত্নে মহারাজ অলঙ্কৃত। এই সকল গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কার্য্যকুশলতা সুবিমল কনক-কান্তির ন্যায় সতত দীপ্তমান।

বাল্যকাল হইতেই মাদক দ্রব্যের উপর তাঁহার হৃদয়ে ঘৃণা বদ্ধ-মূল আছে। এই চরিত্রবান্ পুরুষের আদর্শ চরিত্র অনেকের শিক্ষাস্থল। শুনিতে পাই, কোন কোন বিকৃতমস্তিষ্ক ইংরেজী নবীশ, মহারাজকে এইরূপ স্বধর্ম্মপরায়ণ দেখিয়া, বুঝি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যাঘাত ঘটিবে বুঝিয়া,—কখন কখন হাসি-তামাসা করিয়া থাকেন। সত্য সত্যই যদি কেহ এরূপ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি 'দয়ার' পাত্র। মহারাজের আর একগুণ,—তিনি তোষামোদপ্রিয় নহেন।

তাঁহার ক্ষত্রিয়োচিত আর এক গুণ,—তিনি সৎসাহসী, অশ্বারোহণ-পটু, প্রভূত বলশালী, মৃগয়াপ্রিয় এবং অব্যর্থলক্ষ্য। বাঁকুড়ার অন্তর্গত সোণামুখী গ্রামের অদূরে শিকার করিতে গিয়া, তিনি এক গুলিতে এক ভীষণ প্রকাণ্ড ভল্লুক বধ করেন। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইলে, বিপৎপাতের আশঙ্কা ছিল। ঐ সময় আরও তিনটি ভালুককে তিনি গুলি দ্বারা সংহার করেন।

দৈহিক বলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মানসিক শক্তির সম্যক পরিস্ফুরণ পরিদৃষ্ট হয়। "বিজয় গীতিকা" নামক দুইখানি সঙ্গীত পুস্তক লিখিয়া, তিনি কবি বলিয়া যশস্বী হইয়াছেন। সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক,—এই তিন ভাবের সঙ্গীতমালা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। তাঁহার সঙ্গীতগ্রন্থ পাঠকালে বাস্তবিকই মনে হয়,—তিনি বালক নহেন, যুবক নহেন, তিনি বিজ্ঞ, বহুদর্শী, সংসার-তত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ পুরুষ। তাঁহার কোন কোন সঙ্গীত যেন মন্দাকিনীর সুধার ধারা। এরূপ অল্প বয়সে এরূপ উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা সম্ভব কি না, ইহা জানিবার যদি কাহারও সাধ হয়, তাহা হইলে তিনি দুইখণ্ড বিজয়-গীতিকা একবার পাঠ করিয়া দেখুন।

মহারাজ সঙ্গীত-প্রিয়। সৎসঙ্গীতে তাঁহার সদাই আনন্দ। যথা-নিয়মে নির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ওস্তাদের নিকট তিনি সঙ্গীতাদি শিক্ষা করেন।

মহারাজ ইংরাজী বেশ জানেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং বাঙ্গলাভাষায় একজন সুলেখক। উত্তম শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া, পিতার চক্ষুর গোচরে সর্ব্বদা অবস্থিতি করিয়া, মহারাজ ইংরেজী, বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত এই তিন ভাষাকেই সম্যক অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৩০৯ সালের ২৭শে মাঘ মঙ্গলবার মহারাজের রাজ্যাভিষেক সমুচিত সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। তদানীন্তন ছোট লাট বোর্ডিলন বাহাদুর স্বয়ং বর্দ্ধমান গিয়া এই শুভ কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সময়ে ক্রমাগত কয়েক দিন বর্দ্ধমানে কেবল আনন্দ উৎসবেরই তরঙ্গ উঠিয়াছিল।

মহারাজ বিজয়চাঁদের বিজয় গীতিকা হইতে একটী গীত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহাতেই মহারাজের সঙ্গীত-রচনাশক্তির প্রস্ফুট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঝিঁঝিট-পোস্তা।

শরৎ কমলমুখী নবীনা বধূর ন্যায়। হয়ে মত্ত, হংস-রবে সদা নূপুর বাজায়।
রাজীব জলে বিরাজে, নব ধান্যে শীষ সাজে, হরিত বসনে সেজে, শরৎ এল ধরায়॥
শশাঙ্ক সুরথে সাজে, তারকাবলীর মাজে, বরষা পলায় লাজে, তটিনী পুরিত কায়।
বহে মন্দ সমীরণ, সুশোভিত উপবন, হরষিত প্রাণিগণ, ভূমে কুসুম লুটায়।
যাহার এ সুসৃজন, মধুময় ত্রিভুবন, বিজয় ভকতি ভাবে, ডাক সেই বিধাতায়॥

মহারাজ সম্প্রতি ইংরেজী ভাষাতেও একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। গ্রন্থের নাম,—"Stndies"

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতা বাগবাজারের বসু পাড়ায় গিরিশচন্দ্রের জন্ম। ইহাঁর পিতা ৺নীলকমল ঘোষ একজন উৎকৃষ্ট বুককিপার ছিলেন। গিরিশচন্দ্র জননীর অষ্টম গর্ভজাত। ইনি পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি হন। পরে তিনি হেয়ার স্কুলে পড়িয়াছিলেন। একাদশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র

মাতৃহীন হন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তাঁহার পিতা স্বর্গারোহণ করেন। তিনি ইংরেজি প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তাহার পর তিনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। অতঃপর তিনি গৃহে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। প্রায় চারি বৎসর কাল দিবারাত্র অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের অবসাদ কালে গিরিশচন্দ্র ইংরেজি পদ্যের অনুবাদ করিতেন। তিনি স্বয়ং বহু পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন এবং "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি" হইতে পুস্তক আনিতেন। অবিরাম অধ্যয়নে ইংরেজি সাহিত্যে তিনি সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

বাল্যকালে গিরিশচন্দ্র খুল্লপিতামহীর নিকট পৌরাণিক গল্প শুনিতেন। তিনি স্বয়ং রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতেন; এমন কি, পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পঠিত প্রবন্ধ মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। এখনও তিনি রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক অংশ মুখস্থ বলিয়া যাইতে পারেন। তাঁহার নাট্য-কাব্যের ছন্দোবন্ধে জাতীয় কাব্যের জাতীয়ত্ব সংরক্ষিত। আধুনিক কোন খ্যাতনামা কবি কোন প্রসিদ্ধ প্রবীণ লেখককে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন;—"মহাশয়! আমি কখন যাত্রা শুনি নাই; কখন কাশীদাসী মহাভারত ও কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ করি নাই।" প্রবীণ লেখক বলিয়াছিলেন,—"আপনি বড় অভাগা।" একবার কোন হামবড়া আপন ঢক্কায় আপন যশোঘোষী তথা-কথিত কবিকে একটী বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—"দেখ, তুমি ভাল করিয়া, কীর্ত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়িও।" ইহাতে তথা-কথিত কবি উত্তর দেন,—"তা পড়িব কেন? তাহা হইলে যে আমার অরিজিনালটী (নিজস্ব) নিশ্চিত মাটী হইবে।" গিরিশচন্দ্র এরূপ কবি নহেন; জাতীয় কাব্যে গিরিশচন্দ্রের অনুরাগ ছিল; গরিশচন্দ্র জাতীয় কবি।

এক দিন এক বাড়ীতে হাফ-আকড়াই হইতেছিল। সেই দিন সেই বাড়ীতে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অতুল আদর দেখিয়া, গিরিশচন্দ্রের মৌলিক বাঙ্গালা কবিতা লিখিবার প্রবৃত্তি উন্মেষিত হইয়া উঠে। অতঃপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পাদিত প্রভাকর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি পুস্তকগুলি রীতিমত পাঠ করেন।

এইরূপে বাঙ্গলা ভাষায় তাঁহার অনুরাগের উৎপত্তি এবং বাঙ্গালা রচনায় ব্যুৎপত্তি লাভ হয়। এই সময় হইতে তিনি মৌলিক কবিতা রচনা করিতে থাকেন।

যৌবনে গিরিশচন্দ্র কয়েক বৎসর চাকুরী করিয়াছিলেন। তিনিও তাঁহার স্বর্গীয় পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট বুককিপার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু কবির কেরাণীগিরি উপাদেয় হইবে কেন? তিনি কেরাণীগিরি পরিত্যাগ করেন। ধীরে ধীরে তাঁহার কবিত্ব-শক্তি-প্রকাশের পথ উন্মুক্ত হইল। ১৮৬৭ সালে বাগবাজারে একটী অবৈতনিক যাত্রা-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশ বাবু এই যাত্রার জন্য গান রচনা করিয়াছিলেন। যাত্রায় মাইকেলের শর্ম্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের এই প্রথম গীত-রচনা। এই গীত-রচনায় তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র আদর্শ-অভিনেতা। প্রথমতঃ তিনি ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়, বাগবাজার মুখুজ্যেপাড়ায় বাবু অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে "সধবার একাদশী" নাটক অভিনয় করিবার জন্য একটী দল বসাইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র "নিমচাঁদ" সাজিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রথম অভিনয়। গ্রন্থকর্ত্তা ৺দীনবন্ধু মিত্র "নিমচাঁদের" অভিনয় দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই অভিনয়েই গিরিশচন্দ্রের অভিনেতৃ-প্রখ্যাতি। অতঃপর শ্যামবাজারে বাবু রাজেন্দ্রনাথ পালের বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর "লীলাবতী" নাটক অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশ বাবু ললিত সাজিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাবু ললিতের অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায়, তাহা আমি জানিতাম না; Take this complement at lest"। ইহার পূর্ব্বে ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের শিক্ষা-বিধানে চুঁচুড়ায় লীলাবতী অভিনীত হইয়াছিল। এ অভিনয়ে কিছু কিছু বাদ এবং পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। গিরিশ বাবুর দলে বাদ পড়ে নাই; পরিবর্ত্তনও হয় নাই। দীনবন্ধু বাবু বলিয়াছিলেন—"এবার চিঠি লিখ্‌বো, তুয়ো বঙ্কিম।"

পরে এই বাগবাজার থিয়েটার সম্প্রদায়,—কলিকাতার যোড়াসাঁকোতে ৺মধুসূদন সান্ন্যাল মহাশয়ের বাটীতে "ন্যাশানল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত করেন। এই থিয়েটারে প্রথম টিকিট বিক্রয় হয়। সখের থিয়েটার পেশাদারি হইল, ইহাতে গিরিশ বাবু অসন্তুষ্ট হন। প্রকৃতই তিনি এই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বর এই থিয়েটারে প্রথম নীলদর্পণ অভিনীত হইয়াছিল। গিরিশ বাবু এই থিয়েটারে অভিনয় করেন নাই; তবে সম্প্রদায়ের অনুরোধে অবৈতনিক ভাবে তিনি মাইকেল প্রণীত কৃষ্ণকুমারী নাটকের অভিনয়ে ভীম সিংহ সাজিয়াছিলেন। রাণী ভবানীর প্রপৌত্র নাটোরের মহারাজ চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর গিরিশ বাবুকে স্বহস্তে আপনার পরিচ্ছদে ভীম সিংহ সাজাইয়াছিলেন। ভীমসিংহের অভিনয়েও গিরিশচন্দ্র যশস্বী হইয়াছিলেন। অতঃপর ন্যাশানাল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া যায়।

বিডন ষ্ট্রীটে "গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার" নামে থিয়েটার প্রতিষ্ঠা হয়। গিরিশ বাবু প্রথমে এই থিয়েটারে সখের অভিনয় করিতেন। এই সময় তিনি বঙ্কিম বাবুর মৃণালিনী উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন এবং মাউসি, চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, হগ এণ্ড বুল প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাণ্টোমাইন অভিনয়ার্থে রচনা করিয়াছিলেন। গিরিশ বাবুর অভিনয় দেখিয়া, এক দিন শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভূতপূর্ব্ব সাধারণী পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"বঙ্গে গিরিশ অপেক্ষা যে, কোন দেশে গ্যারিক অধিক ক্ষমতাশালী ছিল, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।" গিরিশচন্দ্র আদর্শ অভিনেতা,—শ্রেষ্ঠ নাটক-লেখক। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে তাঁহার কাব্য-নির্ঝর-ধারা উন্মুক্ত হয়। আজিও সে নির্ঝর-ধারা দিগন্তে উৎসারিত। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয়ার্থ গিরিশচন্দ্র মোহিনীমোহন, আলাদিন, আনন্দ-রহো, রাবণ-বধ, সীতার বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যুবধ, সীতাহরণ, রামের বনবাস সীতার বিবাহ, লক্ষ্মণ-বর্জ্জন, মলিন মালা, ভোট মঙ্গল, ব্রজবিহার প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্যাদি রচনা করেন। তাহা গ্রেট ন্যাশনালে অভিনীত হয়। এই থিয়েটারে গিরিশ বাবু এক শত টাকা বেতনে ম্যানেজার হইয়া-

ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি বৎসর কয়েক চাকুরী করিয়াছিলেন। রাবণ-বধ তাঁহার প্রথম নাটক। পূর্ব্বে তিনি অনেক ক্ষুদ্র কবিতা লিখিয়াছিলেন। "হলদীঘাটের যুদ্ধ" গভীর শোকপূর্ণ কবিতা। এক দিন শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় সাধারণীতে লিখিয়াছিলেন—"এরূপ গভীর শোকপূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষায় বিরল" গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটারে গিরিশ বাবু রমেশ বাবুর প্রণীত "মাধবীকঙ্কণ" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই "মাধবীকঙ্কণের" অভিনয়ে গিরিশ বাবু আট জনের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহাতে অভিনয়ের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতঃপর ১৮৮৩ সালে বিডন ষ্ট্রীট ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এই থিয়েটারে অভিনীত হইবার জন্য গিরিশ বাবু শ্রীবৎসচিন্তা, কমলে কামিনী, বৃষকেতু, চৈতন্য লীলা, নিমাই সন্ন্যাস, প্রহ্লাদ চরিত্র, প্রভাস-যজ্ঞ, হীরার ফুল, বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, বেল্লিক বাজার ও রূপ সনাতন নাটকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অতঃপর গিরিশ বাবুর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আপাততঃ আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার শক্তির ক্রম-বিকাশ এইখানে কতকটা পরিস্ফুট হইল। ইহার পর প্রফুল্ল, হারানিধি, পূর্ণচন্দ্র, বিষাদ, ম্যাকবেথ, মুকুল মুঞ্জরা, আবুহোসেন, করমেতিবাই, মায়াবসান, পাণ্ডব-গৌরব, অভিশাপ, ভ্রান্তি প্রভৃতি অনেক নাটকাদির রচনা করেন। এত প্রসঙ্গবাহুল্যময় নাটক বাঙ্গালায় আর কেহ প্রণয়ন করেন নাই। গিরিশ বাবুর সর্ব্বরস-চালনা-শক্তি সর্ব্বতোমুখিনী। সেক্সপিয়র ফলষ্টাফ চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন, গিরিশ বাবু বরুণচাঁদ বিদূষকের সৃষ্টি করিতে পারেন। জগতের চরিত্র-বৈচিত্র্য যেমন সেক্সপিয়রের নাটকাবলীতে, তেমনি গিরিশচন্দ্রের নাটকাবলীতে পাইবে। সত্য সত্যই বাঙ্গালীর গিরিশচন্দ্র নাট্য-খনির কহিনুর। অবশ্য তাঁহার সকল নাটকেই কৃতিত্বের চরম পরিচয় নাই; কিন্তু তাঁহার বিল্বমঙ্গল, মুকুলমুঞ্জরা, চৈতন্য-লীলা, প্রফুল্ল, বুদ্ধ,—নাট্য-জগতের দিগ্বিজয়িনী নিশানা। গিরিশচন্দ্রের সৌন্দর্য্যসৃষ্টিশক্তির পরিচয় ন্যূনাধিক পরিমাণে তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে

পরিলক্ষিত হইবে। মাতৃভাষায় গিরিশচন্দ্র বাল্যে যে অনুরাগ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে সেই অনুরাগ অবিচ্ছিন্ন। যে অনুরাগে তিনি আপনি মত্ত, আজ তিনি সেই অনুরাগে বাঙ্গালীকে মাতাইয়াছেন। ইনি ৭০ খানিরও অধিক নাটক, নাটিকাদি লিখিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পরের জন্য কাঁদিতে জানেন। তিনি বিপন্ন রুগ্নের উদ্ধারার্থ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন। তিনি ৺রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, ধর্ম্মের যে সংশিক্ষা আপন হৃদয়ে পোষণ করিয়াছেন, তাহাই নিজকৃত সাহিত্যে সঞ্জীবীত করিয়া, বাঙ্গালীর প্রাণে অনুপ্রাণিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র,—পরের জয়ঢাকে আপনার খ্যাতিনাদ উঠাইবার জন্য আত্মমর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিতে জানেন না। সুখ্যাতি-নিন্দায় গিরিশচন্দ্র অবিচলিত। গিরিশচন্দ্র কবি,—সাহসী, নির্ভীক, স্বাধীন, সুদৃঢ়। গিরিশচন্দ্র কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি বহুকাল ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞানসভায় বৈজ্ঞানিক বিদ্যার অনুশীলন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়,—"গিরিশ গীতাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে গিরিশ বাবুর গীতাবলী সন্নিবিষ্ট। ভূমিকায় ইনি লিখিয়াছেন,—"আধুনিক গীত রচয়িতাগণের মধ্যে গিরিশ বাবুর গান যেরূপ বহুদূর বিস্তৃত, বোধ হয়, সেরূপ কোন রচয়িতারই নাই। ভারতবর্ষে যেখানে কর্ম্মোপলক্ষে দু'চারিজন বাঙ্গালী আছেন, সেই স্থানেই গিরিশ বাবুর গান গীত হইয়া থাকে। আমরা "উড়ে যাত্রায়" গিরিশ বাবুর গান গাহিতে শুনিয়াছি। তাঁহার রচিত "নেচে নেচে চল মা শ্যামা, তুজনে তোর সঙ্গে যাব,"—"চল লো বেলা গেলো লো, দেখবো রাধা শ্যামের বামে,"—"ও মা কেমন করে, পরের ঘরে, ছিলে উমা বল মা তাই"—সাগর কুলে, বসিয়া বিরলে, হেরিব লহর মালা"—"কেশব কুরু করুণা দীনে," কুঞ্জ-কানন-চারী" "দেখলে তারে আপন হারা হই"—"হায় রে হায়, প্রেমিক যে জন, সে কেন চায় ভাল বাসা" "চরম সময়, হওমা উদয়, দেখে মরি তারা শ্রীপদনলিনী।" 'যাই গো ওই বাজায় বাঁশী প্রাণ কেমন করে" "হেরি চম্পক কলি,

পড়ে ঢলি ঢলি, আমা বিনা সে কি জানে,—"চমকে চপলা, চমকে প্রাণ, চাহ মা চপলা-হাসিনী" "আমায় বিলিয়ে দিতে চাও কি প্রাণ সই?" "ঘরে কি নাইকো নবনী" "পায়ে ঠেলে যদি চলে যায়" "হাস'রে যামিনী হাস' প্রাণের হাসি রে" প্রভৃতি গানগুলি বাঙ্গলা দেশে এমন স্থান নাই, যেখানে গীত হয় না। পল্লীগ্রামের মাঠে গিরিশ বাবুর অনেক গান আমরা রাখাল বালকগণকে গাহিতে শুনিয়াছি, অনেক বৈষ্ণব ভিখারী গিরিশ বাবুর চৈতন্যলীলা, প্রভাসযজ্ঞ, ব্রজবিহার প্রভৃতি ভক্তিরসাত্মক নাটকের গীত গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া থাকে।" গিরিশ বাবু বস্তুতই ক্ষণজন্মা পুরুষ, সন্দেহ নাই।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।



১২৪৫ সালের ৬ই বৈশাখ হুগলি জেলার অন্তর্গত গুলিটা গ্রামে মাতুলালয়ে হেমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কৈলাস চন্দ্র। হেমচন্দ্র পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। প্রথম লেখা-পড়া হেমচন্দ্রের মাতুলালয়েই সম্পন্ন হইয়াছিল। নবমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত গুলিটা গ্রামের পাঠশালায় অধ্যয়নের পর হেমচন্দ্রের মাতামহ তাঁহাকে খিদিরপুরে লইয়া আসেন এবং সেই সময় হিন্দু কলেজে তাঁহাকে ভর্ত্তী করিয়া দেওয়া হয়। যথা কালে হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজ হইতে জুনিয়ার পরীক্ষা দিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সেই সময় সবে মাত্র হইয়াছে। হেমচন্দ্র ১৮৫৮ খৃঃ অব্দে তাহা হইতে সিনিয়র ও এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ইহার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য প্রবিষ্ট হন। কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতায় এক বৎসরের অধিক তাঁহার আর অধ্যয়ন করা হইল না। এই সময় "মিলিটারি অডিটার জেনারালের আফিসে" হেমচন্দ্র মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কিন্তু কেবল কেরাণীগিরি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা তো আর হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না, কেরাণীগিরি করিতে করিতে তিনি বি-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইহারই ফলে তিনি ইংরাজী ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময় কেরাণী হেমচন্দ্র শিক্ষক হইয়া, কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলে মাসিক ৫০৲ বেতনের একটি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইহার তিন বৎসর পরে ১৮৬২ খৃঃ অব্দে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেমচন্দ্র হাওড়া ও শ্রীরামপুরের মুন্সেফ রূপে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তাঁহার পিতৃ বিয়োগ ঘটে। ইহার কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা-ভবানীপুরে হেমচন্দ্রের বিবাহ হয়, বিবাহের পর তিনি খিদিরপুরে বাস করিতে আরম্ভ করেন।

মুন্সেফের কার্য্যে এক বৎসর মাত্র নিযুক্ত হওয়ার পরেই সরকার বাহাদুরের নির্দ্দেশ অনুসারে হেমচন্দ্রের দূরদেশে যাওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িল। তাঁহার মাতামহী ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন। তাঁহারা কিছুতেই তাঁহাকে দূরদেশে যাইতে দিবেন না স্থির হইল। তাহারই ফলে স্বাধীনচেতা হেমচন্দ্র মুন্সেফি কার্য্যে ইস্তফা দিয়া স্বাধীনভাবে ওকালতি কার্য্যে ব্রতী হইলেন। আলিপুরের সদর দেওয়ানী আদালতে বা তাৎকালিক হাইকোর্টেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হইল। ইংরাজী ১৮৬২ খৃঃ অব্দে এই ঘটনা ঘটে।

গুণের আদর সর্ব্বত্র। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি সুবিধা পাইলেই চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। গুণবান হেমচন্দ্রের গুণ-বহ্নি ওকালতির সুযোগে সাধারণ্যে ছড়াইয়া পড়িল। অনেকেই এই নবীন উকীলকে আদর করিতে লাগিলেন। ইহারই ফলে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হেমচন্দ্র, সুপ্রসিদ্ধ উকীল অন্নদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অবসর গ্রহণে তাঁহারই স্থানে "গবরমেণ্ট সিনিয়র প্লিডারে"র পদে মনোনীত হইলেন। এই সময়ই ইঁহার কবিতার পূর্ণ বিকাশ।

ইংরাজী ১৮৬১ খৃঃ অব্দে যে সময় হেমচন্দ্র হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিতেছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার কবিতা-লেখার প্রবৃত্তি জন্মে। ইহারই ফলে "চিন্তা-তরঙ্গিণী" নামক কবিতা-পুস্তিকা খানি ঐ সময়ই

প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকা খানি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার উপাধিলাভের অন্যতম পাঠ্যরূপে পরিগণিত হয়। এই একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা হইতেই হেমচন্দ্র যে, কালে একজন সরস্বতীর বর পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিল। এই পুস্তিকার ভাষা যেরূপ সরল, সেইরূপ প্রাঞ্জল ;—এই পুস্তকের—

"শীতল বাতাস বয়, জলের কল্লোল।
রাঙ্গা রবি ছবি ল'য়ে খেলায় হিল্লোল।"

প্রভৃতি কবিতা-পাঠে মন এক অপূর্ব্ব শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকে।

ইহার পর বৎসর ইংরাজী ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ইহাঁর যে "ভারত সঙ্গীত" কবিতায় প্রতিভার দীপ্ত রেখা প্রকাশ পাইয়াছিল,—তাহা "এডুকেশন গেজেটে" প্রকাশিত হয়। স্বনামধন্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তখন "এডুকেশন গেজেটে"র সম্পাদক।

ইহার পর সন ১২৭১ সালের ৩১শে বৈশাখ ইহাঁর দ্বিতীয় পুস্তক "বীরবাহু" কাব্য প্রকাশিত হয়। তাহার পর কবিতাবলীর প্রকাশ। এডুকেশন গেজেটে যে "ভারতসঙ্গীত" পাঠে সাধারণে মোহিত হইয়া উঠিয়াছিল, "কবিতাবলী"তে তাহার পুনর্ম্মুদ্রণ হইল। এতদ্ভিন্ন "কবিতাবলীর" অন্যান্য কবিতার ভাবেও সকলে যেন বিভোর হইয়া উঠিল। "কবিতাবলী"র সেই নিরাশ প্রেমের চিত্রে—

'দেখ প্রিয়ে! সূর্য্য আভা, গঙ্গাজলে কিবা শোভা,
সুবর্ণের পাতা যেন ছড়াইয়া পড়িল।
কৃষক মঞ্চের পরে, উঠিল আনন্দ ভরে,
চঞ্চুপুটে শস্য ধ'রে, নভশ্চর ফিরিল।
এ সুখ-সন্ধ্যায়, প্রিয়ে! সাধে জলাঞ্জলি দিয়ে
শূন্যমনে নিরসনে এ অভাগা রহিল॥"

অপিচ—

"আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।
কেন হেন বারে বারে, কাঁদাইতে অভাগারে
গগন মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।"

প্রভৃতি কবিতায় কবি ছত্রে ছত্রে যে মধু রাশি ঢালিয়া দিয়াছেন, লোকে প্রাণ ভরিয়া তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। হেমচন্দ্রের ন্যায় সৌভাগ্য-শালী কয় জন?

ইহার পর হেমচন্দ্রের "আশা কানন" "ছায়াময়ী" "দশমহাবিদ্যা" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। তাহার পর বাঙ্গালা সাহিত্য ভাণ্ডারের উজ্জ্বল-তম রত্ন,—"বৃত্রসংহার।" ইহা হেমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ। কোন কোন অংশে বৃত্র-সংহার মধুসূদনের মেঘনাথ বধ হইতেও শ্রেষ্ঠ। "বৃত্রসংহারের" সর্ব্ব প্রধান নায়িকা ইন্দুবালার স্বার্থপূর্ণ সরল কথা গুলি মাইকেল মধুসূদনের "মেঘনাদ বধের" নায়িকা প্রমীলার বাক্যাবলীর সহিত অনেক বিভিন্ন। দৈত্যকুলবধূ ইন্দুবালা ইন্দ্রাণীর শোকে কাতর প্রাণে বলিতেছেন,—

আমিও রমণী, রমণীও শচী, তবে তিনি কেন তায়,
না করিয়া দয়া, হইয়া নিষ্ঠুর, ধরিতে গেলা ধরায়
কি হবে শচীর, পতি কাছে নাই, মহাবীর পতি মম।
আমিও যদ্যপি, পড়ি সে কখন, বিপদে শচীর সম।

"চিত্তবিকাশ" কবিবরের শেষ কীর্ত্তি। ইহা অন্ধাবস্থায় ৺কাশীধামে লিখিত হয়। ওকালতীতে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জিত করিতেন বলিয়া, হেমচন্দ্র পুস্তক বিক্রয়ের আয়ে তত দৃষ্টি রাখিতেন না। তাহার উপর তিনি অত্যন্ত পরদুঃখকাতর ছিলেন, সেই জন্য যথেষ্ট উপার্জ্জনেও কিছুমাত্র সংস্থান করিতে পারেন নাই। বার্দ্ধক্যে দৈব দুর্ঘটনায় তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। সেই অন্ধাবস্থায় তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হয় সেই সময় কাশীবাস করা স্থির করিয়া তিনি কাশীধামে গমন করেন। হেমচন্দ্র পুস্তকবিক্রয়ের আয় কখন গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু এই বার দারুণ দৈন্যদশায় উহাও আবশ্যক হইয়া পড়িল। তিনি "চিত্তবিকাশ" গ্রন্থকে স্কুলপাঠ্য তালিকা-ভুক্ত করাইবেন মনে করিয়াছিলেন, ফলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। ইহার পর তিনি পুনরায় খিদিরপুরে আগমন করেন। এ সময় তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল না; দারুণ অন্নকষ্টে কবি ব্যথিত হইয়া পড়িলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যসেবী অনেকেই

কবির কষ্টে কষ্ট অনুভব করিলেন। সকলে মিলিয়া মিশিয়া চেষ্টা করিয়া এই সময় গবরমেণ্ট বাহাদুরকে কবির কথা জানাইলেন। বাঙ্গালা গবরমেণ্ট দয়া করিয়া এই সময় কবিকে ২৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। যে হেমচন্দ্র এক সময়ে জলের মত অজস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কত পঁচিশ টাকা এক সময়ে যে হেমচন্দ্র কত অনাথ আতুর বিপন্ন ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন, সেই হেমচন্দ্র এক্ষণে উহা পাইয়া কতকটা যেন শান্তি-সুখ উপলব্ধ করিলেন। এ রাজানুগ্রহও এখন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট হইল। চাঁদায়ও তাঁহার জন্য কিছু অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল।

কবি হেমচন্দ্র এই গবরমেণ্ট বৃত্তি লাভে কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বস্তি পাইয়াছিলেন কিনা, বলিতে পারে না। কালের কুটিল রহস্য ভেদ করা যে, অসম্ভব!

সন ১৩১০সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ হেমচন্দ্র পার্থিব সকল জ্বালা এড়াইয়া অনন্তধামে গমন করিয়াছেন। হেম চন্দ্র অনন্তে মিশাইয়াছেন, কিন্তু বঙ্গে অনন্তকাল তাঁহার কাব্য-কীর্ত্তি উজ্জ্বল রহিবে।

অল্প দিন হইল, তাঁহার উন্মাদিনী পত্নীও পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী।

প্রমথ নাথ,—ময়মনসিংহ-সন্তোষের সমৃদ্ধ জমিদার; পদ্মা, গৌরাঙ্গ, গীতিকা প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। ইনি কিরূপ সুকৌশলে, কেমন মধুর ভাবে, কত কবিত্ব-সৌন্দর্য্যে আত্ম-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন দেখুন;—

"১২৭৯ সনের ফাল্গুনে আমার জন্ম। শৈশবে পিতৃবিয়োগ ঘটে। আমাদের ও আমাদের বিষয়ের ভার আমার পূজনীয়া মাতৃদেবীর উপর পড়ে। আমার জীবনে আমার মাতৃদেবীর প্রভাব বড় অল্প নয়। অভিভাবকহীন ধনিসন্তানকে অতি-স্নেহদুর্ব্বলা জননী অনেক সময়

সুপথে রাখিতে পারেন না। আমাদের ভাগ্যগুণে জননীর স্নেহ ও পিতার দৃঢ়তা মাতৃদেবীতেই বর্ত্তমান ছিল। আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতার সহিত অনেক সময় স্মরণ করি, যে হাতে মাতৃদেবী স্নেহ কোমল হাস্যে আমাদিগকে আহার্য্য পরিবেশন করিয়া ধন্য জ্ঞান করিতেন, সেই হাতেই আবার যথা সময়ে, শাসন দণ্ড, তুলিতে দ্বিধা করিতেন না। বাল্যকালে আমি যেমন দুরন্ত ছিলাম, তেমনই অতিমাত্রায় অধৈর্য্য, আত্মনির্ভরপরায়ণ ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলাম। বাল্যের দুরন্তপনা কাহারও থাকে না, আমারও নাই; কিন্তু অন্যান্য স্বভাবের তেমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই. একজন কড়া পণ্ডিত ও চরিত্রবান্ মাষ্টারের হাতে আমার শিক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। আমার স্মরণ আছে—পণ্ডিত মহাশয় কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই। তিনি অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ ও সাধু প্রকৃতির লোক। অনেক দিন মনে হইত—আজ পণ্ডিত আসিবেন না, কিন্তু আমাদের অভিলাষ ব্যর্থ হইত। তিনি ঘড়ীর কাঁটার মত যথা, সময়ে যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া—আমাদিগকে বিস্মিত ও ব্যথিত করিতেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে, আমাদের একান্ত প্রার্থনা স্বত্বেও ব্যাধিও কোনদিন তাঁহাকে কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে দেয় নাই।

মাষ্টার মহাশয় কতকগুলি নূতন আদর্শ হইয়া সম্মুখে ধরিলেন। তিনি একজন সাহিত্যিক, তাঁহারই সংস্পর্শে আমার বঙ্গভাষা-প্রীতির সূত্রপাত হয়। শিক্ষার এত আয়োজন হইল, স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম; কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় আমাকে দশ জনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিল না। ঐ ধরণের শিক্ষা সামর্থ্য আমার ছিল না। একথা স্বীকার করিতেছি। সাহিত্য আমাকে শৈশব হইতেই অজ্ঞাতে আকর্ষণ করিতেছিল।

আমি ক্লাসে সাহিত্যপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলাম, কিন্তু গণিতের দেবতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। গণিতের ঘণ্টায় লুকাইয়া বাঙ্গলা পড়িতাম। তজ্জন্য বিদ্যালয়ে ও গৃহে কত তিরস্কার লাভ করিয়াছি। কে জানিত, সেই আমি আজ সেই গণিতেরই অর্চ্চনা। করিব। কিন্তু ভজনা এক, আর ভালবাসা এক। গণিতকে কোন দিনই আমি আপ-নার করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমি সাহিত্যের ভক্ত

ছিলাম। আমার মনে হয়—এই সাহিত্য-প্রীতিও—আমাকে নীরবে ভোগ হইতে ত্যাগের দিকে লইয়া গিয়াছে। আমার জীবনে "বঙ্কিমের" প্রভাব যত কার্য্যকারী হইয়াছিল, এত আর কিছু নয়। শুধু সাহিত্যের দিক দিয়া একথা বলিতেছি না। কৈশোরে "বঙ্কিমের" আদর্শগুলি আমার কল্পনা-জগতে ছবির পর ছবি আঁকিয়া আমাকে এক লোকাতীত মায়া-রাজ্যে লইয়া যাইত, উহাতে আমার উন্নত বৃত্তি গুলিও বুঝি বিকশিত হইবার অবসর পাইয়াছিল। আমার স্মরণ আছে, "বঙ্কিম" পড়িয়াই আমার মনে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি অনুরোগ জাগিয়া উঠে; সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় বিলাসিতা ও আচার পদ্ধতির উপর বিরাগ জন্মে। আমি ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে একথা বলিতেছি না,—ইংরেজি সাহিত্যের আমি ভক্ত পাঠক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় কৃপা করে নাই, ক্রমে তাহার অত্যাচার আমাকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। আমার ন্যায় অনবহিতচিত্ত ও অকালপক্ক বালকের পক্ষে বাঁধা নিয়মে নীরস পাঠ্যগুলি গলাধঃকরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই সময় সাহিত্য-মন্দির ও কর্ম্মক্ষেত্র হইতে আমার ডাক পড়িল, সে আহ্বান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর অতিক্রম করা-ইয়া আমাকে গীতগন্ধময় সুন্দর জগতে লইয়া গেল। আমি ঐ উভয়ের কাহাকেও বঞ্চিত করি নাই। কাহারও আহ্বান ব্যর্থ করি নাই। সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত বন্দীর ন্যায় উদার আকাশের নীচে দিনের আলোকে দাঁড়াইয়া, সেই সর্ব্বপ্রথম আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলাম,—একথা বেশ স্মরণ আছে।

এইবার আমার নিজের পথ নিজের কাছে সহজ ও সুপরিচিত মনে হইল। চির-পোষিত আশা সফল হইল। আমি ইংরেজী সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের সুযোগ্য ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ ও শেষে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হুইলার সাহেবের নিকট বিশেষ সহায়তা প্রাপ্ত হইলাম। নানা কর্ম্ম কোলাহলে কর্ত্তব্য আবর্ত্তের উর্দ্ধে সাহিত্য আমার জীবনে ধ্রুব তারার ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। আমি যে কর্ত্তব্যটীকে হৃদয়ের সহি

গ্রহণ ও বরণ করিয়া লই, উহাঁকে চরম সাফল্য দান করিতে নিজকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করি। কাব্য ও কর্ম্ম এক সঙ্গে চলিতে লাগিল। আজও এইরূপই চলিতেছে। এক সময়ে সমস্ত হৃদয় দিয়া কল্পনা ও বাস্তবের মনোরঞ্জন করিতে পারি না—কখনও এ দিকে কখন ও ওদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছি, তাই বলিয়া উভয়ের মধ্যে বিরোধ-বৈরিতা নাই, বরং ছায়ালোকের সংমিশ্রণের ন্যায় একের দ্বারা অন্যের সহায়তা হইতেছে। তথাপি সাহিত্যই আমার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। সাহিত্য ছাড়িলে আমার কিছু থাকে না। জীবনের সহস্র জালে জড়িত হইয়াও আমার শুভ্র সমুন্নত সাধনা সেই এক মহান্ লক্ষ্য পানেই ছুটিয়াছে। আমি অনেক সময় সগর্ব্বে সাহ্লাদে স্মরণ করি,—আমি ধনী নই, মানী নই,—আমি শুধু কবি। কবিতা-রচনায় আমার যত তৃপ্তি, অধ্যয়ন ও সাহিত্যালাপে আমার যত আনন্দ, এমন আর কিছুতে নহে।

কৌতূহলী পাঠক নিরাশ হইবেন, আমার রচনা-উন্মেষের ইতিহাসে কোন কবিত্ব নাই,—তাই একটা আড়ম্বরপূর্ণ ভাবুকতারঞ্জিত সরস বর্ণনার প্রত্যাশা ত্যাগ করিতে হইবে।

আমার বয়স যখন ২১ বৎসর, তখন হইতে কাব্যকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থরূপে হৃদয়ের মধ্যে লাভ করিলাম। সেই সময় হইতে রচনা-তৃষ্ণা তীব্রভাবে জাগিয়া উঠিল। সে সকল কৈশোর রচনা কাহাকেও দেখাইতে ভরসা হয় নাই;—সে গুলি লোক-লোচনের অন্তরালে চিরদিনের জন্য লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। উহাদের উহাই যোগ্য পরিণাম। ক্রমে ক্রমে আমার নিজের রচনার প্রতি আস্থা জন্মিল, নিজের রচনা-সমালোচনার শক্তি জন্মিল,—ভিতরে বাহিরে সংশোধন আরম্ভ। বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতে জীবন ও কল্পনা বিচিত্র ও বিকাশ প্রাপ্ত হইল। কবে আমার কবিতা জনসাধারণের নিকট আত্ম প্রকাশ করিল, সে কথা লেখা অনাবশ্যক।

———

স্বর্ণকুমারী দেবী।

ইনি সাক্ষাৎ সত্ত্বগুণমূর্ত্তি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে কলিকাতা মহানগরীতে ইহাঁর জন্ম হয়। ইনি পিতৃ-গৃহে বাল্যকালে শিক্ষকের নিকট বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষা একত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এ শিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়। ১১ বৎসর বয়সে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের সহিত ইহাঁর পরিণয় ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ইনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ অনুরাগিনী। স্বামীর যত্নে স্বর্ণকুমারী দেবী ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করেন। সুযোগ্য পতির হস্তে পড়িয়া ইহাঁর প্রতিভা সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। ১৮ বৎসর বয়সে ইহাঁর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্ব্বাণ' রচিত হইয়া দুই বৎসর পরে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তক বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে মহিলা-রচিত আদি উপন্যাস; কিন্তু সেই জন্যই ইহার প্রকৃত গৌরব নহে। তৎকালীন সংবাদপত্র সমূহে এক বাক্যে ইহার প্রশংসা ধ্বনিত হইয়াছিল। এমন কি, ইহা স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়া অনেকেই তখন বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু রচয়িত্রীর প্রতিভাময়ী লেখনী-প্রসূত নব নব রচনা শীঘ্রই বঙ্গ-সমাজের মন হইতে এই অবিশ্বাস দূর করিতে সমর্থ হইল। 'দীপ নির্ব্বাণের' পর ইহাঁর অনেক ভাল উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছে। কেবল উপন্যাস নহে, ইহাঁর প্রণীত কবিতা, গীতিনাট্য, কৌতুকনাট্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ক পুস্তকে বঙ্গ-সাহিত্যের কলেবর পরিপুষ্ট। তাঁহার মুদ্রিত পুস্তক সকলের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল;—১ দীপ-নির্ব্বাণ। ২ ছিন্নমুকুল। ৩ হুগলীর ইমাম বাড়ী। ৪ স্নেহলতা। ৫ বিদ্রোহ। ৬ মিবাররাজ। ৭ ফুলের মালা। ৮ কাহাকে? ৯ নব কাহিনী। ১০ মালতী। ১১ বসন্ত উৎসব। ১২ গাথা। ১৩ কবিতা ও গান। ১৪ কৌতুক নাট্য ও বিবিধ কথা। ১৫ পৃথিবী। ১৬ বাল্য বিনোদ। ১৭ গল্প-স্বল্প। ১৮ কীর্ত্তিকলাপ। ১৯ বর্ণবোধ। শেষোক্ত চার খানি বালক-বালিকাদিগের জন্য লিখিত। এখনও ইহাঁর লেখনীর

বিরাম নাই। সম্প্রতি ভারতীতেও ইহাঁর "দেব কৌতুক" নামক এক খানি কাব্য নাট্য প্রকাশিত হইতেছে।

কেবল উপন্যাসাদি রচনাতে ইহাঁর উদ্যম পর্য্যবসিত হয় নাই। বহু বৎসর ধরিয়া ইনি ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পত্রিকার প্রবর্ত্তক। সাত বৎসর কাল ইনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১২৯১ সাল হইতে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং ১১ বৎসর অক্ষুণ্ণ গৌরবে পরিচালনা করিয়া, ১৩০২ সালে কন্যাদ্বয়ের হস্তে উহার ভার অর্পণ করেন।

ভারতীতে তাঁহার যে সকল লেখা বাহির হইয়াছে, তাহার সমস্ত অদ্যাপি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই।

সাহিত্য রচনা ছাড়া অন্যরূপ দেশহিতকর কার্য্যেও ইহাঁকে ব্রতী দেখা যায়। ১২৯৩ সালে ইহাঁর কর্ত্তৃক 'সখি সমিতি' নামে একটী মহিলা সমিতি সংস্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য,—(১) সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের একত্র সম্মিলনে পরস্পর সদ্ভাব বর্দ্ধন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান। (২) পিতা অক্ষম হইলে তাঁহার বালিকা কন্যাকে শিক্ষার্থে সাহায্য দান, অনাথ অসহায়া বিধবাদিগকে অর্থ সাহায্য দান এবং কোন বিধবা ইচ্ছা করিলে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিয়া, যাহাতে তিনি দেশ-হিতকর কার্য্যে জীবন দান করিতে পারেন, সেইরূপ শিক্ষা প্রদান।

অন্য কথায় অসহায়া বিধবাদিগের জন্য একটী আশ্রম স্থাপন করা "সখি সমিতির" বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ মুদ্রার আবশ্যক। সমিতির বহু চেষ্টাতেও যে সামান্য অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাতে সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবার নহে। সেই অর্থের সুদ বালিকা-শিক্ষার জন্য এবং কতিপয় দীনা বিধবা রমণীর সাহায্যের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। বিধবা রমণীগণের মধ্যে অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত গৃহের বিধবা মহিলা; এখন দুর-বস্থায় পড়িয়া এইরূপ দান গ্রহণে বাধ্য হইয়াছেন।

"মহিলা শিল্প মেলা" ইহাঁর আর একটী অনুষ্ঠান। অন্তঃপুর মহিলা-গণের হৃদয়-মনের প্রসারতা সম্পাদন এবং তাঁহাদের শিল্পোন্নতি সাধন

উদ্দেশ্যে কেবল মহিলাদিগের জন্য এবং মহিলাগণ কর্ত্তৃক বৎসরান্তে উক্ত নামে একটি ক্ষুদ্র প্রদর্শনী সংগঠিত হইত। এই প্রদর্শনীতে বোম্বাই আগ্রা, দিল্লী, জয়পুর কানপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের শিল্পাদি রক্ষিত হইত এবং মহিলাগণ তাঁহাদের রচিত নানারূপ শিল্পও প্রেরণ করিতেন। শিল্প-নৈপুণ্যের তারতম্য অনুসারে তাঁহারা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অন্তঃপুর-মহিলাগণের নিকট উক্ত 'মহিলা শিল্পমেলা' একটি বিশেষ আনন্দ উৎসব বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা প্রতি বৎসর ইহার জন্য আগ্রহ ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন। এই মেলা হইতে যে অর্থ লাভ হইত, তাহা "সখি-সমিতির" ভাণ্ডারে যাইত।

স্বর্ণকুমারী কেবল মাত্র প্রতিষ্ঠাবতী লেখিকা নহেন, ইনি নানারূপ সদ্‌গুণবতী। এ সম্বন্ধে ইঁহার কন্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী লিখিয়াছেন,—'আমার মাতার সকলই প্রশংসনীয়, কেবল বুদ্ধি বিদ্যাতেই আমরা তাঁহাকে বড় মনে করি না, তাঁহার স্নেহ-প্রবণ সুকোমল হৃদয়, তাঁহার উদার করুণা, তাঁহার আত্মলোপী ধৈর্য্য—এ সমস্তেই তিনি আমাদিগের নিকট আদর্শ রমণী।" ভারতীর বর্ত্তমান সম্পাদিকা,—"লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র প্রবর্ত্তিকা শ্রীমতী সরলাদেবী বি-এ স্বর্ণকুমারীরই কন্যা,—কবি রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে বন্ধুনগোত্রীয় জিঝোতিয়া ব্রাহ্মণ হৃদয়রাম ত্রিবেদী মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টেঁয়াগ্রামে বাস করেন। তাঁহার প্রপৌত্র বলভদ্র, জেমোর রাজবাটীতে বিবাহ করিয়া জেমো গ্রামে বাস করেন। বলভদ্রের পুত্র রূপাসুন্দর ও ব্রজসুন্দর পরম ধার্ম্মিক ও সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন। ব্রজসুন্দর পৌরাণিক শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ছিলেন, ও বাঙ্গলায় মাধব-সুলোচনা নাটক ও স্বর্ণসিন্দুর সিংহ প্রহসন রচনা

করিয়াছিলেন। কৃষ্ণসুন্দরের পুত্র গোবিন্দসুন্দর ও উপেন্দ্রসুন্দর। গোবিন্দসুন্দর প্রতিভায়, চরিত্রে, তেজস্বিতায় ও দেশানুরাগে স্থানীয় সমাজে শীর্ষস্থ বলিয়া পূজিত ছিলেন। উপেন্দ্রসুন্দরের কোমল স্নেহসিক্ত চরিত্র সর্ব্বজনের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছিল। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সেক্সপীয়রের পেরিক্লিস্ ও ভারতবর্ষের ইতিহাস তিনি সংস্কৃত কাব্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দসুন্দরের পুত্র রামেন্দ্রসুন্দর ও দুর্গাদাস বর্ত্তমান। রামেন্দ্র-সুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইনি স্বয়ং এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। পিতৃদেব পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিতেন,—ক্লাসের মধ্যে বার্ষিক পরীক্ষায় সকলের উচ্চে না থাকিতে পরিলে গৌরব নাই; কিন্তু ফাঁকি দিয়া উচ্চে উঠিবার চেষ্টা লজ্জাকর। সেই সঙ্গে স্বধর্ম্মের প্রতি—স্বদেশের প্রতি ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলাম। বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রতি অনুরাগও সেই বয়সে পিতৃদত্ত শিক্ষার ফল। পিতৃদেবের জ্যোতিষশাস্ত্রে ও গণিতে অসামান্ত অধিকার ছিল। বাল্যকালেই তাহার ফলভাগী হইয়াছিলাম।

"পাঠশালার বার্ষিক পরীক্ষার প্রতিবৎসর প্রথম পুরস্কার পাইতাম; ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করি। ইতিমধ্যে বাঙ্গালা বহি পড়ায় নেশা জন্মিয়াছিল।

"পরে কান্দি ইংরেজি স্কুলে ভর্ত্তি হই। প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান পাওয়ায় পিতৃদেবের দুঃখ হইয়াছিল। পরে আর এরূপ ঘটনা হয় নাই। ইংরেজি স্কুলে পড়িবার সময় বাঙ্গালা কবিতা লিখি-তাম। এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষার বৎসরে পিতৃদেবের মৃত্যু ঘটে। এই দুর্ঘটনায় অবশ হইয়া পড়ি ও পরীক্ষার ফলে হতাশ হই। ১৮৮১ অব্দে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান পাইয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি।

"পিতৃব্যদেবের সহিত কলিকাতা আসিয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে ভর্ত্তি হই। এই সময়টা পড়াশুনার বড় অমনোযোগ ঘটে। পাঠ্য পুস্তক না

পড়িয়া বাহিরের বহি (ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পুস্তক) অধিক পড়িতাম। ফলে ফাষ্ট' আর্ট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানে নামিতে হয়। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও আনুষঙ্গিক সুবর্ণ পদক লাভ করি।

"১৮৮৪ সালে পিতৃব্যের মৃত্যু পুনরায় অবসন্ন করিয়াছিল। বি, এ পরীক্ষাতেও তেমন যত্ন পূর্ব্বক পড়িতে পারি নাই। এই সময়ে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে নেশা জন্মে। ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস পড়া একরূপ ত্যাগ করি। ১৮৮৬ বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনায়ে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করি। এই সময়ে নবজীবনে আমার প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দুই একটা প্রবন্ধ বেনামিতে লিখিয়াছিলাম।

"পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এম্, এ, দিবার জন্য প্রস্তুত হই। রসায়নের অধ্যাপক পেডলার সাহেব একটী "ক্লাস এক্সারসাইজ" দেখিয়া সন্তুষ্ট হন ও তখন হইতেই প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তির জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসাহিত করেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি রসায়নের পরীক্ষক ছিলেন; ঐ পরীক্ষায় আমার কাগজ সম্বন্ধে তিনি সেই দিন আপনার অভিপ্রায় ক্লাসের সম্মুখে ব্যক্ত করেন;— "আমি এ পর্য্যন্ত যত রসায়নের কাগজ দেখিয়াছি; তন্মধ্যে ঐ Out of the way the best"—(কিঞ্চিৎ থামিয়া) পুনর্ব্বার—"Out of the way the best"। তাঁহার ঐ বাক্যে উৎসাহের সহিত প্রেমচাঁদের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম্ এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রে প্রথম স্থান, আনুষঙ্গিক সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার লাভ করি।

"পদার্থ বিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া পর বৎসর প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলাম (১৮৮৮) পরীক্ষকগণের এই রূপ মন্তব্য—"The candidate who took up Physics and Chemistry is perhaps the best student that has as yet taken up these subjects at this examination." অর্থাৎ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল ছাত্র ফিজিক্স এবং কেমিষ্ট্রী লইয়াছেন, এই ছাত্রই তাহাদের মধ্যে বোধ হয় সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ।

"পরে দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের লেবোরেটারিতে বিনা বেতনে বিজ্ঞানচর্চ্চা করিতে পেডলার সাহেবের অনুমতি লইয়াছিলাম। ১৮৯০ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষক নিযুক্ত হই। চারি বৎসর পরে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষক হই। আর পাঁচ বৎসর পর হইতে এন্ট্রান্সে অন্যতম হেড একজামিনার বা প্রথম পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসিতেছি।

"১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে বিজ্ঞান শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া থাকি। বর্ত্তমান বর্ষে কৃষ্ণকমল বাবুর পদ ত্যাগের পর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করিয়াছি।

"কলেজ হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে প্রধানতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করিয়া থাকি। "সাধনা" পত্রিকা বাহির হইলে মাসিক পত্রিকায় বাঙ্গলা প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি। ১৩০৩ সালে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া "প্রকৃতি" প্রকাশ করিয়াছি।

"১৩১০ সালে দার্শনিক প্রবন্ধগুলি সংগ্রহ করিয়া "জিজ্ঞাসা" প্রকাশ করিয়াছি। সামাজিক প্রবন্ধগুলি এখনও পুস্তকাকারে বাহির হয় নাই।

"১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের স্থাপন অবধি উহার সহিত সম্পৃক্ত আছি। ১৩০৫ হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত পরিষৎ পত্রিকা পরিচালনা করিয়াছি।"

অতঃপর রামেন্দ্রবাবু বিনয়নম্র ভাবে লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালা সাহিত্যের ও তদ্দ্বারা স্বজাতির যথাসাধ্য সেবা করিয়া জীবন শেষ করি, এই প্রার্থনা।" জগদম্বা তাঁহার এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন

কঠোর বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক বিষয় সমূহ ইনি অতি সরল ভাষায়,—অতি বিশদ ভাবে বুঝাইতে পারেন। এ শক্তি ইঁহার অসাধারণ।

নবীনচন্দ্র সেন।



বংশ।—যে দুই বৈদ্য বংশ চট্টগ্রামের হিন্দু সমাজের উপর এতকাল আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন তাহারই অন্যতরের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা "রাঢ়ভঙ্গের" সময় ষোড়শ শতাব্দিতে ত্রিবেণীর সন্নিকটস্থ কোনও স্থান হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করেন,—শ্রীযুক্ত রায় চট্টগ্রামের রাজস্ব ভার এবং তাঁহার ভ্রাতা শ্যাম রায় সৈন্য ভার প্রাপ্ত হন। ঢাকার নবাব এখানে শিবিরে অবস্থানকালে শ্যাম রায়ের ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য এক রাত্রিতে একটী দীর্ঘিকা খনন করিয়া, তাহাতে পদ্মফুল দেখাইতে আদেশ করেন। সে রাত্রিতেই শ্যাম রায় তাঁহার শিবির সমক্ষে এক বিস্তৃত দীর্ঘিকা খনন করিয়া এবং নিকটস্থ কর্ণফুলী নদী হইতে তাহা জল পূর্ণ করিয়া তাহাতে পদ্মফুল ভাসাইয়া দেন। নবাব প্রভাতে নিদ্রোত্থিত হইয়া, সপদ্ম সরোবর সন্দর্শন করেন। এই সরোবর এখনও চট্টগ্রাম সহরের উত্তর অংশে "কমলদহ" বলিয়া পরিচিত। নবাব ইহাতে ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। একদিন "রোজার" সময় নবাব পুষ্পঘ্রাণ পাইতেছেন দেখিয়া, শুদ্ধাচারী হিন্দু শ্যাম রায় বলেন যে, তাঁহার "রোজা" ভঙ্গ হইয়াছে, কারণ হিন্দু শাস্ত্র-মতে ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন। নবাব "রমজানের" দিন সপলাণ্ডু গোমাংস রন্ধন আরম্ভ করাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া পাঠান। তিনি নাসিকা বস্ত্রাবৃত করিয়া আসিতেছেন দেখিয়া, নবাব কারণজিজ্ঞাসু হইলেন। শ্যামরায় বলিলেন, কি এক দুর্গন্ধ অনুভব করিতেছেন। নবাব হাসিয়া বলিলেন, উহা গোমাংসের গন্ধ,—ঘ্রাণ অর্দ্ধেক ভোজন, অতএব তাঁহার জাতি গিয়াছে। শ্যাম রায় এরূপে আপনার অস্ত্রে আপনি নিহত হইয়া মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার সন্তানগণ এখানকার মুসল-মানদের অগ্রণী।

তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রায় চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তিনিও বিশুদ্ধাচারী হিন্দু

এবং সিদ্ধ ভক্ত ছিলেন। এক এক সময় তাঁহার স্থাপিত দশভূজার সমক্ষে—ইনি এখনও নবীন বাবুদের কুলমাতা—অহর্নিশি প্রণত থাকিতেন, এবং এরূপ প্রবাদ, মাতা স্বয়ং দর্শন না দিলে তিনি উঠিতেন না। তাঁহার প্রভুত্বে ঈর্ষা-পরায়ণ তাঁহার অন্য এক ভ্রাতা তাঁহাকে এই প্রণত অবস্থায় খড়্গাঘাতে নিহত করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যা কনক-মঞ্জুরী প্রতিজ্ঞা করেন, তাঁহার পিতৃব্যের মুণ্ড যদি দর্শন করিতে পারেন, তবে তিনি "বাপ খুড়া" বলিয়া ক্রন্দন করিবেন, অন্যথা কাঁদিবেন না। তাঁহার অনুচরবর্গ পলাতক খুল্লতাতকে হত্যা করিয়া, তাঁহার মুণ্ড আনিয়া, তাঁহাকে দেখাইয়া, তাঁহার এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। শ্রীযুক্ত রায়ের দুই পত্নীর দুই অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ছিলেন। রাজ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হইলে, তাঁহাদের প্রতিপালনের জন্য একটী বৃহৎ জমিদারী রাখিয়া, নবাব সমস্ত সম্পত্তি "বাজেয়াপ্ত" করেন। এই জমিদারী এখনও অংশক্রমে নবীন বাবু ও তাঁহার বংশীয়দের অধিকারে আছে। তাঁহারা ৯ পুরুষ নয়াপাড়া গ্রামে বাস করিতেছেন এবং শ্রীযুক্ত রায়ের বংশ বলিয়া এ অঞ্চলে পরিচিত। এ বংশের প্রায় প্রত্যেক পতিপত্নীর নামে নয়াপাড়া গ্রামে এক একটী দীঘী কি সরোবর আছে

জন্ম।—১৭৬৮ শকাব্দা ২৯শে মাঘ বুধবার। শ্রীযুক্ত রায় ত্রিবেণী হইতে যে দ্বিতীয় পত্নী বিবাহ করিয়া আনেন, নবীন বাবু তাঁহারই সন্তান। চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সর্ব্বজন পরিচিত নয়াপাড়া তাঁহার জন্মস্থান। এই বিপুল গ্রামখানির চারিদিক হীরক হারের ন্যায় নদীর দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব্বদিকে নদীর অপর পারে তরুলতা শোভিত শ্যাম-পর্ব্বত মালা। নবীন বাবুর জনক ৺ গোপীমোহন রায়, জননী ৺ রাজ-রাজেশ্বরী। পিতা—

"সমাজের শিরোমণি, সদ্‌গুণ ভাণ্ডার। বিবাদে প্রসন্ন মুখ, মোহন আকার।
সরল হৃদয়, পর দুঃখে ম্রিয়মাণ। প্রীতি-রসে নেত্রদ্বয় সদা ভাসমান॥
চতুর, মধুর ভাষী, সাহসে অতুল। এ দেশে দুজন নাহি তাঁর সমতুল॥"

শশাঙ্ক দূত। অবকাশ রঞ্জিনী।

নবীন বাবুর মাতা স্নেহময়ী এবং বিশ্বাসাতীত সরলা। তিনি দশের বেশী গণিতে জানিতেন না। পিতা চট্টগ্রামের জজ আদালতের সেরেস্তাদার—অন্যথা তদস্তি জজ—তারপর মুনসেফ, তাহাতেও ব্যয় সঙ্কুলন হয় না বলিয়া উকিল হইয়াছিলেন। তাঁহার পরোপকারিতা ও দানশীলতা এ অঞ্চলে প্রবাদের মত প্রচলিত।

শিক্ষা।—শিক্ষা,—চট্টগ্রামের গুরুমহাশয়ের পাঠশালা হইতে আরম্ভ কলিকাতায় শেষ হয়। ইনি স্কুলে থাকিতেই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, Wicked the great (দুষ্টের শিরোমণি) এবং বাল্য লীলাটি কতক লর্ড ক্লাইবের মত। এমন খেলা নাই—খেলিতেন না, এমন অস্ত্র নাই—চালাইতেন না, এমন লোক নাই—ক্ষেপাইতেন না। শেষে বিদ্যার পরিচয় পুরাতন সাহিত্য পরিষদে সম্যকরূপ দিয়া আসিয়াছেন। ইনি চট্টগ্রাম স্কুল হইতে ১৮৬৩ ইংরাজিতে এন্‌ট্রান্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৫ সনে এফ এ এবং জেনেরল এসেম্বিলি কলেজ হইতে ১৮৬৮ ইংরাজিতে বি এ পাশ করেন। এক একটী পরীক্ষা পাশ করিলে দেশের লোক স্তম্ভিত হইত যে, এমন দুষ্ট ছেলে কেমন করিয়া পাশ হইল? স্কুলের পণ্ডিত মহাশয় নবীন বাবুর দুষ্টামিতে উৎপীড়িত হইয়া বলিতেন—"গোপী বাবু মাঘ মাসের শীতে এক গলা জলে তপস্যা করিয়া, এমন পুত্র পাইয়া ছিলেন।"

দীক্ষা।—ভারতবিখ্যাত সন্ন্যাসি-শ্রেষ্ঠ ৺ শঙ্কর পুরির কাঁছে তিনি ১২ বৎসর বয়সে দীক্ষিত হন। তাঁহার চক্ষু না ফুটিতে গুরুদেব জলন্ধরে সমাধি প্রাপ্ত হন। ইহা তাঁহার জীবনে বড় দুর্ভাগ্য। নবীন বাবুর উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার কাছে অভিযোগ উপস্থিত হইলেও গুরুদেব তাহা ডিসমিস করিয়া, নবীন বাবুকে আদেশ করেন—"তোমরা ক্রিয়া করম কুচ নেহি হ্যায়। ই'য়ে লোক জানতা নেহি তোমকু হাম্ উদাস মন্তর দিয়া।"

নাম।—কুলানুসারে জন্ম-পত্রিকা-লেখক লিখিয়াছেন, শ্রীনবীনচন্দ্র সেন দাস। নবাবদত্ত পৈত্রিক উপাধিক্রমে শৈশবে ছিলেন শ্রীনবীন-চন্দ্র রায়। কেহ কেহ বহু যত্নে বহু ক্লেশে যে "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করে, নবীন বাবু তাঁহার একজন খুড়তুত ভ্রাতার ভ্রান্তিতে

তাহা হারাইয়াছেন। তাঁহার খুড়তত ভাই বলিলেন, "রায়" Honorary distinction, নামের সঙ্গে আপনি লিখিতে নাই।" নবীন বাবু স্কুলে "রায়" কাটাইয়া "সেন" করিলেন।

বিবাহ।—সে এক বৃহৎ ব্যাপার। তাহাতে দুটি ফৌজদারি মকদ্দমা হয়। প্রথম দর্শনে প্রেম হয়, ইহা অনেকেই শুনিয়াছেন। বিনা দর্শনে প্রেম, বোধ হয় কেহ কখনও শুনেন নাই। অথচ ইহারই ফলে নবীন বাবুর চট্টগ্রামে বিখ্যাত বিবাহ। এফ-এ পরীক্ষার এক মাস পূর্ব্বে এই বিবাহ সম্পাদন করিতে আসিয়া স্কলারশিপ হারাইয়া, জেনেরল এসেম্বিলিজ ইনিষ্টিটিশন কলেজ হইতে তিনি বি এ পাশ করেন।

কর্ম্ম।—পিতা অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করিয়াও ১৮৬৭ ইংরাজিতে বি, এ পরীক্ষার ৩ মাস পূর্ব্বে তাঁহার দানশীলতার গুণে নবীন বাবুকে কলিকাতার পথের কাঙ্গাল করিয়া এবং শাখা প্রশাখায় একটি বিপুল পরিবারের ভার তাঁহার ক্ষুদ্র স্কন্ধে অর্পিত করিয়া, স্বর্গারোহণ করেন। রাজপুত্র পথের কাঙ্গাল হইলেন। প্রথম ভাগ অবকাশরঞ্জিনীর পিতৃহীন যুবক ও শশাঙ্কদূত কবিতায় তাঁহার জীবনের এ অঙ্ক প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু পিতার অক্ষয় পুণ্য বলে কয়েক মাসের মধ্যেই ১৮৬৮ ইংরাজিতে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নবীন বাবু ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট হন। ইনি বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যায় দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছেন। সকলেই, জানেন তাঁহার তেজস্বী চরিত্রের নিবন্ধন এ ডেপুটি জীবন তাঁহার পক্ষে পুষ্পশয্যা হয় নাই। তিনি বিবেক শক্তির প্রতিকূলে কার্য্য করিতে অসম্মত হইয়া, পরোপকার করিতে গিয়া, সর্ব্বশেষ স্বদেশ প্রেমের জন্য উপর্য্যুপরি বিপদস্থ হন। তিনি অনুমান ২০ বৎসর ক্রমাগত সব ডিভিসন শাশনে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি যখন যাহার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই সব-ডিভিসন বিরলবিবাদ ও-শান্তিপূর্ণ হইয়াছে; তথায় তিনি লোক হিতকর কার্য্যে তাঁহার কৃতিত্বের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। ৩ জন কমিশনার তাঁহাকে Extension দিতে—আরও কিছু কাল কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতে—চাহিয়াছিলেন। তিনি তাহাতে সম্মত নাই। এক্ষণে তিনি অবসর-বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত কাব্যাবলি তাঁহার রচিত ;—

(১) অবকাশরঞ্জিনী ১ম ভাগ। (২) অবকাশরঞ্জিনী ২য় ভাগ। (৩) পলাশির যুদ্ধ। (৪) রঙ্গমতী। (৫) রৈবতক। (৬) কুরুক্ষেত্র। (৭) প্রভাস। (৮) অমিতাভ। (৯) ভানুমতী। (১০) গীতা। (১১) চণ্ডী। (১২) খৃষ্ট। (১৩) প্রবাসের পত্র।

সতীশচন্দ্র আচার্য্য বিদ্যাভূষণ

ইহাঁর নিবাস নবদ্বীপ। পিতার নাম ৺ পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। ইনি সরযূপারী গ্রহবিপ্র সম্ভূত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে ইহার জন্ম হয়। ইনি চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও ৫৲টাকা করিয়া বৃত্তি পান তাহার তিন বৎসর পরে নবদ্বীপ হিন্দু স্কুল হইতে ইনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া, দুই বৎসরের জন্য মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন; তাহার পর যথাসময়ে এফ-এ, বি, এ, ও এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; বি, এ পরীক্ষায় সংস্কৃত অনারে কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় ও বঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটী সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন; কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই নবদ্বীপ বিদগ্ধ জননী সভা হইতে সংস্কৃত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া "বিদ্যাভূষণ"—উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ইনি কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া, তথায় ৪ বৎসর কার্য্য করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে সহকারী তিব্বতীয় অনুবাদকের পদে নিযুক্ত করিয়া, শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয়ের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন কার্য্যের ভার অর্পণ করেন।

এই প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে দার্জ্জিলিঙ্গে প্রেরণ করিয়া সেক্রেটারিয়েট প্রেসের অংশবিশেষের অধ্যক্ষতা-কার্য্যে নিযুক্ত করেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তথা হইতে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য্যে বদলি হইয়া, বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য করিতেছেন।

সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় মধুসূদন স্মৃতিরত্ন ও মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণের নিকট ইনি যথাক্রমে দর্শন, স্মৃতি, কাব্য বেদ ইত্যাদি শিক্ষা করেন।

নবদ্বীপে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট ইনি কাব্যশাস্ত্র ও পণ্ডিত যদুনাথ সার্ব্বভৌমের নিকট ইনি ন্যায়শাস্ত্র বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করেন।

দার্জ্জিলিঙ্গে অবস্থান কালে ইনি তিব্বতীয় ভাষা বিশেষরূপ অনুশীলন করেন। তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরীর সুবিখ্যাত ও সুশিক্ষিত লামা কুনছোগওয়ংডান তখন দার্জ্জিলিঙ্গে বাস করিতেন। সতীশ বাবু এই লামাকে ১৫৲টাকা মাসিক বেতন দিয়া ক্রমান্বয়ে দেড় বৎসর ইহাঁর নিকট তিব্বতীয় ভাষায় নীতি ও তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি যে সকল তিব্বতীয় গ্রন্থ ইহাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন, তাহার মধ্যে "কাবাবদুন্‌দেন" এবং "সেরাব ডঙ্গু" সমধিক উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা অবস্থান কালে সিংহল ও ব্রহ্মদেশীয় শ্রমণগণের নিকট ইনি পালিভাষা অধ্যয়ন করেন। সিংহলের সুবিখ্যাত সুমঙ্গল সদাথেরো ও শীলস্কন্ধ স্থবিরের সহ ইহাঁর অনেক লেখালেখি হয়। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইনি পালি ভাষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ইহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ কিম্বা সিংহল ও ব্রহ্মদেশ হইতে কেহ এই পরীক্ষা দেন নাই। ভারতবর্ষে পরীক্ষক না পাওয়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইংলণ্ডের ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীয়ান টনি সাহেব ও ক্যাম্ব্রিজের অধ্যাপক কাউয়েল সাহেবকে

অনুরোধ করেন যে, তাঁহারা যেন ইউরোপ হইতে দুইজন পালি পরীক্ষক নির্ব্বাচিত করিয়া দেন। তাঁহারা লণ্ডন ইউনিভার্সিটির পালি ও বৌদ্ধ-শাস্ত্রের অধ্যাপক সুবিখ্যাত ডাক্তার রীজডেভিডস্‌কে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পালি ভাষার এম, এ, পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। ডাক্তার রীজডেভিডস্ সতীশ বাবুর প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করিয়া সবিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং ইহাঁকে ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া পাঠান। এবারেও ইনি একটী সুবর্ণ পদক ও একশত টাকার পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে বহু অমূল্য গ্রন্থ জার্ম্মান ভাষায় বিদ্যমান আছে, ইহা দেখিয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাস হইতে ইনি জার্ম্মান ভাষার সবিশেষ অনুশীলন করিতেছেন। ইম্পীরিয়েল লাইব্রেরীয়ান ম্যাক্‌ফারলেন সাহেব ইহাঁকে সমুৎসাহিত করিয়া এই ভাষার শিক্ষায় প্রবৃত্ত করেন।

ইনি কলিকাতা বুদ্ধিষ্ট টেক্‌স্‌ট সোসাইটীর সহযোগী সম্পাদক ও মহাবোধি সোসাইটীর কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সভ্য। এই দুই সভার পত্রিকায় ইহাঁর অনেক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় অতি পবিত্রচরিত্র। ইহাঁর মুক্তহস্ততা ও পরোপকারচিকীর্ষা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয়। ইহাঁর বেতন ও অন্যান্য বিষয়ে যাহা কিছু আয় হয়, সমুদয়ই সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। ইনি নিয়মিতরূপে ৭।৮টী ছেলের পড়ার ব্যয় প্রদান করেন এবং যে কেহ বিপদে পড়িয়া শরণাপন্ন হয়,—তাহাকেই যথাশক্তি দান করেন।

ইনি লণ্ডন রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী ও বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়া, গত কতিপয় বৎসর হইতে অনেক উপাদেয় প্রবন্ধ এই দুই সোসাইটীর জর্ণালে প্রকাশ করিতেছেন। অধ্যাপক মোক্ষমূলর তৎকৃত ষড়দর্শন Six Systems of Indian philosophy. নামক গ্রন্থে সতীশ বাবুর প্রবন্ধের অনেক মত উদ্ধৃত করিয়া, সতীশ বাবুকে সবিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনের মত বিশদ ভাবে সতীশ বাবুই সর্ব্ব প্রথমে ইউরোপে প্রচারিত করেন। মনিয়র উইলিয়ম, মোক্ষমূলর,—পারিসের সুবিখ্যাত অধ্যাপক অগস্ত বার্থ,

হলাণ্ডের ডাক্তার ত্রুট, বেলজিয়মের অধ্যাপক পুঁষো, আমেরিকার ডাক্তার পল ক্যারস্, জাপানের ডাক্তার সুজুকী, ওটাকাকুসু, বৃটিস মিউজিয়মের র‍্যাপসন প্রভৃতি সুধীগণ ইউরোপীয় মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা সমূহে সতীশ বাবুর প্রবন্ধের বহু সমালোচনা করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সাহিত্য সভা, সাহিত্য সম্মিলন, স্বধর্ম্ম সাধন সমিতি, গীতা সভা, সুহৃদ সভা, ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট, ফিনিক্স ইউনিয়ন প্রভৃতি বহু সভার ইনি সভ্য। ইহাঁর প্রণীত আত্মতত্ত্ব প্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

নগেন্দ্রনাথ বসু।

"আমি মাহিনগর সমাজের মুখ্য কুলীন। পর্য্যায় ২৮। পিতার নাম নীলরতন বসু। আমার প্রপিতামহ মাহেশে বাস করিতেন। কিন্তু আমার পিতামহ প্রায়ই মেদিনীপুরের অন্তর্গত জকপুরে তাঁহার মাতামহ শ্যামাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের ভবনে বাস করিতেন। তাঁহার এক ভাগিনীর সহিত রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা গৌরবল্লভ রায়ের বিবাহ হয়। সেই সূত্রে তিনি কলিকাতায় আসিলেন। শোভাবাজারের সুবিখ্যাত মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র কালীকৃষ্ণ ঘোষের সহিত ছাতু বাবুর (৺ আশুতোষ দেবের) তৃতীয়া সহোদরা তারিণীদাসীর বিবাহ হয়। তারিণীদাসীর একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণিকে বিবাহ করিয়া পিতামহ ৺ তারিণীচরণ বসু কলিকাতাবাসী হইলেন। সেই অবধি আমরা কলিকাতা বাসী হইয়াছি।

"আমার কোষ্ঠিতে আমার জন্ম তারিখ এইরূপ লিখিত আছে; শকাব্দা ১৭৮৮। সৌরাষাঢ়স্য ত্রয়োবিংশ দিবসে ভৃগুবাসরে অসিত পক্ষীয় নবম্যাং তিথৌ তুলালগ্নে ভার্গবস্য ক্ষেত্রে অশ্বিনী নক্ষত্রে মেষ রাশৌ" ইত্যাদি। সুতরাং এখন আমার বয়স আটত্রিশ বৎসর। ইহার

মধ্যে পঞ্চদশ বর্ষ হইতে আমি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমার সাহিত্য জীবনের ত্রয়োবিংশ বর্ষ আবার কাব্য জীবন, নাট্য জীবন ও ঐতিহাসিক জীবন এই তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমে কবিতা ভাল বাসিতাম, কবিতা লিখিতাম, মাসিক পত্রাদিতে বেনামে ছাপাইতাম। এই সময় কর্ণসিংহ নামে একখানি নায়িকাময় নাটক লিখি। তাহার অল্পকাল পরেই আমরা কয়েকজন বন্ধু বান্ধবে মিলিয়া 'তপস্বিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করি। 'তপস্বিনী" পত্রিকায় আমি অক্ষিচাঁদ নামে একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করি। তাহাতেই নাটকীয় জীবনের সূত্রপাত আরম্ভ হয়। সেই তপস্বিনী পত্রিকায় সেক্‌সপীয়রের বিখ্যাত নাটক ম্যাক্‌বেথের কিয়দংশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১২৯০ সালে এই অনুবাদ সম্পূর্ণ হয়. কিন্তু ছাপা হইয়া বাহির হইতে আরও একবর্ষ সময় লাগে। ম্যাক্‌বেথের এই অনুবাদ কর্ণবীর নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তপস্বিনী অল্পদিন পরেই বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯১ সালে আমরা "ভারত" নামে আর একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করি। তাহাতে সেক্ষপীয়রের হাম্‌লেট নাটকের অনুবাদ খানিকটা করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয়, নানা গোলযোগে অল্প দিনের মধ্যেই "ভারত" অন্তর্হিত হইল। হামলেটের সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করিবার আর অবসর হইল না। এই সময় শ্রীযুক্ত বাবু বিহারিলাল সরকারের আগ্রহে দর্জ্জিপাড়া থিয়েট্রিকাল ক্লবের অভিনয়ার্থ শঙ্করাচার্য্য নামে একখানি ধর্ম্মমূলক নাটক রচনা করি। শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয় হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তৎপরে বন্ধুবর বিহারিলালের উৎসাহে 'পার্শ্বনাথ' 'হরিরাজ' 'লাউসেন' এই কয়খানি পদ্য গদ্যময় নাটক রচনা করি এই কয়খানির মধ্যে উক্ত থিয়েট্রিকেল ক্লবে কেবল পার্শ্বনাথের অভিনয় হইয়াছিল। অপর দুইখানির আয়োজন হইয়াছিল মাত্র। শঙ্করাচার্য্য ও পার্শ্বনাথ রচনায় বহুপূর্ব্ব হইতে আমার ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। লাউসেন রচনার পর কাব্য, নাটক প্রণয়নের ইচ্ছা এককালে তিরোহিত হইল। ইতিহাস

ও ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য পাঠে বলবতী ইচ্ছা হয়। একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া পাণিনি অভ্যাস করিতে থাকি।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে গ্রেটইর্ডেন প্রেস হইতে "শব্দেন্দু মহাকোষ" নামক ইংরাজী ও বাঙ্গালাভাষায় একখানি বৃহদভিধান (Encyclopædia) প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, আমি সর্ব্বপ্রথম তাহার সঙ্কলনভার গ্রহণ করি। এই সঙ্কলন কার্য্যকালে স্যর রাজা রাধাকান্তদেবের সুযোগ্য দৌহিত্র নানা ভাষাবিদ্ মহাত্মা আনন্দকৃষ্ণ বসু ও শ্রীযুক্ত (তৎপরে মহামহোপাধ্যায়) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। আনন্দ বাবুর যত্নে জর্ম্মণ, ফরাসী ও পারসী ভাষা শিক্ষায় অগ্রসর হই। পুরাতত্ত্ব আলোচনায় আমার বরাবরই ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে আমার সেই অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহারই প্রস্তাবে আমি এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যপদ লাভ করি।

শব্দেন্দু মহাকোষ রচনাকালে অত্যধিক পরিশ্রমে কঠিন মস্তিষ্কপীড়ায় আক্রান্ত হই। তজ্জন্য অপর দুই ব্যক্তিকে আমার সহকারী লইতে বাধ্য ছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি অকালে কালকবলে পতিত হওয়ায় "শব্দেন্দু মহাকোষ" "অ" বর্গের এক চতুর্থাংশ (প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা) পর্য্যন্ত মুদ্রণের পর বন্ধ হইয়া যায়। তৎপরে আনন্দকৃষ্ণ বাবুর পরামর্শে নাগরাক্ষরে প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট সঙ্কলন কার্য্যে ব্রতী হই। তৎকালে শব্দকল্পদ্রুম প্রকাশক বসু মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ পুরাণাদি নানা সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিবার অবসর পাইয়াছিলাম। এই সময় মেটকাফ হল ও এসিয়াটিক সোসাইটী পুস্তকাগারে অনেক সময় অতিবাহিত হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বিশ্বকোষের প্রকাশ ভার বহন করিতে সাহসী হইয়াছি।

শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্টাংশের ভার যখন আমার উপর, সেই সময় পুথি সংগ্রহাদির নিমিত্ত আমি মুর্শিদাবাদ জেলায় গমন করি। প্রায় ১৮৮৭ সালের কথা হইবে। বহরমপুরে ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ে উপস্থিত হই। বিশ্বকোষ দুই বর্ষ মাত্র প্রকাশের পর বন্ধ হয়। রামদাস বাবুর পুস্তকালয়ে অনেকেই তজ্জন্য আক্ষেপ প্রকাশ

করেন এবং বিশ্বকোষ প্রকাশের আবশ্যকতা অনেকেরই মুখে শুনিতে পাই। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত ভূত-পূর্ব্ব বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এক পত্র লিখি। তিনি আমার পত্র পাইবামাত্র বিশ্বকোষের সত্ত্ব ও প্রকাশ ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে বিশ্বকোষের অন্যতম সম্পাদক উদার-হৃদয় সাহিত্যবীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও আমাকে যথেষ্ট উৎসাহদান ও বিশ্বকোষ প্রকাশ কল্পে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করেন। বাস্তবিক যখনই তাঁহার নিকট গিয়াছি, তাঁহার সৎপরামর্শ লাভে কখনও বঞ্চিত হই নাই। রঙ্গলাল বাবু ও ত্রৈলোক্য বাবুর যত্নে বিশ্বকোষের প্রথম ভাগ "অ" বর্গ মাত্র সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়, "আ" হইতে আমার উপর ভার পড়িল। সেই সঙ্গে শব্দকল্পদ্রুমের সংস্রবত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

বড়ই আশায় উৎসাহিত হইয়া বিশ্বকোষের সঙ্কলন-ভার গ্রহণ করি। কিন্তু যে দেশে সাহিত্য সেবীর অন্ন নাই, যে দেশের মহাকবি দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রাণত্যাগ করেন, সে দেশে আর আমার আশা কতদূর সফলা হইবে? বলিতে কি,—বিশ্বকোষভার গ্রহণ করিয়া আমি অল্পদিন মধ্যেই নানারূপে বিপদ্‌গ্রস্ত, এমন কি সর্ব্বস্বান্ত হইবার আশঙ্কায় কাতর হইয়াছিলাম। কিন্তু আমি একমাত্র ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল বিপদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। অনেক সময় তাঁহাকে জানাইয়াছি, ভগবন্! হৃদয়ে বল দিন, আমি যেন নিরুৎসাহ না হই, আপনার করুণায় আমি যেন ভিক্ষা করিয়াও বিশ্বকোষ সমাধা করিতে পারি, জীবনের এই একমাত্র ব্রত যেন উদ্‌যাপিত হয়! বলিতে কি, আমার প্রার্থনা বৃথা হয় নাই, কয়েক বর্ষ জীবন সংগ্রামের পর ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। যে বিশ্বকোষের রক্ষার জন্য আমি কতই আশঙ্কা করিয়াছি, ভগবান্ সেই বিশ্বকোষের দ্বারাই কেবল আমাকে নহে, আমার আত্মীয় স্বজন অনেককেই প্রতিপালন করিতেছেন। ঈশ্বরেচ্ছায় এক্ষণে (১৩১০ সালে) বিশ্বকোষের "ম" বর্ণ পর্য্যন্ত ১৫ ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। বিশ্বকোষের ভার গ্রহণের

অল্পকাল পরেই, বিশ্বকোষে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন মানচিত্র প্রকাশিত হয়। তজ্জন্ত আমাকে সমস্ত বৈদিক ও পৌরাণিক ভূগোল আলোচনা করিতে হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্ত প্রকাশিত হইলে এসিয়াটীক সোসাইটীর অধিবেশনে মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ইহা প্রদর্শন করেন, তাহাতে সোসাইটীর সভাপতি প্রভৃতি উপস্থিত সকলেই আমাকে ধন্তবাদ করেন। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া পৌরাণিক ভূভাগ প্রকাশের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। সেই সময় ভূগোল মূলক ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আমার নেত্রে পতিত হয় এবং ঐ গ্রন্থের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ আলোচনা কালে জানিতে পারিলাম যে, সোসাইটি হইতে যে বায়ুপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার শেষাংশ গয়ামাহাত্ম্য ভিন্ন আর সমস্তই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অংশ ও সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের লক্ষণাক্রান্ত, এবং সে কথা অবিলম্বে সোসাটীর কর্ত্তৃপক্ষকে জানান আবশ্যক মনে করিয়া, নানা প্রমাণ প্রয়োগ সম্বলিত এক বিস্তৃত প্রতিবাদ এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাই, সেই সময়েই সোসাইটীর সহিত আমার প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। সাধারণকে বুঝাইবার জন্ত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মূলানুবাদ সহ প্রকাশ করিবার ভার আমার কনিষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করি। তাহার যত্নে ঐ গ্রন্থের পূর্ব্বভাগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তাহার অকাল মৃত্যুতে শেষাংশ প্রকাশ বন্ধ রহিয়াছে।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত আমার প্রথম সাহিত্য সংস্রব ঘটে। ঐ বর্ষে উক্ত সভায় আমি "Susunia Rock-Inscriptions of Chandra-Varnan" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠ করি। প্রায় আঠার শত বর্ষ পূর্ব্বে একজন ক্ষত্রিয় বীর বঙ্গদেশে আসিয়া বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে বৈষ্ণব চক্র প্রতিষ্ঠিত করেন, উক্ত শিলা লিপিতে তাহাই বিঘোষিত। এসিয়াটিক সোসাইটির কার্য্যবিবরণীতে উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তদবধি এসিয়াটিক সোসাইটির সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইতে থাকে। তৎপরবর্ষে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভার পত্রিকায় "Copper-plate Inscription of Visvarupa Sena" ও Chronology of the Sena kings of Bengal" প্রবন্ধ

প্রকাশিত হয়। মহামতি গ্রীয়ার্শন সাহেব তখন উক্ত পত্রিকার সম্পাদক। তিনি উক্ত প্রবন্ধদ্বয় পাঠ কালে মুক্তকণ্ঠে সভা সম্বন্ধে প্রকাশ করিয়াছিলেন, বঙ্গের সেনরাজগণ সম্বন্ধে এতদিন যে গোলযোগ চলিতেছিল, আলোচ্য প্রবন্ধ সেই ঐতিহাসিক অন্ধকার ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রবন্ধে পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণের মত সম্পূর্ণ খণ্ডিত ও গৌড়াধিপ বিজয় সেন, তৎপুত্র বল্লাল সেন, তৎপুত্র লক্ষ্মণ সেন, তৎপুত্র বিশ্বরূপ সেন, প্রভৃতি অধস্তন সেন রাজগণের যথাযথ পরিচয় ও রাজ্যকাল নির্ণীত হইয়াছে। আমার নিতান্ত সৌভাগ্য যে, বোম্বাইয়ের সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর, * অধ্যাপক কিলহোর্ণ * ও ম্যাবেল ডাফ * প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ আমার মতের সমর্থন করিয়াছেন এবং বর্ত্তমান প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাস সমূহে সকলেই ঐ মত গ্রহণ করিতেছেন।

উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের অল্প দিন পরেই এসিয়াটিক সোসাইটির কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে তথাকার Philological Commiteeর (শব্দবিজ্ঞান সমিতির) সভ্য পদ প্রদান করেন। এখনও পর্য্যন্ত ঐ পদে নিযুক্ত আছে।

ঐ বর্ষে শিলালিপি ও পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য আমি উড়িষ্যায় যাত্রা করি। উড়িষ্যার নানা তীর্থ ও বহু ব্রাহ্মণ-শাসন দর্শন করিয়া, নানাস্থান হইতে নানা সময়ের বহুতর শিলালিপি, তাম্রশাসন ও প্রাচীন হস্তলিখিত তালপাতার পুঁথি সংগ্রহ করি। স্বাধীন অনুসন্ধান ফলে বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী উড়িষ্যার ঐতিহাসিকগণ যে সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই ভ্রমাত্মক। উড়িষ্যার প্রকৃত ইতিহাস এখনও কেহ প্রকাশ করেন নাই। উড়িষ্যার সকল প্রাচীন স্থান পরিভ্রমণ ও শিলালিপি সংগ্রহ ভিন্ন উৎকলের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের আর উপায় নাই। আমার সংগৃহীত তাম্রশাসন ও শিলালিপি সাহায্যে

* Dr. Bhandarkar's Report on the Search of Sanskrit, (published 1897) p. LXXXVI-LXXXVIII.

* Dr. Kilhorn's Incription of Northern India, p. 88.

* M. Duff's Indian Chronology, p. 303.

এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় কয়েকটী প্রবন্ধ লিখিয়াছি,—সেই সকল পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উৎকলের ইতিহাস সম্বন্ধে পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বহুলাংশ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

১৮৯৪ খৃঃ অব্দে বারাণসীর সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ হল সাহেব (Fitz Edward Hall) বিলাত হইতে ভারতীয় সকল সাহিত্য সভায় ও বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহে "নাগরাক্ষরের উৎপত্তি" জানিবার জন্য কয়েকটী প্রশ্ন করিয়া পাঠান। দুঃখের বিষয়, তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য কেহই অগ্রসর হইলেন না। তৎপরে এসিয়াটিক সোসাইটীর পণ্ডিত ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কনিষ্ঠ সোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের পরামর্শে এ অ।মি প্রশ্নোত্তর দিবার জন্য অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইল। এসিয়াটিক সোসাইটীর স্থাপনাবধি ঐ সময় পর্য্যন্ত যত শিলালিপি ও তাম্রশাসনের ফটোগ্রাফ বা চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিতে আরম্ভ করি। কঠোর পরিশ্রমের পর হিন্দু জৈন ও বৌদ্ধ নানাগ্রন্থ সাহায্যে "নাগরাক্ষরের উৎপত্তি" নামে এক বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখি। তাহা প্রথমে (১৩০২ সালের মাঘ মাসে) সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায়, পরে ঐ বর্ষের এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমার সৌভাগ্যক্রমে ঐ প্রবন্ধটী দুই বর্ষ মধ্যে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক কাশীস্থ নাগরী প্রচারিণী সভার হিন্দু পত্রিকায়, পরে গুজরাটী ও তৈলঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩০৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আমাকে পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। ১৩০৩ হইতে ১৩০৫ সাল পর্য্যন্ত তিন বর্ষকাল আমি উক্ত সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলাম। ঐ সময়ে পরিষদ পত্রিকার সম্মান রক্ষায় বাধ্য হইয়া অধিকাংশ প্রবন্ধই আমায় লিখিতে হইয়াছে। ১৩০৫ সালে ছোটলাট বাহাদুর আমায় Central Text Book Committeeর সদস্য পদ প্রদান করেন। তৎকালে মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Text Book Committeeর সভাপতি ছিলেন। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট নূতন

প্রণালীতে পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা করিলে ও গবর্ণমেণ্টের নূতন নিয়মানুসারে সমিতি গঠিত হইলে সাবেক Text Book Committee উঠিয়া যায়। আমরাও সেই সঙ্গে অবসর গ্রহণ করি। যাহা হউক, গত ১৩০১ সালে ডিরেক্টার সাহেবের প্রস্তাবে আবার Central Tex Book Committee র সদস্য পদ-লাভ করিয়াছি।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় আমার নিকট মদন পালের এক বৃহৎ তাম্রশাসন প্রেরণ করেন। তৎপূর্ব্বে পালরাজগণের পর্য্যায় সম্বন্ধে বড়ই গোল ছিল; শিলালিপিতে বা তাম্রশাসনে পর্য্যায়ক্রমে ১১ জন মাত্র পালরাজের নাম প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্যক্রমে মদন পালের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়া ১৭ জন পালরাজের বংশানুক্রমিক নাম প্রাপ্ত হই। আমার ঐ প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা ও এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত হইলে পর, সেই বর্ষের বার্ষিক অধিবেশনে সোসাইটীর সভাপতি ছোটলাট বাহাদুর প্রকাশ্যে ঐ প্রবন্ধের উপযোগিতা ও ঐতিহাসিকতা স্বীকার করেন। বাস্তবিক ঐ তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার হওয়ায়, বঙ্গের পালরাজগণের রাজ্যক্রম সম্বন্ধে যে গোলযোগ ছিল, তাহা অনেকটা দূর হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্ত হয় না।

১৩০৩ সালে নড়াইল-হাটবাড়িয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের উৎসাহে "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রকাশ-কার্য্যে ব্রতী হই। বলিতে কি, উক্ত মহাত্মার অর্থানুকূল্য ও উৎসাহ ভিন্ন আমি কখনই এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইতাম না। এদেশে যত প্রকার জাতি ও সম্প্রদায় আছে, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সকলেরই কুলগ্রন্থ বা সংক্ষিপ্ত সামাজিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এরূপ সর্ব্বজাতীয় সামাজিক কুল বিবরণ আর কোন দেশে আছে কি না, আমার জানা নাই। আমাদের এদেশে পূর্ব্বতন রাজনৈতিক ইতিহাসের অভাব থাকিলেও, ঐ সকল কুলগ্রন্থ হইতে জাতীয় বা সামাজিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে। এ কারণ, ঐ সকল কুলশাস্ত্র,—মহামূল্য অপূর্ব্ব সামগ্রী ভাবিয়া, আজ দশ বর্ষ কাল যাবৎ সংগ্রহ করিতেছি।

বিজয় পণ্ডিত রচিত বাঙ্গালার আদি মহাভারত বিজয়পাণ্ডব কথা, ঐ সকল কুলগ্রন্থ সাহায্যে বাঙ্গলার জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলিত হইলে যে, তিমিরাবৃত বাঙ্গালীর ইতিহাসের অনেকাংশ আলোচিত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই আশাতেই আমি জাতীয় ইতিহাস প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি। এ পর্য্যন্ত জাতীয় ইতিহাসে আদি গৌড়, সারস্বত বা সাতশতী, রাঢ়ীয় আদি পাশ্চাত্য বৈদিক, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক, শাকদ্বীপী ও ঝিঝোতিয় ব্রাহ্মণ-বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। যদি ভগবানের করুণা থাকে, তাহা হইলে বঙ্গের অপরাপর সকল জাতির ও সকল শ্রেণীর সমাজিক ইতিহাস প্রকাশ করিবার আশা আছে। আজ ৬ বর্ষ হইল, ভারতবর্ষীয় সকল কায়স্থের বর্ণ-নিরূপণকল্পে "কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়" নামধেয় একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত করি। তখনও জনসংখ্যা নিরূপণ উপলক্ষে মিউনিসিপালিটীর জাতিবিচার সভায় বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই। জাতীয় গোলযোগের সূত্রপাত দেখিয়া, কাল বিলম্ব না করিয়া, নানা বন্ধুবান্ধবের আগ্রহে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিতে বাধ্য হই। তাহারই ফলে ১৩০৮ সালে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বর্ষে অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া চৈত্র পর্য্যন্ত শয্যাগত থাকি। ঐ সময়ে আমার জীবন-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, উক্ত বর্ষে ফাল্গুন মাসে মাননীয় বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ ও মাননীয় বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রপ্রমুখ কায়স্থ মহোদয়গণ আমাকে কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তদবধি কায়স্থ পত্রিকা চলিতেছে। আমিও যথারীতি সম্পাদকতা করিতেছি। এই পত্রিকা এক্ষণে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ আবার আমাকে পত্রিকা সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়াছেন। জানি না, কর্ত্তব্যপালনে কতদূর কৃতকার্য্য হইব।

উপরি-উক্ত গ্রন্থরচনা ও সাহিত্যিক সংস্রব ভিন্ন সাময়িক ও নানা মাসিক পত্রের সহিতও বহুদিন হইতে সংস্রব রহিয়াছে। এ সম্বন্ধে কোন কথা লেখা অনাবশ্যক মনে করি। সাহিত্য পরিষদের সংস্রবে আজ ৮ বর্ষকাল গ্রন্থ প্রকাশ-সমিতির সম্পাদক থাকিতে হইয়াছে এবং

পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, চণ্ডীদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, ভাগবতাচার্য্যের কৃষ্ণ-প্রেমতরঙ্গিণী, রাজকবি জয়নারায়ণের কাশীপরিক্রমা প্রভৃতি কতক প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনও করিতে হইয়াছে।

পুরাতত্ত্বসঞ্চয়, প্রাচীন কীর্ত্তি-উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় দেড় সহস্রাধিক সংস্কৃত পুঁথি সহস্রাধিক বাঙ্গলা পুঁথি এবং শতাধিক প্রাচীন উৎকল পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। ভগবানের নিকট নিয়ত প্রার্থনা, যতদিন বাঁচিব, যেন এইরূপ সাহিত্য সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই।

নবম পরিচ্ছেদ।

শিশিরকুমার ঘোষ।

দেশপ্রসিদ্ধ অমৃতবাজার-পত্রিকার প্রবর্ত্তক, অমিয়ভাণ্ডার অমিয়নিমাইচরিত, নরোত্তমচরিত, কালাচাঁদ গীতা, লর্ড গৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থের সূক্ষ্মদর্শী লেখক শিশিরকুমার আজ বিশ্ববিখ্যাত। অমৃতবাজারে প্রকাশিত শিশিরকুমারের রাজনৈতিক প্রবন্ধমালা এক সময় বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল; কেবল বঙ্গদেশ কেন, ইংরেজ-রাজনীতির কেন্দ্রভূমি ইংলণ্ডেও এক সময় শিশির-কুমারের ইংরেজী ভাষায় লিখিত রাজনৈতিক প্রবন্ধসমূহ তত্রত্য রাজনীতিবেত্তৃ-গণের হৃদয়ে এক অভিনব ভাব জাগাইয়াছিল। শিশিরকুমারের লেখা কি এক অপূর্ব্বভাবে ভরা। মর্ম্মস্পর্শী সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপে,—কোমলকান্ত মধুর ভাষার আবরণে,—শিশিরকুমার যে সকল রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা পাঠ করিয়া, একদিকে কোটি কোটি প্রজার অধিপতি অমিতশক্তি বঙ্গেশ্বর,—অন্য দিকে এদেশের লক্ষপতি সমৃদ্ধ জমিদারবৃন্দ পর্য্যন্ত চমকিত হইতেন। রাজ-বিধির প্রহেলিকাময় শব্দজাল ভেদ করিয়া, শিশিরকুমার দিব্যচক্ষে তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গল নিমেষে পরিমাণ করিয়া লইতে অসামান্য শক্তিশালী। একদিকে হিন্দুপেট্রিয়টের রাজনীতি-চর্চ্চা-চটুল বাগ্মিবর সম্পাদক, অন্যদিকে অমৃতবাজারের কুশাগ্রধী অকুতোভয় শিশিরকুমার,—অনেক ক্ষেত্রে এহেন মাতঙ্গ-শার্দ্দূলসমরে,—অভূতপূর্ব্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—শিশিরকুমারই জয়লাভ করিয়াছেন। শিশিরকুমারের আন্তরিক দেশহিতৈষণা অনেক সময় ভাবী সুপ্রচুর অর্থাগমকেও তাঁহার চক্ষে পথি-পতিত হেয় লোষ্ট্রখণ্ডের ন্যায় মূল্যহীন করিয়াছে। সুপ্রচুর পদসম্ভ্রম-সদন রাজপ্রাসাদকেও তিনি দেশহিত-কামনামূলক আত্মস্বাধীনতার বিনিময়ে অবহেলে জলাঞ্জলি দিয়াছেন।

কাঙ্গালের শিশিরকুমার, আজীবন কাঙ্গালের জন্যই কাঁদিতেছেন। যাহার

জীর্ণগৃহে তণ্ডুলমুষ্টি নাই, শীর্ণদেহে ছিন্ন বসন নাই,—অধিকন্তু প্রবলের অবিশ্রা অত্যাচারে যাহার পাণ্ডুর মুখমণ্ডল অশ্রুধারায় নিয়ত অভিষিক্ত,—শিশিরকুমারে প্রাণ তাহারই জন্য চিরকাল কাঁদিয়া আকুল। নীলকর-পরিপীড়িত শত শ কাঙ্গাল প্রজার জন্য শিশিরকুমার প্রাণপণে লড়িয়াছেন। অকিঞ্চন 'কৃষকের জ শিশিরকুমার রাজদ্বারে বার বার কৃপাভিক্ষা করিয়াছেন। সহস্র সহস্র মধ্যবি প্রজার হিতবর্দ্ধনের জন্য শিশিরকুমার যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা অধুনাতন রূপান্তরে পরিণত কংগ্রেসের বীজাঙ্কুর।

যে শিশিরকুমার গম্ভীর তূর্য্যনাদে রাজনীতির আলোচনা করিয়াছেন, সে শিশিরকুমারই আবার মোহনবংশীরবে গৌরাঙ্গলীলা গাহিয়াছেন; মধুরভা বিভোর হইয়া সেই শিশিরকুমারই দৈন্যের তানে বলিতেছেন,—

"তপ্ত বালুকায়, আছিনু শুইয়া,
চকিতের মত এলো।
শীতল নিকুঞ্জে, যথা ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
গৌর আমায় নিয়ে গেল॥"

সেই শিশিরকুমারই কাতরে করুণ স্বরে কহিতেছেন,—

"ঐশ্বর্য্যের সুখ, প্রভুত্ব করিয়া।
কিম্বা আন জনে মনে দুঃখ দিয়া॥
আমি বড় হব অন্যে ছোট হবে।
নিয়ে বসি মোর চরণ সেবিবে॥
তাহে যেবা সুখ শীঘ্র ক্ষয় হয়।
দম্ভ অহঙ্কার আদি বেড়ে যায়॥
বড় হব, পদ দিয়া আন বুকে।
ছি ছি কাজ নাই হেন ভোগ সুখে॥"

রাজনীতিক শিশিরকুমার এখন এমনই বিরক্ত বৈরাগী ভাবে—গৌর মন্ত্রে দীক্ষিত।

যশোহর জেলার অধীন মাগুরা গ্রাম শিশিরকুমারের জন্মভূমি। মাগুর এক্ষণে অমৃতবাজার নামে সুপ্রসিদ্ধ। এ সম্বন্ধে স্যার জেমস ওয়েষ্টলা প্রণীত ইংরেজী ভাষায় লিখিত হিষ্টরী অব যশোর বা যশোহরের ইতিহ এইরূপ লিখিত আছে,—"মাগুরা পল্লীর ঘোষ বংশ বিখ্যাত। ইহাঁরা জমিদ

কয়েক বৎসর হইল, এই ঘোষ জমিদারগণ মাগুরায় এক বাজার বসাইয়াছেন। তাঁহারা স্বীয় জননীর নামে এই বাজারের নামকরণ করিয়াছেন, অমৃতবাজার। সেই অবধি মাগুরা অমৃতবাজার নামে প্রসিদ্ধ।" মাগুরা কলিকাতা হইতে ৩৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এই মাগুরায় ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে শিশিরকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ।

শিশিরকুমারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম বসন্তকুমার ঘোষ। বসন্তকুমারও অসামান্য প্রতিভাশালী ছিলেন। অমিয় নিমাই চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডের উৎসর্গ পত্রে শ্রীল শিশিরকুমার লিখিয়াছেন,—"আমার দাদা শিশুকাল হইতেই পণ্ডিত। দাদার বয়স যখন আঠার বৎসর, তখনি তিনি আপনি ইংরেজীতে মহাপণ্ডিত হইয়াছেন, সংস্কৃত শিখিয়াছেন, গণিত শাস্ত্র শেষ করিয়াছেন; ষ্টুয়ার্ট মিলের গ্রন্থখানির টিপ্পনী শেষ করিয়াছেন, নূতন পদ্ধতিতে ইংরাজী ব্যাকরণ একখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। কেমিষ্ট্রী, ফিজিক্স প্রভৃতি ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন ও নানাবিধ যন্ত্র আনিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার মানসিক শক্তির কথা কি বলিব? দশ অঙ্কে, দশ অঙ্কে মনে মনে গুণ করিতে পারিতেন। কেমিষ্ট্রি শাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবেন বলিয়া, ফ্রেঞ্চ ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহার পরে পারসী ভাষাও অধিকার করেন। আমার দাদাকে আমি ঈশ্বরের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার একটু সন্তুষ্টির নিমিত্ত আমি শতবার প্রাণ দিতে পারিতাম। যেমন কাদা দিয়া পুতুল গড়ে, সেইরূপ তিনি আমাকে গড়িয়াছিলেন। ভালই গড়িয়াছিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে আমাকে সংসার-স্রোতে ভাসাইয়া তিনি পরলোকে গমন করেন। আমি ভাসিতে ভাসিতে রাজনীতির আবর্ত্তে পড়িয়া গেলাম, সেই আমার দুর্গতির কারণ হইল।"

শিশিরকুমারের মেজ দাদার নাম,—হেমন্তকুমার ঘোষ। ইহাঁরও বুদ্ধি অতীব প্রখর ছিল। অমৃতবাজার-প্রতিষ্ঠায় ইনিও শিশিরকুমারের সহায় ছিলেন। হেমন্তকুমারও শিশিরবাবুকে নিদারুণ শোকে কাতর করিয়া, পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর অন্য ভ্রাতার নাম শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ। ইনিই এক্ষণে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদন-কার্য্যে নিযুক্ত। এই পত্রসম্পাদন কার্য্যে ইহাঁরও তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় পদে পদে পরিস্ফুট। ইহাঁদের ভ্রাতায় ভ্রাতায় যেমন সৌহার্দ্দ আজ কাল প্রায়ই তেমন দেখিতে পাওয়া যায় না।

শিশির কুমারের বাল্যশিক্ষা,—পাঠশালে বা স্কুলে সামান্যই হইয়াছিল। কিন্তু প্রভূত-পরিশ্রমী—অমিত অধ্যবসায়ী শিশিরকুমার স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা-বলে শিক্ষার পরিসর ধীরে ধীরে বাড়াইয়া তুলেন। এক মুহূর্ত্তও তিনি অলসে কাটাইতে ভাল বাসিতেন না,—"ভগবদ্দত্ত অমূল্য ধন—সময়—এক নিমেষও বৃথা ক্ষেপণ করিওনা, ইহাই তাঁহার সাধনার মূল মন্ত্র।" তিনি স্বকীয় চেষ্টায় বিবিধ গ্রন্থগত জ্ঞানার্জ্জনে যেমন নিত্যই প্রবৃত্ত রহিতেন, তেমনই মানবচরিত্র-অধ্যয়নে,—প্রকৃতিতত্ত্ব পরিনির্ণয়েও সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইহাই শিশির কুমারের চরিত্রগত বিশেষত্ব।

শিশিরকুমারের চরিত্র যেমন নির্ম্মল, মনের তেজ যেমন প্রবল, দেহের বলও তেমনি অটুট। কোন কার্য্যই তিনি অক্ষমতার অছিলায় অননুষ্ঠিত রাখিতে জানিতেন না,—রাখিতে পারিতেন না। এই বৃদ্ধ বয়সেও শিশিরকুমারের এ মনোবৃত্তি তুল্য ভাবে জাগরূক। কুস্তিখেলায় তরুণ শিশিরকুমার অনেক বড় বড় ওস্তাদকেও স্তম্ভিত করিয়াছেন। অদম্য অশ্বের সংযম-সাধনে শিশিরকুমার অদ্ভুত সাহসিকতা দেখাইয়াছেন। যশোহরের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা (ভোলারপুকুর) বার বার সন্তরণে পার হইয়া,—ক্রমাগত তিন ঘণ্টা ৩৫ মিনিট কাল সাঁতার দিয়া, শিশিরকুমার পুরস্কারলাভে প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। এমন ঘটনা শিশিরকুমারের বাল্যচরিত্রে প্রচুর।

শিশিরকুমার যাহা দেখিতেন, তাহাই শিখিবার জন্য প্রাণান্তপণ করিতেন। শিশিরকুমারের পখোয়াজ এসরাজ এবং অন্যান্য যন্ত্রবাদনে নিপুণতা দেখিয়া, অনেক অভিজ্ঞ ওস্তাদও তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেন। অথচ, গুরুসন্নিধানে শিশিরকুমারের এ সকলের শিক্ষালাভ অতি অল্পই হইত,—প্রায়ই হইত না। পাঠ্যাবস্থায় অল্পমাত্র অবসরে গোপনে গোপনে শিশির কুমার এসরাজ আদি শিখিতেন। অন্যে যে জটিল রাগ রাগিণী ছয় মাসেও শিখিতে পারিতেন না,—শিশিরকুমার একদিনেই তাহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইতেন। প্রায় সর্ব্ববিধ বাদ্যযন্ত্রেই শিশির কুমার সিদ্ধহস্ত,—কীর্ত্তনালাপে শিশিরকুমার সিদ্ধকণ্ঠ।

ইনি অতি শিশুকাল হইতে এরূপভাবে সঙ্গীত চর্চ্চা করেন যে, অতি অল্প কাল মধ্যেই যশোহরে একজন বিখ্যাত কালোয়াতী গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। সে সময় বাঙ্গালা ভাষায় হিন্দু সঙ্গীতসংক্রান্ত কেবল একখানি

মুদ্রিত পুস্তক ছিল। ইহা দেখিয়া শিশির কুমার "সঙ্গীত শাস্ত্র" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ প্রচুর পরিমাণে অতি সত্বরে বিক্রীত হইয়া যায়। শিশিরকুমার বিবিধ রাগ রাগিণী সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি প্রচলিত রাগ রাগিণীর অন্তর্গত নহে, এরূপ একটি সুরেরও সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহার নাম "অমৃত রাগিণী।" এই রাগিণীতে তিনি অনেকগুলি হিন্দী সংগীত রচনা করিয়াছেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে শিশিরকুমারের আত্মশক্তি প্রসারিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে শিশিরকুমারের চিত্তে সমবেদনা-বৃত্তিও জাগিয়া উঠিল। এইবার শিশিরকুমার ব্যথিতের বেদনা-মোচনরূপ মহাব্রত গ্রহণ করিলেন।

১৮৫৯ সালে যশোহর জেলার নীলকর সাহেবের পীড়নে সহস্র সহস্র প্রজা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। সতর বৎসরের শিশিরকুমার এই দু সময়ে পীড়িত প্রজাগণের করুণ-কাহিনী অকুতোভয়ে হিন্দু পেটরিয়টে এবং অন্যান্য ইংরেজ পত্রে লিখিতে লাগিলেন। চারিদিকে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। কারাভয়ের ত কথাই নাই, ইহার জন্য শিশিরকুমারের প্রাণের ভয় পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু দৃঢ়ব্রত শিশিরকুমার কিছুতেই স্খলিত-পদ হয়েন্ নাই। এই সময়ে যশোহরে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং ইউরোপীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর সহিত শিশিরকুমারের পরিচয় জন্মে।

এইবার শিশিরকুমার বুঝিলেন,—কাতরের ক্লেশ-প্রচার পক্ষে সংবাদ-পত্রই পরম সহায়। কিন্তু মাগুরা বা অমৃতবাজারের ন্যায় সুদূর পল্লীগ্রামে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা একান্ত অসম্ভব। শিশিরকুমার সে অসম্ভব অনুষ্ঠানও সম্ভব করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। শিশিরকুমারের তখন প্রচুর অর্থসঙ্গতি ছিল না, তাহাতেও শিশির ভ্রুক্ষেপ করিলেন না। শিশিরকুমার, হেমন্তকুমার এবং মতিলাল এই তিন ভ্রাতায় সেই মাগুরা গ্রামেই সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠায় কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলেন। শিশিরকুমার অল্পমূল্যে একটী কাঠের প্রেস 'এবং কতকগুলি পুরাতন টাইপ ক্রয় করিলেন। ইহাই মাত্র ইহাঁদের সম্বল হইল। এইরূপ অপ্রচুর উপকরণে, অটূট সাহসে শিশিরকুমার ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মাগুরার সংবাদপত্র প্রকাশ করিলেন। ইহার নাম হইল অমৃতবাজার পত্রিকা। পত্রিকা সাপ্তাহিক। বাঙ্গালাভাষায় ইহা লিখিত হইতে লাগিল।

এই সংবাদপত্র-প্রচারে শিশিরকুমার পদে পদেই নানারূপ বিঘ্ন বাধায়

পড়িতে লাগিলেন। সেরূপ পল্লীগ্রামে তখন তিনি প্রিণ্টার, কম্পোজিটার বা প্রেসম্যান কোথায় পাইবেন? প্রেস-ব্যবহারের উপযোগী অত্যাবশ্যক সামগ্রী সমূহই বা কোথায় মিলিবে? শিশিরকুমার তাহাতেও কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিয়া প্রেসের কার্য্য কতক শিখিয়া গেলেন। তখন শিশিরকুমার নিজেই লেখক, কম্পোজিটার এবং প্রিণ্টারের কার্য্য করিতে লাগিলেন। শিশিরকুমার মনে মনে রচনা করিতে-ছেন, হাতে "ষ্টিক্" ধরিয়া তাহা কম্পোজ করিতেছেন, আর প্রেস টানিয়া তাহা মুদ্রিত করিতেছেন, এমন ব্যাপার অনেক সময়েই ঘটিয়াছে। যখন প্রেসের টাইপ বা প্রেসের কালীর অভাব হইত,—কলিকাতা হইতে সংগ্রহ কোন মতেই সম্ভবপর হইত না, তখন শিশিরকুমার স্বয়ং প্রেসের কালি তৈয়ারি এবং কাঠের টাইপ খোদাই করিয়া লইতেন। একবার দাখিলা ছাপাইবার সময় ।৶০ লিখিবার প্রয়োজন হয়। শিশিরকুমার "হ" অক্ষরটি উলটাইয়া সে কার্য্য সম্পন্ন করেন। এইরূপ অটুট অধ্যবসায়ে শিশির কুমার অমৃতবাজার প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যশোহরের তদানীন্তন মাজিষ্টর মনরো এবং জয়েণ্ট মাজিষ্টর ওকেনলি এ কার্য্যে শিশিরকুমারকে বহুশঃ উৎসাহ প্রদান করিলেন। শিশিরকুমারের প্রতি তাঁহাদের প্রীতি-অনুরাগ পরি-বর্দ্ধিত হইল।

দিন দিন অমৃত বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে প্রসৃত হইল। অমৃত বাজারের শতাধিক গ্রাহক সংগ্রহ হইল। শিশির বাবু অকুতোভয়ে অমৃত বাজার পত্রিকায় নানারূপ অবিচার অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ করিতে লাগি-লেন। অমৃত বাজারে গবরমেণ্টের দৃষ্টি পড়িল। মাজিষ্টর ওয়েষ্টল্যাণ্ড রিপোর্ট লিখিলেন,—"It (The Amrita Bazar Patrika) is conspic-ous only for its scurrilous tone and its disregard of truth. Its declared circulation is 500." অর্থাৎ অমৃত বাজার নিন্দাবাদ প্রচার এবং সত্য-ব্যভিচারের জন্য প্রসিদ্ধ। এ মন্তব্যে অমৃতবাজারের অমিত কার্য্য শক্তিরই পরিচয়। কিন্তু অবিলম্বেই এরূপ মন্তব্যের ফল ফলিল। অমৃত বাজার পত্রিকা পাঁচ মাস অবাধে চলিল। তাহার পরই এক জন ইউ-রোপীয়ান ডেপুটী মাজিষ্টর অমৃত বাজার পত্রিকার নামে মানহানির মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। নামে মানহানির মোকদ্দমা,—কার্য্যতঃ এক গুরুতর

ব্যাপারে পরিণত হইল। স্বয়ং রাজ-কর্ত্তৃপক্ষ এ মোকদ্দমায় অবহিত হইলেন; বহু ইংরেজ এ মোকদ্দমার সাক্ষী দিবার জন্য দাঁড়াইলেন; স্বয়ং বিভাগীয় কমিশনর মোকদ্দমাকালে উপস্থিত হইলেন; আর শিশিরকুমারের মিত্র মিঃ মনরো এবং মিঃ ওকেনলিও এক্ষণে তাঁহার বিরূপ হইলেন। আট মাস কাল মোকদ্দমা চলিল। পরিণামে শিশিরকুমারই এ মোকদ্দমায় জয়ী হইলেন বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহার নামে আর একটী ফৌজদারী মোকদ্দমা উপস্থিত হইল। ইহা উপরি উক্ত মোকদ্দমার একটি অংশ মাত্র। ভগবৎ-কৃপায় এ মোকদ্দমায়ও শিশিরকুমারেরই জয়লাভ হইল।

উপরি উপরি দুইটা মোকদ্দমাতেই শিশিরকুমারের জয়লাভ হইল বটে, এই মোকদ্দমার ফলে, অমৃতবাজারের প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি এবং গ্রাহক সংখ্যাও সমধিক পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইল বটে, কিন্তু শিশির বাবুর আর্থিক অবস্থা একান্ত মন্দীভূত হইয়া পড়িল। অধিকন্তু এই সময় তাঁহার সংসারে আত্মীয় স্বজন এবং স্বয়ং শিশিরকুমারও ম্যালেরিয়া জ্বরে কাতর হইয়া পড়িলেন।

মাগুরার ন্যায় ক্ষুদ্রগ্রামে,—ম্যালেরিয়ামর্দ্দিত পল্লীভূমে অবস্থান করিতে শিশিরকুমারের আর প্রবৃত্তি হইল না। অধিকন্তু তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বৃহত্তর কার্য্যক্ষেত্রের জন্য প্রয়াসী হইয়া উঠিল। তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আসাই স্থির করিলেন। তিনি মাসিক আড়াই টাকা সুদে এক শত টাকা মাত্র কর্জ্জ লইলেন এবং সেই এক শত টাকা মাত্র সম্বল লইয়া,—সংসারের প্রায় ত্রিশজন আত্মীয় স্বজনকে সঙ্গে করিয়া, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শিশিরকুমার কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কলিকাতায় অবিলম্বেই শিশিরকুমারের ম্যালেরিয়া জ্বর নিবৃত্ত হইল; তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। এইবার কলিকাতা হইতেই তিনি অমৃতবাজার প্রচারে উদ্যোগী হইলেন। একজন বন্ধু তাঁহাকে আরও কিঞ্চিৎ অর্থ কর্জ্জ দিলেন। তিনি সেই অর্থ সাহায্যে একটী হেণ্ডপ্রেস ক্রয় করিলেন! ইতিপূর্ব্বে দুই মাসকাল অমৃতবাজার প্রচার বন্ধ ছিল। আবার পূর্ণোদ্যমে শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। ১৮৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা হইতে প্রথম অমৃতবাজার পত্র প্রকাশিত হইল।

দুই এক সপ্তাহেই শিশিরকুমারের অমৃতবাজার কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিস্তর গ্রাহক জুটিল। শিশিরকুমার যাহা সত্য বলিয়া, দেশের মঙ্গল-

কর বলিয়া, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন, তাহাই মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় লিখিতেন। ফলে, দিন দিন বহু সংখ্যক লোক তাঁহার অনুরাগী হইয়া উঠিল। এই সময়ে অমৃতবাজারে বঙ্গের তদানীন্তন কোন উচ্চতম রাজকর্ম্মচারী এবং একজন সবডেপুটী মাজিষ্টরের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশিত হয়। এই চিত্র-প্রকাশেও অমৃত-বাজারের প্রসিদ্ধি বিস্তর বাড়িয়া যায়। তখন কলিকাতায় সকলেরই মুখে অমৃতবাজারের সেই রঙ্গভঙ্গময়ী রচনার কথা,—সেই ব্যঙ্গচিত্রের কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল।

কলিকাতা সহরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশানর এ সময়ে অসীম প্রভাব। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোশিয়েশন জমিদার-সভা। বড় বড় বহু জমিদার এসোসিয়েশনের সদস্য। হিন্দু পেটরিয়ট এসোশিয়েশনের মুখপত্র। পেটরিয়ট ইংরেজী ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র। কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেটরিয়টের সম্পাদক। একদিকে জমিদারশ্রেণীর মুখপত্র হিন্দুপেটরিয়টের সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল, অন্য দিক অনন্যসহায় অমৃতবাজার পত্রিকার অসম্বল সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ। এহেন অমৃতবাজারেরও প্রচুর প্রতিষ্ঠা! প্রধানতঃ সহরের অভাব অভিযোগের কথা,—ধনিসন্তানগণের স্বার্থকথাই হিন্দুপেটরিয়টে প্রকাশিত হয়, আর শিশিরকুমার সুদূর পীড়িত পল্লীর কথা,—সহস্র সহস্র কাঙ্গাল প্রজার কষ্টের কথা—অমৃতবাজারে লিখিতে লাগিলেন। কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে হিন্দুপেটরিয়টে যদি দশ জনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, অমৃতবাজারে সহস্র জনের চক্ষু পতিত হইয়া থাকে। অমৃতবাজার ক্রমেই বহুজন-প্রশংসার্হ হইয়া উঠিল। শিশিরকুমার ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠার উচ্চ সোপানে উঠিতে লাগিলেন।

স্যার জেমস ষ্টিফেন ক্রিমিনেল প্রসিডিওর কোড বা ফৌজদারি বিধি প্রণয়ন করিলেন। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের মুখপত্র হিন্দুপেটরিয়টে এই আইন সম্বন্ধে উদাসভাব প্রকাশ করিলেন। শিশিরকুমার দেখিলেন, আইনে দেশের লোকের ভাগ্যে ভাবিকালে নানাবিধ অমঙ্গলেরই সম্ভাবনা। তিনি অমৃতবাজারে বিলের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করিলেন; কেবল লেখা নহে, তিনি কলিকতা সহরে জমিদার শ্রেণীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একথা বুঝাইতে লাগিলেন; তাঁহাদিগকে আইনের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতে লাগি-লেন;—অনেকেই শিশির কুমারের পক্ষপাতী হইলেন।

আবার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সহিত শিশিরকুমারের মত-বিরোধ ঘটিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন অভিমত দিলেন,— ইনকমট্যাক্স দেশের সর্ব্বনাশকর ট্যাক্স।" অনেক এংলো ইণ্ডিয়ান এই প্রতিবাদে এসো-সিয়েশনের সহিত যোগ দিলেন। কেননা, এংলো ইণ্ডিয়ানগণও ইনকমট্যাক্স দিতে বাধ্য। শিশিরকুমার প্রচার করিলেন,—"এসোসিয়েশন ভ্রম করিতেছেন; এংলো ইণ্ডিয়ানগকে যদি কোন ট্যাক্স দিতে হয়, তাহা হইলে এই ইনকম ট্যাক্স। যত দিন তাঁহাদিগকে এই ট্যাক্স দিতে হইবে, ততদিন তাঁহারা ভারতবাসীর সহিত একমত হইয়া নিশ্চিতই গবরমেণ্টের অপব্যয়ে আপত্তি করিবেন। পরন্তু,—শতকরা নব্বুই জন দরিদ্র এ ট্যাক্সে অব্যাহতি পাইয়াছে, ট্যাক্স দিতে হয় কেবল শতকরা দশজন সমৃদ্ধ ব্যক্তিকে। সুতরাং বুঝিয়া দেখিলে, এ ট্যাক্সে আপত্তি করা উচিত নহে।" এ পক্ষেও শিশিরকুমারের জয় লাভ হইল। বহু লোকে তাঁহার এ তর্কের পোষক হইলেন।

আবার ঘোর বিতর্ক। তখন কলিকাতার কশাইটোলা হইতেই প্রধানতঃ ইউরোপীয়ান আসামীর জন্য ইউরোপীয়ান জুরি নির্ব্বাচিত হইত। বিচারে ইউরোপীয়ান আসামীগণ অনেক সময় অব্যাহতি পাইতেন। ইহাতে সাধারণ কলিকাতাবাসীর মনে জুরী-প্রথার উপর একটা অশ্রদ্ধা জন্মে। "জুরী প্রথা উঠাইয়া দাও,"—এইরূপ একটা ধ্বনি উঠে। অনেক বিচারকেরও জুরী প্রথায় এইরূপ আপত্তি। কেননা, জুরী-প্রথায় প্রকারান্তরে বিচার-পতির বিচারশক্তিতে কিঞ্চিৎ বাধা উপস্থিত হইয়া থাকে। শিশিরকুমার অন্য ধূয়া ধরিলেন, তিনি ক্রমাগত লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—"জুরী প্রথা দেশের মঙ্গলজনক; ইহাতে কেহই আপত্তি করিও না।" ক্রমে অনেকেই শিশির কুমারের কথায় কাণ দিলেন; দেশের মঙ্গল বুঝিলেন,— বুঝিলেন,—এ দেশীয় আচার ব্যবহারে অনভিজ্ঞ,—বিদেশীয় বিচারপতির পার্শ্বে এ দেশীয় জুরী একান্ত আবশ্যক; এ দেশের লোকে জুরীপ্রথার অনুরাগী হইলেন।

এইরূপ নানা ঘটনায় শিশিরকুমারের অনুরাগি-সংখ্যা ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এইবার রাজনীতিক সভা প্রতিষ্ঠায় কল্পনা করিলেন। কল্পনা কার্য্যে পরিণত হইবারও সুযোগ ঘটিল। ব্রিটিশ ইণ্ডি-য়ান এসোসিয়েশন তখন জমিদার বা তদ্বৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্বার্থাধিকারেই সম্বন্ধ রাখিতেন, দেশের অপর সাধারণের সহিত এসোসিয়েশন তত ঘনিষ্ঠতা রাখিতেন

না। এসোসিয়েশনের সভ্য হইতে হইলে বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে হইত শিশিরকুমার এই ভাবে কথা তুলিলেন,—"দেশের সর্ব্বসাধারণ লোকের স্বার্থে দৃষ্টি রাখা এসোসিয়েশনের কর্ত্তব্য, এবং বার্ষিক চাঁদা ৫০ টাকা কমাইয়া পাঁচ টাকা কর উচিত। তাহা হইলে অনেকেই ইহার সভ্য হইতে পারিবে।" শিশিরকুমারে কথা টিকিল না। তখন তিনি ইণ্ডিয়ান লীগ নামে এক সভা প্রতিষ্ঠি করিলেন; কৃষ্ণনগর, বরিশাল, বহরমপুর, ঢাকা প্রভৃত স্থানে শিশি কুমারের সভা বসিল; প্রবল উদ্যমে নিজ কলিকাতা সহরে শিশিরকুমার সভা স্থাপন করিলেন। কলিকাতার এই সভাই,—কেন্দ্র-সভা পরিণত হইল। শিশির কুমারের মতানুগত সম্প্রদায় ক্রমেই প্রবলত হইতে লাগিল।

এই সময়ে বড়োদার গুইকুমার মলহর রাওয়ের মোকদ্দমা। হিন্দু পেটরি গবরমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিলেন; আর অমৃতবাজারে শিশিরকুমার মলহ রাওয়ের পক্ষানুকুলে লিখিতে লাগিলেন। দেশীয় নরপতিগণ ক্ষুণ্ণশক্তি হইলে দেশেরই অমঙ্গলের কথা,—ইহাই শিশিরকুমারের প্রধান যুক্তি। এই যুক্তি বলে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি প্রভূত তেজস্বিতার সহিত মলহর রাওয়ের প অবলম্বন করেন; ফলে ভারতের দিগদিগন্তে অমৃতবাজারের প্রতিষ্ঠা সহস্র মু কীর্ত্তিত হইতে লাগিল। তদানীন্তন বঙ্গেশ্বর স্যর রিচার্ড টেম্পল মফস্ব পরিভ্রমণে গিয়া, সর্ব্বত্রই অমৃতবাজারের কথা শুনিতে পান; তিনি অমৃতবাজারে সম্পাদক শিশির বাবুর সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা করেন। শীঘ্রই তাঁহাদে সে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল।

এইবার কলিকাতায় শিশিরকুমারের উদ্যোগে এক বিরাট আন্দোলন উপস্থি হইল। কলিকাতায় মেয়র তখন স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ। বলিতে গেলে, তিনি তখন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির সর্ব্বেসর্ব্বা। মিউনিসিপ্যালিটিতে এ দেশে লোকের আধিপত্য অতি অল্পই। শিশিরকুমার বুঝিলেন,—মিউনিসিপালিটি এদেশী করদাতৃগণের নির্ব্বাচনাধিকার একান্ত প্রয়োজন। বন্ধু বান্ধবগণকে তি এ কথা বলিলেন। তাঁহারা স্পষ্টবাক্যে সন্দিহানচিত্তে উত্তর করিলেন,—" উদ্যোগ সফল হইবার পক্ষে অন্তরায় প্রচুর।" শিশিরকুমার কিন্তু এ আশঙ্ক ললেন না। শিশিরকুমারের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান লীগের এক সভাধিবে হইল। শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় নির্ব্বাচনাধিকার সম্ব

উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। ছোট লাট স্যর রিচার্ড টেম্পলের কাণে এই সভার কথা উঠিল। তিনি অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন,—ইহা শিশিরকুমারের কীর্ত্তি। তিনি শিশিরকুমারের সহিত সাক্ষাৎকরের বাসনা করিলেন। ছোট লাটের রোটাস জাহাজে এক আমন্ত্রণসভার আয়োজন হইল। শিশিরকুমার এই সভায় আহূত হইলেন। এই নিমন্ত্রিত জনমণ্ডলী হইতে ছোট লাট,—শিশিরকুমারকে স্বয়ং বাছিয়া লইলেন,—তাঁহার সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিলেন,—পুনরায় তাঁহাকে বেলবেডিয়রে আহ্বান করিলেন। ছোট লাটের আদেশানুসারে শিশিরকুমার বেলবেডিয়রে ছোট লাটের সহিত দেখা করিলেন। শিশিরকুমারের নিকট ছোটলাট বাহাদুর নির্ব্বাচনাধিকার সম্বন্ধে সকল তথ্যই অবগত হইলেন। তাঁহার মন এই অধিকার প্রদানের দিকেই অনেকটা ঝুঁকিয়া পড়িল।

এদিকে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এবং এংলো ইণ্ডিয়ানগণ নির্ব্বাচনাধিকার-প্রণালীর প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিলেন,—"হয় এদেশীয়ের হাতে মিউনিসিপালিটির সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হউক,—নচেৎ কিছুই দিবার প্রয়োজন নাই।" ছোটলাট একথাও শুনিলেন; শুনিয়া তিনি শিশিরকুমারকে ডাকাইয়া এই সকল কথা বলিলেন; আর বলিলেন,—"কলিকাতার তাবৎ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি এই নির্ব্বাচনাধিকারের প্রতিকূল হন, তাহা হইলে, আমি কেমন করিয়া, এ অধিকার প্রদান করিতে পারি?" শিশিরকুমার উত্তর দিলেন,—"আপনি সে পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকুন; কলিকাতার যাবতীয় করদাতাই এই নির্ব্বাচনাধিকারের প্রার্থী। অবিলম্বে প্রকাশ্য সভায় ইহা প্রমাণিত করিয়া দিব।"

অতঃপর শিশিরকুমার,—কলিকাতার প্রত্যেক করদাতার বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া নির্ব্বাচনাধিকারের উপকারিতা সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। ফলে, তাঁহারই উদ্যোগে টাউনহলে এক বিরাট সভার আয়োজন হইল। এদিকে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ভবনেও এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এক সভা বসিল। টাউনহলে শিশিরকুমারের সভায় দুই সহস্রেরও অধিক করদাতা উপস্থিত হইলেন,—বক্তা,—কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি; আর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভার লোকসংখ্যা দুই শত হইতে তিন শত মাত্র,—সভাপতি রাজা রমানাথ ঠাকুর। ১৮৭৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি এই

সভাধিবেশন হয়। পরিণামে শিশিরকুমারেরই প্রার্থনা পূর্ণ হইল। ছোট লাট টেম্পল সাহেব এই অধিকার প্রদান করিলেন।

এই সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলস,—ভারতে শুভাগমন করেন। ইহাঁর অভিনন্দন উৎসবের জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন আশী হাজার টাকা চাঁদা তোলেন। তাঁহারা স্থির করেন,—এই টাকাটা আতসবাজী এবং আলোক-সজ্জাদিতে ব্যয়িত হইবে। ইণ্ডিয়ান লীগের পক্ষ হইতে শিশিরকুমার স্থির করেন,—প্রিন্স অব ওয়েলসের এই শুভাগমনের স্মরণকল্পে কোন স্থায়ী কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। একটী টেকনিকেল স্কুল-স্থাপনেরই কল্পনা হয়। ইহাতে ব্যয় অনুমান করা হয় তিন লক্ষ টাকা। প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমনের সাত দিন মাত্র পূর্ব্বে শিশিরকুমারের মনে এই কল্পনা উদিত হয়; এক দিনেই তিনি দেড় লক্ষ টাকা পাইবার আশা প্রাপ্ত হন। কিন্তু যাঁহারা টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা বলেন,—ছোট লাট টেম্পল বাহাদুর যদি বলেন, টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন করাই উচিত, এবং এই স্কুলেই টাকা দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আমরা টাকা দিতে পারি, নচেৎ নহে। এই কথা শুনিয়াই,—প্রিন্স অব ওয়েলসের আসিবার পূর্ব্বদিন রাত্রি নয়টার সময় শিশিরকুমার বেলবেডিয়রে গিয়া ছোট লাটের সহিত দেখা করেন। তত রাত্রে অপর কাহারও সহিত দেখা করা ছোট লাটের নিয়ম নহে। কিন্তু শিশিরকুমারের সর্ব্বত্রই অবাধগতি,—প্রচুর সম্মান। শিশিরকুমার ছোট লাট বাহাদুরকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন,—আর অনুরোধ করিলেন,—"আপনি যদি তাঁহাদিগকে এই স্কুলের উপকারিতার কথা একবার বুঝাইয়া বলেন, তাহা হইলে, তাঁহারা টাকা দিতে আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।" ছোট লাট বাহাদুর বলিলেন,—"তাহাদের সহিত দেখা হইলেই আমি এ কথা বলিব।" শিশিরকুমার উত্তর করিলেন—"আপনি আহ্বান না করিলে তাঁহারা আসিবেন না; সুতরাং দেখা হইবে কেমন করিয়া?" ছোটলাট বলিলেন,—"আমি তাঁহাদিগকে আহ্বান করিব কখন? আর ত সময় নাই, কাল প্রত্যূষে ছয়টার সময় আমি ষ্টিমারে করিয়া, প্রিন্স অব ওয়েলসকে আনিতে যাইব।" শিশিরকুমার তখনি সাহসভরে উত্তর করিলেন,—"কৃপা করিয়া আপনি যদি তাঁহাদের নামে এক একখানি পত্র দেন, তাহা হইলে, কাল ভোরে পাঁচটার সময় আমি তাঁহাদিগকে আপনার নিকট লইয়া আসিতে পারি।" ছোটলাট বাহাদুর প্রথমতঃ পত্র দিতে কিছু

ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু পরে শিশির কুমারের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে কয়েক খানি পত্র দিলেন। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় শিশির কুমার সেই সকল পত্র লইয়া, বেলবেডিয়র ত্যাগ করিলেন; এবং সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায়—অনাহারে ঘুরিয়া, নির্দ্দিষ্ট সেই কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভোরে পাঁচটার সময় বেল-বিডিয়রে ছোটলাট বাহাদুরের নিকট আনয়ন করিলেন। শিশিরবাবুর উদ্দেশ্য সফল হইল; টেকনিকেল স্কুল বসিল,—নাম হইল,—"এলবার্ট টেম্পল অব সায়েন্স।" স্যর রিচার্ড টেম্পল,—শিশির বাবুর অসীম কার্য্যদক্ষতাগুণে মুগ্ধ হইয়া, এই স্কুলের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য বার্ষিক আট হাজার টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। পরে কিন্তু স্যর এশলি ইডেনের রাজ্যকালে এ বৃত্তি প্রত্যাহৃত হয়।

ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল শিশির কুমারকে যেমন প্রায়ই আহ্বান করিতেন,—রাজ্য- শাসন-ঘটিত নানা বিষয়ের পরামর্শ তাঁহার সহিত করিতেন, তাঁহার পরবর্ত্তী ছোটলাট স্যর এশলি ইডেন শিশিরবাবুর তেমনই প্রতিকূল হয়েন। শিশিরবাবুকে একদিন তিনি বেলবেডিয়রে ডাকিয়া স্ব-মতের পক্ষপাতী করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিশির বাবু কোনরূপ ভয়ে কাতর হন নাই; কোনরূপে প্রলোভনে ভুলেন নাই।

১৮৭৯ সালের ১৪ই মার্চ্চ প্রাতে শিশিরকুমার একখানি ইংরেজী সংবাদ-পত্রে এই কয়েকটী কথা পাঠ করিলেন,—'অদ্য সুপ্রিম কাউন্সিলে একখানি বিল পেশ হইবে। এদেশে যে সকল সংবাদপত্র মাতৃভাষায় লিখিত হইয়া থাকে, সেই সকল সংবাদপত্রের সংযম-সাধনই এই বিলের উদ্দেশ্য।' এই কয়েক ছত্র পড়িয়া শিশিরকুমারের মনে হঠাৎ যেন একটা বিদ্যুতের দীপ্তি ঝকিয়া উঠিল; আরও একখানা কাগজে তিনি এই রূপ বিবরণ পাঠ করিলেন। তখন শিশিরকুমার বুঝিলেন,—এইবার অমৃতবাজার পত্রিকার বুঝি সর্ব্বনাশ উপস্থিত। তখন ভ্রাতারা মিলিয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। স্থির হইল, মতি-লাল ব্যবস্থাপক সভায় গিয়া এ বিষয়ের আনুপূর্ব্বিক সংবাদ জানিয়া আসিবেন। মতিলাল, ব্যবস্থাপকসভায় গেলেন। শিশিরবাবু এবং হেমন্তবাবু দুই ভাই, চঞ্চলমনে মতিলালের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় মতিলাল ব্যবস্থাপক সভা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়াই,—শিশিরবাবু এবং হেমন্তবাবু তাড়াতাড়ি ত্রতল হইতে নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি খবর ভাই?" মতিলাল রুদ্ধ

কণ্ঠে সজলনয়নে উত্তর করিলেন,—"দাদা! সর্ব্বনাশ হইল, পত্রিকা বুঝি যায়।" শিশিরবাবু কিয়ৎক্ষণ গভীর চিন্তার পর বলিলেন,—"পত্রিকা কেবল ইংরাজী ভাষারই লিখিত হইবে।"

কিন্তু ইহার এক অন্তরায় ছিল। বহুসংখ্যক ব্যক্তি পত্রিকার কেবল বাঙ্গালা লেখা পড়িবার জন্যই গ্রাহকশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছিলেন। পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজীতে চালাইলে ঐ সকল গ্রাহক হারাইতে হয়। কিন্তু তখন আর সে চিন্তার সময় ছিল না। তখন অতিগুরুতর ব্যাপার,—জীবন মরণের সন্ধিস্থল। যেরূপ আইনের প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহাতে শিশিরকুমার স্থির করিলেন,—পর সপ্তাহে যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হইবে, অমনি পত্রিকাকে আইনের ফাঁদে ফেলা হইবে। সুতরাং মীমাংসা হইল, পত্রিকা আর কোন ক্রমেই ইংরাজী বাঙ্গালা দুই ভাষায় প্রকাশ করা হইবে না। পর সপ্তাহ হইতেই পত্রিকা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজী ভাষায় বাহির হইবে। কিন্তু তাহারও বিষম গোল। শিশির বাবুর তখন ইংরাজী কাগজ বাহির করিবার উপযুক্ত টাইপও নাই, কম্পোজিটরও নাই। কলিকাতা—নিমতলার দত্তবংশীয় বাবু প্রাণনাথ দত্ত ও গিরীশচন্দ্র দত্ত মহাশয়েরা তাঁহাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা পত্রিকার জন্য কতকগুলি ইংরাজী টাইপ ধার দিলেন। শিশির বাবুর কয় ভাইয়েই প্রত্যেকেই কম্পোজের কার্য্যে সিদ্ধহস্ত। সুতরাং ইংরাজিতে কাগজ বাহির করিবার আর কোন বিঘ্ন রহিল না। পর সপ্তাহের সমস্ত কাগজ ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইল।

দিন দিন পত্রিকার উন্নতি হইতে লাগিল। পত্রিকার এইরূপ অভাবনীয় উন্নতির কারণ যে, কেবল শিশির বাবুর এই উৎকৃষ্ট লিখনভঙ্গী, তাহা নহে। শিশির বাবুর রচনার এমন অদ্ভুত মোহিনী শক্তি, তাঁহার এমনই বৈচিত্র্যময়ী লিপিকুশলতা যে, অতি পুরাতন বিষয়ও তাঁহার লেখার গুণে যেন সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হয়। এই গুণেও তাঁহার লেখা দিন দিন লোকের অধিকতর মনোরঞ্জন করিতে লাগিল।

কিরূপে সাপ্তাহিক পত্রিকা দৈনিক হয়, এইবার তাহারই কিছু উল্লেখ করিব। সহবাস-সম্মতি আইনের আন্দোলনে বঙ্গভূমি তোলপাড় হইতেছে,—সমগ্র বাঙ্গালা জুড়িয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় বঙ্গের একমাত্র ইংরাজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান মিরর দেশের লোকের পক্ষ ছাড়িয়া গবর্ণমেণ্টের

পক্ষে দাড়াইলেন। দেশের লোকের মনের কথা প্রকাশ করিবার আর কোন কাগজ নাই। সুতরাং দলে দলে লোক আসিয়া পত্রিকা আফিস ভাঙ্গিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতে লাগিল। সকলেরই মুখে এক কথা,—"পত্রিকাখানি দৈনিক করিয়া দেশের লোকের মনের কথা পত্রিকায় প্রকাশ করুন।" কিন্তু দৈনিক করা কি সহজ কথা? তাহাতে প্রথমেই প্রায় লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন এত টাকা আসে কোথা হইতে! লোকে ত তাহা বুঝে না! তাহারা বারম্বার এইরূপ জেদ করিতে লাগিল,—পত্রিকা দৈনিক করুন। শিশির বাবুর অপার সাহস,—অসাধারণ শক্তি। তিনি লোকের কথাই শুনিলেন; সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শেষে তিনি সাপ্তাহিক পত্রিকাখানিকে দৈনিকে পরিণত করিলেন। ভগবানের এমনই অদ্ভুত লীলা যে, অমৃতবাজার যে দিন হইতে দৈনিক হইল, সেইদিন হইতেই ইহার আয়ও বাড়িতে লাগিল। ফলে, এক দিনের তরেও অমৃতবাজারের অর্থের অনাটন ঘটিল না।

দৈনিক অমৃতবাজার ব্যতীত অমৃতবাজারের সাপ্তাহিক এবং বৈদেশিক এই দুইটি সংস্করণও প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৮৬৮ সালে যশোহর অমৃতবাজার বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্ররূপে প্রথম অমৃতবাজার প্রকাশিত হয়। ১৮৭ সালে অমৃতবাজার খাটি ইংরাজী কাগজ হয়। অমৃতবাজার দৈনিক হয় ১৮ সালে। লর্ডরিপণ যখন ভারতের ভাইসরয়, তখন একদিন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটরী শিশির কুমারকে লাটভবনে যাইবার জন্য এক পত্র লিখেন। লর্ডরিপণ একজন প্রগাঢ় ধর্ম্মবিশ্বাসী বলিয়া চরপ্রসিদ্ধ। সুতরাং শিশির বা আগ্রহে বড়লাট বাহাদুরের এই আমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গমন করেন। এই আলাপে উভয়েই বিশেষ প্রীত হন। স্বায়ত্বশাসনসম্বন্ধে বড় লাট রিপণ বাহাদুর যে সকল আইন বিধিবদ্ধ করেন, শিশির বাবুর তৎপক্ষে কৃতিত্ব প্রচুর।

ভারতের ফৌজদারী বিচারপ্রথা শিশিরকুমার বাবুর পক্ষে বহু দিন হইতে এক বিষম সমস্যার বিষয় দাঁড়াইয়াছিল। শিশির বাবুর পূর্ব্বাপর ধারণা ছিল যে, ভারতে অতি দুর্ব্বল প্রমাণ-প্রয়োগের বলেই বিচারক আসামীর দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, ভারতে আসামীর যে দণ্ড দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা বিলাতের দণ্ডের তুলনায় অত্যন্ত কঠোর। তিনি ভারত গবরমেণ্টকে এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য যথেষ্ট অনুরো

করেন; তাহাতে অনেকটা সুফলও ফলে। তিনি ভারত গবরমেণ্টকে ইহাও জানান যে, এ সম্বন্ধে পরলোকগত মনোমোহন ঘোষ মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত পরামর্শদাতা। তদনুসারে বড়লাট রিপণ বাহাদুর মনোমোহন বাবুকে দণ্ড-বিধির সংস্কার সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। মনোমোহন বাবুও এক বিস্তৃত মন্তব্য লিখেন। এ মন্তব্য সমস্ত ভারতময় প্রচারিতও হয়। কিন্তু অধিকাংশ সরকারী কর্ম্মচারীই এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন; সুতরাং সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় না।

এহেন কঠোর রাজনীতিক শিশিরবাবু কিরূপে কোমলাদপি কোমল বৈষ্ণব হইলেন, রাজনীতির আলোচনা ছাড়িয়া কিরূপে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমসাগরে ডুবিয়া গেলেন, তাহা ১ম খণ্ড অমিয় নিমাই চরিতের উৎসর্গ পত্র হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। শিশির বাবু লিখিতেছেন,—

"শ্রীল হেমন্তকুমার ঘোষের প্রতিঃ—

মেজদাদা! তুমি আমাকে এই জড় জগতে রাখিয়া গোলোকধামে গমন করিলে, তাহার কয়েক দিবস পরে আমি শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী প্রকাশ করিয়াছিলাম;—

"কয়েক বৎসর গত হইল, আমরা দুই ভ্রাতা একটী শোক পাইয়া ব্যথিত হই। তখন আমরা ভাবিলাম যে, যখন সকলকে মরিতে হইবে, তখন মরিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু কি করিব, কোথায় যাইব? মরিবার জন্য প্রস্তুত কিরূপে হইতে হয়? ইহা লইয়া দুভাই ভাই চিন্তা ও বিচার করিতে লাগিলাম।

"পরিশেষে ইহা স্থির হইল যে, মুক্ত হইবার দুইটি পথ আছে। এক জ্ঞান-পথ আর এক ভক্তি-পথ। কিন্তু ইহার কোন্‌টি ভাল? কোন্ পথে আমরা যাইব? তখন ইহার কোন নিরাকরণ করিতে না পারিয়া দুই ভাই দুইটি পথ ভাগ করিয়া লইলাম। মেজদাদা লইলেন ভক্তি-পথ, আমি লই-লাম জ্ঞান-পথ। এরূপ ভাগে আমরা কেহই অসন্তুষ্ট হইলাম না। কারণ আমার মেজদাদা মধুরপ্রকৃতি, ভক্তিময়, ও সর্ব্বজীবে দয়ালু; আর আমি জ্ঞানাভিমানী, তেজীয়ান্, ভক্তি-হীন, ও হৃদয়শূন্য।

"মেজদাদার আমার অপেক্ষা অনেক সুবিধা ছিল। কারণ ভক্তি-পথ, শ্রীনবদ্বীপের শ্রীগৌরাঙ্গ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। সে পথ দিয়া অন্ধ লোকেও যাইতে পারে। অতএব তিনি শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

প্রভৃতি গ্রন্থ অতি মনোযোগের সহিত অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু আমি বড় বিপদে পড়িলাম। জ্ঞান-পথের গুরু কোথা ?

"অগ্রে আমার কথা কিছু বলিয়া লই। আমি যখন ব্যাকুল হইয়া জ্ঞান-পথের অনুসন্ধান করিতেছি, তখন শুনিলাম, বোম্বাই নগরে আমেরিকা দেশ হইতে ব্ল্যাব্যাট্স্কী নামক একটি মেম ও অলকট নামক একটি সাহেব আসিয়াছেন। ইহাঁরা পরম যোগী সিদ্ধপুরুষ, অনেক অলৌকিক ক্রিয়াও করিতে পারেন। এই কথা শুনিয়া আমি বোম্বাই নগরে তাঁহাদের নিকট যাত্রা করিলাম, ও তিন সপ্তাহ কাল তাঁহাদের গৃহে বাস করিলাম। তাঁহাদের নিকট কিছু কিছু দেখিলাম ও কিছু কিছু শিখিলাম। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া যোগাভ্যাস করিতে লাগিলাম। কিন্তু দেহ অপটু আর কলিকাতা জনাকীর্ণ স্থান। এই নিমিত্ত কৃষ্ণনগর জেলায় চুর্ণী নদীর ধারে, হাঁসখালি গ্রামে, একটি পরিত্যক্ত নীল কুঠিয়ালের বাড়ী ভাড়া লইয়া, সেখানে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলাম। আর সেখানে নির্জ্জনে কিছু কিছু মনঃসংযমের কার্য্যও অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

"এদিকে আমার মেজদাদা মহাশয় আমাদের জন্ম-স্থান যশোহর জেলাস্থ মাগুরা (অমৃতবাজার) গ্রামে, সপরিবারে থাকিয়া ভক্তিচর্চ্চা করিতে লাগিলেন ; তিনি গ্রামস্থ লো লইয়া একটী হরি-সংকীর্ত্তনের দল করিলেন। সন্ধ্যাকালে ংকীর্ত্তন করেন, আর অন্যান্য সময়ে ভক্তিগ্রন্থানুশীলন করেন। মেজদাদা মহাশয়ের ভক্তিরস ক্রমেই উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল, ও তাঁহার সঙ্গ-গুণে গ্রামস্থ অনেক লেকেও ভক্তিমান্ হইতে লাগিলেন।

"ক্রমে সংকীর্ত্তনের তেজ বাড়িয়া উঠিল। প্রথম একবার করিয়া সন্ধ্যাকালে হইতেছিল, পরে প্রাতে এবং অবশেষে আবার অপরাহ্নেও সংকীর্ত্তন হইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে মেজদাদা প্রায় অহর্নিশি সংকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

"গ্রামস্থ লোকে সেই তরঙ্গে ডুবিয়া গেলেন, এমন কি, অনেকে আপনাদের সাংসারিক কার্য্য করিতে অপারগ হইতে লাগিলেন। শেষে সংকীর্ত্তনের বিবিধ দলের সৃষ্টি হইতে লাগিল। বালকের একদল হইল, এবং স্ত্রীলোকেও কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমার মেজদাদা মহাশয় তখন সংকীর্ত্তনে দশা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

আর তখন তিনি সমুদায় বিষয় কার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ভক্তিতরঙ্গে সন্তরণ দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

"আমাদের প্রায় দুই মাস দেখা শুনা নাই। কিন্তু মেজদাদা সমস্ত দিবা কিরূপে যাপন করেন, তাহা প্রত্যহ আমাকে লিখেন। আমিও প্রত্যহ পত্র লিখি। কিন্তু আমার লিখিবার কিছু নাই, সুতরাং বিষয় কথা ব্যতীত পরমার্থ কথা কিছুই লিখি না। এমন সময় আমাকে দেখিবার নিমিত্ত, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া, মেজদাদা মহাশয় হাঁসখালিতে শুভাগমন করিলেন।

"দেখি, মেজদাদা মালা ধারণ করিয়াছেন। মুখের আকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মুখ দেখিয়া বোধ হইল যেন হৃদয়ে মলা মাত্র নাই। নয়ন দেখিয়া বোধ হইল যেন অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ খেলিতেছে। মেজদাদার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ভাবিলাম, মেজদাদা যে পথ লইয়াছেন, ইহাতে অবশ্য কিছু আছে।

"মেজদাদাকে দর্শন করিয়া বড় সুখ বোধ হইল। তিনি তখন এক সন্ধ্যা আহার করেন, মৎস্যাদি সমুদয় ত্যাগ করিয়াছেন। আমি যত্ন করিয়া তাঁহার নিমিত্ত বিবিধ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করাইলাম। মাংস রহিল না বটে, কিন্তু মৎস্যাদি বহু প্রকার রহিল। দুই ভ্রাতা ভোজন করিতে বসিলাম। মেজদাদার থালে মোটা চিঙ্গড়ী মাছের দুটা ভাজা মাথা ছিল; মেজদাদা আসনে বসিলেন। কিন্তু চিঙ্গড়ির মাথা ও অন্যান্য মৎস্যের ব্যঞ্জন দেখিয়া কাতরভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন।

"আমি বলিলাম, বৈষ্ণবগণ মৎস্যাদি খাইয়া থাকেন, তুমি কেন খাইবে না? তাহার পর বলিলাম, যে ধর্ম্মের খাইলে ধর্ম্ম যায়, না খাইলে ধর্ম্ম হয়, অর্থাৎ খাওয়ার সঙ্গে যে ধর্ম্মের ভাল মন্দ সম্বন্ধ আছে, সে ধর্ম্ম আমি মানি না।

"মেজদাদা কোন উত্তর না দিয়া কাতরভাবে আমার পানে চাহিয়া রহিলেন। তখন আমি হাসিয়া বলিলাম, ভণ্ডামি করিতে হয় বাহিরে করিও, আমার এখানে কেন? তবু মেজদাদা থালায় হাত দিলেন না। তখন বলিলাম, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ যত্ন করিয়া অতি ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিমিত্ত স্বীয় হস্তে পাক করিয়াছে। তুমি ভক্তবৎসলের পূজা কর, ভক্তের দ্রব্য কেমন করিয়া ত্যাগ করিবে? ইহাই বলিয়া একটু মৎস্য হাতে করিয়া মেজদাদার মুখে দিলাম। আমি যখন নিজ হস্তে তাঁহার মুখে মৎস্য দিতে

গেলাম, তখন মেজদাদা হাঁ না করিতে পারিলেন না। এইরূপে আমি মেজদাদার ধর্ম্ম নষ্ট করিলাম।

"দেখা অবধি দুইজনে কথা চলিতেছে। এক মুহূর্ত্তও ফাঁক নাই। কখন সুখ দুঃখের কথা বলিতেছি। ধর্ম্মের কথা আরম্ভ হইলে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। এইরূপে সারাদিন তর্কে গেল। আমি মেজদাদাকে বলিলাম, তোমার গৌর আমার বড় প্রিয় বস্তু। যদিও তাঁহার মতের সহিত আমার সমুদায় মিলে না, তবু তাঁহার নাম করিলে আমার আনন্দ হয়। কিন্তু তিনি যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছেন, সে স্ত্রীলোকের কি দুর্ব্বলচেতা মনুষ্যের জন্য। তেজস্বী পুরুষের স্ত্রীলোকের মত কান্দিলে চলিবে কেন? পুরুষে জ্ঞান চর্চ্চা করিতে পারিলে আর কান্নাকাটীর মধ্যে কেন যাইবে?

"ভক্ত-পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতেছেন যে, তখন আমার শ্রীগৌরাঙ্গে বিশ্বাস ছিল না। এমন কি মেজদাদা যদিও হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, তবু তিনিও তখন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুকে পূর্ণব্রহ্ম বলিয়া স্বীকার করিতেন না। সে যাহা হউক, জ্ঞান বড় না ভক্তি বড়, এই কথা লইয়া তর্ক হইল। আমি বলি জ্ঞান বড়, মেজদাদা বলেন ভক্তি বড়। কিন্তু মেজদাদা আমার সহিত কখন তর্কে পারিতেন না। তবে আমার আন্তরিক টান বরাবরই ভক্তির প্রতি ছিল।

"মেজদাদা যদিও তর্কে পারিলেন না, কিন্তু আমি মনে বুঝিলাম যে, তিনি অগ্রবর্ত্তী হইয়াছেন, আর আমি পাছে পড়িয়া গিয়াছি। ফল কথা, মেজদাদাকে দেখিয়া আমি বেশ বুঝিলাম, তিনি আমার অপেক্ষা অনেক ভাল হইয়াছেন। এমন কি, আমি তাঁহার মত হই নাই বলিয়া মনে মনে বড় দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু মুখে আমি তাহা স্বীকার করিলাম না। ইহা আমার মনে মনে রহিল। মুখে আস্ফালন করিতেছিলাম, কিন্তু মনে বেশ বুঝিলাম যে তিনি আমার অপেক্ষা অনেক বড় হইয়াছেন, আর গৌরাঙ্গের মতই ভাল।

"বিকালে দুই ভাই গাড়ীতে বেড়াইতে গেলাম। গাড়ীতেও ঐ কথা। ফিরিয়া আসিতে রাত্রি হইল। তখন গাড়ী মধ্যে কথাবার্ত্তা বন্ধ হইল। মেজদাদা আপনার ভাবে রহিলেন, আমি আমার ভাবে রহিলাম।

"একটু পরে মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া একটি গীত গাহিতে লাগিলেন। গীতটীর সমুদায় কথা বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু কথা বুঝিবার প্রয়োজন হইল না। সেই গীতটী আমার হৃদয় কোমল, ও শ্রবণ তৃপ্ত করিতে লাগিল।

ফল কথা, ভক্তের কণ্ঠস্বর একরূপ মন্ত্রবিশেষ। ভক্তের শুদ্ধ কণ্ঠস্বরেই জীব মাত্রের হৃদয় স্পর্শ করে।

"মেজদাদা গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছেন, আর আমার বোধ হইতেছে যেন, শ্রীভগবান্ আমার হৃদয়ে বসিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন। আমি মনোনিবেশপূর্ব্বক সেই করুণ ও মধুর স্বর শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে উহা আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর ক্রমে আমাকে অস্থির করিতে লাগিল। সেই গুন্ গুন্ স্বরটী শেষে হৃদয়ে রহিয়া গেল,—অদ্যাপি আছে।

"মেজদাদা যে গীতটী গাইতেছিলেন, তাহা আমি পরে শিখিয়াছিলাম। সে গীতটী তাঁহার নিজের কৃত। সেটী এই—

হা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধূলায় পড়িল গোরা।
ধূলায় ধুসরিত অঙ্গ দুনয়নে বহে ধারা॥
ক্ষণেক চেতন পায়, বলে আমার কৃষ্ণ নাই,
এই ছিল কোথা গিয়া লুকাইল মনচোরা॥
হা হরি হরি হরি, হরি তুমি কোথা হে,
তুমি আমার প্রাণধন তুমি আমার নয়নতারা॥

"শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাঘটিত গীত পূর্ব্বে মহাজনগণ কিছু কিছু প্রস্তুত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে প্রথা একেবারে লোপ হইয়া গিয়াছিল। সেই প্রথা মেজদাদা কর্ত্তৃক পুনর্জ্জীবিত হইল। এখন উপরি উক্ত আদি গীতটী দেখা দেখি কত শত গৌরাঙ্গ-লীলা ঘটিত পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

"সে যাহা হউক, পর দিবস মেজদাদা বাড়ী চলিয়া গেলেন। তিনি গেলেন বটে, কিন্তু কিছু রাখিয়া গেলেন। তাঁহার সেই করুণ স্বরটুকু আমার হৃদয়ে রহিয়া গেল মেজদাদা বাড়ী যাইয়া আমাকে এক পত্র লিখলেন, তাহার ভাবার্থ এই ;—'শিশির! আমি জুড়াইবার নিমিত্ত তোমার কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে জুড়াও নাই।'

"মেজদাদার এই পত্রে আমি মর্ম্মাহত হইলাম। কারণ, আমি বুঝিলাম যে, যে মেজদাদা যে কথা লিখিয়াছেন তাহা সমুদায় ন্যায্য। আমি আগেও বুঝিয়াছিলাম, তখন আরো বুঝিলাম যে, আমি বৃথা জ্ঞানের কথা বলিয়া মেজদাদার হৃদয়ে বড় ব্যথা দিয়াছি। তখন হৃদয় মাঝারে সেই গুন্ গুন্ শব্দটী আরো

"তখন ভাবিলাম, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রিয় বস্তু, আর মেজদাদাও আমার প্রিয় বস্তু। এ উভয়ের অনুরোধে আমার শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা কিছু জানা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বেও গৌরাঙ্গের লীলা কিছু কিছু শুনিয়াছিলাম, এবং শুনিয়া উহার প্রতি বড় লোভ জন্মিয়াছিল। যখনই গৌরাঙ্গ-লীলা শুনিতাম, তখনই উহা আমার নিকট মধু হইতেও মধু লাগিত।

"আর বিলম্ব না করিয়া কলিকাতা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ পাঠাইতে লিখিলাম, আর মেজদাদার পত্রের উত্তর দিলাম। মেজদাদাকে যাহা লিখিলাম, তাহার ভাবার্থ এই,—'এবার তুমি আমার সঙ্গে যে দুঃখ পাইয়াছ, অন্য বারে আমি তাহা দূর করিব। বিচিত্র কি, হয়ত আমিও তোমার মত হরিবোলা হইব।

"শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ খানি আসিল। আমি উহার প্যাকেট খুলিলাম। পুস্তক খানি হাতে করিলাম, আর কি জানি কেমন আমার অঙ্গ দিয়া যেন একটি আনন্দের লহরী চলিয়া গেল। পিপাসাতুরের জল পান করিয়া যেরূপ অঙ্গ শীতল হয়, পুস্তক খানি স্পর্শ করিয়া সেইরূপ আমার তাপিত হৃদয় শীতল হইল। আমি চৈতন্যভাগবত অল্প অল্প করিয়া পড়িতে লাগিলাম। অল্প অল্প বলি কেন, না, অতি অল্পেই আমার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল।

"মেজদাদা মহাশয় কখন কখন আবিষ্ট হইতেন, ও আবিষ্ট হইয়া আমাকে পত্র লিখিতেন। সে সমুদায় পত্র গুলি যেন তাঁহার হৃদয়ে কে প্রবেশ করিয়া লেখাইতেন। সেই আবিষ্ট অবস্থার আদেশ গুলি আমি বড় মান্য করিতাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মেজদাদাকে আমি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, পুনরায় সাক্ষাৎ হইলে আর তাঁহাকে দুঃখ দিব না। সেই পত্রের উত্তর আসিল।

"তখন সকালবেলা, প্রায় আটটার সময়। আমি ঘরে একলা আছি। আমার ঘরের মেঝে বাঁসের চাচ দ্বারা মণ্ডিত। মেজদাদার পত্রখানি খুলিলাম, তাহাতে যাহা লেখা ছিল তাহার ভাবার্থ এই,—'শিশির! কোন দেবতা, আমি তাঁহাকে চিনি না, আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া বলিলেন যে, তোমার কনিষ্ঠ শিশির, ওটি শ্রীগৌরাঙ্গের চিহ্নিত দাস। ঐ দেহ দ্বারা মহাপ্রভুর অনেক কার্য্য সাধন করিবেন।'

"এই পত্রখানি পড়িয়া আমি সেই চাঁচের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম।

"একটু পরে উঠিয়া বসিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমি এই মাত্র

বলিয়াছি যে, মেজদাদা এরূপ আবিষ্ট হইয়া আমাকে যে উপদেশগুলি পাঠাই-তেন, আমি তাহা বিশ্বাস করিতাম। মেজদাদার পত্রে সুতরাং যাহা লেখা ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করিলাম। কিন্তু আমি মনে মনে এইরূপ ভাবিলাম, 'এ আবার শ্রীভগবানের কি লীলা? প্রেম-ভক্তি প্রচারের কি আর দেহ মিলিল না? আমি কঠিন, কর্কশ, ভক্তিশূন্য, রাজনীতি লইয়া বিব্রত। ইংরাজি পড়িয়া এক প্রকার নাস্তিক হইয়াছি।' আবার ভাবিলাম 'আমা দ্বারা শ্রীভগবান্ প্রেম-ভক্তি প্রচারের কার্য্য করিবেন, তা তাঁহার বিচিত্র কি? তিনি ইচ্ছা করিলে অন্ধের দিব্য-চক্ষু হয়। তাঁহার ইচ্ছা হইলে এই পাষাণবৎ হৃদয়ে ভক্তির অঙ্কুর হইবে, তাহার বিচিত্র কি?

"আমার এখন বোধ হয় যে, সেই পত্রখানি দ্বারা মেজদাদা মহাশয় আমাকে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিলেন।

"আমি তখন অতি কাতর ভাবে করযোড়ে শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলাম যে, ভগবান্! যদি তুমি অসাধনে, কেবল আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, দয়াদ্র্র হইয়া, নিজ গুণে, আমার প্রতি এরূপ কৃপা কর, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথাসাধ্য সরল মনে, তোমার চরণ ভজন ও জগতে তোমার গুণগান করিব।"

উপরি উক্ত প্রস্তাবটী ১২৯৯ সালের চৈত্রে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মেজদাদা! তুমি আবিষ্ট হইয়া পত্রে আমাকে যাহা যাহা লিখিয়াছিলে তাহা আমি লজ্জাক্রমে সব প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

আমি শ্রীগৌরাঙ্গলীলা লিখিব কি তাঁহার চরণ আশ্রয় করিব, ইহা যখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তখন তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে, আমার ভাগ্যে সে ফল লেখা আছে। সেই তোমার শ্রীমুখের বাক্য এখন সফল হইতেছে। অতএব তোমার কনিষ্ঠের এ পরিশ্রমের ধন আর কাহাকে দিব? তুমিই গ্রহণ কর।

তুমি যদি এই জড় জগতে এখন থাকিতে, তবে এই গ্রন্থের প্রতি অক্ষর লইয়া আমার সহিত বিচার করিতে। তুমি আমি দুজনে একত্র হইয়া ভজন করিতাম। এখন তুমি নাই, কাযেই ব্যথার ব্যথী নাই, আমার ভজনও নাই যখন হৃদয় শুষ্ক হইত, তখন তোমার মুখপানে চাহিলেই আমার রসের উদয় হইত। এখন আমার সে সম্পত্তি কিছুই নাই। একে রোগে জীর্ণ শীর্ণ দে[illegible] তাহাতে তোমার বিরহে হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তবু যে আ[illegible]

লিখিতেছি, তাহার কারণ এই যে আমি আর এ জগতের এরূপ একটি কার্য্য ব্যতীত কিরূপে সময় যাপন করিব ?

এই গ্রন্থ লিখিবার সময় তুমি এ জগতে ছিলে না, কাজেই আমার এ গ্রন্থ সম্বন্ধে সমুদায় কথা তোমাকে বলিতে পারি নাই, তাহা এখন বলিতেছি।

শ্রীগৌরাঙ্গ, ভক্ত কি ভগবান্ তাহা লইয়া বিচার করিবার এখানে আবশ্যক নাই। যে জন অন্তরের সহিত শ্রীভগবানকে করুণাময় বলেন, তাঁহার নিকট শ্রীভগবানের অবতার অসম্ভব নয়। যাঁহারা মুখে তাঁহাকে করুণাময় বলেন, মনে মনে ভাবেন যে, এ ক্ষুদ্র নর-সমাজে তিনি আসিবেন কেন, তাঁহারা অবশ্য অবতার মানিতে পারেন না। যাঁহারা মনের সহিত বিশ্বাস করেন, যে শ্রীভগবান প্রকৃতই দয়াল, তাঁহাদের এ কথা বিশ্বাস করিতে আপত্তি কি যে তিনি আমাদের মধ্যে আসিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তাঁহার সহিত যদি মিলন প্রয়োজন হয়, তবে যখন আমরা তাঁহার মত বড় হইতে পারি না, কি আমরা তাঁহার কাছে যাইতে পারি না, তখন তাঁহারই আমাদের মত ছোট হইয়া আমাদের কাছে আসিতে হয়।”

দেখিয়াছি, শিশিরকুমারের অমিয় নিমাই চরিত এবং কালাচাঁদ গীতা পড়িয়া, রসিক পাঠক কাঁদিয়া আকুল হইয়াছেন; শুনিয়াছি, শিশির বাবুর ইংরেজী ভাষায় লিখিত লর্ড গৌরাঙ্গ পড়িয়া আমেরিকার অনেকে গৌরাঙ্গ-মহিমায় বিমুগ্ধ হইয়াছেন। শিশির বাবু এখন ইষ্ট ভজনাতেই অষ্টপ্রহর বিভোর রহেন; সাংসারিক অহেতুক জন-প্রসঙ্গ এখন তাঁহার বড়ই অপ্রিয়।

রাজকৃষ্ণ রায়।

সন ১৮৬২ সালে কলিকাতার যোড়াসাঁকো-পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে একটি সামান্য খোলার ঘরে রাজকৃষ্ণ রায় অবস্থান করিতেন। শুনিয়াছি, ইহাঁর নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর।

শৈশবে ইনি মাতৃহীন হন, তখন ইহাঁর প্রতিপালনভার অন্য একটী স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পিত হয়। অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমের সময় ইহাঁর পিতারও দেহান্তর হয়। পিতার জীবদ্দশা পর্য্যন্ত অষ্টম বৎসরের বালক রাজকৃষ্ণ যোড়াসাঁকোর একটী পাঠাগারে গিয়া লেখা পড়া করিয়া আসিতেন, ; পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার মাতৃষ্বসা তাঁহার লালন-পালনের ভার লয়েন ; যথাসম্ভব শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করেন।

দুঃখ রাজকৃষ্ণের চিরসহচর ছিল। একদিকে মূর্ত্তিমতী কবিতা দেবী তাঁহার যেমন কণ্ঠলগ্ন ছিলেন, মূর্ত্তিময় দুঃখ-সহচরও সেইরূপ তাঁহাকে মুহূর্ত্তেক মাত্র ছাড়িতে পারে নাই। ফল কথা, রাজকৃষ্ণ জন্মাবধি দারিদ্র্য লইয়াই সংসারে বিচরণ করিয়াছিলেন। শৈশবে পিতার অবস্থা শোচনীয় ছিল ; যোড়াসাঁকো অঞ্চলের কোন ধনাঢ্যের গৃহে সামান্য চাকুরী করিয়া তিনি জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার পর পিতৃমাতৃহীন রাজকৃষ্ণ যে মাতৃষ্বসার আশ্রয় পাইলেন, তিনি স্বামিবিয়োগ বিধুরা, সহায়সম্পত্তিহীনা ;—কপর্দ্দক মাত্র সংস্থান তাঁহার ছিল না। রাজকৃষ্ণের পিতা মৃত্যুকালে সামান্য কিছু রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা এবং তাঁহার মাতৃষ্বসার দৈহিক পরিশ্রমজাত কিছু কিছু উপার্জ্জনই রাজকৃষ্ণের প্রতিপালন ও শিক্ষার অবলম্বন হইল। পিতৃমাতৃ-জ্ঞাতি-কটুম্ববিহীন রাজকৃষ্ণের এইরূপে বাল্যজীবন অতিক্রান্ত হয়।

বাল্য বা অধ্যয়নের জীবন অতিক্রম করিয়া, রাজকৃষ্ণ ২১ বৎসর বয়সের সময় সন ১২৮৩ সালে আলবার্ট প্রেসের ম্যানেজারের কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার বেতন বড় অধিক ছিল না। সামান্য বেতনে সামান্যভাবে চোরবাগা-নের এক বাসা বাড়ীর নিম্নতলের একটি ক্ষুদ্র কুঠরীতে এই সময় ইনি অব-স্থিতি করিতেন। এই সময়ে শালকিয়া গ্রামে ইহাঁর বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ইহার পর স্বাধীনচেতা রাজকৃষ্ণের চাকুরী করা আর পোষাইল না; পোষাইলেও তাহাতে অন্নের সঙ্কুলান হইল না, তিনি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে "বীণাপ্রেস" নামে একটি ছাপাখানা স্থাপিত করিলেন। এই ছাপাখানা হইতে তাঁহার অর্থাগমের সুবিধা বড় একটা হইল না বটে; কিন্তু ইহারই ফলে তাঁহার কার্য্যসুরভি দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

সন ১৮৮১ সালে ইহাঁর প্রথম কবিতাপুস্তক "স্তবমালা" বাহির হয়। ইহার পূর্ব্বে "এডুকেশন গেজেটে" ইহার কয়েকটী মাত্র কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পর বৎসর ১৮৮২ সালে "নাট্যসম্ভব" নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা প্রকাশিত হয়। এই ক্ষুদ্র উপরূপক নাটিকা খানি প্রকাশ হইবার সময়ই,—কালে ইনি যে একজন প্রতিভাবান্ কবি হইতে পারিবেন, তাহা সকলেই বুঝিয়া ছিল। এই বৎসরই ইনি "পতিব্রতা" নাম্নী একখানি গীতি-নাট্য এবং ভারতে বর্ত্তমান সম্রাট প্রিন্স অব ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে "ভারতে যুবরাজ" নামক কবিতা পুস্তক রচনা করিয়া প্রকাশ করেন।

ইহার পর সন ১২৮৩ সালে তাঁহার "অবসর সরোজিনী" প্রকাশিত হয়; এ গ্রন্থের কবিত্বশক্তিপ্রভাবে সকলে চমৎকৃত হইল। ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যে রাজকৃষ্ণ বাবু "নিশীথ চিন্তা" "নিভৃত নিবাস" "ভারত গান" "অবসর সরোজিনীর" ২য় ভাগ প্রভৃতি ৪।৫ খানি উৎকৃষ্ট কবিতা পুস্তক লিখিয়া ফেলিলেন। বীণা প্রেস হইতে ঐ সময় সে গুলি প্রকাশিতও হইল, রাজকৃষ্ণ সাধারণ্যে বিলক্ষণ যশস্বী এবং কবি বলিয়া পরিগণিতও হইলেন।

রাজকৃষ্ণ বাল্যাবধি কবিত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার "অবসর সরোজিনী" প্রভৃতির কোন কোন কবিতা কাব্য জগতে উজ্জ্বল রত্ন।

অবসর সরোজিনীর ২য় ভাগ প্রকাশিত হওয়ার পর কবি দেখিলেন, প্রকৃত কবিতায় যশোরাশি লাভ ঘটিলেও, কবিতা পুস্তক বাজারে বড় বিকায় না;— বাঙ্গলা দেশে সাধারণতঃ উপন্যাসের যত আদর, কবিতার আদর তত নহে। লোকে উপন্যাসই আগ্রহে পড়িতে চাহে। এরূপ অবস্থায় এখনকার দিনে বাঙ্গালা সাহিত্য বাজারে নভেল লিখিলে অর্থাগম হইতে পারে। ফলে কবি, কাব্য ছাড়িয়া উপন্যাস লিখিতে যত্নবান্ হইলেন। সন ১২৮৬ সালে

"কিরন্ময়ী" "জ্যোতির্ম্ময়ী" ও "অদ্ভুত ডাকাত" নামক ইহাঁর আর তিনখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এ গুলি প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি তাঁহার জনৈক সুহৃদের পরামর্শ ক্রমে "কবিতা কৌমুদী" "সরল কবিতা" "শিশু কবিতা" প্রভৃতি ৩।৪ খানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখেন।

এই সময় ভারতে রুষ আসিতেছে বলিয়া একটা গুজব উঠে। অর্থাগমের সুবিধা হইবে ভাবিয়া ইনি সেই সময় "রুষের ইতিহাস" লেখেন। তাহার পর প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার দৃষ্টি পড়ে; ইনি "ভারতকোষ" নামক একখানি বৃহৎ অভিধানের সম্পাদন করিতে থাকেন। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক বহুল তত্ত্ব ইহাতে প্রকটিত।

অনেকগুলি পুস্তক লিখিত হইল, প্রকাশিত হইল, কিন্তু বাজারে তেমন বিক্রয় হইল না। রাজকৃষ্ণ ভাবিয়া ছিলেন, পুস্তক হইতে তাঁহার দারিদ্র্য যন্ত্রণার অবসান হইবে, কিন্তু তাহা হইল না; বরং দিন দিন সে যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সুপ্রসিদ্ধ বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এজন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি অনেক চিন্তার পরে রাজকৃষ্ণের ১ম ভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন। পুস্তক বাহির হইল।

প্রথম সংস্করণের পুস্তকগুলি অল্পদিনেই ফুরাইয়া গেল। তাহার পর দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০ সহস্র ছাপা হয়, তাহাও শীঘ্রই ফুরাইয়া গেল; এমন কি সংবাদপত্রে এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন দিতে হয় যে, "আর কেহ মূল্য পাঠাইবেন না, গ্রন্থাবলী আর নাই।" এই গ্রন্থাবলী রাজকৃষ্ণের জীবদ্দশায় পঞ্চম সংস্করণ পর্য্যন্ত ছাপা হয়।

পুস্তক বিক্রয়ের দ্বারা এই সময় ৩।৪ মাসকাল তিনি অর্থের মুখ দেখিতে পান। প্রেসের কার্য্যও এই সময় তাঁহার উত্তমরূপ চলিতে থাকে। রাজকৃষ্ণের দুঃখময় জীবনে এই সময়ই যাহা কিছু সুখ হইয়াছিল।

ইহার পর তাহাঁর ক্রমে ক্রমে সাতভাগ গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রন্থাবলীগুলি প্রথম সংস্করণের ন্যায় আদরণীয় হয় নাই। এই সাত-ভাগ গ্রন্থাবলীতে ছোট বড় ৯৪ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথমভাগ গ্রন্থাবলী,—রাজকৃষ্ণের দেহান্তরের পর অদ্যাপি আর এক সংস্করণ মাত্র

সন ১২৯২ সালের ২৬শে আশ্বিন "বঙ্গ রঙ্গভূমি'তে ইঁহার "প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। নাট্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন, রাজকৃষ্ণের এই প্রহ্লাদ চরিত্র "বঙ্গ রঙ্গভূমি'র উজ্জ্বল রত্ন। এই পুস্তকের অভিনয়েই "বঙ্গ রঙ্গভূমির" কর্ত্তৃপক্ষগণ এক সময়ে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন। উক্ত নাটকের ভূমিকায় কবি লিখিয়াছেন,—"এক 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকের অভিনয়ে লক্ষাধিক দর্শক হইয়াছে এবং উক্ত থিয়েটার কোম্পানী পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রথম অভিনয় কালে তাদৃশ আদরণীয় হয় নাই। শুনিয়াছি, রাজকৃষ্ণের সহিত বঙ্গ রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত বন্দোবস্ত ছিল যে, প্রথম দশটি অভিনয় রজনীতে যত টাকার টিকিট বিক্রয় হইবে, তিনি তাহার শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন পাইবেন। কিন্তু ভালরূপ টিকিট বিক্রেয় না হওয়ায় তিনি ইহাতে লাভবান্ হইতে পারিলেন না। ইহার উপর উক্ত রঙ্গভূমিতে প্রহ্লাদ চরিত্র নাটকের অভিনয় আরম্ভের পর ৩।৪ মাস কাল উক্ত রঙ্গভূমির কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার নিকট হইতে আর কোন পুস্তক লইলেন না। ইহাতে তাঁহার বড় অসুবিধা হইল। তিনি বঙ্গ-রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণের নিকট একটি প্রথম শ্রেণীর অংশ প্রার্থনা করিলেন। তখন ঐ অংশের মূল্য প্রায় ১০০৲ টাকা, সুতরাং অধ্যক্ষগণ তাহাতে সম্মত হইলেন না। ইহারই ফলে রাজকৃষ্ণের বীণা থিয়েটারের সৃষ্টি।

এই বীণা থিয়েটারই তাঁহার কালস্বরূপ হইয়াছিল। অভিনেত্রীগুলির জন্য কোন কোন থিয়েটারে অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হয় ভাবিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বীণা থিয়েটারে তিনি বালকের দ্বারা অভিনয় করান স্থির করিলেন। ফলে বীণা থিয়েটার হইতে তিনি বিলক্ষণ ঋণজালে জড়িত হইলেন। স্ত্রীপুত্রের যে কিছু অলঙ্কার ছিল, তাহা বিক্রীত হইল, তদ্ভিন্ন থিয়েটার গৃহ ও ছাপাখানা বেচিয়া বড় বড় মহাজনদের দেনা কোনরূপে পরিশোধ করিয়াছিলেন। এই ঋণের জ্বালায় কাগজ ছাপাইয়া তাঁহাকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থীও হইতে হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তাহাতে বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায় নাই। এই সময় নানারূপ দুশ্চিন্তায় ও দুর্ভাবনায় ইঁহার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়,—তাহারই ফলে, দেহও যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিবার সংকল্পও

লাগিলেন,—"প্রভো, আমার অদৃষ্টে কি মৃত্যু নাই?" ঠিক এই সময় ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় রাজকৃষ্ণের সহায় হইলেন। সেই সহায়তার ফলে ষ্টার থিয়েটারে তাঁহার আশ্রয় মিলিল। রুগ্ন শয্যায় পড়িয়াও এই সময় তিনি "নরমেধ যজ্ঞ" "লয়লা মজনু" "ঋষ্যশৃঙ্গ" 'বনবীর' ও "বনজীর বদরেমুনীর" এই পাঁচখানি নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করেন। অদ্যাপি ষ্টার থিয়েটারে ঐ পুস্তকগুলির অভিনয় মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

ঐ পুস্তকগুলির মধ্যে নরমেধ যজ্ঞের কুশীদজীবি মণিদত্তের চরিত্র কবির হাড়ে হাড়ে গাঁথা ছিল। সেইজন্যই নরমেধযজ্ঞে ঐ চরিত্র সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর-রূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। নরমেধযজ্ঞের অভিনয় দেখিয়া জনৈক ভয়ঙ্কর সুদখোর মহাজন রাজকৃষ্ণের সমস্ত সুদ রেহাই দিয়াছিলেন।

এই সকল পুস্তক ব্যতীত রাজকৃষ্ণ সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের যে সুন্দর পদ্যানুবাদ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। কবিবর রাজকৃষ্ণ যদি আর কোন পুস্তক না লিখিয়া কেবল এই দুই খানি পুস্তক লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমরত্ব লাভ করিতেন। এইরূপ আধি-ব্যাধি সংজড়িত হইয়াই রাজকৃষ্ণ দেহ ত্যাগ করিলেন।

তাঁহার কার্য্য শক্তি দেখিয়া বাস্তবিক অবাক্ হইতে হয়। দারিদ্র্য যত দূর চরমে উঠিতে হয়, তাহা তাঁহার উঠিয়াছিল। সেই চরম দারিদ্র্যে সাহিত্যের অনুশীলনে স্বতই নানা বিঘ্ন ঘটিবার কথা। কিন্তু তিনি সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সেই সাহিত্য অনুশীলনে যেরূপ চরম উন্নতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা বস্তুতই অত্যদ্ভুত। অতি প্রত্যুষে আরম্ভ করিয়া কোন্ দিন দশটা, কোন দিন পাঁচটা পর্য্যন্ত তিনি অবিশ্রান্ত লিখিতেন, সে লেখায় তাঁহার কিছুমাত্র কষ্টবোধ হইত না; জ্বর গায়েও তিনি রামায়ণের পদ্যানুবাদ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন,—এমনও শুনিয়াছি।

সন ১২৮৫ সালে "নিভৃত নিবাস" নামে ইহাঁর আর একখানি কাব্য গ্রন্থ বাহির হয়। ইহা ভাঙ্গা আমত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত। রাজকৃষ্ণ তৎকৃত "হরধনু —পত্রিকায় লিখিয়াছেন যে, তিনিই প্রথমে তাঁহার "নিভৃত নিবাসে"

রাজকৃষ্ণের সকল পুস্তকই চিরকাল বাঙ্গালা সাহিত্য-কাননে অপূর্ব্ব শোভা বর্দ্ধন করিবে। রাজকৃষ্ণ রায় পদ্যে গদ্যে রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি অতিদ্রুত পদ্য রচনা করিতে পারিতেন। জ্বরের যন্ত্রণায় অস্থির,—এদিকে প্রেসে কাপি চাহি,—সে অবস্থাতেও রাজকৃষ্ণ অনর্গল পদ্য বলিয়া যাইতেছেন,—দুইজন লেখকও তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিতেন না; রাজকৃষ্ণের প্রতিভা এমনই প্রবলা ছিল। ইনি স্বপ্রণীত পদ্যানুবাদ রামায়ণ ও মহাভারতে বিবিধ বিষয়ক যে সকল টীকা টিপ্পনী সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন,—তাহা বঙ্গসাহিত্যে বস্তুতই বড় আদরের সামগ্রী। ইঁহার 'ঘোড়ার ডিম' 'কুপোকাৎ' প্রভৃতি খোস গল্পের নাচুনী ছন্দ বস্তুতই বড় মনোহারা। ঘোড়ার ডিমের সেই,—

নাইকো রাতি, নিবিয়ে বাতি, উষা সতী এলো।
মলিন মুখে, মনের দুখে, আঁধার চলে গেলো॥
সূয্যি মামা, রাঙা জামা, পরলো টেনে গায়।
থেকে থেকে, রাঙা চোকে, পাহাড় পানে যায়॥"

ইত্যাদি এখনও অনেকে আদরপূর্ব্বক আবৃত্তি করিয়া থাকে।

রাজকৃষ্ণ রায়ের এক পুত্র,—এক কন্যা। ইঁহাদিগকে লইয়া রাজকৃষ্ণ রায়ের সহধর্ম্মিণী এক্ষণে কাশীবাসিনী।

নিখিলনাথ রায়।



জেলা ২৪ পরগণায় বসিরহাট সবডিভিসানের অন্তর্গত ইচ্ছামতা নদীতীরস্থ পুঁড়াগ্রাম আমার জন্মভূমি। এই পুঁড়া অতি প্রাচীন গ্রাম। আইনা আকবরিতে সরকার সাতগাঁয়ের মধ্যে পুঁড়া একটী মহাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রামভদ্র রায় যশোহরের ফৌজদার নূর উল্লা খাঁর দেওয়ান ছিলেন। নূর উল্লা খাঁ সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর আদেশে সভাসিংহের বিদ্রোহদমনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। [illegible]

শেষ ভাগে এই বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। রামভদ্র রায়ের পূর্ব্বনিবাস বরিশাল জেলায় ছিল। তিনি কার্য্যোপলক্ষে পুঁড়ায় আপনার বাসস্থান স্থাপন করেন। রামভদ্র রায়ের সময়ে বসন্তরায় ও প্রতাপাদিত্য স্থাপিত যশোহর বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায়, তিনি তাহার সংস্কার করিয়াছিলেন। তদবধি রামভদ্র বংশীয়েরা যশোহর সমাজে সামাজিক মর্য্যাদায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। রামভদ্র আমিরাবাদ নামক পরগণায় জমীদারী লাভ করিয়াছিলেন। পুঁড়া উক্ত আমীরাবাদ পরগণার অন্তর্গত। রামভদ্র বংশীয়েরা অদ্যাপি আমীরাবাদ পরগণার জমিদারী ভোগ করিতেছেন। রামভদ্রের পুত্র রুদ্রদেব অত্যন্ত শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তিনি নানাবিধ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রামভদ্র ও রুদ্রদেবের চেষ্টায় পুঁড়ায় অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ বাস করিয়াছিলেন; পুঁড়ায় এক কালে অনেক চতুষ্পাঠী বিদ্যমান ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের অন্যতম প্রধান পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার পুঁড়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ অদ্যাপি পুঁড়ার পূর্ব্ব গৌরবের ঘোষণা করিতেছেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয় রামভদ্রবংশীয়গণের কুলপুরোহিত। উক্ত বংশীয় পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ন্যায়রত্ন মহাশয় ২৪ পরগণার একজন প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত।

আমার প্রপিতামহ হরিদেব রায় মহাশয় মহিষাদলের রাজবাটীতে দেওয়ানী কার্য্য করিয়াছিলেন। পিতামহ গোবিন্দদেব রায়ও মহিষাদলের অন্যতম কর্ম্মচারী ছিলেন। খুল্লপিতামহ কৃষ্ণদেব রায় হইতে প্রসিদ্ধ তিতুমীরের হাঙ্গামার উৎপত্তি হয়। পিতৃদেব জানকীনাথ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া অনেক সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালাভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। সুপ্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। গুপ্তকবি তজ্জন্য দুই একবার পুঁড়ায় পদার্পণও করিয়াছিলেন। পিতৃদেব কবিতা, গান ও কীর্ত্তনাদি অনেক রচনা করিয়াছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তাঁহার যথেষ্ট চেষ্টা ছিল। তাঁহার চেষ্টায় পুঁড়ায় ছাত্রবৃত্তি ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বেথুন সাহেবের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। আমার কিঞ্চিৎ ন্যূন দুই বর্ষ বয়সের সময় পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। পিতৃদেবের মৃত্যুর পর আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর চন্দ্রনাথ বহরমপুরে মাতৃস্বসার আশ্রয়ে পালিত হইয়া বহরম-

করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃদেবের জীবিত অবস্থায় পুঁড়া স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এফ, এ পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি বিষয় কর্ম্ম পরিদর্শনের জন্য বাটী আসিলেন। আমি স্নেহময় জননীর চেষ্টায় লালিত পালিত হইয়া, পুঁড়ার আদর্শ ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, তাহার পর ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে আমার মাতৃষসার নিকট আগমন করি। আমার মাতৃষসা বহরমপুরের জমীদার সুপ্রসিদ্ধ সেন মহাশয়ের বাটীতে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী বিশ্বম্ভর সেন মহাশয় আমার পিতৃদেবের পিতৃষস্পুত্র এবং ডাক্তার রামদাস সেনের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র। আমি যখন বহরমপুরে আসিয়াছিলাম, তখন বিশ্বম্ভর সেন মহাশয় স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। আমার মাতৃষস্পুত্র শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ সেন মহাশয়ের যত্নে আমি ইংরাজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করি। আমি প্রথমতঃ খাগড়া মিসনরি স্কুলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। বাল্যকাল হইতে আমি একটু একটু কবিতা লিখিতে পারিতাম। বহরমপুরে আসিয়া আমার কবিতা লেখার বেগ বর্দ্ধিত হয়। অনেকে তজ্জন্য আমাকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই বেগ ক্রমে বর্দ্ধিত হওয়ায়, আমি রাজপুত কুসুম নামে একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করি। তাহাতে দ্বাদশটী রাজপুত রায়ের কীর্ত্তি, কবিতায় রচিত হইয়াছিল। ১২৯১ সালে রাজপুত কুসুম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। যদিও আমি কবিতা পড়িতে ও লিখিতে ভাল বাসিতাম বটে, কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ইতিহাসই আমার আদরের পাঠ্য ছিল। রাজপুত কুসুম ইতিহাস ও কবিতা উভয়ের প্রতি অনুরাগেরই ফল। এই পঠদ্দশাকালে আমি রাজস্থান, সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস ও অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ আদরের সহিত পাঠ করিতাম, এবং বহরমপুরের ভাগীরথীতীরে বন্ধুগনের সহিত মিলিত হইয়া এই বিষয়ের আলোচনা করিতাম। এই সময় হইতে আমি বহরমপুর, কাশীমবাজার ও কোন কোন সময়ে মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া, তৎসম্বন্ধে গল্প গুজবাদি শুনিতে ভাল বাসিতাম। এই সময়ে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা দেশের মধ্যে বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। আমরাও সেই স্রোতে বিচলিত হইয়াছিলাম। তজ্জন্য রাজপুতকুসুম সুরেন্দ্র বাবুর নামে উৎসর্গীকৃত হয়। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা স্রোতে বিচলিত হইলেও, আমি সে বক্তৃতায় স্বদেশের প্রতি একটা অনুরাগের আভাস পাইছিলাম। তাহার ফলে আমার ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করিলাম

সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতায় আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল; সেই সময়ে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মান্দোলন বঙ্গদেশে এক নূতন স্রোত প্রবাহিত করিয়াছিল। বহরমপুরও সেই স্রোতে ভাসমান হয়। বহরমপুর তাঁহাদের একটি প্রিয় স্থান ছিল; তাঁহাদের যত্নে বহরমপুরে একটি 'সুনীতি সঞ্চারিণী' সভা স্থাপিত হয়। আমি তাহার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলাম। এই সভা হইতে আমার কবিতারচনা দিন দিন বর্দ্ধিত ও প্রবন্ধ রচনা আরব্ধ হয়, এবং বক্তৃতা করিতেও শিক্ষা করি। ফলতঃ এই সুনীতিসঞ্চারিণী সভা আমাকে বাঙ্গলা লেখাইতে শিখায়। সুনীতি সভা কেবল লেখা শিখাইয়া ক্ষান্ত হয় নাই, ইহা দ্বারা আমরা যথাসাধ্য চরিত্র-গঠনেরও সাহায্য পাইয়াছিলাম; শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন ও পরমারাধ্য চূড়ামণি দেবের সংস্রবে থাকিয়া আমরা নানা বিষয়ে উপকার লাভ করিয়াছিলাম। বিশেষতঃ চূড়ামণি দেবের অনুগ্রহ চিরদিন সমভাবে বিরাজমান থাকায়, পরিণামে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছে। এই সুনীতিসভা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের একটা উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করিয়াছিল। তাহার দ্বারা সুরেন্দ্র বাবুর আন্দোলনে বিচলিতচিত্ত সংযত হইয়া, কোন উচ্চতর কর্ত্তব্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহার ফলেও স্বদেশের পূর্ব্ব ইতিবৃত্ত আলোচনায় আরও আদর বাড়িয়া যায়। এই সময়ে আমি ডাক্তার রামদাস সেনের সহিত আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হই; আমি তাঁহার তৃতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করি। তাঁহার গ্রন্থাদি পাঠ আলোচনা, তাঁহার নিকট হইতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য শ্রবণ, ও তাহার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে অনেক ঐতিহাসিক গ্রন্থ দেখিয়া, আমার ইতিহাস পাঠের প্রীতি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। কয়েক বর্ষ খাগড়া মিশনারি স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া, আমি বহরমপুরে কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হয়। এই সময়ে আমি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্য কিছু কিছু অধ্যয়নও করিয়াছিলাম। বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে পাঠকালে শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-চন্দ্র রায়চৌধুরীর নিকট আমরা ইতিহাস অধ্যয়ন করিতাম। তিনি ইতিহাসের প্রতি আমাদের অনুরাগ আকর্ষণের জন্য যত্ন লইতেন; তজ্জন্য ইতিহাস পাঠের প্রতি আরও অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে কবিতা-রচনাও একেবারে পরি-ত্যাগ করি নাই। কিন্তু প্রবন্ধ-রচনার প্রতি দিন দিন মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল,

থাকিতাম; কাব্য গ্রন্থের মধ্যে নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' ও 'কবিতাবলী' আমার প্রিয়পাঠ্য হইল। এইরূপ সময়ে ১৮৮৭ খৃঃ অব্দের বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুল হইতে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। তাহার পর উক্ত কলেজ হইতে ক্রমে এফ, এ ও বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলাম। কলেজবিভাগে অধ্যয়নকালে বহরমপুর কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের শিক্ষাগুণে স্বাধীন অনুসন্ধানের প্রতি একটী অনুরাগ উৎপন্ন হয়। এই সময়ে ডাক্তার রামদাস সেনের পুস্তকালয়ের ও বহরমপুর কলেজের পুস্তকালয়ের ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ আমি দেখিতে আরম্ভ করি। আমার কলেজবিভাগে পাঠারম্ভের প্রথমেই ডাক্তার সেন মহাশয় পর-লোকগত হন। তিনি জীবিত থাকিলে আমার ইতিহাসচর্চ্চা আরও বর্দ্ধিত হইত। ঐ সময়ে আমি মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহে মধ্যে মধ্যে ভ্রমণ করিতাম। ক্রমে আমার মুর্শিদাবাদের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা হয়। তৎকালে আমার কবিতা লেখা দেশে অনেক পরিমাণে প্রশংসিত হইয়াছিল। 'অশ্রুহার' নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতাপুস্তক আমি বন্ধু-গণের মধ্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত করিয়াছিলাম। জন্মভূমি পত্রিকায়ও দুই একটী কবিতা প্রকাশ করিয়াছিলাম। রাজপুতকুসুমের ২য় ভাগের কয়েকটী কবিতা ও অন্যান্য আরও কতকগুলি কবিতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত আছে। সুনীতি সভা হইতে প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করিয়া আমি মুর্শিদাবাদ পত্রিকা, প্রতিকার ও অনুসন্ধান পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া-ছিলাম। তাহার পর বি, এ পাসের পর আমি মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। এই সময়ে আমি সংস্কৃত এম, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়া-ছিলাম। কিন্তু ইতিহাস রচনায় ব্যাপৃত থাকায় তাহাতে ফললাভ করিতে পারি নাই। এই সময়ে বহরমপুর হইতে 'মুর্শিদাবাদ হিতৈষী' নামে একখানি নূতন সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। আমি তাহাতে অন্যান্য প্রবন্ধের সহিত মুর্শিদা-বাদের ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিগণের বৃত্তান্ত লিখিতে আরম্ভ করি। ক্রমে ঐরূপ প্রবন্ধ সাহিত্য, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায়ও প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সময়ে আমি কিছুকালের জন্য কলিকাতায় গিয়া তথাকার পাবলিক লাইব্রেরী হইতে অনেকগুলি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার ইতিহাস লেখার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম। নিজামত লাইব্রেরী ও দেওয়ান

ফজল রব্বী খাঁ বাহাদুরের সংগৃহীত অনেক হস্তলিখিত কেতাব ও মুদ্রিত কেতাব হই আমি সাহায্য পাইয়াছিলাম ; তদ্ভিন্ন ডাক্তার রামদাস সেনের ও বহরমপুর কলেজের পুস্তকালয় হইতে আমি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রাপ্ত হই। এতদ্ব্যতীত মুর্শিদাবাদের অনেক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের নিকট অনেক কাগজপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এই সমস্ত উপাদান হইতে ও মুর্শিদাবাদের ঐ সমূহের শিলালিপি ও জনশ্রুতি হইতে আমি মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করি। সেই সময়ে মধ্যে মধ্যে আমি মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক স্থান ও ব্যক্তিগণের বৃত্তান্ত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকি। পরিশেষে ঐ সমস্ত প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া আমি ১৩০৪ সালে মুর্শিদাবাদ-কাহিনী প্রকাশ করি। ইংরেজি ১৯৯৭ সালে আমি বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৯৮ সালের মে মাস হইতে ওকালতী করিতে প্রবৃত্ত হই। বহরমপুর জজ আদালতে ৪ বৎসর ওকালতীর পর আমি কলিকাতায় আসি ও ১৯০২ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করিয়াছি। ১৩০৯ সালে আমার মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। কাশীমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের উৎসাহে ও সাহায্যে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি রাজ-সম্পত্তি প্রাপ্তির পূর্ব্ব হইতেই আমার ইতিহাস আলোচনায় উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। ৪ খণ্ডে মুর্শিদাবাদের ইতিহাস সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা আছে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ ছাত্রগণের মধ্যে ইতিহাস আলোচনার জন্য আমি "ঐতিহাসিক চিত্র" নামে একখানি মাসিক পত্রও প্রকাশ করিতেছি।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়।



ইহাঁর পিতার নাম ৺বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। নিবাস ২৪ পরগণার শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রাম। অধুনাবাস কলিকাতা পটলডাঙ্গা, ১২নং পটুয়াটোলা লেন। ইনি অনুমান ১২৫৪ বা ৫৫ সালে, ৬ই শ্রাবণ বুধবার জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁরা খড়দার মুকুটী,—কামদেব পণ্ডিতের সন্তান।

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়, সুপ্রসিদ্ধ ত্রিকুল-ঘর-সম্ভূত। এই ত্রিকুল-ঘর বিষয়ে একটু ইতিবৃত্ত আছে। এইরূপ থাক্‌-বাঁধা-ঘর বঙ্গদেশে বোধ হয় আর দ্বিতীয় নাই। প্রায় আড়াই শত বৎসরের কথা,—শ্রীনন্দন নামক, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের একজন পূর্ব্বপুরুষ, ভ্রমক্রমে পূর্ব্ব বঙ্গের কোনও একটি নীচকুলোদ্ভবা ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করেন। ফলে ইহাঁদের কুলের বিশেষ কলঙ্ক হয়। তখন কুলে কোনরূপ কলঙ্ক হইলে, কুলীন ব্রাহ্মণের পক্ষে মহা বিপদ উপস্থিত হইত। শ্রীনন্দন অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে তাঁহার এক প্রিয়-বন্ধু ছিলেন। বিশ্বেশ্বর আসিয়া শ্রীনন্দনের সহিত যোগদান করিলেন। অতঃপর, মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায় নামক আর একটী বন্ধু আসিয়া তাঁহাদের সহিত জুটিলেন। বন্ধুদ্বয় শ্রীনন্দনকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভায়া হে! আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই,—আজ হইতে তোমারও যে দশা, আমাদেরও সেই দশা।" অনন্তর তিনজনে ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়া গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া, এইরূপ শপথ করিলেন ;—

(১) আমাদের এই 'তিনবংশ' জাত পুত্রকন্যার সহিত তাহাদের পরস্পরের বিবাহ হইবে।

(২) নিতান্ত আবশ্যক না হইলে আমাদের বংশজাত কোন পুত্র, একটীর অধিক বিবাহ করিতে পারিবে না।

(৩) পুত্র-কন্যার বিবাহে অর্থ আদানপ্রদান একেবারেই থাকিবে না। যে, কোনরূপ অর্থ প্রার্থনা করিবে, সে চিরকালের জন্য পতিত হইবে। কন্যার বিবাহে কেবলমাত্র এক যোড়া কাপড় ও এক টাকা দক্ষিণা দিয়া কন্যাকর্ত্তা কন্যা-সম্প্রদান করিবে।

বিবাহ করিয়াছেন; কিন্তু কখনও কাহারও নিকট তিনি একটীও পয়সা গ্রহণ করেন নাই।

ত্রৈলোক্য বাবু স্বাবলম্বনপ্রিয়, স্বাধীন-চেতা, অধ্যবসায়শীল এবং উদ্যোগী পুরুষ। তিনি বহুকর্ম্মান্বিত, বহু জন-সমাদৃত এবং বহু বিখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি। অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি আত্মোন্নতি এবং দেশের উন্নতি করিয়া ধন্য হইয়াছেন,—আজীবন শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞানাদির অনুশীলনে ইনি দেশের টাকা দেশে রাখিবার প্রয়াস পাইতেছেন। ইনি স্বদেশজাত দ্রব্যের প্রতি লোকের আস্থা ও আদর বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আর আহ্লাদের কথা,—এত কাজের ভিড়েও ত্রৈলোক্য বাবু স্বজাতীয় সাহিত্য সেবায় বিরত নহেন। তিনি অতি প্রাঞ্জল ভাবে, সরল কথায় তাঁহার বহু অভিজ্ঞতার ফল প্রদর্শন করিয়াছেন। সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত জন্মভূমি পত্রে তাঁহার সোনা, লোহা, পাথুরে কয়লা, এড়ির চাষ প্রভৃতি বহু প্রবন্ধাবলী পাঠে বাঙ্গালী পাঠক সবিশেষ উপকার লাভ করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্য বাবু শিশুকালে অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার ভয়ে গ্রামের অনেকে শশব্যস্ত থাকিত। তাঁহার একটী প্রকাণ্ড দল ছিল। এই দলের সকল গুলিই এক এক ধনুর্দ্ধর। দুষ্টামি করিতে তাহারা বিশেষ মজবুৎ ছিল। পরের বাগানের ফল পাড়িয়া খাইতে, লোককে মারিতে ধরিতে, এই দল কিছুতেই ভীত হইত না। ইহার উপর কথায় কথায় টেক্স ধার্য্য করা ইহাদের একটা রোগ ছিল। একজন শিউলী আর একজনের খেজুরগাছ কাটিল; ইহারা সেই শিউলীর নিকট টেক্স চাহিল; একজন মাঝি খড়ের নৌকা লইয়া যাইতেছে, একজন গিয়া মাঝির নিকট টেক্সের দাবি করিল; কেহ জমিতে আকের চাষ করিতেছে,—ইহারা সেই চাষীর নিকট হইতেও টেক্স আদায় করিতে আসিল। গ্রামের অন্য বালকদল হয় ত একটা বড় গাছের তলায় খেলা করিতেছে, ইহারা সেখানে গিয়াও টেক্সের জুলুম করিল;—আপত্তি করিলেই হতভাগ্যদের সর্ব্বনাশ; এইরূপ মার-ধর-হাঙ্গাম-হুজ্জুত করা এই দলের প্রধান কর্ম্ম ছিল। ইহা ছাড়া ইহারা মাটীর নীচে গর্ত্ত করিয়া, কেল্লা তৈয়ারী করিত; গুরু মহাশয়ের বেতের ভয়ে কিংবা অভিভাবকগণের তাড়নের শঙ্কায়, মাঝে মাঝে ইহারা সেই 'কেল্লা'র ভিতর গিয়া লুকাইত।

কিন্তু এত দুষ্টামী করিয়াও ত্রৈলোক্য বাবু ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম থাকিতেন। বাল্যকালে হইতেই ত্রৈলোক্যনাথের উদ্ভাবনীশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিজেই মনগড়া একরূপ ভাষার সৃষ্টি করিয়া সম্পূর্ণ নুতনতর এক বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। কাষ্ঠফলকে ও মাটীর চাকৃত্তিতে সেই বর্ণমালা সংযোজিত করিয়া, বালক ত্রৈলোক্যনাথ আপন মনে নানাবিধ, অস্ফুট গান, হেয়ালী, শ্লোক প্রভৃতি রচনা করিয়া, কোন রকমে তাহা ছাপিতে লাগিলেন। ইহাঁর বয়স তখন অনুমান নয় বৎসর। সেই সব বর্ণমালা,—পিটম্যানের "সংক্ষিপ্ত লেখার" সহিত অনেক মিলিয়া যায়। এই পিটম্যানের সঙ্কেতের সহায়তার এক মিনিটে একশত আশিটি কথা লেখা গিয়া থাকে।

গ্রামের স্কুলে ও পাঠশালায় ত্রৈল্যোক্যনাথের শিক্ষা আরম্ভ। ১৮৫৯ সালে গ্রামের স্কুলটী উঠিয়া যায় অতঃপর ত্রৈলোক্যনাথ হুগলী-চুঁচুড়ার ডফ সাহেবের স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, ৬০ সালে ডবল প্রমোশন পাইয়া ৫ম শ্রেণীতে উন্নীত হন, ৬১ সালে কিছু দিনের জন্য ভদ্রেশ্বরের নিকট তেলিনীপাড়া স্কুলে পড়েন। পুনরায় ঐ ডফ সাহেবের স্কুলে আসিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৬২ সালে গ্রামে অত্যন্ত ম্যালেরিয়া হয়। তাহাতে ইহাঁর পিতামহীর পরলোক ঘটে ; পরে মাতা এবং তৎপরে পিতারও পরলোক প্রাপ্তি হয়। ত্রৈলোক্যনাথ নিজেও প্লীহাজ্বরে আক্রান্ত হন। গ্রামের বহু বালক-বালিকা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া মারা পড়ে। এইখানেই ত্রৈলোক্যনাথের লেখা পড়া শেষ হইল

ত্রৈলোক্য বাবুর পিতার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। এখন ত্রৈলোক্যনাথ একমাত্র অবিভাবক—পিতার জ্যেঠাই এবং মার পিসী। ত্রৈলোক্যনাথের বয়স ঐ সময় চৌদ্দ-পনর বৎসর। ত্রৈলোক্য বাবুর জ্যেষ্ঠ, শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ; ইনিও সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত। ত্রৈলোক্য বাবু মধ্যম। তাঁহার নীচে আর চারিটী ছোট ভাই। সকলেই এই সময়ে ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত। ইহাঁদের পৈতৃক জমিসমূহ প্রজাবিলি ছিল। বাগান-বাগিচা ও গাছ-পালাও কিছু ছিল, কিন্তু ১৮৬৪ সালের ঝড়ে তাহা সমুলে বিনষ্ট হয়। সংসারে বড় কষ্ট। রোগে, দুঃখে ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৬৫ সালে জানুয়ারী মাসে বাটী হইতে নিরুদ্দেশ হইলেন। তিনি মানভূম-পুরুলিয়ায়, আত্মীয় শশিশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা করেন। রাণীগঞ্জপর্য্যন্ত রেলে গেলেন। তখন পয়সা ফুরাইয়া গেল। রাণীগঞ্জ হইতে মানভূম তিন দিনের পথ। বন, জঙ্গল,

পাহাড় অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। ত্রৈলোক্যনাথ এই পথ হাঁটিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। রাণীগঞ্জে ইনি দামোদর নদ যখন পার হন, তখন একটি হিন্দুস্থানী চাপরাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চাপরাসীর সহিত আলাপ হইল। ত্রৈলোক্য বাবু বলেন,—"আমায় চাপরাসী বলিল, আসামে গেলে তোমার ভাল চাকরি হয়, এবং আমি তোমায় পাঠাইতে পারি।" ত্রৈলোক্যনাথ সম্মত হইলেন।

চাপরাসীর সঙ্গে আবার রাণীগঞ্জে ফিরিয়া আসিলেন। চাপরাসী বাটিতে মস্ত একটা তাঁহাকে আটক করিল। সেখানে অনেক নীচজাতীয় স্ত্রীপুরুষ ছিল; তাহারা মাদল বাজাইয়া গান করিতেছিল। একদিন পরে চাপরাসীর রক্ষিতা একটী বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের দয়ায় ত্রৈলোক্য বাবু কুলি-চালান হইতে উদ্ধার পান। সেই স্ত্রীলোকটি বলিল, "তোমাকে যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট লইয়া যাইবে, তুমি বলিও, 'আমি যাইব না'।" ৫।৬ দিনের পরে চাপরাসী, কুলিগণ সমভিব্যাহারে ত্রৈলোক্য বাবুকে লইয়া যাইতে চাহে; কিন্তু ত্রৈলোক্য বাবু পথি মধ্যেই পলায়ন করেন। পুনরায় তিনি মানভূমে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাস্তায় বন্য কুলের গাছ ছিল। ত্রৈলোক্য নাথ কুল খাই-য়াই দিন যাপন করিতে লাগিলেন।

ইনি মানভূমে পঁহুছিলেন। ইহাঁর আত্মীয় ইহাঁকে স্কুলে দিবার চেষ্টা করিলেন। এই সময়ে প্রথম শ্রেণীস্থ বালকদিগকে ছোটনাগপুরের কমিশ-নরের আদেশে, রাঁচির মেলা দেখিবার জন্য যাত্রা করিতে হইল। রাঁচী মানভূম হইতে পাঁচ দিনের পথ। পাহাড় পর্ব্বত বন জঙ্গল দিয়া যাইতে হয়। ত্রৈলোক্য বাবুও বালকদের সহিত গেলেন। সকলে গরুর গাড়ীতে গমন করিলেন। মানভূমের ডেপুটী কমিশনর এবং আমলাবর্গ এই সঙ্গে গমন করেন। ত্রৈলোক্য বাবু বলেন, স্কুলের বালকদের মধ্যে আমলারাই অভিভাবক। ২।৪ দিনের মধ্যে বালকদের আমি কাপ্তেন হইয়া দাঁড়াইলাম। সকলকে অসম সাহসিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। জয়পুর নামক স্থানে বাঁদরের পালের মাঝ হইতে গাছে উঠিয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া, মা'র কোল হইতে ছানা কাড়িয়া লইলাম। ঝালিদা উপস্থিত হইয়া, কাঁসাই নদীর মূল নির্দ্দেশ করিবার নিমিত্ত বালকদিগকে দুর্গম গিরিপ্রদেশে লইয়া চলিলাম। সুবর্ণরেখা তীরে শিলি নামক স্থানে, গিরিগুহায় ভল্লুক কিরূপে থাকে, তাহার অনুসন্ধান করিলাম।

ইহাতে বালকগণের অভিভাবকগণ বিরক্ত ও ক্রোধান্বিত হইলেন। যথাদিনে রাঁচী পঁহুছিলাম।

কিন্তু অল্প দিন পরেই রাচি পরিত্যাগ করিয়া আমি বনের পথ অনুসরণ করিলাম। পথে যাইতে যাইতে দু'জন ঢাকাই মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হয়। নাগপুর অঞ্চলের বন্যপ্রদেশে তাহারা হাতী ধরিতে যাইতেছিল। আমি তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম। কিছু দিন পরে জঙ্গলের মাঝে একদিন তাহারা আমার গায়ের কাপড় কাড়িয়া লইল। পুনরায় রাঁচী আসিলাম। রাঁচী হইতে আবার মানভূমে আসিলাম। কিন্তু স্কুল ছাড়িয়া দিলাম, বর্দ্ধমানের নিকট গদা নামক স্থানের রেফাকয়ুসেন নামক একজন মৌলবী তখন মানভূমে থাকিতেন। তাঁহার নিকট পার্সী শিক্ষা করিলাম। অল্পদিনে পন্দনামা, আমদ্‌নামা, গোলেস্তা, বোস্তা শেষ করিলাম।

"বাড়ীর কষ্ট সর্ব্বদাই মনে জাগিত। পুনরায় দেশে প্রত্যাগমন করিলাম। অল্পদিনের জন্য ইছাপুর গ্রামে একটিনী করিলাম। চারি মাস পরে সে কাজ গেল। গ্রামের জনৈক আত্মীয় যশোহর জেলায় কন্‌ট্রাক্টরের কাজ করিতেন। 'যশোহর-কোটচাঁদপুরে যাইতে পারিলে, দু'পয়সা হইতে পারে, তিনি এইরূপ ভরসা দেন। কোটচাঁদপুরে গেলাম। কন্‌ট্রাক্টর আত্মীয়ের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া বাটী আসিলাম। আমার একটী আত্মীয় শ্রীযুক্ত হরকালী মুখোপাধ্যায়—সেই সময়ে বর্দ্ধমানে থাকিতেন। তিনি ডেপুটী-ইন্‌স্পেক্টার অব-স্কুলের কাজ করিতেন। স্কুল-মাষ্টারীর প্রার্থনায় তাঁহার নিকট গেলাম। প্রথমে তিনি কাটোয়ায় পাঠাইলেন; সেথায় কিছু হইল না। পরে বীরভূম জেলায় কীর্ণাহার নামক স্থানে পাঠাইলেন; সেখানেও হইল না। পরে তাঁহার কথায় রামপুরহাটে গেলাম, সেখানেও বিফলমনোরথ হইলাম। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনকালে কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় থাকিতাম, আত্মীয় হরকালী মুখোপাধ্যায়ের নিকট প্রার্থনা করিলে অবশ্য তিনি কিছু দিতেন; কিন্তু চাইতে পারিতাম না। লোকের বাটীতে অতিথি হইয়া পথ চলিতাম।

"সে সময়, ১৮৬৬ সালে—উড়িষ্যায় উৎকট দুর্ভিক্ষের সূচনা হইতেছে। চারিদিকে ঘোর অন্নকষ্ট। সুতরাং কোন দিন আহার মিলিত, কোন দিন মিলিত না। সন্ধ্যাবেলায় কাহারও বাটীতে গেলে যদি সে তাড়াইয়া দিত, সারা রাত্র অনাহারে গাছতলায় থাকিতাম। একদিনের ঘটনা বলি :—

"রামপুর হাট হইতে পদব্রজে শিউড়ী ফিরিয়া আসিয়া দুই দিন আহার হয় নাই। সন্ধ্যার সময় শিউড়ী উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় যাই? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্কুলের হেডমাষ্টার নবীনচন্দ্র দাসের নিকট গেলাম। তাঁহাকে বলিলাম, "মহাশয়! আমি ব্রাহ্মণ; দুই দিন অনাহারে আছি,—যদি আমায় কিছু খাইতে দেন।" তিনি আমাকে একটী দু'আনি দিতে আসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "এরূপ পয়সা ভিক্ষা করিতে আপনার কাছে আসি নাই। আমাদের বংশে কেহ এরূপ ভিক্ষা করে নাই। কোন পুরুষে শূদ্রের বাড়ীতেও কেহ কখন খায় নাই! তবে নিতান্ত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াছি। তৃষ্ণায় আমার বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে! অন্যস্থানে যাইব, এরূপ শক্তি নাই সেই নিমিত্ত আপনার নিকট আসিয়েছি। তিনি উত্তর করিলেন, জাতিতে আমি তন্তুবায়; আমি পরিবার লইয়া আছি। আমার নিকট ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী নাই। তবে তুমি এক কর্ম্ম কর। আমার অধীনে কুঞ্জ বলিয়া একটী জমীদার বালক আছে। সে ব্রাহ্মণ; তুমি আজ রাত্রি তাহার নিকট গিয়া অবস্থান কর। কুঞ্জ আমার সমবয়সী। বীরভূম জেলায় পানাগড়ের নিকট ইছাপুর নামক গ্রামে কুঞ্জের বাস ছিল। সে একটী মেটে ঘরে থাকে। সেই ঘরের ভিতর রান্না হয়। ঘরের ভিতর কুঞ্জ ও আমি বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম; ঘরের এক কোণে ব্রাহ্মণ রাঁধিতে লাগিল। ঘোরতর আগ্রহের সহিত সেই রন্ধন কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। "এই হয়, এই হয়, কখন হয়"—সর্ব্বদাই এই চিন্তা। ব্রাহ্মণ প্রথম ভাত নামাইল। উল্লাসে মন প্রফুল্ল হইল। তাহার পর দাল হইল। এইবার রাঁধিলেই হয়, এই ভাবিয়া মনে অতিশয় আনন্দ উপস্থিত হইল। উত্তপ্ত তৈলে ব্রাহ্মণ সেই মাছ ফেলিয়া দিল, আর তেল জ্বলিয়া ঘরের কোণের চালে, যাহা ঠিক উনুনের উপর ছিল, তাহাতে আগুন লাগিয়া গেল। মহা গোল উঠিল। চারিদিক্ হইতে লোক আসিয়া আগুন নিবাইল। কিন্তু আমার জঠরানল নির্ব্বাণ হইল না। যাহা কিছু রন্ধন হইয়াছিল, সমুদয় নষ্ট হইয়া গেল। দুই পয়সার মুড়ি-মুড়কি আনিয়া কুঞ্জ ও আমি খাইলাম। দুর্ভিক্ষের সময় তাহা এক গালেই ফুরাইয়া গেল। ক্ষুধার কিছুমাত্র নিবৃত্তি হইল না।

"তাহার পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া বর্দ্ধমানের দিকে চলিলাম। ৫।৬ ক্রোশ দূর গিয়া আর চলিতে পারিলাম না। নিতান্ত ক্লান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলাম।

অতি কষ্টে একখানি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এক ব্যক্তির বাটীতে স্ত্রী-পুরুষের কাপড়ে চুণ-হলুদ দেখিতে পাইলাম। মনে করিলাম, ইহাদের বাড়ীতে কোনরূপ শুভকার্য্য হইয়াছে ;—ইহাদের বাড়ীতে খাইতে পাইব। তাহারা জাতীতে সদ্গোপ। বাটীর কর্ত্তা বৃদ্ধ। বৃদ্ধের নিকট আমার সমুদয় দুঃখের কথা বলিলাম। অতি সমাদর করিয়া বৃদ্ধ আমাকে মুড়ী, গুড় ও ঘোল খাইতে দিল। অমৃতের অপেক্ষা তাহা আমাকে মিষ্ট লাগিল। দেহ আমার পুনর্জ্জীবিত হইল। পুনরায় বর্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমি কেবল এক দিনের ঘটনা বলিলাম ; কিন্তু এরূপ ঘটনা আমার জীবনে কতদিন কত রকমে ঘটিয়াছে, তাহা আমার সব মনেও নাই, আর বলিবারও আবশ্যক নাই।"

ত্রৈলোক্য বাবু বর্দ্ধমান গিয়া হরকালী বাবুর কাছে শুনিলেন, তাঁহার পিতামহী অত্যন্ত পীড়িতা। ত্রৈলোক্যনাথকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধা কাঁদিতেছেন। তখন ত্রৈলোক্যনাথের হাতে একটীও পয়সা ছিল না। হরকালী বাবুর নিকট চাহিলে যদিও তিনি পথ খরচ দিতেন,—যদিও পূর্ব্বদিন অনাহারে ছিলেন, তথাপি কাহাকে কোন কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। ত্রৈলোক্য বা বলেন,—সন্ধ্যাবেলা আমি মেমারী আসিয়া পঁহুছিলাম। মেমারি ষ্টেশনের পুষ্করিণীর সান-বাঁধাঘাটে পড়িয়া রহিলাম ; ভাবিতে লাগিলাম, দুদিন আহার হয় নাই ; অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি ; যদি আজ রাত্রেও অনাহারে এখানে শুইয়া থাকি, ত কাল প্রাতে আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িব, সুতরাং এখনি পথচলা ভাল। রাত্রিতেই পথ চলিতে লাগিলাম। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পা আর উঠে না। একটা তেঁতুল গাছ হইতে তেঁতুলপাতা পাড়িয়া লইলাম। তাহাই চিবাইতে চিবাইতে পরদিন বেলা ১২টার সময় মগরায় আসিলাম। শরীর অবসন্ন,—আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। একটী পুরাতন ছাতা ছিল। একজন দোকানী সেই ছাতাটী বাঁধা রাখিয়া আমাকে ফলাহার করিতে দিল, আর গঙ্গাপার হইবার নিমিত্ত নগদ একটী পয়সা দিল। আমি বাটী আসিলাম। দিদিমা সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

"কিছুদিন পরে বীরভূম জেলায় দ্বারকা নামক স্থানে স্কুলমাষ্টারী করিলাম। আত্মীয় হরকালী বাবুর চেষ্টায় এ কাজ হয়। অল্পদিনের মধ্যে রাণীগঞ্জের অন্তর্গত উখড়ায় বদলী হইলাম। এ স্থানের স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক হইলাম। বেতন ১৮৲ টাকা। এই সময় ঘোরতর দুর্ভিক্ষ। রাত্রি দিন লোকের কাতর-ক্রন্দনে শরীর

কণ্টকিত হইতে লাগিল। অস্থিচর্ম্মসার, কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণকায় নর-নারী—বালক-বালিকাদের অবস্থা দেখিয়া বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যে যেখানে পড়িল, সে সেইখানে মরিতে লাগিল। স্থানে স্থানে মড়ার দুর্গন্ধে পথ-চলা ভার হইল! বাড়ীতে শিশু ভাইগণ,—তাহাদের নিমিত্ত টাকা বাঁচাইবার অভিপ্রায়ে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করিলাম। হবিষ্যান্ন খাইয়া দিন যাপন করিতে লাগিলাম। তখন যৌবনের প্রারম্ভ,—অতিশয় ক্ষুধা। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলা এরূপ ক্ষুধা পাইত যে, ক্ষুধায় দাঁড়াইতে পারিতাম না। মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইত। তখন পেট ভরিয়া কেবল এক লোটা জল খাইতাম। তাহাতে শরীর কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ হইত। এইরূপ করিয়া যাহা কিছু যৎসামান্য রাখিতে পারিতাম, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীগণের দুঃখমোচনের চেষ্টা করিতাম ও বাড়ীতে পাঠাইতাম। সেই সময় হইতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, যাহাতে এই স্বর্ণভূমি ভারতভুমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে, এইরূপ কার্য্যে আমাব মনকে আমি নিয়োজিত করিব। সেই দিন হইতে এই সম্বন্ধে যাহা কিছু শিখিবার আবশ্যক, শিখিতে লাগিলাম। তখন মনে মনে এই স্থির হইয়াছে যে, ভারতের লোক যদি নিজে নিজে একটু যত্ন করে, তাহা হইলে এ দেশের অন্ততঃ অর্দ্ধেক দুঃখও দূর হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মিলিত করিতে যত্ন পাইতেছি। কিন্তু কি করিব, সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত। যাহাতে দেশের দুঃখ-মোচন হয়, এরূপ চিন্তা অল্পলোকেই করিয়া থাকেন; বড়জোর না হয়, ক্রিয়া-কর্ম্ম উপলক্ষে কতকগুলি লোককে বৎসরের মধ্যে একদিন কি দুইদিন আহার দিয়া থাকেন। কিন্তু গরীব দুঃখী লোকেরা চিরকালের জন্য যাহাতে একমুঠা অন্ন পায়, এরূপ কার্য্যে কয় জনের দৃষ্টি আছে?

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতার মান্যবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট আমি পরিচিত হই। উখড়ায় থাকিতে তাঁহার নিকট হইতে সহসা পত্র পাই যে, পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর স্থানে তাঁহার জমিদারীতে স্কুল-মাষ্টারীর পদ খালী আছে,—বেতন ২৫৲ টাকা। আমি সে স্থানে গমন করিলাম। বর্ষাকালে এই অঞ্চল জলে ডুবিয়া যায়। গ্রামগুলি এক এক খানি দ্বীপের ন্যায় দেখিতে হয়। যে দিকে চাহিবে, জল ও নৌকার মাস্তুল। স্থানান্তরে এমন

কি অন্য বাড়ীতে যাইতে হইলেও, নৌকা করিয়া যাইতে হয়। একদিন নৌকা করিয়া যাইতে যাইতে দেখি, একটী সামান্য মাটীর ঢিপি জলের ন্যায়; ইহার কেবলমাত্র মাথাটী জাগিয়াছিল,—সেই স্থানে তিনটী অশীতিপর বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহাদের চক্ষু নাই, কর্ণ নাই,—কিছুই নাই। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না,—কেবল ঘাড় কাঁপাইতে থাকে, কোথায় বাড়ী, কে তাহারা, কি করিয়া তাহারা এই মাটীর ঢিপিতে আসিল, কে তাহাদিকে ফেলিয়া গেল,—তাহার কিছুই তাহারা বলিতে পারে না। ভাবে বুঝিলাম, কোন নৃশংস লোকেরা সেই অনাথিনীদিগকে ফেলিয়া গিয়াছে। কেহ তাহাদিগকে আহার দেয় না, কেহ তাহাদিগের খোজ খবর লয় না। কয় দিন তাহারা এইভাবে সেখানে পড়িয়া আছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। তবে অতিশয় শীর্ণকায় হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলাম। আমার নৌকায় তুলিয়া সাহাজাদপুরে আনিয়া আমি তাহাদিগকে যত্ন করিতে লাগিলাম। ইহাতে নায়েব মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ইহারা ত অল্পদিন পরেই মরিবে; মরিলে ফেলিবে কে? তুমি ইহাদিগকে বিদায় রিয়া দাও, হারা যেখানে ছিল, সেই খানে রাখিয়া এস।" আমি তাহার কথা শুনিলাম না। কিন্তু একদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম যে, সেই বুড়ীরা নাই। অনেক অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু তাহাদিগকে আর খুঁজিয়া পাইলাম না। এই বিষয় লইয়া সে স্থানের কোন কোন ক্ষমতাবান্ লোকের সহিত আমার কিছু মনোমালিন্য হইয়াছিল। অল্পদিন পরে পূজার ছুটীতে বাটী আসিলাম। ছুটীর পর কুষ্টিয়া হইতে নৌকা করিয়া পদ্মা দিয়া সাহাজাদপুরের দিকে যাইতেছিলাম। প্রথমদিন একটী চড়ার মাঝখানে নৌকা লাগাইয়া সন্ধ্যার পর আমি রন্ধন করিতেছিলাম; হঠাৎ নিকটে একটী নিশ্বাসের শব্দ হইল। আমি ভয়ে দৌড়িয়া নৌকার উপর উঠিলাম। মাঝিরা বাঁশ লইয়া সেই দিকে গিয়া তাড়া দিল। কি একটা গিয়া জলে পড়িল, এইরূপ শব্দ হইল। অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মাঝিরা বলিল, বোধ হয়, জল হইতে কুমীর উঠিয়া আমাকে ধরিতে আসিয়াছিল। হঠাৎ তাহার নিশ্বাস পড়িল, তাই আমি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পাইলাম। পরদিন প্রাতে নৌকা ছাড়িলাম।

ইতিপূর্ব্বে বাদলা হইয়াছিল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, পূর্ব্বদিক্ হইতে প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছিল। পদ্মায় অতিশয় তুফান উঠিয়াছিল। কিছুদূর গিয়া আমরা আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এক স্থানে তিনখানি বড় নৌকা লাগিয়াছিল; আমরা সেইখানে গিয়া নৌকা লাগাইলাম। পদ্মার নিজ ধারেই প্রায় এক ক্রোশ মাঠ; তাহার পরে গ্রাম। সন্ধ্যাবেলা বাতাস উত্তর দিক্ হইতে বহিতেছিল। তুফানও অতিশয় বাড়িল। কত রাত্রি হইয়াছিল, জানি না। কিন্তু ঘোর কলাহলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উঠিয়া দেখিলাম যে, তুমুল ঝড় আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর দিকের ঝড়ে আমাদের নৌকাকে ক্রমাগত পদ্মার মাঝখানে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। লগী পুতিয়া, দড়ী বাধিয়া আমরা নৌকা রক্ষা করিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। কিন্তু লগী উঠিয়া যায়, দড়ি ছিড়িয়া যায়। আমাদের নিকট যে কয়খানি নৌকা ছিল, ঝড়ে একে একে তাহাদিগকে দূরে লইয়া ডুবাইয়া দিল। শেষ বড় নৌকাখানি বায়ুবেগে আমাদের নৌকার উপর আসিয়া পড়িল। দুইখানি নৌকাই একবারে নক্ষত্রবেগে পদ্মার মাঝখানে চলিল। অল্পক্ষণ পরেই নৌকা দুইখানি ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল। আমাদের নৌকাখানি ডুবিয়া গেল। কিন্তু চারিদিক্ হইতে মাটী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। একবার আমার নিকটেই দশবার হাত মাটী ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন মাটী চাপা পড়িবার ভয় হইল। কষ্টে পাড়ের উপর উঠিলাম। উঠিতেই ঝড়ে আমাকে ঠিক উড়াইয়া না হউক, ঠেলিয়া লইয়া চলিল; আর একবারে পদ্মার ভিতর ফেলিয়া দিল। পুনরায় বাতাসে ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আমিও বায়ুর সহিত অতিকষ্টে তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলাম। সম্মুখে একটি ছোট গাছ দেখিতে পাইলাম। আগ্রহের সহিত গাছটি ধরিলাম। হাতের চারিদিকে কাঁটা ফুটিয়া গেল। বুঝিলাম, গাছটি চারা বাবলা গাছ। সে গাছ ছাড়িয়া দিয়া পুনরায় চলিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটী ঝোপ পাইলাম। সে স্থানে অনেকগুলি বড় বড় গাছ ছিল। তাহার ভিতর শুইয়া পড়িলাম। অতিশয় কম্প উপস্থিত হইল। আর কিছুই জানি না।

যখন পুনরায় জ্ঞান হইল, তখন দেখিলাম যে, দিন হইয়াছে। এক জনদের বাটীতে পড়িয়া আছি। বাটীর স্ত্রীলোকেরা আমার গায়ে আগুনের সেক দিতেছে। ক্রমে যখন জ্ঞান হইল, তখন শুনিলাম যে, যাহাদের বাটীতে

আছি, তাহারা জাতিতে চণ্ডাল। গ্রামের নাম বুলচন্দরপুর। পাবনা হইতে প্রায় চৌদ্দ ক্রোশ। প্রাতঃকালে বাটীর পুরুষেরা, জলনিমগ্ন নৌকার দ্রব্যাদি পাইবার প্রত্যাশায় পদ্মার ধারে গিয়াছিল। ঝড় তখন দক্ষিণ দিক্ হইতে চলিতেছিল। বায়ুবেগে পদ্মা হইতে জল উঠিয়া, তুমুল বৃষ্টির ন্যায়, উপরে অনেক দূর পর্য্যন্ত পড়িতেছিল। যে ঝোপের ভিতর আমি পড়িয়াছিলাম, আশ্রয়ের নিমিত্ত চণ্ডালেরা সেই স্থানে প্রবেশ করে। মৃত অবস্থায় আমি পড়িয়া রহিয়াছি, দেখিতে পায়। গলায় পৈতা দেখিয়া, ধরাধরি করিয়া, মাঠ পার হইয়া তাহারা আমাকে তাহাদের বাটীতে লইয়া আইসে। তাহার পর যত্ন করিয়া আমার পুনরায় চৈতন্য উৎপাদন করে। তিন চারি দিন পরে যখন কিঞ্চিৎ সবল হইলাম, তখন পাবনার দিকে যাত্রা করিলাম।

"কাদামাখা সামান্য একখানি ধুতি পরিয়া, এক-ছুট অবস্থায়, আমার একটী আত্মীয় বৈদ্যবাটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁহার নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাটী; তিনি পাবনায় কর্ম্ম করিতেন। এক্ষণে তিনি বহরমপুরে আছেন। ললিতকুড়ি অথবা অন্য কোন বাঁধের তিনি ইনঞ্জিনিয়ার। ৪।৫ দিন তাঁহার নিকট রহিলাম। তিনি আমাকে কাপড় চোপড় কিনিয়া দিলেন। পাবনায় নাটককার দীনবন্ধু মিত্র ও ডাক্তার হরিশ্চন্দ্র শর্ম্মার সহিত আলাপ হয়। ইহাঁরা দুই জনেই আমাকে যথেষ্ট আদর করিলেন। রাখালবাবু আমাকে খরচ দিয়া বাটী পাঠান। তখন বাটীতে কেহই ছিলেন না; বীরভূম জেলায় জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট সকলেই ছিলেন। বাটী আসিয়া আমার জ্বর-বিকার হইল; কোনরূপে রক্ষা পাইলাম।

"বর্দ্ধমানের হরকালী বাবু তখন কটকের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি আমাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, তাই তাঁহার নিকট যাইবার বাসনায় বাড়ী হইতে যাত্রা করিলাম। হাতে যাহা টাকা-কড়ি ছিল, নৌকা-ডুবিতে সে সমুদয় গিয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে টাকার নিমিত্ত পত্র লিখিলে, পাছে তিনি একেলা কটকে যাইতে না দেন, সেই ভয়ে তাঁহাকে লিখিলাম না। ধার করিতে মাথা কাটা যায়, সে নিমিত্ত ধারও করিলাম না।

"যৎসামান্য খরচ লইয়া পদব্রজে চলিলাম। পথে চিড়া, নুন আর লঙ্কা খাইয়া দিন যাত্রা করিতে লাগিলাম। শেষ দিন পয়সা ফুরাইয়া গেল। সে

দিন খণ্ডিতর নামক স্থান হইতে একবারে ১৯ ক্রোশ রাস্তা চলিলাম। মহানদী সাঁতার দিয়া পার হইলাম। হরকালী বাবুর বাসায় উপস্থিত হইয়া পুনরায় ঘোর পীড়াগ্রস্ত হইলাম। অল্প আরোগ্য লাভ করিলে তিনি আমাকে পুলিসের সব ইন্‌স্‌পেক্টারী করিয়া দিলেন। প্রথম আমাকে কাওয়াজ শিখিতে হইয়াছিল। অল্প দিন পরে কেঁউঝরের লড়াই উপস্থিত হইল। আমাকে তথায় যাইতে আদেশ হইল। কিন্তু প্লীহা জ্বর হওয়ায় পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। ফিরিয়া আসিবার পর, ভুইয়া, জোয়াঙ্গ, কোল, প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা পরাস্ত হইল। বিচারে কাহারও ফাসী হইল, কাহারও বা দ্বীপান্তর হইল। আরোগ্য লাভ করার পর আমি থানার দারোগা হইলাম। কখন বা কোর্টে কাজ করিতে লাগিলাম। এই সময় জাজপুর, ওলাবয়, কেঁদারাপাড়া প্রভৃতি স্থানে দারগা-গিরি করিয়া ভ্রমণ করিলাম। কার্য্য সম্বন্ধে লেখা পড়া উড়িয়া ভাষায় করিতে হইত;—১৫ দিনের মধ্যে একরূপ চলন-সই উড়িয়া ভাষা শিখিলাম। ঐ ভাষায় যত ভাল পুস্তক আছে, ক্রমে সব পড়িলাম। তাহার পর কিছুদিন "উৎকল শুভকরী" নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিলাম।

"আমাদের যেমন কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, কাশীদাসী মহাভারত আছে, উড়িয়া ভাষায়ও এ শ্রেণীর অনেক অধিক ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। কেবল ভাষায় নহে, উড়িয়াবাসীর প্রতাপও দোর্দ্দণ্ড ছিল। ইহাদের পরাক্রমে কতবার, একদিকে তৈলঙ্গ অপর দিকে বঙ্গদেশের মুসলমান রাজগণকে পরাস্ত হইতে হয়। দুই দক্ হইতে এরূপ আক্রান্ত হইয়াও উৎকলবাসীরা সাড়ে তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাঁহারা উড়িয়াদিগকে এক্ষণে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কণারক, জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরমন্দির, কাঠজুলীর বাঁধ প্রভৃতি ইহাদের কীর্ত্তি আজও দেদীপ্যমান।

"এই সময় আমি উৎকল ভাষা উঠাইয়া দিয়া বাঙ্গলা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করি। কারণ ভারতবর্ষের লোক যত এক হয় ততই ভাল, আমার এই উদ্দেশ্য বাঙ্গলা উঠাইয়া দিয়া, এ প্রদেশে হিন্দী প্রচলন করিতেও আমি প্রস্তুত আছি। তবে বঙ্গভাষা সম্প্রতি অনেক উন্নতি করিয়াছে, হিন্দি করে নাই। চৈতন্য চরিতামৃত লেখার কালে, ও কাজ অনায়াসে হইতে পারিত। বলা বাহুল্য, উৎকল ভাষা উঠাইতে কৃতকার্য্য হই নাই; লোকের কেবল বিরাগভাজন হইয়াছিলাম। কটকে থাকিতে সুপ্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আলাপ হয়।

তিনি সেখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সাধারণীর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা ৺গঙ্গাচরণ সরকারও আমাকে অতিশয় আদর করিতেন। তিনি সর্ব্বদাই সকলকে বলিতেন, "যদ্যপি এই যুবক কিঞ্চিৎ দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিনীত হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কালে এই যুবক ভারতবর্ষের শীর্ষস্থান অধিকার করিবে।"

"একদিন কটকের কাছারির বাহিরে দাড়াইয়া আছি, এমন সময় একটী সাহেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে কাছারির ভিতর লইয়া যাইলেন। সে স্থান হইতে আমরা দুইজনে রোমান কাথলিক গির্জ্জায় একটী বিবাহ দেখিতে যাইলাম। পরস্পরে সদ্ভাব হইল। সাহেব কলিকাতা হইতে কটকে গিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সার উইলিয়ম হণ্টার। তাঁহার তুল্য দয়াবান্ ভদ্রলোক আমি দেখি নাই। বিলাতে থাকিয়া তিনি আজ পর্য্যন্ত ভারতের দীন দরিদ্রের মঙ্গলের নিমিত্ত যত্ন করিতেছেন। এই দুর্ভিক্ষ সময়ে ইংরেজের নিকট হইতে টাকা আদায় করিবার জন্য তেজস্বী বাক্যে তিনি ইংলণ্ড কম্পিত করিয়া তুলিয়াছেন। হণ্টার সাহেব কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। অল্প দিন পরে তাঁহার নিকট হইতে পত্র পাইলাম। ১২৫ টাকা বেতনে তিনি একটী চাকরি দিয়া কলিকাতা আসিতে আমায় অনুরোধ করিলেন। ১৮৭০ সালের মে মাসে হণ্টার সাহেবের আফিসে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। হণ্টার সাহেব ও তাঁহার মেম আমার প্রতি অতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। আমি ঠিক তাঁহাদের ঘরের লোকের মত ছিলাম। তাঁহারা আমার কত আবদার, কত উপদ্রব যে সহ্য করিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। ১৮৭৫ সালে হণ্টার সাহেব বিলাত গেলেন। তিনি আমাকে বিলাত যাইতে অনুরোধ করিলেন। আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায় আমি সেবার বিলাত যাইতে পারিলাম না। যদি যাইতাম, তাহা হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

"ইংলিস্ম্যান আফিসে সণ্ডার্স ও বার্কেলে সাহেব আমাকে লইবার জন্য উৎসুক ছিলেন। সদাশয় হণ্টার সাহেবও আমাকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটী দিবার চেষ্টা করেন। এই সময় উত্তর পশ্চিমে কৃষি-বাণিজ্য আফিস হইতে ছিল। পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে দরিদ্রের দুঃখমোচনে সমর্থ হইব, এই উদ্দেশ্যে অন্যান্য আশা ছাড়িয়া দিয়া, এখানে হেডক্লার্কের পদ গ্রহণ করি। সার এডওয়ার্ড বক্ এই আফিসের কর্ত্তা। পৃথিবীতে তাঁহা অপেক্ষা সুহৃৎ আমার আর নাই।

সৌভাগ্যক্রমে আমি যে দুই তিন ইংরেজের কাছে কাজ করিয়াছি, [illegible] রা সকলেই উদারচরিত্র। বক্ সাহেবের আফিসে থাকিতে আমি দেশের উপকারের নিমিত্ত নানারূপ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। একটী দৃষ্টান্ত দিই ;—

"উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বহুকাল হইতে নানারূপ কারুকার্য্য গঠিত হইত। যথা—কাশীর রেশমের কাপড়, গোটা, পিত্তলের কাজ ইত্যাদি ; লক্ষ্ণৌয়ের—গোটা, চিকণ, সূচের কর্ম্ম, সোণারূপার কাজ, বিদরীর কাজ ; মুরদাবাদের—পিত্তলের উপর মিয়া কলম ; নগীনার কাঠের কাজ ইত্যাদি। হিন্দু-রাজাদের সময়ে এবং মুসলমানদের আমলে বাদসাহ, নবাব, আমীর, ওমরাও এই সকল দ্রব্যের আদর করিতেন। ইংরেজের অধিকারে এই সকল শিল্প কারুকার্য্য লোপ পাইতে বসিয়াছিল। দেখিলাম, ইংরেজ কর্ম্মচারীগণ এই সকল দ্রব্য ভালবাসেন ; কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়, ও কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা জানেন না। এদিকে খরিদদার অভাবে কারিকরগণ অতিশয় অন্ন-কষ্ট পাইতেছিল। শিল্পকাজ ছাড়িয়া ভিক্ষা কিংবা কৃষিকার্য্যে অগ্রসর হইতেছিল। এই কারিকর-দিগের ঘোরতর অন্নকষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত বক্‌সাহেবের নিকট অনুরোধ করিলাম। বক্‌সাহেব গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাঁচ সহস্র টাকা ঋণ গ্রহণ করেন, ইহার দ্বারা অতি উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিয়া এলাহাবাদ ষ্টেশনের নিকট একটী বড় হোটেলে রাখিয়া দিলাম। আমি নিজে হোটেলস্বামী সাহেবের সহিত সদ্ভাব করিয়া তাঁহাকে এই সকল জিনিষ বিক্রয় করিতে অনুরোধ করি এই হোটেলে বিলাতযাত্রী সাহেব-মেমগণ দুই একদিন অবস্থিতি করিতেন দেশে বন্ধু-বান্ধবগণকে উপহার দিবার নিমিত্ত সাহেব-বিবিরা এই সকল দ্রব্য অতি আগ্রহের সহিত কিনিতে লাগিলেন। হোটেল-স্বামী একজন ধনবান লোক। তাঁহার চক্ষু ফুটিল, গভর্ণমেণ্টের পাঁচ হাজার টাকা ফিরাইয়া দিয়া, তিনি নিজে অনেক দ্রব্য ক্রয়-বক্রয় করিতে লাগিলেন।"

"আজ কাল কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় নগরে, এমন কি বড় বড় রেলষ্টেসনে যে সকল ভারতীয় কারুকার্য্যের দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, ত্রৈলোক্য বাবুর উদ্যোগই সে সকলের প্রবলতম প্রতিষ্ঠাসাধন। যে সকল দ্রব্য বৎসরে একশত টাকার অধিক বিক্রয় হইত না, সেই সকল দ্রব্য এক্ষণে সহস্র সহস্র টাকার বিক্রীত হইতেছে ! এইরূপে শিল্পকরদের অবস্থা অনেক ফিরিল। অনেকে সঙ্গতিপন্ন হইল। ক্রয়-বিক্রয় করিয়া অনেক ব্যবসাদার

ধনবান্ হইলেন ; ভারতের অনেক প্রাচীন শিল্প বাঁচিয়া গেল। এই সকল টাকা বিদেশ হইতে দেশে আসিতে লাগিল। মুখো পাধ্যায় মহাশয় এইরূপ অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছেন।

ত্রৈলোক্য বাবু, বোধ হয়, আরও বড় চাকুরে হইতে পারিতেন, কিন্তু পরের দোষ নিজের ঘাড়ে লওয়াই তাঁহার স্বভাব, তাঁহার অধীনে প্রায় ত্রিশ-জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। হিন্দুস্থানীকে না লইয়া কেবল বাঙ্গালীকে লওয়ায় কখন কখন তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিরাগভাজন হইতে হইত। অনেক সময় অধীনস্থ কর্ম্মচারীরাও তাঁহার উপর বিলক্ষণ অব্যবহার করিত। ভাল কাজ করিতে গিয়া, বাহিরেও, অনেক সময় তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল একটা দৃষ্টান্ত দিই,—১৮৭৭-৭৮ সালে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ হয়। নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি হরিদ্বারের নিকট রাজঘাটে আসিয়া কিছুদিনের নিমিত্ত অবস্থিতি করেন। দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত লোকের কষ্ট দেখিয়া তিনি ব্যথিত হন, যব ক্রয় বরিয়া তিনি বিতরণ করেন। দিন দিন অনাহার-ক্লিষ্ট লোক বাড়িতে থাকে। যাহা অর্থ ছিল, যব কিনিতেই খরচ হইয়া গেল। এমন কি, এলাহাবাদ ফিরিবার তাঁহার খরচ পর্য্যন্ত রহিল না। কোন রকমে তৃতীয় শ্রেণীর একখানি টিকিটের মূল্য মাত্র তিনি কর্জ্জ পাইলেন। কাপড় চোপড়ের বাক্স সঙ্গে লইতে পারিলেন না, মালগাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে মূল্যবান্ দ্রব্যাদি যাহা ছিল, তাহা মালগাড়ীতে চুরি গেল। শিমলা, দিল্লি প্রভৃতি নানা স্থান হইতে, শালদোশালা নানা প্রকার পরিধেয় ও অপরাপর বহুমূল্য দ্রব্য তিনি বিস্তর সংগ্রহ কারয়াছিলেন ; সবই গেল।

এই সময়ে ত্রৈলোক্য বাবু জানিতে পারিলেন, গাজোরের চাষ করিয়া ও গাজোর খাইয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীগণ প্রাণে বাঁচিতে পারে। প্রতিবিঘায় কত গাজোর হয়, চাষাদের ক্ষেত খুঁজিয়া তাহা স্থির করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন গ্রাম ঘুরিয়া ফিরিয়া পূর্ব্বদিন কে কি খাইয়া দিনপাত করিয়াছিল, ত্রৈলোক্য বাবু তাহার তত্ত্ব লইলেন ; দুর্ভিক্ষ সময়ে গাজোর যে অতি উপকারী সামগ্রী, তাহা স্থির করিয়া ত্রৈলোক্য বাবু গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। গভর্ণমেণ্ট তাহা গেজেটে ছাপাইলেন। দুর্ভিক্ষসময়ে, যাহাতে তাড়াতাড়ি গাজোরের চাষ করিয়া লোকে প্রাণ বাঁচাইতে পারে, এরূপ শিক্ষা দিবার জন্য, গভর্ণমেণ্ট জেলায়

জেলায় কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন। দুই বৎসরের পরে রায়বেরেলী, সুলতান-পুর প্রভৃতি জেলায় দুর্ভিক্ষের সূচনা হইল। সে সময় সহস্র সহস্র লোক অনাহারে মরিয়া যাইত, কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগে, এই গাজো-রের জন্য সেবার জনপ্রাণী মরে নাই।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে গাজোর-সম্বন্ধে ত্রৈলোক্য বাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তদনুযায়ী গবর্ণমেণ্ট ১৩০৩ সালেও বিলাত হইতে কৃষকদিগকে বিতরণ করি-বার নিমিত্ত এক লক্ষ টাকার গাজোরের বীজ আমদানী করেন। বীজ বিলম্বে আসিয়া পৌঁছে। সুতরাং বিশেষ কোন ফল হয় না। মূলতত্ত্ব না জানিয়া সে সময় অনেক সংবাদপত্র গবর্ণমেণ্টকে দোষ দেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য মহৎ।

১৮৮২ সালে ভারতগবর্ণমেণ্টের রাজস্ববিভাগে ত্রৈলোক্য বাবু চাকরি হয়। উত্তর পশ্চিমের শিল্পের উন্নতির জন্য পূর্ব্বে ইনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সমুদয় ভারতের শিল্পকার্য্যের যাহাতে উন্নতি হয়, তিনি তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম ভারতে কি কি দ্রব্য হয়? দ্বিতীয়,—এই সব দ্রব্য কোথায় পাওয়া যায়? তৃতীয়, কি মূল্যে পাওয়া যায়?—এই সকল কথা লিখিয়া তিনি সামান্য একখানি পুস্তক ছাপাইলেন। এই সামান্য পুস্ত-কের তালিকার গুণে ইউরোপীয়গণের চক্ষু ফুটিল। ইহার প্রভাবে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের লোকে লক্ষ লক্ষ টাকার ভারতীয় শিল্প করিতে লাগিল। সাহেবেরা আপনাদের কারুকার্য্য বিক্রয় করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে টাকা লন, কিন্তু আমাদের কারুকার্য্য বেচিয়া সাহেবদের নিকট হইতে কিরূপে টাকা লইব, সে বিষয়ে ত্রৈলোক্য বাবুর বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং তিনি এ পর্য্যন্ত অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

১৮৮২ সালে হলাণ্ডদেশে আমষ্টার্ডাম্ নগরে এক মহামেলা হয়। গভর্ণমেণ্ট ত্রৈলোক্য বাবুকে ঐ মহামেলায় যাইতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মত না হওয়ায়, তিনি যাইতে পারিলেন না। এই সময়ে অকারাদি বর্ণানুক্রমে ত্রৈলোক্য বাবু ভারতে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহার একখানি ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করেন।

১৮৮৩ সালের কলিকাতার আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে কোন কোন বিষয়ের অধ্যক্ষভার ত্রৈলোক্য বাবুর প্রতি অর্পিত হয়। নানা দ্রব্যাদি বিচার করিয়া

মেডেল দিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একজন বিচারকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৮৬ সালে বিলাতের প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। এইবার ত্রৈলোক্য বাবুকে বাধ্য হইয়া বিলাত যাইতে হইল। দেশের বহু উপকারের সম্ভাবনায় তিনি গেলেন। বিলাতে সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিয়াছিল। মহারাণী ও রাজ-পুত্রগণ এবং রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রতি অনেক অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। লর্ড প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও তাঁহাকে অনেক আদর করিয়াছিলেন। বিলাত গমনকালে কয়েকজন উদারহৃদয় সন্ন্যাসী সাধুর নিকট তিনি প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বিলাত গিয়া নিজের স্বার্থের দিকে তিনি একবারে দৃষ্টি রাখিবেন না। বিলাতের কোন কোন বড় লোক তাঁহাকে উচ্চ পদ পাইবার নিমিত্ত ভারতের গবর্ণর জেনারলের নিকট চিঠি দিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু তাহা লইলেন না। এবার বিলাতে তিনি দশমাস কাল অব-স্থিতি করেন। ত্রৈলোক্য বাবু বলেন, 'বিলাতে এই কয়মাস, যতদূর সম্ভব, তিনি আহারাদি বিষয়ে দেশাচার রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন।' তিনি আরও বলেন, তাঁহার সঙ্গে পাচক-ব্রাহ্মণ ছিল এবং হিন্দুর আহারোপযোগী খাদ্য-সামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে ছিল।' অধিকন্তু, বিলাতে এই কয় মাসের জন্য ভারতীয় একটী বাজারও বসিয়াছিল।

ইংলণ্ড হইতে ত্রৈলোক্য বাবু স্কটলণ্ডে গমন করেন। স্কটলণ্ড হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর, হলাণ্ড, বেলজিয়ম, পরে ফ্রান্স, জার্ম্মণী,—তথা হইতে অষ্ট্রিয়া, পরে ইটালী গিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। অল্প দিন পরেই কর্ম্মোপলক্ষে পুনরায় তাঁহাকে তিন সপ্তাহের জন্য বিলাতে যাইতে হয়। ত্রৈলোক্য বাবুর "Visit to Europe" গ্রন্থে সমু-দয় বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

বিলাত হইতে আসিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে জয়পুর আসেন। তথায় তিনি তাঁহার আত্মীয় জয়পুরের দেওয়ান পরলোকগত কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় প্রায়শ্চিত্ত ও পুনঃ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন।

ত্রৈলোক্য বাবু ১৮৮৬ সালে রাজস্ব বিভাগের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মে চাকরি গ্রহণ করেন। এই চাকরি করিতে করিতে তিনি গবর্ণ-মেণ্টের অনুরোধে "Art Manufactures of India" নামক একখানি

বৃহৎ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে দেশের অনেক শিল্পীর বিশেষ উপকার হইয়াছে। শারীরিক অসুস্থ হওয়ায়, ১৮৯৬ সালের মার্চ্চ মাসে তিনি পেন্সন লন, এ রুগ্ন অবস্থায়ও তাঁহার কার্য্যের বিরাম নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে নীরোগ করিয়া চিরজীবী করিয়া রাখুন।

বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত জন্মভূমির সৃষ্টি হইতেই মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। "বিশ্বকোষ" নামক বৃহৎ অভিধান তিনি এবং তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই প্রথম প্রকাশ করেন। অ, আ বর্ণ দুইটী দুইখানি বৃহৎ পুস্তকে শেষ হয়। এখন এই "বিশ্বকোষ' শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্পাদন করিতেছেন। বঙ্গবাসীতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুবিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কতকগুলি ভাষায় অধিকার আছে। ইংরেজী ও বাঙ্গালায় ত আছেই, তাহা ছাড়া, উড়িয়া, হিন্দী, পারশী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ভাষায়ও অধিকার কম নহে। ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, নরতত্ত্ব, উদ্ভিত্তত্ত্ব, প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক বিজ্ঞানশাস্ত্রে অধিকারের নিমিত্ত, ইউরোপীয়গণ তাঁহার বিশেষ সন্ধান করিয়া থাকেন। এক জ্যোতিষ ও সঙ্গীতবিদ্যা ভিন্ন সকল বিদ্যাতেই তাঁহার অল্পাধিক অভিজ্ঞতা আছে।

এই রুগ্ন অবস্থায়ও ত্রৈলোক্য বাবু "Wealth of India" নামক এক-ইংরেজী মাসিক পত্রের সম্পাদন বিষয়ের সহায়তা করেন। এক সময়ে অনেক ইংরেজী কাগজের সহিতও ইঁহার বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

"কঙ্কাবতী" "ভূত ও মানুষ" "ফোক্লা দিগম্বর," "মুক্তমালা" প্রভৃতি ত্রৈলোক্য বাবুর কয়েকখানি নূতন ধরণের গল্প গ্রন্থ আছে। এই সকল গল্প গ্রন্থেও তাঁহার বহু গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে।

পরলোকগত ডাক্তার কানাইলাল দে ও ত্রৈলোক্য বাবু একত্রে "বিজ্ঞানবোধ' নামে একখানি উৎকৃষ্ট স্কুল-পাঠ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ত্রৈলোক্য বাবু ইহা ব্যতীত আরও অনেক স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্‌ এ।

ইনি প্রায় ৫১ বৎসর পূর্ব্বে ২৪ পরগণা-নৈহাটী গ্রামের প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রপিতামহ, তাঁহার জন্মভূমি যশোহর প্রদেশ হইতে "গঙ্গাবাস" করিতে আসিয়া নৈহাটীতে অবস্থিতি করেন। ইহাঁদের আদি বাসস্থান যশোহরে। ইহাঁর পিতার নাম ৺ কমল লোচন ন্যায়রত্ন। ন্যায়রত্ন মহাশয় সেই সময়ের নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর নৈয়ায়িক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। শুধু তিনি কেন, তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণও পুরুষানুক্রমে বিশেষ প্রতিষ্ঠার সহিত ন্যায় শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। নৈহাটীর ভট্টাচার্য্য বংশের কৃতী ছাত্রগণ এক সময়ে বঙ্গদেশের নৈয়ায়িক কুলের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। ৫০।৬০ জন ছাত্রের আহার ও বাস-স্থানাদি দিয়া, সুবৃহৎ চতুষ্পাঠী স্থাপনের জন্য এক সময়ে উক্ত ভট্টাচার্য্য বংশ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। নবদ্বীপের নৈয়ায়িককেশরী ৺ মাধবচন্দ্র তর্ক-সিদ্ধান্ত মহাশয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতামহের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। একথা আমরা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের অগ্রজ ৺ নন্দলাল ন্যায়চুঞ্চু মহাশয়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিতে হইবে না। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে একসময়ে অতি অল্প বয়সেই বঙ্গের নৈয়ায়িক কুলের অগ্রণিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিচার করিতে তখনকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণ ভীত হইতেন। এক সময়ে নবদ্বীপের সুবিখ্যাত ৺ শ্রীরাম শিরোমণি মহাশয়ও ন্যায়চুঞ্চু মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্রের বিচারে পরাজিত হইয়াছিলেন। সে বিচারের কাহিনী এখনও বঙ্গের বৃদ্ধ নৈয়ায়িক কুলের মুখে শুনা যায়। ন্যায়চুঞ্চু মহাশয় এক সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। কিছুকাল ঐ কার্য্য অতি সুখ্যাতির সহিত সম্পন্ন করিয়া পরে ঐ পদত্যাগপূর্ব্বক তিনি বিদ্যালয়ে মুরশিদাবাদ-কান্দী অধ্যাপনার জন্য প্রস্থান করেন।

শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মেঘনাদ ভট্টাচার্য্য বি, এ মহাশয়ের নামও বঙ্গের সাহিত্য-সেবকগণের অবিদিত নহে। তাঁহার সুচিন্তিত সারগর্ভ প্রবন্ধাবলী বক্ষে ধারণ করিয়া, বঙ্গের অনেক সংবাদপত্র আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। মেঘনাদ বাবু এখন রাজপুতনা-জয়পুর মহারাজ কালেজের ভাইস-প্রিন্সিপালের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতা ৺ শম্ভূচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বহুকাল যাবত অতি দক্ষতার সহিত গড়োয়াল

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। শম্ভুচন্দ্রের মন্ত্রিত্ব-সময়ে, মিত্ররাজ্য গাড়োয়ালের যে সমুদয় শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, তাহা গাড়োয়াল-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত রহিয়াছে। শম্ভুচন্দ্র বঙ্গদেশবাসী হইয়াও, স্বীয় অসিত প্রতিভা-বলে গড়োয়াল প্রদেশে, তাঁহার নিজের অধ্যক্ষতায় বড় বড় চাবাগান অতি শৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত করিয়া, তাহা হইতে প্রচুর লাভ দেখাইয়া, অনেক চাকর সাহেবের অসূয়াভাজন হইয়াছিলেন। ঐ প্রদেশ "শম্ভুবাবুর" উদ্দেশে এখনও সকলের মস্তক ভক্তিভরে অবনত হয়।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মাতামহকুলও পুরুষপরম্পরাক্রমে ন্যায়, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র—অধ্যাপনার জন্য বঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ।

শাস্ত্রী মহাশয়ের মহামহের নাম ৺ রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় এক সময়ে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। সে অতি প্রাচীন কালের কথা, তখন সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সি-পালের পদ সৃষ্ট হয় নাই।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের স্বর্গারোহণের অব্যবহিত পরেই প্রাতঃস্মরনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় ঐ পদে কিছুদিনের জন্য নিযুক্ত হয়েন। কি মাতৃকুল, কি পিতৃকুল, শাস্ত্রী মহাশয়ের উভয় কুলই যেমন বিদ্যার গৌরবে—তেমনিই বংশমর্য্যাদায়—বঙ্গের ব্রাহ্মণকুলের অগ্রণী।

শাস্ত্রী মহাশয়ের অতি শৈশবেই পিতৃবিয়োগ হয়। এই অসময়ে পিতৃবিয়ো-গের ফলে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের পড়া-শুনার ভার নিজেরই স্কন্ধে পতিত হয়। তিনি নিঃসহায় অবস্থায় কপর্দ্দকশূন্য হইয়া কলিকাতায় আসেন উদ্দেশ্য সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সময়ে ইহাঁকে বাস-স্থানাদি দিয়া যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। সংস্কৃত কলেজের স্কুল বিভাগের নিম্নশ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়া, শুধু স্কুলের পড়াতেই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। ছুটীর সময়ে নৈহাটীতে গিয়া, তিনি ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ ৺ জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট ব্যাকরণ ও কাব্য অলঙ্কার প্রভৃতিও অধ্যয়ন করিতেন। ঋষিকল্প ন্যায়-ভূষণ মহাশয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের অমানুষী প্রতিভা দেখিয়া,—বিশেষ যত্ন সহকারে অধ্যাপনা দ্বারা তাঁহাকে ঐ সকল শাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিয়া দেন। শাস্ত্রী মহা-শয়ের অধ্যয়ন-স্পৃহা কিরূপ, তাহা এই নিম্নস্থ ঘটনাটিতেই বেশ বুঝা যায়। তিনি সংস্কৃত কালেজের এন্‌ট্রেন্স ক্লাশে উঠিবার পূর্ব্বেই কালেজ লাইব্রেরীর যাবতীয়

ঐতিহাসিক পুস্তকগুলি ,,আদ্যন্ত পড়িয়া ফেলেন। স্কুলে প্রবেশ করিবার পর হইতে পাঠ সমাপন পর্য্যন্ত বরাবরই তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত পারিতোষিক পাইয়া, কি স্কুল কালেজের পরীক্ষা, কি ইউনির্ভারসিটি পরীক্ষা—সকলগুলিতেই উত্তীর্ণ হয়েন। কালেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ কালে শাস্ত্রী মহাশয় "ভারত মহিলা" নামক সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়া, মহারাজ হোলকার প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। এই তাঁহার বাঙ্গালার প্রথম পুস্তক। "ভারত মহিলা" যখন প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, সে সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্য মধ্যে ইহাঁর যে সম্মান জন্মিয়াছিল, তাহা প্রাচীন বঙ্গীয় পাঠকের অবিদিত নহে। "ভারত মহিলা" পুস্তকাকারে বাহির হইবার পূর্ব্বে, ইহা প্রথম ৺ রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময় হইতেই বঙ্কিম বাবুর সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনেক প্রবন্ধ ক্রমে ক্রমে বাহির হইতে থাকে। ঐ সকল প্রবন্ধের মধ্যে কতিপয়ের নাম নিম্নে লিখিত হইল;—"কালিদাস ও সেক্‌সপিয়র" "তৈল" "হৃদয় উদাস" "যৌবনে সন্ন্যাসী" "মেঘদূত" "কালেজী শিক্ষা' 'কাঞ্চন মালা' ত্যাদি এই ইসকল প্রবন্ধের পরিচয় নূতন করিয়া দেওয়া অনাবশ্যক।

শাস্ত্রী মহায়ের আর এক অক্ষয় কীর্ত্তি 'বাল্মীকির জয়';——এ পুস্তকের পরিচয় নূতন করিয়া বাঙ্গালী পাঠকের কাছে দেওয়া পুনরুক্তিমাত্র। "বাল্মীকির জয়" প্রকাশিত হইবার পর উহা যে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, তাহা সুবিখ্যাত বঙ্কিম বাবুও মুক্তকণ্ঠে তাঁহার বঙ্গদর্শনে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর অন্য পুস্তক, "কাঞ্চন মালা"——এই কাঞ্চনমালা উপন্যাস,—"বঙ্গদর্শনে "প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনি আরও অনেক গ্রন্থাদি রচনা করেন। ইহাঁর বিরচিত "ভারতবর্ষের ইতিহাসে" ভারতের প্রাচীন অবস্থা—সেই অতীত কাহিনী ঠিক চিত্রের ন্যায় পাঠকের মানসচক্ষে প্রতিভাত হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু-রাজত্বের বিলুপ্ত গৌরব জ্ঞাত হইতে হইলে, ইহাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাস" ছাড়া অন্য সুলভ গতি নাই।

কয়েক বৎসর হইল, ইহার অলৌকিক প্রতিভার ফল—"কালিদাস ব্যাখ্যা" নামক পুস্তক বাহির হইয়াছে। মহা কবি কালিদাস প্রণীত "মেঘদূত" লইয়া এই পুস্তক রচিত। ইহা "মেঘদূতের" শ্লোকের ব্যাখ্যা নহে,—এ গ্রন্থে কালিদাসের প্রিয় ভক্ত, কালিদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া, তদীয় অনুপম কাব্য মেঘদূতের

কবিত্ব-সৌন্দর্য্যের সমালোচনা করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক পড়িয়া দেখিয়াছি,—কালিদাসের কবিতার অনন্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার প্রিয়ভক্তের ভাবোচ্ছ্বাসে মিশিয়া আর অনুপমও হইয়াছে। কালিদাস যেখানে যে প্রকার ভাব বিন্যাস করিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয় তদীয় সমালোচনী পুস্তিকায়ও ঠিক সেইখানে সেইরূপ ভাবের অভিব্যক্তি করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই। এই পুস্তক বঙ্গসাহিত্যের কোহিনুর। যত দিন যাইবে, কালিদাসের আদরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহারও তত আদর বৃদ্ধি হইবে।

শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ ়ংপন্ন বলিয়া এক দিকে যেমন রাজকীয় "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিরত্নে মণ্ডিত হইয়াছেন, অন্যদিকে পাশ্চাত্য বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী বলিয়া, প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে ভারতে অদ্বিতীয় বলিয়া, "বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীর" প্রত্নতত্ত্ব সমিতি বিভাগের সেক্রেটরী নিযুক্ত । অসামান্য গবেষণা ও অলৌলিক সূক্ষ্ম দৃষ্টির সহিত ঐ পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের গবেষণা-শক্তির ফলে, আজ ইংলণ্ড, জার্ম্মণী, রুষিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের মনস্বী পণ্ডিতগণ প্রত্নতত্ত্ববিষয়ে জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত। পৃথিবীর যেখানে যেখানে প্রাচীন তত্ত্বের আদর আছে, সেখানেই শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষরূপে সমাদৃত। তাঁহার ইংরাজীতে লিখিত প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক বহু পুস্তক ও প্রবন্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও প্রমাণ স্বরূপে পরিগৃহীত ও আদৃত হইতেছে। বাঙ্গালী আমরা, আমাদের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ইহাঁর যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, তিব্বতীয়, পালি, জার্ম্মান ও ফরাসী দেশীয় ভাষায়ও সেইরূপ বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি। মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপকে এমন পাশ্চাত্য ভাষা বিজ্ঞানে অসাধারণ নৈপুণ্য এক শাস্ত্রী মহাশয়েই দেখিতে পাওয়া যায়। এমন মণি-কাঞ্চন-সংযোগ ভারতে এই সর্ব্বপ্রথম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের গৌরবান্বিত অধ্যক্ষ পদে সমাসীন। ইহাঁর আমলে এই কয়েক বৎসরের মধ্যেই সকল দিকেই সংস্কৃত কালেজের শ্রীবৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। ইহাঁরই পরামর্শানুসারে আমাদের ন্যায়পরায়ণ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজে আরও তিনটি নূতন অধ্যাপকের পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন। স্কুল বিভাগেও তিনজন অতিরিক্ত নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। সংস্কৃত কালেজে পূর্ব্বে মাত্র এম্, এ, পরীক্ষায় "এ গ্রুপ" পড়ান হইত। ইনি অধ্যক্ষ হইয়াই ক্রমে বি, ও ডি, গ্রুপ

খুলিয়া দেন। বিশেষ যশের সহিত বহু ছাত্র এখন ঐ সমুদয় দার্শনিক এম্ এ পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতেছে। উপাধি বিভাগে এবং সংস্কৃত আদ্য মধ্য পরীক্ষায় ইহাঁর সময়েই ছাত্রেরা সংস্কৃত কালেজ হইতে ন্যায়, স্মৃতি, বেদান্ত, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাশ হইতেছে। স্কুলবিভাগেরও বহু ছাত্র, প্রায় ৩০।৪০ জন করিয়া প্রতি বৎসর সংস্কৃত আদ্য মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়া, বেশ সহজেই অনুমিত হয় যে, ইহাঁর সময়ে সংস্কৃত অধ্যয়নে লোকের মতি গতি কিরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং কালেজের সংস্কৃত শিক্ষার প্রণালী উত্তরোত্তর কত দূর উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। শাস্ত্রী মহাশয় স্বীয় গুণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াও, চাল-চালনে বেশ-ভূষায় আচার-ব্যবহারে দয়া সৌজন্যে সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায়। তাঁহার অকৃত্রিম বিনয়নম্র ব্যবহার, যে একবার অনুভব করিয়াছে, সে জীবনে কখনও বিস্মৃত হইবে না। তাঁহার চরিত্রের প্রধান গুণ এই যে, তিনি সর্ব্বদা ন্যায়ের বাধ্য, তিনি একমাত্র গুণেরই পক্ষপাতী, খোসামোদের বাধ্য তিনি নন্। মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া, তাঁহাকে কেহ এ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে পারে নাই। তাঁহার সাহসিকতা আছে, কিন্তু ঔদ্ধত্য নাই, গাম্ভীর্য্য আছে, কিন্তু কপটতা নাই, ধার্ম্মিকতা আছে কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর নাই।

মহাকবি ভবভূতির—"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোনুবিজ্ঞাতুমর্হতি" এই উক্তি শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি প্রযোজ্য।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

নদীয়া জেলার সুবর্ণপুর গ্রামে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ জন্ম গ্রহণ করেন। কলিকাতা সহরেই ইহাঁর শিক্ষালাভ হয়। ইনি এম্-এ। সংস্কৃত ভাষায় ইনি উত্তমরূপ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভরত শিরোমণি, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির সাহায্যে ইহাঁর শিক্ষা-সৌষ্ঠব সাধিত হয়। ইনি বিস্তর আর্য্য শাস্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ব্যাপারে ইনি তাঁহার অনুকূল এবং সহায় ছিলেন। ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা ইহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

কাথিড্রাল মিশন কলেজে ইনি কিছুকাল সংস্কৃতের অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন। এই সময়েই ইহাঁর আর্য্য দর্শন প্রকাশিত হইতে থাকে। এক সময়ে আর্য্যদর্শনের প্রসিদ্ধি যথেষ্টই হইয়াছিল। ১৮৮০ সালে ইনি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেরের কর্ম্ম

গ্রহণ করেন। এই কর্ম্মে ইহাঁর অপক্ষপাত বিচারবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় বহুশঃ পরিস্ফুট হইয়াছিল। অনেক সময়ে ইনি কার্য্য ত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র সাহিত্য-সেবা করিবার জন্যই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন বটে, কিন্তু অর্থ স্বল্প গতিকে তাহা পারেন নাই। দিনাজপুর, রঙ্গপুর এবং যশোহর প্রভৃতি স্থানে ডেপুটী ম্যাজিষ্টরের কার্য্যে অবস্থিত রহিয়া, ইনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন; মেলেরিয়া প্রভৃতি দারুণ রোগে আক্রান্ত হন। দ্বারভাঙ্গায় ইহাঁর ব্যাধি ক্রমেই প্রবল হইতে থাকে। চিকিৎসার জন্য ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় কোন চিকিৎসাতেই ফললাভ হইল না। ১৩১১ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ইহাঁর দেহান্তর হইয়াছে।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যথা,—(১) গ্যারিবল্ডির জীবন বৃত্ত; (২) ওয়ালেসের জীবন বৃত্ত; (৩) আত্মোৎসর্গ; (৪) জনষ্টুয়াট মিলের জীবন বৃত্ত; (৫) ম্যাট্‌সিনির জীবনবৃত্ত; (৬) হৃদয়োচ্ছ্বাস; (৭) প্রাণোচ্ছ্বাস; (৮) মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জীবন বৃত্ত; (৯) শান্তিপাগল; (১০) কীর্ত্তিমন্দির; (১১) সমালোচন মালা; (১২) জ্ঞানসোপান; (১৩) চিন্তা-তরঙ্গিনী; (১-৪১৬) শিক্ষাসোপান ৩ ভাগ, (১৭-২৪) আইন সংগ্রহ ৮ ভাগ, (২৫-২৭) জ্ঞান সোপান তিন ভাগ প্রভৃতি। ইহাঁর ভাষা-রচনায় একটু পরিচয় লউন;—

"যেরূপ জড়জগতের রবি, শশী, তারা, কখন গগনে কখন গভীর সাগর গহ্বরে, সেইরূপ মানব-জগতেরও রবি শশী তারা, কখন কাল-শিখার, কখনও কাল-গহ্বরে। তবে প্রভেদ এই যে, জড় জগতে কোন বৈচিত্র্য বা পরিবর্ত্তন নাই, কিন্তু মানব-জগতে নিরন্তর বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। মানব-জগতের ল্যককার রবি শশী তারার সহিত অলকার রবি শশী তারার অনেক বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। কাল যে ভবভূতি ও মিল্‌টন, কালিদাস ও সেক্সপিয়ার, কপিল ও মিল্, শাক্যসিংহ ও কোমত,—মানব-জগতের রবি শশী তারা ছিলেন, সে রবি শশী তারা মানব-গগনে আর কখন উঠিবে না। আজ একজন টলেমী জড়-জগতের রবি শশী তারার গতি ও বস্তুনির্ণয়ে অসমর্থ হউন, কাল সহস্র কোপার্ণিকস সহস্র গ্যালিলি অভ্যুত্থিত হইয়া তন্নির্ণয়ে সমর্থ হইবেন। কারণ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জড় গগনে যে রবি শশী তারা উদিত হইয়াছিল, কোপার্ণিকস ও গ্যালিলিওর সময়েও সেই রবি শশী তারা অনন্ত আকাশে গভীর

সাগরে একই নিয়মে একবার উঠিত—একবার ডুবিত। কিন্তু মানব-জগতে কাল যে রবি শশী গগনে একবার উঠিয়া ডুবিয়াছে, সে রবি শশী তারা আর গগনে উঠিবে না; আর গগনে উঠিয়া ডুবিবে না।”

মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

১৭৫৮ শকাব্দের ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবা একদণ্ড থাকিতে ইহাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺ রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ। তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতা পিতার প্রথম সন্তান। ইহাঁর জন্ম হইলে রামনাথ-বিদ্যাভূষণ নামক একটী পণ্ডিত, ইহাঁর মাতার মাতুলের নিকট নিম্নলিখিত কবিতাটী দ্বারা জন্মসংবাদ জ্ঞাপন করেন।

আপনার অগ্রজাসুতা হয়েছেন পুত্রসুতা,
উনিশে কার্ত্তিক গুরুবার,
দণ্ডেক দিবস স্থিতে জয়ধ্বনি চতুর্ভিতে,
লিখিলাম মঙ্গল সমাচার।

তর্কালঙ্কার মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের আদি বংশজকুল-সম্ভূত। ইহাঁর দশ কি একাদশ পুরুষ পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি রাঢ় দেশের অনির্দ্দিষ্ট কোন গ্রাম ত্যাগ করিয়া ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সেরপুরে বাস করেন। ইহাঁর পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এ জেলার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলাপ-ব্যাকরণ ও নব্যস্মৃতির কয়েকখানি গ্রন্থ পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, ইহাঁর পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে ইনি বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ সারস্বত ক্ষেত্র নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক বিখ্যাত স্মার্ত্ত ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায় এবং কাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

কিছু কাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, পুনরায় নবদ্বীপে আগমন করার সঙ্কল্প করেন, কিন্তু কোন কারণে নবদ্বীপে আসা ঘটে না, সুতরাং কিছুকাল বিক্রমপুরের দীননাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তাহার পর, পুনরায় নবদ্বীপে আগমনপূর্ব্বক পাঠ সমাপ্ত করিয়া ‘তর্কালঙ্কার’ উপাধি

গ্রহণ করেন এবং দেশে প্রত্যাগত হইয়া বাঙ্গালা ১২৬৮ সালে স্বীয় বাসভূমি সেরপুরে চতুষ্পাঠী করেন। ঐ সময় তিনি দেশীয় প্রথা অনুসারে স্বীয় চতুষ্পাঠীতে সমাগত বহু ছাত্রকে যুগপৎ অন্নদান ও বিদ্যাদান করিতেন।

এই সময় বারাণসীর পণ্ডিত-স্বামীর ছাত্র হরচন্দ্র বেদান্তবাগীশ মহাশয় কোন কারণে সেরপুরে উপস্থিত হন। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া তাঁহার সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন। বস্তুতঃ এই আলোচনার ফলেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বেদান্ত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি সমধিক দৃঢ় হয়।

তাহার পর, ইনি সামবেদান্তর্গত গোভিলগৃহ্যসূত্র দেখিবার মানসে একখানি হস্তলিপির জন্য এসিয়াটিক সোসাইটীতে পত্র লেখেন। সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ ইহাঁর নিকট হস্তলিপি প্রেরণ করেন এবং উক্ত গ্রন্থের প্রতি সমধিক অনুরক্ত দেখিয়া উহার সম্পাদন ভারও ইহাঁর উপর অর্পণ করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় উহার ভাষ্যের হস্তলিপি চাহিয়া পাঠান। কিন্তু উহা না পাওয়ায় স্বয়ংই উহার একটী ভাষ্য প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কৃত ভাষ্য দর্শনে সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষগণ সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত ভাষ্য সহিত গোভিল গৃহ্যসূত্র প্রকাশিত করেন। এই গ্রন্থই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সর্ব্ববিধ সৌভাগ্যের প্রসূতি। এই সূত্রেই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত ইহাঁর পরিচয় হয়।

ইংরাজী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের অলঙ্কার ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ইনি প্রশংসার সহিত অধ্যাপনা করিতে থাকেন। ভারত-গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর কার্য্যকলাপে পরিতুষ্ট হইয়া ইংরাজী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ইহাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে বিভূষিত করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বদেশে থাকিতে ও সংস্কৃত কলেজে অবস্থান কালে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। নিম্নে উহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

সংস্কৃত সাহিত্য যথা ;—প্রবোধষট্‌ক, যুবরাজ-প্রশস্তি, সতীপরিণয়, কৌমুদী-সুধাকর, আনন্দতরঙ্গিণী, ভাবপুষ্পাঞ্জলি।

সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্র যথা ;—গোভিলগৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, শ্রাদ্ধ কল্পভাষ্য, গৃহ্য-সংগ্রহ ভাষ্য।

ব্যাকরণ শাস্ত্র যথা ;—শিক্ষা (বাঙ্গালা) সত্যবতীচম্পূ (বাঙ্গালা)।

দর্শন শাস্ত্র যথা ;—মহর্ষি কণাদ-প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলি-টীকা, তত্ত্বাবলী সটীক।

ইং ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময় কলিকাতার শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্ত শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের হস্তে পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও বক্তৃতা করার জন্য আহ্বান করেন। যাঁহারা প্রার্থী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তর্কালঙ্কার মহাশয়ই সমধিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। সুতরাং কর্তৃপক্ষ ইহাঁরই আবেদন গ্রাহ্য করেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য দর্শনের মতের সহিত পাঁচ বৎসরকাল ব্যাপিয়া বেদান্ত শাস্ত্র-সংক্রান্ত পাঁচটী লেক্‌চার দেন। ইউনিভার্সিটীহলে এই লেক্‌চার হয়। এখানে একটী কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তার পদে নিযুক্ত করিয়া আদেশ করেন যে, সর্ব্বসাধারণে ঐ লেক্‌চার শুনিবার জন্য উপস্থিত হইতে পারিবেন। ঐ বিষয় অবগত হইয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় সিণ্ডিকেটকে জানান যে, আমি হিন্দু ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর নিকট দর্শন শাস্ত্রের বক্তৃতা করিতে পারিব না। কিন্তু সিণ্ডিকেট প্রথম উহাতে সম্মত হন না, শেষে তর্কালঙ্কার মহাশয় পদত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করেন। তদনুসারে কেবল হিন্দু সমাজের লোকেরাই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বক্তৃতা শ্রবণের অধিকারী হইয়াছিলেন। এস্থলে ইহাঁর বিশেষ চিত্তের দৃঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি উহা শুনিতে যাইতেন। পাঁচ বৎসরেরই লেক্‌চার বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার জন্য ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের হস্ত হইতে পঁচিশ হাজার টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই বেদান্ত লেক্‌চার বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয়-সম্পদ্। এই সকল কারণে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সমধিক প্রতিষ্ঠা। চতুষ্পাঠী স্থাপন অবধি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইনি অনেক ছাত্রকে কাব্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্মৃতিতে, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াইয়াছেন। ইহাঁর ছাত্রগণ সকল শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষাতেই বৃত্তি ও পারিতোষিক সহ উত্তীর্ণ

হইয়াছেন। ইঁহার ছাত্রগণ ভারতবর্ষের বহু স্থানে অধ্যাপনা কার্য্যে নিরত থাকিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সাহিত্যসেবা উপলক্ষে বহু য়ুরোপীয় পণ্ডিতের সহিত পরিচয় হয়। তন্মধ্যে ভট্ট মোক্ষমূলর, কাউয়েল, ডাউসন্, মণিয়ার উইলিয়াম্ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটী ইঁহাকে অনারারি মেম্বর নিযুক্ত করিয়াছেন। এখনও ইনি অধ্যাপনায় ও গ্রন্থপ্রণয়নে বিরত নহেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় অধুনা কলিকাতা মহানগরীতেই অবস্থান করিতেছেন।

সত্যচরণ শাস্ত্রী।

ইং ১৮৬৬ সালে ১২ই এপ্রেল ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী গঙ্গাতটবর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইঁহার পিতা প্রথমে গবরমেণ্টের কর্ম্ম করিতেন; পরে সরকারী কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, স্বয়ং স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন। এই কর্ম্মে তিনি সুখ্যাতি লাভ যথেষ্টই করিয়াছিলেন। পিতামহ নবকুমার চট্টোপাধ্যায় বহুদিন গবরমেণ্টের মিলিটারী বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে কর্ম্মপটুতার জন্য বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন;—পুরস্কৃতও করেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি হিসাব প্রভৃতি কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। ইনি ৯৫ বৎসর জীবিত ছিলেন। সত্যচরণের প্রপিতামহ ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। ইনি ৭০ বৎসর গবরমেণ্টের পেন্‌সন ভোগ করেন। ৺কাশীধামে ইঁহাদের পরলোক হয়। শাস্ত্রী মহাশয় প্রতাপাদিত্যের প্রধান মন্ত্রী ও সেনাপতি শঙ্করের বংশধর।

২৪ পরগণা-দক্ষিণেশ্বরে ইঁহার বাল্য-শিক্ষাদি হয়। বাঙ্গলা এবং ইংরাজী দুই ইনি কিছু কিছু শিক্ষা করেন। ইনি পনরবর্ষ বয়সে কাশীতে গবরমেণ্ট কলেজ এবং দ্বারভাঙ্গা মহারাজার পাঠশালায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং কাশীধামেই শ্রীমৎ পরিব্রাজকাচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী ইঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

তাঁহার নিকট ইনি অধ্যয়ন করেন। সরস্বতী মহারাজ ইহাঁকে সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করেন। ইহাঁরই দ্বারায় শাস্ত্রী মহাশয় বহু নরপতির সহিত পরিচিত হন; হরিদ্বার, কাশ্মীর প্রভৃতি বহু তীর্থ ইহাঁর সহিত ভ্রমণ করেন। কাশীধামে ইনি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন; কাশীতে দিঘাপতিয়ার রাজার বাটীতে থাকিতেন; সেখানে বহু ছাত্রকে ইনি অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন। ইহাঁর কাশীতে অবস্থান কালেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হয়। পরে ইনি কাশী হইতে বোম্বাই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিতে যান; সেখানে কোলাপুর প্রভৃতি পর্য্যটন করেন; জষ্টিস রাণাদের সহিত পরিচিত হন; শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে হালিবনের জীবনী লিখেন। ইহাঁর পিতাঠাকুর বলেন,—শিবাজীর জীবনী লিখা উচিত। তদনুসারে শিবাজী-জীবনীর উপকরণ-সংগ্রহের জন্য শাস্ত্রী মহাশয় বোম্বাই পরিভ্রমণ করেন। বোম্বাই সহরে বসিয়াই শাস্ত্রী মহাশয় শিবাজীর জীবনী রচনা করেন। কোলাপুর, বড়োদা প্রভৃতি বহু মহারাজেরই নিকট ইনি সংকৃত হন।

হুগলী জেলায় শ্রীরামপুরে জেনেরল মেনওয়ারিং খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইহাঁর নিকট শাস্ত্রী মহাশয় অনেক বিষয় পড়াশুনা করেন,—রুষ ভাষা কি শিক্ষা করেন। বোম্বাই অঞ্চলে ইনি রুষের গুপ্তচর বলিয়া ডিটেকটিব পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু অব্যাহতি পান। বোম্বাইয়ে গ্রন্থ রচনা শেষ করিয়া, শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় আসেন। কলিকাতার গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। প্রতাপাদিত্যের জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্য ইনি যশোহর, সুন্দরবন প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করেন। এই গ্রন্থও কলিকাতাতেই রচিত এবং মুদ্রিত হয়। ইহার কিছুদিন পরে মহারাজ নন্দকুমারচরিতের সূচনা। ইহাঁর জীবনীর জন্য ইনি বীরভূম মুরর্শিদাবাদ এবং রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া নানারূপ তথ্য সংগ্রহ করেন। মুরশিদাবাদের নবাববাড়ী হইতে ইনি সিরাজোদ্দালা, আলিবর্দ্দি খাঁ প্রভৃতির চিত্র সংগ্রহ করেন।

এই তিনখানি গ্রন্থই,—বঙ্গসাহিত্যে বড় আদরের সামগ্রী হইয়াছে।

শরচ্চন্দ্র দেব

শকাব্দা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ ১৮৫৮, সন ১২৬৫ সালের ২রা কার্ত্তিক ইংরাজী ১৬ই অক্টোবর রবিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় কলিকাতার ছয় ক্রোশ দক্ষিণে হরিনাভি গ্রামে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺নন্দলাল দেব। ইহাঁর জন্ম সময়ে মিথুনে বৃহস্পতি, কর্কটে শনি, সিংহে কেতু, কন্যায় বুধ, তুলায় রবি, বৃশ্চিকে শুক্র, ধনুতে মঙ্গল, মকরে চন্দ্র, ও কুম্ভে রাহু ছিল। ইনি বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়া ভাল বাসিতেন; ইহাঁর জ্যেষ্ঠ-তাত মহাশয় ইহাঁকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি বাটীতে দুই তিন খানি পুস্তক পাঠ করাইয়া ইহাঁকে একটী গ্রাম্য পাঠশালায় নিযুক্ত করিয়া দেন; তথায় ইনি দেড় বৎসর কাল অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে ইহাঁর এমনই স্মরণশক্তি ছিল যে, যখন যাহা শুনিতেন, তাহা কিছুতেই ভুলিয়া যাইতেন না। ইনি জননীর নিকট হইতে শুনিয়া কত দেব-দেবীর স্তোত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। সন ১২৭২ সালে নবমবর্ষ বয়সে ইনি জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুর পর হরিনাভি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতেই ইহাঁর মনে ধর্ম্মভাবের উদয় হয়। বিদ্যালয়ের ছুটির পর বাটীতে আসিয়া হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কিছু জলযোগ করিয়া ইনি ৺কাশীরাম দাসের রামায়ণের কিয়দংশ পাঠ করিতেন; ইনি কখনও কোন প্রকার অসৎ সংসর্গে থাকিতেন না। সন ১২৮১ সালে ইনি সাহিত্য উৎসাহিনী সভা সংস্থাপন করেন এবং একটি পুস্তকালয় ও ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা করেন। সন ১২৮২ সালে ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিয়দ্দিন মেট্রপ-লিটনে ও শেষে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে ক্যানিংলাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহাঁকে বড় ভাল বাসিতেন; কলেজের ছুটির পর হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত ইহাঁকে নিজের নিকটে রাখিতেন; এজন্য কলিকাতায় ইহাঁর মন্দ বালকের সহিত সংসর্গ ঘটে নাই। কলেজে অধ্যয়নসময়ে স্বর্গীয় ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অবৈতনিক সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সন ১২৮৪ সালের শেষভাগে বায়ুরোগাক্রান্ত হইয়া ইহাঁকে দশমাস কাল চিকিৎসাধীনে থাকিতে হয়, সেইজন্য আর কলেজে অধ্যয়ন হয় নাই। শ্রদ্ধাস্পদ যোগেশ বাবুর

মধ্যস্থতায় ৺রাজকৃষ্ণ রায়ের সহিত ইহাঁর প্রথম আলাপ হয়; সেই আলাপ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উত্তরকালে সুদৃঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পর হইতেই ইনি পৌরাণিক অভিধান সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন; তাহাই পরে ৺রাজকৃষ্ণ বাবুর যত্নে ও সহায়তায় "ভারতকোষ" নামে ইহা প্রকাশিত হয়। ১২৮৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়; ১২৯৯ সালের বৈশাখ মাসে সম্পূর্ণ হয়। ৺রাজকৃষ্ণ বাবুর আর্থিক অসচ্ছলতা নিবন্ধন ইহাঁর শেষাংশ অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই মুদ্রিত হইয়াছিল। কলেজ পরিত্যাগ করিবার পর রোগ-মুক্ত হইলে ইনি সংস্কৃত চর্চ্চা ও নাটকাভিনয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন; ঐ সময় হইতেই ইনি অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন, এবং উহার অভিনয় কার্য্যের জন্য ৺রাজকৃষ্ণ বাবুর সহিত দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সন ১২৯২ সালে বাবু কালিদাস পালের নিকট ইনি ড্রয়িং শিক্ষা আরম্ভ করেন; ঐ সময় হইতেই ইনি কালিদাস বাবু ও বিহারিলাল রায়ের অনুরোধে "শিল্প-পুষ্পাঞ্জলী" নামক এক খানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করেন; ঐ পত্রে কনকলতা উপন্যাস, কলিকাতার ইতিহাস, রামচরিত, পাণ্ডব-চরিত ও চিত্রবিদ্যানামক প্রবন্ধ ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। ৺রাজকৃষ্ণ বাবুর পরামর্শে, পাণ্ডবচরিত, পরে "হরিলীলামৃত সিন্ধু" নামে পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু এক্ষণে উহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় আছে। ইনি বিজনচিন্তা, প্রণয়প্রতিমা, জয়দ্রথবধ, সাধকসংহার, চিনের কলসী ও শান্তিকুটীর নামে কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন; কিন্তু অদ্যাপি সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই এবং হইবার আশা ও নাই। সন ১২৯৪ সালে ইনি গবর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে নিযুক্ত হন; সেখানে ৭ বর্ষ অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং ঢাকা কলেজের ড্রয়িং মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। সন ১৩০১ সালে ঢাকার পণ্ডিত ৺নীলকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্যোতির্ব্বিশারদ উপাধি প্রাপ্ত হন। সন ১৩০২ সালে ইনি ঢাকার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রদ্ধাস্পদ মহেন্দ্র নারায়ণ ভাব-সগর মহাশয়ের নিকট কবিরাজী শিক্ষা করেন এবং কবিরত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐ সময়ে ইনি তথায় ফটোগ্রাফী শিক্ষাও করিয়াছিলেন। ইনি ভারতবর্ষীয় আর্য্যপত্রিকা, অনুসন্ধান, বীণা, কর্ণধার, শিল্প ও সাহিত্য, বিজ্ঞানদর্পণ, বৈষয়িক তত্ত্ব, ও পন্থা প্রভৃতি সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। ইনি গুরুজ-

উপদেশ সঙ্কলনপূর্ব্বক পারাশরীয় "জ্যোতিষ-কল্পতরু" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং "জ্যোতির্ব্বিদ্" পত্রে জ্যোতিষতত্ত্ব লিখিতে থাকেন। প্রতি রবিবার প্রাতে ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত ইনি হরিনাভি ইংরাজী বিদ্যালয়ে ড্রয়ীং শিক্ষা দিয়া থাকেন। এক্ষণে কলিকাতায় গবর্ণমেণ্টের নর্ম্মাল স্কুলে ড্রয়ীং শিক্ষকরূপে নিযুক্ত আছেন।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী

পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী ১৭৮১ শকাব্দের ফাল্গুন মাসের ৭ই তারিখ জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীযুক্ত নশীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ, বংশজ-কুলসম্ভূত। শাস্ত্রী মহাশয়ের পিতা অদ্যাপি বর্ত্তমান। ২৪পরগণা জেলার অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে শাস্ত্রী মহাশয়ের জন্ম হয়। ইহাঁর মাতামহ ৺ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। ছয় মাস বয়ঃক্রম কালে ইনি কলিকাতা পিতৃগৃহে আনীত হন। ইংরাজী ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আহীরীটোলা বাঙ্গালা পাঠশালা হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুণানুসারে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৮০ খৃঃ এফ্‌ এ পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮২ খৃঃ বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত অনারে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৩ খৃঃ সংস্কৃত এম্, এ, পরীক্ষায়ও প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান অধিকার করেন। বলা বাহুল্য, শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যেক পরীক্ষায়ই প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি, ও বি, এ, এম্, এ, পরীক্ষায় সুবর্ণ পদক পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরে ইনি সংস্কৃত কলেজের অন্যতম সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন এবং উক্ত কার্য্যে বৃত থাকার সময়েই ১৮৮৫ খৃঃ রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০০০০ টাকা মূল্যের পারিতোষিক

লাভ করেন। ইহার কিছু দিন পরে লাহোর অরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায়, শাস্ত্রী মহাশয় উক্তপদে নিযুক্ত হন। কিছু দিন কার্য্য করিয়াই ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। কারণ বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে গৃহে রাখিয়া দূরদেশে বাস করা তাঁহার পক্ষে তখন নিতান্ত ক্লেশকর বোধ হইয়াছিল। তাহার পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুবাদক কার্য্যালয়ে দ্বিতীয় সহকারীর পদ খালি হওয়ায় শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদ গ্রহণ করায় শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পুস্তকালয়াধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। এখনও উক্ত পদেই নিযুক্ত আছেন। বিগত বৎসর গবর্ণমেণ্ট ইহাঁর কার্য্যদক্ষতায় পরিতুষ্ট হইয়া ইহাঁকে "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন।

শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় যেরূপ দক্ষ, দর্শন শাস্ত্রেও সেইরূপ প্রবীণ। ইনি পাঠাবস্থা অতিক্রান্ত হইলেই সাহিত্য-সেবা আরম্ভ করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্ত তাহাতেই নিযুক্ত আছেন। প্রচার-নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত ইহাঁর "কবি ও কাব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত ইহাঁর প্রাচীন ভারতে দাসত্ব প্রথা ও সহবাস-সম্মতিবিষয়ক প্রবন্ধও জনসমাজের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। "প্রাচীন ভারতে স্বায়ত্ত শাসন প্রণালী" নামক ইহাঁর একটী উৎকৃষ্ট ইংরেজী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ বুদ্ধিষ্টটেক্টবুক্ সোইটীর জর্ণালের কলেবর অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত ইহাঁর "লোকবৃত্ত ও সমাজস্থিতি" নামক একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ কিছু দিন পূর্ব্বে সাহিত্যসংহিতায় প্রকাশিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় "মুসলমান রাজত্বে কৃষির অবস্থা" নামক একটী গবেষণাপূর্ণ ইংরেজী প্রবন্ধ লিখিয়া ত্রিবাঙ্কোরের মহারাজের প্রতিশ্রুত ৩৫০ টাকা পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধটী অদ্যাপি অমুদ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহাঁর সমালোচনার ক্ষমতাও অসাধারধণ। পূর্ব্বে ইনি কলিকাতা গেজেটে তিনমাস অন্তর যে সকল নব প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, উহা পাঠ করিয়া সকলেই ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ এ পরীক্ষার সংস্কৃত পরীক্ষক ছিলেন; এখন বি, এ ও এম্ এ পরীক্ষার সংস্কৃত-পরীক্ষক পদে নিযুক্ত আছেন। পূর্ব্বে ইনি সাহিত্যপরিষদের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন, এখন সাহিত্যসভার অবৈতনিক

সম্পাদকতা করিতেছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ইনি শোভাবাজারের বিখ্যাত রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের উদ্যোগে ন্যায় দর্শনের "ভাষাপরিচ্ছেদ" নামক গ্রন্থের একটী বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতেও ইহাঁর ন্যায় দর্শনে বিদ্যাবত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাঁর প্রতিভা ও জ্ঞানের বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত হইল। ইহা ব্যতীত ইহাঁর আর কতকগুলি গুণ আছে, যাহা সাধারণ ইংরেজী-শিক্ষিত ব্যক্তিতে দৃষ্ট হয় না। ইনি পরোপকারী, অনেক সময় নিজের কার্য্য ও শান্তি নষ্ট করিয়া পরের বেগার খাটিয়া থাকেন। এতভিন্ন ইনি কোন কূটনীতির ধার ধারেন না। উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া পরের অপকার করা দূরে থাকুক, শত্রু মিত্র সকলেরই সমভাবে যথাশক্তি উপকার করেন। ন্যায়-পরায়ণতা ও স্বাধীনচিত্ততা ইহাঁর চরিত্রের প্রধান গুণ। ইনি বিচার ক্ষেত্রে আসীন হইয়া আত্মমর্য্যাদা বিস্মৃত হন না এবং কার্য্য করিবার সময় ইনি কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া কার্য্য করেন না।

শাস্ত্রী মহাশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাপূজা ও ধ্যান-ধারণা ইনি নিয়মিতরূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এতভিন্ন ইনি পিতা মাতা ও গুরুজনের প্রতিও অত্যন্ত ভক্তিমান্। ইহাঁর পুণ্যাত্মা বৃদ্ধ পিতা মাতা এই বিখ্যাত পরমভক্ত পুত্র ও পৌত্রগণের শুশ্রূষায় আপ্যায়িত হইয়া, পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছেন।

মতিলাল রায়।

বর্দ্ধমান জেলার অধীন পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্ভূত ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ সালে ২১শে মাঘ বৃহস্পতিবার দিবামান ২১।২৫ পলে তৃতীয়া তিথিতে মতিলাল রায় ভূমিষ্ঠ হন। ইহাঁর পিতার নাম মনোহর রায়। পিতামহ, কাশীনাথ রায়। ইহাঁরা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। মনোহর রায়ের তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ অল্পকাল জীবিত থাকিয়া জীবনলীলা সম্বরণ করেন, কনিষ্ঠ অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে কালে কবলিত হয়েন। মতিলাল মধ্যম।

ইহাঁর পিতার জন্মস্থান রাজসাহী পুটিয়া রাজধানীর নিকট পীড়পা ছিগ্রামে।

সেইখানেই ইহাঁদের পৈতৃক বাসস্থান। কিন্তু মনোহর রায়ের পিতা কাশীনাথ রায় উল্লিখিত ভাতশালা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁদের তিন সহোদরের মধ্যে ইনিই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ভাতশালায় ভ্রাতৃগণের সহিত বিবাদ করিয়া কাশীনাথ উত্তালতরঙ্গময়ী ভীষণ পদ্মা পারে পুটিয়ার রাজসংসারে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে ভাতশালায় তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়। আর তিনি ভাতশালায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। ঐ প্রদেশে পুনরায় দার পরিগ্রহ-পূর্ব্বক পীড়গাছিতে বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার নয়টী সন্তান হয়। তন্মধ্যে ৫টী পুত্র ও ৪টী কন্যা। ঐ পাঁচটীর মধ্যে মনোহর রায় তৃতীয়। কাশীনাথ রাজসাহী অঞ্চলেই জীবন লীলা সম্বরণ করেন।

মতিলাল রায়ের জ্যেষ্ঠতাত ৺ কালীশঙ্কর রায়, ওয়াটসন সাহেবের কনসারণে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি মেদিনীপুরের অন্তর্গত আমলা-গড়ের কুঠীতে, স্থানান্তরিত হন; সেই স্থানে অধিকাংশ সময় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমলাগড় হইতে পীড়গাছি অনেক দূর; সহসা যাতায়াত ঘটিত না, ঐ সময়ে বঙ্গদেশের রাস্তা সকলও অতিশয় দুর্গম ছিল। একারণ পীড়গাছি হইতে ১২৪৮ সালে পরিবারবর্গকে ভাতশালায় আনিয়া কালীশঙ্কর সেই স্থানেই বাস করেন।

মতিলাল রায়ের জন্মের ২॥ বৎসর পরে ইহাঁর জ্যেষ্ঠতাত, কালীশঙ্কর স্বর্গারোহণ করেন। কালীশঙ্কর বাটীর মধ্যে প্রধান উপার্জ্জনশীল ছিলেন; তাঁহার অভাবেই অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। মতিলাল রায়ের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যথাবিধি হাতেখড়ি হয়; গ্রাম্য পাঠশালায় ইনি বিদ্যাধ্যয়ন করিতে থাকেন। পাঠে ইনি অত্যন্ত অনাবিষ্ট ছিলেন। গুরু মহাশয় যখন উপদেশ দিতেন, তখন মতিলাল অন্যমনস্ক থাকিতেন। এইজন্য গুরুমহাশয় তাঁহাকে "হাবলা মতি" বলিয়া ডাকিতেন। কিন্তু অঙ্ক বিদ্যায় মতিলালের কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণতা ছিল গুরুমহাশয়, সেজন্য তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন।

এই সময়ে মতিলাল ইহাঁর ৺র্থ পিতৃব্য গণেশ রায়ের শাসন ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন। বাল্যস্বভাব বশতঃ চাঞ্চল্য হেতু মতিলাল বড় দুষ্ট ছিলেন। ইহাঁদের বাটীতে পূর্ব্বকাল হইতে প্রতিবৎসর ৺শ্যামাপূজা হইয়া থাকে। একবার শ্যামা পূজার সময় ইনি বারুদ পোড়াইতে গিয়াছিলেন। বারুদে অগ্নিসংলগ্ন না হওয়ায়, মতিলাল যেমন তাহাতে ফুৎকার দিবেন, অমনি

বারুদে অগ্নি স্পৃষ্ট হইয়া তাঁহার মুখমণ্ডল দগ্ধ করিল। সৌভাগ্যক্রমে দুইটী চক্ষু রক্ষা পাইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে সে চিহ্ন আছে! দগ্ধমুখমণ্ডলে বড়ই বেদনা হইয়াছিল। চিকিৎসকের সবিশেষ সাহায্য লইতে হইয়াছিল। ইহাঁর পিতৃব্য গণেশ রায় এই সকল ব্যপার দর্শন করিয়া বালককে ভাতশালায় রাখা অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন; তিনি মতিলালকে ২৪ পরগণায় বারাশতের অন্তর্গত বোকুণ্ডা গ্রামের নীলকুঠির দেওয়ানের নিকট রাখিয়া আইসেন। মতিলালের পিতা মনোহর রায়ই তখন এই কুঠীর দেওয়ান। বালক মতিলাল নয় বৎসর বয়সে ঐ স্থানে প্রেরিত হন। তথায় মতিলাল জাগুলিয়া বিদ্যালয়ে ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। ইনি প্রতি দিন অশ্বারোহণে নীলকুঠী হইতে বিদ্যালয়ে যাইতেন; এই সময় সমবয়স্ক আমোদপ্রিয় বহু বালক আসিয়া ইহাঁর সহিত যোগ দিত,আর বিদ্যালয় গমনে বাধা দিয়া তাহারা মতিলালকে লইয়া ঘোড়াচড়া আমোদেই কালহরণ করিত। ঘোড়দৌড়ের আড়ম্বরে পথে লোকের গমনাগমন কঠিন হইয়া উঠিত। মতিলাল সন্ধ্যার পর কুঠীতে প্রত্যাগমন করিত; পিতা মনে করিতেন, পুত্র নিয়ম মত পাঠাভ্যাস পূর্ব্বক প্রত্যাগত হইল। কিন্তু ক্রমশঃ সকল রহস্যই প্রকাশ পাইল; লোকে বিরক্ত ও বিব্রত হইয়া দেওয়ানজীর নিকট পুত্রের গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। পুত্রের এরূপ নিন্দাবাদ পিতার অবশ্যই বিরক্তিকর হইল। তিনি পুত্রের ঐ সকল প্রাত্যহিক উপদ্রবের কথা শুনিয়া পুত্রের উপর বীতশ্রদ্ধ হইলেন; তথা হইতে পুত্র মতিলালকে পুনর্ব্বার ভাতশালায় প্রেরণ করিলেন।

এই সময় ভাতশালায় একটী ইংরেজী স্কুল হইয়াছিল। মতিলাল কিছুদিন ঐ স্কুলে পাঠ করিয়া নবদ্বীপ মিসনরিস্কুলে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে মনোহর রায় মহাশয় বাটী আসিয়া পুত্রকে পুনর্ব্বার বারাশতে লইয়া যান; তথায় গবর্ণমেণ্টস্কুলে তাঁহাকে নিয়োজিত করেন। বোকুণ্ডার কুঠী হইতে বারাশত প্রায় ৪।৫ ক্রোশ দূর। তথা হইতে প্রতিদিন স্কুল যাতায়াত সুকঠিন; সেইজন্য মনোহর রায় কিছুকাল পরে বাদুমহেশপুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে মতিলালের থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মতিলাল গ্রামের বালকগণ সহ নিত্য নিত্য বারাশতে গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। মতিলালের সহচর কতিপয় বালকের বেশ কবিত্বশক্তি ছিল

তাহারা মধ্যে মধ্যে নানারূপ প্রবন্ধ,—কবিতা ছন্দে লিখিত; তদ্দর্শনে মতিলাল রায়েরও রচনায় প্রবৃত্তি জন্মে। এই সময়ে তিনি কয়ে কয়ে খয়ে খয়ে মিল করিয়া পদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। যে সকল বালকের কবিত্ব ইঁহা হইতে বিশদরূপে বিকাশিত হইয়াছিল, তাহারা ইঁহার রচনা সংশোধন করিয়া দিতে লাগিল। ক্রমে অসম্বন্ধদোষ সকল ইঁহার নয়নপথে পতিত হইতে লাগিল। বন্ধুগণ ক্রমশঃ উৎসাহ বর্দ্ধন সহকারে আগ্রহের সহিত ইঁহার রচনা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। স্কুলের শিক্ষক মহাশয়ও ইঁহার রচনায় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

স্কুলের অবকাশ সময়ে মতিলাল কলিকাতায় গিয়া মিত্র শিবদাস মিত্রের নিকট থাকিতেন। সেই সময়ে বিখ্যাত প্রভাকর সম্পাদক কবিকুলরত্ন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। গুপ্ত মহাশয় মতিলালের রচনা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন; ইঁহাকে সবিশেষ উৎসাহে উৎসাহিত করেন। ইঁহার দুই একটী প্রবন্ধও এই সময় প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলিতে হইবে, রচনা-শিক্ষা সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ই মতিলাল রায়ের প্রথম শিক্ষক।

ক্রমে মতিলাল রায়ের রচনাগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পরলোক গমন করিলেন। মতিলাল রায় ইঁহার শোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। ইনি বারাশত স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেন; কিন্তু বিফলমনোরথ হয়েন। মনোহর রায় আর তাঁহাকে স্কুলে পাঠাইতে ইচ্ছা করিলেন না। কিছুদিন পরে তিনি চুঁচুড়ায় পুত্রের বিবাহ দিলেন। তাহাকে চাকরী করিতে অনুরোধ করিলেন।

মতিলাল চাকরী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন! কলিকাতা যোড়াসাঁকো পুলীশ অফিসে তিনি কেরাণীগিরি কর্ম্ম পাইলেন; সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে কার্য্য অতিশয় কষ্টকর ভাবিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

এদিকে খড়দহ বিশ্বাস মহাশয়দের কুঠী অচল হইয়া উঠিল। ফলে,—মনোহর রায়কেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হইল। মনোহর মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন; কিছুই রাখিতে পারেন নাই; দুর্গোৎসবাদি নানারূপ সৎক্রিয়াতেই সমস্ত অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। বিবিধ প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিয়া দান করিতেন। জ্যোতিষে তাঁহার অধিকার ছিল; কোন সময়ে গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "মতির

রচনা সম্বন্ধে বিশেষ যশ হইবার সম্ভাবনা। কালে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে মনোহর রায় ভাগীরথী তীরে দেহ ত্যাগ করেন। মতিলাল কোন ক্রমে এ যাত্রায় পিতৃশ্রাদ্ধের দায়ে উদ্ধার পাইলেন। পৈতৃক ভূসম্পত্তি খুব কমই ছিল। তাহার আয় হইতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হওয়া সাতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। মতিলাল বড়ই বিপন্ন হইলেন।

এই প্রকার কিছু দিবস কষ্ট সহিয়া তিনি চক্‌বামুনগড়ে গ্রামের একটি স্কুলে শিক্ষকতা কার্য্য নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু পরিশ্রমযোগ্য ফললাভ হইল না। এই জন্য মতিলাল নবদ্বীপনিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সাহায্যে তথাকার মিসনারী স্কুলের ৪র্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। তথায় তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহাতে একরূপ দিনাতিপাত হইতে লাগিল। দুই বৎসর সেখানে থাকিয়া মতিলাল পরে বালীগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত হরলাল কোঁয়ার মহাশয়ের সাহায্যে কলিকাতার জেনারেল পোষ্ট অফিসে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ের কিছুদিন পূর্ব্বে মতিলালের শ্বশ্রুমাতাঠাকুরাণী চুঁচুঁড়া পরিত্যাগ করিয়া বালীবারাকপুরে বাসা করেন। মতিলাল প্রতিদিন ঐ স্থান হইতে কলিকাতা যাতায়াত করিয়া কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ঐস্থানে মতিলালের কোন কোন রচিত প্রবন্ধ দেখিয়া অনেকে আগ্রহের সহিত তাঁহাকে রমাবতী গ্রন্থের আদর্শে অভিনয়োপযোগী একখানি নাটক রচনা করিতে অনুরোধ করেন। অচিরেই মতিলালের নাটক লেখা সমাপ্ত হয়। উহা দেখিয়া সকলে সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উৎসাহ দাতাগণের উৎসাহে নাটক খানি যশের সহিত অভিনীত হয় কোন্নগর ও কলিকাতার প্রশংসার সহিত ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

এইরূপ রচনা সম্বন্ধে মতিলালের ক্রমেই উৎসাহবৃদ্ধি হইতে লাগিল মতিলাল এই সময় জেনারেল পোষ্টাপিসে কর্ম্ম করিতেন; এবং অবসরকালে আমোদ প্রমোদেই কাটাইতেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইলে ইহাঁর একটী পুত্র হয়। ক্রমে সন্তান ২২ দিবসের হইল; দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ দিবস প্রাতে মতিলাল অফিসে গমন করিলে পর ইহাঁর পত্নী ওলাউঠা রোগাক্রান্তা হন। কোন লোক গিয়া অফিসে মতিলালকে এই নিদারুণ সংবাদ দেয়। মতিলাল একান্ত ব্যগ্রচিত্তে হেডক্লার্ক সাহেবের নিকট ছুটির প্রার্থনা করেন। সাহেব বলিলেন,—"ফাষ্ট ডেলিভারি অর্থাৎ প্রথমবারের ডাক রওনা না হইলে বিদায়

দিতে পারি না।" মতিলাল অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; তথাপি সাহেব শুনিলেন না, বরং তিনি আরও দৃঢ়ভাবে ঐ কথাই বলিলেন। এই গোলযোগে অনেক সময় অতিবাহিত হইল। পরে অফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ এ বিষয়ে অনুরোধ করিয়া মতিলালকে অবসর দিলেন। তখন বেলা প্রায় ৯ টা, দ্রুত বেগে তিনক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া মতিলাল বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর হাতে পায়ে খিল ধরিতেছে; গরম জল পূর্ণ বোতল দিয়া তাঁহাকে সেক করা হইতেছে; রোগিণী যন্ত্রণায় কাতর স্বরে চীৎকার করিতেছে। অবিলম্বে ডাক্তার আনা হইল। কিন্তু চিকিৎসায় কোন ফল হইল না। মতিলালের সহধর্ম্মিণী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ইহা সন ১২৭৬ সালের ফাল্গুন মাসের ঘটনা। শুনিয়াছি,—এই সাধ্বী পতির চরণামৃত না খাইয়া জল গ্রহণ করিতেন না।

এক্ষণে এই মাতৃহীন সন্তানের লালন পালনের উপায় চিন্তায় মতিলাল ব্যাকুল হইলেন, তাঁহার পঞ্চম খুল্লতাত ভোলানাথ রায়কে সংবাদ দিলেন। তিনি একটী চাকরাণী সঙ্গে করিয়া বালিবারাকপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শিশু সন্তানকে ভাতশালায় আনিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। অন্নাশন কালে তাহার নাম রাখা হইল ধর্ম্মদাস। এই ধর্ম্মদাসই এক্ষণে রায় মহাশয়ের যাত্রাদলের স্যমন্তক মণি।

কিছু দিবস অতীত হইলে, মতিলালের বন্ধুগণ তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে যুক্তি দিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তখন তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিসে পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে চির অবসর লইতে পারেন, তখন এই চিন্তাই তাঁহার প্রবল হইয়া উঠিল। ফলে পোষ্টাফিসের চাকরী তিনি ত্যাগ করিলেন; ইহাতে অনেকেই তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিলাল তাহাতে টলিলেন না।

দুই বৎসর পরে ১২৭৮ সালে দোগাছিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয় মতিলালকে যাত্রাগান রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তিনি সেই অনুরোধে গীতাভিনয় রচনা করিয়া দলের লোককে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মতিলাল প্রথম রামায়ণের অন্তর্গত তরণীসেনবধ নাটক রচনা করেন; পরে রামবনবাস রচিত হয়। এই দুই পালার শিক্ষাদানকার্য্য সাঙ্গ হইলে, হরিবাবু,—চাগুলি নিবাসী কালিদাস মিত্র মহাশয়ের বাটীতে দুর্গোৎ-সবের সময় বায়না গ্রহণ করেন। এই গ্রামে অভিনয় কার্য্য যশর সহিত

সম্পন্ন হইল। রচনা সম্বন্ধেও যথেষ্ট প্রশংসাধ্বনি উঠিল। আধুনিক ধরণে যাত্রা অভিনয়ের ইহাই হইল প্রথম সূত্রপাত। হরিনারায়ণ বাবু উৎসাহিত হইয়া মতিলালকে বেতন দিতে রাজী হইলেন। দল লইয়া তিনি প্রথমে মুরশিদাবাদ পরে রামপুর বোয়ালিয়া গমন করেন। তথায় প্রথমে "তরণী সেন বধ" গীতাভিনয় হইল। সকলেই একবাক্য হইয়া বলিলেন, ইহার পূর্ব্বে এমন গীত আর কখনও কেহই শ্রবণ করেন নাই। বোয়ালিয়ায় প্রায় দুই মাস কাল যাবৎ দল থাকিল যশের সহিত তথায় অভিনয় কার্য্য চলিতে লাগিল। বিলক্ষণ অর্থও উপর্জ্জিত হইয়াছিল। পরে কোন বিশেষ কারণে মতিলালের সহিত হরিবাবুর মনান্তর হইল; রাস পর্য্যন্ত ঐ দল একত্রই থাকিল; পরে দল পৃথক পৃথক হইয়া গেল। ১২৮০ সালে নবদ্বীপে মতিলালের যাত্রাদল প্রতিষ্ঠিত হইল।

মতিলালের প্রথম গীতাভিনয় গ্রন্থ তরণী সেনবধ, দ্বিতীয় রামবনবাস, তৃতীয় কালীয়সর্প দমন, অতঃপর ভরতমিলন, মহালীলা, সীতাহরণ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, বিজয়চণ্ডী, পাণ্ডবনির্ব্বাসন, নিমাইসন্ন্যাস, ভীষ্মেরশর শয্যা, রামরাজা, কর্ণবধ, লক্ষ্মণ ভোজন, ও ব্রজলীলা প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হয়। এতদ্ভিন্ন যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, সীতা অন্বেষণ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ, জগন্নাথের মাহাত্ম্য বা ক্ষেত্রধামের মাহাত্ম্য রামপরিণয়, ও নূতন সুবচনীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিস্তর পালা ইনি রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর বিস্তৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মতিলাল আর বিবাহ করিবেন না এইরূপই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিলালের খুল্লতাত শ্রীহরিচরণ রায় মতিলালের বিবাহ দিবার জন্য উদ্যোগ,—হইলেন। ইনি কৃষ্ণগঞ্জের কুঞ্জহাটে কুতনবিসী কর্ম্ম করিতেন। এই সময়ে মতিলালের অজ্ঞাতে তিনি বজরাপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরানাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কন্যার সহিত মতিলালের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন: ফলে ১২৮৩ সালে শ্রাবণ মাসে মতিলালের পুনর্ব্বার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

মতিলালের যাত্রা ক্রমেই দেশপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিল। মতিলাল যখন কোন স্থানে অভিনয় করিতে গমন করেন, তখন দলে দলে লোক তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাঁহার বাসাগৃহের দ্বারে আসিয়া সমবেত হয়। এমন সৌভাগ্য কয় জনের ঘটিয়া থাকে? মতিলাল যেরূপ বহুবিধ শাস্ত্রাদি বিলোড়নপূর্ব্বক বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা লাভেও সুবিদ্বান্ বলিয়া

সুপরিচিত হইয়াছেন। ১২৮০ সালে অগ্রহায়ণ মাসে মতিলাল যখন নবদ্বীপে দল প্রতিষ্ঠা করেন, তখন নবদ্বীপেশ্বরী পোড়ামাতাকে অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার মন্দির অঙ্গনে প্রথম অভিনয় করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রামবনবাস পালা অভিনীত হয়। অভিনয়ে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতগণ ও অপর সাধারণ সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন। মতিলালের এই উপদেশপূর্ণ রচনা শ্রবণ করিয়া, নবদ্বীপনিবাসী মহামহোপাধ্যায় ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় অতীব প্রীত হইয়া, মতিলালকে কবিরত্ন উপাধি সহ এক স্বর্ণমেডল এবং পণ্ডিতবর ৺ব্রজমোহন বিদ্যারত্ন কবিবর উপাধি সহ মতিলালকে দুইটি স্বর্ণ মেডল অর্পণ করেন। অদ্যাবধি মতিলাল বহুল স্বর্ণমেডল প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের জেলাজজ টেলার সাহেব যখন বিলাত গমন করেন, তৎকালে মতিলালের ভীষ্মের শরশয্যা পালা জজসাহেবের বাঙ্গলাতে অভিনীত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে তিনি নিরতিশয় প্রীত হইয়া মেমোরিয়েল কমিটি হইতে মতিলালকে একটী স্বর্ণমেডেল প্রদান করেন; ইহা ১৮৮৭ সালের কথা। মুরশিদাবাদ-কান্দির রাজা শরচ্চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের বাটীতে রাধাবল্লভ জীউর রাস উপলক্ষে মতিলালের দল বায়না হয়। মতিলালের সারগর্ভ উপদেশপূর্ণ রচনা শ্রবণে রাজাবাহাদুর সাতিশয় প্রীতিসহকারে মতিলালকে স্বর্ণমেডেল প্রদান করেন। মতিলাল যখন ভাটপাড়াতে অভিনয় করিতে গিয়াছিলেন, তখন ভাটপাড়ানিবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাঁর রচনা মাধুর্য্য ও অত্যুৎকৃষ্ট সঙ্গীতসমূহ শ্রবণে আনন্দপ্লুত হইয়া ইহাঁকে নিম্ন লিখিত শ্লোক সহ একটী স্বর্ণমেডেল প্রদান করেন,—

মতিলালকবেদৃশ্যং। কাব্যদর্শনহর্ষিতা-
ভট্টপল্লী সমাচষ্টে কাব্যকণ্ঠ-পদেন তম্॥

কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে ৺বারদোল উপলক্ষে যখন ইহাঁর যাত্রা হয়, তখন নবদ্বীপাধিপতি ক্ষিতীশচন্দ্র মতিলালকে বলিয়াছিলেন,—"আপনা হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে কোন যাত্রাই রাজবাটীতে হয় নাই। আমার বোধ হয়, তখন যদি এরূপ যাত্রা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদেরও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইত।" তৎপরে মহারাজ নিম্নলিখিত শ্লোক সহকারে মতিলালকে স্বর্ণমেডল অর্পণ করেন;—

নবদ্বীপাধিপঃ শ্রীমান্ ক্ষিতীশচন্দ্র ভূপতিঃ।
উপাধিং মতিরায়ায় রচনাকুশলংদদৌ॥

মতিলাল এইরূপ সুবর্ণ পদক, এইরূপ উপাধি প্রচুর পাইয়াছেন। আজ তাঁহার যশঃসৌরভে দশদিক্ পরিব্যাপ্ত। ইহাঁর সঙ্গীতের সুর অভিনব ভঙ্গীবিশিষ্ট; বড়ই মনোহর। সহস্র সহস্র কণ্ঠে আজ মতি রায়ের সঙ্গীত প্রতিধ্বনিত। মতিলালের কে অসীম সৌভাগ্য! কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার কমল কুটীরে বিশেষ যত্ন সহকারে রায় মহাশয়ের যাত্রার অভিনয় শুনিতেন। একদা আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেশব বাবুর বাড়ীতে রায় মহাশয়ের যাত্রা হইতেছে কেশব বাবুর অঙ্কে স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস উপবিষ্ট,—একমনে রায় মহাশয়ের গান শুনিতেছেন। রায় মহাশয় তৎকালে তাঁহার প্রণীতে নিমাই সন্ন্যাস গীতাভিনয়ে শ্রীধর রূপে অবতীর্ণ। আবেগময়ী প্রাণমনমুগ্ধকর ভক্তিরসের প্রবলস্রোতে পরমহংস সমাধি প্রাপ্ত হইলেন, অনেক পরে মোহ অপগত হইলে রামকৃষ্ণ পরমহংস,—মতি মতি বলিয়া স্বয়ং উত্থান পূর্ব্বক রায় মহাশয়কে আলিঙ্গন করিলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সিমুলতলার বাটীতে সমাজ ও নীতি শিক্ষা বিষয়ে রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া শত মুখে প্রশংসা করিয়াছেন। রায় মহাশয়ের পূর্ব্ব আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল ছিল। যাত্রা সম্প্রদায়ের উন্নতি করিয়া এক্ষণে ইনি বিস্তীর্ণ জমীদারী করিয়াছেন। ইনি অতি সদাশয় অমায়িক নম্রপ্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান হিন্দু;—প্রত্যহ সহস্র দুর্গানাম লেখেন, সন্ধ্যা আহ্নিক প্রভৃতি প্রাত্যহিক কার্য্যে ৪।৫ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করেন। দরিদ্র অবস্থায় ইনি যেরূপ নিরাহঙ্কার ছিলেন, এখনও ঠিক তাহাই; বাটীতে অন্নদান, দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা প্রভৃতি সমস্ত পর্ব্বেরই অনুষ্ঠান হয়। রায় মহাশয় সৌভাগ্যশালী পুরুষ, তাঁহার সাধ্বী সীমন্তিনী গুণবতী ভার্য্যা গৃহলক্ষ্মীস্বরূপ, অন্নদানে অন্নপূর্ণা। রায় মহাশয় এক্ষণে নবদ্বীপে ত্রিতল বাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় সপরিবারে বাস করিতেছেন। রায় মহাশয়ের পাঁচটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক। উভয়েই সাহিত্য। সেবী। জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মদাস কর্ত্তৃক এখন যাত্রাদল পরিচালিত। মধ্যম ভূপেন স্কুলে পড়িতেছেন। অপর গুলি নাবালক। কন্যা দুইটী সবিশেষ গুণবতী।

পঞ্চানন তর্করত্ন।

কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় গৌতমগোত্র ব্রাহ্মণ কুলীন। কান্যকুব্জে জবনাধিকার হইলে গৌতম এবং অন্যান্য গোত্রের কতিপয় ব্রাহ্মণ দলবদ্ধ হইয়া; দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন হিন্দুরাজ্যে বাস করেন; দাক্ষিণাত্যও জবনাধিকৃত হইল, তখন কিছুকাল অতীত হইলে, তদ্বংশীয়গণ সে দেশ ত্যাগ করিয়া জবনোপদ্রবশূন্য বাঙ্গালা অরণ্য ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই সম্প্রদায়ই ভট্টপল্লী-সমাজ-সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য বৈদিকশ্রেণীর পূর্ব্ব-পুরুষ। বাঙ্গালায় ইহাঁদের দ্বিতীয় উপনিবেশ স্থান প্রতাপাদিত্যের ভুজবলপালিত যশোর-সমীপস্থ ধুলিয়াপুর। গৌতমগোত্রসম্ভূত অল্লাল ভট্ট সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। তিনিই প্রথমে হিন্দুরাজার অধীন ধুলিয়াপুরে বাস করেন। অল্লালভট্টের পিতা গণপতি ভট্ট ৪৬১৩ কল্যব্দে ভাস্বতী-নামক জ্যোতিষ গ্রন্থের জ্যোতিষ্মতী-নাম্নী বিবৃতি রচনা করেন। এক্ষণে কল্যব্দ ৫০০৫। অল্লাল ভট্টের ভ্রাতা গোবিন্দানন্দ নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বর্ষক্রিয়া-কৌমুদী প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। আমি এই অল্লাল ভট্টের অধস্তন একাদশ পুরুষ। আমার পুরুষ বিদ্বান্ বুদ্ধিমান্ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত।

পরম পূজ্যপাদ ৺ নন্দলাল বিদ্যারত্ন মহাশয় আমার পিতা। তিনি কবি পণ্ডিত মধুরভাষীসৌম্যদর্শন এবং পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অধিক বয়স পর্য্যন্ত পুত্রমুখ দর্শন করিতে না পাইয়া, বংশলোপের আশঙ্কায় বিবিধ ধর্ম্মাচরণ করেন। পিতা মাতা উভয়েই মহাদেবের প্রীত্যর্থে অনেক ব্রত-নিয়ম করিয়াছিলেন। তৎপরে আমার জন্ম হয়। পঞ্চাননের আরাধনায় আমার জন্ম বলিয়া পিতা আমার পঞ্চানন নাম রাখেন।

১২৭৩ সালে আমার জন্ম। ১২৭৭ সালে মাঘ মাসে আমার 'হাতে খড়ি' হয়। পিতাই আমার লিখন কার্য্যে গুরুতা করেন। এক মাসে আমার এক প্রকার অক্ষর পরিচয় হয়। ১২৭৮ সালে পিতা আমাকে সংস্কৃত সুপদ্ম ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ভ করেন। পিতৃদেবের অ পূর্ব্ব বোধনাগুণে আমি অতি শৈশবেই দুরূহ সংস্কৃত ব্যাকরণ বুঝিতে লাগিলাম। এই সময়ে আমার মাতুল ৺অমৃতময় বিদ্যারত্ন মহাশয় মাঘকৃত শিশুপালবধ পাঠ করেন। তাঁহার "শ্রিয়ঃপতিঃ শ্রীমতি শাসিতুং জগৎ জগন্নিবাসো বসুদেবসদ্মনি।" এই প্রথম কবিতার

আবৃত্তি শুনিয়া আমিও কবিতা রচনায় উদ্যত হই। কিন্তু আমার বয়ঃক্রম তখন ছয় বৎসর মাত্র, সবে ব্যাকরণ আরম্ভ করিয়াছি; সন্ধি-শব্দ কিছুরই জ্ঞান নাই; তথাপি বালকতা-প্রযুক্ত শ্রুত কবিতার অনুকরণে দুই চরণ কবিতা লিখিলাম,—"কিয়ঃপতিঃ কঃ পতি-দেবসূর্য্যঃ নারায়ণস্য গ্রহকাঙ্ক্ষিণীকঃ।"

অর্থ জানি নাই, ভাব মনে করি নাই, ভাষা জানি না, যা মনে আসিল, তাহাই লিখিলাম, কিন্তু ছন্দোদোষ ঘটিল না। আমার এই পাগলামী মামা দেখিলেন, পিতৃদেবকে বলিলেন, পিতৃদেব আমার কবিতার ছন্দঃশুদ্ধি দেখিয়া প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে নীরব আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি যখন সপ্তমবর্ষীয় বালক, পিতৃদেব তখন আমাকে ব্যাকরণের একটী পূর্ব্বপক্ষ শিখাইয়া সভার কোলে বসাইয়া মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট মদীয় শিক্ষা পরিচয় প্রদান করাইয়াছিলেন। আমাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য পিতৃদেব কত উপায়ই করিতেন, কিন্তু হায়! তাঁহার প্রদত্ত সুশিক্ষা এই হতভাগ্য পুত্র অধিক দিন প্রাপ্ত হয় নাই। আমি শৈশবে অত্যন্ত জিগীষু ছাত্র ছিলাম. আমা হইতে অধিক পাঠী ছাত্রের সমপাঠী হইবার জন্য আমি মধ্যে মধ্যে গোপনে পূজ্যপাদ ৺রঘুমণি বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট পাঠ লইতাম। এইরূপে ১২৮২ সালের ৺পূজার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার ব্যাকরণ-পাঠ অবাধে চলিল। আমি পূর্ণ নবম বৎসর বয়সে প্রায় সমস্ত ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করিলাম। কিন্তু এই কার্য্যে আমার কৃতিত্ব কিছুই ছিল না। আমি তাদৃশ মেধাবী বা বুদ্ধিমান্ নহি, কেবল ঋষিতুল্য পিতৃদেবের কৃপা ও শিক্ষা-ব্যবস্থার কৌশলে আমার উন্নতি হইয়াছিল। ১২৮১ সালের ৺পূজা ফুরাইলে, পিতৃদেব আমার অধ্যাপনায় অধিকতর মনোযোগী হইলেন; কিন্তু আমার দুরদৃষ্ট, ১২৮২ সালের ১২ অগ্রহায়ণ পরম পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব সজ্ঞানে শ্রীশ্রী৺নারায়ণ স্মরণ করিতে করিতে ভাগীরথী-তীরনীরে দেহ ত্যাগ করিলেন। আমি দশম বৎসর বয়সে পদার্পণ করিবামাত্র পিতৃহীন হইলাম। আমার পরমারাধ্যা জননী সীতা সাবিত্রীর মত সাধ্বী ছিলেন। পিতৃদেবকে যে সময়ে তীরস্থ করা হয়, সেই সময়েই তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। পিতৃদেবের মৃত্যুর পরদিনেই জননীও আমাকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া পতিলোকে গমন করিলেন। আমি তখনও একপ্রকার অবোধ; আমার একটী ৩ বৎসরের বালিকা ভগিনী ও নবপ্রসূত একটী ভ্রাতা; আমরা এই তিন অনাথ; আমরা আমার পরম পূজনীয়া ছোটখুড়ীমাতার প্রতিপালনে

থাকিলাম। পিতা-মাতার আদরের বস্তু পরম যত্নের ধন,—(তেমন যত্ন অনেক সন্তানের ভাগ্যে ঘটে না)—এই হতভাগ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পথের ভিখারী হইল।

আমাদের যে যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, এবং কতিপয় ভক্ত শিষ্য ছিলেন, তদানুকূল্যেই আমাদের সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ হইত। ২ মাস অতীত হইলে আমি আবার পাঠারম্ভ করিলাম। এবার পূজ্যপাদ ৺ রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এবং পূজ্যপাদ ৺ জয়রাম ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের নিকট আমার পাঠ চলিতে লাগিল; কিন্তু আমার আর সেরূপ মনোযোগ থাকিল না। এইরূপে ৩ মাস অতীত হইলে ৺ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও সজ্ঞানে ৺ গঙ্গালাভ করিলেন। তখন ন্যায়ভূষণ মহাশয়ই আমার একমাত্র শিক্ষাদাতা হইলেন। তিনিও আমাকে পুত্র-বাৎসল্যে অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন; তিনি আহার করিতে করিতে মুখের গ্রাস হস্তে রাখিয়াও আমাকে পাঠ দিতেন। আমি তখন রঘুবংশ পড়ি। এই ভাবে ১২৮৩ সাল কাটিতে লাগিল। আমি অভিভাবকহীন বালক, পাঠে যতটুকু মনোযোগ ছিল, ক্রমে তাহাও কমিল; আমি ক্রীড়াপরায়ণ বালকদিগের সঙ্গ লইলাম। অভ্যাসবশতঃ এবং লোক লজ্জায় এক একবার করিয়া পাঠ লইতাম বটে; কিন্তু তাহার অনুশীলন একেবারেই করিতাম না। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইল। তখন এক সদাশয় পুরুষ আমার প্রতি কৃপা করিয়া স্বয়ং আমার তত্ত্বাবধানে প্রবৃত্ত হইলেন। এই পুরুষের নাম শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী কবিরত্ন। একবৎসর তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া আমার পুনরায় অধ্যয়নপ্রবৃত্তি প্রবলা হইল। আমি তখন সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে শিখিয়াছি।

এইবার আর একটু পূর্ব্ব কথা বলিব। ৺রামকানাই ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় অল্লাল ভট্ট হইতে অধস্তন অষ্টম পুরুষ, তাঁহার শৈশববাস ভট্টপল্লীর নিকটস্থ গঙ্গাতীরবর্ত্তী কাঁকনাড়া গ্রাম। কাঁকনাড়া ভদ্রাসন রাজদত্ত তদীয় পৈতৃক ভূমি। যৌবনে ভট্টপল্লীগ্রামে বাস করেন। গৌতম গোত্রের মধ্যে তিনিই প্রথম ভট্টপল্লীবাসী। ন্যায়বাচস্পতি মহাশয় নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, তিনি ১১৭৫ সালে রাজা দেবেন্দ্রনাথ রায়ের নিকট মেদিনীপুর সুজামুঠার ২০ বিঘা ব্রহ্মত্র ভূমি দান প্রাপ্ত হন। তাঁহার পাণ্ডিত্য-যশোবিকাশের সূত্রপাত মাত্রেই ৩৮ বৎসর বয়সেই ৺ গঙ্গালাভ হয়, তাঁহার পত্নী সহমৃতা হ'ন। তাঁহার আট পুত্র ও দুই কন্যা,—জ্যেষ্ঠ আনন্দচন্দ্র, অষ্টম লম্বোদর। জ্যেষ্ঠের উপাধি বিদ্যাপঞ্চানন, অষ্টমের উপাধি তর্কবাগীশ, জ্যেষ্ঠ অদ্বিতীয়

নৈয়ায়িক এবং সংস্কৃত ভাষায় মহাকবি। তিনি স্বয়ং শ্রীরামলীলোদয় কাব্য রচনা করিয়া প্রতিপালক মাতামহের নামেই প্রচার করেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্কাম মহাকবির পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যেও অল্প। তর্কবাগীশ মহাশয় বিখ্যাত স্মার্ত্ত ও কবি ছিলেন, তিনি বাঙ্গালা গীতও রচনা করিতেন, তাঁহার বাঙ্গালা রচনা তাৎকালিক কবির দলে সাদরে গৃহীত হইত। অনুষ্ঠানে ঋষি-কল্প ধার্ম্মিক তর্কবাগীশ মহাশয় আমার পিতামহ। তিনি ৪৮।৪৯ বৎসর পূর্ব্বে ৺ গঙ্গালাভ করিয়াছেন; তাঁহার মৃতাবশিষ্ট তিন পুত্র ও দুই কন্যা। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺ নন্দলাল বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় তর্কবাগীশ মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। পিতৃদেবের সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত একটী কালীস্তোত্র এবং ২।১টী কবিতা এখনও আছে, তাঁহার বাঙ্গালা রচনায়ও অনুরাগ ও নিপুণতা ছিল। তিনি ধনোপার্জ্জনের জন্য বিশেষ চেষ্টা কখন করেন নাই, দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে হইলেও তিনি উপযুক্ত যান ব্যবহার করিতেন, কিন্তু তাৎকালিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের এরূপ ব্যবহার প্রায় ছিল না। পিতৃদেব নিতান্ত সন্তোষশীল ছিলেন। মাত্র বিদায় পাইলেও অসন্তোষযুক্ত হইতেন না।

পিতৃদেব একান্ত ভগবদ্ভক্ত ছিলেন, সকল কার্য্যেই সর্ব্বদা ভগবৎকর্ত্তৃত্ব অনুভব করিতেন, শ্রীশ্রীভগবান্‌কে গুপ্ত বন্ধু এবং রক্ষক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। তিনি পূজায় নিরত হইলে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইতেন। তিনি ভক্তশিষ্টের কাতরতায় একরাত্রি জপ করিয়া একটী শিষ্ট কন্যাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করেন। আমার শৈশবে শ্লীপদ রোগ চিকিৎসায় উপশম প্রাপ্ত না হইলে, তিনি এক দিনের শিবারাধনায় তাহা প্রশমিত করেন। পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে দর্শন করিলে পাষণ্ডের হৃদয়ও ভক্তিপূর্ণ হইত, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। শৈশবের স্মৃতি এখনও জাগিয়া উঠে, পিতৃদেবের সেই প্রশান্ত ললাট, সুদীর্ঘ আরক্ত সৌম্য নেত্র, সদা হাস্যময় মুখমণ্ডল, বিশাল মাংসল বক্ষস্থল এবং আরক্ত কোমল সমতল শ্রীচরণাম্বুজ আমার হৃদয়ে এখনও অঙ্কিত; কিন্তু ভাগ্যহীন আমি সেই মহাপুরুষের সেবা করা আমার ভাগ্যে ঘটিল না। আমার জননী সাক্ষাৎ সাবিত্রী, পিতার আহারের পূর্ব্বে কখন তিনি জল গ্রহণ করিতেন না, সংসারে তিনি কর্ত্রী হইয়াও সকল পরিজনের নিকটেই সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। আমার জন্য দেবতার নিকটে প্রণাম করিয়া জননীর স্বর্ণগৌর-ললাটপ্রান্তে 'কড়া' পড়িয়াছিল; সেই স্নেহময়ী

জননীর শ্রীচরণ-সেবাসুখও আমার কখন ঘটে নাই, আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য পুরুষ জগতে বিরল। কেন যে ঘটে নাই তাহা পরে বলিব। সেই পর্য্যন্তই আমি সুখলাভে বঞ্চিত। যখনই কোন সুখের হেতু উপস্থিত হয়, তখনই মনে হয়, আজ আমার যদি সেই পুত্রগতপ্রাণ পূজ্যপাদ পিতৃদেব থাকিতেন, কতই সুখী হইতেন,—আমি ধন পুত্র মান যশ প্রাপ্ত হইলে সময় সময় নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করি। এই ক্ষণিক বিকার নিবারণ কিছুতেই করিতে পারি না। যে সময় আমার জনক-জননী উভয়েই অনন্তধামে গমন করিলেন সে সময়ে কিন্তু আমার অবস্থা এমন হয় নাই। মনে হয়, তখন কেমন একটা হইয়া গিয়াছিল, কিছুই বুঝি নাই আমি তখন যেন তত্ত্বজ্ঞানী।

১২৮৭ সালে আমার প্রথম বিবাহ। ১২৮৯ সালে এই পত্নীর মৃত্যু হয়, ১২৯০ সালের বৈশাস মাসে আমার দ্বিতীয় বার বিবাহ হয়। আমার এই পত্নী আমাকে নিজগুণে প্রীত করিয়াছিলেন, আমার সতত শ্রমজনিত উষ্ণ মস্তিষ্কতায় আমি বিনা অপরাধেও কখন কখন পত্নীর প্রতি রূঢ় ব্যবহার করিতাম, কিন্তু তিনি সে সময়েও পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্যের ত্রুটি করিতেন না; যে অবস্থাতেই হউক, তিনি কখন আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই, কখন তিনি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন নাই। শঙ্খমাত্র আভরণেই পরিতুষ্টা ছিলেন। তিনি আমার ১০।১২টী ছাত্রকে স্বহস্তে পাক করিয়া অন্ন দিতেন; আমি কোথাও সম্মান লাভ করিলে তিনি অদ্বিতীয় আনন্দ লাভ করিতেন, আমার কিঞ্চিৎ অসম্মান হইলেও আমা অপেক্ষা অধিক দুঃখিতা হইতেন। আমার পত্নী লেখা পড়া জানিতেন না, কিন্তু রণ স্মরণ শক্তি তাঁহার ছিল, মিতব্যয়িতা ছিল, সাংসারিক যাবতীয় অসাধাকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা ছিল। সূর্য্যোদয় হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি নিজের স্নানাহারের জন্য অতি অল্প সময় অতিবাহিত করিয়া সাংসারিক কার্য্য সমস্ত সময় ক্ষেপণ করিতেন। বিলাস কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, আমার পরম পূজনীয়া খুড়ীমাতা, এবং পতিপ্রাণা পত্নীর সাহায্যেই আমার অল্প ব্যয়ে অনেক বৃহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইত। আমার পত্নী কায়মনোবাক্যে সধবাবস্থায় মৃত্যু কামনা করিতেন, তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হইয়াছে। এই পত্নী আমার গৃহলক্ষ্মী ছিলেন, তাঁহার আগমন হইতে আমি কখন কোন আর্থিক কষ্ট পাই নাই। তিনিও কখন কোন শোক পান নাই। সে যাহা হউক ১২৯০ সালে আমি

আমার কনিষ্ঠা ভগিনীকে পাত্রস্থা করি। এই ব্যাপারে আমার কিছু ঋণ হয়। আমার প্রথম পত্নীর চিকিৎসাব্যয়ের জন্যও কিছু ঋণ হয়, এই ঋণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, সুদের ঝঞ্ঝাট ও সংসারপালন উভয়দিক্ রক্ষা কঠিন হইল, খুড়ীমাতা বড়ই কষ্টে পড়িলেন। আমি সবই জানিলাম, কিন্তু আমি তখনও নিরুদ্বেগ। এইরূপ, প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল। খুড়ীমাতার কষ্ট আরও বাড়িল। অপমানভয়ে তিনি বিশেষ ভীতা হইলেন; আমি তখন নব্য ন্যায়ের হেত্বাভাস পড়িতেছি,—আমি কিছু চঞ্চল হইলাম, কিছু অর্থাগম না হইলে আর চলে না, ইহা বুঝিলাম। তখন আমি কর্ত্তব্য চিন্তা করিয়া একদিন কলিকাতায় গেলাম, কলিকাতার একটি শিষ্যের সাহায্যে একাকী ইন্দোর যাত্রা করিলাম। ইন্দোর যাত্রার কথা আমার সেই শি ব্যতীত আর কেহই অবগতস্য ছিল না। ইন্দোরে আমার পিতার এক ভক্ত মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া মহারাজসমীপে উপস্থিত হইব, মহারাজ অর্থ সাহায্য করিবেন, এই আশাতেই আমার ইন্দোরগমন। আমার তখন বয়ঃক্রম ঊনবিংশ বৎসর। আমি ইন্দোরে গমন করিয়া আমার শিষ্যের সাহায্যে অনেক স্থানে পরিচিত হইলাম, কিন্তু সাধারণ প্রার্থী রূপে পরিচিত হইলাম না। ইন্দোরের মন্ত্রী ঢুণ্ডু শ্যামরাওর সভাতে আমার সমস্যাপূরণ ও অতি শীঘ্র কবিতা রচনা দেখিয়া অনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাজসভায় আমার আহ্বান হয়, মহারাজ তুকাজীরাও হোলকার স্বহস্তে আমাকে ৫০ টাকা নগদ, একযোড় শাল ও একটী দীর্ঘ উষ্ণীষ প্রদান করেন। ইহার কএক দিন পরে ধার রাজ্যে গমন করি। ধারের প্রাচীন নাম ধারা। ধারা ভোজবংশের রাজধানী। বিক্রমাদিত্যের স্বর্গলাভ হইলে, কালিদাস ভোজ রাজ্যের সভাসদ্ হ'ন, এইরূপ কিম্বদন্তী আছে। কালিদাসের সিদ্ধিস্থান, ভুবনেশ্বরীমন্দির অদ্যাবধি ধারা রাজ্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তাৎকালিক ধারা রাজ্যের প্রধান সভাপণ্ডিত অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ গণেশ শাস্ত্রী আমার শাস্ত্রীয় পরিচয় বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়া কৃপা করিয়াই হউক, আর যোগ্য বোধেই হউক, রাজসভায় সর্ব্বোচ্চ বিদায় আমাকে প্রদান করিলেন। শাল ও উষ্ণীষ সেখানেও পাইলাম। বৃদ্ধ পণ্ডিত গণেশ শাস্ত্রী আমাকে ধার রাজসভায় অন্যতম পণ্ডিত হইয়া থাকিতেও বলিয়াছিলেন। আমার পাঠসমাপ্তি হয় নাই। বিশেষ দূরতম প্রদেশ, এই কারণে আমি শাস্ত্রিমহাশয়ের কথা রক্ষা করিতে পারি নাই, সেই ভক্ত শিষ্য

হইতেও কিছু অর্থপ্রাপ্তি হইল, আমি বাড়ী আসিলাম। অল্প বয়সে সুদূর প্রদেশে রাজসম্মান লাভ করিয়া আসিলাম, কিন্তু আনন্দ করিবে কে? যিনি কত আশা করিয়া যত্ন ও আদরে আমাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন, আমি এতটুকু জ্ঞানের পরিচয় দিলে যিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন, আমার একটু প্রশংসা শুনিলে যাঁহার আহ্লাদের অবধি থাকিত না, সেই স্বর্গাদুচ্চতর আমার ঋষিকল্প পিতৃদেব আজ কোথায়? হায়! আমার এই পুরষকারে তেমন আনন্দ করিবার কেহই নাই! এই ভাবিয়া আমি প্রকৃতই শোকার্ত্ত হইলাম। পিতৃবিয়োগের প্রকৃত ক্লেশ সেই দিনে আমার প্রথম অনুভূত হইল। তেমন আনন্দ করিবার কেহ না থাকিলেও খুড়ীমাতার কিছু আনন্দ হইল, তাঁহার ঋণযন্ত্রণা কিছু কমিল! তাহার পর দুই বৎসর মনোযোগের সহিত ন্যায়শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলাম, পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম মহাশয় তর্করত্ন উপাধি প্রদান করিলেন, কিন্তু আর্থিক অভাবপ্রযুক্ত অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত না হইয়া অর্থোপার্জ্জনে মনোযোগী হইতে বাধ্য হইলাম। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু আমার সমস্ত বৃত্তান্ত আমার ভক্ত বন্ধু শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র সোমের নিকট বিদিত হইলেন, লোকপ্রতিপালনপরায়ণ যোগেন্দ্রচন্দ্রের দয়ার্দ্র হৃদয়ে তখনই একটী কল্পনা জাগিয়া উঠিল। সেই কল্পনার ফলেই শাস্ত্রপ্রকাশের সৃষ্টি। যোগেন্দ্র বাবু ১২৯৩ সালের মাঘ মাসে আমার শিষ্যবাড়ীতে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমাকে উনবিংশতি সংহিতার অনুবাদ করিবার জন্য বলিলেন; অর্থের কথাও কহিলেন। আমি বলিলাম, আমি যখন নির্দ্ধন সুতরাং এ কার্য্যে অর্থ গ্রহণ করিব, কিন্তু বেতনস্বরূপে নহে, পুরুষানুক্রমে আমাদের বেতনগ্রহণ নাই, আমি বেতন লইব না। সম্মানরক্ষক মহানুভব যোগেন্দ্র চন্দ্র আমার কথায় সম্মত হইলেন; আমি অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আরও দুইটি পণ্ডিত ঐ সময়ে শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগে কার্য্যপ্রবৃত্ত হইলেন, তন্মধ্যে বৃদ্ধ পণ্ডিত ত্রৈলোক্যনাথ ভাগবতভূষণই তখন শাস্ত্রপ্রকাশের কর্ত্তা; কিন্তু তিন চারি মাস পরেই কার্য্যতঃ আমার উপরই শাস্ত্র প্রকাশের কর্ত্তৃত্ব ভার ন্যস্ত হইল। এক বৎসর পরে আমাকে শাস্ত্রপ্রকাশ বিভাগের সম্পাদক হইতে হয়। সেই সময় বঙ্গবাসী কলেজে এফ, এ, ক্লাস প্রথম খোলা হয়; আমি এফ, এ, ক্লাসের অবৈতনিক সংস্কৃতাধ্যাপক নিযুক্ত হই এবং ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশের কল্পনা করিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করি, কিন্তু ১২৯৪

সালের চৈত্র মাসে আমি বিশেষ পীড়িত হইয়া বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপনা কার্য্য এবং ন্যায়শাস্ত্র প্রকাশের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হই।

পূজ্যপাদ অধ্যাপক মহাশয়ের আদেশে ১২৯৬ সালের শ্রাবণ মাসে আমি বাড়ীতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হই। অনেকগুলি স্বদেশীয় বিদেশীয় ছাত্র আমার নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের উৎসাহে এবং শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবপুর বাঁশবেড়িয়াবাসী ললিতমোহন সিংহ প্রমুখ মহানুভবগণের ও বঙ্গবাসীতর আর্থিক সাহায্যে ১২৯৭ সালে ভট্টপল্লীতে আমার সম্পাদকতায় একটী পরীক্ষাসমাজ স্থাপিত হয়। তখন গবর্ণমেণ্টের আদ্য-মধ্য পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। পরে সেই সভাই গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরীক্ষা-কেন্দ্ররূপে গৃহীত হয়। সে সভা এখনও আছে, আমি এক্ষণে সেই সভার সহকারী সভাপতি।

অত্রি সংহিতা, বিষ্ণু সংহিতা, যাজ্ঞবাল্ক্য সংহিতা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভগবতীগীতা, রত্নাবলী এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্র আমার সম্পূর্ণ অনূদিত। সংস্কৃত-ছায়াবলম্বন করিয়া মালতীমাধব নামক উপন্যাস আমি রচনা করিয়াছি। অধ্যাত্ম রামায়ণ, কাশীখণ্ড, শ্রীমদ্ভাগবত এবং মনুসংহিতার অনুবাদ সম্পূর্ণ-রূপে আমার সম্পাদিত। দশকুমারচরিত, যোগবাশিষ্ঠ, হারীত উবন প্রভৃতি ষোড়শসংহিতা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, লিঙ্গ, শিব, কূর্ম্ম, মার্কণ্ডেয়, বৃহন্নারদীয়, সৌর, বৃহদ্ধর্ম্ম, দেবীভাগবত, উৎকলখণ্ড, দেবীপুরাণ, পদ্মপুরাণ, কালিকাপুরাণ, বাল্মীকীয় রামায়ণ প্রভৃতি নব্য প্রাচীন বহুতর গ্রন্থানুবাদ আমার সম্পাদিত। বিদ্যাপতি পদাবলীর টীকা সমালোচনা ও অলঙ্কারনির্ণয় আমার কৃত। সাংখ্য দর্শনের অনুবাদ বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, তত্ত্বকৌমুদীর সংস্কৃত নূতন টীকা আমার রচিত। এই সমস্ত গ্রন্থই বঙ্গবাসীর নিজস্ব। 'শোক' নামক কাব্য, সর্ব্বমঙ্গলোদয় নামক শ্লিষ্ট কাব্য এবং বহুতর অমুদ্রিত কবিতা সংস্কৃতভাষায় মৎকর্তৃক বিরচিত হইয়াছে। বিশুদ্ধ নিত্যকর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, গ্রহণকৃত্যব্যবস্থা আমার বিরচিত; পরন্তু অন্যত্র প্রকাশিত। প্রথম চারি বৎসর আমিই 'জন্মভূমির' সম্পাদন কার্য্যে ব্রতী ছিলাম। বিদ্যোদয় নামক সংস্কৃত মাসিক পত্রে আমার কতিপয় সংস্কৃত গদ্য পদ্য প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। নবজীবন, বেদব্যাস এবং প্রতিমায় আমার কয়েকটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। হিন্দুরমণী প্রভৃতি কতিপয় গল্প

এবং শতাবধি ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, পৌরাণিক, দার্শনিক এবং চুটকী প্রবন্ধ তথা শিবসঙ্গীত ও কতিপয় পদ্য জন্মভূমি পত্রিকায় আমি লিখিয়াছি। দৈনিক ও বঙ্গবাসীতেও আমার লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমি যশো-লোভে বা অর্থলোভে এই সকল গ্রন্থ প্রবন্ধ রচনাদি করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহাতে আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই ; যে মহাপুরুষগণ আমাকে শিক্ষাদান করিয়া-ছেন, ইহাতে তাঁহাদেরই কৃতিত্ব; তবে গ্রন্থে যে সকল ত্রুটি আছে, তাহা আমা-রই দোষের পরিচায়ক। শ্রীশ্রী৺ ভগবৎকৃপায় এবং ৺ পিতৃদেবের আশী-র্ব্বাদে এই সাহিত্যসেবার মধ্যে থাকিয়াই আমি ১৫ বৎসরকাল ন্যায় প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের যথাশক্তি অধ্যাপনা এবং নূতন নূতন গ্রন্থ আলোচনা করিতেছি। বঙ্গবাসীর বৃত্তি, মেদিনীপুর নাড়াজোল রাজার বৃত্তি, এবং বিশ্বনাথবৃত্তি আমার অধ্যাপনার অবলম্বন। মানভূম হইতে বরিশাল রংপুর এবং ময়মনসিংহ হইতে মেদিনীপুর এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের ক্রিয়াশীল সদ্বংশসম্ভূত ধার্ম্মিকগণ আমাকে নিমন্ত্রণপত্রে আহ্বান করিয়া, আমার অধ্যাপনা ও সংসারনির্ব্বাহসাহায্য করিতেছেন।

আমি আমার ৪ জন অধ্যাপকের নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, তদ্ভিন্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর প্রধান খ্যাত, ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়, শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ শাস্ত্রিমহাশয় ৺ অমৃতময় বিদ্যা-রত্ন মহাশয়, ৺ পরমহংস ভোলারাম স্বামী মহাশয় এবং মিথিলানিবাসী শ্রীযুক্ত সুন্দর ঝা মহাশয় অধ্যাপনার দ্বারা আমাকে উপকৃত করিয়াছেন। অন্য প্রকার উপকার আমি জীবনে অনেকের নিকটেই পাইয়াছি ; সেই সকল উপকর্ত্তা আমার চিরস্মরণীয় ; কিন্তু তাঁহাদের সম্মতি ব্যতীত আমি তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতে পারিলাম না। জগতে ভাগ্যবান্ সাধুপুরুষই উপকারক হইয়া থাকে ; ভাগ্যহীন পুরুষই উপকার গ্রহণ করে। যে উপকৃত ব্যক্তি কোন সময়ে উপকারকের বা অন্যের উপকার করিতে সমর্থ হয়, সে পুরুষও ভাগ্যবান্। আমি এমনই হত-ভাগ্য যে, অনেকের নিকটেই উপকার লইয়াছি বটে, কিন্তু কাহারও যে উপকার করিতে পারিয়াছি, এমন মনে হয় না।

১৩০৭ সালের দিল্লী ভারতধর্ম্মমহামণ্ডলে গমনোপলক্ষে আমার দেশ-ভ্রমণ আমার জীবনের একটী স্মরণীয় ঘটনা। দিল্লীর অপূর্ব্ব সভা, উদার চেতা ধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত মিত্রতা, আর্য্য সম্প্রদায়কে বিচার

করিবার জন্ত বিজ্ঞাপন দ্বারা আহ্বান, তাঁহাদিগের বিচারে অপ্রবৃত্তি, দিল্লী প্রবাসী প্রত্যক্ষদর্শী শিবচন্দ্র বাবুর প্রমুখাৎ সিপাহী বিদ্রোহে দিল্লীর অবস্থা শ্রবণ আমার বড়ই প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। তাহার পরে জয়পুরে গমন করি। জয়পুরের সৌন্দর্য্য, শ্রীশ্রী৺গোবিন্দজীর মহিমা, অম্বর দুর্গের ভীমকান্ত ভাব, মানসিংহের বিজয়বৈজয়ন্তী, জগদম্বা যশোরেশ্বরীর অপূর্ব্ব দর্শন, গল্‌তা (গালবাশ্রব) ভ্রমণ, সুপ্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রী ৺ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রাদি পরিবার বর্গের অমায়িক ভাব, রাজকীয় সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন, রাজকলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীযুত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সরলতা মহত্ত্ব ও আমার সম্মান বৃদ্ধির জন্য আগ্রহ এবং কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সদ্ব্যবহার আমার চিরস্মরণীয়; তখন ৺ কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যয় রাজগুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, তাঁহার বহি-র্ব্বাটী—রাজা, মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষে অনেক সময়ই পরিপূর্ণ থাকিত কান্তি বাবুর বহির্ব্বাটীস্থ সভা দ্বিতীয় রাজসভার ন্যায় ছিল। পুরুষসিংহ কান্তিচন্দ্র বার্দ্ধক্যেও কর্ম্মময় জীবন লইয়াই কাল যাপন করিতেন। একদিন আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া বয়সে অল্প হইলেও সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাকে দেখিয়াই গাত্রোত্থান করিলেন; নতকন্ধরে নমস্কার করি-লেন, সেরূপ বিনীতভাব সাধারণ পুরুষে দুর্লভ। আমি কান্তি বাবুকে ইহার পূর্ব্বেও দূর হইতে একদিন দেখিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে শোকের ছায়া লক্ষ্য করিয়াছি-লাম; কারণানুসন্ধানে বুঝিয়াছিলাম, তিনি পত্নী বিয়োগেহৃদয়ে কাতর আছেন। আমি প্রতিনমস্কার করিয়া তাঁহারই জন্য বিরচিত আমার নিম্নলিখিত কবিতাটী তাঁহাকে শুনাইলাম;—

"হা দেবি! স্মরসংজ্বরো মম পুনর্নাস্তি স্মরধ্বংসিনো
নাস্তে কেলিকলা পুরাণপুরুষস্যানন্তচিন্তাজুষঃ।
সেবাব্যগ্রতরাঃ শতং পরিজনা পুজ্যোঽস্মিলোকৈস্তথা
শূন্যং কিন্তু বিনা ত্বয়া মন ইতি গ্লায়ন্ শিবঃ পাতু বঃ॥

একটীমাত্র কবিতা শুনিয়াই কান্তি বাবু আমার পক্ষাপাতী হইলেন। পর দিবসেই রাজবাটী হইতে আমার সম্মান বিদায় ২৫০৲ জয়পুরী টাকা (কোং ২০০৲) এবং ১ যোড়া উৎকৃষ্ট শাল আমার নিকট উপনীত হইল। আমার এই সম্মান লাভে আমি শ্রীযুক্ত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে হৃদয়ের সহিত পূর্ণ আনন্দ লাভ করিতে দেখিয়াছিলাম। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকিলে তিনি

যেমন আনন্দিত হইতেন, মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও সেইরূপ আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত পুরুষহৃদয়ে এরূপ আনন্দপ্রদানজনিত আনন্দ আমার জীবনে সেই প্রথম অনুভূত হইয়াছিল।

ভট্টপল্লীতে সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন আমার একপ্রকার শেষ কার্য্য; একার্য্যও আমি স্বার্থপ্রণোদিত হইয়াই করিয়াছি, প্রশংসার বিষয় কিছুই নাই। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই।—১৩০৪ সালে চুঁচুঁড়াবাসী প্রসিদ্ধ ধার্ম্মিক গোষ্ঠীপতি ৺ রাধাগোবিন্দ সোমের পৌত্র ভূতপূর্ব্ব সবজজ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন সোম আমার যত্নে ও অনুরোধে বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মাণের জন্য এককালীন দুইসহস্র মুদ্রা প্রদান করেন, তাহাতেই বিদ্যালয় নির্ম্মাণ হইয়াছে। উক্ত সবজজ আরও ৫ শত টাকা পাঠশালা প্রভৃতির জন্য প্রদান করিতেছেন। শ্রীমান্ বরদাপ্রসন্নের উদ্যোগেও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহায়তায়, পূর্ব্বতন কমিশনর শ্রীযুক্ত ফেণ্ডুকেল সাহেব বহাদুরের অনুগ্রহে, প্রেসিডেন্সীবিভাগের ইন্সপেক্টার মিঃ পি মুখুর্জ্জি মহোদয়ের প্রযত্নে এবং শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর পেডলার বাহাদুরের কৃপায় বিদ্যালয়ে মাসিক ৫০৲ ছাত্রবৃত্তিও গবর্ণমেণ্ট হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে দর্শন, স্মৃতি ও ব্যাকরণ-সাহিত্য এই তিনটী বিভাগ আছে। স্মৃতির একজন ও ব্যাকরণ-সাহিত্যের আর একজন অধ্যাপক আছেন। দর্শনবিভাগ আমার অধ্যাপনার অধিকৃত। গত বৎসর শ্রীশ্রী৺পূজার পূর্ব্বেই বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্ট ছাত্রবৃত্তির সমাচার প্রাপ্ত হইলাম। আমার গৃহলক্ষ্মী বড়ই আনন্দিতা হইলেন, কিন্তু তাঁহার সে আনন্দ অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না; গত বৎসর ২৬শে অগ্রহায়ণ তিনি একটী সাতদিনের পুত্র সন্তান এবং আর ৫টী শিশুপুত্র কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিলেন। আমি সেই স্তন্যপানহীন স্তনন্ধর শিশু পুত্র আর ৩টী রুগ্ন বালক পুত্র এবং একটী বালিকা রুগ্না কন্যা লইয়া সংসারের বিষম আবর্ত্তে হাবুডুবু খাইতেছি। আর যে কোন সৎকার্য্য আমার ভাগ্যে ঘটিবে, এমন ত আশা হয় না। যিনি আমার পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় পালনকর্ত্রী ছিলেন, সেই বৃদ্ধা খুড়ীমাতাই মাতৃহীন মদীয় সন্তানগণকেও লালন-পালন করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার রোগ-শোক-জীর্ণ শরীরই অচলপ্রায় হইয়াছে। বোধ করি, শীঘ্রই সব ফুরাইবে।

ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যারত্ন।

শৈশব ও বাল্য।

হুগলি জেলার ত্রিবেণী বঙ্গের একটী পবিত্র তীর্থ। প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সংযোগ হইয়াছে; সেখানে যুক্তবেণী ত্রিবেণী, আর এই সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ত্রিবেণী পার্শ্বে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর বিয়োগ হইয়াছে, তাই এখানে মুক্তবেণী ত্রিবেণী। এই ত্রিবেণীও সেই ত্রিবেণীর ন্যায় পবিত্রক্ষেত্র; এই ত্রিবেণীও সুতরাং হিন্দু মাত্রেরই পরিচিত। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে এই ত্রিবেণীও পবিত্র তীর্থ—দ্বিতীয় প্রয়াগ!

এই পবিত্র দ্বিতীয় প্রয়াগে, সুপ্রসিদ্ধ বৈকুণ্ঠপুর ক্ষেত্রমোহনের জন্মস্থান যে পল্লী ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের আবির্ভাবে পূত ও প্রসিদ্ধ, সেই বৈকুণ্ঠপুর পল্লীরই এক বৈদ্যবংশে ক্ষেত্রমোহন জন্মগ্রহ করিয়াছেন, ইহাঁর মাতুলালয়ও ঐ ত্রিবেণীগ্রামেরই বাসুদেবপুরে বিরাজিত; ক্ষেত্রমোহনের পিতা ৺পীতাম্বর সেনগুপ্ত প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহাঁর পিতামহ ৺রামমোহন সেনগুপ্ত এবং মাতামহ ৺রাজীবলোচন দাসগুপ্ত, দুই সহোদরই অসাধারণ চিকিৎসকরূপে দেশ বিখ্যাত ছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন শৈশবে স্বগ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিক্ষালাভ করেন। তালপাত, কলাপাত ও কাগজ লেখা সাঙ্গ করিয়া, সেবকশ্রী আজ্ঞাকারী ও মহামহিম পাঠের পত্র সমাপ্ত করিয়া, "কস্য কার্য্যাঞ্চাগে" লিখিতে লিখিতে, সের-কসা, মণ-কসার পর, চালন-জমাবন্দীর অঙ্ক কসিতে কসিতে, ক্ষেত্রমোহন যখন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসেন, তখন তিনি সপ্তম বর্ষ অতিবাহিত করিয়া, অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পৌষ মাসে সপ্তমের অতিক্রম করিয়া, মাঘে অষ্টমে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে—চতুর্থ দিবসে—কলিকাতার সংস্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট হন।

ক্ষেত্রমোহনের পিতামহ মনে করিয়াছিলেন, পৌত্রকে নিজেই সংস্কৃত শিখাইয়া, আয়ুর্ব্বেদে প্রবৃত্ত করিবেন। কিন্তু ক্ষেত্রমোহনের জ্যেষ্ঠা সহোদরার কলিকাতায় বিবাহ হইয়াছিল তিনি আগ্রহসহকারে সহোদরকে নিজের কাছে রাখিয়া,

সংস্কৃতকলেজে পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অদ্বিতীয় ছাত্র ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য। তাঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং তাঁহাদেরই পরম স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহনের ভগিনীপতি ৺দুর্গাচরণ গুপ্তের প্রতিবেশী ছিলেন। ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ও প্রধান শিক্ষক পদে অসাধারণ যোগ্যতা প্রদর্শন করিয়া, অকালে ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিতপ্রবর অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এবং কলিকাতা-মিউনিসিপালিটীর সহকারি-সভাপতি শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এখনও পৃথিবীকে ভূষিত করিতেছেন!

কৃষ্ণকমল নীলাম্বর সংস্কৃতকলেজে পড়িতেন, ইহাঁদেরই পরামর্শে ক্ষেত্রমোহনকে ঐ সংস্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট হইতে হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও দুই জনেই ক্ষেত্রমোহনকে বন্ধুপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন; দুই সহোদরই ক্ষেত্রমোহনকে সহোদরবৎ স্নেহ করিতেন। সে স্নেহ—সে বন্ধুত্ব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণকমল, ক্ষেত্রমোহনকে কেবল সহোদরত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহাকে শিষ্যত্বেও অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ক্ষেত্রমোহন কৃষ্ণকমলের সহিত ক্রীড়া করিতেন, আমোদ আহ্লাদ করিতেন। আবার তাঁহাকে গুরুপদে বসাইয়া, তাঁহার কাছে বিদ্যালাভ করিতেন। বিদ্যালাভে পরমশ্রদ্ধাভাজন বন্ধু নীলাম্বরও ক্ষেত্রমোহনের সাহায্য করিতেন।

ক্ষেত্রমোহন পরম ভাগ্যবলে, কৃষ্ণকমল ও নীলাম্বরের বাল্যবন্ধু হইতে পাইয়াছিলেন; পরম ভাগ্যবলেই তিনি কৃষ্ণকমলের দয়াময়ী জননীকে মাতৃপদে এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে ভগিনীপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পাইয়াছিলেন। কৃষ্ণকমলের পবিত্র সংসারের সকলেই ক্ষেত্রমোহনকে অকৃত্রিম স্নেহে অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যদি ক্ষেত্রমোহন বাল্যকালে কৃষ্ণকমল ও তাঁহার পরিবারবর্গের সেরূপ স্নেহভাজন না হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহার কলিকাতায় থাকা কষ্টকর হইত; তাঁহার পড়াশুনা করাও হয় ত অসাধ্য হইয়া উঠিত। কৃষ্ণকমল ও নীলাম্বর এবং ইহাঁদের সমগ্র পরিবারবর্গের ঋণ ক্ষেত্রমোহন কোনকালে শুধিতে পারিবেন না। যে স্নেহ—যে দয়া—ক্ষেত্রমোহন বাল্যে দেখিতে পাইয়াছিলেন; সেই স্নেহ—সেই দয়া তিনি যৌবনেও উপভোগ করিয়াছিলেন! সংসারে সকলের পক্ষে নানারূপ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তথাপি এখনও সেই বাল্য-সহোদরত্ব ক্ষেত্রমোহনের মনে পূর্ব্ববৎ বিরাজ করিতেছে।

ক্ষেত্রমোহন যখন সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। ক্ষেত্রমোহনের প্রতিপালক ৺দুর্গাচরণ গুপ্তের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বন্ধুত্ব ছিল; আর বিদ্যাসাগর মহাশয় রামকল, কৃষ্ণকমল এবং নীলাম্বরকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন, তিনি সর্ব্বদাই ইহাঁদের বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন। সংস্কৃতকলেজের প্রধানতম ইংরেজি-শিক্ষক বিদ্বৎকুলতিলক ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীও সর্ব্বদাই প্রিয় শিষ্য রামকমল কৃষ্ণকমলকে দেখিতে আসিতেন। সংসঙ্গে কাশীবাস, ক্ষেত্রমোহনও সঙ্গগুণে এবং ভাগ্যবলে, অতিবাল্যেই বিদ্যাসাগর এবং সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। ইহাঁদের হৃদয়ের সেই স্নেহ ক্রমে পরিপুষ্ট হইয়াছিল। মহাপুরুষেরা যত দিন ইহলোক পবিত্র করিয়াছিলেন, তত দিন ক্ষেত্রমোহন, সম্পদে বিপদে—বিশেষতঃ বিপদে—দুই মহাপুরুষের কাছেই যে উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনির্ব্বচনীয়! এ পক্ষে ক্ষেত্রমোহনের মত সৌভাগ্য অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

রামকমল কৃষ্ণকমলদিগের বাড়ীতে যাঁহারা আসা যাওয়া করিতেন, ক্ষেত্রমোহন তাঁহাদের সকলেরই স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পরে বড়লোক হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্ষেত্রমোহনকে কদাচ স্নেহদানে বঞ্চিত করেন নাই। ক্ষেত্রমোহন ১৮৫৪ অব্দে সংস্কৃতকলেজে প্রবিষ্ট হইয়া, চারি বৎসরে ব্যাকরণ সাহিত্য পড়িয়া, পঞ্চম বর্ষে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করেন। সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতকলেজেই ইংরেজি শিক্ষাও চলিতে থাকে। ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের কাছে আরম্ভ করিয়া, ৺গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর, গোবিন্দচন্দ্র গোস্বামী, ৺চন্দ্রমোহন তর্কসিদ্ধান্ত, প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়ের পাদমূলে বসিয়া, পরে ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের কাছে উচ্চ সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। চারি বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইলে, ক্ষেত্রমোহন অদ্বিতীয় আলঙ্কারিক ৺প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের কাছে অলঙ্কার শাস্ত্রে এবং আনুসঙ্গিক কাব্য নাটকাদিময় উচ্চ সাহিত্যে শিক্ষালাভ করেন। তখন অলঙ্কারের শ্রেণীতেই বৃত্তি পরীক্ষা হইত। বৃত্তিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ক্ষেত্রমোহন মাসিক ৮ টাকার বৃত্তিলাভে কৃতার্থ হন। ক্রমেই স্মৃতি ও দর্শনের অধ্যয়ন ও পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিরও পরিমাণ বাড়িতে থাকে। সিপাহিসংগ্রাম উপলক্ষে সংস্কৃতকলেজেও একটা সংগ্রাম হয়। শিক্ষাবিভাগের সিবিলিয়ান অধ্যক্ষ ইয়ং

সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিরোধ ঘটে, অমিততেজাঃ ব্রাহ্মণসন্তান বিদ্যাসাগরও সংস্কৃতকলেজের সংস্রব ছাড়িয়া দেন। প্রেসিডেন্সিকলেজের ইতি-হাসাধ্যাপক বি কাউয়েল সাহেব সংস্কৃতকলেজেরও অধ্যক্ষতা ভার লইতে বাধ্য হন। কিন্তু কাউয়েল সাহেবের স্নেহশীলতা, সংস্কৃতানুরাগ, পাণ্ডিত্য এবং কোমল ব্যবহার বিদ্যাসাগরবিচ্ছেদের শোকে শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়।

ওদিকে তর্কবাগীশ মহাশয়ের কাছে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িয়া,ক্ষেত্রমোহন অদ্বিতীয় স্মার্ত্তাচার্য্য ৺ভরতচন্দ্র শিরোমণির কাছে স্মৃতি,পরে সর্ব্বদর্শন পারদর্শী ৺জয়নারয়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে দর্শনশাস্ত্র পড়েন, বলা বাহুল্য, বৈয়াকরণাচার্য্য ৺তারানাথ তর্কবাচস্পতির পাদমূলে বসিয়া ক্ষেত্রমোহনকে সিদ্ধান্তকৌমুদী এবং শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকার পাঠ লইতে হইয়াছে।

তৎকালে অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনের পাঠ এক এক বর্ষে সাঙ্গ হইত না। এনট্রান্স দিবার পূর্ব্বে অলঙ্কার স্মৃতি ও দর্শন পড়িয়া, এফএর ইংরেজি পাঠ পড়িতে পড়িতে অলঙ্কার স্মৃতি দর্শন এবং ব্যাকরণ পড়িতে হইত। সংস্কৃত কলেজ হইতে এফ-এ পাঠ করিয়া, প্রেসিডেন্সি-কলেজে বি-এ পড়িতে হইত, কিন্তু সংস্কৃত কলেজের বৃত্তিভোগী ছাত্রদিগকে প্রত্যহ সংস্কৃত কলেজেও অলঙ্কার দর্শনাদি পড়িতে হইত, সংস্কৃত কলেজের সংস্কৃত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজের বৃত্তি রক্ষা করিতে হইত। ক্ষেত্রমোহনকেও এইরূপ করিতে হইয়াছিল। এই জন্যই তাঁহাকে অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনের অনেক গ্রন্থ পড়িতে হইয়াছিল। অলঙ্কারে সাহিত্যদর্পণ এবং কাব্য প্রকাশ সম্পূর্ণভাবে পড়িয়া, দুই গ্রন্থের পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। স্মৃতি শাস্ত্রে দায়ভাগ, দত্তকমীমাংসা, মিতাক্ষরার ব্যবহারাধ্যায় এবং মনুসংহিতার পাঠ লইতে এবং পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল, দর্শন শাস্ত্রে বিশ্বনাথের ভাষা পরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী পড়িয়া, পরে কণাদের বৈশেষিক দর্শন এবং গৌতমের ন্যায়সূত্রবৃত্তি পড়িতে হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তর্কপঞ্চাননের আদেশে ও উপদেশে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহেও অধিকার লাভ করিতে হইয়াছিলেন।

ক্ষেত্রমোহন ১৪ বৎসর সংস্কৃত কলেজে ছিলেন, ৯ বৎসর বৃত্তিভোগ করিয়া-ছিলেন, কলেজের সকলবৃত্তিই ক্ষেত্রমোহনের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, আর সকল অধ্যাপকেরই স্নেহ কৃপা ক্ষেত্রমোহনের ভাগ্যে যথেষ্ট পরিমাণ ঘটিয়াছিল।

সতীর্থ সহপাঠীদিগের সহোদরাধিক স্নেহ ক্ষেত্রমোহনের ভাগ্যে যেরূপ ঘটিয়াছিল, অনেকের ভাগ্যে সেরূপ ঘটে না। কালবশে অনেকেই চলিয়া গিয়াছেন, এখনও যাঁহারা বিদ্যমান আছেন, তাহারা ক্ষেত্রমোহনকে পূর্ব্ববৎ স্নেহ-বন্ধুত্বে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

যৌবন।

কলেজেই বালক ক্ষেত্রমোহনকে যৌবনে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তিনি ১৮৬৫ অব্দে ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী বারাশত মহকুমায় বারাসাত সহরে ৺রামরতন রায়ের কন্যাকে বিবাহ করেন, তিনি এখন বর্ত্তমান। ক্ষেত্রমোহন ৫টী পুত্র ও ৯টী কন্যার মুখ দেখেন। কিন্তু হায়! ১৪টীর ৮টী চলিয়া গিয়াছে. এখন ৩টী পুত্র ও ৩টী কন্যা বিদ্যমান। ক্ষেত্রমোহনকে সহোদর সহোদরাদের বিয়োগে কাতর হইয়া, শেষে পুত্র কন্যার বিয়োগে জরজর হইতে হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধ প্রকাশ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উচ্চ উপাধি পাইয়া, বংশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদিগের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, গুরুভক্তি, বিনয়, বন্ধু-প্রীতি, সহোদরসুলভ কর্ত্তব্য প্রভৃতি গুণে আদর্শীভূত হইয়া, অসময়ে—অল্প বয়সে সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছেন। যাঁহার বিয়োগে পরিচিতমাত্রকে কাঁদিতে হইয়াছে, যাঁহার বিয়োগ-দুঃখ এখনও সকলের সহ্য হইয়া উঠে নাই, সেইরূপ পুত্ররত্নের বিয়োগে যে, ক্ষেত্রমোহন এখনও জীবিত আছেন, ইহাই তাঁহার ধীরতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেছে। বস্তুতঃ ক্ষেত্রমোহনের মত সর্ব্বতোমুখী সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়! এখন ক্ষেত্রমোহনের বয়স ষষ্টিবর্ষ, এ বয়সেও তাঁহার পরিবার পোষণের জন্য অবিরাম লেখনী চালন করিতে হইতেছে। ইহাই সহিষ্ণুতার অপূর্ব্ব নিদর্শন!

সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে।

সংবাদপত্রই ক্ষেত্রমোহনের সাহিত্য, সংবাদপত্রই ক্ষেত্রমোহনের নিত্যকৃত্য। কলেজ ছাড়িয়া, ১৮৬৯ অব্দে ক্ষেত্রমোহন মেদিনীপুরে ডেপুটি-ইনস্পেক্টর হইয়া, অল্পদিন গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৭৩ অব্দে সে কার্য্য ছাড়িয়া তিনি সংবাদপত্রে জীবন অতিবাহিত করিলেন, প্রথমে "আর্য্যদর্শন" নামক মাসিক পত্রে কিছু দিন বন্ধুপ্রবর ৺যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের সহযোগিতা করিয়া

ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন অল্পদিন পরেই, শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদক পণ্ডিতপ্রবর ৺দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় "প্রভাতসমীর" নামক প্রাত্যহিক পত্রের সম্পাদন ও প্রচার করেন। অর্থাভাব নিবন্ধন, বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই, 'প্রভাত সমীর'কে অন্তর্ধান করিতে হয়। কিন্তু 'এই প্রভাত সমীরে'ই ক্ষেত্রমোহন সংবাদপত্রের ভাষায় যে প্রাঞ্জলতা, ওজস্বিতা এবং বাগ্মিসুলভ বর্ণনাপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই পরে সকল সংবাদপত্রে পরিগৃহীত হয়। 'প্রভাত সমীরে'র অন্তর্ধান হইবার পর ক্ষেত্রমোহন সংবাদপত্র-পরিচালনেই জীবিকার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে অনেকের পক্ষে যাহা সখের কার্য্য বলিয়া পরিচিত ছিল, ক্ষেত্রমোহনের পক্ষে তাহাই জীবিকানির্ব্বাহের কার্য্য হইয়া উঠিল। এই জন্যই অনেক প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রই ক্ষেত্রমোহনের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। নববিভাকর, সহচর, সাধারণী, সাপ্তাহিক সমাচার, প্রভাতী, সমাচারচন্দ্রিকা প্রভৃতি পত্রের সহিত ক্ষেত্রমোহনের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। নববিভাকর ও সহচরের সম্পাদন-ভারই কার্য্যতঃ বহুকাল যাবৎ ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্নকে লইয়া থাকিতে হইয়াছিল। প্রভাতী, সমাচারচন্দ্রিকা প্রভৃতির সহিতও তাঁহার সম্পাদকীয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। দৈনিকবার্ত্তা, প্রজাবন্ধু প্রভৃতি পত্রেও ক্ষেত্রমোহনের হাত পড়িয়াছিল। ফলতঃ এক সময়ে ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের সম্বন্ধ না থাকিলে যেন সংবাদপত্রই চলিত না। বঙ্গবাসীর বয়স যখন প্রায় এক বৎসর সেই সময়ে ক্ষেত্রমোহনের সহিত বঙ্গবাসীর ঘনিষ্ঠতা ঘটে। সেই ঘনিষ্ঠতা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়া, প্রায় ২১ বৎসর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু বঙ্গবাসীর দৈনিক প্রায় আদ্যন্ত কালই ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্তের হস্তে ছিল। অল্পদিন অন্য হস্তে থাকিয়া দৈনিক প্রায় ১৪ বৎসর ক্ষেত্রমোহনের সম্পাদকীয় হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল।

এখন বঙ্গবাসীর সহিত ক্ষেত্রমোহনের সম্বন্ধ নাই, তিনি বসুমতী পত্রের সম্পাদন পক্ষে সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সাহায্যে যে, বঙ্গবাসী অনেক দিন অনেক উপকার পাইয়াছে; ক্ষেত্রমোহনের নানাবিধ প্রবন্ধে যে, কিছুকাল বঙ্গবাসী অনেক গৌরবলাভ করিয়াছে, একথা বঙ্গবাসীর স্বত্ত্বাধিকারী মহাশয় এখনও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। রাজনীতি এবং অর্থনীতির আলোচনায় ক্ষেত্রমোহনের সমকক্ষ পাওয়া দুর্লভ। সরকারী বজেটের আয় ব্যয় লইয়া আলোচনা করিতে, বাঁটা ও সোনা-রূপার সম্বন্ধ বিচারে পুরাতন ইতিহাসের সম্বন্ধ ঘটানায় আধুনিক ঘটনাসমূহের বিচার করিতে

ক্ষেত্রমোহন যে, একপ্রকার সিদ্ধহস্ত, তাহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। আর সংস্কৃত বিদ্যার সম্যক্ অধিকার চর্চ্চায় ক্ষেত্রমোহনের বাঙ্গলাভাষা স্বতই ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়া থাকে। অথচ তাঁহার লেখনীসুলভ প্রাঞ্জলতা ও বর্ণনাগত সরলতায় তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ হইয়াও সরস হইয়া থাকে।

ক্ষেত্রমোহন সংবাদপত্রেই জীবন ন্যস্ত করিয়াছেন, যাহা লিখিয়াছেন, সমস্তই সংবাদপত্রের জন্য। কিন্তু তিনি যত লিখিয়াছেন, এত লেখা অন্যের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। ক্ষেত্রমোহন ৩০ বৎসর যাবৎ প্রায় প্রত্যহ সংবাদ পত্রের জন্য লিখিতেছেন, অন্যান্য বিষয়ের ত কথাই নাই, তাঁহার প্রবন্ধগুলিও যদি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়, তাহা হইলে, ঘরে স্থান পায় না।

দৈনিকের জন্য লিখিত এবং দৈনিকে প্রচারিত কয়েকটী প্রবন্ধ লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধপ্রকাশ পুস্তকে পরিণত করিয়াছিলেন, "শিক্ষা এবং উপদেশ" নামক সেই পুস্তকখানি সর্ব্বত্রই প্রশংসালাভ করিয়াছিল, বিদ্যালয়ের বৃত্তি-পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াও সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। দৈনিকের জন্য লিখিত "মদনমোহন" নামক একখানি উপন্যাস গ্রন্থও পুস্তকাকারে পরিণত হইয়া প্রচারিত এবং আদৃত হইয়াছিল।

ক্ষেত্রমোহনকে জীবিকার্জ্জনের জন্যই দিবারাত্র লেখনী চালন করিতে হইয়াছে; সংবাদপত্রই তাঁহার উপজীব্য। বঙ্গবাসীর জন্মভূমি, প্রদীপ, সাহিত্য প্রভৃতি মাসিক পত্রও ক্ষেত্রমোহনের প্রবন্ধে বঞ্চিত হয় নাই। বঙ্গবাসীর জন্মভূমি ইহাঁর বহুপ্রবন্ধে পরিশোভিত হইয়াছিল। ইহাঁর বহু প্রবন্ধে 'প্রদীপও' অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সাহিত্য-সংসৃষ্ট অন্যরূপ অনেক কার্য্যও ক্ষেত্রমোহনকে করিতে হইয়াছে, এখনও করিতে হইতেছে।

কিন্তু লব্ধপ্রতিষ্ঠ গ্রন্থকার হইবার অবসর সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হউক, আর সেরূপ ইচ্ছা নাই বলিয়াই হউক, ক্ষেত্রমোহন বহু গ্রন্থের রচনা বা প্রচার করেন নাই। ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন গ্রন্থকার বলিয়া, তাদৃশ প্রসিদ্ধ না হইলেও, তাঁহার গ্রন্থ পাঠকসমাজে আদৃত, কিন্তু তিনি সংবাদপত্রের লেখক বলিয়াই দেশে ও সমাজে পরিচিত। সংবাদপত্রসম্পাদনেই তিনি জীবন অতিবাহিত করিলেন। এ কার্য্যে তাঁহার শিষ্য সংখ্যাও কম নহে। এ পক্ষে তিনি অনেকেরই গুরুস্থানীয়।

বিহারিলাল সরকার।

সাধনার চরম লক্ষ্য এক হইলেও, সাধনার প্রক্রিয়া বা প্রণালী অধিকার-ভেদে স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। সাহিত্য-সাধনা সম্বন্ধেও এই কথা। প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর সাহিত্য-সাধনা আপন প্রাকৃতিক পথে পরিচালিত হয়। আমার সাহিত্য-সাধনার প্রক্রিয়া বা প্রণালী আমারই প্রকৃতির অনুসারী। ইহাতে একটা স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হইবে।

সাধনা আছে বটে; কিন্তু সিদ্ধি নাই; বুঝি এ জনমে তাহা আর হইল না। সাধনায় সিদ্ধি সহস্রকরা দুই জনেরও হয় কি না, সন্দেহ। সাধনা ছাড়ি নাই; ছাড়িবও না, এখন এইরূপই সুদৃঢ় সংকল্প; তবে অদৃষ্টের কথা স্বতন্ত্র; পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা থাকিবে না কি? সিদ্ধি এ জনমে না হয়, নাই হইল, জন্মজন্মান্তরেও হইবে না কি? যাহা হউক, আমার সাহিত্য-সাধনায় স্বাতন্ত্র্য-তত্ত্বটুকু সাধারণের একান্ত অশ্রাব্য হইবে না, এই বিশ্বাসে, হরিমোহন ভায়ার অনুরোধ রক্ষা করিতে সাহসী হইলাম।

পড়া শুনা,—বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি এবং ইংরেজি ফাষ্ট আর্ট পর্য্যন্ত। সংসারের অসচ্ছলতা বুঝি ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় পাশ হইবার পক্ষে অনেকটা পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দুই বেলা ছেলে পড়াইতে হইত। পাশের উপযোগী পরিশ্রমে কতকটা কাতরতা এবং অনেকটা মনোযোগের অবসাদ আসিয়া পড়িত। আর এক বৎসর পড়িলে হয়ত পাশ হইতে পারিতাম; অন্ততঃ আমার মনের এইরূপ একটা স্তোক; কিন্তু তাহা আর হইল না। সংসার ক্রমে অসচ্ছলতর হইয়া পড়িল। পিতা ঠাকুর অনেক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি চাকুরী করিতেন; ব্যবসায়ও চালাইতেন। চাকুরি ছাড়িলে ব্যবসায়ের উন্নতি, এই ধারণায় তিনি চাকুরী ছাড়িয়া দেন। ব্যবসায়ের উন্নতিও হইয়াছিল; কিন্তু অনেক টাকার লহনা পড়িয়া গেল; কাজেই ব্যবসায়ও উঠিল। চাকুরী ও ব্যবসায়ের শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; আর চাকুরী বা ব্যবসায়ের শ্রম সহিল না। সঞ্চিত অর্থে সংসার চলিল; কিন্তু তাহাতে আর কত দিন চলে? তিনি জিতেন্দ্রিয়, পরিমিতব্যয়ী এবং পরিমিতাচারী ছিলেন বলিয়া, আমাকে বহু দিন অর্থকৃচ্ছ্রতার কিঞ্চিন্মাত্র তাপ অনুভব

করিতে দেন নাই। স্থির গম্ভীর সৌম্য শান্ত গিরিগহ্বরে জ্বলন্ত গলিত ধাতব দ্রব্য পরতে পরতে স্ফুটিত, তা কে জানিত? ভিতরে শিরায় শিরায় তপ্ত শোণিত-স্রোত, বাহিরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শান্তির শত সৌম্য শীতচ্ছায়া, বালক আমি বুঝিব কি? এক দিন কিন্তু অন্তরের অগ্ন্যুচ্ছ্বাস বাহিরে উথলিয়া উঠিল। বাবা মাকে বলিলেন,—"ক্রমে সংসার চালান দায় হইল। এ সময় বিহারী যদি মাসে মাসে কুড়িটী টাকা আনিয়া দেয়, তাহা হইলে আমি নির্ব্বিঘ্নে সংসার চালাইতে পারি।" নিভৃত নিরালয়ের কথা আমার কর্ণে পৌঁছিল। পড়া-শুনা ছাড়িলাম। চাকুরীর সন্ধানে ফিরিলাম।

পর দিনই চাকুরী হইল। কলিকাতা-রাধাবাজারে কলিকাতা-প্রেসে কার্য্য-পরিদর্শকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম। তখন ৺ রাজমোহন মুখোপাধ্যায় প্রেসের স্বত্বাধিকারী। তিনিই প্রভু। কলিকাতা-নন্দনবাগানের ৺কেদারনাথ মিত্র এই চাকুরিটী যোগাড় করিয়া দেন। তিনি আমার সহাধ্যায়ী ও পরম মিত্র ছিলেন। কলেজের যুবক, নূতন কার্য্যে ব্রতী; কাজেই কার্য্যাক্ষমতার আশঙ্কা পদে পদে। ভগবানের শরণ লইলাম। প্রভুর কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিলাম। প্রতিজ্ঞা হইল,—"প্রভুকে প্রভুই ভাবিব; প্রভুর কাজকে আপন কাজ বলিয়াই ভাবিব।" এইরূপ প্রতিজ্ঞা এবং ইহার সাধনা অবশ্য মানবকর্ত্তব্যের একটা নীতিসূত্রেরই সিদ্ধান্ত। পরীক্ষার প্রারম্ভ। ভগবৎকৃপায় একটী দুইটী করিয়া অনেকগুলি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরীক্ষার পুরস্কার,—প্রভুর প্রীতি-সঞ্চার। এ প্রীতির ফল কিন্তু আর এক বিপত্তি। আমার ভার প্রভুকে দিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু প্রভুর ভার আমাকেই লইতে হইল। বড় বড় সাহেব সওদাগরদিগের বাড়ী হইতে কাজ আনা, বড় বড় সাহেব-শুভোকে কাজ বুঝাইয়া দেওয়া এবং তাঁহাদের নিকট হইতে কাজ লওয়া প্রভৃতি গুরুতর কার্য্য তিনিই করিতেন। ক্রমে ক্রমে সেই সব কাজ করিবার ভার আমাকেই লইতে হইল। তিনি যেন আমারই মুখপ্রেক্ষী হইলেন। ভগবানকে ডাকিলাম।

এইবার অগ্নি-পরীক্ষা। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রেসের কার্য্যে নিযুক্ত হই। দুই বৎসর পর রাজমোহন বাবু প্রভাতী নাম্নী একখানি প্রাত্যহিক সংবাদ-পত্রিকা পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। কালীঘাটের ৺ পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাতীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি সুলেখক ছিলেন। তিনি প্রভাতীর ভার রাজমোহন বাবুর হস্তে সমর্পণ করিয়া বিদায় লন। আমার সাহিত্য-গুরু

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত মহাশয় প্রভাতীর সম্পাদক হন। ইঁহার সহিত আমার শিষ্যত্ব-সম্বন্ধ প্রভাতীর লেখা-সূত্রেই স্থাপিত। প্রথম "কন্যা-দায়" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধ প্রভাতীতে প্রকাশিত হইল। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় আর কোন প্রবন্ধ লিখি নাই। মিরর ও ষ্টেটশম্যান পত্রে দুই একবার দুই একখানি ইংরেজিপত্র লিখিয়াছিলাম মাত্র। "কন্যাদায়" প্রবন্ধে প্রভাতী-সম্পাদক প্রীতিভরে আমার গুরুত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রভাতীর পুণ্য-প্রকোষ্ঠে আমার কর্ণে সাহিত্য-সাধনার মহামন্ত্র প্রদান করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে অতঃপর আমার কোন প্রবন্ধই প্রত্যাখ্যাত হয় নাই।

কয়েক মাস পরে তিনি প্রভাতীর সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। সে বিচ্ছেদ-ব্যথা বুকে বড় বাজিয়াছিল। সম্পাদক না হইলেও, প্রভাতীর সম্পাদকীয়তার ভার আমার উপর পতিত হইল। সওদাগর মাকড়ু ক্লার্কের উচ্চতম কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রত্যহ একটী করিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিবার ভার লইয়াছিলেন। আমি অনুবন্ধ ও সংবাদাদি লিখিতাম। যে দিন তিনকড়ি বাবু প্রবন্ধ লিখিতে না পারিতেন, সে দিন আমাকেই লিখিতে হইত। এইরূপ ব্যবস্থায় এক বৎসর স্বচ্ছন্দে চলিয়াছিল; কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় প্রভাতীর পরমায়ু শেষ হইয়া আসিল। প্রভাতীর বিষম কম্পোজিটারবিভ্রাট ঘটিল। যেরূপ উপযুক্ত কম্পোজিটর হইলে, প্রভাতার কার্য্য স্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত, যে কারণেই হউক, সেরূপ কম্পোজিটার পাওয়া গেল না। সংখ্যায়ও কম পড়িল। কম্পোজিটার নাই; অথচ প্রভাতী যথাসময়ে প্রকাশিত করিতেই হইবে। বদ্ধপরিকর হইলাম। কম্পোজ শিখিলাম। প্রেসের কার্য্য পরি-দর্শন করিতাম; প্রভাতীকেও যথাসময় প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতাম। দিবা-রাত্রি অবিরাম পরিশ্রম। প্রভু ব্যাকুল হইতেন। আমি হয়ত কোন দিন অন্ন-গ্রহণের অবসর পাইতাম; কোন দিন পাইতাম না। তিন মাস অনবরত প্রায়ই বাজারের খাবার খাইয়া প্রভাতীসেবার জন্য জীবনটাকে কোন প্রকারে টানিয়া রাখিতে হইয়াছিল। দিনের বেলায় যতদূর পারিতাম, কম্পোজ করিতাম। লিখিবার সময় হইত না; মনে মনে রচনা; হাতে হাতে অক্ষর-যোজনা। সন্ধ্যার পর বাহিরের প্রেস হইতে দুই এক জন বাঙ্গালা-জানা কম্পোজিটর আনাইয়া, বাকি কম্পোজ শেষ করাইয়া লইতাম। প্রাতঃকালে প্রভাতী বাহির করিয়া দিয়া দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইতাম। তাহার;

পর আবার কম্পোজ ধরিতাম। শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল; কিন্তু তবুও ভগবানে ভরসা। আমি প্রভুর জন্য বুক বাঁধিলাম; কিন্তু প্রভু আমার জন্য বুক বাঁধিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, আমি বুঝি মরি। প্রভাতী উঠিয়া গেল। প্রভাতীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ আমাকেই করিতে হইল! বড় সাধের প্রভাতী!

যে সময় প্রভাতী উঠে, সে সময় প্রেসের অবস্থা ভাল ছিল না। যে দিন প্রভাতী উঠিল, সে দিন ভাবিলাম, কি করিব? বুঝিতেছি, প্রভু আমাকে ছাড়িবেন না; কিন্তু না ছাড়িলে পেট চলিবে কিসে? তিন চারি মাসের বেতন বাকি পড়িয়াছিল। প্রেস না ছাড়িলে ত আরও বাকি পড়িবার সম্ভাবনা; সুতরাং উপায় কি? বাকি পড়ুক, এক দিন না এক দিন পাইব, এ দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বটে; কিন্তু আর বেশী দিন প্রেসে কাজ করিতে হইলে, প্রভুর গলগ্রহ হইতে হয়। তখন প্রভাতী আফিস নিমতলা ষ্ট্রীটে রাজমোহন বাবুর বাড়ীতে। বাড়ীর বৈঠকখানায়,—সন্ধ্যার ঘনচ্ছায়ায়,—একাকী বিরলে বসিয়া কত কি ভাবিতেছি, এমন সময় বিখ্যাত গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত রাধানাথ মিত্র মহাশয় সহসা উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বিহারী দাদা! প্রভাতী উঠিয়াছে না কি?" আমি দীর্ঘশ্বাসে প্রকৃত কথাই বলিলাম। রাধানাথ বাবু বলিলেন,—"বঙ্গবাসীতে কাজ করিবে? যোগেন বাবু তোমায় ডাকিয়াছেন।" আমি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইলাম। পরে একটু সামলাইয়া বলিলাম,—"একবার রাজমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, তার পর তোমার কথায় উত্তর দিব।" রাজমোহন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন,—"বিহারী বাবু! আমি ত আপনাকে কাজ ছাড়িতে বলি নাই।" আমি তাঁহাকে প্রেসের অবস্থা ও আমার অবস্থা সব বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি বুদ্ধিমান্, সব বুঝিলেন। বঙ্গবাসীতে চাকুরী করিতে সম্মতি দিলেন। বিদায়ে আমার চক্ষে জল আসিল; প্রভুও অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। কি কারণে প্রেসের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলিলাম না। বলিতেও নাই।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বঙ্গবাসীর প্রিণ্টারী কার্য্যে নিযুক্ত হই। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় আমাকে নিযুক্ত করেন। তিনি তখনও প্রভু,—এখনও প্রভু। এ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসীতে কার্য্য করিতেছি। প্রথম চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বঙ্গবাসীর কার্য্যে প্রবিষ্ট হইবার সময় সেই প্রতিজ্ঞারই পুনঃসংস্করণ হইল। প্রতিজ্ঞাপালনে পারগ হইয়াছি কি না, হয়ত সে কথা এক দিন প্রভুর মুখেই প্রকাশ পাইবে। বঙ্গবাসী আফিসে

বিংশতি বৎসরের উপর কাটাইলাম। প্রথমতঃ প্রেসবিভাগের সুবন্দোবস্ত করিবার ভার পাই। কার্য্যপরিচালনের প্রতিপদে সেই প্রতিজ্ঞারই পুনরন্বেষণ। ভগবৎকৃপায় সফল হইলাম। বহুদিন শত্রু-বিভীষিকার ছায়া পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিয়াছিল। যোগেন বাবুর ঔদার্য্যে সকল বিভীষিকা বিদূরিত হয়। যখন প্রিণ্টারী করিতাম, তখন এক দিন বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় গৃহে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল প্রভৃতির সাক্ষাতে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"The most energetic man" পূর্ব্বে যোগেন বাবুর সহিত আমার পরিচয় ছিল না। তিনি বাঙ্গালা লিখিতে পারিতেন, এ ধারণা আমার ছিল না; কিন্তু বঙ্গবাসীতে প্রবিষ্ট হইয়া জানিলাম, তাঁহারই রচনায় বঙ্গবাসীর চরমোন্নতি।

বাল্যে রামায়ণ-মহাভারতপাঠে এবং চণ্ডীর গান, কথকতা প্রভৃতি শ্রবণে আমার যে শাস্ত্র-বিষয়াভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইয়াছিল, বঙ্গবাসীর প্রিণ্টারী তাহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। বঙ্গবাসীতে প্রথম "শাস্ত্র-প্রকাশে" যে সব শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, আমাকে তাহার অধিকাংশেরই একটা করিয়া প্রুফ দেখিতে হইত শাস্ত্রপ্রকাশবিভাগীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী সদুপদেশে এবং শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যাবিশ্লেষণে আমার শাস্ত্রজ্ঞান কতকটা পরিমার্জ্জিত হইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস পাঠের একট প্রখর প্রবৃত্তি জুটিয়াছিল। সেই প্রবৃত্তি পরে ইংরেজি সাহিত্য-ইতিহাস সংক্রান্ত জ্ঞানার্জ্জনের উত্তরসাধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাঠ্যাবস্থায় আমার পঠনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একটা সবিশেষ সুযোগ ঘটিয়াছিল। কলিকাতা-নন্দনবাগাননিবাসী আমার অকৃত্রিম বান্ধব শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকট হইতে পড়িবার জন্য নূতন নূতন পুস্তক পাইতাম। তিনি প্রত্যেক মাসে অনেক টাকার পুস্তক কিনিতেন; এখনও কিনিয়া থাকেন; তবে এখন সংস্কৃত পুস্তকসংগ্রহে তাঁহার যত্ন বেশী।

যখন কলিকাতা প্রেসে কাজ করিতাম, তখন সকালসন্ধ্যা প্রত্যহ, এমন কি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা করিতাম। কলিকাতা-হাতিবাগানের কবিরাজ ৺কালিদাস রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সংস্কৃত-কাব্যবিশারদ শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয়ের নিকট ভট্টি ও রঘুবংশ এবং কলিকাতা সংস্কৃত

কলেজের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দের নিকট শকুন্তলা, কাদম্বরী ও মেঘদূত পাঠ করি। নিবারণ বাবু তখন দর্জ্জিপাড়ায় থাকিতেন। এখন তিনি মানভূম-পুরুলিয়ার কমিশনারের আফিসে চাকুরী করেন। কলিকাতা-নন্দন-বাগানের ৺কাশীশ্বর মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র ৺যজ্ঞনাথ মিত্র যখন বি, এ পড়িতেন, তখন তাঁহার বাড়ীতে গিয়া তাঁহার সঙ্গে সেক্সপিয়র পড়িতাম। সেক্সপিয়রের যে যে গ্রন্থ বি, এর পাঠ্য ছিল, যজ্ঞনাথ বাবু তাহা স্বয়ং পড়িতেন এবং আমাকে পড়াইতেন। আমার পিতাঠাকুরের ইংরেজি ভাষায় সবিশেষ দখল ছিল। তিনি সেক্সপিয়র ও পোপের গ্রন্থ অনর্গল মুখস্থ বলিয়া যাইতেন। তাঁহার মুখে প্রায়ই সেক্সপিয়র এবং পোপের আবৃত্তি শুনিতাম। ইতিহাসেই আমার ঝোঁক বেশী। পিতৃদেবের নিকট ইংরেজি শিখিয়াছিলাম এবং জননীদেবীর নিকট বর্ণপরিচয় পড়িয়াছিলাম। বঙ্গবাসী অফিসে যখন প্রিণ্টারী করিতাম, যোগেন বাবু তখন প্রায়ই বলিতেন,—"বিহারী বাবু যদি উন্নতি করিতে চাহেন ত, কেবল পড়ুন।" সেই উপদেশই আমার জপমালা হইয়াছিল; এখনও জপমালা হইয়া আছে; তবে নানা শোক-তাপে প্রবৃত্তি কমিয়াছে; কিন্তু যোগেন বাবুর সেই সদুপদেশ-বাণীর উত্তেজক উৎসাহ-সুরাসারে মুমূর্ষু প্রবৃত্তিটাকে এখনও বাঁচাইয়া রাখিয়াছি।

যখন প্রিণ্টারী করি, তখন যোগেন বাবু ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারী। যোগেন বাবু সম্পাদক বলিয়া গণ্য ছিলেন। উপেন্দ্র বাবু ম্যানেজারী করিতেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দৈনিকের সম্পাদক এবং ৺বামদেব দত্ত বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক ছিলেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রবিজয় বসু, শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি অনেকেই বঙ্গবাসীতে লিখিতেন। উপেন্দ্র বাবু সকল সম্পর্ক ছাড়িয়া দেন। নূতন বন্দোবস্ত হইল। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ম্যানেজারির ভার লইলেন। বাম বাবু দৈনিকের সম্পাদক এবং আমি সহকারী সম্পাদক হইলাম। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ বঙ্গবাসীর সম্পাদক হইবার অধিকারী নহেন, এখন এই নিয়ম হইল। এ পর্য্যন্ত সেই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। দৈনিকের সহকারি-সম্পাদকীয়তার ভার গ্রহণ করিবার কয়েক মাস পরে আমি ভয়ানক প্রস্রাব-পীড়ায় আক্রান্ত হই। তিন মাসের ছুটি লইলাম।

ভগবৎকৃপায় ক্রমে অনেকটা আরোগ্য লাভ করিলাম; কিন্তু একেবারে সারিলাম না। মধ্যে মধ্যে পীড়া প্রবল হইত। প্রায় আট দশ বৎসর কাল ভুগিয়াছিলাম। তবে ইহার জন্য আর কামাইও করিতে হয় নাই; ছুটিও লইতে হয় নাই। এখন ৺বৈদ্যনাথের কৃপায় কোন সন্ন্যাসিপ্রদত্ত ঔষধে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি। তিন মাস ছুটি লইবার পর ফিরিয়া গিয়া দেখি, আমার আর কার্য্যও নাই; স্থানও নাই। রাম বাবু বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেন গুপ্ত দৈনিকের সম্পাদক হইয়াছেন। পূর্ব্বে ক্ষেত্র বাবু বঙ্গবাসীতে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। তাঁহাকে দৈনিকের সম্পাদক হইতে দেখিয়া, আমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। দৈনিকের সহকারী আর আবশ্যক হইল না। যাই কোথায়? সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, বঙ্গবাসী আফিসে আমার স্থান হইবে না; কেবল দূরদর্শী যোগেন বাবু কি জানি কি ভাবিয়া, আমাকে একটু স্থান দিলেন। স্থান পাইলাম; কিন্তু কাজ কৈ?

কাজ জুটিল। এই সময় বঙ্গবাসীর প্রথম শাস্ত্রপ্রকাশ প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রপ্রকাশের মূল্য ত্রিশ টাকা হইয়াছিল। এখনকার মতন তখন শাস্ত্রগ্রন্থ-পাঠে লোকের সেরূপ প্রবৃত্তি ছিল না; কাজেই শাস্ত্রপ্রকাশের যত গ্রাহক হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল, তত গ্রাহক হয় নাই, অথচ এরূপ শাস্ত্রগ্রন্থ হিন্দুর গৃহে গৃহে বিরাজ করে, যোগেন বাবুর ইহাই সম্পূর্ণ বাসনা। লোকের শাস্ত্রপাঠের প্রবৃত্তি উন্মেষিত করিতেই হইবে; কিন্তু উপায় কি? যোগেন বাবু আমায় বলিলেন,—"বিহারী বাবু উপায় কি?" আমি ভাবিলাম, উপায় ভগবান্। প্রকাশ্যে বলিলাম,—"তাহার ভাবনা কি? এই সহরে যত স্বধর্ম্মপরায়ণ ধনাঢ্য এবং শিক্ষিত হিন্দু আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নামে গ্রাহক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া একখানি করিয়া পত্র লিখিয়া আমায় দিন। এই পত্র আমার সঙ্গে থাকিবে। আমি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া প্রত্যহ যত জনের বাড়ী পারি যাইব। সঙ্গে শাস্ত্রপ্রকাশ থাকিবে। এক জন দ্বারবান্ যেন আমার সঙ্গে থাকে। আমি যে বাড়ীতে যাইব, দ্বারবান আমার কথামতে সেই বাড়ীর কর্ত্তাকে গাড়ী হইতে পুস্তক লইয়া গিয়া দিবে।"

আমার কথামতই ব্যবস্থা হইল। প্রতিজ্ঞা করিলাম, প্রত্যহ অন্ততঃ দুইটী করিয়া গ্রাহক করিব। জগদম্বা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। প্রথম দিনেই দুইটী গ্রাহক

করিলাম। এইরূপে পাঁচ ছয় মাসে চারি পাঁচ শত গ্রাহক হইয়াছিল। শাস্ত্র-গ্রন্থের প্রুফ পড়িয়াছিলাম বলিয়া, গ্রাহকসংগ্রহে অনেকটা কাজ হইয়াছিল। অনেক স্থলে অনেককেই শাস্ত্রের অর্থ এবং প্রত্যেক গ্রন্থের বিষয়ভাব বুঝাইয়া গ্রাহক করিতে হয়। আমার গ্রাহক-সংগ্রহের কীর্ত্তিটা আর এখানে পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বলিবার প্রয়োজন নাই। ভুক্তভোগী ভিন্ন গ্রাহক-সংগ্রহের কষ্ট-বেদনা, পরন্তু কৌতুক-আমোদের রসটুকু সহজে কেহ উপভোগ করিতে পারিবেন না। কোথাও শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছিল; কোথাও দুই এক ঘণ্টা করিয়া বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল; কোথাও দস্তুরমত রাজনীতি সমাজনীতির আলোচনা করিতে হইয়াছিল। কলিকাতা-সিমলার কোন শাস্ত্রানভিজ্ঞ বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা তত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া গ্রাহক করিতে হইয়াছিল। ডালপটীর কোন আধুনিক শিক্ষিতের নিকট বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ৺দীননাথ ঘোষ মহাশয় স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—"আমি এ পর্য্যন্ত কাহারও কথায় কোন পুস্তকের গ্রাহক হই নাই, আপনার কথায় গ্রাহক হইলাম।" রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র ৺আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নিকট যখন যাই, তখন তিনি বলেন,—"এই দেখ বাপু, আমার গৃহে সকল রকম শাস্ত্রগ্রন্থের পুঁথি রহিয়াছে; আমি আর ও সব পুস্তক লইয়া কি করিব?" বাস্তবিক তাঁহার গৃহে অনেক পুস্তক ছিল। বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি ফিরিবার সময় একবার আনন্দ বাবুকে বলি,—"মহাশয়! আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি একবার দেখুন।" তিনি আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"বাপু! তুমি এ কার্য্যে সফল হইবে; কেন না, মণিহারীর দোকান লইয়া আসিয়া কেহ দোকান খুলিয়া দেখাইলে, কিছু লইবার প্রয়োজন না হইলেও, এটা সেটা দেখিতে দেখিতে, দুই একটা জিনিষ লইতে ইচ্ছা হয়। তুমিও সেইরূপ আমাকে তোমার গ্রন্থ দেখাইতে চাহিতেছ, যদি দেখিতে দেখিতে দুই একখানি লইতে ইচ্ছা হয়।" আমি অবশ্য একটু মৃদু হাসিলাম। আনন্দ বাবু এক প্রস্থ শাস্ত্র-প্রকাশ লইতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তবে তিনি বলিলেন,—"ইহা আমি স্বয়ং লইব না; তোমার একটী গ্রাহক করিয়া দিব।" আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিলাম। শাস্ত্রপ্রকাশের গ্রাহক করিতে কোথাও আদর পাইয়াছি, কোথাও তাড়া খাইয়াছি, কোথাও হাসিয়াছি, কোথাও

কাঁদিয়াছি। নানা স্থানে নানারূপ অভিনয় করিতে হইয়াছে। ফলে আমি যেন তখন নির্ব্বিকার চৈতন্য পুরুষ।

শাস্ত্রপ্রকাশের কার্য্য ফুরাইল। আমার ভাবনা জুটিল। যোগেন বাবুও নিশ্চিন্ত নহেন। আমি ভাবিলাম, আমি যাই কোথায়; তিনি ভাবিলেন, আমাকে দেন কোথায়। আমার ও তাঁহার ভাবনার ভার ভগবান্ লইলেন। বঙ্গবাসীর কার্য্য হইতে বাম বাবুর সম্পর্ক বিচ্যুত হইল। বাম বাবু হুগলী-বৈঁচির বিখ্যাত দত্তবংশীয়। তাঁহার সরস রচনায় বাঙ্গালীমাত্রেই মুগ্ধ হইত। আমি বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক হইলাম। বুকে পাষাণ-ভার চাপিল। পূর্ব্বে প্রিণ্টারীর কার্য্যকালে দৈনিকে ও বঙ্গবাসীতে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতাম। যোগেন বাবুর অনুরোধে প্রথমেই বঙ্গবাসীতে নেপাল সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখি। এই সময়ের একটী ঘটনার কথা আমার মনে আজিও জাগিয়া আছে। বঙ্গবাসী বাহির হইয়া গিয়াছে। শুক্রবার পূর্ণ বিশ্রাম। বঙ্গবাসীর সম্পাদকীয় গৃহে বহু সাহিত্যসেবীর পুর্ণ সমাবেশ হইয়াছে। আমিও উপস্থিত। সহসা বর্ত্তমান বঙ্গবাসী কলেজের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বর্দ্ধমান হইতে আসিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন বঙ্গবাসী প্রেস হইতে গিরিশ বাবুর কৃষি-গেজেট বাহির হইত। বঙ্গবাসী-অফিসেই কৃষি-গেজেটের কার্য্যালয় ছিল। গিরিশ বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়াই বলেন,—“যোগী, আজিকার নেপাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ কে লিখিয়াছে? বাম বাবু বুঝি?” যোগেন বাবু একটু মৃদু হাসিয়া নীরবে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে আমাকে দেখাইয়া দিলেন। গিরিশ বাবু বলিলেন,—“Three cheers for Behary Baboo বিহারী বাবুকে কি Present দিই।” এই কথা বলিয়া তিনি দ্বারবানকে দিয়া ছাঁচি পানের খিলি কিনিয়া আনাইলেন এবং আমাকে তাহা সাদরে খাইতে দিলেন। বুক দুরু দুরু কাঁপিল। জগদম্বাকে ডাকিলাম। মনে মনে বলিলাম,—“দেখ মা! মুখ রেখো।”

বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক হইবার সময় প্রত্যেক সংখ্যায় একটী বা দুইটী, কখন কখন ততোধিক প্রবন্ধ, অনুবন্ধ, সংবাদ, কলিকাতা, মফঃস্বল প্রভৃতি লিখিবার ভার আমার উপর পড়িল। কৃষ্ণ বাবু তখন সম্পাদক। তবে অনুবন্ধ তিনি অধিকাংশই লিখিতেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে আমাকেই সম্পাদন-ভার লইতে হইত। কোন কোন সময় তিনি দুই এক মাস করিয়া ৺বৈদ্যনাথে থাকিতেন।

দশ বার বৎসর এইভাবে চলিয়াছিল। প্রিণ্টারীর কার্য্যকালে এক মাসকাল একবার কোন কারণে আমাকে একাই বঙ্গবাসী, দৈনিক ও প্রেস চালাইতে হইয়াছিল। এক সময় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র ও ৺ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের সহকারিত্বে বঙ্গবাসী-সম্পাদনের শ্রী-বর্দ্ধন হইয়াছিল। বঙ্গবাসী হইতে তাঁহাদের সম্পর্কচ্যুতি হইলে, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আসেন। রস-রচনাপটু সুলেখক শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় আজ প্রায় দশ বার বৎসর বঙ্গবাসীর সহকারী সম্পাদক। পরে ব্রজ বাবু ম্যানেজারি ছাড়িয়া দিলেন; কৃষ্ণ বাবু ম্যানেজার হইলেন; পাঁচু বাবু সম্পাদকীয়তার ভার পাইলেন। আমি যে সহকারী, সেই সহকারী রহিলাম। সম্পাদক হইবার শক্তিও নাই; আশাও নাই; উপায়ও নাই; ইহ জন্মেত নহে। বহু সাধনা নহিলে শক্তিসঞ্চয় হয় না; শক্তিসঞ্চয় হইলেও ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মাইতে হইবে। সে সুকৃতি কোথায়? বঙ্গবাসী হইতে পাঁচকড়ি বাবুর সম্পর্ক বিচ্যুত হইল। দৈনিক উঠিল। ক্ষেত্র-বাবু বঙ্গবাসীর প্রধানতম লেখক হইলেন। এখন বঙ্গবাসীতে কৃষ্ণ বাবুও নাই; ক্ষেত্র বাবুও নাই। এক বৎসর কাল কেবল হরিমোহন ভায়া ছিলেন এবং আমি ছিলাম। তাহার পর শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত দ্বিজপদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ আসেন। উভয়েই কৃতবিদ্য ও সুলেখক। হরি-মোহন ভায়া বরাবরই রহিয়াছেন। আমরা এখন চারিজনেই আছি। অবশ্য পূর্ব্বাপেক্ষা এখন আমার দায়িত্ব গুরুতর এবং অধিকার অধিকতর। যোগেন বাবু তখনও প্রভু, এখনও প্রভু। বঙ্গবাসী সর্ব্ববিষয়ে তাঁহারই পরামর্শে পরিচালিত।

যখন জন্মভূমি প্রকাশিত হয়, তখন যোগেন বাবু আমাকে জন্মভূমিতে লিখিতে অনুরোধ করেন। তখন কৃষ্ণ বাবু বঙ্গবাসীর সম্পাদক ছিলেন বলিয়া যোগেন বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। তিনি জন্মভূমির উন্নতিসাধনে যত্নশীল হইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে প্রথমে জন্মভূমিতে পঙ্গপাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখি। প্রত্যেক মাসেই এক একটী প্রবন্ধ লিখিতাম। জন্মভূমির লিখিত প্রবন্ধ "আরকট অবরোধ" ও "পলাশী যুদ্ধ" হইতে আমার "ইংরেজের জয়" গ্রন্থ; "অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও পদ্মপুরাণ" প্রবন্ধ হইতে শকুন্তলা-রহস্য গ্রন্থ; "৺ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত" প্রবন্ধ হইতে "বিদ্যাসাগর" গ্রন্থ হইয়াছে। বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত "তিতুমীর" প্রবন্ধ হইতে আমার "তিতুমীর" গ্রন্থ রচিত।

জন্মভূমিতে দুই চারিটী কবিতা লিখিয়াছিলাম। ইহার পূর্ব্বে কোন সংবাদপত্রে বা মাসিক পত্রে আমি কবিতা লিখি নাই। ফাষ্ট আর্ট পড়িবার সময় দুইটী কবিতা লিখিয়াছিলাম। একটী ৺নবগোপাল মিত্রের প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মেলায় এবং অপরটী ২৪পরগণা-বারুইপুরে চৌধুরী বাবুদের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত মেলায় পড়িয়াছিলাম। হিন্দু মেলায় একটী "রৌপ্য পদক" এবং বারুইপুরের মেলায় "মেঘনাদবধ" পুস্তক পুরস্কার পাইয়াছিলাম। আমি যে বৎসর হিন্দু মেলায় পারিতোষিক পাই, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার পূর্ব্ব বৎসর একটী পদ্য পড়িয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলায় আমার পদ্য শুনিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের "সাধারণী"তে সেই পদ্য প্রকাশিত হইয়াছিল।

বারুইপুরে পদ্যপাঠ করিবার চারি পাঁচ মাস পরে রামনগরে ৺বিশ্বনাথ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ কন্যার সহিত আমার পরিণয় হয়। রামনগর বারুইপুরের প্রায় দুই ক্রোশ পূর্ব্বে। আমার পরিণয়টা কিঞ্চিৎ উপন্যাস-রস-সম্পন্ন। পদ্যপাঠের পর বন্ধু ৺গিরিশচন্দ্র বিশ্বাসের অনুরোধে রামনগরে যাই। সেখানে এক রাত্রি এক দিন ছিলাম। আমার এখন যিনি পত্নী, তখন তিনি পাত্রী। ফিরিবার সময় তাঁহার একটী পাত্র দেখিবার জন্য আমার উপর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ পড়িল; সুতরাং ঘটকতাসূত্রে পাত্রীদর্শনের প্রয়োজন হইল। সে প্রয়োজন সারিয়া কলিকাতায় ফিরিলাম। চারি পাঁচ মাস পরে বিধাতার ভবিতব্যে আমার ঘটকত্ব বরত্বে পরিণত হইল। বন্ধু গিরিশচন্দ্র শ্যালিকাপুত্র হইলেন। পরিণয়ের পূর্ব্বে বুঝি পদ্যপাঠের পুণ্যফলে শুভদৃষ্টির শুভযোগ সংঘটিত হইয়াছিল। একটা প্রবাদ আছে যে, পদ্যপাঠকালে আমার যে প্রশংসা-ধ্বনি উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি রামনগর পর্য্যন্ত না পৌঁছিলে, বিধাতার ভবিতব্য-চক্র বোধ হয় ঘুরিয়া দাঁড়াইত।

পাঁচ বৎসর হইল, আমি গান-রচনায় প্রবৃত্ত হই। দর্জ্জিপাড়ার "সুহৃৎ-সঙ্কীর্ত্তন সমিতি"র জন্য কীর্ত্তন রচনা করি। এই সময় আমার কনিষ্ঠ পুত্র মতীন্দ্রলাল পঞ্চম বর্ষ বয়সে আমায় ছাড়িয়া মহাকাশে মিশিয়া যায়। বুকে ব্যথা বাজিলে বুঝি গানের ভাষা ফুটে; ভাব উঠে; তান ছুটে। পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র মতীন্দ্রলালের শেষ নিশ্বাস অনন্ত অনিলে মিশাইবার পর কে যেন কি ভাবে কি ভাব ফুটাইল। ভাষা ফুটিল; সহসা তরঙ্গে তান ছুটিল,—

ধামার।

ব্যথাহারী ব'লে হরি! ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে?
ব্যথা দিয়ে তাই কি হে, চাহ ব্যথা ঘুচাইতে?

ঠুংরি।

ব্যথা না পে'লে, কেহ ত কখন কাঁদে না!
না কাঁদিলে,—কেহ ত তোমায় চাহে না!
না চাহিলে,—কেহ ত তোমায় ডাকে না!
তাই. বুঝি ব্যথা দিয়ে, চাহ,—হরি! কাঁদাইতে?

ঝাঁপতাল।

ব্যথা না পে'লে, তোমায় মনে রয় না!
তোমায় মনে না হ'লে, তোমার কথা ত কেউ কয় না।
তোমার কথা না হ'লে, বুঝি—তোমার দয়া হয় না!
তাই, ব্যথা দিয়ে, চাহ বুঝি, আপন কথা কওয়াইতে!

দশকুশী!

মরণের পথে শুয়ে,—মরণের কোলে,—
(হরি হে!)
তৃষিত-জড়িত-কণ্ঠে, ডাকি হরি হরি ব'লে.
ভাসি নয়ন-জলে, যাতনায় জ্ব'লে;
তখন তুমি থাকতে নার, কাছে এস,
আপন ব্যথাহারী নাম রাখিতে।

একতালা।

তখন পাই হে সুধা, মথিয়ে গরল!
আঁধার ছাঁকিয়ে, পাই হে, আলোক বিমল!
হয় কত অমঙ্গলে,—কতই মঙ্গল,
সুধা ঝরে,—নির্ঝর হে,
চিতানল-ঘন চিতে!

রূপক।

হরি! শুধু, ব্যথাহারী তোমার নাম ত নয়!
তুমি প্রেমময়,—তুমি প্রাণময়,

তুমি সুখময়,—তুমি নিরাময়,
তবে কিসে ব্যথা আসে, কেন দুঃখ হয়!
কভু ত দেখি নাই, বিকচ কমলে গরল ঢালিতে!

দোলন।

কেন,—তোমার হাসা চাঁদ আঁধারে মিশায়?
কেন,—তোমার ফোটা কমল নিশীথে শুকায়?
কেন,—সন্ধ্যাচ্ছায়া পড়ে গোধূলি-গগন-গায়?
লীলাময়! তোমার এ সব লীলা না পারি বুঝিতে!

খয়রা।

আমার, এ সব কিছু, বুঝে কাজ নাই;
আমি, বুঝিতে না চাই। (কাজ নাই)
যদি ব্যথা না পে'লে তোমায় নাহি পাই;
যদি ব্যথা না পে'লে তোমায় ভুলে যাই;
তবে ব্যথা দিও, ব্যথা দিও,
দিও না, তোমার নাম ভুলিতে।
(দিও না আমায় দিও না তোমার নাম ভুলি:
দিও না, ব্যথাহারী নাম ভুলিতে;
দিও না, ব্যথাহারী দয়াল হরি
নাম ভুলিতে,—দিও না ওহে;)

মতীন্দ্রলালের শোক পাসরিতে না পাসরিতে শিশু কন্যা নব-দুর্গার অকাল বিলয়ে আবার গান ফুটিল ;—

তেওট

না হ'তে ভাবের উদয়! কেন হে বিলয়,
দয়াময়! জলে জলবিম্ব-প্রায়!
ভাবে প্রাণ ফুটে, বাসনায় টুটে,
তৃষাময় সাধে সব শুকায়ে যায়॥

একতালা।

হরি হে! এ সংসারে, ভাবি যারে তারে
আপন বলিয়ে,—কি জানি কি টানে।

চাহি মুগধ নয়নে, আকুল পরাণে;
ভাবি মনে হেন, সুধা-আশে যেন,
চেয়ে রই সুধাকর পানে।
সে যে দেখিতে দেখিতে, আঁখি পালটিতে,
চকিতে মিলায় কোথায়॥

ঝাঁপতাল।

তবুও পিয়াসা, তবুও যে আশা,
তবু ভালবাসা, মিটে না আমার।
দূরে মরু-পারে, বালুকা-বিথারে,
রবিকর-ধারে, রচিত অমিয়-সায়র।
দূরে নয়নে হেরে, বুঝিতে না পেরে,
কি জানি কি মোহ-ফেরে,
উন্মাদ-মানস ধায়॥

ঠুংরি।

সুধার ঝরণা খুলিয়ে দিয়ে,
আছ তুমি হরি! কাছে দাঁড়াইয়ে,
কত স্নেহ-ভরে, কতই আদরে,
ডাকিছ আমায় আয় আয় বলিয়ে;
সে তো জানি না,— সে তো বুঝি না,—
সে তো দেখি না,— সে তো শুনি না,—
মরি মোহ-মরীচিকায়॥

লোফা।

দয়াময়! দেখা দাও, পরশে ফিরাও,
বাসনা ঘুচাও, পিয়াস মিটাও,
দেহ হরি, ঝারি ভ'রি,
শান্তি-বারি পিপাসায়॥

দোলন।

কোথা তুমি, কোথা তুমি!
হেথা পড়ে আমি,—অকূল বিশ্বের মাঝে.—

নিয়ত নিরয়গামী।
কি যে মরমের কথা, কি যে অন্তরের ব্যথা,
কি না জানো, তুমি অন্তর্যামী!
আমি ফিরিতে হে চাই, ফিরিতে না পাই,
কে যেন পিছে টানিয়ে ফিরায়॥

দশকুশী।

তুমি পথ না দেখালে কোথা যাব চ'লে!
ধূ-ধূ প্রান্তরে, অবশ অন্তরে, অবসাদে পড়ি ঢ'লে।
দেহ পথ দেখাইয়ে, লও হে তুলিয়ে,
আপন অভয় কোলে।
আজি মরম-ব্যথায়, মরমের ঘায়,
তোমারে পরাণ চায়॥

খয়রা।

ভাবে ভাব মিলায়ে, ভাব বিলায়ে.
এস ভাবময়,—জাগ এ অন্তরে।
যে ভাবে কদম্ব ফুটে, যে ভাবে তটিনী ছুটে,
যে ভাবে বাসনা মরে;
যে ভাবে বৃন্দাবনে, শ্যামরূপে রাই সনে,
জেগেছিলে ঘরে ঘরে;
সেই ভাবে চাও, সেই ভাব দাও,
আমার হৃদয় ভ'রে।
আমি ভাবে যাই গলি, ভাবে হরি বলি,
ভাবে পড়ি লুটায়ে পায়॥

ইহার পর আমার বহু গীত রচিত হইয়াছে। শত গীতে আমার "গান" গ্রন্থ। যখন আমি কলিকাতা-বহুবাজারের মটস লেনে ডল সাহেবের স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন লর্ড মেওর মৃত্যুপলক্ষে একটী গান রচনা করিয়াছিলাম। তখন আমার বয়স বোধ হয় পনের। পিতা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত গীতরচয়িতা ৺রূপচাঁদ পক্ষী মহাশয় কোলে লইয়াছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর বয়স হইল, কখন ইংরেজি লেখার চর্চ্চা করি নাই এবং রাখিও নাই;

আজিকাল কার্য্যগতিকে বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত টেলিগ্রাফ নামে প্রাত্যহিক ইংরেজি পত্রে কিছু কিছু লিখিতে হইতেছে।

"বিদ্যাসাগর" পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর, আমি তিন মাস রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছিলাম। "বিদ্যাসাগর" পুস্তকের বিষয়সংগ্রহে যেরূপ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, তেমন গুরুতর পরিশ্রম জীবনে আর কখন করি নাই। কত দিন প্রত্যহ সকাল হইতে বেলা প্রায় দুইটা পর্য্যন্ত ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া হিন্দুপেটরিয়টের পঞ্চাশ বৎসরের ফাইল উল্টাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনঘটনা সংগ্রহ করিয়াছি কতদিন সংস্কৃত কলেজের ধূলিপূর্ণ গৃহের মধ্যে বসিয়া আলমারি হইতে কাটিয়া মুষিক-পুরীষপূর্ণ পঞ্চাশ বৎসরের পুরাতন খাতাপত্র বাহির করিয়া তথ্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বাঙ্গালা ও ইংরেজী সাহিত্যের তুলনা করিবার জন্য এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে হস্ত-লিখিত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে কতদিন অনাহারে কাটাইয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বহু ইংরেজী পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। হায়! তিনি আমায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার জন্য কতবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। বড়ই দুঃখ, তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই, বোধ হয়, পারিবও না। "অন্ধকূপহত্যা" বিবরণ কাল্পনিক, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য কতদিন এসিয়াটিক সোসাইটী ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লাইব্রেরীর দ্বারস্থ হইতে হইয়াছিল, তাহার নিরূপণ নাই। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলের গল্প পদ্মপুরাণ হইতে সংগৃহীত, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শকুন্তলার উপাখ্যানসংক্রান্ত পুঁথিসংগ্রহে কত লোকের কত উপাসনা করিতে হইয়াছে। আরও দুই একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত। এ জনমে আর সমাপ্ত হইবে না।

বুক ঝলসিয়া গিয়াছে; পঞ্জর ভাঙ্গিয়াছে; বুকের মাঝে দাউ দাউ দাবানল জ্বলিতেছে! পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, দুহিতা, মাতা, জামাতার বিয়োগে-শোকে শক্তিশেল বুকে বিঁধিয়া আছে। ১৩০২ সালের ২৮শে আশ্বিন পিতা ও ২৮শে অগ্রহায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গে গিয়াছেন। সেই দিন হইতে সংসারের কুহেলিকায় অনভ্যস্ত এবং নিত্য সংসারের দুর্ব্বহ ভারগ্রস্ত, আমি,—এই সংসারের চির-অজানা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। ১৩০৬ সালের ১০ই জ্যৈষ্ঠ পুত্র যতীন্দ্রলাল এবং ১৩০৮ সালের ২৬শে আষাঢ় নয় মাসের কন্যা নবদুর্গা পরশীর ক্ষীণালোকে খেলিতে খেলিতে

সংসারশ্বন-নিবিড় ঘনান্ধকারে মিশিয়া পৃথিবীর কোন পারে চলিয়া গিয়াছে। ১৩০৯ সালে ১৫ই চৈত্র জননী ত্রিরাত্র গঙ্গাবাস করিয়া চূড়ামণি যোগে সজ্ঞানে অনন্তধামে গিয়াছেন। পনর দিন পরে ১৩১০ সালের ১লা বৈশাখ স্মিত-শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক জামাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ অকালে অনন্ত আকাশে মিশিয়াছে। সম্মুখে রবিতাপঝলসিত কমনীয় কিসলয়সম একাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা! কত সহিব! তবুও সহিয়াছি। মরমের বহ্নিতাপ বাহে কাহাকেও বুঝিতে দিই নাই। যতীন্দ্রলালের যে দিন মৃত্যু হয়, তাহার পর দিন সংকীর্ত্তনে নাচিয়া গাহিয়াছি,—

"একি দেখি অপার করুণা তোমার
তুমি আপনি কাঁদ আপন নামে ভক্তের ব্যথা মূলাধার।"

জামাতার নাভিশ্বাস,—বঙ্গবাসীর জন্য "গৌরাঙ্গ" পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়াছি। কিন্তু হায়! মরমে মরমে কেন কালানল জ্বলে? শাস্ত্রসদুপদেশের স্নিগ্ধশীতল শান্তি-সলিলে শতবার আগুণ নিবাইয়াছি, শতবার সে আগুণ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মূঢ় আমি,—বৃথা আশ। কঠোর তপোনিরত মায়াতীত তপস্বী মুহূর্ত্ত মায়ার সাম্মোহন-কটাক্ষে মুহুর্মুহু শিহরিলেন,—আমি কে? মনে কি পড়ে না, তপস্বী নিমিষে কি বিশ্ব-ব্যোমব্যাপী করুণ-প্লাবনে ব্রহ্মাণ্ড ভাসাইয়াছিলেন! অটল অচল হিমাদ্রির বক্ষ বিদারি কি সুরস্রোতে, কি ছন্দ-তরঙ্গে শোকের চির-স্মরণীয় গাথার নির্ঝর ফুটিয়াছিল! তপস্বী বলিয়াছিলেন,—

"বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ।"

আমি কে? জানি না, কাহার অভিশাপে; কিন্তু আমারই মহাপাপে, আমার চির-শান্তিময় সংসারকুটীরে শমন আগুণ জ্বালাইয়াছে। পারিবারিক পবিত্রতায় ও কর্ত্তব্য-সাধনায় সংসার আমার চির-শান্ত-শুদ্ধ তপোবন। বাবা ছিলেন,—সদাশিব; মা ছিলেন,—অন্নপূর্ণা। মা গিয়াছেন, আমার মনে হয়, আমার মায়ের অভাবে সমগ্র বঙ্গভূমির অন্নপূর্ণা-রূপিণী মাতৃকুলের অবসান হইয়াছে। যখনই যত উপার্জ্জন করিয়াছি, সকলই বাবা ও মাকে দিয়াছি। কপর্দ্দকের প্রয়োজন হইলে, হাত পাতিয়াছি। এখন পত্নী, বিধবা কন্যা, দশম বর্ষীয় পুত্র মুনীন্দ্রলাল ও এক বৎসর-বয়স্কা কন্যা লইয়া,—"দূরে বালুকা-বিথারে, রবিকর-ধারে, রচিত অমিয়-সায়র"।

পত্নী সংসার-সাধনায় জননীর পথানুবর্ত্তিনী। শোকের শত শেলকায় সংবিদ্ধ হইয়াও, সংসারের জন্যই তিনি সংসারের জঞ্জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। জঞ্জাল ঘুচাইয়া জ্বালা জুড়াইতে চাহি; কিন্তু পারি কৈ? এখন হে দেব-ভূদেব! আশীর্ব্বাদ করুন,—বঙ্গবাসীর সেবায় যেন জীবনের শেষ কয়টা দিন অতিবাহিত হয়।

১৭৭৭ শকে বা ১২৬২ সালে ২রা কার্ত্তিক বা ইং ১৮৫৫ সালের ১৮ই অক্টোবর মহা অষ্টমী পূজার দিন ঠিক সন্ধি পূজার পর হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামে আমার জন্ম। তখন বাড়ীতে দুর্গোৎসব হইত। যখন জন্মগ্রহণ করি, তখন পিতামহ ৺বেচারাম সরকার ছাতু বাবুর বাড়ীতে ও পিতা ৺উমাচরণ সরকার কলিকাতা সারবেয়ার জেনারেল আফিসে চাকুরী করিতেন। জ্যেষ্ঠ ৺নীলকণ্ঠ সরকারের বয়স তখন পাঁচ বৎসর মাত্র। আমরা দুই সহোদর। দাদা গিয়াছেন;—আমিই আছি। একটী মাত্র ভগিনী আছেন। হুগলী জেলার মথুরাবাটী গ্রামে আমার মাতুলালয়। আমার মাতামহ ৺রামচাঁদ মিত্র মহাশয় কবি গাহিতেন এবং কবির গান রচনা করিতেন। আট বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসি। প্রথম পাঠশালে পড়ি। তাহার পর বহুবাজার গবরমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলে ভর্ত্তি হই। এইখানেই ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলাম। পরে ডল সাহেবের স্কুলে পড়ি। জেনারেল এসেম্বিলি কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ হই। কলিকাতার দর্জ্জিপাড়ায় আমাদের বসতবাটী। কার্য্যোপলক্ষে পিতাঠাকুর বহুবাজারে থাকিতেন; কাজেই আমাদিগকে প্রথম সেইখানে থাকিয়া পড়া শুনা করিতে হইয়াছিল। পরে যে বৎসর এনট্রান্স পরীক্ষা দিই, সে বৎসর দর্জ্জিপাড়ার বাড়ীতে আসি। আজ প্রায় বার তের বৎসর হইল, দর্জ্জিপাড়ার বাড়ীতে কুলাইত না বলিয়া বাবা ১০নং রামচাঁদ নন্দীর গলিতে বাটী ক্রয় করেন। এখন এই বাড়ীতেই আছি।

আমার মনে হয়, বাঙ্গলা স্কুলে পড়িয়াছিলাম বলিয়া বাঙ্গালা শিখিয়াছি। তাই শ্রীমান্ মুনীন্দ্রলালকে বাঙ্গালা স্কুলে দিয়াছি। প্রভাতী আফিসে কাজ করিবার সময়, এই একটা ধারণাই বল, আর খেয়ালই বল, হইয়াছিল যে, থিয়েটারে অভিনয় করিলে, বক্তৃতার শক্তিসঞ্চয় হয়। এই ধারণা বা খেয়ালের বশে, কয়েকটী বন্ধুর সহিত একত্র মিলিত হইয়া, দর্জ্জিপাড়ার ৺রামানন্দ পালের বাটীতে

"দর্জ্জিপাড়া থিয়েট্রিকেল ক্লব" নামক একটী সখের থিয়েটার করি। থিয়েটারের স্থায়ী ষ্টেজ হইয়াছিল। তখন রামানন্দ বাবু জীবিত ছিলেন। থিয়েটারে অভিনয় শিখাইতাম; কিন্তু অভিনয় শিখি নাই। এইটী বুঝি আমার দৈব বিদ্যা। সরমের শাসনে রঙ্গমঞ্চে চড়িয়া অভিনয় করিবার সুযোগ হয় নাই। তবে ছদ্মবেশে "শুম্ভ-সংহার" নাটকের অভিনয়ে কালী সাজিতাম। কালীর অভিনয় নীরব। আমার কালী সাজিতে হয় না,—রসনা কিঞ্চিৎ লোল করিতে পারিলেই সাক্ষাৎ কালী। সরমের মান রাখিতে, অন্তত পরিচিতের নিকট আত্মগুপ্তির প্রয়োজন হইত; সুতরাং পরিচিতের চক্ষে ধূলি-প্রক্ষেপের জন্যই মুখে মুখস পরিয়া আর সর্ব্বাঙ্গে কালো-রঙ্গের ছোপান গেঞ্জি আঁটিয়া কালী সাজিতে হইত। সমর-সংঘর্ষণে তরবারি-চক্রে কাটিয়া কুটিয়া যাইবার ভয়ে, কেহ কালী সাজিতে রাজি হইত না। কিন্তু কালী ত চাই; কাজেই কালী সাজিবার সাহসটুকু আমাকে সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

ফলে কিন্তু অভিনয় করিলে, বক্তা হওয়া যায়, এ ধারণা বা খেয়ালটা এখনও আমার মজগের ভিতর মজিয়া আছে। বিনা প্রমাণে এ কথা বলিতেছি না। আমি বক্তৃতা করিয়াছি; অবশ্য অভিনয়েরই অনুপাতে। তবে বক্তৃতা-ক্ষেত্রে মুখসে মুখ ঢাকিতে হয় নাই; পরন্তু বক্তৃতা গৌরবের না হইলেও রৌরবের নহে; অভিনয়ের মত ততটা নীরবও নহে। এক দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আমার মৌখিক ঘণ্টাকাল-ব্যাপী "উপসর্গ"-বিচার বক্তৃতা-কণ্ডুয়নের একটা প্রকট উপসর্গ হইয়াছিল। আরও দুই এক স্থলে অল্পাধিক পরিমাণে এইরূপ উপসর্গের উৎপাত যে হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। যদি বক্তার মত আমার বিদ্যা-বুদ্ধি প্রখরা হইত, অভিনেতার মত অভিনয় করিবার শক্তি থাকিত, আর যদি সরম সম্বরি রঙ্গমঞ্চে সরব অভিনয় করিতে পারিতাম, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিত একটী দিগ্বিজয়ী বক্তা হইতাম। ইতি প্রমাণ,—শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।



প্রভাত চিন্তা ও ভক্তির জয় প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, বিখ্যাত 'বান্ধব'সম্পাদক, বঙ্গের, 'কারলাইন' শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ ১২৫০ অব্দে ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণায় ভরাকর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ঠাকুর ৺শিব নাথ ঘোষ। মাতার নাম ৺উমাতারা। পিতামহ ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের নামে "ভক্তির জয়" উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। ভরাকরের ঘোষ মহাশয়েরা বঙ্গজ কুলীন কায়স্থসমাজের মধ্যে, অতি বড় উচ্চ পদবীরূঢ়। তাঁহাদিগের কুলাচার্য্য ব্রাহ্মণ। কুলাচার্য্যের গ্রন্থে পূর্ব্বাপর পঁচিশ পুরুষের বিবাহ ও কন্যাদান প্রভৃতি ক্রিয়া দোষগুণ সমালোচনার সহিত লিখিত আছে। তাঁহাদিগের সহিত কোন পুরুষেও, দেশীয় মৌলিক কায়স্থের কোনরূপ সম্পর্ক না থাকা হেতু, তাঁহারা স্বদেশে 'ঘোষ ঠাকুর' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কালীপ্রসন্নের ধারায় এখন পর্য্যন্তও মৌলিকের সম্পর্ক ঘটে নাই।

কালীপ্রসন্নের প্রপিতামহ ঠাকুর রামপ্রসাদ ঘোষ ঢাকার নবাব সরকারে বড় কাজ করিয়া, বিক্রমপুরের অঙ্গীভূত দোহার পরগণায় ভাল জমিদারী সৃষ্টি করিয়াছিলেন; এবং কাঠালিয়া গ্রামে বাড়ীঘর বানাইয়া, বহুলোকের প্রতিপালকরূপে সম্মান পাইয়াছিলেন। তখন পদ্মার স্রোত গোয়া-লন্দ হইতে আড়িয়লখাঁ দিয়া, দাক্ষণে প্রবাহিত হইত। পদ্মার স্রোত যখন বিক্রমপুরের অন্তর্ব্বাহিণী রথখোলা নমিকা ক্ষুদ্র সোতা দিয়া প্রবাহিত হইয়া, মেঘনায় যাইয়া মিশিল, তখন সেই ক্ষুদ্র সোতাই দুই তিন বৎসরের মধ্যে, সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তিধারণ করিয়া কীর্ত্তিনাশা নদীনামে, মনুষ্যের হৃদয়ে ভয়ঙ্কর ত্রাস উৎপাদন করিল। রাজনগরের মহারাজাধিরাজ রাজবল্লভ অবধি, বিক্রমপুরের ছোট বড় সমস্ত ভূম্যধিকারীদিগের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি, কীর্ত্তিনাশার গ্রাসে গড়াইয়া পড়িল। রামপ্রসাদের কাঁটালিয়ার বাড়ী ও জমিদারীর প্রধান ভাগ, কীর্ত্তিনাশার উদরস্থ হওয়ায়, তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ, উত্তরে প্রায় দুই প্রহরের পথ সরিয়া, ভরাকর গ্রামে আসিয়া নূতন বাড়ী করেন। এই স্থানই কালীপ্রসন্নের জন্মস্থান। ভরাকরে আরও অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের বসতি থাকা হেতু, উহা বিক্রমপুরে একটী ভদ্রপল্লী বলিয়া পরিচিত।

কালাপ্রসন্নের পিতা শিবনাথ বড় প্রগাঢ় বিশ্বাসী ও ভক্তিমান্ হিন্দু ছিলেন। পাছে কালীপ্রসন্ন ইংরাজী শিখিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হন, তিনি এই হেতু তাঁহাকে ইংরাজী পড়িতে দিবেন না বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং বাড়ীতে যে একটী ফারসীর মকৃতব ছিল, তাহাতেই কালীপ্রসন্নকে, তিন বৎসর বয়সের সময় প্রথম শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। মকৃতবে দুইটী মুন্সী থাকিত, তাহারা শিবনাথের নিকট উপযুক্ত বেতন পাইত। ভরাকরের নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের ভদ্রবংশীয় বালক ও যুবকগণ এই মকৃতবে থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত। বিদ্যার্থীদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঘোষ মহাশয়দিগের বাড়ীতে অন্ন-বস্ত্র পাইত। কালীপ্রসন্ন বাল্যকালে বড় বেশী মেধাবী ছিলেন। তাঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, তখন 'পন্দেনামার' বয়াৎ ও কীর্ত্তিবাসের পয়ার তাঁহার কণ্ঠস্থ। বাড়ীর মেয়েরা শিশুর মুখে রামায়ণ শুনিবার অভিলাষে তাঁহাকে বড়ই আদর করিয়া, পাঠকের মত আসনে বসাইতেন, এবং সকলে তাঁহাকে চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া কীর্ত্তিবাসি রামায়ণ শুনিতেন। এইরূপে অল্প কিছুদিনের মধ্যে, কাশীরামদাসের মহাভারতও কালীপ্রসন্নের কণ্ঠস্থ হইল। এবং তাঁহার মেধা ও প্রতিভার দিকে শিবনাথ ঘোষ মহাশয়ের দৃষ্টি পড়িল। ভরাকর গ্রামে তখন কলাপ ব্যাকরণের একটা বৃহৎ টোল ছিল। টোলের অধ্যাপক কালীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বৃদ্ধ ঘোষ মহাশয়ের অনুরোধে কালীপ্রসন্নকে সংস্কৃত শিখাইতে সম্মত হইলেন। এবং প্রায় প্রতিদিনই ঘোষবাবুদিগের বাড়ীতে আসিয়া কালীপ্রসন্নকে কলাপের সন্ধিবৃত্তি পড়াইতে লাগিলেন। সন্ধিবৃত্তি এক বৎসরে সমাপ্ত হইল। ষষ্ঠ বৎসরে কালীপ্রসন্ন কলাপের শব্দরূপ অর্থাৎ চতুষ্টয় বৃত্তি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। বাড়ীর অন্যান্য বালকেরা তখন ইংরাজী পড়ে। কালীপ্রসন্ন ইংরাজী-পড়িতে সুযোগ পাইতেছেন না বলিয়া, সময় সময় সমান বয়স্কদিগের নিকট চক্ষের জল ফেলিতেন। ঈশ্বরের ইচ্ছায়, অল্পদিনের মধ্যেই, তাঁহার প্রার্থিত সুযোগ ঘটিল। কালীপ্রসন্নের পিতামাতা দীর্ঘকাল গঙ্গাপ্রবাসের উদ্দেশ্যে কলিকাতা যাত্রা করিলেন, কালীপ্রসন্ন বালকের প্রণালীতে বিস্তর কাঁদিয়া-কাটিয়া পিতা-মাতার সঙ্গী হইলেন। শিবনাথ যখন বরিশালে পঁহুছিলেন, তখন কালীপ্রসন্নের বুদ্ধি ফিরিল। তিনি বরিশালে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত শম্ভুনাথ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় নামিয়া রহিলেন এবং সেখানে থাকিয়া, ইংরাজী পড়িতে লাগিলেন। বরিশালে সে সময় গবর্ণমেণ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দুইটী পাদ্রীর দুইটী পৃথক্ স্কুল ছিল। বরিশালের বালকেরা

সেই পাদ্রীদ্বয়ের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করিত। পাদ্রীদিগের একটীর নাম ব্যারাডো, তিনি রোমেন ক্যাথলিক। আর একটীর নাম রিকেট; তিনি প্রটেষ্টেণ্ট। কালীপ্রসন্ন অত্যল্পকাল ব্যারাডোর স্কুলে পড়িয়া, আপনার বুদ্ধিতেই রিকেট সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই স্কুলে প্রত্যেক তিন মাসে ডবল প্রমোশন পাইয়া, এক বৎসরে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিলেন। চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী ঈশপস ফেবল লেনীর গ্রামার. কালীপ্রসন্ন এই পুস্তক রীতিমত মুখস্থ করিলেন। তিনি ফার্সী মক্তবে থাকা কালে, এই এক মোটা কথা শিখিয়াছিলেন যে, পাঠ্য পুস্তক মুখস্থ না হইলে প্রকৃত বিদ্যা জন্মে না। তিনি এই হেতু যেরূপ উৎসাহের সহিত কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত মুখস্থ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ উৎসাহের সহিত ক্লাসের পাঠ্য ইংরাজী পুস্তক নিচয়ও পুনঃপুনঃ পাঠের দ্বারা মুখস্থ করিয়া, অল্প বয়সেই, ইংরাজীতে একটুকু প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নবমবর্ষ বয়সের সময়, বরিশালে গবর্ণমেণ্ট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। কালীপ্রসন্ন দুই বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করিয়া, তাঁহার দশম বর্ষ বয়সের সময়েই তিনি ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেখানে দুটী বৎসর কাল বিশেষে উদ্যম ও আগ্রহের সহিত ইংরেজী পড়িলেন। এই দুই বৎসর তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য এবং ইতিহাস ও ভূগোলের পরীক্ষায় সর্ব্ব প্রথম হইয়া, অনেক মুল্যবান্ পুস্তক প্রাইজ পাইয়াছিলেন। ঢাকা কলেজে তখন প্রাইজ দিত, এখন আর দেয় না। কালীপ্রসন্ন যে বৎসর এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিলেন, সেই বৎসর তাঁহার বুদ্ধি বিগড়াইল! তিনি দীনবন্ধু গোস্বামী নামক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণের নিকট মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ ও মেঘদূত এবং শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য নামক আর একটী পণ্ডিতের নিকট ভট্টি, পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং পাঠ্য পুস্তকে উপেক্ষা করিয়া, সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুদ্দীপ্ত উৎসাহে ডুবিয়া গেলেন। আট নয় মাসে সংস্কৃতে তাঁহার ভাল প্রবেশ হইল, এবং এই সময় তাঁহার রচিত দু একটী বাঙ্গালা প্রবন্ধ, পণ্ডিতদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিল। কিন্তু কলেজের শিক্ষা এক প্রকার মাটী হইয়া গেল। ঐ সময়ে, ঢাকা কলেজে Lewis society নামে একটী প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক সমিতি ছিল। কলেজের প্রফেসার শিক্ষক ও পণ্ডিতেরা সেই সমিতির সভ্য। কালীপ্রসন্ন সেই সভায় তাঁহার তের বৎসর বয়সের সময়, "পদার্থ বিদ্যা অনুশীলনের ফল" এবং "বন্ধুতা না হৃদয় বন্ধন" এই নামে দুইটী সুদীর্ঘ বাঙ্গালা প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, খুব বেশী

প্রশংসা পাইয়াছিলেন। প্রবন্ধ রচনায় ঐ সময়েই কালীপ্রসন্নের বিশেষ যশ হইল বটে, কিন্তু তিনি কালেজে রীতিমত অধ্যয়ন করিলেন না বলিয়া, তাঁহার অভিভাবকদিগের মধ্যে, কেহ কেহ তাঁহাকে কটু তিরস্কার করিলেন। এই তিরস্কার তাঁহার প্রাণে সহিল না। তিনি কিছুকাল পরেই কলিকাতা চলিয়া গেলেন, এবং সেখানে আগে চেতলায়, তাহার পর ভবানীপুরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, এবং পরিশেষে কলিকাতার উত্তর প্রান্তে অবস্থান করিয়া, ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন। সে সময়, কলিকাতায় বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রতি লোকের তেমন অনুরাগ ছিল না। ইংরেজীর উপরই সর্ব্ব সাধারণের বিশেষ অনুরাগ। কালীপ্রসন্ন সাময়িক স্রোতে প্রবাহিত হইয়া ইংরেজী অধ্যয়নেই একবারে ডুবিয়া গেলেন; এবং কএক বৎসর কাল, ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান নীতিবিজ্ঞান, এবং ধর্ম্মতত্ত্বের ইতিহাস বা থিয়লজি প্রভৃতি গ্রন্থরাশি পাঠ করিয়া ইংরেজি ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন।

তিনি এ সময়ে প্রতিদিন, দিবা রাত্রিতে, অতি কম হইলেও চৌদ্দ পনর ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন; এবং যখন অধ্যয়নে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেন, তখন কলিকাতার কোন একটী দীঘী কিম্বা পুষ্করিণীর পাড়ে যাইয়া, কিছুক্ষণ পাদচারণা করিতেন। তাঁহার অধ্যয়ন প্রণালীতে একটুকু নূতনত্ব ছিল। কোন একখানি অপঠিত অথচ দুর্ব্বোধ পুস্তক তাঁহার হস্তগত হইলে, তিনি তাহা তাঁহার অধ্যয়ন গৃহে লইয়া যাইতেন এবং পুস্তক খানিকে একখানি আসন অথবা পীঠের উপরে ভক্তির সহিত রাখিয়া, সেখানে ঈশ্বরের কৃপা লাভের জন্য পুনঃপুনঃ প্রণাম ও প্রার্থনা করিতেন। তার পর পুস্তকখানি সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, উহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেন। ক্যাণ্ট কুঁসে, ফিকৃটে ও কোমটে প্রভৃতি দার্শনিকগণের অতি কঠিন পুস্তকনিচয়ও তিনি এইভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন; এবং কোন কোন পুস্তক বিশ পঁচিশ বার পড়িয়া উহার সমস্ত কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছেন।

কালীপ্রসন্ন অতি উচ্চ ক্ষমতান্বিত বাগ্মী। তিনি এইক্ষণ যেমন লোক-বহুল সভাস্থলে বাঙ্গালায় কেমন এক বিচিত্র ভাষায়, বিচিত্র ভঙ্গীতে, দুই তিন ঘণ্টাকাল অনর্গল বক্তৃতা করিয়া, শ্রোতৃবর্গকে মোহিত ও স্তম্ভিত করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রথম বয়সেও তিনি ইংরেজী ভাষায় ঐরূপ বক্তৃতা করিয়া মানুষের হৃদয়ের উপর,—অন্ততঃ তৎকালের জন্য, এক আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্চারণ করিতে

সমর্থ হইতেন। তাঁহার বয়স যখন সবে বিশ বৎসর, সেই সময় তিনি ইংরেজী বক্তা বলিয়া বিখ্যাত হন। তাঁহার বক্তৃতার প্রথম আরম্ভ ভবানীপুরে। সে সময় ভবানীপুরে একটি সুপরিচিত সাহিত্য সভা ছিল। একবার সে সাহিত্যসভার সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে এক বৃহৎ অধিবেশন হয়। সভাগৃহ দুই তিন সহস্র লোকে পরিপূর্ণ। সভাপতি হুগলী কলেজের তদানীন্তন প্রিন্সিপাল; এবং সেদিনকার জন্য সভার বক্তা বাবু মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মহেন্দ্র বাবু মস্তিষ্ক-মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞান বিদ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সেই শাস্ত্র সম্পর্কে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মহেন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ হইয়াও শ্রোতৃবর্গের অতৃপ্তি উৎপাদন করে। ইহার কারণ মহেন্দ্রবাবুর নাস্তিক্যবাদ। তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন কিনা, তাহা এত দিনের পর, বলিতে পারিব না। কিন্তু তিনি প্রবন্ধে ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, ফ্রেনলজী শাস্ত্র মানে না; ফ্রেনলজী শাস্ত্র মানিলে, ঈশ্বর, পরকাল এবং আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে না।

কালীপ্রসন্ন সে সময় আপনাকে বক্তা বলিয়া জানিতেন না। তিনি কোন দিন বক্তৃতা করিবেন, এমন কথা তখন পর্য্যন্ত ঘুণাক্ষরেও তাঁহার কল্পনায় ঠাঁই পায় নাই। কিন্তু তিনি মহেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া, সে সময়ে, কতকটা আত্মবিস্মৃতবৎ। তিনি একটুকু টুকরা কাগজে পেনসিলে লিখিয়া সভাপতিকে জানাইলেন যে, "মহেন্দ্র বাবু ফ্রেনলজি শাস্ত্রের অসঙ্গত ব্যখ্যা করিতেছেন! তাঁহার সমস্ত কথাই বিজ্ঞান বিরুদ্ধ। আমি ইহার প্রতিবাদ করিতে পারি কি?" সভাপতিও মহেন্দ্র বাবুর অনাস্তিক্য মতে নিতান্ত অপ্রীত হইয়াছিলেন। তিনি, এই হেতু কালীপ্রসন্নকে প্রতিবাদের জন্য প্রফুল্লচিত্তে অনুমতি দিলেন, এবং যেই পণ্ডিতবর মহেন্দ্র বাবু উপবিষ্ট হইলেন, কালীপ্রসন্ন অমনি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এ বক্তৃতা ইংরেজীতে হইল। বাঙ্গালা ভাষায় ভাল বক্তৃতা হইতে পারে; এমন কথা কলিকাতার লোক তখন পর্য্যন্ত কল্পনা করিতে পারে নাই। বলা বাহুল্য যে, কালীপ্রসন্নের এই বক্তৃতা তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হইলেও, ভাগ্যবশতঃ একান্ত হৃদয়হারিণী হইল; এবং তাঁহার বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হওয়ার পর সভাপতি ও সভাস্থ অনেক বিজ্ঞলোক তাঁহার কাছে আসিয়া, তাঁহাকে নানা প্রকারে সংবর্দ্ধিত করিলেন। কালীপ্রসন্ন,

এই প্রথম জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার ভাল বক্তৃতা শক্তি আছে; এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই বক্তা হইতে পারেন। তখন কলিকাতায় কালীপ্রসন্নের অনেক বন্ধু বান্ধব ছিলেন। তন্মধ্যে ঢাকার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রীক্ট জজ রায় যোগেশ চন্দ্র মিত্র বাহাদুর এবং বাবু ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি দুই একটি সম্ভ্রান্ত লোক এখন পর্য্যন্তও জীবিত আছেন। ভবানীপুরস্থ বন্ধু বান্ধবগণের অনুরোধে কালীপ্রসন্ন অতি অল্পকাল পরে সেখানে The christianity of christ and the christianity of church অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম ও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম্ম এই দুইয়ের পার্থক্য বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় ঠিক তিন ঘণ্টা সময় লাগিয়াছিল; এবং শ্রোতৃবর্গ ঐ তিন ঘণ্টা কাল, মন্ত্র মুগ্ধবৎ উপবিষ্ট ছিলেন। সভা যে সকল মহামান্য পুরুষের উপস্থিতে অলঙ্কৃত ছিল, তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু দ্বারকানাথ মিত্র Rvd. Dow Rvd. Lall Bihary De এবং রায় যোগেশচন্দ্র মিত্র বাহাদুরের নাম উল্লেখযোগ্য। বক্তৃতার পর আর তর্ক বিতর্ক হইল না। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে একব্যক্তি বক্তার বিশুদ্ধ ইংরেজী, পাণ্ডিত্য ও উদ্দীপনাময়ী ভাষার উল্লেখ করিয়া, ধন্যবাদ দেওয়ার পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ দ্রুতপদে নিকট আসিয়া, কালীপ্রসন্নকে গাঢ় আলিঙ্গন ও ললাটে চুম্বন দানে কৃতার্থ করিলেন। আর Rvd. Dowl রেভারেণ্ড ডলও তাঁহাকে নানারূপ প্রিয় বাক্যে অভিনন্দিত করিয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপদেশ দিলেন। কালীপ্রসন্ন এই সময় হইতে কয়েক বৎসর কাল রীতিমত আপনার গৃহে অধ্যয়ন করিতেন, এবং কোন সভা-সমিতি হইতে আহূত হইলে, তথায় যাইয়া ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় এ সময় তিনি একেবারেই অনুরাগশূন্য। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও রেভারেণ্ড ডল তাঁহাকে এ সময় প্রতি সপ্তাহে নানাবিধ দুর্ল্লভ ইংরেজী গ্রন্থ পড়িতে দিতেন। তিনি ঘরে বসিয়া সেইগুলি পড়িতেন এবং কখনও কিছু লিখিতে ইচ্ছা হইলে, তাহাও ইংরেজীতে লিখিতেন।

ইহার পর এক দিন ডল সাহেবের একটি কথায় তাঁহার জীবনের স্রোতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিল। ডল সাহেব তাঁহাকে বলিলেন "দেখ কালীপ্রসন্ন, ইংরেজী আমাদিগের বস্তু। উহা তোমাদিগের মাতৃভাষা নহে। তোমরা ইংরেজীর জন্য যত কেন পরিশ্রম না কর, উহা কখনও তোমাদিগের নাম-মুদ্রায় মুদ্রিত হইয়া পৃথিবীতে প্রচলিত হইবে না। যদি স্বদেশের জন্য

প্রকৃত কিছু কার্য্য করিতে চাও, তাহা হইলে. আপনার মাতৃভাষার সেবা কর পৃথিবীর যে সকল মহাত্মা মানব জাতিকে হাসাইয়া কিংবা কাঁদাইয়া, জাতীয় জীবন স্রোতে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন।" ডল সাহেবের কথাগুলি কালীপ্রসন্নের অস্থিতে অস্থিতে লিখিত হইল এবং তিনি কিরূপে বাঙ্গলা সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন করিবেন ও বর্ত্তমান কালের শ্লথবিলম্বিত মেয়েলি বাঙ্গালার শক্তি ও উদ্দীপনার একটা তরঙ্গ প্রবাহিত করিবেন,—এই চিন্তাই তাঁহার চিত্তের প্রধান চিন্তা হইল। তিনি ইহার পর, এক দিন, অতি গভীর ভক্তির সহিত সঙ্কল্প ও প্রতিজ্ঞা করিয়া, বাঙ্গালা ভাষার সেবাব্রত গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালায় তৎকালে যে সকল ভাল পুস্তক পাওয়া গেল, তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত পুনঃপুনঃ পড়িলেন এবং সংস্কৃত ব্যকারণে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে বাঙ্গালা ভাষার উপর যথার্থ আধিপত্য হয় না বলিয়া, এবার তিনি পাণিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন। পাণিনি অষ্টাধ্যায়ী, বৃত্তি ও বার্ত্তিকের সহিত বিশাল গ্রন্থ। উহা পড়িতে হইলে মূল গ্রন্থ এবং ভট্টোজী দীক্ষিতের প্রক্রিয়া-বিবৃত্তি সূত্রে সূত্রে মিলাইয়া পড়িতে হয়। তিনি উহার সহিত আবার কলাপ ও মুগ্ধবোধের সূত্র মিলাইয়া পড়িলেন এবং কয়েক বৎসরেই পাণিনি ব্যাকরণে অসাধারণ অধিকার লাভ করিলেন। এখন হইতে বাঙ্গালা তাঁহার চক্ষে আর এক বস্তুর মত হইল। তিনি বাঙ্গালা ভাষার প্রস্রবণ স্থানে পঁহুছিয়া, উহাকে ইচ্ছামত চালনা করিবার শক্তি লাভ করিলেন। এবং তাঁহার সংস্কৃত অধ্যয়ন শেষ হইবার পূর্ব্বেই, তিনি বাঙ্গালায় গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালায় তিনি যে সকল ছোট ছোট পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার একখানিও মুদ্রিত কিম্বা প্রকাশিত হয় নাই। সেগুলি তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতি প্রসন্নময়ী ঘোষজায়ার জন্য রচিত হয় এবং তাঁহার নিকট ন্যস্ত থাকে। কালীপ্রসন্নের বালিকারাও সেই সকল পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গলা শিক্ষায় বিস্তর উপকার পাইয়াছেন। এই পুস্তকগুলির দুই একখানি, এখনও তাঁহার প্রথম রচনার চিহ্নস্বরূপ, রক্ষিত আছে। উঁহার যে সকল পুস্তক, সাধারণের চক্ষে পড়িয়াছে, তাহারমধ্যে "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব"ই সর্ব্ব প্রথম। "নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাবের পূর্ব্বে তিনি "পার্কারের জীবন চরিত ও আমেরিকার সভ্যতা"—এই নামে পাঁচ শত পৃষ্ঠাযুক্ত এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন, দুর্ভাগ্য বশতঃ সেই গ্রন্থ তাঁহার টেবিলের দরাজ হইতে অপহৃত হয়।

উহা কি সূত্রে কাহার হাতে পড়িয়া, কোথায় যাইয়া রহিল, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" তেমন বৃহৎ গ্রন্থ না হইলেও অনতি বৃহৎ উপাদেয় বস্তু। উহা ডিমাই আটপেজী ২৪২ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়া কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। কিরূপ শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্ত্তনে নারী জাতির উন্নতি হইতে পারে, ইহাই ঐ পুস্তকে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। তখনকার "তত্ত্ববোধিনী" ও "হিন্দুপেটরিয়ট" সম্পাদক নিজ নিজ পত্রে ঐ পুস্তকের দীর্ঘ সমালোচনা করেন। 'পেট্রিয়ট' সম্পাদক বড় আদর করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "বাঙ্গালা পদ্যে মধুসূদনের দ্বারা যেরূপ সংস্কার সংঘটিত হইয়াছে, "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাবের" রচয়িতার দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে সেরূপ এক পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সংসাধিত হইবে।" কালীপ্রসন্নের সহিত দীনবন্ধু ও কৃষ্ণদাস পাল, উভয়েরই বেশ সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, এই প্রীতিমূলক সমালোচনা, হয় দীনবন্ধু, না হয় কৃষ্ণদাস লিখিয়াছেন। তিনি তাহার পর বঙ্কিম বাবুর প্রমুখাৎ জানিতে পান যে, ঐ সমালোচনা, বঙ্কিম, দীনবন্ধু ও ডাক্তার ধর্ম্ম দাসের মিলিত লেখা।

নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব যখন প্রকাশিত হয়, তখন কালীপ্রসন্নের বয়স পঁচিশ বৎসর। তিনি ২২ বৎসর বয়সের সময় ঢাকা ছোট আদালতের ক্লার্ক অব দি কোর্ট (clerk of the court) পদে নিযুক্ত হইয়া সেই হইতে ঢাকাতেই অবস্থিত থাকেন। কলিকাতার ছোট আদালতে যাহাকে রেজিষ্ট্রার বলে, মফঃস্বলের ছোট আদালতে তাহারই নাম হইয়াছিল clerk of the court. কোর্ট ক্লার্কেরা তখন আরজি লইত, সমন জারি করাইত ও আপনার হুকুমেই ডিক্রিজারি ও ওয়ারেণ্ট জারি করাইয়া ডিক্রির টাকা আদায় করিত। কালীপ্রসন্ন এই কার্য্যে ১১ বৎসর কাল নিযুক্ত ছিলেন, এবং বিশেষ নিপুণতার সহিত কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন। এই সময় ঢাকায় যে কোন সভাসমিতি হইত, কালীপ্রসন্ন তাহাতে অগ্রনায়করূপে উপস্থিত থাকিয়া, বাঙ্গালায় অথবা প্রয়োজনবশতঃ ইংরেজীতে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; এবং সমাজের একজন প্রধান চালক বলিয়া পরিচিত হওয়ায়, সহরের ছোট বড় সমস্ত সাহেবের নিকটই সমধিক সম্মান পাইতেন।

এই সময়, ঢাকায় প্রতি মাসে, কালীপ্রসন্নের দুই তিনটি বক্তৃতা হইত। সে সকল বক্তৃতা শুনিবার জন্য, দূরস্থিত লোকও সময় সময়, ঢাকায় আসিত।

বক্তৃতার প্রশংসা করা আমার উপযুক্ত হয় না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে যে দিন তাঁহার বক্তৃতা হইত, সে দিন ঢাকায় একটা আনন্দের তুফান বহিত; এবং দুই চারি দিন কাল, সে বক্তৃতার কথা লইয়া, ঢাকার স্থানে স্থানে নানারূপ আলোচনা হইত। বক্তৃতার সময় সভাস্থ সহস্র লোক নিস্তব্ধ উপবিষ্ট রহিত; এবং যেন বক্তার তৎকালীন ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে অভিভূত হইয়া, তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিত। কালীপ্রসন্নই এক প্রকার বাঙ্গালা বক্তৃতার পথপ্রদর্শক। কারণ, বাগ্মিকুলতিলক কেশবচন্দ্র যে কালে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন নাই; কালীপ্রসন্ন সেই সময় সর্ব্বপ্রথম, বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিয়া দেশস্থ সকলকে মোহিত করেন; এবং অত্যুৎকৃষ্ট ইংরেজী বক্তৃতায় ভাষার ক্রীড়া-বৈচিত্র্য ও উদ্দীপনার তরঙ্গ যতদূর উঠিতে পারে, ঐ উভয়ই যে বাঙ্গালা বক্তৃতায়, তাহা হইতেও অনেক বেশী উপরে উঠিতে পারে, ইহা প্রথম স্বশক্তিতে অনুভব করিয়া, এবং কার্য্যে ফলাইয়া বাঙ্গালা ভাষার উৎকর্ষ বর্দ্ধন ও শক্তি বিস্তারে উপাসকের মত অনুরাগী হন। বাঙ্গালা সম্বন্ধে তাঁহার এই তদ্গদ ভক্তি ও উপাসনার ভাব এখন আরও যেন শতগুণ বাড়িয়াছে। এ বিষয় পরে বলিব।

কালীপ্রসন্ন যখন ছোট আদালতের কার্য্যে নিযুক্ত, তখন তাঁহার ঐ কার্য্য একটা উপলক্ষ মাত্র ছিল। তিনি প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পর হইতে রাত্রি ১১টা কিংবা ১২টা পর্য্যন্ত নিরন্তর সংস্কৃত ও ইংরেজী অধ্যয়ন করিতেন; শরীর যখন ভাল থাকিত, তখন শেষ রাত্রে শয্যা ত্যাগ করিয়া ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত, টোলের ছাত্রের মত, ব্যাকরণের সূত্রবৃত্তি ও টীকা টিপ্পনী কণ্ঠস্থ করিতেন এবং একটুকু অবসর পাইলেই আপনার মনঃকল্পিত অসংখ্য বিষয় মধ্যে কোন না কোন কথা অবলম্বন করিয়া, প্রবন্ধ লিখিতেন। তাঁহার জীবনের এই সময়টা বড়ই সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে যে সকল প্রসিদ্ধনামা সাহিত্যসেবী কার্য্য উপলক্ষে ঢাকায় আসিতেন, তাঁহারা এখানে পৌঁছিয়াই কালীপ্রসন্নকে খুঁজিয়া লইতেন; এবং কালীপ্রসন্নও তাঁহার প্রাণটা যেন তাঁহাদিগের হাতে তুলিয়া দিয়া, সৌহার্দ্দের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেন। এখানে এই ভাবে, যাঁহাদিগের সহিত কালীপ্রসন্নের বিশেষ বান্ধবতা হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে, ভূতপূর্ব্ব তত্ত্ববোধিনী-সম্পাদক পণ্ডিতবর অযোধ্যানাথ পাকরাশী ও রামায়ণের অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিখ্যাতনামা নটকবি বাবু দীনবন্ধু মিত্র ও বাবু অমৃতলাল বসু, সাধারণী সম্পাদক সুপ্রথিত লেখক বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার এবং তদীয়

পিত। ঢাকার খ্যাতনামা সবজজ মহাত্মা গঙ্গাচরণ সরকার মহাশয় প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একদিন ঢাকার তদানীন্তন থিয়েটার হলে, সন্ধ্যার পর, "প্রীতি ও রাজনীতির পৃথক্‌গতি" এই বিষয়ে কালীপ্রসন্নের বক্তৃতা হইতেছে; বক্তৃতাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ, বাহিরেও তিলার্দ্ধ স্থান শূন্য নাই; এই সময়ে ঢাকার সর্ব্বজনপ্রিয় আসিষ্টাণ্ট কমিশনর রায় অভয়চন্দ্র দাস বাহাদুর এবং আরও দুই একটি ভদ্র-লোকের সঙ্গে একটি সদানন্দমূর্ত্তি তেজস্বী পুরুষ বক্তৃতা গৃহে প্রবেশ করিয়া প্লাটফর্ম্মের পুরোভাগে বিশিষ্ট আসনে উপবেশ করিলেন; এবং যতক্ষণ বক্তৃতা হইল, ততক্ষণ তিনি বক্তার মুখ পানে স্তিমিত নয়নে তাকাইয়া রহিলেন। যখন বক্তৃতা পরিসমাপ্ত হইল, তখন বাবু অভয়চন্দ্রের প্রযত্নে বাগ্মিবর কালীপ্রসন্নের সহিত আগন্তুকের পরিচয় হইল। আগন্তুকের নাম দীনবন্ধু মিত্র। উভয়ে উভয়ের গুণাতিশয্যে আকৃষ্ট হইয়া, কিছুক্ষণ গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ রহিলেন। উদারহৃদয় দীনবন্ধু স্বভাবতই নিতান্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি অন্যের প্রশংসা করিবার সুযোগ পাইলে বড় সুখী হইতেন। তিনি অনেকের কাছেই বলিলেন যে, বাঙ্গালা ভাষায় এতশক্তি আছে, এবং বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বক্তৃতার মত এমন আশ্চর্য্য বক্তৃতা হইতে পারে, ইহা তিনি কখনও কল্পনা করেন নাই। তিনি পর দিন, সন্ধ্যার পর কালীপ্রসন্নের বাসায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং বলিলেন,—"ভাই আমি এখানে পোষ্টাল বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে আসিয়াছি, কত দিন থাকিব—ঠিক বলিতে পারি না। আমার এই অনুরোধ, যে কয়দিন এখানে থাকি, সে কয়দিন, সন্ধ্যার পর, দুজনে যেন একসঙ্গে অবস্থিত রহিতে পারি। কালীপ্রসন্ন দীনবন্ধুর সৌহার্দ্দ লাভে কৃতার্থবৎ হইলেন। তাঁহার বোধ হইল, তিনি যেন সাহারার মরুভূমিতে অকস্মাৎ একটি অমৃত-নির্ঝর লাভ করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর প্রতি দিনই দুইজনে একস্থানে মিলিতেন; এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গে আলাপ করিয়া, রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত একত্র থাকিতেন। দীনবন্ধু বাবুর প্রায় রাত্রিতেই এখানে সেখানে নিমন্ত্রণ হইত। কালী প্রসন্নও সেই নিমন্ত্রণের ভাগী হইতেন। বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার যখন ঢাকায় থাকিতেন, তখনও তিনি আর কালীপ্রসন্ন প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যার পর, প্রায়শঃ একত্র অবস্থান করিয়া, পরস্পর পরস্পরের সাহিত্যানুরাগে উৎসাহের উদ্দীপনা ঢালিয়া দিতেন।

যে সময়, কালীপ্রসন্নের নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব বাহির হয়, তাহার অল্প কিছু পূর্ব্বে, কিংবা পরে, সঙ্গীত মঞ্জরী ও সমাজশোধনী নামে আর দুই খানি পুস্তক বাহির হয়। সঙ্গীত মঞ্জরী পরমার্থতত্ত্ববিষয়ক গীতিকবিতা। উহার অনেক গীত এখনও পূর্ব্ব বঙ্গের অনেকের কণ্ঠস্থ আছে; এবং এখানে, সেখানে স্বর-সংযোগে শ্রদ্ধার সহিত গীত শ্রুত হইয়া থাকে। ঘোষ মহাশয়ের আরও বহু গীতি-কবিতা রচিত ও প্রচারিত আছে। যাহা মুদ্রিত হয় নাই, তাহার সংখ্যা দুই তিন শত হইবে; এগুলি কালে মুদ্রিত হইবে বলিয়া আশা করি। কালী-প্রসন্ন ঢাকা ছোট আদালতে সম্পৃক্ত থাকা সময়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত বঙ্গদর্শন বাঙ্গালা সাহিত্য জগতে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন প্রকাশের বৎসরেক পরে, কালীপ্রসন্ন বান্ধব নামক সাহিত্য পত্র প্রকাশ করিয়া, বঙ্গীয় সাহিত্য সেবীদিগকে এক নূতন আনন্দ প্রদান করেন। বান্ধবের প্রথম সংখ্যা যখন প্রকাশিত হইল, তখন সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই, নানারূপ প্রিয় কথার দ্বারা হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করিলেন। অনেকে পত্র লিখিয়া কালীপ্রসন্নকে উৎসাহিত ও সংবর্দ্ধিত করিলেন। পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত বাঙ্গালা লেখকদিগের প্রতিনিধিরূপে, তদানীন্তন 'সোমপ্রকাশে' বান্ধবের, সুদীর্ঘ সমালোচনা করিলেন। এবং কালীপ্রসন্নের ভাষার নানারূপ প্রশংসা করিয়া, এই এক বিশেষ কথা লিখিলেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যেমন হৃদয়হারিণী, কালীপ্রসন্নের প্রবন্ধমালাও তেমন হৃদয়হারিণী। কোন একটি প্রবন্ধ পড়িতে আরম্ভ করিলে, তাহার শেষ না করিয়া ত্যাগ করা যায় না।" মধ্যস্থ সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু কালীপ্রসন্নের লেখার প্রতি অত্যধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন; এবং এক বিস্তৃত প্রবন্ধে বান্ধবের সমালোচনা করিয়া পরিশেষে লিখিলেন যে, "বাঙ্গালায় এমন লেখা ইতঃপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হয় নাই; ভারত সংস্কারক সম্পাদক বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত কালীপ্রসন্নের লেখনভঙ্গী ও চিন্তাশীলতায় মোহিত হইয়া নির্ভয়ে লিখিলেন যে, "কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইমারসন্।" উমেশ বাবুর এই কথা সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইল; এবং সে সময়ের আরও অনেক পত্রিকায় কালীপ্রসন্নের লেখার প্রতি ঐরূপ গভীর প্রীতি ও ভক্তি প্রদর্শিত হইল। ঐ সময়ে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সাধারণী এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন সাহিত্য সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। কালীপ্রসন্ন এই দুইয়ের মত জানিতে না পারিয়া, প্রথমতঃ এইরূপ শঙ্কা করিয়াছিলেন, বুঝি

তাঁহার বাঙ্গালা বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রীতিকর হয় নাই। কিন্তু উদারহৃদয় অক্ষয়চন্দ্র যেরূপ উচ্ছ্বসিতহৃদয়ে বান্ধবের ভাব ও ভাষার প্রশংসা করিলেন, তাহাতে কালীপ্রসন্নের সে শঙ্কা একেবারে দূর হইল। তারপর যখন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়া, বঙ্গদর্শনে মুক্তকণ্ঠে বান্ধবের প্রশংসা করিলেন, আর সম্পাদক সম্বন্ধে লিখিলেন যে, ''ইহাঁর ভাষা সুন্দর, চিন্তাশক্তি অসামান্য" তখন বঙ্গদেশের সকল স্থানে বান্ধবসম্পর্কে একটা আনন্দ-ধ্বনি উঠিল। এবং কালীপ্রসন্ন বান্ধবের প্রতিষ্ঠা ও গৌরব রক্ষার্থ প্রতি মাসে এক একটি আশ্চর্য্য ও অভিনব প্রবন্ধের দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের চিত্ত রঞ্জনে নিরত রহিলেন। বান্ধবপ্রকাশের সময় যাঁহারা কালীপ্রসন্নের প্রতি প্রীতি ও সৌহার্দ্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কালীপ্রসন্ন অদ্যাপি অতি গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া থাকেন, এবং কিরূপে তাঁহাদিগের সম্পর্কে আপনার হৃদয়ের প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবেন, তাহা ভাবিয়া অধীর রহেন।

বান্ধবের যে সকল প্রবন্ধ বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল, তাহা হইতে বান্ধব-প্রকাশের কয়েক বৎসর পরই "নীরব কবি' প্রভৃতি কয়েকটি পরস্পরসংবদ্ধ নূতন প্রবন্ধের সঙ্কলনে "প্রভাত চিন্তা" নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত হইল; এবং উহা তদানীন্তন সাহিত্যসমাজে যতদূর সম্ভব সম্মান ও আদর পাইল। তখন বর্ত্তমান সময়ের মত পাঠ্য পুস্তক নির্ব্বাচনের কমিটি ছিল না। বিভাগীয় ইনস্পেক্টরই পাঠ্য নির্ব্বাচন করিতেন। প্রভাত চিন্তা পূর্ব্ববঙ্গীয় চক্রে ছাত্র-বৃত্তি ক্লাসে পাঠ্য হইল, এবং উহার যশোধ্বনিতে সাহিত্যসেবী মাত্রেরই উৎসাহ বাড়িল।

ঘোষ মহাশয়ের সাহিত্যিক ও সাংসারিক জীবনে এ সময়ে এক বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ঘোষ মহাশয় তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতার প্রভাবে ও বিদ্যাবত্তার গৌরবে ঢাকার সাহেবদিগের নিকট বড় সম্মানিত ছিলেন। তখন এ দেশে কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্স হয় নাই; সাহেবেরা এ দেশের প্রায় সমস্ত সভাসমিতিতেই বাঙ্গালীর সহিত মিশিতেন; কোন কোন সভায় নামতঃ পৃষ্ঠভূমিতে থাকিয়া, সভার সমস্ত কার্য্য কর্ত্তৃত্বের সহিত চালাইতেন। ঐরূপ সভা সমিতিতে ঘোষ মহাশয়ই তাঁহাদিগের অগ্রণীরূপে কার্য্য করিতেন; এবং সভায় বক্তৃতা ও সভাসংক্রান্ত অন্যান্য কার্য্য সম্পাদনের দ্বারা বাঙ্গালীর

সহিত সাহেবদিগের সৌহার্দ্দ বন্ধনে যত্নপর হইতেন। এই সকল কারণে দেশের একজন উচ্চশ্রেণীস্থ সমাজচালকের ন্যায়, সাহেবদিগের নিকট তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। লেফটেনেণ্ট গভর্ণর ঢাকায় উপস্থিত হইলে সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা যেমন (private interview) প্রাইভেট সাক্ষাৎকারের দ্বারা আপ্যায়িত হইতেন, ঘোষ মহাশয়ও সেইরূপ আপ্যায়ন লাভ করিতেন। তখনকার chlef secreary ডেম্পিয়ার সাহেব ঘোষ মহাশয়কে ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ঢাকা ছাড়িলেই বান্ধব ছাড়িতে হয়, এবং বান্ধব ছাড়িলেই তাঁহার সাহিত্য-ব্যবসা লোপ পায়। তিনি এই হেতু ঐ ডিপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার পর নবাব সার আবদুল গনি সাহেব বাহাদুর কে, সি, এস, আই এবং নবাব সার আসানউল্লা সাহেব বাহাদুর কে, সি, আই, ই ঘোষ মহাশয়কে বিশেষ আগ্রহ করিয়া, প্রথমতঃ বরিশালের প্রধান এজেণ্ট, তৎপর আটিয়ার ম্যানেজারের পদ দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু এইরূপ কোন বৃহৎ বৈষয়িক পদ গ্রহণ করিলে, এবং পদ উপলক্ষে ঢাকা ছাড়িলে, সাহিত্য-ব্যবসায়ে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে হইবে, এই শঙ্কায় ঘোষ মহাশয় এবারও বৃহৎ, লোভ সংবরণ করিয়া বান্ধব লইয়া ঢাকায় অবস্থান করাই সঙ্কল্প করিলেন।

অদৃষ্টের গতি ঘোষ মহাশয়কে তথাপি বিষয় সংসারে টানিয়া লইল। ঢাকা জেলায় সে সময়ে, ব্রাহ্মণ ভূম্যধিকারী রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন ; এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র (তদানীং) কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ও উদারতা, সৌজন্য, সদ্গুণগ্রাহিতা ও বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি বিবিধ স্পৃহণীয় গুণে ঢাকার ভদ্রসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। কুমার রাজেন্দ্র প্রথম দর্শনাবধি ঘোষ মহাশয়কে অগ্রজের ন্যায় সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতেন, এবং সুযোগ পাইলেই তাঁহার বাসায় যাইয়া ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ে নানারূপ শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। তদীয় পিতা রাজা কালী নারায়ণ রায় বাহাদুরও ঘোষ মহাশয়কে নিতান্ত শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিতেন। সাংসারিক নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ লইতেন ; এবং সময়ে সময়ে, আদর করিয়া বলিতেন,— "আমি আপনাকে রাজেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জ্ঞানে ভাল বাসিয়া থাকি।" ১২৮৩ সনে, ফাল্গুন মাসে, শিবরাত্রির পর্ব্বাবসর উপলক্ষে, রাজা কালীনারায়ণ ও তদীয় পুত্র কুমার রাজেন্দ্র, ঘোষ মহাশয়কে বিশেষ আদরের সহিত আমন্ত্রণ করিয়া জয়দেব-

পুরে নেওয়াইলেন; এবং ক্রমে দুই দিন তাঁহার সহিত সাংসারিক বহু বিষয়ে আলাপ করিয়া তাঁহাকে ভাওয়ালের চিপ ম্যানেজারের পদ গ্রহণের অনুরোধ করিলেন। রাজা কালীনারায়ণ নির্ব্বন্ধাতিশয়ের সহিত বলিলেন,—"আপনি সাহিত্য সেবার অনুরোধে ঢাকা ছাড়িয়া দূরে যাইতে চাহেন নাই; এবং এ জন্যই নবাব সাহেবদিগের কার্য্য গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমার কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলে আপনার সাহিত্য সেবার বিঘ্ন হইবে না, অথচ আমার বৃহৎ উপকার হইবে। আপনি আপনার কর্ত্তব্য বোধ অনুসারে, যখন ইচ্ছা তখন ঢাকায় যাইতে পারিবেন, এবং জয়দেবপুর থাকিয়া ঢাকাস্থ প্রেসের তত্ত্বাবধান করিতে সুযোগ পাইবেন। পরন্তু আপনি এখানে কোন অধীনতার ক্লেশ পাই-বেন না। আমি এক্ষণে কর্ম্মে অপটু, তাই আমি আপনার হাতে সমস্ত সঁপিয়া দিতে ইচ্ছা করি। আপনি আমার প্রতিনিধিরূপে শ্রীমান্ রাজেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিবেন। এইভাবে আপনি যাহা করিবেন, তাহাই আমার কার্য্যরূপে পরিগণিত হইবে।

ঘোষ মহাশয় শিশুকাল হইতেই একান্ত স্নেহপ্রবণ। তাঁহাকে প্রীতি-স্নেহের ভাষায় আমন্ত্রণ করিয়া কোন কথা কহিলে, তিনি আপনার সুখ-শান্তি ত্যাগ করিয়াও সে কথা রক্ষা করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। এখানেও তাহাই হইল। তিনি বৃদ্ধ রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরের বিশেষ ইচ্ছায় এবং কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের স্নেহময় আগ্রহে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে তিন বৎসরের বিদায় লইয়া ভাওয়াল ইষ্টেটের শাসন ও সংরক্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন; এবং ইষ্টেটের মঙ্গলার্থ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণপণ করিয়া কার্য্য করিতে লাগিলেন। সূক্ষ্মদর্শী ঘোষ মহাশয়ের পরিপাটী তত্ত্বাবধানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যবস্থায় জয়দেবপুরের আয় প্রতি বৎসরই নানাদিক্ দিয়া বাড়িতে লাগিল; এবং ঘোষ মহাশয়ের প্রতিপত্তিতে পরগণার সমস্ত স্থানেই আশ্চর্য্য শান্তি সংস্থাপিত হইল। পর-গণার অনেক স্থানে প্রজা বিদ্রোহ ছিল। বিদ্রোহী প্রজারা পুত্রের ন্যায় বশীভূত হইল। ঘোষ মহাশয় যখন প্রথম ভাওয়ালের ভার গ্রহণ করেন, তখন জমিদারী বিভাগের পুরাতন কর্ম্মচারীরা অনেকে বলিয়াছিলেন যে, সাহিত্যসেবীরা জমি-দারীর কি বুঝে, আর কি কার্য্য করিতে পারে? কিন্তু ঘোষমহাশয়ের কার্য্য দর্শনে তাঁহারা অল্প সময় মধ্যে লজ্জায় জড়ীভূত হইলেন,—যাহারা মনে মনে বিষ-বিদ্বেষ পোষণ করিত, তাহারাও বাহিরে বশ্যতা স্বীকার করিল।

ভাওয়ালের কার্য্যে জয়দেবপুরস্থ রাজপরিবারের বিশেষ উন্নতি হইল বটে, কিন্তু ঘোষ মহাশয়ের চিরসেব্য সাহিত্যব্রতের বিশেষ বিঘ্ন ঘটিল। তাঁহার কার্য্য গ্রহণের কএক বৎসর পরেই বান্ধব ধীরে ধীরে বিলয় পাইল। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বঙ্গদর্শন ত্যাগ করেন, তখন তিনি তাঁহার স্বাভাবিক মহত্ত্ব ও উদারতায় লিখিয়াছিলেন যে, "বঙ্গদর্শন যাহা করে নাই, বান্ধব তাহা করিবে।" সেই বান্ধব যখন সাহিত্যিক সেবার অভাবে বিলোপ পায়, তখন ঘোষ মহাশয়ের মনের অবস্থা কিরূপ, তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। তিনি প্রকৃতই তখন শিশুর মত অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; কবে আবার বা বান্ধবকে পুনর্জ্জীবিত করিবেন, এই কথা লইয়া সুহৃদ্‌দিগের সহিত বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন।

বান্ধব লোপ পাইল বটে; কিন্তু ঘোষ মহাশয়ের অধ্যয়ন ও গ্রন্থ রচনার কার্য্য বন্ধ হয় নাই। তিনি রাজার কার্য্যের মধ্যে যখনই অবকাশ পাইতেন, তখনই ইয়ুরোপীয় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য এবং ভারতবর্ষীয় পুরাণ, তন্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের নানারূপ গ্রন্থ, পাঠ করিতেন: এবং যখন সুযোগ পাইতেন, তখনই বান্ধবের পুরাতন প্রবন্ধগুলিকে নূতন করিয়া লিখিয়া, গ্রন্থবদ্ধ করিবার জন্য শ্রম করিতেন। এই পরিশ্রমের ফল "নিভৃত চিন্তা" "ভ্রান্তিবিনোদ",—"প্রমোদলহরী" অথবা বিবাহ-রহস্য" এবং "নিশীথ চিন্তা"। এ সকল গ্রন্থ সাহিত্য সমাজে কিরূপ গৃহীত হইয়াছে. তাহা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

ঘোষ মহাশয়ের ভাওয়াল শাসন সময়ের ২৬ বৎসর কাল মধ্যে, ভাওয়ালস্থ প্রজা ও তালুকদারের মঙ্গলার্থ যে সকল সদনুষ্ঠান হইয়াছে, এখানে তাহার দীর্ঘ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার স্থান নাই। ভাওয়ালের প্রজারা তাঁহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে পিতৃতুল্য জ্ঞানে ভালবাসিত ও ভক্তি করিত; এবং অতি-বড় দুঃখের সময়, তাঁহার কাছে আসিতে পারিলেই প্রাণে শান্তি পাইত। তিনি যখন বঙ্গ-দেশীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত হন, তখন ভাওয়ালের তালুকদার ও প্রজারা সর্ব্বসাধারণ প্রজামণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে, জয়দেবপুরে এক বিরাট সভা আমন্ত্রণ করেন। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় স্বয়ং সে সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিকটবর্ত্তী ভূম্যধিকারীর মধ্যে অনেকে সে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সেই সভা হইতে ঘোষ মহাশয়কে

একখানি সম্মানসূচক অভিনন্দনপত্র ও একটি বহুমূল্য সোণার ঘড়ি উপহার দেওয়া হয়। অভিনন্দন পত্রখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর

মহিমবরেষু।

মহাত্মন্!

গুণগ্রাহী ও সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বহুবিধ উচ্চ গুণের পুরস্কারস্বরূপ মহাশয়কে প্রভূত-সম্মান-পরিচায়ক "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। এই রাজ-প্রদত্ত সম্মান ও গৌরবে আমরা ভাওয়াল-নিবাসী তালুকদার ও ভদ্রমণ্ডলী আমাদিগের নিজকেই নিরতিশয় সংবর্দ্ধিত ও গৌরবান্বিত জ্ঞান করিতেছি। আমাদিগের এই আনন্দের সময়ে আমরা একবারে নীরব ও নির্লিপ্ত থাকিতে পারিতেছি না। আমরাও এ সময়ে আমাদিগের চিরসঞ্চিত প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয়স্বরূপ এই ক্ষুদ্র অভিনন্দন-পত্র সহ মহাশয়কে একটি সুবর্ণ ঘটিকা উপহার প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতি সামান্য বস্তুও অমায়িক প্রীতি ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সহিত প্রদত্ত হইলে অসামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আমরা এই সাহসে সাহসী হইয়া অদ্যকার এই আনন্দের দিনে এই ক্ষুদ্র উপহার লইয়া মহাশয়ের সম্মুখে উপস্থিত। ভরসা করি, মহাশয় আমাদিগের এই প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপহার প্রীতির সহিত গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে চিরবাধিত করিবেন।

আজি মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত সময়ে ভাওয়ালের অতীত একবিংশতি বৎসরের কথা এবং ভাওয়াল নিবাসী বহু সহস্র লোকের সুখ দুঃখ ও সমুন্নতির নানাবিধ বৃত্তান্ত আমাদিগের স্মৃতির নিকটস্থ হইতেছে।

ভাওয়ালের প্রাতঃস্মরণীয় ও পুণ্যশ্লোক অধিপতি স্বর্গীয় রাজা কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর যখন আশ্রিতবর্গের উন্নতির জন্য অশেষ প্রকার পরিশ্রমে ক্লান্ত ও বার্দ্ধক্যের সন্নিহিত হন, তখন আমাদিগের বর্ত্তমান বহু গুণালঙ্কৃত, বিদ্যোৎসাহী, বিদ্বজ্জনপ্রিয় ও বিখ্যাতনামা ভূপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী বাহাদুর অল্পবয়স্ক বালক। স্বর্গীয় রাজা বাহাদুর যেন ভগবানের ইঙ্গিত ক্রমে তাঁহার সেই বালক পুত্রের সুশিক্ষা ও বিপুল সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য মহাশয়কেই সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত জ্ঞান করেন, এবং তাঁহার কর্ত্তব্যের গুরুভার মহাশয়ের হস্তেই ন্যস্ত করিয়া জীবনের চরম সময়ে রাজকুমার ও মহাশয়ের সম্মিলিত কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কিছু দিন সুখ-শান্তিতে জীবন যাপন করেন।

মহাশয় বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের অতি উচ্চ শ্রেণীস্থ কুলীন এবং বিক্রমপুরের একটি পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত বংশের প্রতিনিধি। পরন্ত, মহাশয় অদ্বিতীয় বাগ্মিতা ও অমৃত-রস-নিষ্যন্দী লেখনীর গুণে ও সুপ্রসিদ্ধ "বান্ধব" পত্রিকার গৌরবে নিয়োগ সময়েই সমস্ত বঙ্গ দেশেই সুপরিচিত ও গৌরবান্বিত ছিলেন। তখন আমরা মনে করিয়াছিলাম, মহাশয় সুগভীর চিন্তাশীল দার্শনিক কবি, স্বভাবতঃ সাহিত্য সুখ-বিলাসী এবং মাতৃ ভাষার সেবায়ই নিরন্তর মগ্ন। সুতরাং বিষয়-কার্য্যে মহাশয়ের অনুরাগ জন্মিবে না এবং ভাওয়ালের ন্যায় একটি সুবিস্তৃত ভূসম্পত্তি শাসন সংরক্ষণে যেরূপ শ্রমশীলতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, আমরা মহাশয়েতে দেখিতে পাইব না। কিন্তু অতি অল্পকাল মধ্যেই লোকে বুঝিতে পারিল যে, মহাশয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী এবং মহাশয় শ্রম, অধ্যবসায়, শাসনী শক্তি ও লোকরঞ্জিনী বৃত্তি প্রভৃতি বহুবিধ উচ্চ ক্ষমতার আদর্শ স্থল। মহাশয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই ভাওয়ালের তালুকদার, ভদ্রমণ্ডলী ও প্রজাবর্গের সুখ ও সম্মান বৃদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হইয়াছেন। মহাশয় স্বভাবতঃ পরদুঃখকাতর এবং পরের সম্মান রক্ষা বিষয়ে যারপরনাই সাবধান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিশালী। এ জন্য মহাশয় তালুকদার ও ভদ্র মণ্ডলীর সম্মান বৃদ্ধি কামনায় ও প্রজাবর্গের কল্যাণার্থ উদার-স্বভাব ও উন্নত-মনা রাজা বাহাদুরের অনুমোদনক্রমে বিবিধ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহাতে আমরা ভাওয়ালবাসী সকলেই সর্ব্বপ্রকারে উপকৃত হইয়া মহাশয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-ঋণে আবদ্ধ আছি। মহাশয়ের অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলে ভাওয়ালের আয় ও অধিকার প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে, বিবাদ বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে এবং যাঁহাদিগের সহিত শত বৎসর যাবৎ বিসম্বাদ চলিতেছিল, তাঁহাদিগের সকলের সহিতই সদ্ভাব, সৌহার্দ্দ ও মৈত্র সংস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বাহাদুরের অর্থ, উৎসাহ ও আন্তরিক অনুরাগে এবং মহাশয়ের প্রীতি প্রবর্ত্তিত যত্ন ও উদ্যোগে জয়দেবপুরে "সাহিত্য সমালোচনী সভা" সংস্থাপিত হয়। মহাশয় প্রথমাবধিই ঐ সভার অধিনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সভার কার্য্য কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

এইক্ষণ শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, মহাশয় সুস্থ শরীরে সুদীর্ঘজীবী হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত উত্তরোত্তর যশস্বী হউন এবং মহাশয়ের বঙ্গদেশ-বিখ্যাত নামের সহিত ভাওয়ালবাসীর এই সুখ-সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকুক।"

ভবদীয় তালুকদারগণ।

ঘোষ মহাশয়ের রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করা সম্পর্কে এখানে দুটি কথা বলা আবশ্যক। যে সময়, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী উৎসব

হয়, তাহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে, ঢাকায় ঘোষ মহাশয়ের প্রতিপত্তি অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। ঢাকার কমিশনার সাহেবেরা তখন সকলেই তাঁহাকে সকল বিষয়ে পরামর্শে ডাকিতেন, এবং যতদূর সম্ভব আদর করিতেন। ডায়মণ্ড জুবিলীর সভায় অসংখ্য জমিদার উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সাহেবদিগের ইঙ্গিত ও সহরের প্রধান ব্যক্তিদিগের পরামর্শ অনুসারে ঘোষ মহাশয়ই সে মহাসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরুদ্ধ ও বাধ্য হন। তিনি সে সভায় সভাপতিরূপে একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; এবং সে বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃতই মোহিত ও চমৎকৃত হইয়াছিল। উহার দুই তিন দিন পূর্ব্বে ঘোষ মহাশয় ঐ জুবিলী উপলক্ষে আর একটি বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তখনকার কমিশনার টয়নবি সাহেব (Mr. Toynbi) বহুলোকের কাছে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন যে, "আমি ইটালিয়ান মিউজিক বড় ভালবাসি; এবং অনেকদিন তাহা শুনিয়াছি। কিন্তু কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় যে একটা অপূর্ব্ব ও অসাধারণঃ মাধুরী আছে, ইটালিয়ান মিউজিকেও তাহা নাই। টয়নবির পূর্ব্ববর্ত্তী কমিশনার যনসন্ সাহেব তাঁহার এই সকল অসামান্য গুণ এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে অত্যুচ্চ প্রসিদ্ধির কথা গবর্ণমেণ্টে জ্ঞাপন করেন। তারপর টয়নবি সাহেব ঐ সকল কথার বিশেষ সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করেন। এই দুইজনের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া, সার আলেক্‌জেণ্ডার, ম্যাকেঞ্জি তাঁহাকে প্রথমে একখানি Certificate of Honour ও তাহার পর রায় বাহাদুর উপাধি প্রদান করেন। তাঁহার এই রায় বাহাদুর উপাধি দান উপলক্ষে ঢাকায় এক বৃহৎ দরবার হইয়াছিল। এখনকার বোর্ডের সিনিয়র মেম্বর অনারেবল হেন্‌রি স্যাবেজ সাহেব সি, এস্ আই, সেই দরবারে লেফটেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুরের প্রতিনিধিরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বক্তৃতায় ঘোষ মহাশয়কে সম্ভাষণ করিয়া বলেন যে, আপনি সুদীর্ঘকাল ও সুকীর্ত্তিত যশের সহিত জাতীয় সাহিত্যের সেবা করিয়া, বঙ্গদেশীয় সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চ আসন লাভ করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট এই হেতু আপনাকে এই উচ্চ উপাধি প্রদানে সম্মান করিতেছেন। এই উপাধি আপনার মত ব্যক্তিতে প্রদত্ত হইয়া অধিকতর সম্মানিত হইল। ভাওয়ালে যে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিরাট সভা হইয়াছিল, তাহাও এই উপাধি লাভের পর। সে সভার সভাপতি ভাওয়ালের চিরস্মরণীয় ভূপতি, ঘোষ মহাশয়কে

কিরূপ সম্মান করিতেন, তাহা রাজা রাজেন্দ্রের নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি পাঠেই অনুভূত হইতে পারে।

"আপনাদিগের বাসস্থান এই ভাওয়াল অদ্য অতিগভীর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, এবং অরণ্য ভূমির ন্যায় আশাশূন্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া থাকিলেও ইহা এক সময়ে বঙ্গদেশের পুরাতন ইতিহাসে একটি সুখ-সমৃদ্ধি-সম্পন্ন ক্ষুদ্র রাজ্য বলিয়া পরিচিত ছিল। ইহার আয়তন প্রায় এক সহস্র বর্গমাইল। ইহা অনেক বিষয়েই বঙ্গদেশে একটি বিচিত্র স্থান। ইহার স্থানে স্থানে মনোহর-বন ভূমি ও মৃগয়ার যুদ্ধক্ষেত্র এবং স্থানে স্থানে নানারূপ শস্য সম্পদের সুষমা চিত্র। যদি কেহ ইতিহাসের চক্ষু লইয়া ইহাতে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীপুর, রাজাবাড়ী এবং মাহনার গহন অরণ্যে কত কি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। যদি কেহ সুপণ্ডিত ক্লার্কের মত উদ্ভিদ্ তত্ত্বের বিবিধ শাখায় বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, ভাওয়ালই তাঁহার বিলাস ক্ষেত্র। যাহারা Ethnologist অর্থাৎ নৃজাতীয় বিদ্যার অনুরাগী, ভাওয়ালই তাঁহাদিগের অধ্যয়নের স্থান। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনারা। কারণ, এই যে আপনারা বহু শত ব্যক্তি এখানে উপবিষ্ট হইয়াছেন, আপনাদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য এবং কেহ কায়স্থ অথবা বৈদ্য এবং আপনাদিগের নিজ নিজ অধিকারে জাতিমালায় বর্ণিত আর্য্য ও অনার্য্য কত জাতীয় লোক বাস করিতেছে তাহা আপনারাও গণনা করিয়া দেখেন নাই। এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের বহু সহস্র লোক আপনাদিগের মুখ-প্রেক্ষী—আপনাদের আশ্রিত। আপনাদিগের মধ্যে একতা থাকিলে সেই একতার নাম, ভাওয়ালের বহু লক্ষ্য লোকের সুখ-শান্তি; আর, অনৈক্য ঘটিলে সেই অনৈক্যের পরিণাম অসুখ, আত্মকলহ, অশান্তি ও আপদ। আজি আপনারা আত্ম-প্রেরণাবশে একত্র মিলিত হইয়া আপনাদিগের ভূস্বামীর প্রতিনিধিকে অভিনন্দন পত্রের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করিতেছেন। ইহাতে শত্রু মিত্র সকলেই বুঝিতে পাইতেছে যে, আপনারা আমার, আর আমি আপনাদিগের; এবং ভাওয়ালের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এক্ষণ একসূত্রায় গ্রথিত এবং ভূস্বামীকে মধ্যগ্রন্থি করিয়া একীভূত এই দৃশ্য অপেক্ষা আমার চক্ষে অধিকতর সুখপ্রীতিকর দৃশ্য আর কি হইতে পারে?

তার পর, গুণের আদর, ক্ষমতার পুরস্কার অথবা প্রতিভার সংবর্দ্ধনা। এই সকল কার্য্য মনুষ্যমাত্রেরই হৃদয়হারি ও মনুষ্যত্বের গৌরব-বর্দ্ধক। কিন্তু আপনারা আজি যাঁহার বিবিধ গুণরাজি, উজ্জ্বল প্রতিভা ও উচ্চ ক্ষমতার সম্মানার্থ এখানে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহার সম্মান-সংবর্দ্ধনায়ই বা কে আমা অপেক্ষা অধিকতর সুখী হইতে পারে? কিন্তু রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের অসামান্য সাহিত্যিক প্রতিভা এবং অনন্যসাধারণ কর্ম্মশক্তি বিষয়ে যদি কিছু বলিবার থাকে, তাহা আপ-

নারাই বলিবেন। কারণ, সে সকল কথা আমার মুখে ভাল শুনাইবেন না। আমি যদি পৃথিবীতে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের কোন কথা শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে তাহা তাঁহার কাছে। ইউক্লিড বলিয়াছেন,—"There is no Royal road to learning."অর্থাৎ বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজপথ নাই। কিন্তু রায় বাহাদুরের প্রখর প্রতিভার আলোকে আমি চিরদিনই সুখ-সেব্য রাজপথে বিচরণ করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছি। তিনি আমাকে ইয়ুরোপ ও ভারতবর্ষের দুর্গম ইতিহাস উপন্যাসের মত মধুর কথায় গাঁথিয়া মুখে মুখে শিখাইয়াছেন। Comte Mill ও Spcncer এর দুর্বোধ জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা দুধের মত তরল করিয়া পান করাইয়াছেন। আজি কি করিয়া আমি তাঁহার সমালোচনা করিব? এবং সাধারণের নিকট তাঁহার শক্তির পরিচয় দিব? কিন্তু যিনি তারা আর ফুলের তুলনা প্রসঙ্গে সুকুমারমতি বিষময় জ্যোতি-র্বিজ্ঞানের সমস্ত সার কথা সহজে বুঝাইতে পারিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা ইহা সম্ভবে কি না, তাহা সুবিজ্ঞ সাহিত্যিকদিগের বিচার সাপেক্ষ। রায় বাহাদুরের সাহিত্যিক যশঃ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আমি যেমন কিছুই বলিতে পারি না, অথবা বলিতে ইচ্ছা করি না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার কার্য্য কর্ম্ম সম্পর্কেও সেই প্রকার আমি কোন কথা বলিতে অধিকারী নহি। কারণ তিনি আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব কর্ত্তৃক ভাওয়ালের শাসন সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্বে তাঁহার প্রতিনিধি রূপে এবং তৎপরে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ এই দ্বাবিংশতি বৎসর কাল যাহা কিছু করিয়াছেন, সমস্ত আমার কার্য্য, এবং সেই সকল কার্য্যের জন্য এক দিকে যেমন আমি ফলভাগী, আর-এক দিকে মনুষ্য সমাজের নিকট সেই প্রকার আমি দায়ী। তবে এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, আমি যখন উনবিংশ বর্ষ বয়সের সময় পিতৃহীন হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিয়াছিলাম এবং চারি দিকে উদ্বেগের সমুদ্রে বেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন রায় বাহাদুরের অতি গভীর স্নেহের নির্ভরে ইহা আমি বুঝিয়াছিলাম যে, [illegible] প্যারে, আমার জন্য তাহা হইবে। জগদীশ্বরের কৃপায় তাহা হইয়াছে।—ভাওয়ালের উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম, চারিদিকেই তখন বিবাদ-বহ্নির ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শুনা যাইত। সে আগুন নিবিয়া গিয়াছে। সে গর্জ্জন একেবারে নীরব ও নিস্তব্ধতার সমুদ্রে ডুবিয়াছে। ভাওয়ালের অভ্যন্তরেও অশেষ অশান্তি ছিল, সে অশান্তিও এক্ষণ শিশুর নিদ্রার ন্যায় সুখশান্তিতে পরিণত হইয়াছে! আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, আমি এ সকল কার্য্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোনটিরই নাম উল্লেখ করিতে পারি না। কারণ, তাহার সমস্ত কার্য্যের সহিতই আমি ওত প্রোত জড়িত। গবর্ণমেণ্ট ঘোষ মহাশয়কে রায় বাহাদুর উপাধি দিয়াছেন। ইহাতে আপনাদিগের যত আনন্দ, আপনারা অবশ্যই মনে করিতে পারেন, আমার তাহা অপেক্ষাও অধিকতর গভীর আনন্দ। উপাধি সকল সময়ে এবং সকলের জন্যই শোভার আভরণ হয় না। কিন্তু আপনাদিগের মত বহুশত মান্য গণ্য

বড় তালুকদার এবং সম্ভ্রান্ত সামাজিক সমবেত হইয়া যাহাকে অভিনন্দনের দ্বারা সংবর্দ্ধিত করে, বোধ হয়, উপাধি তাদৃশ ব্যক্তির জন্য সুযোগ্য আভরণ। ঢাকা বিভাগের কমিশনর রাজ-প্রতিনিধিরূপে রাজ দরবারে উপবিষ্ট হইয়া, উপাধি দান সময়ে রায় বাহাদুরকে যে কয়টি কথা বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, আমি এ স্থলে সেই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিব। আমি নিজে কিছু বলিতে পারি নাই, কিন্তু রাজপুরুষের কথার পুনরুক্তি করিলে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই।

"Rai Bahadur, your, services to the country, as Honorary Magistrate for some years, as a Member of the District Board and as Chairman of the Sudder Local Board ever since the creation of these Boards, have been varied and valuable. But apart from all this, and over and above other considerations, you occupy a very conspicuous position of merited distinction, in the domain of your country's literature, as the most distinguished of living Bengali authors. The title of Rai Bahadur which our Viceroy has been pleased to confer upon you, is a fitting recognition of your place in the esteem of your countrymen, and in giving effect to his Excellency's commands. I congratulate you heartily on your well-earned distinction which I trust will be an honoor to yoo, as long as you continue to honour it".

[illegible]স্থানে থাকা কালে, শুধুই যে প্রজাবর্গ লইয়া ব্যাপৃত ছিলেন, এমন নহে। তিনি সেই কালে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিপোষিত সারস্বত সভা ও সাহিত্য সমালোচনীতে একটা সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারণ করিয়া, দেশের পণ্ডিত সমাজ ও সাহিত্যিকদিগের বিস্তর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। সারস্বত সমাজ উপলক্ষে তখন ঢাকায় প্রতিবৎসরই একটি আশ্চর্য্য সভা হইত। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী ও পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি দেশ দেশান্তরের পণ্ডিতেরা সে সভায় উপস্থিত থাকিতেন। সহরের সাহেব ও মেম সাহেবেরাও আপনাদিগের উপস্থিতির দ্বারা সভাকে অলঙ্কৃত করিতেন; এবং ঘোষ মহাশয় প্রতিবৎসরই সে সভায় সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগিতা, পণ্ডিত সমাজের উন্নতির সহিত দেশের উন্নতি, প্রভৃতি বিষয়ে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করিয়া, সভাস্থ সকলের

হৃদয়কে যেন ক্ষণকালের জন্য কাড়িয়া লইতেন। বক্তৃতা প্রায়ই বাঙ্গালায় হইত, কোন কোন বৎসর সাহেবদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে বাধ্য হইতেন। তিনি সারস্বত সভায় যে শেষ বক্তৃতা করেন, তাহা ইংরেজীতে হইয়াছিল। বক্তৃতার দুই একটি বাক্য অদ্যাপি আমাদিগের চিত্তে জ্বলদক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। এখানে তাহার একটা বাক্য স্মৃতির উপর, নির্ভর করিয়া উদ্ধৃত করিব। সে ভাষা পাইব না। সেই সময়ের সেই দৃষ্টির, বৈদ্যুতিক কণ্ঠস্বরের, মোহিনী এবং শ্রোতৃবর্গের সে তন্ময়তা বর্ণনা দ্বারা বুঝাইতে পারিব না, কিন্তু ঘোষ মহাশয় ইংরেজীতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার ভাব বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিব। বক্তৃতার অবসানে ঘোষ মহাশয় বলিলেন,—

"এ সভাস্থলে অদ্য অনেক রাজপুরুষ এবং রাজকীয় সম্পর্কশূন্য সম্ভ্রান্ত ইয়ুরোপীয় ভদ্রলোক উপস্থিত আছেন। আর অনেক সুশিক্ষিতা সুসভ্য গৌরবান্বিতা বস্ত্রাভরণসমালঙ্কৃতা পাশ্চাত্যসুন্দরী সভার শোভা বাড়াইয়াছেন। তাঁহাদিগের পুরোভাগে আজি ভারতীয় পণ্ডিতসমাজের অবস্থা প্রদর্শন করিয়া কি ফল লাভ করিলাম। পণ্ডিত মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেরই পায়ে পাদুকা নাই, পৃষ্ঠে বস্ত্র নাই, এবং মূর্ত্তিতে অধুনাতন সভ্যতার সামান্য কোন চিহ্ন নাই। তাঁহাদিগের এই বিড়ম্বিত দৃশ্য প্রদর্শন করিয়া,—যে দৃশ্য ইয়ুরোপীয় ললনার চক্ষে নিশ্চয়ই যারপরনাই বিরক্তিজনক, তাহা দেখাইয়া, কার কি স্বার্থ উদ্ধার করিলাম। কিছু ফল না পাইয়াছি,—কিছু স্বার্থ উদ্ধার না করিয়াছি, এমন নহে। তাহা সংক্ষেপে বুঝাইব। এই পৃথিবীর সকল দেশেই বিদ্যাদান আছে, বিদ্যার আদান প্রদান হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে সকল দেশের সহিতই ভারতবর্ষের একটুকু পার্থক্য আছে। বিদ্যাদান অন্যান্য দেশে অতি লাভজনক বণিগ্‌বৃত্তি। ভারতবর্ষে উহা একদিকে অপত্যস্নেহ, আর একদিকে অত্যুপকর গুরুভক্তি অথবা পিতৃভক্তির অতুল সম্পত্তি। গুরু পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এক হস্তে বিদ্যাদান করেন, আর এক হস্তে কড়ায় ক্রান্তিতে গণনা করিয়া সুদে ও আসলে তাহার প্রতিদান গ্রহণ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে ভারতীয় গুরুরা শুধুই বিদ্যাদান করেন, এমন নহে; তাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা যৎসামান্য যাহা কিছু তণ্ডুল সঞ্চয় করেন, তাহারই একার্দ্ধ ছাত্রদিগকে অকাতরে ও অপত্য নির্ব্বিশেষে দান করিয়া, সমগ্র মানব জাতিকে গুরূচিত শিক্ষা দেন। ভারত বর্ষের সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অতীত কালবর্ত্তী অমল-চরিত্র গুরুসম্প্রদায় এখন আর পৃথিবীতে

নাই। তাঁহারা পৃথিবীর সভ্যতাকে নিজ নিজ কর্ম্মশক্তিতে সহস্র হস্ত উপরে তুলিয়া উচ্চতম স্বর্গে স্বস্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ভিক্ষাজীবী পণ্ডিত সম্প্রদায় তাঁহাদিগেরই পুরাতন কীর্ত্তির প্রতিকৃতিরূপে ভারত সমাজে অবস্থিত রহিয়া, ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মনুষ্যদিগকে একটুকু আভাস দান করিতেছেন। ইহাঁরা প্রত্যেকেই বহুবালকের বিদ্যাদাতা এবং পিতার ন্যায় তাহাদিগের অন্নদাতা ও প্রতিপালনকর্ত্তা। যদি এইরূপ নিঃস্বার্থ পরোপকারী এবং সারস্বত ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার্থ ব্রতচারী পুণ্যময় মহাশয় পুরুষদিগের দর্শন লাভে ও হৃদয় altruistic sentiment অর্থাৎ পরার্থা প্রীতির পবিত্রতম উৎকর্ষ হৃদয়ে প্রতিভাত না হয়, তাহা হইলে আর কিছুতেই তাহা প্রতিভাত হইতে পারে না।” সাহেব ও বিবিরা বক্তৃতার এ অংশে মুহুর্ম্মুহু করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঘোষ মহাশয় তাঁহার জীবনে অতিকম হইলেও এই প্রকার সহস্র বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার একটি বক্তৃতাও রক্ষিত ও সাহিত্যে গ্রথিত হয় নাই।

গত বৎসর প্রাবৃট-প্রারম্ভে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার অমৃত-নিষ্যন্দিনী মনোহারিণী বক্তৃতায় কলিকাতা যেন কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বক্তৃতার অক্ষরে অক্ষরে বয়োজ্ঞানবৃদ্ধ কালীপ্রসন্নের বহুদর্শিতার অমিয় রসপ্রবাহ!

ইংরেজের রাজধানী,—রাজসম্পদবিলাসিনী কলিকাতায় বাঙ্গালা বক্তৃত,—এ সাধারণ কথা নহে। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় কেহ বাঙ্গালা বক্তৃতা [illegible] অনেক সময়ে তাঁহাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিত, আর বক্তা উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষিত লোক হইলেও, সাধারণতঃ লোকে মনে মনে তাঁহাকে অবজ্ঞা করিত, উপেক্ষা করিত। অধুনা যিনি বাঙ্গালা দুইটী কথা কহিতে অপ্রস্তুত অথবা অসমর্থ, তিনি সুশিক্ষিত ভদ্রসমাজে নিতান্তই অসার অথবা অশিক্ষিত লোক বলিয়া অনেক সময় উপেক্ষিত হইয়া থাকেন। কলিকাতায় এ বায়ুর পরিবর্ত্তন বঙ্কিম কিম্বা কালীপ্রসন্ন কোন ব্যক্তিরই গুণে নহে,—ইহা কবিশেখর রবীন্দ্রনাথ, সাহিত্য-সেবী-পরায়ণ হীরেন্দ্রনাথ ও নটকবি অমৃতলাল-প্রমুখ সাহিত্য-সেবী এবং সাহিত্য-পরিষৎ, সাহিত্য-সভা, সাহিত্যসম্মিলন, সাবিত্রী লাইব্রেরী প্রভৃতি সভা-সমিতির প্রতিভান্বিত সদস্য প্রভৃতি উন্নত-চেতা সাহিত্যিক দিগের দৃঢ় সংকল্পের ফল, তাঁহাদিগের যত্নে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা

কলিকাতায় প্রচলিত প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে এবং বাঙ্গালা ভাষা উহার অধিকার ও আধিপত্যে ক্রমেই উপরে উঠিতেছে।

পূর্ব্ব বঙ্গের কীর্ত্তিস্তম্ভ কালীপ্রসন্ন সেই প্রথার আশ্রয়ে গত ১৩১০ সালের ৫ই আষাঢ় কলিকাতায় দীনা-হীনা দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষিতা দুর্ব্বলা বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমে তিনটি বক্তৃতা করিয়া, এদেশের শিক্ষিত লোকের হৃদয়ে এই একটা সংস্কার দৃঢ় মুদ্রিত করিয়াছেন যে, ইংরেজী ভাষা কেশব, কালীচরণ ও সুরেন্দ্র প্রভৃতির কণ্ঠে মধুরে ও গম্ভীরে ঝঙ্কারিত হইয়া, যেরূপ উচ্চ গ্রামে পঁহুছিয়াছে,—উচ্চ শক্তি ও উচ্চ সম্পদ প্রদর্শন করিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষাও মাধুরীতে ঠিক তেমনি মধুর, গাম্ভীর্য্যে ঠিক তেমনই গম্ভীর এবং তেজস্বিতা ও উদ্দীপনায় তেমনি অগ্নিময় পদার্থ এবং উহার শক্তি অসামান্য। আমরা কায়স্থসভায় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের প্রথম বক্তৃতা শুনিয়া, বিস্ময়-মুগ্ধ চিত্তে প্রশংসা করিয়াছি। কিন্তু তিনি কলিকাতাস্থ সাহিত্যসম্মিলনের উদ্যোগে ক্লাসিক থিয়েটার হলে যে বক্তৃতা রিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া শুধু আমরা নহি,—এখানকার সকলেই আমরা, বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছি।

সাহিত্য সম্মিলনের আহুত সভায় কাব্য, বাঙ্গালা কাব্য এবং তাহার সঙ্গে বিশেষতঃ হেমচন্দ্রের কাব্য সমালোচনায় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সেই দিন যে ভাবে যে রস-মধুর ভাষায় যাহা বলিলেন এবং বলিতে বলিতে যেন আপনার চিত্তের অজ্ঞাতসারে যে ভাবে উদ্দীপনার উচ্চ গ্রামে উঠিয়া, সভাস্থ শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় আকর্ষণ করিলেন, তাহা দেখিয়া শুনিয়া [illegible]— [illegible] করিয়া আমরা বুঝিলাম যে, এরূপ বাগ্মিতা জাতীয় সাহিত্যের প্রকৃতই একটা বৈভব বটে। কিন্তু ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে বাঙ্গালা বক্তৃতা লিখিবার উপযুক্ত রিপোর্টার নাই।

বক্তা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বাঙ্গালা কবিতা হইতে, ভারতচন্দ্রের সুমার্জ্জিত বাঙ্গালায় পঁহুছা পর্য্যন্ত যে সকল কথা বলিলেন, যে সকল উপমা দ্বারা দুই তিন প্রকারের কবিতার পার্থক্য বুঝাইলেন, তাহা আমাদের নিকট অতি উপাদেয় কাব্য প্রবন্ধের ন্যায় বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু ইহার পর হঠাৎ যখন তিনি কাব্যের উদ্দেশ্য, মানব-জগতে কাব্যের প্রয়োজন এবং কাব্যের বিশেষ উৎকর্ষ বিষয়ে কথা আরম্ভ করিয়া,—"সমবেত মানব জাতিরূপ বিরাট

বিগ্রহের সেবার সহিত কাব্যের অচ্ছিন্ন অভিন্ন সম্বন্ধ" প্রদর্শন করিলেন, যখন বলিতে লাগিলেন যে, মানব সমাজের ধর্ম্ম কর্ম্ম, সমাজ-সংস্কার, সাহিত্য-সংস্কার, নীতি-সংস্কার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই যেমন সেই নিত্য প্রত্যক্ষ বিরাট বিগ্রহের নিত্য আরতি, প্রকৃত কবিতাও সেইরূপ সেই বিগ্রহের স্তুতি-গীতি, তখন অনেকে কান পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন, এবং যেন সেই অপ্রত্যক্ষ বিগ্রহকে সম্মুখ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—এমন জ্ঞানে ক্ষণকালের জন্য সমস্ত ভুলিয়া গেলেন।

ইহার পর, তিনি বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য যার পর নাই করুণ-কণ্ঠে দুই একটি কথা বলিয়া, বৃত্র সংসারের সমালোচনার অবতারণা করিলেন। বক্তা যাহা বলিলেন, তাহার সারাংশ এই, "যদি কবিত্বের প্রতিভা লইয়া তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে, অমর কীর্ত্তি মধুসূদন অবশ্যই হেমচন্দ্র হইতে উচ্চতর পদবী রূঢ়, হেমচন্দ্র শব্দসম্পদে দরিদ্র, সময়ে সময়ে একটু একটু কর্কশ এবং কোন কোন স্থানে রসশূন্য। কিন্তু যদি কাব্যের পারস্পরিক উৎকর্ষ লইয়া বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার—মধুসূদনের মেঘনাদ বধ হইতে তুলনায় অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। বৃত্রসংহার যাহা করিয়াছে, মধুসূদনের শিক্ষা ও সংস্কার দোষে মেঘনাদে তাহা বলে নাই, হেমচন্দ্র বৃত্রসংহার চরিত্রের যেরূপ অপূর্ব্ব পট দেখাইয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার মেঘনাদ বধে তাহা দেখাইতে পারেন নাই।

বক্তা এস্থলে, বাল্মীকির কবিত্ব এবং রামচিত্র রামচরিত্রের জগদ্দুর্লভ অতুলত্ব অতি আশ্চর্য্য ভাষায় এবং যতদূর সম্ভব—বিশদবর্ণনায় সকলকে বুঝাইয়া গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাল্মীকির সে রাম কই। রামের যে মনোহর মূর্ত্তি চিন্তা [illegible] মানব জাতি সতত উদ্দেশে প্রণাম করিতেছে, যাঁহার কথা স্মরণে, কেহ করুণরসের অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, কেহ ভক্তিতে মাথা নোয়াইতেছেন, কেহ বা ভাবের উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইতেছেন, ভারতভূমির সেই প্রাণারাধ্য রাম—আর রামময় জীবিতা জগৎপূজিতা সীতা মেঘনাদ বধের কোনস্থলে পরিলক্ষিতা হইতেছেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে মেঘনাদ বধ ও বৃত্রসংহারের তুলনা করিয়া, বক্তা বলিলেন,—কিবা সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের সুপরিচিত পুরাতন সূত্র, কিবা ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অধুনাতন বিচার ব্যবস্থা,—যে দিকে দৃষ্টি কর, যে দেশের সাহিত্যসমালোচকদিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া মানিয়া লও, বৃত্র সংহার সর্ব্বোতোভাবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মহাকাব্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন

একখানি মহাকাব্য আর কোনও দিন ফুটে নাই। ভবিষ্যতে যে ফুটিবে, এমন বেশী আশা নাই। যে সকল কাব্য ইংরেজী সংস্কৃত ভাষায় মহাকাব্য বলিয়া সম্মানিত, তাহারও সকলখানিতেই বৃত্রসংহারের তুলনা নাই। ধন্য হেমচন্দ্র! সে কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন, আর ধন্য আমরা,—আমরা এ কাব্যের সমালোচনা করিতেছি। কিন্তু যখন মনে করি, যে বিলাসবিলোল বঙ্গদেশে সামান্য একটা পণ্যবিলাসিনীর পায়ের আল্‌তা উপলক্ষেও প্রভূত অর্থ জলের ন্যায় ব্যয়িত হয়, সেই বঙ্গদেশে মহাকবি হেমচন্দ্র, অন্তরে ও বাহিরে ঘণীভূত অন্ধকারে নিপীড়িত হইয়া, অশ্রুজল ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া গিয়াছেন, যে বঙ্গে অতি নগণ্য নরাধমেরাও স্বর্ণশয্যায় বিরাজমান রহিয়া, শুধুই মনুষ্যের রক্ত শোষণে ও প্রাণপীড়নে জীবন যাপন করিতেছে, বঙ্গের উজ্জলতম আভরণ, প্রশান্ত গম্ভীর হেম সেই বঙ্গের এক পার্শ্বে উন্মাদিনী ভার্য্যা আর এক পার্শ্বে অবোধ কয়েকটি বালকের অন্তর্দ্দাহী হাহাকারের মধ্যে দগ্ধহৃদয়ে চক্ষু বুজিয়াছেন, তখন নিরাশার গাঢ় ছায়ায় চারিদিক অন্ধকার দেখি।

সাহিত্য পরিষৎ সভায়

সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে সাহিত্য পরিষদের সম্ভ্রান্ত সভ্যগণের বিশেষ আমন্ত্রণে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর ইউনিভারসিটি ইনিষ্টিটিউট নামক সুরম্য নিকেতনে 'বাঙ্গালা ভাষার ক্রম বিকাশ' নামক আর একটি বক্তৃতা করেন।

এ সভায় সভাপতি ছিলেন—শান্ত শিষ্ট সুধীর মূর্ত্তি সুপণ্ডিত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর। এ সভাতেও বহু সুশিক্ষিত সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইয়াছিল।

বক্তা এই সভায় 'বাঙ্গালা' ভাষার ক্রম বিকাশ' স্তরে স্তরে প্রদর্শন করিয়াছেন। পুরাতন আর্য্যদিগের সেই জগৎপূজ্য সংস্কৃত ভাষা—যে ভাষা ঋষিযুগ পার হইয়া, ভারবি ও ভবভূতি প্রভৃতি মহাকবিদিগের সময়ে সংসারে একটা পার্ব্বত্য পদার্থের ন্যায় প্রতীয়মান হইত, সেই ভাষা ধীরে ধীরে বঙ্গদেশে আসিয়া বাঙ্গালীর কোমল প্রাণে প্রতিহত হইয়া, কেমন করিয়া এলাইয়া পড়িল, কেমন করিয়া সে গাম্ভীর্য্যের পরিবর্ত্তে অতি মধুর তেমন শ্রুতিমনোহর ললিতভাষায় পরিবর্ত্তিত হইল, বক্তা তাহাই প্রথমতঃ তাঁহার আনন্দময়ী স্বর লহরীতে সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। এ সময় তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোক, ভারবির দুই একটি পদ এবং জয়দেবের দুই এক পংক্তি

আবৃত্তি করিলেন। ইহার পর, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সময় অতিক্রম করিয়া, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে আসিয়া পঁহুছিলেন শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেই অতুলনীয় ভক্তি,—এই ভক্তিমিশ্রিত প্রেমের স্রোত সংকীর্ণ বাঙ্গালা ভাষায় প্রবর্ত্তিত হইয়া ভাষার কিরূপ একটী বিপ্লব ঘটাইল, বঙ্গে এক সঙ্গে কিরূপে এক সহস্র ত্রিতন্ত্রী বাজিয়া উঠিল, তাহা বলিয়া বক্তা সভাস্থ সকলকে বড়ই প্রীত করিলেন। এইরূপে বঙ্গের কাব্যযুগ অতিক্রম করিয়া ঘোষজ মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যে ভিক্টোরিয়া যুগের আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বিবেচনায় এযুগের নাম প্রয়াগ-যুগ। বাঙ্গালাভাষা এতকাল ভাগীরথীর বিমল স্রোতে প্রবাহিত হইতেছিল, অকস্মাৎ ইহাতে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবলস্রোত যমুনাপ্রবাহের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। এই হইতে বাঙ্গালাভাষায় আকৃতি ও প্রকৃতি—গতি ও শক্তিতে প্রকৃতই একটী যুগান্তর ঘটিল। যাহা পাঁচশত বৎসরে হয় নাই, বাঙ্গালাভাষা পঞ্চাশ বৎসরে সেই স্ফূর্ত্তি,—সেই শক্তি লাভ করিয়া, সর্ব্বাংশে এক নূতন বস্তুর ন্যায় মনুষ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এই সময় বক্তা সভার নিকট একটি নূতন কথা বলেন। সে কথা এই—"ভাষায় পুষ্টি ও শক্তি সংবর্দ্ধনের তিনটি উপায়,—(১) অনুবাদ (২) অনুকরণ, (৩) উদ্ভাবন। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার তারাশঙ্কর প্রভৃতি শক্তিশালী ব্যক্তিরা, তাঁহার বিবেচনায়, অনুবাদ দ্বারা গদ্য সাহিত্যের প্রাথমিক পুষ্টি সাধন করেন। লোকে মনে করিতে পারে যে, বক্তা,—বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার প্রভৃতির প্রতি একটু ভক্তির অভাব প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের সে অনুবাদ কারুকার্য্যের এবং তৎসম্পর্কিত শক্তির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলেই তখন হৃদয়ের প্রীতিতে পুনঃ পুনঃ করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে অনুবাদ, অনুকরণ ও উদ্ভাবনার যুগ আলোচনা করিয়া বিদ্যাসাগর বঙ্কিম এবং আরও কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থকার সম্বন্ধে প্রধানতঃ যাহা যাহা বক্তব্য, তাহা বলিয়া বক্তা উপসংহারে বলিলেন,—"বাঙ্গালা ভাষা"কে শুধুই মেয়েলি কথায় মধুর করিয়া রাখিলে চলিবে না, যে জগতে ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ভাষা শক্তি সম্পদে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান গ্রাস করিয়া বসিয়াছে, সে জগতে শুধু কথাত্মক লেখার রস-রঙ্গে জাতীয় ভাষার পুষ্টি হইবেনা।

এই সময়ে বক্তা,—বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ, মতি রায়

প্রভৃতি যাত্রাওয়ালার কথা তুলিয়া—হরুঠাকুর প্রভৃতি কবিওয়ালার কথা তুলিয়া —ধরণীধর শ্রীধর ও কৃষ্ণকান্ত প্রভৃতি কথকের কথা তুলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার সূক্ষ্ম সমালোচনে শ্রোতৃবৃন্দকে অতিমাত্র মোহিত করিয়া তুলিলেন। ঘন ঘন করতালি নাদে সভাগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল।

কলিকাতায় কালীপ্রসন্নের সম্মান সম্বর্দ্ধনার অবধি ছিল না। একটী ঘটনায় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি ;—

১৩১০ সালের ১২ই আষাঢ়ের বঙ্গবাসী হইতেই সেই চিত্ত-বিনোদন বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

আজি কলিকাতায় বঙ্গের কার্লাইল বিখ্যাত সাহিত্য মহারথ বিস্ময়াবহ বাগ্মী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের আনন্দপ্রদ সম্মাননা দেখিয়া, হৃদয়ে অতি গভীর আনন্দ লাভ করিলাম। গত সপ্তাহের মঙ্গলবার ২৪ পরগণা টাকার উদারহৃদয় উন্নতমনা সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর আদরে ও ঔৎসুক্যে রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বরাহনগর সান্ধ্য সমিতিতে সুখ-সম্মাননায় সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে, তাঁহারই ব্যয়ে কলিকাতার বহুসংখ্যক সাহিত্যসেবী ও সাহিত্যানুরাগী প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সেই বয়োজ্ঞানবৃদ্ধ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর কে সি এস আই উক্ত সাহিত্য সমিতিতে সভাপতিরূপে উপবিষ্ট ছিলেন। রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর,—রায় যতীন্দ্রনাথের বরাহনগরস্থ রাজভবন সদৃশ রমণীয় ভবনের দ্বারদেশে যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনই সদানন্দমূর্ত্তি সুবিজ্ঞ রায় ডাক্তার চুণীলাল বসু বাহাদুর প্রভৃতি বহু সাহিত্যসেবী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আগমন করিয়া রায় বাহাদুরকে যারপর নাই প্রীতি-অদরে সভামণ্ডপে লইয়া গেলেন। সেখানে সভাপতি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন বহু আদর করিয়া তদীয় দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁহাকে আদরের আসন প্রদান করেন। ইহার কিছুকাল পরেই, রায় যতীন্দ্রনাথ সেই সভা-সমিতির এক প্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের দ্বারা তদীয় অতীত জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে বাঙ্গলা ভাষার কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, ভাব বৈচিত্রময়ী আবেগ-বিহ্বলা লেখায় এবং ওজস্বিনী ও মধুরাক্ষরা বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গলা ভাষার অন্তঃস্রোতে কিরূপ আশ্চর্য্য প্রকার তাড়িত শক্তির সঞ্চার হইয়াছে, সে বিষয়ে সংক্ষেপে একটু সারগর্ভ বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতার পর, একখানি সুললিত শব্দরচিত সংস্কৃত শ্লোকগ্রথিত অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া, তাহা মহারাজ বাহাদুরের হস্তে তুলিয়া দেন। মহারাজ বাহাদুর যখন তাঁহার স্বাভাবিক মধুরতার সহিত সেই অভিনন্দন পত্র-খানি রায় কালীপ্রসন্নকে প্রদান করেন, তখন সভা, সমস্ত সভ্যের সানন্দ করতালিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর, শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র,—কালীপ্রসন্নের সাহিত্যিক কীর্ত্তি সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিলেন এবং তাঁহার প্রভাত চিন্তা, নিশীথ চিন্তা প্রভৃতি

গ্রন্থ বাঙ্গলাভাষায় কিরূপ সম্মান গৌরব-প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি ভাববিহ্বল হইয়া আরও বলিলেন,—“রায় কালীপ্রসন্ন বাঙ্গলার ইমার-সন এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয়ের উচ্চ প্রদেশে তাঁহার চিরস্থায়ী আসন। অতঃপর রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ,—মহারাজ বাহাদুরের অনুমোদন সহকারে সংক্ষেপে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা মধুর হইয়াছিল। ইহার পর সঙ্গীত। যেখানে গায়কের নাম শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ গোস্বামী, যেখানে গীতিসহচর যন্ত্রিকের নাম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী, যেখানে সঙ্গীতবস্তুর নাম জয়দেব ও বিদ্যাপতি—ললিতকান্ত পদাবলী, সেখানে প্রশংসায় সাধারণবাক্যে তাদৃশ গুণসমন্বয়ের গৌরব বর্দ্ধন করা কঠিন। সঙ্গীত অবসানে সর্ব্বজনসম্মানিত মহারাজ বাহাদুর সভায় সকলকে এবং সভায় অভ্যর্থিত অতিথি রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরকে সুপ্রসন্মিলন-সমুচিত সাদর বাক্যে আপ্যায়িত করিয়া, প্রাসাদে প্রস্থিত হন। শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ টাকীর মুন্সী বাড়ীর চিরপ্রথিত প্রথানুসারে প্রীতিভোজের বিরাট আয়োজন করেন, চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় প্রীতি ভোজে সকলেই পরম পরিতোষ লাভ করেন।

এ দিনের আমন্ত্রণ-সভায় এই অভিনন্দন খানি পঠিত হইয়াছিল,—

বঙ্গীয়কায়স্থকুলপ্রদীপ বঙ্গীয়বাগ্‌ভাববিভাসদীপ।
শ্রীরায়বাহাদুররাজসংজ্ঞ কালীপ্রসন্নাখ্যঘোষবংশজ্ঞ॥ ১॥
সুস্বাগতং নন্দয়তীহ লোকং ভবদ্বাক্যমুৎসাহয়তে ন বা কম্।
কবিত্ববাগ্মিত্বসুদীপ্তরত্নং ভব্যেব নিত্যং বসতি প্রযত্নম্॥ ২॥
রাজস্বনৈপুণ্যবদান্যভাবৈঃ ক্ষাত্রং স্বমাদীপয়দার্য্যভাবৈঃ।
যো বান্ধবো বান্ধবনেতৃতাতঃ যো কুত্র ভবান্ধবভাব এতঃ॥ ৩॥
প্রভাতচিন্তাং নিভৃতাদিচিন্তাং প্রণীয় ভক্তেৰ্বিজয়ং কুচিন্তাম্।
.... রত্নস্য শুভপ্রয়াণং মমাত্র মোদাম্বুনিধিপ্রয়াণম্॥ ৪॥
ভাবোত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্গতবচোবিন্যাসচাতুর্য্যত।
স্তিষ্ঠন্তীহ সভাসদোঽপ্যবিবুধাস্তে শালভঞ্জীসমাঃ।
বালং নন্দয়তে রতিং বিনয়তে বৃদ্ধং যুবানং সতীং
মুগ্ধং চেতয়তে শুভং গময়তে যদ্বক্তৃতোর্জস্বিনী॥ ৫॥
সুস্নিগ্ধং ভাবগর্ভং সরলসুমধুরং ভাসিতং যস্য লোকা
উদ্‌গ্রীবং কর্ণরন্ধ্রে সুদমতিতরসা যাবিবিন্তি সন্তাপতপ্তাঃ।
পীযূষাসক্তদেহা ইব চ কতি জনাঃ সন্তবন্তীহ নিত্যং
স শ্রীকালীপ্রসন্নো জয়তি ভুবি চিরং ঘোষবংশাবতংসঃ॥ ৬॥

বস্তুতই বান্ধবের বিজ্ঞ কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্যমন্তক মণি। কিবা ভাবচ্ছটা-মনোহর, কোমল-কান্ত পদ-বহুল, হৃদয়হারী প্রবন্ধাবলীর,

রচনায়,—কিবা মন্দাকিনী-ধারা-গঞ্জিনী পারিজাত-পরিমলপরিবাহিনী সহস্রজন-চিত্তপ্রমাথিনী বক্তৃতায়,—কালীপ্রসন্ন এই বৃদ্ধ বয়সেও অহর্নিশ মাতৃ-সেবায় বিভোর।

কাণাচণ্ডী।

চণ্ডী,—জাতিতে তন্তুবায়। নিবাস,—কালনা। অন্ধ। কণ্ঠস্বর উচ্চ-মধুর। ফরাসডাঙ্গায় ভগিনীর বাড়ী। সেইখানেই তাহার দীর্ঘকাল অবস্থান। ফরাসডাঙ্গায় পথে পথে গান গাহিয়া ভিক্ষা করাই তাহার কার্য্য। চণ্ডী,—কবি। তাহার স্বরচিত গান শুনাইতেছি;—

"চক্ষু বিনে ভাই, যত দুঃখ পাই, বলে কি জানাব, আমি তা জানি।
অন্ধের যত কষ্ট, জানেন ধৃতরাষ্ট্র, আর জানেন বিশিষ্ট অন্ধমুনি॥
দৃষ্টিহীন জন্য নামটী আমার কাণা, নামের এমনি দোষ আদর করে না,
জগৎ পূজ্য কড়ি, সেও যদি হয় কাণা, চলেনা গো—ওগো ইন্দু হলেও কাণা,
অগণ্য তিনি॥
সম্পূর্ণ দুঃখেতে বলে চণ্ডীকাণা, কাণার দুঃখ কিঞ্চিৎ জানে গো রাতকাণা;
ভেবে দেখলাম চিত্তে কাণার দোষ নানা—জগতে গো!
কেবল কাণা পুত্রের আদর করেন জননী॥
কষ্টে সৃষ্টে করি পথে আনা গোনা, বালকেরা বলে কোথায় যাস্ রে কাণা;
স্বহস্তে কেটেছিস্ মহাপাপের খানা, তোর কি মনে নাই রে!
কাণা, খানায় প'ড়ে কেন হারাবি প্রাণী॥
জন্মাবধি আমার মরণ পর্য্যন্ত, হলোনা হবে না এ দুঃখের অন্ত,
জীবনান্তে যদি করেন রাধাকান্ত, করুণা গো—
চণ্ডীর ঐ ভরসা মনে দিবা রজনী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। এখানে আমি অনাবশ্যক বিনয়প্রকাশ করিয়া জায়গা জুড়িব না। কিন্তু গোড়াতে এ কথা বলিতেই হইবে, আত্মজীবনী লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ লোকেরই থাকে, আমার তাহা নাই। না থাকিলেও ক্ষতি নাই, কারণ আমার জীবনের বিস্তারিত বর্ণনায় কাহারো কোন লাভ দেখি না।

সেইজন্য এস্থলে আমার জীবনবৃত্তান্ত হইতে বৃত্তান্তটা বাদ দিলাম। কেবল, কাব্যের মধ্য দিয়া আমার কাছে আজ আমার জীবনটা যেভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট সংক্ষেপে লিখিবার চেষ্টা করিব। ইহাতে যে অহমিকা প্রকাশ পাইবে, সেজন্য আমি পাঠকদের কাছে বিশেষ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমার সুদীর্ঘকালের কবিতালেখার ধারাটাকে পশ্চাৎ ফিরিয়া যখন দেখি, তখন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাই—এ একটা ব্যাপার, যাহার উপরে আমার কোনো 'কর্ত্তৃত্ব ছিল না। যখন লিখিতেছিলাম, তখন মনে করিয়াছি আমিই লিখিতেছি বটে, কিন্তু আজ জানি, কথাটা সত্য নহে। কারণ, সেই খণ্ডকবিতাগুলিতে আমার সমগ্র কাব্যগ্রন্থের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ হয় কি, তাহাও আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। এইরূপে পরিণাম না জানিয়া আমি একটির সহিত একটী কবিতা যোজনা করিয়া আসিয়াছি;—তাহাদের প্রত্যেকের যে ক্ষুদ্র অর্থ কল্পনা করিয়াছিলাম, আজ সমগ্রের সাহায্যে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, সে অর্থ অতিক্রম করিয়া একটী অবিচ্ছিন্ন তাৎপর্য্য তাহাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছিল। তাই দীর্ঘকাল পরে একদিন লিখিয়াছিলাম :—

এ কি কৌতুক নিত্য-নূতন
ওগো কৌতুকময়ি!
আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে
বলিতে দিতেছ কৈ?

অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হ'তে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা ল'য়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কি বলিতে চাই সব ভুলে যাই
তুমি যা' বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই
কোথা ভেসে যাই দূরে!

বিশ্ববিধির একটা নিয়ম এই দেখিতেছি যে, যেটা আসন্ন, যেটা উপস্থিত, তাহাকে সে খর্ব্ব করিতে দেয় না। তাহাকে এ কথা জানিতে দেয় না যে, সে একটা সোপানপরম্পরার অঙ্গ। তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে, সে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত। ফুল যখন ফুটিয়া উঠে, তখন মনে হয়, ফুলই যেন গাছের একমাত্র লক্ষ্য—এমনি তাহার সৌন্দর্য্য—এমনি তাহার সুগন্ধ যে, মনে হয়, যেন সে বনলক্ষ্মীর সাধনার চরমধন—কিন্তু সে যে ফল ফলাইবার উপলক্ষ্যমাত্র, সে কথা গোপনে থাকে—বর্ত্তমানের গৌরবেই সে প্রফুল্ল, ভবিষ্যৎ তাহাকে অভিভূত করিয়া দেয় না। আবার ফলকে দেখিলে মনে হয়, সে-ই যেন সফলতার চূড়ান্ত। কিন্তু ভাবী তরুর জন্য সে যে বীজকে গর্ভের মধ্যে পরিণত করিয়া তুলিতেছে, এ কথা অন্তরালেই থাকিয়া যায়। এমনি করিয়া প্রকৃতি[illegible]ছে চলিয়া—মতা, ফলের মধ্যে ফলের চরমতা রক্ষা করিয়াও তাহাদের অতীত একটী পরিণামকে অলক্ষ্যে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

কাব্যরচনাসম্বন্ধেও সেই বিশ্ববিধানই দেখিতে পাই—অন্তত আমার নিজের মধ্যে তাহা উপলব্ধি করিয়াছি। যখন যেটা লিখিতেছিলাম, তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই যে তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি, এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি,
—তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলি-

তেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য্য প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান। ফুৎকার বাঁশীর একএকটা ছিদ্রের মধ্যে দিয়া এক-একটা সুর জাগাইয়া তুলিতেছে এবং নিজের কর্ত্তৃত্ব উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিতেছে, কিন্তু কে সেই বিচ্ছিন্ন সুরগুলিকে রাগিণীতে বাঁধিয়া তুলিতেছে? ফুঁ সুর জাগাইতেছে বটে, কিন্তু ফুঁ ত বাঁশী বাজাইতেছে না? সেই বাঁশী যে বাজাইতেছে, তাহার কাছে সমস্ত রাগরাগিণী বর্ত্তমান আছে, তাহার অগোচরে কিছুই নাই।

বলিতেছিলাম বসি একধারে
আপনার কথা আপন জনারে,
শুনাতেছিলাম ঘরের দুয়ারে
ঘরের কাহিনী যত;
তুমি সে ভাষারে দহিয়া অনলে,
ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে,
নবীন প্রতিমা নবকৌশলে
গড়িলে মনের মত।

এই শ্লোকটার মানে বোধ করি এই যে, যেটা লিখিতে যাইতেছিলাম সেটা শাদা কথা, সেটা বেশী কিছু নহে—কিন্তু সেই সোজা কথা,—সেই আমার নিজের কথার মধ্যে এমন একটা সুর আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাহা বড় হইয়া ওঠে, ব্যক্তিগত না হইয়া বিশ্বের হইয়া ওঠে। সেই যে সুরটা সেটা ত আমার অভিপ্রায়ের মধ্যে ছিল না? আমার পটে একটা ছবি দাগিয়াছিলাম বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে যে একটা রং ফলিয়া উঠিল, সেই রংও সে রঙের তুলি ত আমার হাতে ছিল না।

নূতন ছন্দ অন্ধের প্রায়
ভরা আনন্দে ছুটে চলে যায়,
নূতন বেদনা বেজে ওঠে তায়
নূতন রাগিণী ভরে;

যে ব্যথা বুঝি না জাগে সেই ব্যথা,
জানি না এনেছি কাহার বারতা
কারে শুনাবার তরে!

আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি যখন আমার একটা ক্ষুদ্র কথা বলিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন কে একজন উৎসাহ দিয়া কহিলেন—"বল বল, তোমার কথাটাই বল! ঐ কথাটার জন্যই সকলে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে?" এই বলিয়া তিনি শ্রোতৃবর্গের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিলেন; স্নিগ্ধ কৌতুকের সঙ্গে একটুখানি হাসিলেন—এবং আমারই কথার ভিতর দিয়া কি-সব নিজের কথা বলিয়া লইলেন?

কে কেমন বোঝে অর্থ তাহার,
কেহ এক বলে, কেহ বলে আর,
আমারে শুধায় বৃথা বারবার,
দেখে' তুমি হাস বুঝি!
কে গো তুমি কোথা রয়েছ গোপনে
আমি মরিতেছি খুঁজি!

শুধু কি কবিতালেখার একজন কর্ত্তা কবিকে অতিক্রম করিয়া তাহার লেখনী চালনা করিয়াছেন? তাহা নহে। সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়াছি যে, জীবনটা যে গঠিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সমস্ত সুখদুঃখ,—তাহার সমস্ত যোগ-বিয়োগের বিচ্ছিন্নতাকে কে একজ[illegible] তাৎপর্য্যের মধ্যে গাঁথিয়া তুলিতেছেন। সকল সময়ে আমি তাঁহার আনুকূল্য করিতেছি কি না জানি না, কিন্তু আমার সমস্ত বাধাবিপত্তিকেও, আমার সমস্ত ভাঙাচোরাকেও তিনি নিয়তই গাঁথিয়া-জুড়িয়া দাঁড় করাইতেছেন। কেবল তাই নয়, আমার স্বার্থ, আমার প্রবৃত্তি, আমার জীবনকে যে অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতেছে, তিনি বারেবারে সে সীমা ছিন্ন করিয়া দিতেছেন—তিনি সুগভীর বেদনার দ্বারা, বিচ্ছেদের দ্বারা বিপুলের সহিত বিরাটের সহিত তাহাকে যুক্ত করিয়া দিতেছেন। সে যখন একদিন হাট করিতে বাহির হইয়াছিল, তখন বিশ্বমানবের মধ্যে সে আপনার সফলতা চায় নাই—সে আপনার ঘরের সুখ,

ঘরের সম্পদের জন্তই কড়ি সংগ্রহ করিয়াছিল। কিন্তু সেই মেঠো পথ, সেই খোরো সুখদুঃখের দিক্‌ হইতে কে তাহাকে জোর করিয়া পাহাড়-পর্ব্বত-অধিত্যকা-উপত্যকার দুর্গমতার মধ্য দিয়া টানিয়া-লইয়া যাইতেছে

এ কি কৌতুক নিত্য-নতন
ও গো কৌতুকময়ি!
যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে
চলিতে দিতেছ কই?
গ্রামের যে পথ ধায় গৃহপানে,
চাষিগণ ফিরে দিবা-অবসানে,
গোঠে ধায় গোরু, বধূ জল আনে
শতবার যাতায়াতে,
একদা প্রথম প্রভাতবেলায়,
সে পথে বাহির হইনু হেলায়,
মনে ছিল, দিন কাজে ও খেলায়
কাটায়ে ফিরিব রাতে;—
পদে পদে তুমি ভুলাইলে দিক্‌,
কোথা যাব আজি নাহি পাই ঠিক,
ক্লান্ত হৃদয়, ভ্রান্ত পথিক
এসেছি নূতন দেশে;
কখনো উদার গিরির শিখরে
কভু বেদনার তমোগহ্বরে
চিনি না যে পথ সে পথের 'পরে
চলেছি পাগলবেশে!

এই যে কবি, যিনি আমার সমস্ত ভালমন্দ, আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছেন, তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি "জীবনদেবতা" নাম দিয়াছি। তিনি যে কেবল আমার এই ইহজীবনের সমস্ত খণ্ডতাকে ঐক্যদান করিয়া, বিশ্বের সহিত

তাহার সামঞ্জস্যস্থাপন করিতেছেন, আমি তাহা মনে করি না—আমি জানি, অনাদিকাল হইতে বিচিত্র বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্ত্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন;—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎস্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে। সেইজন্য এই জগতের তরু-লতা পশুপক্ষীর সঙ্গে এমন একটা পুরাতন ঐক্য অনুভব করিতে পারি—সেইজন্য এত-বড়-রহস্যময় প্রকাণ্ড জগৎকে অনাত্মীয় ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় না।

আজ মনে হয় সকলেরি মাঝে
তোমারেই ভালবেসেছি;
জনতা বাহিয়া চিরদিন ধরে,
শুধু তুমি-আমি এসেছি।
চেয়ে চারিদিক্‌পানে
কি যে জেগে ওঠে প্রাণে!
তোমার-আমার অসীম মিলন
যেন গো সকলখানে!
কতদিন এই আকাশে যাপিনু
সে কথা অনেক ভুলেছি,
তারায় তারায় যে আলো কাঁপিছে—
উছে চলিয়া—
সে আলোকে দোঁহে দুলেছি।
তৃণ-রোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব-আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি' উঠে পুলকে?
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,—
মূক মেদিনীর মর্ম্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।

এই প্রাণে-ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি?

* * *

লক্ষবরষ আগে যে প্রভাত
উঠেছিল এই ভুবনে,
তাহার অরুণ-কিরণ-কণিকা
গাঁথ-নি কি মোর জীবনে?
সে প্রভাতে কোন্‌খানে
জেগেছিনু কেবা জানে?
কি মুরতিমাঝে ফুটালে আমারে
সেদিন লুকায়ে প্রাণে?
হে চির-পুরাণো, চিরকাল মোরে
গড়িছ নূতন করিয়া!
চিরদিন তুমি সাথে ছিলে মোর,
রবে চিরদিন ধরিয়া!

তত্ত্ববিদ্যায় [illegible] কোনো অধিকার নাই। দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদের কোনো তর্ক উঠিলে আমি নিরুত্তর হইয়া থাকিব। আমি কেবল অনুভবের দিক্ দিয়া বলিতেছি, আমার মধ্যে আমার অন্তর্দেবতার একটি প্রকাশের আনন্দ রহিয়াছে—সেই আনন্দ, সেই প্রেম আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আমার বুদ্ধি মন, আমার নিকট প্রত্যক্ষ এই বিশ্বজগৎ, আমার অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ পরিপ্লুত করিয়া আছে। এ লীলাত আমি কিছুই বুঝি না, কিন্তু আমার মধ্যেই নিয়ত এই এক প্রেমের লীলা? আমার চোখে যে আলো ভাল লাগিতেছে, প্রভাত-সন্ধ্যার যে মেঘের ছটা ভাল লাগিতেছে, তৃণতরুলতার যে শ্যামলতা ভাল লাগিতেছে, প্রিয়জনের যে মুখচ্ছবি ভাল লাগিতেছে—সমস্তই সেই প্রেমলীলার উদ্বেল তরঙ্গ-

মালা। তাহাতেই জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের, সমস্ত আলো-অন্ধকারের ছায়া খেলিতেছে।

আমার মধ্যে এই যাহা গড়িয়া উঠিতেছে এবং যিনি গড়িতেছেন, এই উভয়ের মধ্যে যে একটি আনন্দের সম্বন্ধ, যে একটী নিত্য প্রেমের বন্ধন আছে, তাহা জীবনের সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া উপলব্ধি করিলে সুখ দুঃখের মধ্যে একটি শান্তি আসে। যখন বুঝিতে পারি, আমার প্রত্যেক আনন্দের উচ্ছ্বাস তিনি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন,—আমার প্রত্যেক দুঃখবেদনা তিনি নিজে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন জানি যে, কিছুই ব্যর্থ হয় নাই,—সমস্তই একটা জগদ্ব্যাপী সম্পূর্ণতার দিকে ধন্য হইয়া উঠিতেছে।

এইখানে আমার একটি পুরাতন চিঠি হইতে একটা জায়গা উদ্ধৃত করিয়া দিই।—

"ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হ'য়ে উঠ্‌চে, তা অনেকসময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো একটা নির্দ্দিষ্ট মত নয়,—একটা নিগূঢ় চেতনা—একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে আপনার একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,—আমার সুখ, দুঃখ, অন্তর—[illegible] বিশ্বাস আচ[illegible] সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব। শাস্ত্রে যা লেখে, তা সত্য কি মিথ্যা বলতে পারিনে—কিন্তু সে সমস্ত সত্য অনেক-সময় আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী, বস্তুত আমার পক্ষে তার অস্তিত্ব নাই বল্লেই হয়। আমার সমস্ত জীবন দিয়ে যে জিনিষটাকে সম্পূর্ণ আকারে গড়ে' তুলতে পারব, সেই আমার চরমসত্য। জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝ্‌তে পারি নে—প্রত্যেক কথাটা বানান করে' পড়্‌তে হ'লে যেমন সমস্ত পদটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না, কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির

অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায়, তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝ্তে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র-চন্দ্র-সূর্য্য জল্‌তে জল্‌তে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে চিরকাল ধরে' তৈরি হ'য়ে উঠ্‌বে, আমার ভিতরেও তেম্‌নি অনাদিকাল ধরে' একটা সৃজন চল্‌চে; আমার সুখ-দুঃখবাসনা-বেদনা তার মধ্যে আপনার আপনার স্থান গ্রহণ কর্‌চে। এই থেকে কি হ'য়ে উঠ্‌বে জানি নে, কারণ, আমরা একটি ধূলি-কণাকেও জানি নে। কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাইরে অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যোগ করে' দেখি, তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটা বৃহৎ আনন্দসূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখ্‌তে পাই—আমি আছি, আমি হচ্চি, আমি চল্‌চি, এইটেকে একটা বিরাট্ ব্যাপার বলে বুঝতে পারি, আমি আছি এবং আমার সঙ্গে সঙ্গেই আর সমস্তই আছে, আমাকে ছেড়ে এই অসীম জগতের একটি অণুপরমাণুও থাকৃতে পারে না, আমার আত্মীয়দের সঙ্গে আমার যে যোগ, এই সুন্দর শরৎপ্রভাতের সঙ্গে তার চেয়ে কিছুমাত্র কম ঘনিষ্ঠ যোগ নয়—সেইজন্যই এই জ্যোতির্ম্ময় শূন্য আমার অন্তরাত্মাকে তার নিজের মধ্যে এমন করে' পরিব্যাপ্ত করে' নেয়। নইলে সে কি আমার মনকে তিলমাত্র স্পর্শ কর্‌তে পার্‌ত? নইলে তাকে কি আমি সুন্দর বলে' অনুভব কর্‌তেম? * * আমার সঙ্গে ... কথা, ...কালের নিগূঢ় সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্চে বর্ণগন্ধগীত। চতুর্দ্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য-অলক্ষ্য-ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত কর্‌চে—কথা বার্ত্তা দিনরাত্রিই চল্‌চে।"

এই পত্রে আমার অন্তর্নিহিত যে সৃজনশক্তির কথা লিখিয়াছি—যে শক্তি আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখকে, সমস্ত ঘটনাকে ঐক্যদান, তাৎপর্য্যদান করিতেছে, আমার রূপরূপান্তর—জন্মজন্মান্তরকে একসূত্রে গাঁথিতেছে, যাহার মধ্য দিয়া বিশ্বচরাচরের মধ্যে ঐক্য অনুভব করিতেছি, তাহাকেই "জীবনদেবতা" নাম দিয়া লিখিয়াছিলাম :—

ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম ?
দুঃখসুখের লক্ষ ধারায়
পাত্র ভরিয়া দিয়েছি তোমায়,
নিঠুর পীড়নে নিঙাড়ি বক্ষ
দলিতদ্রাক্ষাসম !

কত যে বরণ, কত যে গন্ধ,
কত যে রাগিণী, কত যে ছন্দ,
গাঁথিয়া গাঁথিয়া করেছি বয়ন
বাসর-শয়ন তব,
গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মূরতি নিত্য নব !

আশ্চর্য্য এই যে, আমি হইয়া উঠিতেছি, আমি প্রকাশ পাইতেছি ! আমার মধ্যে কি অনন্ত মাধুর্য্য আছে,—যেজন্য আমি অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অগণ্য সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকার সমস্ত শক্তিদ্বারা লালিত হইয়া, এই আলোকের মধ্যে, আকাশের মধ্যে চোখ মেলিয়া দাঁড়াইতে চলিতে— ত্যাগ করিতেছে না। মনে কেবল এই প্রশ্ন উঠে, আমি আমার এই আশ্চর্য্য অস্তিত্বের অধিকার কেমন করিয়া রক্ষা করিতেছি—আমার উপরে যে প্রেম, যে আনন্দ অশ্রান্ত রহিয়াছে,—যাহা না থাকিলে আমার থাকিবার কোন শক্তিই থাকিত না, আমি তাহাকে কি কিছুই দিতেছি না ?

আপনি বরিয়া লইয়াছ মোরে
না জানি কিসের আশে !
লেগেছে কি ভাল হে জীবননাথ
আমার রজনী আমার প্রভাত,

আমার নর্ম্ম, আমার কর্ম্ম
তোমার বিজনবাসে ?
বরষা-শরতে বসন্তে শীতে
ধ্বনিয়াছে হিয়া যত সঙ্গীতে
শুনেছ কি তাহা একেলা বসিয়া
আপন সিংহাসনে ?
মানসকুসুম তুলি অঞ্চলে
গেঁথেছ কি মালা, পরেছ কি গলে,
আপনার মনে করেছ ভ্রমণ
মম যৌবন বনে ?
কি দেখিছ বঁধু মরম মাঝারে
রাখিয়া নয়ন দুটি ?
করেছ কি ক্ষমা যতেক আমার
স্খলন পতন ত্রুটি ?
পূজাহীন দিন সেবাহীন রাত
কত বারবার ফিরে গেছে নাথ
অর্ঘ্যকুসুম ঝরে পড়ে গেছে
বিজনবিপিনে ফুটি !
যে সুরে বাঁধিলে এ বীণার তার
নামিয়া নামিয়া গেছে বারবার,
কবি, তোমার রচিত রাগিণী
আমি কি গাহিতে পারি ?
তোমার কাননে সেচিবারে গিয়া
ঘুমায়ে পড়েছি ছায়ায় পড়িয়া,
সন্ধ্যাবেলায় নয়ন ভরিয়া
এনেছি অশ্রুবারি !

যদি এমন হয় যে, আমার বর্ত্তমান জীবনের মধ্যে এই জীবনদেবতার সেবার সম্ভাবনা যতদূর ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়া থাকে, যে আগুন

তিনি জ্বালাইয়া রাখিতে চান আমার বর্ত্তমান জীবনের ইন্ধন যদি ছাই হইয়া গিয়া আর তাহা রক্ষা করিতে না পারে, তবে এ আগুন তিনি কি নিবিতে দিবেন? এ অনাবশ্যক ছাই ফেলিয়া দিতে কতক্ষণ? কিন্তু তাই বলিয়া এই জ্যোতিঃশিখা মরিবে কেন? দেখা ত গিয়াছে, ইহা অবহেলার সামগ্রী নহে? অন্তরে অন্তরে ত বুঝা গিয়াছে, ইহার উপরে অনিমেষ আনন্দের দৃষ্টির অবসান নাই।

এখন কি শেষ হয়েছে, প্রাণেশ,
যা-কিছু আছিল মোর?
যত শোভা, যত গান, যত প্রাণ,
জাগরণ, ঘুমঘোর?
শিথিল হয়েছে বাহুবন্ধন,
মদিরাবিহীন মম চুম্বন,
জীবনকুঞ্জে অভিসারনিশা
আজি কি হয়েছে ভোর?
ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আন নবরূপ, আন নবশোভা,
নূতন করিয়া লহ আরবার
চিরপুরাতন মোরে?
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়ে চলিয়া—
নবীন জীবনডোরে!

নিজের জীবনের মধ্যে এই যে আবির্ভাবকে অনুভব করা গেছে—যে আবির্ভাব অতীতের মধ্য হইতে অনাগতের মধ্যে প্রাণের পালের উপরে প্রেমের হাওয়া লাগাইয়া আমাকে কালমহানদীর নূতন নূতন ঘাটে বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই জীবনদেবতার কথা বলিলাম।

এই জীবনযাত্রার অবকাশকালে মাঝে মাঝে শুভমুহূর্ত্তে বিশ্বের দিকে যখন অনিমেষদৃষ্টি মেলিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছি, তখন আর-এক অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। নিজের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির এক অবিচ্ছিন্ন যোগ, এক চিরপুরাতন একাত্মকতা আমাকে একান্তভাবে

আকর্ষণ করিয়াছে। কতদিন নৌকায় বসিয়া সূর্য্যকরোদ্দীপ্ত জলে-স্থলে-আকাশে আমার অন্তরাত্মাকে নিঃশেষে বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছি ; তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি নাই, তখন জলের ধারা আমার অন্তরের মধ্যে আনন্দগানে বহিয়া গেছে ;—তখনি এ কথা বলিতে পারিয়াছি :—

হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুলফল,
জীবসাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা,
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা !

তখনি এ কথা বলিয়াছি :—

আমারে ফিরায়ে লহ, অয়ি বসুন্ধরে,
কোলের সন্তান তব কোলের ভিতরে,
বিপুল অঞ্চলতলে ! ওগো মা মৃণ্ময়ি—
তোমার মৃত্তিকামাঝে ব্যাপ্ত হ'য়ে রই,
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মত ?

এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হই নাই :—

তোমার মৃত্তিকাসনে
আমারে মিলায়ে ল'য়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্তচরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি' ;—আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে-ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্র-ফুল-ফল-গন্ধরেণু !

আমার স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব নাই—বিশ্বের সহিত আমি আমার কোনো বিচ্ছেদ স্বীকার করি না।

মানব-আত্মার দম্ভ আর নাহি মোর
চেয়ে তোর স্নিগ্ধশ্যাম-মাতৃমুখ-পানে ;
ভালবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর!

আশা করি, পাঠকেরা ইহা হইতে এ কথা বুঝিবেন, আমি আত্মাকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে, বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি, কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া কোনো জিনিষকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ, তাহাই আমার কাছে অসীমবিস্ময়াবহ। আমি এই জল-স্থল, তরু-লতা, পশু-পক্ষী, চন্দ্র-সূর্য্য, দিন-রাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য্য! এই জগৎ তাহার অণুতে-পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলিকণায় আশ্চর্য্য! আমাদের পিতামহগণ যে, অগ্নি-বায়ু, সূর্য্য-চন্দ্র, মেঘ-বিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে, সমস্তজীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তবসঙ্গীত ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল—ইহা আমার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সূর্য্যকে যাহারা অগ্নিপিণ্ড বলিয়া উড়াইয়া দিতে চায়, তাহারা যেন জানে যে, অগ্নি কাহাকে বলে! পৃথিবীকে যাহারা "জলরেখা-বলয়িত" মাটির গোলা বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহারা যেন মনে করে যে, জলকে জল বলিলেই সমস্ত জল বোঝা গেল এবং মাটিকে মাটি বলিলেই সে মাটি হইয়া যায়।

প্রকৃতিসম্বন্ধে আমার পুরাতন তিনটি পত্র হইতে তিন জায়গা তুলিয়া দিব।

"এমন সুন্দর দিনরাত্রিগুলি আমার জীবন থেকে প্রতিদিন চলে যাচ্চে—এর সমস্তটা গ্রহণ করিতে পার্‌চি নে! এই সমস্ত রং, এই আলো

এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপী নিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক-ভূলোকের মাঝখানের সমস্ত শূন্য-পরিপূর্ণ-করা শান্তি এবং সৌন্দর্য্য—এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চল্‌ছে! কত-বড় উৎসবের ক্ষেত্রটা! এতবড় আশ্চর্য্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হ'য়ে যাচ্চে, আর আমাদের ভিতরে ভাল করে' তার সাড়াই পাওয়া যায় না! জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি। লক্ষলক্ষযোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে' অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে' একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়, আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না! মনটা যেন আরো শতলক্ষযোজন দূরে! রঙীন্ সকাল এবং রঙীন্ সন্ধ্যাগুলি দিগ্বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক-একটি মাণিকের মত সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্চে, আমাদের মনের মধ্যে একটাও এসে পড়ে না! * * * * যে পৃথিবীতে এসে পড়েছি, এখানকার মানুষগুলি সব অদ্ভুত জীব! এরা কেবলই দিনরাত্রি নিয়ম এবং দেয়াল গাঁথ্‌চে—পাছে দুটো চোখে কিছু দেখ্‌তে পায়, এইজন্যে পর্দ্দা টাঙিয়ে দিচ্চে—বাস্তবিক পৃথিবীর জীবগুলো ভারি অদ্ভুত! এরা যে ফুলের গাছে একএকটি ঘ্যারাটোপ পরিয়ে রাখে নি, চাঁদের নীচে চাঁদোয়া খাটায় নি, সেই আশ্চর্য্য! এই স্বেচ্ছ-অন্ধগুলো বন্ধ পাল্কীর মধ্যে চড়ে পৃথিবীর ভিতর দিয়ে কি দেখে চলে যাচ্চে!"—

"একসময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হ'য়েছিলেম, যখন আমার উপর সবুজঘাস উঠ্‌ত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধ উত্তাপ উত্থিত হ'তে থাক্‌ত, আমি কত দূরদূরান্তর, দেশদেশান্তরের জল-স্থল ব্যাপ্ত করে' উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাক্‌তেম, তখন শরৎসূর্য্যালোকে আমার বৃহৎ সর্ব্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস, যে একটি জীবনী শক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্দ্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ-ভাবে সঞ্চারিত হ'তে থাকৃত—তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত, অঙ্কুরিত মুকুলিত, পুলকিত সূর্য্যসনাথ আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর

প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্চে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌চে, এবং নারিকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্ করে' কাঁপছে।"

"এই পৃথিবীটি আমার অনেকদিনকার এবং অনেকজন্মকার ভালবাসার লোকের মত আমার কাছে চিরকাল নতুন। * * আমি বেশ মনে করতে পারি, বহুযুগ পূর্ব্বে তরুণী পৃথিবী সমুদ্রস্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্য্যকে বন্দনা করচেন,—তখন আমি এই পৃথিবীর নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হ'য়ে, পল্লবিত হ'য়ে উঠেছিলেম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না, বৃহৎ সমুদ্র দিনরাত্রি দুলচে এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে' ফেল্‌চে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্য্যালোক পান করেছিলেম—নবশিশুর মত একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হ'য়ে উঠেছিলেন, এই আমার মাটির মাতাকে আমার মস্তক শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে এর স্তন্যরস পান করেছিলেম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুট্‌ত এবং নবপল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে' বর্ষার মেঘ উঠ্‌ত তখন তার ঘনশ্যামচ্ছটায় আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মত স্পর্শ করত। তার পরেও নবনব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে চলিয়া— [illegible]চি।
দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে। আমার বসুন্ধরা এখন একখানি রৌদ্রপীত হিরণ্য অঞ্চল পরে' ঐ নদীতীরের শস্যক্ষেত্রে বসে আছেন—আমি তাঁর পায়ের কাছে, কোলের কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড়ুচি। অনেক ছেলের মা যেমন অর্দ্ধমনস্ক অথচ নিশ্চল সহিষ্ণুভাবে আপন শিশুদের আনাগোনার প্রতি তেমন দৃক্‌পাত করেন না, তেমনি আমার পৃথিবী এই দুপুরবেলায় ঐ আকাশপ্রান্তের দিকে চেয়ে বহু আদিমকালের কথা ভাব্‌চেন,—আমার দিকে তেমন লক্ষ্য করচেন না, আর আমি কেবল অবিশ্রাম বকেই যাচ্চি।"

প্রকৃতি তাহার রূপ-রস-বর্ণ গন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন, তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে—সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বদ্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাপ্ত করিতেছে। নৌকার গুণ নৌকাকে বাঁধিয়া রাখে নাই, নৌকাকে টানিয়া-টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। জগতের সমস্ত আকর্ষণ-পাশ আমাদিগকে তেমনি অগ্রসর করিতেছে। কেহ বা দ্রুত চলিতেছে বলিয়া সে আপন গতিসম্বন্ধে সচেতন,—কেহ বা মন্দগমনে চলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে, বুঝি-বা সে একজায়গায় বাঁধাই পড়িয়া আছে। কিন্তু সকলকেই চলিতে হইতেছে,—সকলই এই জগৎসংসারের নিরন্তর টানে প্রতিদিনই ন্যূনাধিকপরিমাণে আপনার দিক্ হইতে ব্রহ্মের দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে। আমরা যেমনই মনে করি, আমাদের ভাই, আমাদের প্রিয়, আমাদের পুত্র আমাদিগকে একটি জায়গায় বাঁধিয়া রাখে নাই; যে জিনিষটাকে সন্ধান করিতেছি, দীপালোক কেবলমাত্র সেই জিনিষটাকে প্রকাশ করে, তাহা নহে, সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে;—প্রেম প্রেমের বিষয়কে অতিক্রম করিয়াও ব্যাপ্ত হয়। জগতের সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্য্যের মধ্য দিয়া, ভগবান্‌ই আমাদিগকে টানিতেছেন—আর-কাহারো টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়াই সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই ত আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ, সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন!

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়!
অসংখ্যবন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণ গন্ধময়! প্রদীপের মত

সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমারি মন্দিরমাঝে! ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার!
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তারি মাঝখানে!
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া!

আমি বালকবয়সে "প্রকৃতির প্রতিশোধ" লিখিয়াছিলাম,—তখন আমি নিজে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলাম কি না জানি না,—কিন্তু তাহাতে এই কথা ছিল যে, এই বিশ্বকে গ্রহণ করিয়া, এই সংসারকে বিশ্বাস করিয়া, এই প্রত্যক্ষকে শ্রদ্ধা করিয়া আমরা যথার্থভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করিতে পারি। যে জাহাজে অনন্তকোটি লোক যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া সাঁতারের জোরে সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা সফল হইবার নহে!

"হে বিশ্ব, হে মহাতরি, চলেছ কোথায়?
আমারে তুলিয়া লও তোমার আশ্রয়ে!
একা আমি সাঁতারিয়া পারিব না যেতে!
কোটি কোটি যাত্রী ওই যেতেছে চলিয়া—
আমিও চলিতে চাই উহাদেরি সাথে!
যে পথে তপনশশী আলো ধরে' আছে
সে পথ করিয়া তুচ্ছ, সে আলো ত্যজিয়া,
আপনারি ক্ষুদ্র এই খদ্যোত-আলোকে
কেন অন্ধকারে মরি পথ খুঁজে খুঁজে!

* * * *

পাখী যবে উড়ে যায় আকাশের পানে
মনে করে এনু বুঝি পৃথ্বী ত্যজিয়া;
যত ওড়ে—যত ওড়ে, যত ঊর্দ্ধে যায়,

কিছুতে পৃথিবী তবু পারে না ছাড়িতে—
অবশেষে শ্রান্তদেহে নীড়ে ফিরে আসে !”

পরিণতবয়সে যখন “মালিনী” নাট্য লিখিয়াছিলাম, তখনো এইরূপ দূর হইতে নিকটে, অনির্দ্দিষ্ট হইতে নির্দ্দিষ্টে, কল্পনা হইতে প্রত্যক্ষের মধ্যেই ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিবার কথা বলিয়াছি :—

বুঝিলাম ধর্ম্ম দেয় স্নেহ মাতারূপে,
পুত্ররূপে স্নেহ লয় পুন ;—দাতারূপে
করে দান, দীনরূপে করে তা গ্রহণ,—
শিষ্যরূপে করে ভক্তি, গুরুরূপে করে
আশীর্ব্বাদ ; প্রিয়া হয়ে পাষাণ-অন্তরে
প্রেম-উৎস লয় টানি, অনুরক্ত হয়ে
করে সর্ব্বসমর্পণ। ধর্ম্ম বিশ্বলোকালয়ে
ফেলিয়াছে চিত্তজাল,—শিথিল ভুবন
টানিতেছে প্রেমক্রোড়ে,—সে মহাবন্ধন
ভরেছে অন্তর মোর আনন্দবেদনে !

নিজের সম্বন্ধে আমার যেটুকু বক্তব্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া আসিল, এইবার শেষ কথাটা বলিয়া উপসংহার করিব।—

মর্ত্ত্যবাসীদের তুমি যা দিয়েছ, প্রভু,
মর্ত্ত্যের সকল আশা মিটাইয়া তবু
রিক্ত তাহা নাহি হয়। তার সর্ব্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ।
নদী ধায় নিত্যকাজে ; সর্ব্বকর্ম্ম সারি'
অন্তহীন ধারা তার চরণে তোমারি
নিত্য-জলাঞ্জলিরূপে ঝরে অনিবার।
কুসুম আপন গন্ধে সমস্ত সংসার
সম্পূর্ণ করিয়া তবু সম্পূর্ণ না হয়,—
তোমারি পূজায় তার শেষ পরিচয়।
সংসারে বঞ্চিত করি, তব পূজা নহে ;—

'কবি আপনার গানে যত কথা কহে
নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি',
তোমাপানে ধায় তার শেষ অর্থখানি!

আমার কাব্য ও জীবন সম্বন্ধে মূলকথাটা কতক কবিতা উদ্ধৃত করিয়া, কতক ব্যাখ্যাদ্বারা বোঝাইবার চেষ্টা করা গেল। বোঝাইতে পারিলাম কিনা, জানি না—কারণ, বোঝা'না-কাজটা সম্পূর্ণ আমার নিজের হাতে নাই—যিনি বুঝিবেন, তাঁহার উপরেও অনেকটা নির্ভর করিবে। আশঙ্কা আছে, অনেক পাঠক বলিবেন,—কাব্যও "হেঁয়ালি" রহিয়া গেল, জীবনটাও তথৈবচ। বিশ্বশক্তি যদি আমার কল্পনায়, আমার জীবনে, এমন, বাণীরূপে উচ্চারিত হইয়া থাকেন, যাহা অন্যের পক্ষে দুর্বোধ, তবে আমার কাব্য, আমার জীবন পৃথিবীর কাহারো কোনো কাজে লাগিবে না—সে আমারি ক্ষতি, আমারি ব্যর্থতা। সেজন্য আমাকে গালি দিয়া কোনো লাভ নাই—আমার পক্ষে তাহার সংশোধন অসম্ভব—আমার অন্য কোনো গতি ছিল না।

বিশ্বজগৎ যখন মানবের হৃদয়ের মধ্য দিয়া, জীবনের মধ্য দিয়া মানব-ভাষায় ব্যক্ত হইয়া উঠে, তখন তাহা কেবলমাত্র প্রতিধ্বনি-প্রতিচ্ছায়ার মত দেখা দিলে বিশেষ কিছু লাভ নাই। কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা জগতের যে পরিচয় পাইতেছি, তাহা জগৎপরিচয়ের কেবল সামান্য একাংশমাত্র;—সেই পরিচয়কে আমরা ভাবুকদিগের, কবিদিগের, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদিগের চিত্তের ভিতর দিয়া কালে-কালে, নবতররূপে, গভীরতররূপে সম্পূর্ণ করিয়া লইতেছি। কোন্ গীতিকাব্যরচয়িতার কোন্ কবিতা ভাল, কোন্‌টা মাঝারি, তাহাই খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখানো সমালোচকের কাজ নহে। তাঁহার সমস্ত কাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব কোন্ বাণীরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই বুঝিবার যোগ্য। কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া বীণাপাণি বাণী, বিশ্বজগতের প্রকাশশক্তি, আপনাকে কোন্ আকারে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাই দেখিবার বিষয়।

জগতের মধ্যে যাহা অনির্ব্বচনীয়, তাহা কবির হৃদয়দ্বারে প্রত্যহ বারংবার আঘাত করিয়াছে—সেই অনির্ব্বচনীয় যদি কবির কাব্যে বচন

লাভ করিয়া থাকে ;—জগতের মধ্যে যাহা অপরূপ, তাহা কবির মুখের দিকে প্রত্যহ আসিয়া তাকাইয়াছে, সেই অপরূপ যদি কবির কাব্যে রূপলাভ করিয়া থাকে ; যাহা চোখের সম্মুখে মূর্ত্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা যদি কবির কাব্যে ভাবরূপে আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে ; যাহা অশরীর-ভাবরূপে নিরাশ্রয় হইয়া ফিরে, তাহাই যদি কবির কাব্যে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া সম্পূর্ণতালাভ করিয়া থাকে ;—তবেই কাব্য সফল হইয়াছে এবং সেই সফল কাব্যই কবির প্রকৃত জীবনী। সেই জীবনীর বিষয়ীভূত ব্যক্তিটিকে কাব্যরচয়িতার জীবনের সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ধরিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা।

বাহির হইতে দেখো না এমন করে,
আমায় দেখো না বাহিরে!
আমায় পাবে না আমার দুখে ও সুখে,
আমার বেদনা খুঁজো না আমার বুকে,
আমায় দেখিতে পাবে না আমার মুখে,
কবিরে খুঁজিছ যেথায় সেথা সে নাহি রে!

* * * *

যে আমি স্বপনমূরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বোঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি, এসেছ কাহারে ধরিতে?
মানুষ-আকারে বদ্ধ যেজন ঘরে,
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে,
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে,
কবিরে খুঁজিছ তাহারি জীবনচরিতে?

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে আত্মজীবনী লিখিয়াছেন, উপরে তাহাই অবিকল প্রকাশিত হইল। ইহাঁর জীবন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় এইরূপ :—

১২৬৮ সালের ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র।

অতি অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালাভ হয়। শৈশবকাল হইতেই ইনি রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। বাড়ীর একজন পুরাতন চাকর সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ করিত, আর রবীন্দ্রনাথ তন্ময়চিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেন। চারিপাঁচবৎসর বয়সের সময় তিনি নিজেই পড়িতে পারিতেন।

অতি অল্পবয়সেই রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ যখন নর্ম্মালস্কুলে শিক্ষালাভার্থ প্রবিষ্ট হন, তখন এই স্কুলে সাতকড়ি দত্ত নামে একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনায় উৎসাহদান করিতেন।

ইহার পর, রবীন্দ্রনাথ পিতাঠাকুরের সঙ্গে কিছুকাল বোলপুরে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহার পর, পিতার সহিত ইনি ড্যাল-হাউসি পাহাড়ে গমন করেন। এই সময়ের রবি বাবুর লিখিত বিবরণ এইরূপ,—

"ড্যালহৌসি পাহাড়ে থাকিতে আমার পিতা অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতেন। আমাকে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ অভ্যাস করিবার জন্য রাত্রি চারিটার সময় উঠাইয়া দিতেন।"

এই সময়ে পিতা দেবেন্দ্রনাথ, পুত্র রবীন্দ্রনাথকে আকাশের তারা দেখাইয়া জ্যোতিষবিষয়ে শিক্ষা দিতেন। রবীন্দ্রনাথ প্রক্টরের রচিত সহজপাঠ্য ইংরেজী জ্যোতিষগ্রন্থের সহজ অংশগুলি বাঙ্গলায় অনুবাদ করিতেন। ইহাই তাঁহার বাঙ্গলা গদ্যরচনার সূত্রপাত।

ইহার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ সিবিলিয়ান্ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৎকালীন কর্ম্মস্থান আমেদাবাদে গমন করেন। সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতা। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথের লাইব্রেরীতে বসিয়া রবীন্দ্রনাথ একাগ্রমনে নানারূপ ইংরেজী গ্রন্থ পাঠ করিতেন। এ সময় ইহাঁর বয়স ১৬বৎসর। ভারতী পত্রিকায় এই সময় হইতেই তিনি প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন।

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের বিলাতযাত্রা। লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি

কলেজে তিনি কিছুদিন অধ্যাপক মলির ইংরাজি-সাহিত্য-ক্লাসে যোগ দিয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অবধি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সেবায় নিরত রহিয়াছেন।

হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরী।



১২৭১ সনে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বালুচরে লস্কর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হরিনারায়ণ মজুমদার। মাতার নাম ৺ মাতঙ্গিনী। জাতি,—বৈদ্য।

১২৭৪ সনে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত জামালপুর মহকুমার অধীন সেরপুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বংশসম্ভূত ৺ হরিচরণ লস্কর তালুকদার মহাশয়ের পত্নী ৺ গোবিন্দমণি দেবী হরগোবিন্দ বাবুকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন,—ইহা লস্কর চৌধুরী মহাশয়ই লিখিয়াছেন।

১২৭৬ সনে হরগোবিন্দ বাবুর মাতা গোবিন্দমণির পরলোক ঘটে; সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে যায়। হরগোবিন্দ বাবু ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন।

১২৮২ সনে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত মহকুমা জামালপুরের অধীন কলাবাধা গ্রামনিবাসী ৺ কৃষ্ণকিশোর সেন মহাশয়ের প্রথম কন্যা ৺ কামিনীসুন্দরী দেবীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়।

১২৯০ সনে জামালপুর হাই স্কুল হইতে হরগোবিন্দ বাবু এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১২৯০ সনে ৺ সরোজবন্ধু লস্কর নামে ইহাঁর প্রথম পুত্র ভুমিষ্ঠ হয়।

১২৯১ সনে হরগোবিন্দ বাবুর প্রথমা পত্নী পরলোক গমন করেন। ১২৯৩ সনে সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের হাত হইতে মুক্ত হয়। ১২৯৬ সনে হরগোবিন্দ বাবু পুত্রসহ মুরশিদাবাদ বালুচরে গিয়া কয়েক বৎসর অবস্থিতি করেন।

১২৯৯ সনে হরগোবিন্দ বাবু পুত্রসহ কলিকাতায় আগমন করেন। ১৩০০ সনের ২২শে চৈত্র এই পুত্রের অকাল মৃত্যু ঘটে।

১৩০১ সনের ১লা বৈশাখ হরগোবিন্দ বাবুর দশানন বধ মহাকাব্যের প্রথম খণ্ড "রাবণ বধ" কাব্য নামে প্রকাশিত হয়।

১৩০১ সনের শ্রাবণ মাসে পুত্রশোকার্ত্ত হরগোবিন্দ বাবু সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বারাণসীধামে গমন করেন, তথায় যোগ শাস্ত্র ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন; তৎপরে তথা হইতে নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন, চিত্রকূট পর্ব্বতে কিছুকাল সন্ন্যাসিগণের সহবাসে রহেন; সেখান হইতে মাদ্রাজ যান এবং আডিয়ার থিওসফিকেল সোসাইটীতে কর্ণেল অলকটের নিকট কিছু দিন অবস্থান করেন।

১৩০২ সনে হরগোবিন্দ পুনরায় বারাণসী ধামে আগমন করেন, তথায় পুনশ্চ যোগশাস্ত্রের আলোচনা ও বেদান্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি দেখিলেন, যোগশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ তাঁহার পক্ষে অনেকটা অসম্ভব, তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, কলিকাতায় কিছু দিন থাকিয়া, ঐ বৎসরেই মুরশিদাবাদ জেলার দেবীপুর গ্রামে গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

১৩০৩ সনে হরগোবিন্দ বাবু সেরপুরে ফিরিয়া যান, সেরপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে স্বীয় সম্পত্তি স্বহস্তে গ্রহণ এবং সেরপুরে তহশীল কাছারী সংস্থাপন করেন।

১৩০৪ সনে সেরপুরনিবাসী ৺ দ্বারকানাথ পত্রনবীশ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী শরৎকামিনী দেবীর সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়।

১৩০৬ সনে শ্রীমতী লাবণ্যলতিকা দেবী নামে ইহাঁর প্রথম কন্যা জন্ম গ্রহণ করে।

১৩০৯ সনে ইনি সেরপুর পরগণার জমিদারীর অংশ ক্রয় করেন, এবং গবরমেণ্ট হইতে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৩১০ সনে হরগোবিন্দ বাবু কলিকাতায় আগমন করেন এবং এই বৎসরই ইহাঁর "দশানন বধ" মহাকাব্য প্রকাশিত হয়।

দশানন বধ মহাকাব্য,—বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন প্রণালীর নূতন গ্রন্থ। তাঁহার ভাষা নূতন, ছন্দ নূতন, সবই নূতন। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত যে প্রণালীতে কবিতা রচিত হইতেছে, আমি সে প্রণালী অবলম্বন না করিয়া, সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ছন্দঃ চালাইতে অনেকেই যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই প্রকৃতরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, আমিও যে কৃতকার্য্য হইয়াছি, এরূপ কথা বলি না, তবে ছন্দগুলি আমি এরূপ ভাবে গ্রথিত করিয়াছি, তাহাতে বালক বৃদ্ধ যুবা যে কেহই হউন, পাঠ করিতে পারিলেই ছন্দসমূহ অনায়াসে অনর্গল নির্গত হইবে, হ্রস্ব দীর্ঘাদি উচ্চারণ করিবার জন্য কোন ক্লেশই করিতে হইবে না। * * * কেবল যে সংস্কৃত ছন্দ শাস্ত্রোক্ত ছন্দই ব্যবহার করিয়াছি, তাহা নহে, আমার স্বরচিত ছন্দও বহু আছে। এই গ্রন্থেবর্ণনা স্থলে অর্থাৎ আমার স্বীয় উক্তিস্থলে গীতিছন্দ ব্যবহার করিয়াছি, এই ছন্দটী প্রসিদ্ধ কবি জয়দেববিরচিত ললিত-লবঙ্গলতা প্রভৃতি গীতের অনুকরণে রচিত হইয়াছে।" গীতিচ্ছন্দে গ্রন্থের আরম্ভ এইরূপ,—

"চমকি বিশ্ব নববীর্য্য-মূর্দ্ধা-নৃপ রজনি রাজ্য-অবসরে,
উদিত উদয়-গিরি-কনক-মঞ্চ 'পরি গঞ্জি মঞ্জু মণিবর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচয় সৈন্য নিচয় সম, বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে।
ভস্মিল হতকর-পতিত-রজনিকর; যোদ্ধনিকর উডুবৃন্দে।
ঝলমল রবিকরপুঞ্জ রঞ্জিভব মঞ্জুল কিরণতরঙ্গে,
ধ্বজকুল সদৃশ সমুজ্জ্বলি সজ্জিত সুরপুর-শৃঙ্গ-বরাঙ্গে।
তরুণদিবস বর পরম অলঙ্কৃত কুসুম মুকুট ধরি শীর্ষে,
রবি-নৃপতি-শ্রী-প্রকৃতি-অতুল-তনু সজ্জিত করিল সহর্ষে।"

গ্রন্থে,—গ্রন্থকারের গুণপনার পরিচয় পত্রে পত্রে পরিস্ফুট। বঙ্গ-সাহিত্যে এ কীর্ত্তি তাঁহার অবিনশ্বর।

দশম পরিচ্ছেদ।

জগদ্বন্ধু ভদ্র।

১২৪৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার জগদ্বন্ধু ভদ্র ঢাকা জেলায় পানকুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভদ্র। জগদ্বন্ধু বাবুর তিনজন জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ কমলাকান্ত, দ্বিতীয় রামকুমার, তৃতীয় নন্দকুমার।

পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমে জগদ্বন্ধু বাবুর হাতেখড়ি হয়, তিনি স্বগ্রামে গুরু-মহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন আরম্ভ করেন।

নবম বর্ষ বয়সে ইনি বটতলার শিশুবোধক, কৃত্তিবাস রামায়ণ, কাশী-দাসের মহাভারত, নলদময়ন্তী, তৎপরে দাশুরায়ের পাঁচালী ইত্যাদি বিস্তর বাঙ্গালা গ্রন্থ পাঠ করেন।

দশম বর্ষ বয়সে ইনি পারস্য-ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং এক বৎসরে সমস্ত পন্দিনামা গোলেস্তার তিন অধ্যায় ও বোঁস্তার এক অধ্যায় শেষ করিয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সহোদরের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জ গমন করেন। কমলাকান্ত ভদ্র পুলীশের দারোগা ছিলেন। জগদ্বন্ধু বাবু এই থানায় অবস্থিতি করিয়া, পারস্যভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। এই সময়ে নারায়ণগঞ্জের মহাজনদিগের যত্নে সেখানে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। জগদ্বন্ধু বাবু উহাতে ইংরেজী অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বর্ষ।

এই একাদশ বর্ষে জগবন্ধু বাবুর বিবাহ হয়। তখন ইঁহার সহ-ধর্ম্মিণী স্বর্ণময়ী চৌধুরাণীর বয়ঃক্রম মাত্র পাঁচ বৎসর ছিল। জগদ্বন্ধু বাবু নারায়ণগঞ্জ স্কুলে তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করেন। কিন্তু সেখানে উঁহার পড়াশুনা বড় ভাল হয় নাই। তখন ইনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে ঢাকা বাঙ্গালা বাজার ব্রাঞ্চস্কুলের চতুর্থশ্রেণীতে যাইয়া ভর্ত্তি হন।

ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল ছিলেন; কিন্তু গণিত ইতিহাসে নিকৃষ্ট ছিলেন। যাহা হউক, তিন মাস অধ্যয়নের পর বার্ষিক পরীক্ষায় তৃতীয় হইয়া ইনি তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হন।

১২৭৭ সনের কার্ত্তিক মাসে ৺রামকৃষ্ণ ভদ্র মহাশয়, ১২৭৮ সনের জ্যেষ্ঠমাসে ৺কমলাকান্ত ভদ্র ও এই বৎসর আশ্বিন মাসে জগদ্বন্ধু বাবুর জননী পরলোক প্রাপ্ত হন। জগদ্বন্ধু বাবুর সহোদরেরা পিতৃশ্রাদ্ধে অপরিমিত ব্যয় করেন; ফলে তাঁহারা প্রায় তিন সহস্র টাকার ঋণগ্রস্ত হন। তৎপরে অল্পকাল মধ্যে জগদ্বন্ধু বাবুর জ্যেষ্ঠ সহোদর ও পরলোক গমন করেন। ঋণ বাড়িয়া যায়। ইহা ১৮৬১ সালের ঘটনা। এই বৎসর জগদ্বন্ধু বাবুর এণ্টেন্স পরীক্ষা দিবার কথা। কিন্তু এই সকল বিপদে ইনি অধ্যয়নে ক্ষান্ত হইয়া চাকরীর জন্য নন্দকুমার ভদ্র মহাশয়ের সহিত নওয়াখালী গমন করেন।

জগদ্বন্ধু বাবুর চাকুরী করা হইল না; আবার তিনি পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি ঢাকা-বাঙ্গালা-বাজার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। জগদ্বন্ধু বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন; পাশ হইলেন। দশ টাকা বৃত্তি পাইলেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এল, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। জগদ্বন্ধু বাবু ১৮৬৫ সনের মধ্যভাগে কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বেলেট সাহেব (তখন তিনি একটীং ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন) তাঁহাকে ত্রিশ টাকা বেতনে যশোহর জেলা-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। তিন চারি মাস পরে জগদ্বন্ধু বাবুর পঞ্চাশ টাকা মাহিনা হয়।

ইনি ১৮৬৫ হইতে ১৮৭৪ অব্দ পর্য্যন্ত প্রথমে তৃতীয় শিক্ষক, পরে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে প্রথম তিন শ্রেণীতে গণিত ও প্রথম শ্রেণীতে ইতিহাস ভূগোল শিক্ষা দিয়াছেন,—গৌরবের বিষয় এই যে, এই কয়েক বৎসরে ইহাঁর একটী ছাত্রও পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হয় নাই। শিক্ষকের পক্ষে ইহা কম সুখ্যাতির কথা নহে, এবং এইরূপ সুখ্যাতির জন্যই ১৮৭৫ খৃঃ সি, বি, ক্লার্ক সাহেবের অনুরোধে ইনি প্রধান শিক্ষকের পদে উন্নীত

ইনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ্চ তারিখে পাবনা জেলা স্কুলের ভার গ্রহণ করেন; এবং ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর উক্ত স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের হস্তে ভার প্রত্যর্পণ করেন।

জগদ্বন্ধু বাবু আবাল্য সাহিত্য-সেবক। একাদশ বর্ষে নারায়ণগঞ্জ স্কুলে অধ্যয়নের সময় তত্রত্য ছাত্র-সভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করিতেন; দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে ব্রজলীলা-বিষয়ে ছয় সাত খণ্ড পাঁচালী রচনা করেন। ইনি নারায়ণগঞ্জ পরিত্যাগ সময়ে এই পাঁচালীগুলি স্বহস্তে দগ্ধ করিয়া ফেলেন। ঢাকা যাইয়া ইনি প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত কবিতা-কুসুমাঞ্জলি নামক মাসিক পত্রিকায় ও ঢাকাপ্রকাশে রীতিমত লিখিতে থাকেন। যতদিন ইনি ঢাকাতে ছিলেন, "ঢাকাপ্রকাশ" সংবাদ-পত্রে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ইহাঁর কিছু-না কিছু রচনা বাহির হইত। এই সময়ে মুরশিদাবাদে প্রচারিত "ভারত-রঞ্জন" পত্রিকায় তুর্কী-রুসীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাঁর অনেকগুলি অতি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এডুকেশন গেজেটেও ইনি সময়ে সময়ে লিখিতেন। পরে বাঙ্গালা "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে, ইনি প্রতি সপ্তাহে তাহাতে দুই তিনটী করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেন। এইপত্রিকায় ইংরেজী জন গিলপিনের অনুকরণে ইহাঁর "হানিফগাজী" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। জগদ্বন্ধু বাবুর বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রধান ব্যঙ্গকাব্য "ছুছুন্দরীবধ কাব্য"ও এই অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ঢাকার প্রসিদ্ধ কবি ৺হরিশ্চন্দ্র মিত্রের "মিত্র প্রকাশ" নামক মাসিক পত্রে জগদ্বন্ধু বাবু গদ্যপদ্যময় বিস্তর প্রবন্ধ লিখিতেন। রায় কালী প্রসন্ন ঘোষ বাহাদুরের প্রসিদ্ধ "বান্ধবে"ও মধ্যে জগদ্বন্ধু বাবুর লিখিত মনোহর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। তন্মধ্যে সীতারাম রায়, পৃথ্বীরায়, আবুলফজল, বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক, হীরক, মৌক্তিক, বাড়বানল, বায়ুমহাসাগর, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি প্রবন্ধ এবং হিন্দুভূগোল নামে প্রত্নতত্ত্ব-ঘটিত প্রবন্ধগুলি প্রসিদ্ধ। অনুসন্ধান পত্রিকায় ইনি নানাবিষয়ক বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

জগদ্বন্ধু বাবু যখন এফ, এ ক্লাসে পড়েন, তখন তদ্বরচিত অমিত্রাক্ষর

ছন্দে 'তপতী-উদ্বাহ' কাব্য প্রচারিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জগবন্ধু বাবুর দ্বিতীয় কাব্য "ভারতের হীনাবস্থা" প্রকাশিত হয়। উহা মিত্রাক্ষরে বিবিধ মিশ্রছন্দে লিখিত। ইনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলীও সুপ্রচার করেন, তৎপূর্ব্বে একখানি নাটক প্রচারিত হয়।

জগবন্ধু বাবুর "ঐতিহাসিক গল্প" স্কুলপাঠ্য সুন্দর গ্রন্থ।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ। ইনি বৈষ্ণব গ্রন্থেরও পুনঃ প্রচারে বিলক্ষণ শ্রদ্ধাবান্। ইঁহার "গৌরপদ তরঙ্গিনী" নামক একখানি গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

দীননাথ মুখোপাধ্যায়

পিতা ৺হীরালাল মুখোপাধ্যায়। আদি বাসস্থান ঢাকা-আমলিগোলায়। পিতামহ ৺রামকানাই মুখোপাধ্যায় ১২২৫ সালে কার্য্যোপলক্ষে হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়ায় আসিয়া বাস করেন। সেই অবধি চুঁচুড়ায় বাস। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশ—বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, ফুলে মেল, বেগ গাঁই, ভরদ্বাজ গোত্র, কুলভঙ্গ। ৺রামকানাই মুখোপাধ্যায় একজন পরম হিন্দু ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র,—(১) হীরালাল—ইনি হুগলী কলেজ হইতে জুনিয়র স্কলারসিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহুদিবস শিক্ষা বিভাগে কর্ম্ম করিয়াছিলেন। খামারগাছি, দ্বারবাসিনী, চকদিঘী, বালুচর প্রভৃতি বিদ্যালয়ের তিনি হেড মাষ্টার ছিলেন ও পরিশেষে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ধনী ও সওদাগর জৈনধর্ম্মাবলম্বী রায় লছমীপৎ সিংহ বাহাদুরের কলিকাতাস্থ কুঠিতে এজেণ্টস্বরূপ কর্ম্ম করিতেন। (২) দ্বারিকানাথ—ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত এল, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া একজন সুবিখ্যাত ডাক্তার হইয়াছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যে চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার এরূপ অসাধারণ জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, অনেকে তাঁহাকে ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। তিনি

প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু মৃত্যুকালে অধিক কিছু রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ৺ বঙ্কিমবাবু হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে ইঁহার সমপাঠী ছিলেন। সেই সময় হইতেই উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। বঙ্কিমবাবু ইঁহার প্রতিভার বড়ই সমাদর করিতেন। সরকারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকার সময় বঙ্কিমবাবু যখনই অবসর মত কাঁঠালপাড়ার বাটীতে আসিতেন, তখনই ভাগীরথী পার হইয়া, দ্বারিকানাথের চুঁচুড়ার বাটীতে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতেন। (৩) ৺ রাজেন্দ্রনাথ—ইনি হুগলীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আফিসের দ্বিতীয় কেরাণী ছিলেন। ৺ হীরালালের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ দীননাথ, মধ্যম অমৃতলাল ও কনিষ্ঠ নিতাইচাঁদ। হীরালাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বালুচর বিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছিলেন, সেই সময় অর্থাৎ ১২৭৭ সালের ৬ই পৌষ (১৮৭০) খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর) মঙ্গলবার বালুচরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দীননাথের জন্ম হয়।

দীননাথ বাল্যকালে হুগলী মডেল বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। তখন হইতেই বাঙ্গালাভাষা শিক্ষায় তাঁহার অনুরাগ ও উদ্যম ছিল। দ্বাদশ বর্ষ হইতেই তিনি বাঙ্গালা ভাষায় কবিতা লিখিতে পারিতেন ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক দ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লইতেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন ও যত্ন সহকারে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়; ফলে তাঁহারা শিক্ষাপক্ষে কিছু গোলযোগ ঘটে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তারিখে ফরাশী চন্দননগর নিবাসী বাখরগঞ্জের তৎকালীন ডেপুটী কালেক্টার বাবু পীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত সতর বৎসর বয়ঃক্রমের সময় দীননাথের বিবাহ হয়।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দীননাথ বাবু হুগলী কলেজ হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। অসচ্ছল সংসারের ভার সেই সময় হইতেই তাঁহার স্কন্ধে পতিত হওয়ায়, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া লেখা-পড়া ছাড়িতে ও অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হয়। পরলোকগত

সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্যামাধব রায় ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের পরামর্শানুসারে ১৩০০ সালের ১২ই আষাঢ় অর্থাৎ ১৮৯৩খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুন তারিখে তিনি পিতৃ-সঞ্চিত অর্থে ও সাধারণের আনুকূল্যে "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পরিচালন আরম্ভ করেন। চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" প্রথম বৎসর হুগলী সাবিত্রী প্রেসে ছাপা হইয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের প্রথমেই দীননাথ স্বয়ং মুদ্রাযন্ত্র ও আবশ্যকমত অক্ষর ও ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম ক্রয় করেন ও পিতার নামানুসারে এই প্রেসের নাম "হীরাযন্ত্র' বা "ডায়মণ্ড প্রেস" রাখেন। হুগলী জেলার অভাব অভিযোগ, প্রয়োজনীয় সংবাদ এবং হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু সমাজ ও রাজনীতি সংক্রান্ত নানাবিষয়ক প্রবন্ধ প্রচার ও আলোচনা করাই এই সংবাদপত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী দীননাথের অদম্য চেষ্টা, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে "চুঁচুড়াবার্ত্তাবহ" এক্ষণে যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছে। হুগলীর ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ মিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার শীল মহাশয় এই সংবাদপত্রে স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের যাবতীয় নিলামী ইস্তাহারের প্রচার আদেশ দিয়া প্রভূত উপকার করিয়াছেন। এই কারণে ইহার প্রয়োজনীয়তাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। দীননাথ "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" প্রকাশের পূর্ব্বে ষ্টেটসম্যান, অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান মিরর এবং অন্যান্য বাঙ্গালা সংবাদপত্র ও মাসিক পত্রিকায় প্রায়ই লিখিতেন। তিনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও বহুজনপরিচিত। সাধ্যমত পরোপকার ও বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।



ইনি ১৮৬০ সালের ১লা আগষ্ট ২৪ পরগণার অন্তর্গত পূর্ব্ববঙ্গ রেল-ওয়ের শ্যামনগর ষ্টেসনের এক ক্রোশ পূর্ব্বে রাহুতা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম ভবসুন্দরী দেবী। হরিমোহনের পিতা মাতা ছয়টী পুত্র সন্তান রাখিয়া অতি অল্প বয়সে ইহ-জগৎ পরিত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ রঙ্গলাল, মধ্যম ত্রৈলোক্যনাথ, তৃতীয় মহেন্দ্রনাথ, চতুর্থ শ্যামলাল, পঞ্চম হরিমোহন, ষষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স দুই বৎসর মাত্র। সেই দুই বৎসরের মাতৃহীন শিশুকে অনেক কষ্টে রক্ষা করা হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চদশবর্ষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র জ্যেষ্ঠ সহোদরদিগকে কাঁদাইয়া মাতৃকোলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শৈশব অবধিই সংবাদপত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতে হরিমোহনের একান্ত আগ্রহ ছিল। ১৮৭৫ সালে তিনি সাধারণীতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সকলে তাঁহার কবিতা আদরের সহিত পাঠ করিত। সাধারণী-সম্পাদক চুঁচুড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় হরি-মোহনের কবিতা পাঠে প্রীত হইয়া, তাঁহাকে বিশেষরূপে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহের সাধারণীতে হরিমোহনের রচিত কবিতা বা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। অক্ষয় বাবুর উৎসাহ হরিমোহন সর্ব্বদা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিয়া থাকেন।

ক্রমে হরিমোহন অপরাপর সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রে কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সম্পাদকগণ তাঁহার রচনা আদরের সহিত গ্রহণ করিতেন। হাবড়া হিতকরী, সোমপ্রকাশ, বান্ধব, নবজীবন, নব-বিভাকর, উপহার, গান ও গল্প প্রভৃতি পত্রে তাঁহার রচিত কবিতা ও প্রবন্ধ নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইত।

১৮৭৮-৭৯ সালে হরিমোহন এলাহাদের কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে সোমপ্রকাশ সম্পাদক দ্বারকা-

নাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পীড়িত হইয়া নিয়মিতরূপে সোমপ্রকাশ চালাইতে অশক্ত হইয়া পড়েন। সোমপ্রকাশ বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। ইতি-পূর্ব্বে বিদ্যাভূষণ মহাশয় একবার তাঁহার ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিব-নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে সোমপ্রকাশের ভার সমর্পণ করেন। শাস্ত্রী-মহাশয় চাঙ্গড়ীপোঁতা হইতে মুদ্রাযন্ত্র ভবানীপুরে উঠাইয়া আনিয়া, অমৃত-বাজার পত্রিকার রীতি অনুসারে কতক ইংরাজী ও কতক বাঙ্গালায় সোমপ্রকাশ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। সোমপ্রকাশের রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। কিছু দিন এইভাবে চলিল। কিন্তু এই নূতন আকারে সোমপ্রকাশের সেরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হইল না। বিদ্যাভূষণ মহাশয় পুনর্ব্বার সম্পাদন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজী অংশ পরিত্যক্ত হইল; সোমপ্রকাশ পুনর্ব্বার পূর্ব্ব মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইতে লাগিল।

কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শরীর ভগ্ন হইয়াছে, পত্রিকা উত্তমরূপে চালান তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। হরিমোহন এলাহাবাদে; কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সোমপ্রকাশের ভার গ্রহণ করিতে বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ বিদ্যা-ভূষণ বালক হরিমোহনকে সোমপ্রকাশের ভার লইতে সাধিতেছেন, ইহা অপেক্ষা হরিমোহনের গৌরবের বিষয় আর কি আছে? তিনি সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া ভবানীপুরে সোমপ্রকাশের ভার গ্রহণ করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয় মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন এই মাত্র, নতুবা কয়েক বৎসর হরিমোহন বিশেষ সম্মান ও তেজের সহিত সোমপ্রকাশ চালাইয়াছিলেন। হিতবাদীসম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই সময়ে লণ্ডন মিশনরী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন। তিনিও মধ্যে মধ্যে সোমপ্রকাশে দুই একটী কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর হরিমোহন বাবু কল্পদ্রুম নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সংশ্লিষ্ট হন। এই মাসিক পত্রিকার আদি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিমোহন বাবুর পক্ষ হইতে যে সব কথা শুনা যায়, সে সবের আলোচনা এখানে

করিলাম না। সেরূপ আলোচনা করিবার প্রয়োজনও নাই। হরিমোহন বাবু শেষে ইহার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন। এই পত্রের উপর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নাম ছিল; ইহা ভূষণ মহাশয়ের নামেই প্রকাশিত হইত।

একবার একটী প্রবন্ধ লইয়া সোমপ্রকাশের বিপদ উপস্থিত মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ হইয়াছে। গবরমেণ্ট বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নি মোচলেখা চাহিলেন; তিনি মোচলেখা দিতে স্বীকার করিলেন না। সোমপ্রকাশ প্রকাশ বন্ধ হইল। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ণ উদ্যমে নববিভাকরপত্র প্রকাশ করিলেন। এক দিকে চন্দ্রের অস্ত, অপর দিকে সূর্য্যের উদয় হইল। কিছু দিন পরে সোমপ্রকাশ পুনর্ব্বার প্রকাশিত হইল।

বড় লাট লর্ড লিটনের আমলে মুদ্রাযন্ত্র আইন পাশ হয়, বলা বাহুল্য, এই সময় সংবাদপত্র মহলে খুব হৈচৈ পড়িয়াছিল; চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠিয়াছিল। ওদিকে সোম-প্রকাশ, নববিভাকরের সহিত মিশিল; এদিকে ইংরেজী বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত সাপ্তাহিক অমৃতবাজার পত্রিকা এক দিনেই আদ্যোপান্ত ইংরাজী হইয়া গেল। লর্ড রিপণের আমলে মুদ্রাযন্ত্র আইন্ উঠিয়া যায়। অতঃপর নববিভাকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, সোম-প্রকাশ যখন পুনঃ প্রকাশিত হয়, তখন আর সোমপ্রকাশের সহিত হরিমোহন বাবুর কোন সম্বন্ধ ছিলনা।

হরিমোহন বাবু মুকুট-উদ্ধার ও অদৃষ্টবিজয় নামে দুইখানি মহাকাব্য, জীবন সঙ্গীত নামে একখানি খণ্ড কাব্য, প্রণয়-প্রতিমা নাটক ও যোগিনী কমলাদেবী ও জীবনতারা নামে তিনখানি উপন্যাস গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সমস্ত গ্রন্থই সংবাদপত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছিল।

ইংরাজী ব্যতীত হরিমোহন বাবুর সংস্কৃত, উর্দ্দূ ও ফরাসীভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে।

হরিমোহন বাবুর তিন পুত্র, ললিতমোহন, ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণ,

কন্যা, সুকুমারী ও ইন্দিরা, এখন জীবিত আছে। পুত্র কন্যায় ছয়টী রা গিয়াছে।

১৮৮২ সালে হরিমোহন ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষিবিভাগে শী কার্য্য প্রাপ্ত হন। এখনো সেই পদে নিযুক্ত আছেন।

কামাখ্যাচরণ গুপ্ত।

কামাখ্যা চরণ হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার ভাঙ্গামোড়া গ্রামে শকাব্দা ১৭৮১ সালের ১৮ই ফাল্গুন বুধবার জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ভাঙ্গামোড়ার শ্রীযুক্ত অম্বিকা চরণ গুপ্তের দ্বিতীয়ানুজ। পিতার নাম ৺ মাধব চন্দ্র গুপ্ত। কামাখ্যা চরণ পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম কালে গ্রাম্য গুরু মহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় গুলি সমাপ্ত করিয়া, মায়াপুর উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বাঙ্গালা বিভাগে নিযুক্ত হয়েন। তথায় বর্ষাধিক কাল অতিবাহিত করিয়া অগ্রজ অম্বিকা চরণ ভাঙ্গামোড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকতা প্রাপ্ত হইলে, তথায় ইংরেজী, বাঙ্গালা উভয় ভাষা শিক্ষা করিতে থাকেন। ইং ১৮৭৫ সালের নবেম্বর মাসে ইনি মাইনর পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সাঁওতাল পরগণার মহেশপুরে উচ্চ, শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এনট্রেন্স পরীক্ষা দিবার জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েন। উক্ত শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা স্বনামধন্য পূজ্যপাদ স্কুল ইন্‌স্পেক্টর ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহাশয় কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। তিনি পরিদর্শন বহিতে কামাখ্যা চরণের ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া প্রথম পারিতোষিক তাঁহাকেই দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে মহেশপুরের স্বর্গীয় মহারাজা গোপাল চন্দ্র সিংহ তাঁহাকে মিণ্টনের কাব্যাবলী নিজ হস্তে অর্পণ করিয়া উৎসাহিত করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে কামাখ্যাচরণের এণ্টেন্স পরীক্ষা দেওয়া হইল না। ১৮৮০ সালে পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমার ইনকম ট্যাক্সের

প্রধান কেরাণী গিরিতে নিযুক্ত হইয়া, তিনি একবৎসরের উর্দ্ধতন তথায় অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে অগ্রজ অম্বি চরণের নিকট শিবপুরে থাকিয়া তিনি ইংরেজী সাহিত্যের আলোচনা প্রবৃত্ত হয়েন। তাহার পর কিছুকাল জ্যেষ্ঠ অম্বিকাচরণের সঙ্গে থাকি উলুবেড়িয়া ও আমতা সবরেজিষ্ট্রী আপিশের প্রধান কেরাণীর ক করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এই সময়েই জন্মে—এডুকেশন গেজেটে তাঁহার কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার পর এলাহাবাদ প্রিপেরেটরী স্কুলের শিক্ষকতায় তাঁহার কিছু দিন কাটিয়া যায়। ১৮৮৬ সালে ইংরেজের ব্রহ্মদেশাধিকারের পর কমিশেরিয়েটের কেরাণী গিরিতে ১৮ মাস অবস্থিতি করিয়া, স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর উত্তর পশ্চি-মাঞ্চলের ঝান্সির কমিশেরিয়েটের কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে যারপরনাই শোকসন্তপ্ত হইয়া তিনি পুনরায় ১৮৯০ সালের জুন মাসে ব্রহ্মদেশ গমন করেন। সেখানে কিছু দিন কেরাণী গিরির পর কমিশেরিয়েটে এজেণ্ট হইয়া তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করেন। সেই সঞ্চিত অর্থে ব্রহ্মদেশের রুসিবাইন্ ডিষ্টিক্টের বার্ণাউ সিও নামক স্থানের দুর্গমধ্যে একটী রিফ্রেশমেণ্ট রুম ও বিলিয়ার্ড খেলার আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। এই ব্যবসায়ে তাঁহার যথেষ্ট অর্থাগমের উপায় হইয়াছিল। কিন্তু মান্দালা সহর হইতে বহু টাকার দ্রব্যাদি বার্ণাড মিডস লইয়া যাইবার কালে মোগলের বাজারে আগুণ লাগায় সমস্ত পুড়িয়া যায়, তাহাতে তাঁহার মূল ধনের অধিকাংশ নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতেও কামাখ্যা চরণ দমিলেন না, পুনরায় ব্যবসায় মনোনিবেশ করিয়া, তিনি আপন অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিমুখী অদৃষ্টদেবী তাহাতে নারাজ হইলেন। এক জন মহাজনের প্রতারণায় তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশে ফিরিতে হইল। অগ্রজের উৎসাহ এবং পরামর্শে তিনি আপনার ব্রহ্মদেশে অবস্থিতির বিবরণ ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া ইং ১৮৯৬ সালে Six years in Burma নামে এক খানি ইংরেজী পুস্তক প্রকাশ করেন। পুস্তকখানির ভাষা ও ভাব এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, দেশীয় ও বিদেশীয় সংবাদ-পত্রসম্পাদকবর্গ

হার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। দুইবৎসর পরে উহার দ্বিতীয় স্করণ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর কামাখ্যা চরণ কিছু দিন কোচবিহার রাজ্যের একাউণ্ট জেনেরল আপিশে কেরাণী গিরি করেন। কিন্তু কামাখ্যা চরণ বশে চাকরী ছাড়িয়া দেন। কোচবিহারে অবস্থিতি কালে "নব্য ারতে" তাঁহার কয়েকটী কবিতা প্রকাশিত হয়। পরে কামাখ্যা চরণ জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করেন। তাঁহার পিতা এক জন সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহার পুরুষানুক্রমিক কতগুলি ঔষধ আছে—বর্ত্তমান সময়ে সে গুলিই তাঁহার প্রধান সম্বল। ইহাঁর কবিতার কয়েকছত্র এইরূপ,—

নিরাকার রূপ।

নিরাকার রূপ কল্পনায় জ্যোতি,
জ্যোতির কল্পনা সারের সার,
প্রেমের প্রগাঢ় অনন্ত অসীম,
ছুটিছে অনন্তে প্রবাহ তার।

হিল্লোলে হিল্লোলে বহে প্রাণ বায়ু,
উচ্চ উর্ম্মিমালা উঠিছে তায়
জীবন-জোয়ারে মৃত্যু ভাটা লাগে,
সাম্য ও বৈষম্য ভাসিয়া যায়।

———

চারুলতা ঘোষ।



ইনি 'চারুকুসুমাঞ্জলী' নামক একখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রত্যেক আদর্শ হিন্দু রমণীর কি করা কর্ত্তব্য তাহা এই গ্রন্থে বর্ণিত।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মক্তারপুর গ্রামে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা শ্রীপার্শ্বনাথ নাগ বিশ্বাস মহাশয় একজন সুবিখ্যাত তালুকদার ও পদস্থ ব্যক্তি। পার্শ্বনাথ বাবুর ৫টী মেয়ে। তিনি সকলকেই রীতিমত শিক্ষিতা করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। চারুলতা,—গ্রাম্য বিদ্যালয়ের উচ্চপ্রাইমারি ক্লাস পর্য্যন্ত পাঠ করেন; বিক্রমপুর শেখরনগর নিবাসী শ্রীদিগিন্দ্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। দিগিন্দ্র বাবু পত্নীকে যত্নের সহিত ইংরাজি ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেন। নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় অতি অল্পকাল মধ্যেই চারুলতার বাঙ্গালা ভাষায় ব্যুৎপত্তি জন্মে; ইনি ইংরাজি ভাষায় আশাতিরিক্ত কৃতকার্য্যতালাভে সক্ষম হন।

দিগিন্দ্র বাবু ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তি। প্রকাশ এইরূপ,—দিগিন্দ্র বাবু এক সময়ে স্ত্রী স্বাধীনতার বড়ই পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় স্ত্রীকে (গ্রন্থকর্ত্রীকে)ও স্বমতাবলম্বিনী করিতে চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। দিগিন্দ্র বাবু ঢাকা নগরীতে থাকিয়া স্বীয় মতের পরিপোষক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, গ্রন্থকর্ত্রী স্বামীর নিকট কয়েকখানি পত্র লিখেন। ঐ সকল পত্র পাঠ করিয়া দিগিন্দ্র বাবুর মত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এক্ষণে তিনি স্ত্রী স্বাধীনতার পূর্ব্ববৎ পক্ষপাতী নহেন। ঐ সকল পত্রের কয়েক খানাই 'চারুকুসুমাঞ্জলী' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই গ্রন্থে 'একখানি পত্র' নামক কবিতার এক স্থানে আছে,—

"তুমি নাকি ঘৃণা কর এ সব দেখিয়ে,
দিবানিশি আছি মোরা খুটী নাটী নিয়ে;
সর্ব্বদা সংসারে মত্ত, না বুঝি বিজ্ঞান তত্ত্ব।

না ভাবি অপুর সত্ব গালে হাত দিয়ে;
পানে চুনে খয় দিয়ে, কেন যায় লাল হয়ে
ভাবিনা এ রসায়ন চমকিত হয়ে;
তুমি নাকি ঘৃণা কর এ সব দেখিয়ে!

অন্যস্থানে আছে,—

'ঘৃণা কর, কর তুমি পড়ে আছি পায়ে;
উহাই চন্দন বলি মেখে নিব গায়ে।
যদি তব হয় সুখ, পেতে দিতে পারি বুক
পড়ুক সহস্র বজ্র সমবেত হয়ে
তোমার সুখের লাগি, হয়ে সরবস্ব ত্যাগি
সকলি করিতে পারে বাঙ্গালীর মেয়ে:
ঘৃণা কর, কর তুমি পড়ে আছি পায়ে।

তারাকুমার কবিরত্ন।

সংস্কৃত শ্লোকের সরল পদ্যানুবাদে ইনি সিদ্ধহস্ত। ইহাঁর প্রণীত কৃষ্ণভক্তিরসামৃত, পঞ্চামৃত, তারা মা, কবিবচন-সুধা প্রভৃতি গ্রন্থ ইহার বিশিষ্ট পরিচায়ক। সংস্কৃত-রচনা শক্তিও ইহাঁর একান্ত প্রশংসনীয়।

২৪ পরগণা জেলায় সোনারপুরের নিকটবর্ত্তী চাঙ্গড়িপোঁতায় ইহাঁর নিবাস। ১২৫৪ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম কৃষ্ণমোহন শিরোমণি।

সংস্কৃত কলেজে কবিরত্ন মহাশয় শিক্ষা লাভ করেন। রাজসাহী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপনা ইহাঁর প্রথম চাকুরী। ইহার পর ইনি কলিকাতায় আসিয়া রেশমী বস্ত্রাদির ব্যবসায় করেন। অতঃপর, রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকট তিনি কর্ম্ম পান। এ চাকুরীর অবসানে ইনি মেট্রপলিটান কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপক হন। এক্ষণে আর তিনি চাকুরী করেন না; নিজের পুস্তকাদির আয়েই তাঁহার সংসার এখন

ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ,—জীবন-মৃগ-তৃষ্ণা; শিবশতকম্; নীতিমালা ছোট চাণক্য; বড় চাণক্য প্রভৃতি। স্কুল পাঠ্য অনেক গ্রন্থও ই প্রকাশ করিয়াছেন।

ধনকৃষ্ণ সেন।

বর্দ্ধমান জেলায় শাকটীগড় ষ্টেশনের প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী খাঁড় গ্রামে ১২৭১ সালে ধনকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন পিতার নাম রামপরাণ সেন। জাতি উগ্র-ক্ষত্রিয়।

গ্রামের পাঠশালে ধনকৃষ্ণ ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে ইংরাজী শিক্ষার্থে ভৈটাগ্রামের মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেন, কিন্তু শিক্ষার বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় ধনকৃষ্ণ বর্দ্ধমানে প্রেরিত হন। মহারাজার কলেজে তাঁহার শিক্ষারম্ভ হয়। এই কলেজ হইতেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সেই সময় তিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। সে গুলি আজ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত অবস্থাতেই পড়িয়া আছে। যথাসময়ে তিনি এফ-এ পরীক্ষা দেন। অতঃপর তিনি সুন্দরী নামক একখানি উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করেন; তাহার প্রায় অর্দ্ধেক অংশ ও দস্যু-দুহিতানামক একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস, উগ্র ক্ষত্রিয় প্রতিনিধি নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর তিনি ১২৯৪ সালে বি, এ অধ্যয়ন মানসে কলিকাতায় আসেন ও মেট্রোপোলিটন কলেজে বি, এ অধ্যয়ন করিতে করিতে ১২৯৫ সালে প্রথম সুদর্শনের রাজ্যাভিষেক নামক নাটক রচনা করেন। আজ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ পাইনের যাত্রার দলে বিশেষ সুখ্যাতির সহিত এই পালা অভিনীত হইতেছে। ক্রমে তিনি সতী মালাবতী, অনুধ্বজের হরিসাধন, অভিমন্যুবধ, সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য, গোবর্দ্ধন মিলন, পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ, উমাতারা বা জটিল, পাণ্ডব-

রাজার হরিবাসর, মহামিলন, মহাপরীক্ষা এই কয়েক খানি পৌরাণিক নাটক রচনা করেন।

১৩০২ সালে ধনকৃষ্ণ নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রগড় গ্রামে শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন রায়ের জমিদারীর ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হন, চারি বৎসর কার্য্য করার পর শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত নন্দলাল গোস্বামী মহাশয়ের ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে কার্য্য করিতেছিলেন।

তাঁহার প্রণীত সমস্ত গ্রন্থ এখনও প্রকাশিত হয় নাই, কেবলমাত্র পৃথুরাজার শতাশ্বমেধ যজ্ঞ, কর্ণবধ ও সতী-মালাবতী প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি ১৩০৯ সালে আটত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমে বৃদ্ধ পিতা ও একমাত্র কন্যা রাখিয়া, কনিষ্ঠ ভাইদিগকে ও আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করিয়াছেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেন অগ্রজের মৃত্যুকালীন আদেশ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহ প্রকাশ মানসে সম্প্রতি পাণ্ডবমিলন বা কর্ণবধ নামক নাটক প্রকাশিত করিয়াছেন।

বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র।

নিবাস,—মাজিদা; বর্দ্ধমান। পিতার নাম রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য। রাজনারায়ণ কবি ও লেখক ছিলেন। ইহাঁর কাব্যগ্রন্থ,—রসিক-রঞ্জন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাচার-চন্দ্রিকায় ইনি প্রবন্ধ লিখিতেন, রত্নাবলীর সম্পাদক ছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মধুসূদন। ইহাঁর যত্নে বিষ্ণুচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ। মধুসূদনও লেখক। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কারারুদ্ধ হইলে, তাঁহার ভাস্কর পত্রিকা মধুসূদনই সম্পাদন করেন।

নদীয়া-নাকশিপাড়ায় বিষ্ণুচন্দ্র ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ করেন; পরে কলিকাতার গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি হন, তাহার পর কৃষ্ণনগর

মিশনরি স্কুলে তাঁহার অধ্যয়ন। এই সময়ে রঙ্গপুর-কাকিনার 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ' প্রকাশিত হয়। মধুসূদন তাহার সম্পাদক হন। বিষ্ণুচন্দ্রও তখন কৃষ্ণনগর হইতে কাকিনায় গিয়া ইংরেজী বাঙ্গালা স্কুলে পড়িতে থাকেন। এইরূপে নানা স্থানে নানা স্কুলেই তাঁহার শিক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

১৮৬৭ সালে ইনি এলাহাবাদে একাউণ্টেণ্ট জেনেরল আফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাহার পর তাহার চাকুরী রেলওয়ে আফিসে। মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ে ইনি ১৮৭১ সালে এলাহাবাদে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন তাঁহার হইয়া উঠিল না। ১৮৭৩ সালে বিষ্ণুচন্দ্র এলাহাবাদস্থিত গবরমেণ্টের আইন স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৪ সালে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৫ সালে এলাহাবাদে হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষায় পাশ হন। ইহার পর এই সালেই এই হাইকোর্টের ওকালতী আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ সাল হইতে ১৮৮৬ সাল পর্য্যন্ত আজমগড় জেলা আদালতে ওকালতী করেন। ১৮৮৭ সাল হইতে পুনরায় হাইকোর্টেই ওকালতী করিতে থাকেন।

বহু সংবাদপত্র ও মাসিকপত্রে ইনি বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ইহাঁর গ্রন্থ 'অপচয় ও উন্নতি'-অর্থনীতি সম্বন্ধীয় সন্দর্ভমালা। ইহা ১৮৯০ সালে প্রকাশিত হয়।

চন্দ্রশেখর সেন।

ইনি "ভূ-প্রদক্ষিণ" নামক গ্রন্থের লেখক। ইনি এসিয়া, ইউরোপ, আফরিকা, আমেরিকা,—সংক্ষেপতঃ পৃথিবীর যাবতীয় সুপ্রসিদ্ধ স্থান সমূহ পরিদর্শন করিয়াছেন। এই বহুল পরিদর্শন এবং অশেষ অভিজ্ঞতার অমিয় ফল,—ইহাঁর বিরাট গ্রন্থ "ভূ-প্রদক্ষিণ।"

চন্দ্রশেখর ১৮৫১ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিমোহন সেন। জাতিতে বৈদ্য। চন্দ্রশেখর আশৈশব একান্ত পর্য্যটনপ্রিয়। ইঁহার জননীও, ভ্রমণানুরাগিণী। তিনিও কুমারিকা হইতে বদ্রিনাথ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছেন। মাতার গুণ,—পুত্রে সংক্রামিত। ফলে, পুত্র আজ পৃথিবী পর্য্যটকরূপে প্রসিদ্ধ।

স্কুলে শিক্ষা চন্দ্রশেখরের অধিক হয় নাই; মালদহেই স্কুল মাষ্টারী তাঁহার প্রথম চাকরী।

কিছুকাল পরে চন্দ্রশেখর চাকরীও ছাড়িয়া দেন; কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু শেষ পাঠে সবুর সহিল না; তিনি বিনা উপাধিতেই ডাক্তারী আরম্ভ করিলেন। উপাধি না হউক,—গবরমেণ্টের নিকটও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান হইল। তিনি আসাম সীমান্তে মেডিকেল অফিসারের কার্য্য পাইলেন। ইহাও ছাড়িয়া দিলেন। এক্ষণে ইনি ব্যারিষ্টার।

১৮৮৯ সালে তাঁহার পর্য্যটন আরম্ভ হয়। ইউরোপের বহুস্থান তিনি একাধিকবার পরিভ্রমণ করিয়াছেন। "ভূ-প্রদক্ষিণ" বস্তুতই বাঙ্গলা-ভাষায় ভ্রমণ বৃত্তান্তসম্বন্ধে অত্যুত্তম গ্রন্থ। যাঁহাদের নানা দেশ ভ্রমণে নানাবিধ বিঘ্ন বাধা বিদ্যমান, কেবলমাত্র এই গ্রন্থ পাঠেই তাঁহাদের সে সকল দেশের তথ্যাস্বাদের বাসনা অনেক পরিমাণে সন্তৃপ্ত করিতে পারে। কেবল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বিবরণে ভূপ্রদক্ষিণ ভোরপুর নহে. রাজনৈতিক এবং সামাজিক তথ্যও ইহাতে ভূরি পরিমাণে সংন্যস্ত। তুলনায় সমালোচনাও বিরল নহে।

জগদানন্দ রায়।

১২৭৬ সালের ৩রা আশ্বিন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে জগদানন্দ রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম অভয়ানন্দ রায়;—ইনি জমিদার, অনরারি ম্যাজিষ্ট্রার,—মিউনিসিপাল কমিশনর। ইহাঁরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ।

সংস্কৃতেই জগদানন্দ বাবুর বিদ্যারম্ভ; তৎপরে ইনি ছাত্রবৃত্তি পড়িতে আরম্ভ করেন; ১৮৮৩ সালে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবিষ্ট হন। জগদানন্দ বাবু ১৮৮৮ সালে প্রবেশিকা এবং ১৮৯০ সালে বি, এ, পরীক্ষা দেন।

গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা, সাধারণী, সাহিত্য, ভারতী এবং বিস্তর পত্রে ইনি বিস্তর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

জয়গোপাল গোস্বামী।

ইহাঁর নিবাস শান্তিপুর;—জেলা নদীয়া। ইনি মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বংশধর। কাব্যদর্পণ, আটাকাটি সীতাহরণ, শৈবলিনী প্রভৃতি গ্রন্থের ইনি রচয়িতা। ইহাঁর পুত্র,—বেনোয়ারিলাল গোস্বামী মহাশয়ও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের বিস্তৃত জীবনী দ্বিতীয় ভাগে প্রকাশিত হইবে।

কুঞ্জবিহারী কাব্যতীর্থ ধন্বন্তরি।

ইহাঁর জন্মস্থান—হুগলী জেলায় দাঁড়পুর গ্রাম। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ হইতে কাব্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কাব্যতীর্থ উপাধিপ্রাপ্ত হয়েন। পরে দর্শনশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক ত্রয়োদশ বৎসর কাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছেন। পুরুষানুক্রমে ইহাঁরা এই ব্যবসা করিতেছেন। কবিরাজ মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতা শ্রীনাথ দাস মহাশয় দেশের একজন বিখ্যাত সুচিকিৎসক ছিলেন। তিনি পরোপকারী,

সত্যনিষ্ঠ, সরলপ্রকৃতি ও পরম হিন্দু ছিলেন। যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থের উৎকৃষ্ট অনুবাদ এবং সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন কোন গ্রন্থে অনেক স্থলেই আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে ধন্বন্তরি মহাশয়ের কৃতিত্ব আছে। এই সকল অনুবাদ যে বঙ্গভাষার বিশেষরূপ পুষ্টিসাধন করিয়াছে, সে কথাই বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন ইনি অন্যান্য কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থেরও অনুবাদ করিয়াছেন। চিকিৎসাবিষয়ক মাসিকপত্রেও উহাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ সকল মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপে অন্তরালে থাকিয়া ধন্বন্তরি মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়া তাহার পুষ্টিসাধন করিতেছেন। ইনি নিজে "ধন্বন্তরি" নামক চিকিৎসাবিষয়ক মাসিক পত্র ১৩০৪ সালের আষাঢ় হইতে ১৩০৫ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত দেড় বৎসর কাল নিয়মিতরূপ সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। ধন্বন্তরি পত্রে ইহাঁর অনুসন্ধিৎসা, শাস্ত্রাভিজ্ঞত, বিচারনিপুণতা প্রভৃতি গুণের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। পরাশর ঋষির সংস্কৃত কৃষিসংগ্রহ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ ইহাঁরই কৃত।

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

"তরু বল্‌রে বল্‌,—কে তোরে সাজায়ে দিল, পত্র-পুষ্প-ফল"—কবি বিষ্ণুরামের এই সঙ্গীত সুপ্রসিদ্ধ। সঙ্গীত-গ্রন্থ ব্যতীত ইনি অন্যরূপ গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেটীয়ারি গ্রামে ১৭৫৪ শকাব্দে ২৮শে চৈত্র বিষ্ণুরাম জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই ইনি পিতৃহীন হন। শিশুকাল হইতেই বিষ্ণুরাম বাঙ্গালা কবিতা লিখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইহাঁর প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ "রাম বাল্য-লীলামৃত।"

১৩০৮ সালের ২৫শে ফাল্গুন কবি বিষ্ণুরামের দেহান্তর হইয়াছে।